বঙ্গদর্শন

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর।

(সাগর-মাহাত্ম্য)

পঙ্কজ বলিলে পদ্মকেই বুঝায়; বিদ্যাসাগর বলিলেও সকলে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই বুঝিয়া থাকেন। তিনি সত্যই বিদ্যার সাগর, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত পরিচয় কি বিদ্যায়? না। তিনি বুদ্ধির আধার, তেজের আকর, উৎসাহের প্রতিমূর্ত্তি; কিন্তু কেবল এ সকল গুণের জন্য ত তিনি আমাদের হৃদয়ের এই গভীর ভক্তি আকর্ষণ করেন নাই। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ও এই সকল গুণের অধিকারী ছিলেন, তাঁহার ও ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণ প্রায় এক সময়েই ঘটিয়াছিল। কিন্তু মনস্বী রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুতে কি দেশব্যাপী হাহাকার উঠিয়াছিল? "বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে" কথা সত্য বটে, কিন্তু সে শিক্ষিত সমাজে; সাধারণের সহিত তাহার সম্পর্ক বড় অল্প, তবে বিদ্যাসাগরের বিয়োগে দেশে শোকের সে প্রবল উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল কেন এবং আজিও তাঁহার কথা উঠিলেই সাধারণের চক্ষু সজল হইয়া আসে কেন? সে কি তিনি বিদ্যাসাগর বলিয়া? না। তিনি যে দয়ার সাগর, দয়াই তাঁহার বিশেষত্ব। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহার দয়ার কথা স্মরণ করিয়াই আজিও আকুল হয়। দয়ার সাগর উপাধিই তাঁহার প্রকৃত পরিচয়; দানের মাহাত্ম্য আমরা ভুলিয়াছিলাম। স্বদেশ-প্রেম, স্বজাতি-প্রেম, স্বধর্ম্ম-প্রেম আমাদিগের নিকট পুঁথিগত বিদ্যার তুল্য ছিল। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরই আমাদিগের দয়া ও প্রেমের মহিমা স্বীয় জীবনের কার্য্যের ভিতর দিয়া আবার নূতন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন।

স্বর্গীয় মনস্বী ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন "ভারতের ইতিহাস উহার অধিবাসী জনগণের সহধর্ম্মী প্রেম ও স্বদেশী প্রেম-বিহীনতা দোষের প্রায়শ্চিত্তের ইতিহাস মাত্র। তিনি বলিয়াছিলেন যে, উচ্চশ্রেণীর হিন্দু তাঁহার 'শাস্ত্রবাক্যে' শিক্ষিত, যে সর্ব্ব ঘটেই ভগবান বিদ্যমান আছেন, সমস্তই একের বিভূতি। কিন্তু ব্যবহারে সধর্ম্মীকে পশুর অপেক্ষাও অপবিত্র

ভাবে দেখিতেন, এবং অনেকটা এখনও দেখেন। ঘরের দাওয়াতে ছাগল-নাদিতে দোষ কম, এক জন মেথর বা ডোম বসায় দোষ বেশী। এই সধর্ম্মী প্রেমের অভাবে এই সধর্ম্মী বিদ্বেষের জন্য ভগবান করুণা-পূর্ব্বক পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সধর্ম্মী প্রেমিক মুসলমানকে শাস্তা ও শিক্ষকরূপে এ দেশে প্রেরণ করেন। মুসলমানের আমলের শেষে হিন্দুর মধ্যে কতকটা সধর্ম্মী প্রেমের উদ্রেক হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মহারাষ্ট্রীয় শূদ্রের সহিত একপ্রাণ হইয়া দেশের কার্য্য করিয়াছিল। সর্ব্ব বর্ণের পঞ্জাবী শিখও একপ্রাণ হইয়া কার্য্য করিয়াছিল। কিন্তু মহারাষ্টীয়ের এবং শিখেদের স্বদেশী প্রেম পরিস্ফুট হয় নাই, উহা প্রাদেশিকভাবে বদ্ধ ছিল। উহারা নিজেদের সকলকেই ভারত-সন্তান বলিয়া মনে করে নাই। মহারাষ্ট্রীয়, রাজপুতানা-বাসীকে এবং বাঙ্গালীকে নির্ম্মম ভাবে লুঠ করিয়াছিল। শিখ কয়টা বড় সহর—সহিন্দ একেবারে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। ভারতবাসী যে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের স্বদেশী সুতরাং প্রেমের পাত্র এবং অপর দেশবাসী সকলের অপেক্ষাই নিকটের, এই সহজ কথা উভয়েই কিছু মাত্র বুঝেন নাই। ভগবান এই স্বদেশী বিদ্বেষ-পাপের দমন জন্য পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বদেশী ভক্ত ইংরাজকে ভারতে অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপন জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। সধর্ম্মী প্রেম সম্বন্ধে মুসলমান আদর্শস্থানীয়; দরিদ্র, ভিক্ষুক এবং নবাব বাদসাহ ভাই ভাই ভাবে একত্র নমাজ পরিতে আদিষ্ট এবং সে বিধি উহারা প্রীতির সহিত পালন করিয়া থাকেন। ইদের দিনে কাতারে কাতারে মুসলমানদের একত্র উপাসনা কি সুন্দর ও পবিত্র দৃশ্য। এ দিকে আবার স্বদেশী প্রেম সম্বন্ধে ব্রিটিশ বা ইংরেজ জাতি আদর্শস্থানীয়! ইংরাজের মধ্যে স্কচ্, ওয়েলস্, আইরিশ, রোমান্-ক্যাথোলিক, ডেসেটার, প্রেসপিটিরিয়ান্ প্রভৃতিই প্রাদেশিক ভেদ আছে, কিন্তু উহারা সকলে স্বদেশ-প্রেমে মত্ত। স্বধর্ম্মের জন্য মুসলমান অপকর্ম্মও করিতে প্রস্তুত, স্বদেশীর জন্য ইংরাজও অপকর্ম্ম পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত। ভারতবাসী হিন্দু-মুসল-মানগণের কাহার জন্যই অপকর্ম্ম হইয়া কাজ নাই; কিছুতেই ঈশ্বর সমীপে অপরাধী হইয়া কাজ নাই, উহাতে স্বধর্ম্মীর বা স্বদেশীর প্রকৃত উপকার করা হয় না, কিন্তু প্রত্যেক ভারতবাসীর মনেই গাঢ় স্বধর্ম্মী প্রেম গাঢ়তর স্বদেশী প্রেমে আবৃত থাকা প্রার্থনীয়, সেইরূপ কখন হইলে তবে এই পুণ্য-ভূমিতে ও কর্ম্ম-ভূমিতে ভগবানের প্রেরিত স্বধর্ম্মী প্রেমিক ও স্বদেশী প্রেমিক —আদর্শদিগের আগমন সার্থক হইবে।"

আমার মনে হয়, তাঁহাদের আগমনের সার্থকতার সূত্রপাত হইয়াছে। বিদ্যাসাগরই এই সার্থক পথের প্রথম ও প্রধান যাত্রী, কিন্তু তাঁর প্রেম কেবল স্বধর্ম্মী প্রেমে ও স্বদেশী প্রেমে আবদ্ধ ছিল না, সে প্রেম বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণ, কি চণ্ডাল, হিন্দু কি মুসলমান, ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টান, ছোট কি বড়, আবশ্যক স্থলে সমান ভাবে সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। তিনি তাঁহার অধ্যা-

পকের কলেরা রোগে যেমন সেবা করিয়াছিলেন, একজন মেথরের সুশ্রূষাতেও সেইরূপ একান্ত মনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কোন অধ্যাপক স্বীয় ভাগিনেয়ের কলেরা পীড়ায় ভীত হইয়া তাহার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। অধ্যাপকের সেই পরিত্যক্ত ভাগিনেয়কেও বিদ্যাসাগর যেরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, অন্য এক ব্যক্তির ঐ পীড়াক্রান্ত ভৃত্য, প্রভু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বিদ্যাসাগরের নিকট সেইরূপ ব্যবহারই পাইয়াছিল। সেই মুমূর্ষু, পরিত্যক্ত, অনাথ ভৃত্যকে বিদ্যাসাগর পথ হইতে তুলিয়া বুকে করিয়া লইয়া নিজের শয্যায় আশ্রয় দিয়াছিলেন। সংক্রামক রোগ বলিয়া তিনি কখন রোগীর সেবায় পশ্চাৎপদ হন নাই। একজনার সেবায় প্রাণ হারাইলে দেশের ও দশের উপকার করা সম্ভব হইবে না, সুতরাং Public goodএর জন্য সেরূপ সেবায় নিজের মূল্যবান জীবনকে বিপন্ন করা অনুচিত এরূপ যুক্তি-তর্কের উদয় কখনও তাঁহার মনে হয় নাই।

একবার সহোদর শম্ভুচন্দ্রের নিষেধ-ইঙ্গিত সত্বেও কোনও কুষ্ঠরোগীর স্বহস্ত আনীত জলখাবারও বিদ্যাসাগর অম্লান বদনে খাইয়াছিলেন এবং এ জন্য পরে শম্ভুচন্দ্র অনুযোগ করিলে বলিয়াছিলেন "তোমার ঐ পীড়া থাকিলে আমি কি করিতাম।"

সে বৎসর দুর্ভিক্ষের সময় হাজার হাজার লোককে অন্ন দিয়া, যাহারা সকলে একত্রে খাইতে অনিচ্ছুক তাহাদের সিধা দিয়া, যাহারা প্রাণান্তেও সাধারণে পরের সাহায্যে জীবন ধারণের কথা প্রচারে স্বীকৃত ছিল না, তাহাদিগকে গোপনে অর্থ সাহায্য করিয়াও বিদ্যাসাগরের মনে তৃপ্তি হইত না। সমাগত দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনসঙ্ঘের রুক্ষ মস্তকে তৈল দিবার ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। নীচজাতীয়, যথা ডোম, চণ্ডাল আদি শ্রেণীর লোককে অপরে ঘৃণাবশত তৈল না দিলে বিদ্যাসাগর স্বহস্তে তাহাদের মস্তকে গাত্রে তৈল দিয়া দিতেন। দুর্ভিক্ষের পরেও যাহাদের অবস্থা শোচনীয় তাহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। শারদীয় পূজায় পঞ্চ সহস্র মুদ্রার বস্ত্র দান করিয়াও এ দুর্ভিক্ষের সময় সহস্র টাকার বস্ত্র দান করিয়াছিলেন। যখন বাল্যকালে উপার্জ্জনের ক্ষমতা ছিল না, তখনও তিনি গামছা পরিধান করিয়া বস্ত্রহীনকে নিজের বস্ত্র দিতেন। উত্তরকালে তিনি যখন বিশেষ পদস্থ হইয়াছিলেন তখনও পূর্ব্ব পরিচিত দীন দুঃখী বা সামান্য অবস্থাপন্ন লোকের সহিত একাসনে বসিয়া তাহাদের সহিত কত ঘরের কথা কহিতেন, সম্ভ্রান্ত ও বড় লোক কেহ কেহ তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া লজ্জিত হইলে তিনি বলিতেন "আমার ছোট বড় সবই সমান, আমার এ ব্যবহারে যদি তোমরা লজ্জানুভব কর, তবে আমার সহিত আলাপ না রাখিলেই চলিবে।"

বর্দ্ধমান যখন ম্যালেরিয়ায় উৎসন্নপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় গভর্ণমেণ্ট দ্বারায় চিকিৎসা সাহায্য করাইয়াও নিজ ব্যয়ে Dispensary স্থাপন

করিয়া ঔষধ, পথ্য ও বস্ত্র দিয়া শত শত রোগীর জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

ঔষধে অধিক ব্যয় হইতেছে বলিয়া ডাক্তার দরিদ্র ব্যক্তি ও রোগীর জন্য কুইনানের পরিবর্ত্তে সিঙ্কোনা (cincona) ব্যবহারের প্রস্তাব করিলে "রোগ ত সবারই সমান, তবে ঔষধের তারতম্য কেন হইবে" বলিয়া সে প্রস্তাব বিদ্যাসাগর মহাশয় অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এক দিন দেশবাসী দীন দুঃখীর কথায়, অন্ন ক্লিষ্টের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিয়াছিলেন, দেশে সকলেই Congress করিতেছেন, আন্দোলন করিতেছেন কিন্তু দেশের শত সহস্র লোক যে অনাহারে প্রতিদিন মরিতেছে তাহাদিগকে ত কেহ দেখিতেছেন না। যে দেশের লোক দলে দলে না খাইয়া প্রত্যহ যমদ্বারে উপস্থিত হইতেছে তাহাদের আবার রাজনীতি কি? আজকাল আমরা দেশের দীন দুঃখীর অভাব ও কষ্ট যেন এক আধটু বুঝিতেছি, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন এই কথা বলিয়াছেন তখন তিনি ছাড়া দুঃখীর ব্যথা কয় জনা বুঝিত! এখনই বা কয়জনে কতটুকু বুঝি! বুঝিলেই বা তাহা মোচনে কতটুকু চেষ্টা করি। বিদ্যাসাগর দীনদুঃখীর দুঃখ বুঝিতেন এবং বুঝাই যথেষ্ট মনে করিতেন না, মোচন করিতেও চেষ্টা করিতেন। লক্ষপতির সাহসে যাহা কুলায় না সেই ভাবে অর্থ ব্যয় করিয়া নিজের বহুমূল্য সময়ের দিকে লক্ষ্যমাত্র না রাখিয়া সে অভাব, সে দুঃখ ঘুচাইতেন। এরূপ আদর্শ কখন বৃথায় যায় না, এ আত্মত্যাগ কখন নিষ্ফল হয় না।

গত অর্দ্ধোদয় যোগে যখনই যুবক, কিশোর এমন কি বালকবৃন্দকেও দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া অনাহারে, অনিদ্রায় প্রফুল্ল চিত্তে স্বদেশবাসীর সেবা করিতে দেখিয়াছি, তখনই আনন্দে শিহরিয়া উঠিয়া ভাবিয়াছি, এতদিনে বিদ্যাসাগরের আদর্শের ফল ফলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এতদিন দেশের মৃত দেহে সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার হইয়াছে, আর ভূদেব বাবুর সেই সধর্ম্মী ও স্বদেশী প্রেম সম্বন্ধে অনুমানও বুঝি যাথার্থ্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে!

বিদ্যাসাগর পরের সেবার জন্য অর্থ বা সময় কিছুরই মায়া করিতেন না। তিনি পীড়িত বন্ধুর সেবার বা মনোরঞ্জনের জন্য ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া পীড়িতের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। কোন উন্মাদরোগ-গ্রস্তা বন্ধুপত্নীকে অন্য কেহ আহার করাইতে সক্ষম হইত না বলিয়া বিদ্যাসাগর দীর্ঘকাল তাহাকে স্বহস্তে আহার করাইয়া আসিতেন।

পরের দুঃখে তাঁহার হৃদয় সদাই কাঁদিয়া উঠিত, তাই বালবিধবার যে দুঃখ তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহা মোচনের জন্য তিনি আপনার সমস্ত সুখ, শান্তি, স্বাস্থ্য ও অর্থ বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠামাত্রও করেন নাই। কুলীন-কুমারীর ব্যথায় ব্যথিত হইয়াও বহুবিবাহ নিবারণের জন্য সেরূপ গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

আকাশের তারকা, সমুদ্রের তরঙ্গ, মরুভূমির বালুকা বরং গণনা করা সম্ভব,

কিন্তু বিদ্যাসাগরের দানের সংখ্যা সাধ্যাতীত। তাঁর অধিকাংশ দানই গোপন ছিল, তবু ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে! কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যাদায়-উদ্ধারের জন্য ঋণ-দায়ে বিব্রত হইয়াছিলেন, তাঁহার মহাজন কলিকাতা ছোট আদালতে নালিশ করিয়াছেন—সে দায় হইতে উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই, কত কত বড় লোকের নিকট দুঃখের কাহিনী বলিয়া ব্রাহ্মণ সাহায্য চাহিয়াছেন কোন ফল হয় নাই, শেষ বিদ্যাসাগরের সহিত তার পথে দেখা, বিদ্যাসাগরকে তিনি চিনিতেন না, কথায় কথায় বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণের বিপদ শুনিলেন, তার পর তাঁকে কিছু না বলিয়া ছোট আদালতে সে টাকা জমা করিয়া দিয়া ব্রাহ্মণকে ঋণমুক্ত করিলেন, ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত জানিল না, তাঁহার উদ্ধার কর্ত্তা কে! এইরূপ দান এক আধটি নয় অসংখ্য। মাসে যে তিনি কত লোকের মাসহারা যোগাইতেন, তাহা তাঁহার উইল দেখিলে কতকটা অনুভূত হয়! ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা করিতে আসিয়া যদি দাঁড়াইয়া থাকিত, তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় ভৃত্যদের ধমকাইতেন, বলিতেন, দিবি ত এক মুঠা চাউল, তা আবার দেরী কেন, ওরা এই সময়ে আর দুই বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে পারিবে।

এক ভিখারিণীকে বর্দ্ধমানে বিদ্যাসাগরের পুরাতন পাচক ভর্ৎসনা করায় তাহাকে কর্ম্ম হইতে অবসর দেন, পুরাতন ভৃত্য বলিয়া তাহার পেনসেনের ব্যবস্থা করিয়াও দিয়াছিলেন, তথাপি যে ভিখারীকে কটু কথা বলে, তাহাকে নিজের গৃহে রাখিতে বিদ্যাসাগর আর স্বীকৃত হইলেন না।

এক দিন কোন ধনীর বৈঠকখানায় গৃহস্বামীর সহিত বিদ্যাসাগর বসিয়া আছেন, এমন সময় এক ভিখারীর কাতর চীৎকার তাহার কর্ণে বার বার পশিতে লাগিল, তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া ধনীকে বলিলেন ও লোকটা চীৎকার করে কেন! ধনী মনে করিলেন বিদ্যাসাগর বুঝি ঐ চীৎকারে বিরক্ত হইতেছেন, সে জন্য দ্বারবানকে ডাকিয়া লোকটার ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন। ভিক্ষুক সে ধনবানের গৃহে ভিক্ষার জন্য গিয়াছে, ইহা নিশ্চয়ই বামনের চন্দ্রলাভের ন্যায় দুরাশা। কিন্তু তার এ দুরাশার অর্দ্ধেক ফল ফলিল অর্থাৎ চন্দ্রের পরিবর্ত্তে দ্বারবানের সুকোমল হস্তের অর্দ্ধচন্দ্র প্রাপ্ত হইয়া ভিক্ষুক কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল। বিদ্যাসাগর ইহা বুঝিলেন, তাড়াতাড়ি সে বৈঠকখানা হইতে নামিয়া একটি টাকা এবং পাছে সে টাকাটি ভাঙ্গাইতে মায়া করিয়া না খাইয়া উপবাসী থাকে, তাই আর দুইটি পয়সা দিয়া বলিলেন বাপু, এ দুয়ারে আর কখনও আসিও না, শুনিয়াছি বিদ্যাসাগরও আর সে বাড়ীতে প্রবেশ করেন নাই।

বিদ্যাসাগর ধর্ম্মপ্রচার কেন করেন না বলিয়া কেহ কেহ তাঁহার নিকট আক্ষেপ করিতেন! বিদ্যাসাগর তাহাদিগকে বলিতেন বাপু ঐ কাজটি আমার দ্বারা হইবে না, পরের জন্য বেত খাওয়া আমার কর্ম্ম নয়। সে কিরূপ? না, যখন পরকালে ধর্ম্মের বিচার হইবে তখন হয় ত ঠিক ধর্ম্ম গ্রহণ

কম্মি নাই বলিয়া এক প্রস্থ বেত খাইব, আবার যাহারা আমার প্রদর্শিত ধর্ম্ম পথে আসিবে, তাহাদিগকে কেন অধর্ম্ম পথে চালাইয়াছি বলিয়া তরফে তরফে প্রত্যহ বেত খাইতে হইবে; তা বাপু অত বেত খাওয়ায় আমার কাজ নাই, এ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব কেহ ঠিক আবিষ্কার করিতে পারেন নাই,—সে মীমাংসা আর সৃষ্টির প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত হইল না। সুতরাং না বুঝিয়া কি ধর্ম্ম প্রচার করিব—

বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা॥

কিন্তু বিদ্যাসাগর কি সত্যই কোন ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই? কলির যাহা প্রধান ধর্ম্ম তিনি তাহাই প্রচার করিয়াছেন, শুনিয়াছি মনুসংহিতায় আছে—

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দ্দানমেকং কলৌ যুগে।

সত্য যুগের প্রধান ধর্ম্ম তপস্যা, ত্রেতা যুগের প্রধান ধর্ম্ম জ্ঞান, দ্বাপর যুগের প্রধান ধর্ম্ম যজ্ঞ, কলি যুগের প্রধান ধর্ম্ম দান।

পরাশর সংহিতাতেও না কি ঐ কথা—

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দ্দানমেব কলৌ যুগে!

এ যুগে বিদ্যাসাগরের মত দান কে করিয়াছে তাঁহার মত দাতা কে? সুতরাং বলিতে হইবে, কলিযুগে তিনিই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-প্রচারক! কিন্তু তাঁহার দানের সীমা শাস্ত্রের ভবিষ্যৎবাণীও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

অভিগম্য কৃতে দানং ত্রেতাস্বাহূয় দীয়তে।
দ্বাপরে যাচমানায় সেবয়া দীয়তে কলৌ।

সত্য যুগে পাত্রের নিকট গিয়া দান করিয়া আইসে, ত্রেতাযুগে পাত্রকে আহ্বান করিয়া আনিয়া দান করে, দ্বাপর যুগে নিকটে আসিয়া যাচ্ঞা করিলে দান করে, কলিযুগে আনুগত্য করিলে দান করে।

কিন্তু বিদ্যাসাগরের দান কলিকালেও সত্যযুগের ন্যায় ছিল!

বিদ্যাসাগর দানই করিয়াছেন, কিন্তু সংসারে প্রতিদান বড় পান নাই, অবশ্য প্রতিদানের আশায় তিনি দান করেন নাই, বিশেষত দানগ্রহণ তিনি ত করিতেনই না, এই মন্ত্র যেন তাঁর জীবনের জপ-মালা ছিল—

"যাচিতারশ্চনঃ সন্তু মাচ যাচিস্ম কঞ্চন।" "সহস্র সহস্র যাচক আমার নিকটে উপস্থিত হউক, আমি যেন কোন ব্যক্তিরও নিকট যাচ্ঞা না করি।" তিনি অর্থ কি উপকার ইহা পাইবার জন্য লালায়িত ছিলেন না, কিন্তু তিনি প্রীতির প্রার্থী ছিলেন! তিনি এক সময় তাঁহার পিতৃদেবকে লিখিয়াছিলেন, আমি এ সংসারে আসিয়া কাহাকেও সুখী করিতে পারিলাম না, আমার অবস্থা যেন, কথামালার অশ্ব ও বৃদ্ধ কৃষকের বৃদ্ধের মত। এই কয়টি সামান্য কথাতেই তাঁহার মনের বেদনা কতক অনুভব করা যায়। তাঁহার কনিষ্ঠ দৌহিত্র নিতান্ত শৈশব অবস্থায় কথা-প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "দাদা মহাশয় আমি তোমায় বড় ভাল বাসি, কিন্তু তার চেয়ে বেশী ভাল বাসি, তোমার ঐ চক-চকে সিকি দুয়ানিকে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় এ কথায় বড় সুখী হইয়া বলিয়াছিলেন "ঠিক

কথাই রে গুজি, আমা অপেক্ষা আমার চকচকে সিকি দুয়ানিকেই সবাই বেশী ভাল বাসে, তুই ছেলে মানুষ তাই সত্য কথা বল্লি! অন্তে চাপিয়া যায়।” এ কথাতেও তাঁহার হৃদয়ের ক্ষত ধরা পড়ে। স্বর্গগতা বালিকা প্রভাবতী সম্ভাষণেও তাঁহার হৃদয়ের ব্যথা বুঝিতে পারি। সংসারের স্বার্থপরতা, অকৃতজ্ঞতা, নীচতা দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন! কেহ তাহার নিন্দা করিতেছে শুনিলে তিনি একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিতেন, দাঁড়াও, আগে দেখি, আমি তাহার (ঐ নিন্দুকের) কোন উপকার করিয়াছি কি না! হায়, তিনি যাহাদের প্রাণ দিয়া উপকার করিয়াছেন তাহারাই তাঁহার নিন্দুক, কি নিদারুণ অভিজ্ঞতা! বিদ্যাসাগরের দারুণ ক্রোধ ছিল সত্য, সে ক্রোধে সময় সময় প্রলয় বহিয়া যাইত, ক্রোধের বশে অনেক সময় তিনি ক্ষতিগ্রস্তও হইয়াছেন অনেক সৎকার্য্যও পণ্ড হইয়াছে, কিন্তু সে ক্রোধ সে জিদ না থাকিলে আবার অনেক শুভ কর্ম্মও হইত না। আমরা তাই বিদ্যাসাগরকে যেমন ভাল বাসি, তাঁর জিদ, তাঁর ক্রোধকেও তেমনই আদর করি। বিদ্যাসাগর একদিন তাঁর জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র সুরেশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন—তোরা সত্যই কি আমায় ভাল বাসিস? সুরেশ বাবু তখন ঠিক বালক নহেন, রঘুবংশ প্রভৃতি পাঠ করেন—সুরেশ বাবু উত্তর দিলেন সত্যই আপনাকে ভাল বাসি। বিদ্যাসাগর বলিলেন, আমি তোদের প্রতি এত তর্জ্জন গর্জ্জন করি, সময়ে সময়ে প্রহারও করি, তবু তোরা আমায় ভাল বাসিস্ এ কথা সত্য কেমন করিয়া বুঝিব। তখন সুরেশ বাবু রঘুবংশের সেই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন—

“অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ
যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ।”

যে সাগরে মকর কুম্ভীর, সেই সাগরেই রত্ন নিহিত! রত্নাকরকে কে না ভালবাসে? আমরাও সুরেশ বাবুর মত বলি, রত্নাকরকে কে না ভালবাসে?

বিদ্যাসাগরের দয়া কেবল মনুষ্য মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, তিনি কুকুর বিড়ালের জন্যও শোক করিতেন। একদিন গাভী দোহনের সময় তিনি গাভীর ও বৎসের ব্যাকুলতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন! গাভীর সজল করুণ চক্ষে যে কথা প্রকাশ পাইতেছিল, তাহা তিনি যেন হৃদয় দিয়া পাঠ করিলেন; গাভী যেন বলিতেছিল—

“দারুণ পালক সেই, আমারি কুটীরে,
বাঁধিয়া রেখেছে, মোর শিশু বৎসটীরে।
আমি আছি তিন হাত মাত্র দূরে বাঁধা
দিবস যামিনী মোর সার শুধু কাঁদা।
ক্ষুধায় আকুল বাছা জিজ্ঞাসে না কেহ,
বাঁট ভরা দুধ মোর বুক ভরা স্নেহ।
সারা রাত্রি বাছা মোর মা মা বলে ডাকে
ক্ষুধায় দুর্ব্বল হ'য়ে ভূমে পড়ে থাকে!
দুজনায় দুজনের মুখ পানে চাই
বিফল রোদনে মোরা যামিনী পোহাই!
প্রত্যহ প্রভাতে পাই প্রভুর দর্শন,
সে দৃষ্টি এ প্রাণে করে অনল বর্ষণ!
দেখিলে দোহন পাত্র বাম হাতে কেঁড়ে
আসিয়া বাছারে দেয় একবার ছেড়ে।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বৎস পাগল হইয়া
দুধ খেতে আসে মোর বাঁটে মুখ দিয়া।
দুটি মাত্র টান দিতে, সে পাষাণ প্রাণে
নাহি সহে, বাছার বদন ধরে টানে।
তখনি, সরায়ে নিয়া ধ'রে রাখে কাছে,
তা' দেখে কি অভাগিনী মার প্রাণ বাঁচে।
সব দুধ টুকু মোর টানিয়া দোহায়
ভাবি হায়, কেন কাল যামিনী পোহায়!
কাছে দাঁড়াইয়া বাছা হায় হায় করে,
'মা মা' ব'লে ডাকে আর আঁখি দুটী ঝরে,
নিঠুর যখন দেখে দুধ নাই বাটে,
ছেড়ে দেয়, তারে, বাছা শুষ্ক বাট চাটে।
সব চলে যায় মোরা দুইজনে কাঁদি,
নীরবে সকলি সহি, বিধি প্রতিবাদী!
পূর্ব্ব জন্মে কার মাকে দিয়েছিনু ক্লেশ
তারই এ কঠোর শাস্তি, জেনেছি বিশেষ। *

এই দৃশ্য দেখিয়া, এই ভাব মনে অনুভব করিয়া তিনি দুগ্ধ ত্যাগ করিয়াছিলেন! বর্ত্তমানের গাভী-দোহনের ব্যাপার ত সকলেই জানি, সে দৃশ্যও অনেক সময় দেখি, কিন্তু কয় জনে, সে করুণ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দুগ্ধ ত্যাগ করিয়াছি? কেহ কেহ বলেন ঈশ্বরচন্দ্র ভগবৎভক্ত ছিলেন না, আমরা সে কথা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি, বরং আমরা বলি, তাহার ন্যায় ভগবৎ-প্রেমে প্রেমিক কয়জন? নিম্ন-উদ্ধৃত কবিতা আমাদের এ উক্তির পোষকতা করিবে।

"Abou Ben Adhem—may his
tribe increase!
Awoke one night from dream
of peace,
And saw, within the moonlight
in the room,
Making it rich, and like a lily
in bloom.
An angel writing in a book of
gold,
Exceeding peace had made Ben
Adhem bold,
And to the presence in the room
he said,
"What writest thou?" The
vision raised its head.
And, with a look made of all
sweet accord,
Answered, 'The names of those
who love the Lord,'
'And is mine one?' Said Abou.
'Nay, not so'
Replied the angel. Adhem spoke
more low.
But cheerly still, and said, 'I
pray thee,
Write me as one that loves his
fellow-men.'
The angel wrote, and vanished.
The next night
He came again, with a great
wakening light.
And showed their names whom
love of Godhas blessed,

* কবি শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের অপ্রকাশিত কবিতা।

And, lo! Ben Adhem's name
led all the rest.

মানুষকে ভালবাসিলেই ভগবানকে ভাল বাসা হয়। সেই ভালবাসার স্বর্গীয় প্রবাহ বিদ্যাসাগর এ দেশে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

ভগীরথ স্বর্গ হইতে জাহ্নবীকে মর্ত্ত্যে আনিয়া সগরকুল উদ্ধার করিয়াছিলেন, আর বিদ্যাসাগর করুণার জাহ্নবী বহাইয়া আমাদের দেশকে ধন্য করিয়াছেন! সেই জাহ্নবীর নির্ম্মল সুশীতল বারি ব্যবহারে সহস্র সহস্র লোক পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, দেশ ধন্য হইয়াছিল, কিন্তু সে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীও যেন ধরা পৃষ্ঠ হইতে আবার অন্তর্হিত হইতেছেন, ভাগীরথীর সে প্রবাহ, সে গভীরতা, সে তেজ আর নাই; নিদাঘের দারুণ তাপ সে স্নিগ্ধ সলিল শুষিয়া লইতেছে। দেশবাসী তৃষ্ণায় কাতর, কে আর স্বর্গ হইতে করুণার সে মন্দাকিনী মর্ত্ত্যে আনিয়া সুশীতল বারি বিতরণে তৃষিতের তৃষ্ণা নিবারণ করিবে?

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

গায়ত্রী-রহস্য।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে দেখা গিয়াছে যে অসীম বৈচিত্র্যময় হিন্দুধর্ম্মের মূলসূত্র গায়ত্রী। প্রাচীন সুধীগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গায়ত্রীর অর্থ চিন্তা করা কর্ত্তব্য। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য তিনটী শ্লোকের দ্বারা গায়ত্রীর যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ধৃত—যথা

"দেবস্য সবিতুর্ব্বর্চ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুং।
ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্ব্বরেণ্যং চাস্য ধীমহি॥
চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গঃ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ॥
বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষো বিরাট্।
বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ॥

অর্থাৎ "সূর্য্যদেবের অন্তর্যামী সেই তেজস্বরূপ যাঁহাকে ব্রহ্মবাদীরা সর্ব্বব্যাপী, সকলের প্রার্থনীয় পরমাত্মা কহেন সেই প্রার্থনীয়কে আমরা আমাদের অন্তর্যামিরূপে চিন্তা করি; যিনি আমাদের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের প্রতি পুনঃপুনঃ প্রেরণ করিতেছেন, যিনি চিৎস্বরূপে বুদ্ধির প্রেরক হইয়া সম্পূর্ণ জগতে ব্যাপক হন, আর যিনি জন্ম-মরণাদি সংসার হইতে যাঁহারা ভয়যুক্ত তাঁহাদের প্রার্থনীয় হন।" (রামমোহন রায়ের অনুবাদ)

প্রাচীন ভট্ট গুণবিষ্ণু গায়ত্রীর অর্থের উপসংহারে এইরূপ নিষ্পন্নার্থ করিয়াছেন, যথা—

"যস্তথাভূতো ভর্গোঽস্মান্ প্রেরয়তি স জগজ্জ্যোতীরসামৃত ভূরাদিলোকত্রয়াত্মক সকলচরাচরস্বরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সূর্য্যাদি নানা দেবতাময় পরব্রহ্ম স্বরূপো ভূরাদি সপ্তলোকান্ প্রদীপবৎ প্রকাশয়ন্ মদীয় জীবাত্মানং জ্যোতিরূপং সত্যাখ্যং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মস্থানং নীত্বা আত্মন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সহৈকভাবং করোতীতি

চিন্তয়ন্ জপং কুর্য্যাৎ।" অর্থাৎ, "যে এপ্রকার *সর্ব্বব্যাপী ভর্গ আমাদের অন্তর্যামী হইয়া* প্রেরণ করিতেছেন, তেঁহ জল জ্যোতিঃ রস অমৃত এবং ভূরাদি লোকত্রয় এবং সকল চরাচরময় আর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সূর্য্যাদি নানা দেবতাময় হন সেই বিশ্বব্যাপী পর-ব্রহ্ম তেঁহ ভূঃ প্রভৃতি সপ্তলোককে প্রদীপের ন্যায় প্রকাশ করেন তেঁহ আমাদের জীবাত্মাকে জ্যোতির্ম্ময় সত্যাখ্য সর্ব্বোপরি ব্রহ্মলোককে প্রাপ্তি করিয়া পরব্রহ্মস্বরূপ আপনাতে আপন চিদ্রূপের সহিত এক ভাবে প্রাপ্ত করেন এইরূপ চিন্তা করিয়া গায়ত্রী জপ করিবেক।" (রামমোহন রায়ের অনুবাদ)

রাজা রামমোহন রায় মহাশয় ইহার অর্থ করিয়াছেন। যথা—

"তত্রাদৌ "ওঁ" ইতি জগতাং স্থিতি-লয়োৎপত্ত্যেককারণং ব্রহ্ম নির্দ্দিশতি। "যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতিঃ।

তদোঙ্কার প্রতিপাদ্য কারণং কিমেভ্যঃ কার্য্যেভ্যো বিভিন্নং তিষ্ঠতীত্যাশঙ্কায়ামনন্তরং পঠতি। "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" ইতি দ্বিতীয় মন্ত্রঃ। ইদং লোকত্রয়ব্যাপ্যৈব তৎ কারণ-রূপং ব্রহ্ম নিত্যমবতিষ্ঠতে "দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ" ইতি শ্রুতিঃ। কিং তর্হি তস্মাৎ কারণাৎ জগদন্তঃস্থিতানি স্থূলসূক্ষ্মাত্মকানি ভূতানি স্বাতন্ত্র্যেণ নির্বহন্তি নবেতি সংশয়ে পুনঃ পঠতি "তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধীয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ" ইতি তৃতীয় মন্ত্রঃ। দীপ্তিমতঃ সূর্য্যস্য তদনির্ব্বচনীয়মন্তর্য্যামি *জ্যোতিরূপং বিশেষন প্রার্থনীয়ং ন কেবলং* সূর্য্যান্তর্যামী কিন্তু যোহসৌ ভর্গঃ অস্মাকং সর্ব্বেষাং শরীরিণামন্তঃস্থোহন্তর্যামী সন্ বুদ্ধি-বৃত্তীর্বিষয়েষু প্রেরয়তি "য আদিত্যমন্তরো যময়তি এষ ত আত্মা অন্তর্য্যাম্যমৃতঃ" ইতি শ্রুতিঃ। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি" ইতি গীতাস্মৃতিশ্চ।

ত্রয়াণাং মন্ত্রাণামভিধেয়ৈস্যৈকত্বাদেকত্র জপো বিধীয়তে।

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

তেষাময়ং সংক্ষেপার্থঃ।

সর্ব্বেষাং কারণং সর্ব্বত্রব্যাপিনং অস্মর্য্য-দস্মদাদি সর্ব্বশরীরিণামন্তর্য্যামিনং চিন্তয়ামঃ ইতি।

অর্থাৎ তাহাতে আদৌ "ওঁ" এই শব্দ জগতের স্থিতি লয় উৎপত্তির কারণ পর-ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিতেছেন। "যাহা হইতে এই সকল ভূত জন্মিতেছে আর জন্মিয়া যাহার দ্বারা স্থিতি করিতেছে, ম্রিয়মাণ হইয়া যাহাতে পুনর্গমন করে তাহাকে জানিতে ইচ্ছা করে তেঁহ ব্রহ্ম হন" এই শ্রুতি।

সেই ওঁঙ্কারের প্রতিপাদ্য যে কারণ তিনি কি এই সকল কার্য্য হইতে বিভিন্নরূপে স্থিতি করেন এই আশঙ্কায় পুনরায় পাঠ করিতেছেন "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই তিন ব্যাহৃতি যাহা দ্বিতীয় মন্ত্র হয়। অর্থাৎ সেই কারণরূপ পরব্রহ্ম এই ত্রিলোক বিশ্বকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। "জ্যোতিরূপ মূর্ত্তি-রহিত অর্থাৎ স্বপ্রকাশ এবং সম্পূর্ণ ও

অন্তরবাহ্যে ব্যাপিয়া বর্ত্তমান এবং জন্ম-রহিত পরমাত্মা হন” এই শ্রুতি।

জগতের অন্তঃপাতী স্থূলসূক্ষ্মভূত সকল সেই কারণ হইতে স্বতন্ত্ররূপে আপন আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন কি না এই সংশয়ে পুনরায় পাঠ করিতেছেন “তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ” এই তৃতীয় মন্ত্র অর্থাৎ দীপ্তিমন্ত সূর্য্যের সেই অনির্ব্বচনীয় অন্তর্য্যামী জ্যোতিঃস্বরূপ বিশেষমতে প্রার্থনীয় তাঁহাকে আমরা চিন্তা করি, তিনি কেবল সূর্য্যের অন্তর্য্যামী হন এমত নহে, কিন্তু যে সেই স্বপ্রকাশ আমাদের সর্ব্বদেহীর অন্তস্থিত অন্তর্য্যামী বুদ্ধির বৃত্তিকে বিষয়ে প্রেরণ করিতেছেন; যিনি সূর্য্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে নিয়মে রাখিতেছেন সেই অবিনাশী তোমার অন্তর্য্যামী আত্মা হন অর্থাৎ অন্তঃস্থিত হইয়া তোমাকে নিয়মে রাখিতেছেন” এই শ্রুতি। ভগবদ্গীতা। “সকল ভূতের হৃদয়ে হে অর্জ্জুন ঈশ্বর অবস্থিতি করেন।”

এই তিন মন্ত্রের প্রতিপাদ্য এক পরব্রহ্ম হন এ কারণ তিনের একত্র জপের বিধি দিয়াছেন।

সেই তিনের সংক্ষেপার্থ এই—সকলের কারণ সর্ব্বত্রব্যাপী সূর্য্য অবধি করিয়া আমাদের সকল দেহবস্তের অন্তর্য্যামী তাঁহাকে চিন্তা করি ইতি। (রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী ৩১৯ পৃঃ)

পূজ্যপাদ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী গায়ত্রীর আদ্যন্তে উচ্চারিত প্রণবের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

“বেদশাস্ত্রে ওঁকারের রূপ “ওঁ” এই প্রকার দেখাইবার অর্থ কি? নিরাকার ব্রহ্মের রূপ নাই, বেদে নিরাকার ওঁকারের রূপ বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। যখন নিরাকার ব্রহ্ম সাকার জগৎরূপে অর্থাৎ বিরাট নানা নামরূপে বিস্তার হন, তখন শাস্ত্রে তাঁহার নাম ওঁকার বলিয়া ঋষি, মুনিগণ কল্পনা করেন। অ, উ, ম অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই তিন অক্ষর যোগে ওঁকার অক্ষর হইয়াছে অর্থাৎ সমস্ত চরাচর স্ত্রীপুরুষকে লইয়া বিরাট ব্রহ্মের নাম ওঁকার। সেই ওঁকার ব্রহ্মের উপরে যে বিন্দু লিখিত আছে ইহার অর্থ এই যে, জীবসমূহের মস্তকের ভিতরে ও বহিরাকাশে জ্ঞানরূপ জ্যোতি আছেন অর্থাৎ তেজোরূপ সূর্য্যনারায়ণ ঐ বিন্দু। অর্দ্ধ মাত্রা চন্দ্রমা জ্যোতিঃ, যিনি জীবমাত্রের কণ্ঠভাগে বিরাজ করিতেছেন। চন্দ্রবিন্দু অর্থে প্রকৃতি-পুরুষ যুগলরূপ। সমস্ত লইয়া বিরাটরূপ জানিবে। (সার নিত্যক্রিয়া, ৮ম সং ১২৭ পৃঃ)

পূজ্যপাদ সমগ্র ব্রহ্ম গায়ত্রীর যে অর্থ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

ওঁ “ভূর্ভুবস্বঃ” কি না, ভূর্লোক, অন্তরীক্ষলোক, স্বর্লোক। ভূর্লোক পৃথিবীকে বলে, অন্তরীক্ষ লোক মধ্যস্থানকে বলে, স্বর্লোক আকাশ বা স্বর্গকে বলে, কিন্তু ইহার সার অর্থ ভূর্লোক নাভীতে জঠরাগ্নি রূপ জ্যোতিঃ, অন্তরীক্ষলোক হৃদয়ে প্রাণস্বরূপ চন্দ্রমা জ্যোতিঃ; স্বর্লোক মস্তকে জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ। এই তিন লোকের তিন রূপ। ইহার নাম ব্যাহৃতি।

এই তিন লোকের জ্যোতিকে প্রেম ও ভক্তি সহকারে এক অখণ্ডাকার পূর্ণ রূপে ধ্যান করিলে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জীবাত্মার সহিত অভিন্নরূপে ভাসিবেন, আর কোন বিষয়ে ভ্রম থাকিবে না। "তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য",তৎ অর্থে ঈশ্বর 'সবিতুর্বরেণ্যং' কি না জগত প্রসবিতার অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা সূর্য্যনারায়ণের পূজনীয়। 'ভর্গো দেবস্য' অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণের তেজঃ—তিনিই দেবতা। "ধীমহি ধিয়োয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ," ঈশ্বর অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ অন্তর হইতে বুদ্ধি প্রেরণ করেন। প্রত্যেক নরনারী ভক্তি পূর্ব্বক চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির সম্মুখে করপুটে প্রার্থনা করিবেন যে, হে ভর্গদেবস্য, হে দেবজ্যোতিঃ স্বরূপ জগন্মাতা জগৎপিতা জগৎগুরু জগদাত্মা, আমার বুদ্ধিকে অন্তর হইতে প্রেরণ করিয়া সত্য তত্ত্বে সংযুক্ত করুন—যাহাতে ব্যবহারিক ও পরমার্থিক কার্য্য আমি উত্তমরূপে বুঝিয়া নিষ্পন্ন করিতে পারি, যাহাতে জ্ঞান পাইয়া সপরিবারে মুক্তি স্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপে থাকিতে পারি। 'ওঁ আপঃ জ্যোতিঃ রসোঽমৃতং ব্রহ্ম" ওঁকার ব্রহ্ম, আপঃ অর্থে জল, রস ও জ্যোতি অর্থে জোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ অমৃতরূপ অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক মনুষ্যগণের উপাসনা করা উচিত। তাহা হইলে সকল মঙ্গল হইবে। নিরাকার পরমাত্মা অন্তর্য্যামী দৃষ্ট হন না, মনোবাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং তিনি নিরাকার সাকার বিরাট প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃ স্বরূপে বিরাজমান আছেন। এই জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ পরমাত্মাকে প্রাতে, সায়ংকালে, শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক প্রত্যেক নরনারী প্রণাম করিবে ও আপনার পরমাত্মার এবং ওঁকার মন্ত্রের একই রূপ জানিয়া এই চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ তেজোময়কে নেত্র ও মস্তকে ধারণ করিবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এক অক্ষর ওঁকার প্রণবের মূল পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ। অধিক মন্ত্রের আড়ম্বরে সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। ইহাতেই সহজে কার্য্য উদ্ধার হইবে।" (ঐ)

এখন বিচারের বিষয় একটী রহিল। ভট্ট গুণবিষ্ণু যে দেবতাময় বলিয়া গায়ত্রীকে উল্লেখ করিয়াছেন সে দেবতা কি, বা কে? ও ব্রহ্মগায়ত্রীর সপ্ত ব্যাহৃতিকে যে সপ্তলোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন সে সপ্ত লোক কি? সন্ধ্যাহ্নিকে ত্রিসন্ধ্যার যে ধ্যান কথিত হইয়াছে তাহাতে উল্লিখিত দেবতার রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। নিজ দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের এবং ত্রিসন্ধ্যার তদনুযায়ী আকাশস্থ সূর্য্যমণ্ডলে তত্তৎ দেবতার শক্তির বা প্রকৃতির ধ্যানের বিধি দৃষ্ট হয়।

প্রাতে নিজ নাভিদেশে ব্রহ্মার ধ্যান।

"ওঁ রক্তবর্ণং চতুর্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং হংসাসনসমারূঢ়ং ব্রহ্মাণং নাভিদেশে ধ্যায়েৎ॥" এবং রবিমণ্ডলে ব্রহ্মাণী মহাশক্তির ধ্যান।

'ওঁ প্রাতর্গায়ত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা রক্তবর্ণা দ্বিভুজা, অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরা হংসাসনারূঢ়া ব্রাহ্মী ব্রহ্মদৈবত্যা কুমারী ঋগ্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।"

মধ্যাহ্নে হৃদয়ে বিষ্ণুর ধ্যান।

"ওঁ নালোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খ-চক্রগদাপদ্মহস্তং গরুড়াসনারূঢ়ং হৃদি কেশবং ধ্যায়েৎ।"

রবিমণ্ডলে বৈষ্ণবী শক্তির ধ্যান।

"ওঁ মধ্যাহ্নে সাবিত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মহস্তা যুবতী গরুড়ারূঢ়া বৈষ্ণবী বিষ্ণুদৈবত্যা যজুর্ব্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।"

সায়ংকালে ললাটে মহেশ্বরের ধ্যান।

"ওঁ শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরমর্দ্ধ-চন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভস্থং ললাটে শম্ভুং ধ্যায়েৎ।" এবং সূর্য্যমণ্ডলে রুদ্রানীর বা রুদ্রশক্তির ধ্যান।

"ওঁ সায়াহ্নে সরস্বতী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা শুক্লবর্ণা দ্বিভুজা ত্রিশূলডমরুকরা বৃষভাসনা-রূঢ়া রুদ্রানী রুদ্রদৈবত্যা সামবেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।"

এই ধ্যানবিধির আলোচনায় ইহাই প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, ক্ষুদ্র জীবদেহের সহিত বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ও ক্ষুদ্র জীব-চৈতন্যের সহিত অসীম ব্রহ্মচৈতন্যের মিলন সাধনই ইহার উদ্দেশ্য। দেহে সন্তানোৎপাদন, শ্বাসচালন ও সমুদায় বাহ্য ক্রিয়ার শান্তি এই তিন ভাবের বিভেদ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেহগত জীব-চেতনার ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে। এবং ঐ সমস্ত ক্রিয়ার পরম্পরা ক্রমে যাহা মূলশক্তি, যাহার দ্বারা নিখিল ব্যবহার ও পরমার্থ সিদ্ধ হইতেছে, সেই শক্তিকে পূজ্যপাদ পরমহংস মহাশয় আকাশস্থ সৌরজ্যোতিরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

"জীবশরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কল্পনায় ধারণ করিবার যে কথা আছে, ইহার সার মর্ম্ম এক সত্য ওঁকার বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য নারায়ণ জীবসমূহের মস্তকে প্রকাশ বা বিরাজমান, এই জন্য ইহাকে ব্রহ্মা বলে। ইনি ললাটে আছেন এই কারণ ইহাঁর নাম শিব বা জীব, ইনি জীবসমূহের হৃদয়ে আছেন এ কারণ ইহাঁকে বিষ্ণু বলে।" (ঐ ১১১ পৃঃ)

"আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতি-রুত্তমং।
হৃদয়ে সর্ব্বজন্তূনাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি ॥
হৃদ্যাকাশে চ যো জীবঃ সাধকৈরূপবর্ণ্যতে।
স এবাদিত্যরূপেণ বহির্নভসি রাজতে ॥
পাষাণমণিধাতূনাং তেজোরূপেণ সংস্থিতঃ।
বৃক্ষৌষধিতৃণানাঞ্চ রসরূপেণ তিষ্ঠতি।"

যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

"সূর্য্যমণ্ডলের অন্তর্গত যে জ্যোতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ তিনিই প্রাণী সকলের অন্তরে জীবরূপে অবস্থিতি করেন। যিনি সাধকগণ কর্ত্তৃক শাস্ত্রানুসারে অন্তরাকাশে জীব বলিয়া বর্ণিত হয়েন, তিনিই বহিরাকাশে সূর্য্য-নারায়ণ রূপে বিরাজমান; প্রস্তর, মণি ও ধাতুর মধ্যে তিনিই তেজোরূপে এবং বৃক্ষ, ঔষধ ও তৃণের মধ্যে রসরূপে রহিয়াছেন।" (ঐ ১১০)

সপ্ত লোক সম্বন্ধে প্রথমত স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহাই ব্রহ্ম-গায়ত্রীর মহা-ব্যাহৃতি। ইহার অর্থ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ বা তারাগণ, চন্দ্রমা ও সূর্য্য-নারায়ণ। (ঐ ১২৯ পৃঃ)

এই সপ্তকেই দেহস্থ ষটচক্র ও তাহার সমাপ্তি সহস্রার। দেহের সর্ব্ব নিম্নস্থানে

স্থূলতম পৃথিবীতত্ত্ব ও সর্ব্বোর্দ্ধে বিশুদ্ধ চৈতন্য-তত্ত্ব, ইহার মধ্যে সূক্ষ্মতার তারতম্য অনুসারে চক্রনামা অন্যান্য তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। (ঐ ১৩৩ পৃঃ)

মহীং মূলাধারে কমপি মণিপুরে হুতবহং
স্থিতং স্বাধিষ্ঠানে হৃদিমরুতমাকাশমুপরি।
মনোপি ভ্রূমধ্যে সকলমপি ভিত্বা কুলপথং
সহস্রসারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরসি॥

ধ্যানের জন্য যে পরমাত্মার রূপকল্পনা তাহার পূজ্যপাদ কৃত রূপক-ভেদ স্থানাভাবে সংগৃহীত হইল না। পূর্ব্ব সংগৃহীত বাক্যে লেখকের মনের ছায়াপাত যত্নে নিবারিত হইয়াছে। আজ্ঞাচক্র যে মনের স্থান ও সহস্রসারে যে বিশুদ্ধ একীভূত শক্তি ও চৈতন্যের স্থান, ইহা প্রাচ্য বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না, তাহা এ ক্ষেত্রে বিচার্য্য নহে।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

পাষাণী।

কবিবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার রচিত 'পাষাণী' নাটিকার উপাখ্যান-ভাগ মহাকবি বাল্মীকি রচিত অহল্যার উপাখ্যান হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের জাতীয় সাহিত্যে চির গৌরবের সামগ্রী। শুধু গৌরবের নহে, পূজার্হ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রামায়ণ-রচয়িতা মহাকবি বাল্মীকি শুধু কবি নহেন, তিনি মহর্ষি। সাধনা বলে যাঁহারা সত্যকে প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, হিন্দু শাস্ত্রানুসারে তাঁহারাই মহর্ষি পদবাচ্য হন। মহর্ষি বাল্মীকি সাধনা বলে রত্নাকর দস্যু হইতে মহর্ষি বাল্মীকি হইয়াছিলেন, মহাকাব্য রামায়ণ তাঁহারই সাধনালব্ধ সিদ্ধির অমৃত-মধুর ফল।

অহল্যার উপাখ্যানের সহিত রামায়ণের আখ্যায়িকা-ভাগের বিশেষ কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও প্রসঙ্গত এই উপাখ্যানটী কথিত হইয়াছে। সংক্ষেপে উপাখ্যানটী এইরূপ; রাম যখন মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে মিথিলায় যাইতেছিলেন, তখন মিথিলার উপবনে একটী জনশূন্য আশ্রম দেখিতে পাইয়া সেটি কোন্ মুনির পরিত্যক্ত আশ্রম তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশ্বামিত্র রামের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন "বৎস, এই দিব্য আশ্রমটী মহাত্মা গৌতমের পূর্ব্বাশ্রম। মহর্ষি গৌতম নিজ পত্নী অহল্যার সঙ্গে এই স্থানে তপানুষ্ঠান করিতেন। এইরূপ বহু বৎসর গত হইলে একদিন রূপমুগ্ধ সুরপতি ইন্দ্র গৌতমের অনুপস্থিতির সময়ে গৌতমের বেশ ধারণ করিয়া অহল্যার নিকট গমন করিলেন। গৌতম আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়াই এই ঘটনা জানিতে পারিয়া ইন্দ্রকে অভিশপ্ত করিলেন, এবং অহল্যাকেও এই অভিশাপ দিলেন, 'তুমি এই আশ্রমে ভস্মশায়িনী ও সমস্ত প্রাণীর অদৃশ্যা হইয়া বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া বহু বৎসর আপনার কৃত দুষ্কার্য্যের জন্য অনুতপ্তচিত্তে তপস্যা করিবে। পরে

যখন মহারাজ দশরথের পুত্র রাম এই বনে আগমন করিবেন, তখন তুমি তাঁহার দর্শনে পবিত্রা হইয়া পূর্ব্বশরীর প্রাপ্ত হইবে।' এই অভিশাপ প্রদান করিয়া গৌতম তপস্যা করিবার জন্য হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন, তদবধি এই মনোরম আশ্রম জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পরিত্যক্ত অবস্থায় পতিত আছে।" বিশ্বামিত্র রামের নিকট অহল্যার কাহিনী এইরূপ বিবৃত করিয়া তাঁহাকে গৌতমাশ্রমে প্রবেশ করিতে বলিলেন। রাম গৌতমের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন ভাগ্যবতী অহল্যা তপঃপ্রভাবে এরূপ প্রভাসম্পন্না হইয়াছেন যে দেবতারাও তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হ'ন না। তিনি স্বামীর বাক্যানুসারে রামের আগমন কাল পর্য্যন্ত ধূম পরিব্যাপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায়, তুষারাবৃত মেঘাচ্ছন্ন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ও নিবিড় জলদ-জালাবৃত প্রদীপ্ত সূর্য্যকিরণের ন্যায় ত্রি-জগতের দুর্নিরীক্ষ্যা হইয়াছিলেন। এখন রাম সন্দর্শনে বিগতপাপা হইয়া সকলেরই দৃষ্টিপথে আবির্ভূতা হইলেন।

গৌতমও তপোবলে সমস্ত বিষয় জানিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া ধৌত-কলুষা স্বীয় পত্নীকে গ্রহণ করিয়া সস্ত্রীক হইয়া রামলক্ষ্মণের পূজা করিলেন।

উচ্চশ্রেণীর কবি মাত্রেই মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া গ্রন্থ রচনা করেন। রামায়ণে বর্ণিত এই অহল্যার উপাখ্যানের উদ্দেশ্য কি তাহা লইয়া বিচার করিবার পূর্ব্বে আমরা সাহিত্য সম্বন্ধে গুটীকতক কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। সাহিত্যকে আমরা দুই ভাবে দেখিতে পারি, প্রথমত সমস্ত পৃথিবীর সাহিত্যের ভাবে, দ্বিতীয়ত জাতীয় সাহিত্যের ভাবে। পৃথিবীতে নানা দেশে, নানা যুগে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর কল্যাণদায়িনী মহাবাণী সকল প্রচার করেন। মহাপুরুষের মুখনির্গত সেই সকল বাক্যই পৃথিবীতে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, আর সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোকে পথ দেখিয়া মানব আপনার গন্তব্য পথে চলে। জগতে যত প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র আছে মূলত সকলের একই শিক্ষা হইলেও দেশভেদে, যুগভেদে, এবং যে সকল মহাপুরুষ ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন তাঁহাদেরও প্রকৃতিভেদে নানা ধর্ম্মকে সময় সময় পরস্পরের বিরোধী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ঈশ্বর আর এক প্রকারে অবিরোধী ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন, সে শিক্ষা প্রকৃতির শিক্ষা। 'প্রকৃতি' নামক তাঁহার স্বরচিত বিশাল গ্রন্থের প্রতি পত্রে বাহ্যপ্রকৃতি, জীবপ্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির বিচিত্রভাবে নানা বাধা প্রতিরোধ ও উত্থান-পতনের ভিতর দিয়া ক্রমবিকাশের ইতিহাসে তিনি প্রকৃত সত্য ও কল্যাণের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্রতার মধ্য দিয়া যে মহান্ সত্য আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিতেছেন, সে সত্য সকল দেশে, সকল কালে, সকলের পক্ষেই সমান সত্য। সে সত্য সমগ্র মানবজাতির সনাতন সত্য। কিন্তু অধিকারভেদে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করা সকলের পক্ষে সমান সহজ নহে। অক্ষরজ্ঞানহীন মূর্খ যেমন সজ্জিত অক্ষর-মালা কেবল 'হিজি-

বিজি' বলিয়া মনে করে, সেইরূপ আমাদের ধারণা-শক্তির অল্পতাবশত প্রকৃতির এই বিচিত্র ভাবগুলি অনেক সময় আমাদের নিকট নিতান্ত দুর্ব্বোধ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একদিকে যেমন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বপ্রকৃতিকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে যে গূঢ় ও বিশ্বজনীন সত্য আছে, তাহাই আবিষ্কার করিয়া তাহার উপরে বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন, আবার অপর দিকে সেইরূপ তত্ত্বদর্শী মনীষীগণ তাঁহাদের সূক্ষ্মদৃষ্টি দ্বারা প্রকৃতি-গ্রন্থে ভগবানের অভিপ্রায় পাঠ করিয়া তাহাকে সাধারণ মানবের সহজবোধ্য করিবার জন্য নানা বর্ণে রঞ্জিত তুলিকার দ্বারা চিত্রাঙ্কনী প্রতিভায় আমাদের মনের সম্মুখে সেগুলি পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছেন। কবি প্রকৃতি-কাব্যের যে বিচিত্র ঝঙ্কার অন্তরের ভিতর শুনিতে পাইতেছেন, তাহারই সহিত আপনার হৃদয়-বীণা মিলাইয়া জগৎবাসীর শ্রবণে অপূর্ব্ব সঙ্গীত-লহরী ঢালিয়া দিতেছেন। ইহাই বিশ্বসাহিত্য। বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্রতার ভিতর দিয়া যে সত্য আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, সেই সত্যই বিশ্বসাহিত্যের প্রাণ। যে সাহিত্যের প্রাণ আছে, সেই সাহিত্যই চিরদিন অমর হইয়া রহিয়াছে, প্রাণহীন সাহিত্য বুদ্বুদের মত আজ জন্ম গ্রহণ করিয়া কাল কালসমুদ্রের ভিতর কোথায় মিলাইয়া যায়, তাহার কোন চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

জাতীয়সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের ক্রোড়েই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, বিশ্বকাব্যের বীণার সহিতই তাহার জীবন-বীণার তার বাঁধা। তবে, তাহার সুরে আরও একটু বিশেষত্ব আছে, সেটী জাতীয় বিশেষত্ব। সেই বিশেষত্বের ভিত্তির উপরেই জাতীয়ত্বের প্রতিষ্ঠা, সেই বিশেষত্বের গণ্ডি দিয়াই সকল জাতি তাহাদের জাতীয় সাহিত্যকে তাহাদের নিজস্ব করিয়া লয়। সেই জন্যই জাতীয় সাহিত্য আমাদের অধিক প্রিয়তর। জাতীয়-সাহিত্য জাতীয়জীবনের ইতিহাস, আশ্রয় ও জনক। তখন যে জাতি প্রধানত যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে তাহাদের সাহিত্যেও সেই ভাবের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। সেই সমস্ত গত কালের জাতীয় জীবনের ইতিহাস সাহিত্যের পৃষ্ঠায় পাঠ করিয়া আমরা যুগবিভাগ নির্ণয় করি। ভারতবর্ষের সাহিত্যে বৈদিক যুগ হইতে একাল পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে বহুতর যুগপরিবর্ত্তনের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সাহিত্য শ্রেণীবদ্ধ এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে আদিকাল হইতে জাতীয় জীবনের ইতিহাস রক্ষা করিয়া আসিতেছে, সেই ইতিহাস জাতির পূর্ব্বপিতৃগণের সহিত পরবর্ত্তীগণের চরিত্রগত যে নিগূঢ় সম্বন্ধ তাহাই সচেতন করিয়া রাখিয়াছে। জাতীয়-সাহিত্য কেবল জাতীয় জীবনের ইতিহাস মাত্র নহে, সে জাতীয়-জীবনের আশ্রয় ও জনক। যখনই কোন জাতি, যে কোন ভাবে, ধর্ম্মে অথবা কর্ম্মে, উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, সাহিত্যই তখন তাহাদিগের মন্ত্রদাতা গুরু ও আশ্রয় হইয়াছে, এবং যখন কোন জাতি জড়তার নিদ্রালস্য পরিত্যাগ করিয়া নবজীবনের পথে অগ্রসর

হইয়াছে তখন সাহিত্যকেই সেই নব-জীবনের জনক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

মহাকাব্য রামায়ণ অমর বিশ্বসাহিত্য এবং আমাদের জাতীয় সাহিত্য। "জগতে কাহাকেও ঘৃণা করিবে না" এইটী বিশ্ব-সাহিত্যে প্রচারিত একটী মহাবাণী। যে যতই কেন দুষ্ক্রিয়ারত মহাপাপী হোক্ না, তথাপি সে ঘৃণার পাত্র নহে। ঈশ্বর তাঁহার নিজের সৃষ্ট বিশ্বপ্রকৃতিতে এই নীতি প্রচার করিয়াছেন। তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না। যতদূর নীচত্ব আমরা কল্পনা করিতে পারি তাহার অপেক্ষাও অধিক নীচ ক্রিয়াসক্তকে ভগবান তাঁহার রাজ্যে স্থান দান করিয়াছেন, ঘৃণা করিয়া বর্জ্জন করেন নাই। বিশ্বসাহিত্য বিশ্ব-প্রকৃতির নিকট ভগবানের প্রদত্ত এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। বিশ্বসাহিত্যের এই মহান্ নীতি আর্য্যসাহিত্যের কাব্য, নাটক, ইতিহাস ও আখ্যায়িকা সকল গ্রন্থেই সার্থকতা লাভ করিয়াছে। জীবমাত্রেই নিষ্কলুষ সচ্চিদানন্দ নারায়ণের অংশ, যে জাতির ইহাই মজ্জাগত ধারণা, তাহাদের জাতীয়-সাহিত্য যে এই ভাবে গঠিত হইবে ইহাই স্বাভাবিক। ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস ও একান্ত নির্ভরই ভারতবর্ষের জাতীয়ত্ব, ভারতবাসীর শিক্ষাদীক্ষায়, কার্য্যে ও মনে সকল বিষয়েই এই নির্ভরের ভাব প্রকাশ পায়। এই জন্য রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি আমাদের জাতীয়-সাহিত্যও এইভাবে অনুপ্রাণিত। আমাদের জাতীয়-সাহিত্য বলেন, ভগবান পতিতপাবন, তিনি কখনও পতিতকে উপেক্ষা করেন না। তিনি করুণার মহাসমুদ্র, প্রেমময় ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী। তিনি জগৎপিতা, জগতে কেহই তাঁহার ঘৃণার পাত্র নহে। তাঁহার রাজ্যে কোন জীবেরই অন্য জীবকে ঘৃণা করিবার অধিকার নাই। তুমি অপরাধীকে শাস্তি দিতে পার, লাঞ্ছিত করিতে পার, নির্ব্বাসিত করিতে পার, ইহলোক হইতে বিদায় দিতে পার, কিন্তু ঘৃণা করিতে পার না।

তুমি পাপীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে পার না, কিন্তু দুষ্ক্রিয়া ও পাপ যেন তোমার একান্ত ঘৃণার বস্তু হয়, ইহাই বিশ্বসাহিত্যের দ্বিতীয় শিক্ষা। বিন্দুমাত্র অন্যায়াচরণও যেন তোমার মনের দুর্ব্বলতা অথবা অনব-ধানতায় ক্ষমা প্রাপ্ত না হয়। অতি যৎসামান্য অগ্নিও যেমন কাষ্ঠস্তূপের ভিতরে গোপন ভাবে থাকিলে ক্রমশ তাহা বৃদ্ধি পাইয়া দেশ ধ্বংস করিতে পারে, তেমনি মনের গূঢ়তম সামান্য পাপও প্রশ্রয় পাইলে, শুধু কেবল পাপাচারীর নিজের নহে, তাহার আত্মীয়-স্বজনের এমন কি দেশের পর্য্যন্ত ধ্বংসের কারণ হয়। এই জন্যই পাপীর উপযুক্ত শাস্তি প্রয়োজন, সে শাস্তির কঠোরতা তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য নহে, পাপ ধ্বংস করিয়া তাহার হাত হইতে পাপ-গ্রস্তকে বাঁচাইবার জন্য। বিশ্বসাহিত্যের এই শিক্ষাও আমাদের জাতীয়-সাহিত্যে পূর্ণরূপে বর্ত্তমান, তথায় দুরাচারী ও দুরাচার-সহিষ্ণু সম-অপরাধী বলিয়া গণ্য হইয়াছে। আর্য্যজাতি ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করিয়াছেন,—

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব দণ্ড বজ্রসম তারে যেন দহে।"

হিন্দুশাস্ত্রের কর্ম্মফলবাদে এই নীতিরই সার সংগৃহীত হইয়াছে।

বিশ্বসাহিত্যের আর একটী মহাবাণী এই যে পবিত্রতা ও আত্মত্যাগই প্রকৃত প্রেমের বীজস্বরূপ। এই দুটীর অভাব হইলে কখনও প্রকৃত প্রেমের বিকাশ হইতে পারে না।

অহল্যার উপাখ্যানে বিশ্বসাহিত্যের এই তিনটী সর্ব্বপ্রধান নীতিই উপলব্ধি হয়। অহল্যার চিত্তে কিছু মলিনতা ছিল বলিয়া তিনি ঋষিপত্নী হইয়াও অধঃপতনের সোপানে পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ গৌতম পত্নীর এইরূপ গর্হিত আচরণ দেখিয়াও তাঁহাকে ঘৃণা করেন নাই। ঘৃণা করিলে তিনি অপথগামিনী পত্নীকে তখনই ত্যাগ করিয়া যাইতেন, কিন্তু গৌতম তাহা না করিয়া পত্নীর চিত্তের মলিনতা দূর করিবার উপায় চিন্তা করিয়াছিলেন। তিনি অহল্যাকে যে অভিশাপ দিয়াছিলেন তাহাতে স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা অথবা নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায় নাই, বরং স্নেহই প্রকাশ পাইয়াছে। সে স্নেহ পুরুষোচিত সবল স্নেহ, আসক্তি-দুর্ব্বল স্নেহ নহে। প্রিয়তমা পত্নীকে অনির্দ্দিষ্ট দীর্ঘকালের জন্য বন মধ্যে একাকিনী দুশ্চর কঠোর তপস্যায় নিয়োজিত রাখিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে মনে যে আঘাত লাগিয়াছিল, সে আঘাত সহ্য করিবার মত চিত্তের সবলতা তাঁহার ছিল। কেননা, তিনি আত্মত্যাগী, তাঁহার চিত্ত তপস্যাপূত, তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে প্রেমের কণকপ্রদীপ জ্বলিয়াছে, শোক ও সংশয়ের অন্ধকার তাই সেখানে ছায়া ফেলিতে পারে নাই।

গৌতম জানিতেন, হৃদয়ের মালিন্য দূর করিতে হইলে তপস্যা প্রয়োজন, গৌতম জানিতেন অপরাধের দণ্ড ভগবানের স্নেহের বিধান। ভগবান তাঁহার নিজের বিধি নিজেই ভঙ্গ করিতে পারেন না, এই জন্য অহল্যা কঠোর তপস্যায় বিশুদ্ধা হইলে শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পাইয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে নহে।

ঈশ্বরে একান্ত মনে আত্মসমর্পণ, সকল বিষয়ে তাহাতে নির্ভর, আমাদের জাতীয়-সাহিত্যের এই যে বিশেষত্ব, তাহাও এই উপাখ্যানে পরিস্ফুট হইয়াছে। গৌতম অসহায়া স্ত্রীকে বনমধ্যে একাকিনী রাখিয়া যাইতে ইতস্ততঃ করেন নাই; বনে, গৃহে, অথবা যেখানেই হউক ভগবানই একমাত্র রক্ষক এ বিষয়ে তাঁহার সংশয় ছিল না। অহল্যা তপস্যায় চিত্তশুদ্ধির ফলে ভগবানের দর্শন পাইলেন, নররূপী নারায়ণের চরণরেণু-স্পর্শে তাঁহার পাষাণ-স্তূপের মত পাতকরাশি অন্তর্হিত হইয়া গেল, তিনি নিষ্কাম প্রেমের রাজ্যে নবজন্ম গ্রহণ করিয়া প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া রহিলেন।

রামায়ণের এই অহল্যার উপাখ্যান অপথগামীকে কি আশ্বাসই প্রদান করিতেছে! ভগবানের অপার করুণার প্রতি মানবমনে কি নির্ভরের ভাবই জাগাইয়া তুলিতেছে। এখনও প্রতিদিন প্রাতঃকালে অহল্যার প্রাতঃস্মরণীয় নাম স্মরণ করিতে গিয়া পাপপঙ্কে নিমজ্জিতপ্রায় কত মানবের মনে আবার নব বল জাগিয়া উঠে, কত লুব্ধ পাপাচারীরও আপাতমধুর পাপে ঘৃণা জন্মিয়া পবিত্রতার সৌরভে চিত্ত আকৃষ্ট হয়।

রামায়ণের এই উপাখ্যানটী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার নাটিকায় প্রথমে যখন ঋষিপত্নী অহল্যার সাক্ষাৎ পাই, তখন তিনি ফুল তুলিতে তুলিতে গাহিতেছেন,—

"আজি কি ব্যথা উঠিছে জাগি'য়ে
মম হৃদয় কিসের লাগি' রে
যেন উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।"

তাহার পর অহল্যা তাঁহার সখী মাধুরীর নিকট আপনার "নিরুদ্ধ প্রাণের ব্যথা" বলিতেছেন,—

"মনে আছে, বিবাহ আমার হইয়াছে কতদিন?

* * * *

তখন ছিলাম দশবর্ষীয়া বালিকা,
আজ আমি পঞ্চদশবর্ষীয়া যুবতী।"

পঞ্চদশবর্ষীয়া অহল্যা ইতিমধ্যেই "শতানন্দ" নামে একটী পুত্রের জননী হইয়াছেন। পুত্রটীর বয়সও ৪।৫ বৎসরের কম নহে, কেননা ঋষিপুত্র মিথ্যা কথা ও দুষ্টামি বিদ্যাতে বেশ পরিপক্ক হইয়াছে।

শতানন্দ। দাদা আমাকে মেরেছে!
অহল্যা। তুই বুঝি দুষ্টামি করেছিলি?
শতানন্দ। না। আমি বল্লাম দাদা সন্দেশ খাবি? অমনি দাদা আমাকে ঠাস্ করে চড় মারলে।

অহল্যা সঙ্গিনীর নিকট নিরুদ্ধ প্রাণের ব্যথা বলিতেছেন। সে প্রাণের ব্যথা কি? প্রথমটা তাহা ভাল করিয়া বুঝা যায় না। কেবল অহল্যার উক্তি হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, তিনি জানেন যে তিনি অপূর্ব্ব রূপবতী, আরও বুঝিয়াছেন যে তাঁহার জীবন বিফল হইয়া গেল।

'দেখ্ চেয়ে—
শুদ্ধ চেয়ে দেখ্ সখি, এরূপ মাধুরি,
শুদ্ধ চেয়ে দেখ্ গলে এই পুষ্পমালা।
হয়নি কি অধোমুখী এ বক্ষপরশে
লজ্জায়? নিশ্চয়, শুদ্ধ মন্দারব্রততী
যোগ্য হইবার ভুষা এ মৃণাল ভুজে!
দেখ্, বেড়িয়াছে মোরে এ কৌষেয় বেশ
কত না আগ্রহে!

ব্যর্থ নহে—
এ রূপ, এ যৌবন এ জীবন? জগৎ
বিস্বাদ নহে?—"

ষষ্ঠ দৃশ্যে, তপস্যার্থে বিদায়প্রার্থী গৌতমের বিদায়-প্রার্থনায় অহল্যা বলিতেছেন:—

"যদি না থাকিবে
বিবাহ করিলে কেন? বাঁধিলে আমার
কৈশোর, তোমার শীর্ণ বার্দ্ধক্যের সনে?
দেখ চাহি এই মুখপানে—এই নব
উদ্ভিন্ন যৌবন, এই উচ্ছ্বসিত রূপ,
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, এই উদ্বেল হৃদয়—
দেখিছ? বাঁধিলে কেন নবসুকোমল
কুসুমিত পল্লবিত শ্যামল বল্লরী
নীরস বিশুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডে?"

ঋষিপত্নী অহল্যার ইহাই মনোবেদনা। এত রূপ-যৌবন, বৃদ্ধ গৌতমের পত্নীত্বে কি না সকলই ব্যর্থ হইয়া গেল? স্বামীকে অহল্যা স্পষ্টাক্ষরেই বলিলেন,—

"তুমি যাও, তুমি থাক—একই কথা প্রভু—
অহল্যার। তোমার হৃদয়ে নাই স্নেহ;
তোমার অধরে নাই সুধা!"

আবার স্বামী চলিয়া গেলে বলিতেছেন—

"এত রূপ! এ পূর্ণ যৌবন! সব বৃথা?
ধরিয়া রাখিতে তবু পারিলি না হায়
এ স্ত্রৈণ মূঢ় স্থবির গৌতমে?"

এই স্থানেই অহল্যার সম্পূর্ণ পরিচয় নহে। ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন আরও বিচিত্র। দ্বিজেন্দ্র বাবুর লিখিত সমালোচনায় দেখিতে পাই কুরুচিপূর্ণ কাব্য তিনি বড়ই ঘৃণা করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁহার অঙ্কিত রুচির চিত্র তুলিয়া দিতে আমাদের সঙ্কোচ বোধ হইতেছে।

পথিকের বেশে ইন্দ্র পথে চলিয়াছেন, প্রোষিতভর্ত্তৃকা অহল্যা সাগ্রহে তাঁহাকে ডাকিলেন।

ইন্দ্র। ডাকিলে মোরে কে তুমি তাপসী?

* * * *

কত দূর মিথিলানগরী, দয়া করে' দেবি
পথ বোলে দাও যদি।

অহল্যা। পান্থ, বহুদূর,
সে স্থান দুর্গম। সন্ধ্যা আগত। তাপস
মদীয় আশ্রমে যাপ নিশীথ।

* * * *

ইন্দ্র। না, না, যাইব না।

অহল্যা। হাঁ যাইবে তুমি। মুখে স্পষ্ট ব্যক্ত তাহা,
কপট! আশ্রমে চল। (অস্ফুট স্বরে) সত্য বলিতেছি,
আমি তব দাসী, তুমি মোর প্রাণেশ্বর।

দ্বিজেন্দ্র বাবু অহল্যার চিত্রে আরও যাহা অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বিস্তারিত লিখিবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে,—প্রবাসগত গৌতমের আশ্রমে ইন্দ্র প্রতিরাত্রে ময়ূরপঙ্খী নৌকা চড়িয়া আসিতে লাগিলেন, অহল্যা আশ্রমেই কিছু দিন এইরূপ ভাবে থাকিয়া অবশেষে গৌতমের আগমন ভয়ে ইন্দ্রের সহিত পলায়ন করিলেন। *পলায়ন কালে পুত্র শতানন্দ জাগ্রত* হইয়া পড়িলে তাহার গলা টিপিয়া হত্যা করিয়া পলায়ন করিলেন। তাহার পর দশ বৎসর ইন্দ্রের সহিত বিহার সুরাপান ইত্যাদিতে কাটাইয়া দিলেন। অবশেষে ইন্দ্র যখন স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন,—

"এতদিন ভুঞ্জেছি তোমারে—
মিটেছে লালসা মম! আর নাহি চাহি।"

তাহার পরেও অহল্যা ইন্দ্রের পদতলে পড়িয়া—

"কোথা যাও?
যাইও না প্রিয়! এখনো যুবতী আমি,
দশবর্ষ ধরি পান করিয়াছ বটে
এ রূপের তীব্রসুরা; পাত্রে চেয়ে দেখ
আরো আছে, আরো দিতে পারি।"

বলিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ইন্দ্র কিছুতেই থাকিলেন না, অহল্যার সকল মিনতি অগ্রাহ্য করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

অহল্যা। নির্ম্মম লম্পট! যাবে?
যাবে? এই যাও।

(কটিদেশ হইতে ছুরিকা লইয়া ইন্দ্রের বক্ষে আমূল রোপণ)

ইহার পর অহল্যার স্বকৃত দুষ্কার্য্যের জন্য অনুতাপ আরম্ভ হইয়াছে। সে অনুতাপ এই রূপ,—

"আমি কলঙ্কিনী সত্য। কিন্তু কার দোষে?
কে রোপিয়াছিল এই স্বর্ণলতিকায়

নীরস পাষাণস্তূপে ? কে বা প্রলোভনে
ভুলাইল অসহায়া দুর্ব্বলা রমণী,
কে তাহারে নিক্ষেপিল করিয়া সম্ভোগ
শূন্য পাত্র সম, পান করি তীব্র সুরা ?
নহে সে নির্ম্মম ক্রুর পুরুষ ? তথাপি—
শুদ্ধ আমি, দোষী একা সমাজ-বিচারে ?”

দ্বিজেন্দ্র বাবুর এই চিত্র ক্ষণিকের মতিভ্রংশে পদস্খলিতা ভারতবর্ষের পুণ্যাশ্রমনিবাসিনী ঋষিপত্নীর চিত্র নহে। ইহা নরকের চিত্র, ইহা নরকনিবাসিনী পিশাচিনীর চিত্র। উচ্চশ্রেণীর কবিদিগের কাব্য মাত্রেই একটী মহৎ উদ্দেশ্য থাকে ইহা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে উদ্দেশ্যে পাষাণী-নাটিকার অবতারণা করিয়াছেন, প্রথম দৃশ্যে বিশ্বামিত্র ও জনকের কথোপকথনে তাহার আভাস পাওয়া যায়। গৌতমের চরিত্র ক্ষমাগুণের আদর্শ করিয়া সৃষ্টি করাই তাঁহার এই কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহার গৌতম অতি শান্তস্বভাব, অতিশয় বিনয়ী এবং ক্ষমাশীল। গৌতম যখন সহধর্ম্মিণীর মুখে শুনিতেছেন,—

“তপস্যার—
শুষ্ক কর্ত্তব্যের জন্য তোমার জীবন,
আমার জীবন চাহে সম্ভোগ।
ভিন্ন গতি দু'জনার ভিন্ন দিকে।”

তখনও গৌতম শান্তভাবে মনে মনে সহধর্ম্মিণীর উদ্দেশে বলিতেছেন “সত্য কথা, ঘুচিল না এ বিচ্ছেদ প্রিয়ে!” গৌতম-পত্নী স্বামীকে মুখের উপরেই “বৃদ্ধ, নীরস বৃক্ষকাণ্ড” ইত্যাদি সুমধুর সম্বোধন করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না, সঙ্কোচ করিবার কোন কারণও নাই, কেননা মহাত্মা গৌতম ক্ষমাশীল। যখন রামচন্দ্রের উপদেশে অহল্যার চৈতন্য হইল, তিনি স্বামীর কাছে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তখন পুত্র শতানন্দ পিতাকে কুলটা জননীর প্রতি শাস্তি বিধান করিতে অনুরোধ করিলে গৌতম বলিলেন—

“শাস্তি দিব ? হায়!
আকণ্ঠ নিমগ্ন পাপে আমি মূঢ়মতি,
দুর্ব্বল মনুষ্য নিজে। সাধ্য কি আমার,
কর্ত্তব্যস্খলিত, মূঢ় মনুষ্য উপরি
বসিব বিচারাসনে ?”

কিন্তু বাল্মিকীর গৌতমের এতটা ক্ষমাগুণ ছিল না। তিনি এত কথা না বুঝিয়া, তখনই অহল্যাকে

“এস প্রপীড়িতা পরিত্যক্তা প্রাণেশ্বরি!
এস বাণবিদ্ধ মম পিঞ্জরের পাখী
হৃদয় পিঞ্জরে ফিরে এস!”

বলিয়া বক্ষে ধারণ না করিয়া বরং অভিশাপ দিলেন যে, “তুমি বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া, ভস্মশায়িনী ও অন্যের দুর্নিরীক্ষ্যা হইয়া অনুতাপদগ্ধ চিত্তে তপস্যা কর। তপস্যাফলে দশরথতনয়ের দর্শন পাইয়া সম্পূর্ণ পবিত্র হইলে আমি তোমাকে গ্রহণ করিব।”

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার কালিদাস ও ভবভূতি নামক প্রবন্ধে কালিদাস ও ভবভূতির কাব্য লইয়া বিচার করিতেছেন। সংস্কৃত-সাহিত্যে নাটকের নায়কের সর্ব্বগুণসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন, দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতে এইজন্য ভবভূতি পত্নীত্যাগী রামচন্দ্রকে নিজের নাটকের

নায়ক করিবার জন্য অনেক ঘসিয়া মাজিয়া দোষবর্জ্জিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবুও বোধ হয় সেই কারণেই ক্ষমাহীন ব্রাহ্মণ গৌতমকে কল্পনার তুলিকায় মার্জ্জিত করিয়া ক্ষমাগুণ-সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। সে চরিত্র-চিত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ন্যায় অসামান্য প্রতিভাবান লেখকের হাতে পড়িয়াও নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়াছে। যদিও গৌতমের চরিত্রে একটা শান্ত ভাব আছে, কিন্তু সে শান্তভাব চরিত্রের অটলতায় দৃঢ় ও চরিত্র-গৌরবে উজ্জ্বল নহে, সে শান্ত ভাব যেন জড়তার সহিত জড়িত। অহল্যা-চরিত্রে স্বামীর প্রভাব বিন্দুমাত্রও লক্ষিত হয় না, অহল্যার এতদূর অধঃপতন অনেকটা গৌতমেরই দোষে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যে তাপসপত্নী তপস্বী গৌতমের সম্মুখে "তোমার অধরে নাই সুধা" অতএব, "তোমাতে আমাতে মিলন অসম্ভব," নির্ব্বিবাদে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া 'প্রিয়ে, প্রেয়সি প্রভৃতি প্রণয়মধুর সম্ভাষণ শুনিতে পায় তাহার পক্ষে স্বেচ্ছাচারিণী হওয়া খুব বেশী আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। মহর্ষি গৌতম যখন পুত্র শতানন্দকে জনকের নিকট রাখিয়া তপস্যা করিতে যাইতেছেন, তখন শতবার জনককে বলিতে-ছেন "আমার শতানন্দকে দেখিও।" শতবার ফিরিয়া আসিয়া শতানন্দের মুখে চুম্বন করিতেছেন, শতবার বলিতেছেন, "চলিলাম!" কিন্তু চলিতে আর পারিতেছেন না। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া শিষ্য চিরজীব আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল—

"চলিলাম, চলিলাম' একশত বার
করার সদর্থ বুঝি, প্রভু যাইবার
ইচ্ছা নাই? কে মাথার দিব্য দিয়া তবে
কহিয়াছে 'যাও, যাও,' থাকো না এখানে?"

তবুও গৌতমের "যাই, যাই" আর শেষ হইল না। অবশেষে তিনি শতানন্দকে বলিলেন,—

"বৎস, প্রাণাধিক,
একটী চুম্বন তুই দিবি না পিতারে?"

শতানন্দ চুম্বন দিলে বলিলেন,

"একবার 'বাবা' বোলে ডাক্
শুনে যাই।"

শতানন্দ যখন "বাবা" বলিয়া ডাকিল তখন গৌতম

"না যাইতে পারিব না আমি,
রহিব সংসারী।"

বলিয়া একেবারে হাল ছাড়িয়া দিলেন।

এই স্থানে গৌতমের চরিত্র একেবারে ম্লান হইয়া গিয়াছে! কোলের শিশুর জন্য পুত্রবৎসলা জননীর এরূপ "আকুলী, বিকুলী" শোভা পাইত, কিন্তু মহর্ষি গৌতম— তাঁহার পক্ষে এরূপ আচরণ নিতান্ত বিসদৃশ। তাঁহার আশক্তি চাঞ্চল্যহীন স্নেহ নির্ব্বাত অগ্নিশিখার ন্যায় থাকিবে। আর তাহাই দেখিতে সুন্দর।

উদারস্বভাব মহাত্মারা যে পাপীকে ঘৃণা করেন না, বরং তাহাদের প্রতি করুণা পরবশ হন, প্রেম দিয়া তাহাদের পাপের দাহ দূর করিবার চেষ্টা করেন, পতিতা পত্নীর প্রতি গৌতমের প্রেম ও করুণার

দৃশ্যে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন। পাপী ঘৃণার পাত্র নহে যথার্থ, কিন্তু পাপও কি ঘৃণার যোগ্য নহে? যখন শরীরের রক্ত বিষাক্ত হইয়া স্ফোটকের আকার ধারণ করে, তখন শত শীতল প্রলেপেও তাহার দাহ নিবারিত হয় না, তাহার জন্য অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

> "শাস্তি দিব? হায়!
> আকণ্ঠ নিমগ্ন পাপে আমি মূঢ়মতি,
> দুর্ব্বল মনুষ্য নিজে, সাধ্য কি আমার
> কর্ত্তব্যস্খলিত, মূঢ়, মনুষ্য উপরি
> বসিব বিচারাসনে?"

গৌতমের এই উক্তিতে কি ইহাই বুঝায় না, যে, যখন সকলেই অপরাধী তখন পরস্পর পরস্পরকে ক্ষমা করিয়া সংসার পাতাইয়া ঘরকন্না করিতে থাকাই ভাল। আমি নিজেই যখন দোষী তখন অন্যের দোষের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে চাহিব কোন্ সাহসে? দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রচারিত এই সত্য বিশ্বসাহিত্যের অথবা আমাদের জাতীয়-সাহিত্যের অনুমোদিত নহে। আর্য্য-সাহিত্য পাপীকে করুণার ক্রোড়ে আশ্রয় দিতে বিমুখ নহে, কিন্তু পাপকে বিন্দুমাত্র উপেক্ষা করিতে পারে না, সে পাপ নিজেরই হউক অথবা অন্যেরই হউক। আমি যদি পাপী হই, আমার মনের কলুষ আমি উপেক্ষা করিতে পারিব না, এবং আমি নিজে কলুষিত বলিয়া অন্যের চিত্তের কলুষ-রাশিও উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে পারি না। পাপী বলিয়া কেহ পরিত্যাগের যোগ্য নহে বটে, কিন্তু যত দিন সে পাপমুক্ত না হয় তত দিন তাহাকে পরিত্যক্ত থাকিতেই হইবে। এই জন্য যতদিন অহল্যা বিগত-পাপা না হইয়াছিলেন ততদিন মুনি-পত্নী-সমাজে তাঁহার স্থান ছিল না।

অহল্যার নাম দিয়া দ্বিজেন্দ্র বাবু এমন একটী রমণী-চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন যে, যাহার অপেক্ষা দুশ্চারিণী রমণী কল্পনা করাও কঠিন। যে রমণী মুনিপত্নী হইয়া নিজেই পথ হইতে সুন্দর যুবক পথিককে নিশীথে কু-অভিপ্রায়ে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যায়, যে প্রণয়াস্পদের সহিত গৃহত্যাগ করিবার জন্য স্বীয় গর্ভজাত সন্তানকে শ্বাস-রোধ করিয়া হত্যা করে, দ্বিজেন্দ্র বাবু তাঁহার সেই মানস-কন্যাটীর প্রতি বারবার "প্রলুব্ধা, প্রতারিতা" বলিয়া মমতা প্রকাশ করিলেও তাহার দোষের গুরুত্ব কিছু কমিবে না। দ্বিজেন্দ্র বাবুর কি ইহাই মত যে রমণীরা যতদূর ইচ্ছা অধঃপতনের পথে চলিলেও তাহারা কেবল "প্রলুব্ধা, প্রতারিতা," তাহারা প্রণয়াস্পদের সঙ্গে গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়া আবার যখনই ফিরিয়া আসুক, স্বামীগণের, "প্রতারিতা, প্রলুব্ধা, পতিতা, প্রেয়সী আমার!" বলিয়া বক্ষে ধারণ করিয়া ক্ষমাধর্ম্মের মাহাত্ম্য দেখানো উচিত? দ্বিজেন্দ্র বাবু যদি এই মত প্রচারের উদ্দেশ্যেই পাষাণী নাটিকা রচনা করিয়া থাকেন, তবে নায়ক ও নায়িকার অহল্যা ও গৌতম নাম না দিয়া অন্য কোন নাম দিলে আমাদের বিশেষ কিছুই আপত্তি থাকিত না।

কাব্যে ও সাহিত্যে পাপ ও পুণ্য উভয়েরই চিত্র আঁকিতে হয়। প্রধানতঃ

পুণ্যের নিকট পাপকে হীন করাই এই চিত্রাঙ্কণের উদ্দেশ্য থাকে। রেনাল্ড ও জোলা প্রভৃতিও তাঁহাদের প্রণীত অনেক পুস্তকে পরিণামে পুণ্যের জয় দেখাইয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের অঙ্কিত পাপচিত্রগুলি এমন বিচিত্র বর্ণে ও নৈপুণ্যসহকারে অঙ্কিত যে তাহাতেই লোকের মন মুগ্ধ হওয়া যায়। এইরূপ সজীব পাপচিত্রে পরিপূর্ণ বলিয়াই এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলি অপাঠ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। পাপচিত্র উপভোগ করিবার যোগ্য নহে, পুণ্যচিত্রই সাহিত্যের অলঙ্কার। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার সুনিপুণ চিত্রাঙ্কণী প্রতিভায় ইন্দ্র ও অহল্যার প্রণয়কাহিনী উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন, গৌতম তাহার নিকট নিষ্প্রভ, আর পাষাণীর উদ্ধারকর্ত্তা রামচন্দ্রের কথা তো দুইচারিটী সামান্য কথাতেই শেষ হইয়াছে।

আমরা পাষাণী সমালোচনা উপলক্ষ্যে অনেক অপ্রিয় কথা লিখিয়াছি। কিন্তু যাহা লিখিয়াছি তাহা সত্যেরই খাতিরে। দ্বিজেন্দ্র বাবুর অনেক রচনা বঙ্গসাহিত্যের স্থায়ী সম্পত্তি হইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস; তিনি জাতীয়-সাহিত্যভাণ্ডারে 'দুর্গাদাস,' 'মেবার পতন' ও 'সাজাহান' প্রভৃতি অমূল্য রত্ন দান করিয়াছেন—তাঁহার 'হাসির গান', কয়টি জাতীয়-সঙ্গীত বঙ্গসাহিত্যে একটা অভিনবত্ব আনিয়া দিয়াছে, তাঁহার কতকগুলি চিত্র বঙ্গ-সাহিত্যের একটা দিক উজ্জ্বল রাখিয়াছে, কিন্তু তাঁর অনেকগুলি রচনা একেবারেই তাঁর উপযুক্ত নহে, সে গুলি তাঁহার ও বঙ্গ-সাহিত্যের কলঙ্কস্বরূপ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাঁহার পাষাণী 'পাষাণে,' তাহার নমুনা 'কষিয়া' দেখিলাম। আশা করি দ্বিজেন্দ্র বাবু নিবিষ্ট চিত্তে, সমালোচকের চক্ষে, পাষাণী পাঠ করিয়া, তাঁহারই সমালোচনার "পরশুরামি" কুঠারাঘাতে ভবিষ্যতে তাঁহার পাষাণী প্রভৃতিকে সংস্কৃত করিতে চেষ্টিত হইবেন এবং আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়া এই "অপ্রিয়" কথা আলোচনার জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। তাঁহার নিকট আরও প্রার্থনা করি, তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা যেন পাষাণীর ন্যায় নাটকে বা কোন ব্যক্তিগত আলোচনায় আকৃষ্ট না হইয়া দুর্গাদাস, মেবার পতন, সাজাহানের ন্যায় নাটক রচনায় নিযুক্ত থাকে।

শ্রীসরসীলাল সরকার।

ধর্ম্মের কথা।

১

এক সময় ধর্ম্মের কথা অনেক কহিয়াছি। এখনো অবসর পাইলে বলি না এমন নয়। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মকথা কহিবার সাহসটা কমিয়া যাইতেছে, ইহা দেখিতেছি।

ধর্ম্ম-বস্তু যে কত নিগূঢ়, কত জটিল, আগে তাহা বুঝিতাম না। এখনো যে ভাল করিয়া বুঝি, এ স্পর্দ্ধা নাই। তবে যতটুকু বুঝিতেছি, তাহাতেই মনে হয়, সচরাচর লোকে যে ভাবে ধর্ম্মের কথা

বলে, ধর্ম্ম লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা করে, তার মত এমন নিষ্ফল কাজ আর দুনিয়ায় নাই।

ফুল যেমন আপনা হইতেই ফুটে, বায়ু যেমন আপনা হইতেই বহে, চূতগন্ধে মাতোয়ারা হইয়া কোকিল যেমন আপনা হইতেই পঞ্চমে তান ধরে, তরুণ কিরণরেখার আভাসে আপনা হইতে যেমন জীবজগৎ জাগিয়া উঠে, তেমনি আপনা হইতে যখন ধর্ম্ম-কথা বেরিয়ে পড়ে, তাহা নিষ্ফল নহে। সে কথার সার্থকতাও বাহিরে নয়, ভিতরে; শ্রোতার কাণে বা মনে নয়, বক্তার আপনার মনে ও প্রাণে। ফোটা-ই যেমন ফুলের সার্থকতা, বহিয়া যাওয়াই যেমন মলয়ের সার্থকতা, সেইরূপ আপনা হইতে, আপনারই জন্য যে ধর্ম্ম-কথা বাহির হয়, আত্মপ্রকাশেই তার পূর্ণ সার্থকতা। কে শুনিল বা না শুনিল, কে বুঝিল বা না বুঝিল, কার প্রাণে তাহা লাগিল বা না লাগিল, এ সকল বাহিরের ঘটনা বা ফলাফলের উপরে, এরূপ ধর্ম্মকথার সার্থকতা আদৌ নির্ভর করে না। এরূপ ধর্ম্মকথার কথা এখানে বলিতেছি না। লোককে বুঝাইবার জন্য যে ধর্ম্মকথা বলা হয়, অপরের ভ্রান্তিবিনোদনের জন্য যার অভিব্যক্তি হয়, পরমতাবলম্বী লোককে স্বমতাবলম্বী করিবার জন্য, আপনার দলের বা সম্প্রদায়ের পরিসর বৃদ্ধির চেষ্টায় যে ধর্ম্ম-কথা উক্ত হয়, তারই কথা এখানে বলিতেছি। তার মত নিষ্ফল কাজ, সত্যই, দুনিয়ায় আর কিছু আছে কি না, জানি না।

এ জন্য আমাদের দেশে লোককে ডাকিয়া ধর্ম্মকথা কহিবার প্রথা কখনো ছিল না। পণ্ডিতেরা সভা করিয়া শাস্ত্রার্থের আলোচনা করিতেন। বক্তাগণ পৌরাণিকী কথা কহিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন ও চরিত্র-গঠন করিতেন। সদ্‌গুরুগণ শিষ্যমণ্ডলীকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। এ সকল প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু যে যা বোঝে না কেবল নহে, বুঝিতে চাহে না, তাহাকে জোর করিয়া সে কথা শুনাইবার ও বুঝাইবার প্রয়াস কখনো দেখা যায় নাই।

আর, এর মূল কারণ এই মনে হয় যে আমাদের দেশের প্রাচীন সাধুমহন্তরা ধর্ম্ম-বস্তু যে কত গূঢ়, কত জটিল ইহা অতিশয় দৃঢ়ভাবে বুঝিয়াছিলেন ও ধরিয়াছিলেন। তাঁরা জানিতেন যে যার ভিতরে যে বস্তু বা যে অবস্থা জন্মে নাই, বাহির হইতে তাহাকে কখনো সে বস্তু দেওয়া যায় না, ও তার ভিতরে সে অবস্থা আনা সম্ভব নহে। এক কথায় বলিতে গেলে, তাঁরা অধিকারী-ভেদ মানিতেন, সকলে সকল বিষয়ের অধিকারী নহে, এ সত্যটা অতি দৃঢ় ভাবে ধরিয়া-ছিলেন।

এক সময়, এই অধিকারীভেদের কথা শুনিলেই, আমরা নাসিকা কুঞ্চিত করিতাম। ধর্ম্মবস্তু সার্ব্বজনীন, ভগবানের সত্য সার্ব্বভৌমিক, এখানে আবার অধিকারী অনধিকারীর কথা কি? ধর্ম্মে অধিকারী-ভেদ মানাটা তখন নিতান্ত অসত্য ও অধর্ম্ম বলিয়া মনে হইত। কিন্তু সত্যই কি ধর্ম্মে কোনো অধিকারী অনধিকারী ভেদ নাই? সকল সত্যই কি সকলে বুঝে, না বুঝিতে পারে? যুক্তিতে যা ধরা যায়, তাকেই কি

চরিত্রে ও চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়? ক্ষেত্রতত্বের পতিজ্ঞার ন্যায়, কেবল যুক্তি-পরম্পরার উপরেই কি ধর্ম্মকে গড়িয়া তোলা যায়? আর তা যদি সম্ভব না হয়, তবে অধিকারী-ভেদ না মানিয়া এ সমস্যার অপর মীমাংসাই বা কি আছে?

ফলত যত জীব, তত ধর্ম্ম। প্রত্যেক জীবের ধর্ম্ম তার নিজস্ব বস্তু। ধর্ম্ম যে কেবল মরণে সঙ্গে যায়, তাহা নহে; জন্মকালেও সঙ্গে থাকে। আমরা প্রত্যেকে আমাদের ধর্ম্মকে সঙ্গে লইয়া জন্মগ্রহণ করি, আবার আয়ু ফুরাইলে এই ধর্ম্মকে সঙ্গে লইয়াই লোকান্তরে গমন করি। যাহা হইতে ভূত সকলের উৎপত্তি, যাহাতে ভূত সকলের স্থিতি, যাহা ভূত সকলের নিয়তি ও গতি, তাহাই ধর্ম্ম। সমষ্টিভাবে এই ধর্ম্মই ব্রহ্ম; ব্যষ্টিভাবে ঐ ব্রহ্মই ধর্ম্ম।

ব্রহ্মেতে এই বিশ্ব স্থিতি করিতেছে, যখন বলি, তখন বিশ্বকে সমষ্টিরূপেই দেখি। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বস্তু, ব্রহ্মেতে যাহাকে দেখিবে তাহাকেই নির্ব্বিশেষভাবে দেখিতে হইবে। ব্রহ্ম সকলেতে, সকলেই ব্রহ্মেতে। ব্রহ্ম সকলেরই প্রাণস্য প্রাণং উত চক্ষুষশ্চক্ষুঃ ব্রহ্ম যেমন তোমার প্রাণ, তেমনি আমার প্রাণ, তেমনি বিশ্বেরো প্রাণ। ব্রহ্মদৃষ্টিতে তুমি আমি, সাধু অসাধু, জীব ও জড়, সকলই একাকার হইয়া যায়, নির্ব্বিশেষে সকল বিশেষত্ব বিলোপ প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু ধর্ম্মেতে এই বিশ্ব স্থিতি করিতেছে, যখন বলি, তখন ইহাকে একান্ত ব্যষ্টিভাবে দেখিয়া থাকি। ধর্ম্ম বলিলেই নিয়মের বাঁধন, বিধি-নিষেধের কড়াকড়ি বুঝিয়া থাকি। ব্রহ্মে বিধিও নাই নিষেধও নাই। বিধি-নিষেধ বলিলেই একের সঙ্গে অপরের সম্বন্ধ বোঝায়। এক যে অপর হইতে পৃথক্, এ ধারণা ব্যতিরেকে বিধি-নিষেধের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। এটা কর, ওটা করিও না,—ইহা যখনই বলি, তখনই এটা যে ওটা হইতে ভিন্ন, স্বতন্ত্র, ওটার বিরোধী, ইহা ধরিয়া লই। এই ভেদবুদ্ধির উপরে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মদৃষ্টিতে এ ভেদের স্থান নাই। ব্রহ্মে অভেদ, ধর্ম্মে ভেদ, ব্রহ্ম ও ধর্ম্ম এ দুয়ের পার্থক্য এই। মূলে, পরমার্থত দুই এক; যা ব্রহ্ম তাই ধর্ম্ম। কিন্তু এই এক বস্তুই সমষ্টিভাবে দেখিলে, ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হয়, ব্যষ্টিভাবে দেখিলে ধর্ম্মরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম সকলেতেই আছেন বলিয়া, ধর্ম্মও তাই সকলেই আছেন। আমরা এই জন্য কেবল মানুষেরই ধর্ম্ম আছে, আর কারো নাই, এমন কথা কখনো বলি না। আমরা যাকে ধর্ম্ম বলি, তা জড়ে জীবে, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা, মানুষ-দেবতা, সকলেই আছেন। কিন্তু এই ধর্ম্ম প্রত্যেকেই বিশিষ্ট আকার ধারণ করিয়া আছেন। এই জন্য প্রত্যেকের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র। জলের যা ধর্ম্ম, আগুণের তাহা ধর্ম্ম নহে। পৃথিবীর বা মৃত্তিকার যা ধর্ম্ম, আকাশের তাহা ধর্ম্ম নহে। বৃক্ষলতার যা ধর্ম্ম কীটপতঙ্গাদির ধর্ম্ম তাহা নহে। পশুপক্ষীর যা ধর্ম্ম, মানুষের তাহা নহে। এমন কি একের ধর্ম্ম যাহা, অপরের ধর্ম্ম তার বিরোধীও হইতে পারে। এই বিরোধে ধর্ম্মের ধর্ম্মত্ব কখনো নষ্ট হয় না। সৃষ্টিতে তো এরূপ বিরোধ সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ

করিতেছি। শক্তিতে শক্তিতে বিরোধ, বস্তুতে বস্তুতে বিরোধ, জীবে জীবে বিরোধ, এই নিত্য বিরোধের সমষ্টিই বিশ্ব। আর ধর্ম্মবস্তু এই বিরোধের মধ্যে, এই বিরোধকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত হইতেছে। এই বিরোধ বিশ্বের অস্থিমজ্জাগত। এই বিরোধই ভাগ্যবিবর্ত্তনের প্রণালী।

অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই জগৎব্যাপী বিরোধ, যাহাকে লইয়াই জগতের স্থিতি ও পরিণতি, যে বিরোধের একান্ত নিরশনের নামই মহাপ্রলয়,—এই বিরোধও ঐকান্তিকী বস্তু নহে। বিরোধ জগতের প্রণালী, কিন্তু লক্ষ্য নহে। বিশ্বের মূল এক এবং গতিও এক। এই অনন্ত ভেদ-বিরোধের মধ্য দিয়া জগৎ একই লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়াছে। এই ভেদ-বিরোধ একত্বকে বিনাশ করে না, বরং একত্বকে প্রতিনিয়তই প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। আর বিরোধ যখন মিলনেরই সূত্র হইয়া, একই কেন্দ্রে সকলকে আকর্ষণ করে, ভেদ যখন অভেদেরই দিকে ছুটিতে থাকে, তখনই অধিকারীভেদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

অধিকারী-ভেদে লক্ষ্যের একত্বকে কখনো নষ্ট করে না, কেবল পন্থার বিশালতা ও বিভিন্নতাই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ঋজু কুটিল বহুবিধ পথ ধরিয়া জীব একই গন্তব্যের দিকে যাইতেছে, হিন্দু এ কথা কখনো অস্বীকার করে নাই। কেবল সকল মানুষই যে এক লক্ষ্যের অনুসরণ করিতেছে, এমনো নহে। এই লক্ষ্য কেবল মানুষের লক্ষ্য নহে। ইহা সকল জীবেরই লক্ষ্য। ইহা সমগ্র বিশ্বেরই চিরন্তন লক্ষ্য। জড় ও জীব, চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ, সকলে আপন আপন ভাবে, আপন আপন অধিকারে এই সনাতন এই বিশ্বজনীন লক্ষ্যের দিকে যাইতেছে। ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি যেমন এক শক্তি, এক ইচ্ছা, এক প্রাণ, এক সত্তা হইতে, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের গতিও সেই একেরই দিকে। যাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, তাহাতেই ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি, তাহাতেই আবার ব্রহ্মাণ্ডের লয়। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি"—যাহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাহাতে ভূতগ্রাম স্থিতি করে, প্রলয়-কালে যাহাতে ভূতগ্রাম পুনঃপ্রবেশ করে ও লীন হয়,—শ্রুতি ইহাকেই ব্রহ্ম কহিয়াছেন। ইহাই হিন্দুর তথাকথিত অদ্বৈতবাদের মূল। এই অদ্বৈততত্ত্বের উপরেই এক দিকে ধর্ম্মের একত্ব ও অপর দিকে ধর্ম্মের অধিকারী-ভেদ, এই উভয় সত্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ফলত এই অধিকারীভেদ মানিয়াই হিন্দুর ধর্ম্ম এমন বড়, এমন উদার, এমন সার্ব্বজনীন বস্তু হইয়াছে। যে ধর্ম্ম অধিকারীভেদ মানে না, তাহা যতই কেন উদারতার ভাণ বা সার্ব্বজনীনতার দাবি করুক না, তাহা প্রকৃত পক্ষে উদারও হইতে পারে না, সার্ব্বজনীনও হইতে পারে না। খৃষ্টধর্ম্মে অধিকারী-ভেদ নাই, সুতরাং একদিকে যেমন সকল খৃষ্টীয়ানই একই রূপ সাধনার, একই আকারের উপাসনার কেবল অধিকারী নহে, কিন্তু তাহাই অবলম্বন করিতে বাধ্য, সেইরূপ যারা ইহা করিল না, বা করিতে পারিল না, তারা এই ধর্ম্মের

বাহিরে পড়িয়া রহিল, আর যতক্ষণ এক জনও কোনও ধর্ম্মের বাহিরে পড়িয়া আছে, ততক্ষণ সেই ধর্ম্ম যতই কেন উচ্চ হউক না, সার্ব্বজনীন কখনো হইতে পারে না। সর্ব্বজনের যাহা নহে, তাহা সার্ব্বজনীন, ইহাতে অর্থ-বিরোধ ঘটে। ইচ্ছা করিলেই তুমি খৃষ্টীয় ন হইতে পার, তাহাতে কোনো বাধা নাই; এ কথা বলিলেও এই আপত্তির খণ্ডন হয় না। এখানে আমার ইচ্ছাই তবে এই সার্ব্বজনীনতার বিরোধী হইয়া আছে। এরূপ বস্তুকে কখনো সার্ব্বজনীন বস্তু বলা যায় না, বলা যাইতে পারে না। মনুষ্যত্ব সার্ব্বজনীন বস্তু; সমগ্র মনুষ্যমণ্ডলীকে অধিকার করিয়া এই বস্তু আছে। আমি ইচ্ছা করি আর না করি, এই মনুষ্যত্ব আমার, আমি এই মনুষ্যত্বের। সভ্য ও অসভ্য বড় ও ছোট, জ্ঞানী ও মূর্খ, সাধু ও অসাধু, সুস্থ ও অসুস্থ, সবল ও দুর্ব্বল, প্রৌঢ় ও শিশু, সকলেই এই সাধারণ মনুষ্যত্বের আশ্রিত, অঙ্গীভূত, অধীন। যে পঙ্গু সেও মানুষ, যে খঞ্জ সেও মানুষ। যে বোবা সেও মানুষ। এই জন্যই মনুষ্যত্ব সার্ব্বজনীন বস্তু। ইচ্ছা করিয়া তুমি মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ কর নাই; আর ইচ্ছা করিয়া এখন মনুষ্যত্বের বাহিরে যাইতেও পার না, থাকিতেও পার না। তুমি পশুর মত জীবন যাপন করিতে পার, মনুষ্যত্বকে অবমাননা করিতে পার, তোমার এই শ্রেষ্ঠ অধিকারকে অগ্রাহ্য করিতে পার, কিন্তু মনুষ্যত্ব তথাপি তোমাকে ছাড়িবে না। প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে মনুষ্যত্বের এই যে ঐকান্তিক অপরিহার্য্য সম্বন্ধ আছে, তারই জন্য মনুষ্যত্ব সার্ব্বজনীন বস্তু। যে ধর্ম্ম সমগ্র বিশ্বের মধ্যে এই ঐকান্তিক, এই অপরিহার্য্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না, সে ধর্ম্ম কখনো বিশ্বজনীন বা সার্ব্বজনীন হইতে পারে না। হিন্দু যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করে, তাহা সার্ব্বজনীন, এই জন্য সেই ধর্ম্মের বিশাল সম্বন্ধজালে জড় ও জীব সকলে সমান ভাবে বাঁধা রহিয়াছে। জলে সে ধর্ম্ম শৈত্য, অগ্নিতে উত্তাপ, সূর্য্যচন্দ্রনক্ষত্রাদিতে জ্যোতি, পৃথিবীতে পুণ্য গন্ধ। পক্ষীতে সে ধর্ম্ম পক্ষীত্ব, কীটে কীটত্ব, পতঙ্গে পতঙ্গত্ব, মানুষে মনুষ্যত্ব। এই জন্যই হিন্দুর ধর্ম্ম

সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ।

জড়, জীব, সকলেরই মধু। ইহা সহজ বস্তু, ইহা সার্ব্বজনীন বস্তু। ইহা বিশ্বজনীন তত্ত্ব।

ধর্ম্ম সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ—এখানেই ধর্ম্মের বিশালত্ব ও সার্ব্বজনীনত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথমত ধর্ম্ম কেবল মনুষ্যের নহে, সর্ব্বেষাং ভূতানাং—সকল ভূতের সাধারণ সম্পত্তি। আর ইহা সকল ভূতের মধু। এই মধু শব্দের অর্থ অত্যন্ত গূঢ়।

মিষ্টত্বই মধুর ধর্ম্ম। যাহা মিষ্ট যাহা তৃপ্তিকর, তাহাই মধু। ধর্ম্ম সকল ভূতের মধু, অর্থ এই যে ধর্ম্মে সকল ভূতের পরম তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। যাহাতে যে বস্তুর পরম তৃপ্তিলাভ হয়, তাহাই সে বস্তুর ধর্ম্ম।

আর প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব প্রকৃতি হইতেই তার তৃপ্তির কারণ উৎপন্ন হয়। বস্তু যখন আপনার প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়, আপনার অন্তঃপ্রকৃতির চরিতার্থতা লাভ করে, তখনই তাহার পরম তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। ধর্ম্ম সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ এই বলিয়া ধর্ম্মের মূল

তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া মহাভারত ধর্ম্মকে জীবের প্রকৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমি যা, তাতেই আমার তৃপ্তি হয়, আমি যা নই তাতে কখনো আমার তৃপ্তি হইতে পারে না। আমি ইন্দ্রিয়সম্পন্ন জীব, চক্ষুকর্ণরসনাদি আমার প্রকৃতির অঙ্গ, আমার প্রকৃতির তৃপ্তি সাধনের যন্ত্র। এই জন্য বিষয়রসে আমার তৃপ্তি হয়। যখন আমার প্রকৃতি এই সকল ইন্দ্রিয়কে ছাড়াইয়া যায়, তখন ইন্দ্রিয় সাহায্যে বিষয়ভোগ করাতে আমার যে তৃপ্তি হইত, এখন অতীন্দ্রিয়ের ধ্যান-ধারণাতে তদপেক্ষা অধিকতর, গভীরতর তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। আমার প্রকৃতির স্ফূর্ত্তি ও সার্থকতাই এই তৃপ্তির কারণ ও অর্থ। ধর্ম্ম সকল ভূতের পরম তৃপ্তির কারণ, সকল ভূতের মধু, এই জন্য সে ধর্ম্মে সকল ভূতের আত্মপ্রকৃতির সার্থকতা লাভ হইয়া থাকে। ধর্ম্মের ভিতর দিয়া ভূতগ্রাম ভাগ্যবিবর্ত্তনে, আপনার প্রকৃতিকে ফুটাইয়া তোলে, আপনার প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়। আর প্রত্যেক জীবের প্রকৃতির উপরে যখনই ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তখনই এক দিকে ইহা সার্ব্বজনীন বস্তু হয়, ও অপর দিকে ইহার মধ্যে অধিকারীভেদে স্থান হইয়া থাকে। ফলত অধিকারীভেদ আছে বলিয়াই ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন, আর সার্ব্বজনীন বলিয়াই তাহাতে অধিকারীভেদের প্রতিষ্ঠা সম্ভব ও আবশ্যক হয়।

শ্রীঃ ———

মাতৃহীনা।

(গল্প)

১

কাঞ্চনপুরের রামদয়াল বসু সম্পন্ন গৃহস্থ। তাঁহার যথেষ্ট জোত জমা ছিল, সম্বৎসর প্রায় দুই 'খাদা' (৩২ বিঘা) জমিতে আবাদ হইত; দুটি আমকাঁঠালের বাগান, একটি কদলী ও শাক-শবজীর বাগান, ছোট-বড় তিনটি পুষ্করিণী, তন্মধ্যে একটি পুষ্করিণীতে প্রায় আধ মণ ওজনের পাকা 'রুই' পাওয়া যাইত। তাঁহার গোয়ালে যে কয়েকটি পয়স্বিনী গাভী ছিল, তাহারা বৎসরের অধিকাংশ সময়েই দৈনিক দশ বার সের দুধ দিত। রামদয়ালের স্ত্রী ক্ষান্তমণি সুদক্ষা গৃহিণী ছিলেন, তাঁহার গৃহিণীপণায় চঞ্চলা কমলা অচঞ্চল ভাবে তাঁহার গৃহে বাস করিতে ছিলেন। রামদয়ালের সোণার সংসার।

সংসারে পরিবার সংখ্যা নিতান্ত অল্প। রামদয়ালের তিন চারিটি পুত্র তিন চারি বৎসরের হইয়া পিতা মাতার মায়া কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছিল, বড়টি বাঁচিয়া থাকিলে এত দিন বিশ বৎসরের হইত। ছেলে কটিকে যমের হাতে সঁপিয়া দিয়া তাঁহারা চারি বৎসরের একটি কন্যা পুঁটুকে লইয়া কোন রকমে পুত্রশোক ভুলিয়াছিলেন;

পুঁটু তাঁহাদের নয়ন পুত্তলি। সংসারে পুঁটুর আদরের সীমা ছিল না। পুঁটু 'মলে'র সঙ্গে জুতা পায়ে দিত, কাছা দিয়া কাপড় পরিত, এবং নাকে মুক্তার একটি নলক থাকিলেও পুরুষের মত সে কামিজ গায়ে দিত। স্ত্রী ও কন্যা ভিন্ন রামদয়ালের সংসারে এক বিধবা বৃদ্ধা পিসিমা ছিলেন, অন্য পরিবার ছিল না। তথাপি তাঁহার গৃহে দু'বেলা পঞ্চাশখানি পাতা পড়িত। ক্ষান্তমণি এত লোকের ভাত-ব্যঞ্জন একাকী রাঁধিতেন, পিসিমা নামে মাত্র তাঁহার সাহায্য করিতেন। প্রতিপাল্য পোষ্যগণকে ক্ষান্তমণি যখন অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত মা অন্নপূর্ণা ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন বিতরণ করিতেছেন। তাঁহার নাসিকায় প্রকাণ্ড নথ, ললাটে একটি ক্ষুদ্র নীলবর্ণ উল্কী, মস্তকের নিবিড় কুন্তলদাম চূড়াকারে সম্মুখ দিকে বাঁধা, পরিধানে কস্তাপেড়ে সাড়ী; তাঁহার প্রকোষ্ঠে সুলোহিত শাঁখা ও করতলে স্তূপীকৃত অন্ন পূর্ণ থালা। পল্লী-বাসিনীরা বলিত, ক্ষান্তমণি তাঁহার ঘরের লক্ষ্মী।

রামদয়ালের বিধবা পিসি রামমণি বার্দ্ধক্যে নিতান্ত স্থবিরা হইয়া উঠিয়াছিলেন, তের বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া তিনি ভ্রাতার সংসারেই প্রতিপালিত হইতেছিলেন। তিনি ভ্রাতার সংসারেই কর্ত্রী ছিলেন। ভ্রাতার মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতিপালন-ভার ভ্রাতুষ্পুত্র রামদয়ালের স্কন্ধে পড়িল; দীর্ঘকাল সংসারের কর্ত্তৃত্ব করিয়া যখন তিনি 'পেন্‌সন' লইলেন তখন ক্ষান্তমণিকে অগত্যা সেই গুরুভার গ্রহণ করিতে হইল। পিসিমা তাঁহার বার্দ্ধক্যের প্রধান অবলম্বন হরিনামের ঝুলিতে মনপ্রাণ সমর্পণ করিলেন। কিন্তু পুঁটুর আক্রমণে তাঁহাকে হরিনামের ঝুলি লইয়া বড় ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত! ঝুলি হইতে কোন দিন তাঁহার গঙ্গামৃত্তিকা খানি, কোন দিন তিলক কাটিবার চটাটি, কোন দিন বা তাঁহার টিনমোড়া চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র আরসী খানি চুরি যাইত, এবং বিস্তর সাধ্যসাধনার পর পুঁটু গুপ্ত স্থান হইতে তাহা বাহির করিয়া দিত। যে দিন তিনি সন্ধ্যাকালে পুঁটুকে কোলের কাছে লইয়া রূপকথা না বলিতেন, তাহার পর দিনই এইরূপ অনর্থপাত হইত। তাঁহার উপর পুঁটুর দৌরাত্ম্যের সীমা ছিল না।

ক্ষান্তমণি পিতৃগৃহে অল্প লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন, কিন্তু বিলাসিতার সহিত কোন দিন তাঁহার পরিচয় হয় নাই। তিনি রামায়ণ মহাভারত কোন রকমে পড়িতে পারিতেন, নাটক নভেল বুঝিবার বিদ্যা তাঁহার ছিল না, সে প্রবৃত্তিও ছিল না। সমস্ত দিন গৃহকার্য্য করিয়া তিনি প্রায়ই অবসর পাইতেন না; কোন দিন একটু অবসর পাইলে সে সময়টুকু তিনি কাঁথা শেলাই বালিশের ওয়ার শিলাই প্রভৃতি সূচ কার্য্যে ক্ষেপণ করিতেন; কোন দিন রামায়ণ খানা খুলিয়া বসিতেন; পিসিমা হরিনামের ঝুলিটি হাতে লইয়া মালা ঘুরা-ইতে ঘুরাইতে পরম পবিত্র রামচরিতকথা একাগ্র মনে শ্রবণ করিতেন, পল্লীবিধবা-গণও সেখানে আসিয়া জুটিতেন। অবশেষে দিবসের সকল কার্য্য শেষ করিয়া রামদয়াল যখন শ্রান্ত দেহে গৃহে উপস্থিত হইতেন,

তখন ক্ষান্তমণি পুস্তক বন্ধ করিয়া তাঁহার হাত মুখ ধুইবার জল দিতেন, স্বামীর জন্য জলযোগের আয়োজনে ব্যস্ত হইতেন।

পুঁটু এতক্ষণ কোথায় থাকিত তাহার কেহ সন্ধান রাখিত না। কিন্তু রামদয়াল জল খাইতে বসিয়া "পুঁটু পুঁটু, আয়রে!"—বলিয়া যেমন ডাকিতেন, অমনই পুঁটু কোথা হইতে কালো কোকড়া চুলগুলি দুলাইতে দুলাইতে, মাটিতে আঁচল লুটাইতে লুটাইতে তাহার পিতার সম্মুখে আসিয়া বসিত!—ঘরে প্রচুর দুধ হইত; ক্ষান্তমণি স্বামীর জন্য ক্ষীর, সর, চাঁচির সন্দেশ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। পিতার পাতে প্রসাদ না পাইলে পুঁটুর তৃপ্তি হইত না। পুঁটু কাছে বসিয়া না খাইলে রামদয়ালের মুখে কোনও জিনিস রুচিত না।

জলযোগ শেষ হইলে ঝি তামাক সাজিয়া আনিত। রামদয়াল হুঁকা লইয়া, বারান্দায় মাদুরের উপর তামাক খাইতে বসিতেন, পুঁটু তাঁহার জানুর কাছে বসিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে 'আগাডুম্ বাগাডুম্' খেলিত, পিতার সহিত কত অসম্বন্ধ গল্প করিত। ক্ষান্তমণি গৃহে সন্ধ্যাদীপ দেখাইয়া পাকশালায় প্রবেশ করিতেন। এই ভাবে সাংসারিক কর্ত্তব্য পালন করিতে করিতে সুখশান্তি ও আনন্দে তাঁহাদের জীবনের দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল, রামদয়ালের সংকল্প ছিল, পুঁটু আর একটু বড় হইলে তাহাকে সুপাত্রে সম্প্রদান করিয়া গৌরীদানের পুণ্য সঞ্চয় করিবেন; কিন্তু মানুষের সংকল্প সকল সময় কার্য্যে পরিণত হয় না, ভগবান রামদয়ালকে নিশ্চিন্ত হইতে দিলেন না। আষাঢ়ের একদিন মেঘান্ধকারপূর্ণ সন্ধ্যাকালে সহসা কোথা হইতে একটা উদ্দাম ঝটিকা আসিয়া রামদয়ালের গৃহের সোণার প্রদীপ এক ফুৎকারে নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলিল; ক্ষান্তমণি জীবনের মধ্যাহ্নে ভীষণ বিসূচিকা রোগে, সংসার রঙ্গমঞ্চের অভিনয় শেষ করিয়া দিব্যধামে প্রস্থান করিলেন। গৃহিণীর অভাবে রামদয়ালের গৃহ শ্মশানে পরিণত হইল। সংসারে পূর্ব্বে যাহা যেমন ছিল, তাহা তেমনই রহিল, কেবল এক জনের অভাবে রামদয়ালের মনে হইতে লাগিল, তাঁহার সুখের কুঞ্জ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাঁহার জীবন মরুময় হইয়াছে।

২

পুঁটু মায়ের বড় আদরিণী কন্যা ছিল। মায়ের শোক সে সহজে ভুলিতে পারিল না। তাহার বয়স তখন পাঁচ বৎসর, পাঁচ বৎসরের মেয়ে সংসারে মা ছাড়া আর কাহাকেও বড় চিনিত না। মাতৃবিয়োগের পর তাহার চরিত্রের বড় পরিবর্ত্তন হইল। পূর্ব্বে সে সমস্ত দিন পল্লীবাসিনী প্রতিবাসিনী বালিকাদের সঙ্গে খেলা করিয়া বেড়াইত, আহারের সময় ভিন্ন অন্য সময় তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইত না; পাড়ায় তাহাদের অগম্য স্থান ছিল না। একমাত্র কন্যা বলিয়া সে পিতামাতার অত্যধিক আদর লাভ করিয়াছিল, তাহাকে পিতামাতার তাড়না সহ্য করিতে হইত না। এক এক দিন পুঁটু রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া মহা উৎসাহে খেলা ঘরের রন্ধন কার্য্যে মনোনিবেশ করিত। সুর্কী, বালি, কাদা, তেলাকুচার ফল, পৈ'মুচড়ি', 'ঘোলমৌনির'

লাল লাল ফল, তাহার ভাত মাছ ডাল, তরকারী দধি দুগ্ধের স্থান অধিকার করিত। কোন কোন দিন সে হাসি মুখে তাহার পিতামাতাকে তাহার 'বেটা'র বিবাহের বৌভাতে নিমন্ত্রণ করিত। মা তাহার আয়োজন দেখিয়া বলিতেন, "পুঁটু আমার বেঁচে থাক্‌লে খুব ভাল গিন্নি হবে।" রামদয়াল বলিতেন, "হাঁ, ওর শ্বশুর শাশুড়ী ওর হাতের রান্না খেয়ে কখন ভুল্‌তে পারবে না। মাটীর সন্দেশ, সুরকীর চচ্চড়ি, তেলাকুচার ঘণ্ট, বালির পায়স, পুঁটু খুব ভাল রেঁধেছে; তোর রান্না চমৎকার হয়েছে পুঁটু!"—পিতার প্রশংসায় আনন্দে ও লজ্জায় পুঁটুর ফুলের মত গাল দু'খানি লাল হইয়া উঠিত; কিন্তু সে হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিত, "এখনও মার মত ভাল রাঁধ্‌তে শিখিনি, পান তৈয়েরীও খুব ভাল হয় না; এই দেখ বাবা, আমার পান!"—পুঁটু সেটে আলুর পাতা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই পিতাকে দেখাইত।

মা বলিতেন, "পুঁটু, এখন তোর রান্না-বান্না রেখে দে, অনেক বেলা হয়েছে, ভাত খাবি আয়।"

পুঁটু বলিত, "তুমি বলো কি মা? আজ যে আমার বেটার বিয়ের বৌভাত, পাঁচ জনকে 'নেমন্তন্ন' করেছি, তাদের খাওয়া দাওয়া না হতেই আমি খেয়ে বসে থাক্‌বো! এখনো যে আমার 'আন্নিক' (আহ্নিক) হয় নি!"

পুঁটু তাহার বুড়ো দিদি রাসমণিকে আহ্নিক পূজা করিতে দেখিত, তাঁহার দেখা-দেখি সে মধ্যে মধ্যে একখানি কুশাসন পাতিয়া তাহার উপর পূজাসনে বসিত, খেলিবার গেলাসে সে এক গেলাস জল লইয়া সেই জলে মাটি গুলিয়া তিলক কাটিত, বিড়বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িত, দশবার মাটিতে মাথা ঠুকিয়া প্রণাম করিত; একটু নেকড়া হরিনামের ঝুলির মত করিয়া বাঁধিয়া, তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র হাত খানি রাখিয়া এক গাছি কাঠের মালা ঘুরাইত, মধ্যে মধ্যে তাহা ললাটে স্পর্শ করিত। মা যদি বলিতেন, "পুঁটু, আমার গামছা খানা নিয়ে আয় ত মা!" অমনি পুঁটু রাগ করিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া বলিত, "আমি এখন জপে বসেছি, আমাকে কিছু ব'লো না।"

রামদয়াল বাবু মধ্যাহ্নে আহারাদির পর কিছু কাল বিশ্রাম করিতেন, এক এক দিন পুঁটু হঠাৎ তাহার সঙ্গিনীদের ছাড়িয়া তাহার পিতার মাথার কাছে আসিয়া বসিত, এবং তাঁহার কেশবিরল মস্তকে ধীরে ধীরে হাত বুলাইত। সেই স্নেহ-স্পর্শে রামদয়াল চক্ষু খুলিয়া দেখিতেন, পুঁটু তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া খিলখিল করিয়া হাসিতেছে!

রামদয়াল সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিতেন, "খবর কি পুঁটু? আমার মাথার উপর তোর নজর পড়্‌লো কেন?"

পুঁটু বলিত, "বাবা, সৈ আমার বৌ কেড়ে নিয়েছে, গয়নাগুলোও সব ফেরত নিয়েছে। আমাকে একটা মেয়ে কিনে দেবে বাবা? আর আমাকে এক গাছা ফুতির মালা কিনে দিয়ো; আমার বেটার জন্যে পূজোয় একটা ভাল পোষাক চাই।"

রামদয়াল বলিতেন, "ওরে বুড়ী, তাই বুঝি আমার মাথায় হাত বুলোতে এসেছিস্? তোর হাড়ে হাড়ে নষ্টামি!"

রাসমণি বলিতেন, "কলির মেয়ে কি না কেমন করে কাজ আদায় করতে হয় তা এরই মধ্যে শিখেচে !"

পুঁটু বলিত, "না বাবা, তোমার মাথাটা উস্‌কো খুস্‌কো হয়ে আছে, আমি চিরুণ এনে তোমার মাথায় সিঁতি কেটে দিই।"

রামদয়াল হাসিয়া বলিতেন, "আমার টাকে সিঁতি কাটবি? তোর সাহস ত খুব!"

* * * * * *

কিন্তু সে দিন আর নাই। মায়ের মৃত্যুর পর পুঁটুর সেই সদাপ্রফুল্লভাব অন্তর্হিত হইয়াছিল। শৈশবেই তাহার শৈশব-চাঞ্চল্য দূর হইয়াছিল। প্রথম প্রথম সে মায়ের জন্য বড় কাঁদিত; কিছু দিন পরে সে আর তেমন কাঁদিত না বটে, কিন্তু এক স্থানে বসিয়া কি যেন ভাবিত; এক এক সময় সে চুপে চুপে নির্জ্জন ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইত, যেন তাহার ব্যাকুল দৃষ্টি চারিদিকে কাহাকে খুঁজিত! তাহার পিতার শয়ন কক্ষে খাটের পাশে দেওয়ালে তাহার মায়ের একখানি বড় 'ফটো' টাঙ্গানো ছিল। ক্ষান্তমণি দুই বৎসর পূর্ব্বে পুঁটুকে কোলে লইয়া ছবিখানি তুলাইয়া ছিলেন। মায়ের সেই ছবির দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া উঠিত, তাহার প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিত, তাহার ইচ্ছা হইত, একবার সে তেমনই করিয়া মায়ের কোলে গিয়া বসে! সেই সময় দৈবাৎ তাহার পিতা সেই কক্ষে উপস্থিত হইলে সে তাড়াতাড়ি খাটের পাশে মুখ গুঁজিয়া দাঁড়াইত। পিতা যদি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কি হয়েছে পুঁটু?"---অমনই পুঁটু ফুঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিত; রামদয়ালের চক্ষুও সিক্ত হইয়া উঠিত।

ক্ষান্তমণির মৃত্যুর পর রাসমণি বড়ই বিপদে পড়িলেন। রামদয়ালকে দু বেলা দুটি রাঁধিয়া দিতে তাঁহার প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইল, তাঁহার পূজার্চ্চনারও বড় ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন, এ ভাবে বেশী দিন কাটিতে পারে না, সংসারের একটি অভিভাবিকা না হইলে আর চলিতেছে না। তিনি আর কয় দিন? তাঁহার অভাবে কে রামদয়ালের সেবা-শুশ্রূষা করিবে? পরিচারিকারা পর মাত্র, তাহারা স্বার্থ চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকে, তাহাদের দ্বারা কতটুকু কাজ পাওয়া যায়? বিপদে আপদে তাহাদের উপর কি নির্ভর করিতে পারা যায়?—সুতরাং পিসিমা স্থির করিলেন, রামদয়ালের আর একটি বিবাহ দিতে হইবে, একটি নূতন বৌ ঘরে না আনিলে সংসার চির দিন 'হোটেলখানা' হইয়া থাকিবে; আর রামদয়ালের বয়সই বা এত বেশী কি, দুই কুড়ি তিন বৎসর বৈ ত নয়! এ বয়সে বিবাহ না করিলে চলিবে কেন?

৩

ক্ষান্তমণির মৃত্যুর পর দুই মাস চলিয়া গেল। রাসমণি মধ্যে মধ্যে রামদয়ালকে বিবাহের কথা বলেন, কিন্তু রামদয়াল অত্যন্ত অন্যমনস্ক, সে কথা কানে তোলেন না। অবশেষে পিসিমা রামদয়ালের বন্ধু গ্রাম্য স্কুলের প্রধান পণ্ডিত ত্রিলোচন কাব্যতীর্থের শরণাগত হইলেন।

ত্রিলোচন রামদয়ালের বাল্য বন্ধু;

তাঁহার সহিত রামদয়ালের অনেক কথা হইত। ত্রিলোচনের ইচ্ছা রামদয়াল বিবাহ করিয়া পুনর্ব্বার সংসারী হন; তিনি রামদয়ালের নিকট ইঙ্গিতে তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন; পিসিমার অনুরোধের পর তিনি রামদয়ালকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। রামদয়াল বলিলেন, আর কেন ভাই? আমাদের বাঙ্গালীর 'বল বুদ্ধি ভরসা, চল্লিশ হলেই ফরসা।'—চল্লিশ পারিয়েছি, এখন কোন রকমে আর দশ-বারোটা বছর চোক কান বুঁজে কাটাতে পারলেই পাড়ি জমাতে পারি। এই দশবারো বৎসরের জন্য কেন আর একটা দুগ্ধপোষ্য বালিকাকে গলায় বেঁধে সংসার সমুদ্রে ডুবিয়ে মারবো?—আরও এক কথা, বিবাহ করলেই মেয়েটা পর হয়ে যাবে। মাপ্ কর ভাই, এ কাজটি আমাকে দিয়ে হবে না।"

এই ভাবে একটি বৎসর কাটিয়া গেল। দুশ্চিন্তায় পিসিমার মাথার সমস্ত চুল সাদা হইয়া গেল, তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

পর বৎসর জ্যৈষ্ঠমাসে ক্ষান্তমণির এক মাতুল কয়েক দিনের জন্য রামদয়ালের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বাড়ী কাঞ্চনপুর হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে, কাঞ্চনপুরে তাঁহার কিছু পৈতৃক লাখরাজ জমি ছিল, তিনি তাহারই বন্দোবস্ত করিতে আসিয়াছিলেন; তাঁহার হঠাৎ কাঞ্চনপুরে আসিবার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল কি না প্রকাশ নাই। এত বড় সংসারটা একটি স্ত্রীলোকের অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে দেখিয়া তাঁহার আক্ষেপের সীমা রহিল না। তিনি রামদয়ালকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। পিসিমার সঙ্গেও তাঁহার যুক্তি-পরামর্শ চলিতে লাগিল; কিন্তু রামদয়ালের সেই এক কথা,—একটি গরীবের ছেলের সঙ্গে পুঁটুর বিবাহ দিয়া জামাইটিকে পৈতৃক ভিটায় বসাইয়া তিনি কাশীবাসী হইবেন। বিবাহে রুচি নাই, তাহা কর্ত্তব্যও নহে।

কিন্তু মিত্র মহাশয় কাব্যতীর্থ নহেন, তাঁহাকে নিরস্ত করা কঠিন হইল। মামা-শ্বশুর মিত্তিরজা আহারান্তে বাঁধা হুঁকায় অম্বরী তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "বাবাজী, তোমাদের বয়সই বা এমন কি হয়েছে, ছেলে মানুষ বল্লেই হয়, এ বয়সে এ রকম বৈরাগ্য নিতান্ত পাগলামি। এই দেখ না কেন আমাদের নারায়ণপুরের জমীদার পদ্মলোচন বাবু তেষট্টি বৎসর বয়সে চতুর্থ পক্ষে আবার কেঁচে গণ্ডুষ কল্লেন, হাইকোর্টের উকীল জনার্দ্দন বাবুর ধী শক্ত নাম, জাজ্জ্বল্যমান সংসার, সংসারে ছেলে মেয়ে নাতি পুতি সকলই বর্ত্তমান, তবু গিন্নি রোগা বলে তের বৎসরের একটি বৌ ঘরে এনেছেন! তাঁরা কি অবিবেচক, ভাল মন্দ বুঝতে পারেন না? ভেবে দেখ দেখি বাপু, কঠিন ব্যারাম হ'লে, বুড়ো বয়সে শরীর অক্ষম হয়ে পড়লে কে তোমাকে দেখ্‌বে, কে 'তাগত' করবে, কে তোমার মুখে দুটি ভাত তুলে দেবে? কথায় বলে "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং"—আজ তুমি ভাল আছ, রক্তের জোর আছে, কাল পড়ে যেতে পার; তখন ত একজন সেবা-শুশ্রূষার লোক চাই। চাকর-চাকরাণীদের দিয়ে

যদি অসময়ে সেবা চলতো তা'হলে আর ভাবনা ছিল কি?

বাবাজী বলিলেন, "মামা, সকলের রুচি এক রকম নয়, মুনসেফ পরেশ বাবু সাত ছেলের বাপ, পরিবার মারা যেতে না যেতে অশৌচ হতে না হতে পনের বছরের একটা ধাড়ী মেয়ে কোথা থেকে লুকিয়ে বিয়ে করে এলেন, ছেলে-মেয়েগুলিকে পর করলেন! আবার রাজপুত্র প্রমোদকিশোরের বাইশ বৎসর বয়সে পত্নী বিয়োগ হলো, তিনি ব্রহ্ম-চর্য্য আরম্ভ করলেন; মাছ খান না, হবিষ্য করেন! রুচির কথা নিয়ে তর্ক তুলে কোন লাভ নেই। তবে সত্তর বৎসর বয়সেও যাঁরা দশ বছরের নলক-পরা বধূ ঘরে এনে খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন, নূতন করে সংসার পাতেন, তাঁদের মতের সঙ্গে আমার মত মেলে না। আমার যা গিয়েছে—তা আর ফিরে আস্‌বে না, যদি আস্‌তো তবে তা যেতো না। সে অভাব যখন কখনই পূরণ হবে না, হবার আশা নেই, তখন খেয়ার কড়ি দিয়ে কেন ডুবে পার হই? আপনি আমাকে আর এ অনুরোধ করবেন না।"

মিত্তির জা ভাগিনেয়ীটির শোকে আকুল হইয়া উঠিলেন, কলাপাতার নলটা হুকার মুখ হইতে খসিয়া পড়িল, বস্ত্রপ্রান্তে তিনি চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন, তাহার পর কিঞ্চিৎ সাব্যস্থ হইয়া বলিলেন, "বাবাজী ঠিক কথাই বলেছ; যেমনটি যায় তেমনটি আর আসে না। বিশেতঃ মা ক্ষান্ত আমাদের সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মত ছিল, মামা-মামীর প্রতি তার ভক্তি কত ছিল! সে অভাব কখন পূরণ হবে না তা জানি, আর পরের মেয়ে ঘরে আন্‌লে পুঁটুরাণী যে পর হয়ে যাবে এ কথাও ঠিক। কিন্তু পুঁটু বড় হয়ে 'সময় অসময়ে' তোমার যে করবে, এ আশাও করো না; সংসারে আর পাঁচটা দেখ্‌চি কি না! ওর ঈশ্বর ইচ্ছায় দুটো ছেলে মেয়ে হবে, তাদের নিয়েই ব্যস্ত থাক্‌বে না বুড়ো বাপকে দেখ্‌বে? আমি বাপু, তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী, অনেক বিবেচনার পর একটা সংযুক্তি স্থির করেছি। আমার ইচ্ছা আমার ছোট মেয়ে কিরণশশীকে তোমার হাত দিয়ে যাই, খাসা গোছালো মেয়ে, তোমার যেমন সংসার শূন্য, সে তার ঠিক উপযুক্ত। তার রূপ গুণের কথা আর কি বলবো, বয়সও এই চৌদ্দ পার হয়েছে। কুলীনের ঘরের মেয়ে, ন দশ বছর বয়সে বিয়ে দিয়ে উঠ্‌তে পারিনি। বিশেষ মেয়েটির উপর বড়ই মায়া, ছোট মেয়ে কি না! আর সে পুঁটুকেও খুব যত্ন টত্ন করবে, পুঁটুর মার মামাতো বোন, তার পর ত নয়। পুঁটুকে ঠিক মায়ের মতই দেখ্‌বে। দেখ বাবা আমার এই অনুরোধটা তোমাকে রাখ্‌তেই হবে, তোমার মঙ্গলের জন্যই এ কথা বলছি; আমার ভগিনীপতি—তোমার শ্বশুর ঘোষজা বেঁচে থাকলে তিনিও আজ এ জন্য তোমাকে অনুরোধ করতেন! তুমি আমার কথায় রাজী না হলে তোমাকে ছাড়চিনে।"—মিত্তিরজা খপ্‌ করিয়া রামদয়ালের হাত জড়াইয়া ধরিলেন —পিসিমা আড়ালে দাঁড়াইয়া সকল কথাই শুনিতেছিলেন, তিনি সময় বুঝিয়া রামদয়ালের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "বাপের তুল্য 'বেক্তি', হাত ধরে অনুরোধ করচে, কথাটা ঠেলো না বাবা।

কথায় বলে, 'কাচা কাপড়, যাচা মেয়ে, যে ছাড়ে সে অলপ্পেয়ে'!"

রামদয়ালের হঠাৎ সন্দেহ হইল, লাখরাজি জমীর বন্দোবস্ত করিতে আসা একটা উপলক্ষ্য মাত্র, তিনি মেয়ের বিবাহের ঘটকালী ক'রতেই কাঞ্চনপুরে আসিয়াছেন!—রামদয়াল ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন অন্য কোথাও কি আপনার কিরণশশীর উপযুক্ত পাত্র যুটচে না? আমার মত আধ্‌বুড়োর হাতে তাকে সমর্পণের জন্য এত ব্যস্ত হয়েছেন কেন?"

মিত্তিরজা বলিলেন, "আমার মেয়ের পাত্রের অভাব! বলই বা কি আর কও-ই বা কি? হরিশ্চন্দ্রপুরের চৌধুরী জমীদারদের সঙ্গে তার বিয়ের 'কথা-কথন' চল্‌চে। মস্ত ধনী লোক তারা, দরজায় তিনটে হাতী বাঁধা! মেয়েকে বাঁউড়ী সুট গহনা দেবে। আর ছেলেটি যেন কার্ত্তিক, বাঙ্গালা স্কুলে বোধোদয় শেষ করে আখ্যানমঞ্জরী পড়চে! তা কিরণশশী কোলের মেয়ে, গিন্নি অত দূরে বিয়ে দিতে রাজী নন। আর সত্যি কথা বল্‌তে কি, অত বড় লোকের ঘরে কাজ করতে আমারও মন সরচে না। মেয়ের সঙ্গে একবার দেখা করতে হলে বেয়াইএর কাছে চারদণ্ড উমেদারী করতে হবে।"

প্রকৃত কথা এই যে, কিরণশশীর রূপ থাকিলেও মিত্তিরজার অর্থ ছিল না। একালে ভদ্রসমাজে কেবল মেয়ের রূপে 'চিঁড়া ভেজে না'। রূপ ত চাই-ই, সঙ্গে সঙ্গে রূপচাঁদও চাই। মিত্তিরজা যেখানেই বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছেন, সেখান হইতেই তিন চারি হাজার টাকার ফর্দ্দ আসিয়াছে। রামদয়ালের সাংসারিক অবস্থা ভাল, কোন রকমে সাত পাকটা দিতে পারিলে বিষয় সম্পত্তি সমস্তই তাঁহার মেয়ের হইবে। এত বড় প্রলোভন, বৈষয়িক লোক হইয়া তিনি কিরূপে ত্যাগ করেন? রামদয়ালের বয়স আর দশ বৎসর অধিক হইলেও তাঁহার এ বিবাহে আপত্তি ছিল না।

রামদয়াল বড় গোলে পড়িলেন, মিত্তিরজার প্রস্তাবে হঠাৎ রাজী হওয়া কঠিন, কিন্তু তাঁহার হাত ছাড়ানো আরও কঠিন। তাঁহার প্রধান ভয় নূতন গৃহিণী আসিয়া তাঁহার পুঁটুকে পর করিয়া দিবে। কিন্তু মিত্তিরজার কন্যা পুঁটুর মাসী, মাসী যদি জননীর স্থান অধিকার করে, তবে সে কি তাহার ভগিনীর কন্যাকে ফেলিতে পারিবে? রামদয়াল ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার মন অনেকটা নরম হইল, কিন্তু হঠাৎ শেষ উত্তর দিতে পারিলেন না; বলিলেন, "বিবাহে আমার আদৌ ইচ্ছা নাই, তবে দিন কত ভাবিয়া দেখি, আপনাকে আজই কথা দিতে পারিব না।"

বাবাজীর মন অনেকটা নরম হইয়াছে বুঝিয়া মিত্তিরজা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। তিনি রাত্রে বেয়ানকে বলিলেন, "বুঝেছ বেয়ান, বাবাজীত নিমরাজী হয়েছেন, কিন্তু এখনও পুরো রাজী করতে পারিনি। এ কালের ছেলে পিলের ঐ যেন কি এক রকম স্বভাব, কোন মতে গোঁ ছাড়তে চায় না। এ দিকে সংসারটা যে ব'য়ে যায় তার কি? তোমার বাপ বড় বাপের ভিটেয়

আলো দিবার ত মানুষ চাই ! মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাই এনে বাড়ীতে বসালে কি বাপদাদার নাম রক্ষে হয়, না দুধের 'তেষ্টা' ঘোলে মেটে ? বাপ-পিতামহ জলগণ্ডুষের প্রত্যাশা করেন। রামদয়াল ছেলে মানুষ, বুদ্ধি শুদ্ধি ত পরিপক্ক হয় নি, চুল না পাকলে বুদ্ধি পাকে না। রামদয়ালের ভয়, বিয়ে করলে পাছে মেয়েটি পর হয়ে যায় ! তা, তুমি ওকে বুজিয়ে সুজিয়ে রাজী কর, আমার কিরণশশী দুষ্টু মেয়ে নয়, পুঁটুকে সে ঠিক মেয়ের মতই দেখবে। আমার ইচ্ছা, শ্রাবণ মাস পড়তে পড়তেই শুভকর্ম্মটা শেষ হয়ে যাক্।"

পিসিমা বলিলেন, "যেমন করেই হোক, বিয়েটা শীগ্‌গির শীগ্‌গির দিয়ে ফেলতে হচ্চে, রামের বিয়ে না দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারবো না। যেমন করেই হোক আমি তার মত করবো বেয়াই, তুমি ভেবো না। তোমার মেয়ে আন্‌বো সে ত ঘরেরই কথা !"

সেই রাত্রেই পিসিমা কাঁদিয়া কাটিয়া রামদয়ালকে রাজী করিলেন। পরলোকগতা পত্নীর উজ্জ্বল স্মৃতি পুনঃপুনঃ তাঁহার মর্ম্ম পীড়িত করিতে লাগিল; কিন্তু নিদারুণ দুর্ভাবনার মধ্যেও রামদয়াল একটু সান্ত্বনা লাভ করিলেন, মামাশ্বশুরের কন্যাকে বিবাহ করিলে সে তাঁহার পুঁটুকে পর করিতে পারিবে না। সে যে পুঁটুর মাসি !

মিত্তিরজা পর দিন বেয়ানের মুখে শুনিলেন, রামদয়াল বিবাহে সম্মত হইয়াছেন।—তিনি অকূল সাগরে কূল পাইলেন।

৪

শ্রাবণ মাস পড়িতে না পড়িতে রামদয়াল কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধ মিত্তিরজার স্কন্ধ হইতে দুশ্চিন্তার বোঝা নামাইয়া নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন, কিরণশশীকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলেন।

কিরণশশী সুন্দরী না হইলেও তাহাকে কুরূপা বলা যায় না, ক্ষান্তমণি তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক রূপবতী ছিলেন; কিন্তু রামদয়াল যে বয়সে কিরণশশীকে বিবাহ করিয়া আনিলেন সে বয়সে রূপের মোহ প্রায়ই কাটিয়া যায়, তখন মানুষের হৃদয় গুণেরই পক্ষপাতী হইয়া উঠে। পিসিমা দেখিলেন বৌটি পরম গুণবতী। সে সকালে উঠিয়া গোময় দিয়া পিসিমার তুলসীমঞ্চ নিকাইত, তাঁহার 'আকাচা' কাপড় কাচিয়া দিত, তাঁহার রন্ধনের যোগাড় করিয়া দিত, আবার বৈকালে তাঁহার পাকা চুল তুলিয়া দিত; এত গুণের বৌ কি কারও হয় ? রামদয়ালও দেখিয়া শুনিয়া ক্রমে কিরণশশীর পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন, বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে বধূর প্রতি তাঁহার হৃদয়ে সহানুভূতির সঞ্চার হইয়াছিল; যে হরিশ্চন্দ্রপুরের চৌধুরী জমীদারের পুত্রবধূ হইয়া 'বাঁউড়ী সুট' গহনা পড়িয়া জীবন সার্থক করিতে পারিত, সে তাঁহার ন্যায় প্রৌঢ়ের গলে বরমাল্য অর্পণ করিয়া তাঁহার দুঃখকষ্ট অসুবিধার সঙ্গিনী হইল, দয়ার্দ্র হৃদয় রামদয়ালের দয়া ও সহানুভূতি ক্রমে দাম্পত্য প্রেমের শূন্য আসনের দিকে অগ্রসর হইল, তিনি পরলোকগতা পতিব্রতা পত্নী ক্ষান্তমণির কথা ধীরে ধীরে ভুলিতে লাগিলেন।

কিন্তু পুঁটু তাহার নূতন মায়ের সহিত তেমন অসঙ্কোচে মিশিত না; কোন দিন তাহাকে মন খুলিয়া কোন কথা বলিত না। পূজার সময় সে দেখিল, নূতন মা তাহার মায়ের তোরঙ্গ খুলিয়া বারাণসী সাড়ীখানি বাহির করিয়া লইয়া পরিল, তাঁহার গহনাগুলি সমস্তই গায়ে দিল—তাহার পর পল্লীবাসীদের সঙ্গে দত্তবাড়ী আরতি দেখিতে গেল। সে তাহাকে ডাকিল না, পুঁটুও সঙ্গে যাইতে চাহিল না। সে বারান্দার পৈঠায় মলিন মুখে বসিয়া রহিল।

দুই বৎসর পূর্ব্বের কথা পুঁটুর মনে পড়িল। সেও এই রকম পূজার দিন। তাহার মা এই বারাণসী সাড়ীখানি পরিয়া নানা অলঙ্কারে সাজিয়া ও পুঁটুকে সাজাইয়া তাহাকে কোলে লইয়া আরতি দেখিতে গিয়াছিলেন। আজ মা কোথায়? আজ কেহ তাহাকে সাজায় না, কেহ তাহাকে গহনা পরাইয়া দেয় না। পুঁটু খাইতে না চাহিলে কেহ তাহাকে আদর করিয়া ডাকিয়া খাইতে দেয় না; কেহ তাহার রুক্ষ চুলগুলিতে হাত দেয় না। মা বলিতেন 'আহা, আমার পুঁটুর কেমন চুল! এমন চুল আর কাহারও নয়।'—অনেক দিনের কথাটা পুঁটুর মনে পড়িল, সে আর কোন মতে আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। সে সেই সোপান প্রান্তে পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।—তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া বুড়ো দিদি রাগ করিয়া বলিলেন, "আজ তোর হলো কি?—নাঃ দিনরাত এমন ঘ্যান-ঘ্যান প্যানপ্যান ভাল লাগে না। আজ 'বছরকার' দিন এমন দিনে ভরা সন্ধ্যা-বেলা কাঁদ্‌লে অলক্ষণ হবে যে!"—হায়! ঠাকুর মাও আজ তার দুঃখ অভিমান বুঝিলেন না! মা হারাইয়া সে সংসারে বুঝি সকলই হারাইয়াছে। পুঁটু কাঁদিয়া কাঁদিয়া সানের উপর ঘুমাইয়া পড়িল।

সে দিন মহাষ্টমী। মধ্যাকাশ হইতে শরতের অর্দ্ধচন্দ্র সুবিমল রজতকিরণ বর্ষণে চরাচর প্লাবিত করিতেছিলেন। পূজাবাড়ীতে মহা উৎসাহে সন্ধিপূজার ঢাক বাজিতেছিল, পাড়ার ছেলেমেয়েরা মনের মত পোষাক পড়িয়া মনের আনন্দে পূজা দেখিতে যাইতেছিল। রুক্ষকেশা, মলিনবস্ত্রপরিহিতা অনাদৃতা অভিমানিনী পুঁটু একাকী সানের উপড় পড়িয়া স্বপ্ন দেখিল, মা যেন আকাশে চাঁদের পাশে লুকাইয়া হাসিতেছেন, হাসিয়া হাসিয়া ডাকিতেছেন, 'আয় মা, আয়! যদি জ্বালা জুড়াতে চাস্ তবে আমার কোলে আয়!"—কিন্তু পুঁটু অত উচুতে উঠিবে কিরূপে? মায়ের কোলে যাইবার জন্য সে স্বপ্নে অস্থির হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার আশা পূরিল না; তাহার মুদিত চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সুশীতল নৈশ সমীরণ অদূরবর্ত্তী রজনীগন্ধার ঝাড় হইতে মধুর সৌরভ বহন করিয়া পুষ্পগন্ধে পুঁটুকে মায়ের আদরের ন্যায় আচ্ছন্ন করিল, তাহার অযত্নবর্দ্ধিত রুক্ষ কেশদাম লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

মাতার মৃত্যুর পর হইতে পুঁটু তাহার পিতার কাছে খাটের উপর রাত্রে

শয়ন করিত। বাপের কাছে না শুইলে ভয়ে তাহার ঘুম হইত না। সন্ধ্যার পর পুঁটু জাগিয়া দেখিল নূতন মা আরতি দেখিয়া ঘরে ফিরিয়াছে, বস্ত্রালঙ্কারগুলি খুলিয়া বাক্সে তুলিয়া রাখিতেছে, পুঁটু দীন নেত্রে একবার সেই দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে খাটের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল।

কিরণশশী জিজ্ঞাসা করিল,—কি লা পুঁটি, ওখানে এসে দাঁড়ালি কেন?

পুঁটু বলিল, "বাবার বিছানায় শোব।"

কিরণশশী মুখ ভঙ্গী করিয়া বলিল, 'আর খাটে শুতে হবে না। সমস্ত দিন ধূলো-কাদা ঘেঁটে, যেখানে সেখানে মাটিতে গড়িয়ে বেড়াবেন, আর সন্ধ্যাবেলায় খাটে শুতে আস্‌বেন। হাবাতে মেয়েটাকে নিয়ে কি জ্বালাতেই পড়েছি! যা এখান থেকে, তোর বুড়ো দিদির কাছে শুয়ে থাক্‌গে। আমি তোর জন্যে তিন দিন অন্তর বিছানার চাদর বদলাতে পারিনে, আদর দিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে একেবারে মাথায় চড়িয়েছে, স্বর্গে বাতি দেবেন!"

পুঁটু নড়িল না, খাটের বাজু ধরিয়া ছবির মত দাঁড়াইয়া রহিল। চোখের জলে সে কিছু দেখিতে পাইল না।

কিরণশশী গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তবু ঐখানে খুঁটির মত দাঁড়িয়ে রৈলি! কথা বল্লে শুনিস্‌নে কেন? বেরো ঘর থেকে।"

কিরণশশী তাহার ডানা ধরিয়া শয়ন কক্ষের দ্বারের দিকে সরাইয়া দিল।

পুঁটু কাঁদিতে কাঁদিতে চণ্ডীমণ্ডপে তাহার পিতার নিকট গেল। রামদয়াল তখন চণ্ডীমণ্ডপে ফরাসের উপর বসিয়া কয়েক জন প্রজার সঙ্গে জমীসংক্রান্ত কি কথা বলিতেছিলেন, তাহাদিগকে বিদায় দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুঁটু কি হয়েছে রে, কাঁদচিস্ কেন?"

পুঁটু প্রথমে কোন উত্তর দিল না, অনেক পীড়াপীড়িতে বলিল, "নূতন মা বকেচে, আমাকে খাটে শুতে দেবে না।"

রামদয়াল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, অনেক দিন হইতেই তাঁহার মনে হইতেছিল বিমাতা কখন মাতার অভাব পূর্ণ করিতে পারে না। দুই একটি ঘটনা দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন পুঁটুর প্রতি কিরণশশীর কিছু-মাত্র স্নেহ নাই। অদ্য পত্নীর ব্যবহারে তিনি বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু কোন কথা না বলিয়া পুঁটুকে কোলে লইয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। ধূলোমাখা ধেড়ে মেয়েকে বাপের কোলে দেখিয়া কিরণশশীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, সে নথ নাড়িয়া বলিল, "রাজ্যের ধূলো ওর গায়ে, তুমি ওকে খাটে শোয়াতে পাবে না।"

রামদয়াল রক্তনেত্রে 'দ্বিতীয় পক্ষের' দিকে চাহিলেন, কোন কথা না বলিয়া পুঁটুকে খাটে শয়ন করাইলেন এবং তাহার পাশে বসিয়া তাহার রুক্ষ কেশরাশিতে অঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিলেন।

কিরণশশী দেখিল, তাহার স্বামী তাহার হুকুম তামিল করিল না। রাগে ও অভি-মানে সে পচা ইলিশের মত ফুলিয়া ঢাক হইল; স্বামীর কর্ণমূলে সুশাণিত বিষাক্ত বাক্যবাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। 'দোজবরে'র এত সাহস!

কিরণশশী একটা হরিকেন লণ্ঠনের

নিকট বসিয়া সুপারী কাটিতে কাটিতে বলিল, মানুষ যত বুড়ো হচ্ছে, ততই যেন বুদ্ধি-বিবেচনা সব লোপ পেয়ে যাচ্ছে! সংসারে আর কারও ত মেয়ে নাই! মেয়ের আদর দেখ্‌লে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়, যদি মেয়ের রূপ থাক্‌তো ত আরও কত হতো। সারাদিন ধূলো-কাদা ঘেঁটে বেড়াবে, চিমটি দিলে ময়লা ওঠে, থাটে না শুলে ওর ঘুম হয় না!"

রামদয়াল গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ছেলে মানুষ, ধূলো কাদা ঘেঁটে বেড়ানো ওদের স্বভাব। তুমি ত গাল দিতে খুব মজবুত, কোন দিন ত তোমাকে ওর গা-টা পরিষ্কার করে দিতে দেখ্‌লাম না। পিসিমা আছেন তাই কোন কোন দিন ওর মাথায় একটু জল পড়ে।"

রাগে কিরণশশীর সুপারী কাটা বন্ধ হইয়া গেল। সে বলিল, "আমার ত অন্য কাজকর্ম্ম কিছু নেই, তাই মেয়েকে তিন বেলা সাবান মাখাতে বসবো!—এত দরদ হয়ে থাকে তুমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করলেই পার।"

রামদয়াল বলিলেন, "ওর মা বেঁচে থাক্‌তে সে কখন এ কথা বলতো না। পুঁটুর আদর যত্ন করবার মানুষ নেই বলেই আমি বুড়ো বয়সে এই দুষ্কর্ম্ম করিছি, আবার একটা বিয়ে করে বসেছি!"

দ্বিতীয় পক্ষের নব যুবতী পত্নী প্রৌঢ় স্বামীর নিকট এরূপ গঞ্জনা কোন কালেই সহ্য করিতে পারে না। কিরণশশী রাগে গজরাইতে লাগিল, তাহার নাসিকার প্রকাণ্ড নথচক্র অজগরের 'কুলোপানা' চক্রের মত আন্দোলিত হইতে লাগিল, সে ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "যদি কথায় কথায় অপমান করবে, তবে বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছিলে কেন? কে তোমার পায়ে ধরে সাধ্‌তে গিয়েছিল?"

রামদয়াল ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছিলেন, কিরণশশীর ব্যবহারে তাঁহার হৃদয়ে আজ বড় আঘাত লাগিয়াছিল; তিনি তাহাকে মার্জ্জনা করিলেন না, বলিলেন, "কেহ পায়ে ধরে সাধেনি বটে, তবে এ জন্যে কেহ কেহ হাতে ধরে সাধাসাধি করেছিল কি না তোমার বাপকে সে কথা জিজ্ঞাসা করলে জান্‌তে পারবে। ভেবেছিলাম মেয়েটা তোমার কাছে আদর যত্ন পাবে, কিন্তু দেখচি তুমি ওকে দু'চক্ষে দেখতে পার না!"

কিরণশশী বলিল, "তুমি কথায় কথায় আমাকে খোঁটা দেও, আমি তোমার এত 'নাথি-ঝাঁটার' ভাত খেতে চাইনে, দাও আমাকে কালই বাপের বাড়ী পাঠিয়ে; যদি 'অদেষ্টে' দুঃখই না থাক্‌বে, তবে এত যায়গা থাক্‌তে বাবা আমাকে 'দোজবরের' হাতে সঁপে দেবেন কেন? এর চেয়ে হাত পা ধ'রে জলে ফেলে দিতে পারতেন, তাও ভাল ছিল, চিরকালটা এমন জ্বালাতন হ'য়ে মরতে হতো না।"

কথায় কথা বাড়ে বুঝিয়া রামদয়াল আর কোন কথা বলিলেন না, তিনি শয্যায় শয়ন করিয়া অদৃষ্ট-বিড়ম্বনার কথা ভাবিতে লাগিলেন, জীবনটা তাঁহার নিকট জটিল সমস্যা বলিয়া মনে হইতে লাগিল! তখনও আকাশে চাঁদ হাসিতেছিল, পূজা বাড়ীতে মহাশব্দে ঢাক বাজিয়া ক্ষুদ্র গ্রামখানি তোল-

পাড় করিয়া তুলিতেছিল, এবং নৈশ সমীরণে কেতকী, রজনীগন্ধা ও কামিনীর গন্ধ দিকে দিকে ভাসিয়া যাইতেছিল,—উৎসবমুখর পল্লী-প্রকৃতি ক্ষুদ্র মানবের সুখদুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন।

পুঁটু অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চক্ষু মুদিতে পারিল না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চক্ষু ফুলিয়া উঠিল। বালিকা হইলেও সে তাহার পিতামাতার দাম্পত্য কলহের অর্থ বুঝিয়াছিল; সে বুঝিল, তাহার দোষেই তাহার পিতা মনে এত বেদনা পাইয়াছেন, দুঃখিনী মাতৃহারা বালিকা ভাবিল, "মা মরিবার সময় আমাকে সঙ্গে লইয়া গেল না কেন? আর কোন দিন বাবার কাছে শুইতে আসিব না।"

কিরণশশী সে রাত্রে তাহার অঞ্চল-শয্যা ত্যাগ করিল না, রাত্রে কাহারও আহার হইল না। পুঁটু পর দিন হইতে তাহার বুড়ো দিদির জীর্ণ মলিন শয্যায় আশ্রয় লইল। পূজার আনন্দোৎসব কোথা দিয়া গেল তাহা সে বুঝিতেও পারিল না। দশমীর দিন বিসর্জ্জনের বাজনার সঙ্গে শানাই যখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিরহ-সঙ্গীত গাহিতে লাগিল, তখন সে মাটীতে লুটাইয়া কাঁদিয়া বলিল, "মাগো, তুমি কোথায় গিয়াছ, আমাকেও নিয়ে যাও।"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

নাট্য-রঙ্গ।

(১)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ:—

অনুগত শ্যেন (মিঃ সেন?)—নবীন 'মাসিক' সম্পাদক।

অসমান খান—পুরাতন ঐ

অয়সকান্তি—নামজাদা লেখক।

স্থান—নবীন সম্পাদকের কার্য্যালয়।

অয়সকান্তি স্বীয় প্রবন্ধের প্রুফ-সংশোধনে ও মধ্যে মধ্যে নবীন সম্পাদককে উপদেশ প্রদানে রত। পার্শ্বে সসঙ্কোচে উপবিষ্ট—লেখকের মুখের প্রতি সাগ্রহ-নিবদ্ধ-দৃষ্টি নবীন সম্পাদক।

সহসা প্রকোষ্ঠে তৃতীয় ব্যক্তির ছায়া পড়িল। ক্রোধকম্পিত স্বরে আগন্তুক কহিল—

"অয়সকান্তি, এ উত্তম!"

উভয়ে মুখ তুলিল—দেখিল স্বয়ং অসমান খান।

অসমান খান তাঁহার মাসিকের জনৈক লেখকের নিকট সবিশেষ অবগত হইয়া অয়সকান্তির সন্ধানে আসিয়াছিল। অনুগত শ্যেন অসমানের সে ব্যঙ্গোক্তিতে অয়সের অপমানাশঙ্কায় ত্রস্তে চেয়ার ছাড়িয়া উভয়ের মধ্যে আসিবার চেষ্টা করিল। অয়সকান্তি আরক্ত মুখে অথচ স্থির স্বরে উত্তর করিল—

"কি উত্তম, অসমান?"

"আমার মাসিকের জন্য প্রদত্ত সমালোচনার পুস্তক লইয়া অপর মাসিকে সমা-

লোচনা লেখা—এ উত্তম। আমার কার্য্যালয় ছাড়িয়া এ অফিস গৃহে তোমার অধিষ্ঠান—এ উত্তম।”

অয়স কহিল—“এই পত্রিকার সহিত সম্বন্ধ রাখা, ইহার জন্য কার্য্য করা এখন আমার ইচ্ছা। আমার কর্ম্ম উত্তম কি অধম, সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই।”

অসমান বিস্মিত হইল; বিস্মিতের অধিক ক্রুদ্ধ হইল, কহিল—

“প্রয়োজন আছে কি না আছে, কাল প্রাতে দৈনিক পত্রের স্তম্ভে দেখিবে।”

অয়স পূর্ব্ববৎ কহিল—“যখন literary tribunal আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তখন তাহার উত্তর দিব। তোমার চিন্তা নাই।”

অসমান পূর্ব্ববৎ ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—

“আর যদি আমিই জিজ্ঞাসা করি?”

অয়সকান্তি প্রুফ দর্শন হইতে বিরত হইল, গেলি প্রুফের কাগজগুলি বামহস্তে ধরিয়া স্থির দৃষ্টিতে অসমানের প্রতি নিরীক্ষণ করিল; সুবর্ণমণ্ডিত ফ্রেমযুক্ত চশমার মধ্য হইতে তাঁহার মার্জ্জার-বিনিন্দিত নয়ন কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিতায়ন হইয়া দীপ্ত হইয়া উঠিল, পমেটম-মর্দ্দিত সযত্ন-কেয়ারী-কৃত অলকাবলীর সহিত শিরোদেশ হঠাৎ এক দিকে হেলিল, অতি পরিষ্কার স্বরে অয়স কহিল—

“অসমান, যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমার উত্তর এই—এখন এই সম্পাদকই আমার আদরের পাত্র।”

যদি তন্মুহূর্ত্তে কক্ষ মধ্যে বজ্রপতন হইত, তবে অসমান অধিকতর চমকিত হইতে পারিত না। সে স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

অয়স পুনরপি কহিল—

“শুন, অসমান, আবার বলি, এই সম্পাদক আমার প্রিয়তম—আমার সর্ব্বস্ব। যাবজ্জীবন আমি ইহারই মাসিকের সেবায় নিযুক্ত থাকিব। আমার হৃদয়ে আর অন্য মাসিকের স্থান নাই। কালই যদি নববিধানের চক্রে ইহার অস্তিত্ব চূর্ণ হইয়া যায়, তথাপি দেখিবে, অন্তকাল পর্য্যন্ত ইহারই স্মৃতি আমার হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। এমন কি, এই মুহূর্ত্তের পর যদি ঘটনাবশে ইহার সহিত আমার প্রকাশ্য সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে হয়, তথাপি আমি প্রচ্ছন্ন নামে ইহারই সহায়তা করিব। আরও শুন—মনে করিতে পার, এতক্ষণ কি বলিতে-ছিলাম? আমি তোমার লেখক ভাঙাইয়া পারি, গ্রাহক ভাঙাইয়া পারি, বিজ্ঞাপনদাতা ভাঙাইয়া পারি, তোমার গ্রাহকের লিষ্ট supply করিয়া পারি, যদি সম্ভব হয়, প্রেস ভাঙাইয়া পারি, এবং প্রয়োজন হইলে সাধারণের মন ভাঙাইয়া পারি, ইহাকে তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসনে তুলিব। কতকটা লোকনিন্দা-ভয়, কতকটা অভিজ্ঞ-তার অভাব, এই নবীন ব্রতীকে এখনও পশ্চাৎপদ রাখিয়াছে। নতুবা দেখিতে, সত্বরেই তোমার কাগজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত-প্রায় হইত।”

তার পর গম্ভীরস্বরে অয়সকান্তি পুনরপি কহিল “অসমান, এ সকল কথা বলিয়া ক্লেশ দিলাম, অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি আমার অনেক লেখা প্রকাশ করিয়াছ; তুমি আমার যশের প্রথম উত্তরসাধক। তোমায় রূঢ় কথা বলা আমার অনুচিত।

কিন্তু ইদানিং নানা রূপে তুমি আমায় বড়ই জ্বালাইয়াছ। চিরদিন তোমার মুরুব্বিয়ানা আর ভাল লাগে না। তুমি আমায় অস্থির-চিত্ত ভাবিয়া আমায় কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেছিলে। কিন্তু আমি যাই হই, অস্থিরচিত্ত নহি; আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই 'এই পত্রে ভিড়িয়াছি।' অয়স-কান্তি যাহা করে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে। আজ তোমাকে এ কথা বলিলাম, কাল সাহিত্য-সমাজে এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিব।"

পরে অনুগতের প্রতি ফিরিয়া বলিল—"অনুগত তুমিও আমায় ক্ষমা কর। আজিকার আমার এ আচরণে তোমার অনিষ্ট হইতে পারে. কিন্তু অসমান আজ আমায় এরূপ উত্তেজিত না করিলে, এ গূঢ়তম কথা কখনও কাহারও নিকট প্রকাশ পাইত না।"

ক্ষণেক থামিয়া অয়সকান্তি পুনরায় কহিতে লাগিল—

"অসমান, আবার বলি, যদি দোষ করিয়া থাকি, দোষ মার্জ্জনা করিও। আমি তোমার পূর্ব্বের সেই স্নেহের লেখক। পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া সে স্নেহের লাঘব করিও না। এখন আমি ইঁহার স্তবে স্তুতিতে নির্ব্বিচার প্রশংসা প্রচারে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছি। আমি উচ্চ আশার তাড়নায় যশের স্বর্ণলঙ্কায় উপনীত হইবার কামনায় সমুদ্র অতিক্রমে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি আমার পূর্ব্ব প্রীতিতে নিরাশ হইয়াও বিশেষ বুদ্ধির প্রণোদনে প্রতিকূল সমালোচনায়ুধ নিক্ষেপে আমায় অপমান-সলিলে ডুবাইও না।

এই বলিয়া অসমানের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া অয়সকান্তি পুনবার প্রুফ দেখিতে বসিয়া গেলেন। ইদানিং অয়সকান্তির ব্যবহারে অসমানের মনে সন্দেহের উদয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু এতটা যে গড়াইয়াছে অসমান তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। নিরাশা-দগ্ধ অসমান কিয়ৎক্ষণ বিহ্বলের ন্যায় বিনা বাক্যে থাকিয়া নবীন সম্পাদকের প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। নবীন সম্পা-দক বুঝিলেন সে কটাক্ষ যেন বলিতেছে "এ পৃথিবীর মধ্যে অয়সের প্রীতি-আকাঙ্ক্ষী দুই সম্পাদকের স্থান হয় না!"

অনুগতের স্নেহদৃষ্টি যেন প্রকাশ করিল আমি অয়সকান্তিকে একচেটে করিবার অভিলাষী নহি। কিন্তু তাহাতেও অসমানের রুদ্রমূর্ত্তি শান্তভাব ধারণ করিল না। বক্রদৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে অসমান সে স্থান ত্যাগ করিল। নবীন সম্পাদক বুঝিল ভাবী মসীযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ইতি উদ্যোগ পর্ব্ব।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

গত দুই মাসে পরিষদের চিত্রশালায় আবার কতকগুলি কৌতূহলবর্দ্ধক দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে। (১) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধাচার্য্য-

গণের ব্যবহৃত একটি তাম্রমুকুট ও একটি ঘণ্টা উপহার দিয়াছেন। মুকুটের সম্মুখ ভাগে কতকগুলি বুদ্ধমূর্ত্তি বিশিষ্ট ধাতুময় চূড়া আছে এবং পশ্চাদ্দিকে একটি খোদিত লিপি আছে। ঘণ্টাটির গাত্রে যোগীগণের ব্যবহৃত বজ্রচিহ্ন যুক্ত। (২) শ্রীযুক্ত নৃপতিনাথ ত্রিবেদী মহাশয় একটি বৃহৎ বিষ্ণুমূর্ত্তি উপহার দিয়াছেন, এটিও পূর্ব্বসংগৃহীত বিষ্ণুমূর্ত্তিগুলিরই সমাকৃতি। (৩) শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভূষণার রাজা সীতারাম রায়ের কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ হইতে কয়েকখানি কারুকার্য্য-বিশিষ্ট ইষ্টক (৪) শ্রীযুক্ত জানকীনাথ গুপ্ত মহাশয় নশীপুরের এক প্রাচীন মন্দিরের কারুকার্য্যবিশিষ্ট ইষ্টক এবং শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কামাখ্যা-মন্দিরের কারুকার্য্যবিশিষ্ট ইষ্টক উপহার দিয়াছেন। (৫) শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সিংহ মহাশয় বিষ্ণুপুরের রাজ-কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ হইতে কারুকার্য্যবিশিষ্ট ইষ্টক, কামানের গোলা এবং সাঁজোয়া (বর্ম্ম) উপহার দিয়াছেন। (৬) শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর একটি শেরশাহের স্বর্ণমুদ্রা ও একটি আকবরশাহের স্বর্ণমুদ্রা ক্রয় করিয়া দিয়াছেন। আকবরী মোহরটি টাঁড়া নগরের টাঁকশাল হইতে মুদ্রিত। রাজা টোডরমল যখন বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা হন, তখন টাঁড়ায় (রাজমহলের নিকট) টাঁকশাল হয়। এই টাঁকশালের মুদ্রা প্রায় পাওয়া যায় না। পরিষদের পুস্তকালয়ে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গলার আদিনাটক "ভদ্রার্জ্জুন" ও আদিনাটক বলিয়া ভ্রান্ত প্রসিদ্ধিবিশিষ্ট পুস্তিকা "প্রেম-নাটক" সংগৃহীত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যত গুলি মুদ্রিত নাটকের নাম জানিতে পারা গিয়াছে তন্মধ্যে তারাচরণ শিকদার প্রণীত এই 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। উহা ১৭৭৪ শকাব্দে (১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে, ১২৫৯ সালে) কলিকাতার চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত। ৺রামনারায়ণ তর্করত্নের-"কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কর যন্ত্রে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। 'প্রেম-নাটক' পুস্তিকা ১২৬৯ সালে মুদ্রিত-গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগে স্থির হইয়াছে—কাঁঠালপাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগৃহীত চণ্ডীদাসের পদাবলী (পাঁচশতাধিক) প্রকাশিত হইবে।

গয়াড় তুঙ্গদেবের তাম্রশাসন।

এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী, এম্-এ মহাশয় এক খানি নূতন তাম্রশাসনের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। নীলমণি বাবু বলেন,—এই শাসনখানি সোসাইটির হাতে অনেক দিন উপেক্ষিত ভাবে পড়িয়া ছিল। উহা কোথা হইতে, কবে, কে, কিরূপে সংগ্রহ করিয়াছিলেন কার্য্য বিবরণের কোথাও তাহা দেখা যায় না।

শাসনখানির আকার আয়তন ৬ইঃ × ৫ইঃ। ইহার মাথার উপর ডিম্বাকৃতি একটি পিতলের রাজমুদ্রা লাগান আছে। এই মুদ্রায় একটি বৃক্ষতলে একটি বৃষ-মূর্ত্তি আছে, ইহাই ইহার লাঞ্ছন। ইহার ঊর্দ্ধে রাজনাম "শ্রীগয়াড়তুঙ্গদেবস্য" এইরূপে খোদিত আছে। রাজনামের ঊর্দ্ধে অর্দ্ধচন্দ্র ও বৃত্তাকার চিহ্ন খোদিত আছে। অর্দ্ধচন্দ্রটি

চন্দ্রের ও বৃত্তাকার চিহ্নটি সূর্য্যের উদ্দেশ্যে খোদিত। শাসনখানির উভয় পৃষ্ঠাতেই লিপি খোদিত আছে। অক্ষরগুলি গভীর করিয়া খোদিত। অবস্থা ভালই আছে।

অক্ষরের আকার দেখিয়া ইহাকে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বলিতে পারা যায়। শাসনখানি ভূমিদানের দলিল। তুঙ্গবংশীয় রাজা গয়াড় তুঙ্গদেব এই দানের কর্ত্তা। তিনি রোহিত গিরিবাসী ও শাণ্ডিল্য-গোত্রীয়। রোহিতগিরি বর্ত্তমান শাহাবাদ জেলার রোটাসগড়। এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকার ৪র্থ ভাগের ৩১১ পৃষ্ঠার এই রোটাসগড়ে ১২৭৯ সম্বন্ধে "প্রতাপ" নামে কোন রাজা ছিলেন জানা যায়। তাঁহার সঙ্গে এই তুঙ্গ বংশীয়দিগের কোন সংস্রব ছিল কি না তাহা এখনও জানা নাই। গয়াড়তুঙ্গ এই শাসনে আপনাকে "পরম মাহেশ্বর" অর্থাৎ বিশিষ্ট শৈব বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, রাজ-মুদ্রার বৃষলাঞ্ছন হইতেও বুঝা যায়। শাসনের একস্থানে তাঁহাকে কেবল মাত্র মণ্ডলেশ্বর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার আবিষ্কৃত মণ্ডলের নাম যমগর্ত্তমণ্ডল। বংশাবলী হিসাবে ইহাতে যে কয়টি নাম পাওয়া যায় তাঁহাদের মধ্যে সম্পর্কসূত্র বিশেষ স্পষ্ট করিয়া লেখা নাই। বাণার্য্য-শক্র, জগতুঙ্গ ও সলানতুঙ্গ এই তিনটি মাত্র নাম পাওয়া গিয়াছে। নীলমণি বাবুর অনুমান গয়াড়তুঙ্গ এই শেষোক্তের পুত্র। যমগর্ত্তমণ্ডলে বেন্দুঙ্গ বিষয়ে তোরো গ্রামখানি তিনি বিভিন্নগোত্রীয় একাদশ জন ব্রাহ্মণকে নানামত অংশে ভাগ করিয়া দিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণেরা অহিচ্ছত্র হইতে আসিয়া ওড্র বিষয়ে "কুরুবাভত" গ্রামে বাস করিয়া-ছিলেন। এই শাসনে 'মাল' শব্দের অর্থ লইয়া নীলমণি বাবু একটু তর্ক করিয়া স্থির করিয়াছেন যে দর্শনযোগ্য উচ্চভূমির নাম মাল ভূমি। চলিত কথায় মালের জমী অর্থে যে জমীর খাজনা দিতে হয়। শাসন-খানিতে তারিখ নাই।

নীলকণ্ঠ।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ষোড়শীর কাজ বাড়িয়াছে। আজ কাল তাহাকে প্রত্যহই বাবুদের বাটী যাতায়াত করিতে হয়, প্রাতে মন্মথের জননী গঙ্গা-স্নানের পথে ষোড়শীকে লইয়া আসেন, রাত্রিতে আবার ঝি এবং দ্বারবান তাহাকে গৃহে রাখিয়া যায়। ষোড়শী অতি প্রত্যুষে উঠিয়া গৃহদেবতার পূজার ব্যবস্থা করিয়া রাখে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাবুদের বাটীর 'বামুন ঠাক্রুণ' আসিয়া 'শীতলের' আয়োজন করিয়া দেন। পুরোহিতকে সুতরাং কোন্ প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। যা কিছু অসুবিধা রামির, তাহাকে রাঁধিয়া খাইতে হয়, সে ইচ্ছা করিলে বাবুদের বাটীতে খাইতে পারে, সে প্রস্তাব হইয়াও ছিল, কিন্তু ষোড়শীর ব্যবস্থায় এইরূপই চলিতেছে। রামির কষ্টের উপর কষ্ট তাহাকে এখন প্রায় বাবুদের বাটীতে ছুটা-

ছুটি করিতে হয়—ষোড়শী ঠাকুরুণ ত দিব্বি গাড়ী চাপিয়া যাতায়াত করেন, তিনি ত আর হাঁটাহাঁটির কষ্ট বুঝেন না, তাই কথায় কথায়—ডাক্ রামিকে! এ কষ্টেও একটু সুখ ছিল—রামি দেখিত বাবুদের বাড়ীর গিন্নিই ত এখন তাহার মুনিব ঠাকুরুণ! ষোড়শী যাহাকে হাতে তুলিয়া দেয় সে পায়, যাহাকে না দেয়, সে পায় না। বৌ সরলা ত ষোড়শীর পিছু পিছু ফেরে—যার ধন তার ধন নয়,—কিন্তু ইহাতে রামির বড় সুখ, কে জানে কেন, সরলার প্রতি সে বিদ্বেষবতী। মন্মথ যে দিন বলিয়াছিল—'ঝির সাক্ষাতে এত লজ্জা কেন', সেই দিন সরলার ব্যবহারে, জানি না রামি কি দেখিয়াছিল, সেই দিন হইতে রামি সরলার উপর হাড়ে চটা। সরলার কোনরূপ অনিষ্ট হইলে রামি যেন তাহাতে আনন্দ অনুভব করে। আজ সরলার গৃহে ষোড়শীর এতটা আদর দেখিয়া রামি মনে মনে একটা ভবিষ্যৎ কল্পনা করিয়া লইল; সে যেন স্পষ্ট দেখিল—সরলার সুখের দিন ফুরাইয়া আসিতেছে।—'তোমারে মারিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।' থাক, থাক, আর বেশী দিন নয়! সুখের বৃন্দাবন হবে দুখময়।

গৃহিণীও এখন ষোড়শীর মুঠার মধ্যে। সত্যই ষোড়শীর গৃহিণীপণা অনন্যসাধারণ। গৃহিণী হইতে বাড়ীর ঝি-চাকর সকলেই তাহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট—অসন্তুষ্ট কেবল ভাঁড়ারি এবং পাচক। এতদিন—'সেই ধান সেই চাল, কিন্তু গিন্নি বিনে আলথাল' ছিল। ভাঁড়ারে দ্রব্যের অভাব নাই, খরচেরও ত্রুটী নাই, কিন্তু হয় ত দাসদাসীর আহারের সময় ব্যঞ্জনের অভাব; হয় ত অনেকের খাওয়াই হয় না। এমন এক দিন নয়, দুই দিন নয়, মাঝে মাঝে প্রায়ই ঘটিত। গৃহিণী ইহার কোনই কূলকিনারা করিতে পারিতেন না। তিনি যাহাদের আহার হইত না, শেষে তাহাদের পয়সা ধরিয়া দিতেন। তাহাতে খরচও হইত, অথচ নিন্দা ঘুচিত না। ষোড়শী দু'এক দিন এরূপ অব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিল না। তাহার পর একদিন ধীরে ধীরে 'গিন্নিমা'র নিকট জানাইল—'খরচ সেই সবই হয়, কেবল দেখার অভাবে এতটা বিশৃঙ্খল হইতেছে।' গৃহিণী দুরের গন্ধা নিকটে পাইলেন, বলিলেন—'মা, আমি তা বুঝি, কিন্তু কে দেখে?' বাস্তবিকই দেখিবার লোকের বড় অভাব। গৃহিণী পূজা-অর্চ্চনা যোগধ্যান লইয়াই দিনের অধিকাংশ সময় ব্যস্ত। মধ্যাহ্নে আহারান্তে যে একটু সময় পান তাহা মহাভারত শুনিতেই কাটিয়া যায়—সে সময় চালডালের কথা ভাল লাগে না। সরলা 'বৌ মানুষ', বিশেষতঃ ছেলে মানুষ; এ গৃহিণীপণা তার কাজ নয়, বিশেষত সে শিক্ষা তার নাই। ষোড়শী বাল্যকালে তাহার মাতুলাশ্রয়ে থাকিত। কুলীনকুমারীদের আশ্রয়ই সেই। মাতুল বেশ অবস্থাপন্ন, দুই বেলা অনেকগুলি পাত সে বাড়ীতে পড়ে। মাতামহী পাকা গৃহিণী। ষোড়শী বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত মাতুলাশ্রয়ে লালিতাপালিতা। সেই গৃহে সুনিপুণা গৃহিণী মাতামহীর আদর্শে শিক্ষিতা, কাজেই

ষোড়শী গৃহকার্য্যে সুদক্ষা। যে খেলোয়াড়, সে খেলায় কাঁচা চাল দেখিলে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না; হোক্ না কেন গুরুজন, চালে তাঁহার ভুল হইলে, তখনি তাহা ধরিয়া দিবার জন্য হৃদয়ে একটা চাঞ্চল্য অনুভব করে। যদি বা অন্য চালে চুপ করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু যখন 'মাৎ' হইবার সম্ভাবনা তখন সে চুপ করিয়া থাকিতেই পারে না। ষোড়শী যখন দেখিল, সে সোনার সংসার গৃহিণীপণার অভাবে মাটি হইতে বসিয়াছে, গৃহে বাহিরে সর্ব্বত্র নিন্দা রটিতেছে, তখন আর সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; গৃহিণী কি মনে করিবেন না ভাবিয়া, সাংসারিক বিশৃঙ্খলার কথা তাঁহাকে বলিয়াছিল। গৃহিণী লোক বড় ভাল, বড় সাদাসিদে, সাধারণ লোকের ন্যায় একবার রাগ করা দূরে থাক্ ষোড়শী যে তাঁহার ব্যথার ব্যথী ইহা বুঝিয়া মনে মনে বড়ই আহ্লাদিত হইলেন, বলিলেন,—'মা এ সব ভার তোমার, তুমি বৌমাকে শিখাইয়া লও।'

ষোড়শী তখন সরলাকে সহকারিণী লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে অন্নপূর্ণার আবির্ভাব হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সরলা প্রাণপণে ষোড়শীর সাহায্য করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম কিন্তু তাহার প্রাণ পড়িয়া ছিল অন্যত্র। সে কাজ করিতে করিতে অন্যমনস্ক হইত। ষোড়শী ইহা বুঝিল। হাসিয়া বলিল "এখন আমি গুরুমহাশয়, আমার পাঠই পড়িতে হইবে, অন্য পাঠ ভুলিয়া যাও।" মুখে ইহা বলিল কিন্তু সরলার মনের কথা সে বুঝিল। ভালবাসার কি যন্ত্রণা ষোড়শী তাহা জানিত, ভালবাসিয়া কি সুখ তাহা সে বুঝিত, তাই সে সরলার যাহাতে দুই দিক রক্ষা হয় সেই ব্যবস্থা করিল। সরলাকে বলিল কাল হইতে তোমার টিফিনের ছুটি বাড়াইয়া দিব। মন্মথ যখন অন্দর মহলে আসিত ষোড়শী সময় বুঝিয়া ঠিক সেই সময় সরলাকে ছাড়িয়া দিত। সরলা আপনার দৌর্ব্বল্য ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া মনে মনে কিছু লজ্জিত হইল। কিন্তু এ ব্যবস্থায় অসুখী হইল না। ষোড়শীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা বাড়িয়াই গেল।

ষোড়শী কেবল গৃহিণীপণাতেই নিপুণা নহে, রন্ধনেতে সে সিদ্ধহস্তা। সে একদিন সাধ করিয়া রাঁধিবার ভার লইল। সে দিন ষোড়শী মনের মতন করিয়া নানাবিধ ব্যঞ্জন পায়স পিষ্টক প্রস্তুত করিল।

মন্মথের আহারের সময় সে সরলাকে সঙ্গে করিয়া সেখানে দাঁড়াইল। অনেকে বলেন আহারের সময় কেহ কাছে থাকিলে আহারে কেমন বাধ বাধ ঠেকে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে ইহা খাটে না; আর, কাহার কিরূপ হয় বলিতে পারি না, কিন্তু আজ সম্মুখে সরলা ও ষোড়শীকে দেখিয়া মন্মথ আহার্য্যের ওজন ঠিক রাখিতে পারিল না। আমরা সত্য কথা বলিব মন্মথ ভোজন করিয়া এমন তৃপ্তি আর কখনও পায় নাই।

বহুদিন পূর্ব্বে একদিন নীলকণ্ঠের সহিত একত্রে ষোড়শীর স্বহস্ত প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন মন্মথ আহার করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে দিন

ত এত সুস্বাদু মনে হয় নাই। সে সঙ্গগুণে কি অন্য কারণে ঠিক বলা যায় না। কিন্তু আজ ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনে যেন সুধা ক্ষরিতেছিল। মন্মথ আহার-অন্তে পরিহাসচ্ছলে বলিল 'রাঙ্গাদিদি আজ বুঝিলাম কি গুণে দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবকে এত মুগ্ধ রাখিয়াছিলেন। কি গুণে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখা হইয়াছিলেন। আমার বোধ হয় দ্রৌপদী যদি তোমার মতন রাঁধিতে পারিত, তবে কুরুপাণ্ডব উভয় পক্ষই দ্রৌপদীর গোলাম হইত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আর হইত না।' ষোড়শী যেন পরিহাস না বুঝিয়াই চাপা রহস্যে বলিল 'রান্নায় নুন বেশী হইয়াছে কি?' মন্মথ বলিল 'না, সে কথা বলিলে যে আমার নিমকহারামী হয়। সত্যই আজ খাওয়াটা বড় বেশী রকম হইয়াছে, ভয় হইয়াছে পাছে আপনার এত সাধের পায়েস মিষ্টান্নে পেট ফাটিয়া বাহির হইয়া যায়। ষোড়শী গম্ভীর ভাবে বলিল 'মাথা ফাটিয়া না বাহির হইলেই বাঁচি'। এতক্ষণ সরলা নীরবে এ রহস্যালাপ শুনিতেছিল এবার সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মন্মথ কিছু অপ্রতিভ হইল, সে ষোড়শীকে মহাভারতের ফাঁদে ফেলিতে গিয়া নিজে কৃত্তিবাসের ফাঁদে পড়িল।

সরলা একটু অন্যমনস্ক ছিল। ষোড়শী পুণ্যবতী, সে তার রন্ধন গুণে এমনি করিয়া তাহার স্বামীকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে, আজ সে আমার স্বামীকেও কত তৃপ্তি দিয়াছে, আর আমি ছি ছি! আমি আমার স্বামীকে এ ভোজন-সুখ হইতে এতদিন বঞ্চিত রাখিয়াছি। একদিনও তাহাকে এ সুখে সুখী করিতে পারিলাম না।

ষোড়শীও ভাবিতে লাগিল, সত্যই কি আমার রান্না মন্মথের এত ভাল লাগিয়াছে?

সহসা ষোড়শীর ভাবান্তর ঘটিল। প্রবাসে কে তাঁহার স্বামীকে যত্ন করিতেছে, রাঁধিয়া দিতেছে? আবার কতদিনে ষোড়শী তাঁহাকে রন্ধন করাইয়া আহার করাইতে পারিবে। তাহার রন্ধন কি কাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে? মন্মথের এ মিছা কথা। ছাই রান্না।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

সমালোচনা।

নবদ্বীপ-পরিক্রমা (প্রথমাংশ) —বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। পরিষদ এই পুরাতন পুস্তকের প্রকাশ করিয়া নবদ্বীপের ইতিহাস রচনার একটা উপকরণ রক্ষা করিলেন। পরিষদের গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ঠিক বলিয়াছেন—"নবদ্বীপ অতীত বঙ্গের প্রধান গৌরবকেন্দ্র।"—ইহার পুরাতত্ত্ব উদ্ধার একান্ত প্রয়োজনীয়। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, দ্বিতীয় খণ্ডের বিস্তৃত ভূমিকায় নবদ্বীপের পুরাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব ও ধারাবাহিক ইতিহাস প্রকাশ করিবেন। আমরা আগ্রহের সহিত দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের অপেক্ষায় রহিলাম।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

দশম বর্ষ।] অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ [৮ম সংখ্যা।

বঙ্গদর্শন

(নব পর্য্যায়)

মাসিক পত্র।

কলিকাতা,

২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

মজুমদার লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত।

হিন্দুস্থান সমবায় বিমামণ্ডলী লিমিটেড্।

প্রধান কার্য্যালয়—৩০ নং ড্যালহাউসি স্কোয়ার (দক্ষিণ), কলিকাতা।

মঞ্জুরী মূলধন—এক কোটী টাকা একশত টাকার একলক্ষ অংশে বিভক্ত।

প্রত্যেক অংশের জন্য বার্ষিক মাত্র ৫৲ টাকা তলব অনুসারে দেয়।

অংশের ১০ তলব যথাক্রমে শোধ করিলে আর ১৫ বৎসর অন্তে বা পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে মৃত্যুর প্রমাণ মাত্র অংশের পরিমাণ টাকা বিমারূপে পাওয়া যায় এজন্য পৃথক্ পণ দিতে হয় না। অংশও সম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত সুলভ পণে এবং বহুবিধ সুবিধাজনক সর্ত্তে সকলপ্রকার বিমার কার্য্য করা হয়। স্ত্রীলোকেও সমান হারে সমান সর্ত্তে বিমা করিতে পারেন। বিমার মেয়াদ পূর্ণ হওয়া মাত্র বা বিমাকারীর মৃত্যু হইলে মৃত্যুর প্রমাণ পাওয়া মাত্রেই টাকা বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। বিমাকারীর ওয়ারিশ নিঃসহায় স্ত্রীলোকের নাবালক হইলে মৃত্যুর প্রমাণ সংগ্রহ ও আইন ঘটিত তদ্বির মণ্ডলী স্বয়ং করিয়া থাকেন কখনও পণ চালাইতে অসমর্থ হইলেও মণ্ডলীর খরচ বাদে প্রদত্ত টাকা সুদ সমেত ফেরত পাওয়া যায়। সকল রকম বিমাতেই লাভের অংশ দেওয়া হইয়া থাকে।

ভূসম্পত্তিতে টাকা খাটাইয়া দ্বিতীয় বর্ষের প্রারম্ভ হইতে অল্প সময়ের মধ্যে শতকরা ১৫৲ টাকার অধিক লাভ পাওয়া গিয়াছে। প্রথম বর্ষে শতকরা ৭৲ টাকা ডিভিডেণ্ড বণ্টন করা হইয়াছিল—দ্বিতীয় বর্ষে শতকরা ৯৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। প্রথম দুই বৎসরেই ৫১ লক্ষ টাকার অধিক বিমার কার্য্য পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে মাসিক ৬।৭ লক্ষ টাকার কাজ পাওয়া যাইতেছে।

সর্ব্বত্র সম্ভ্রান্ত ও দক্ষ এজেণ্ট আবশ্যক। এজেণ্টগণকে উচ্চতম হারে কমিশন দেওয়া হইয়া থাকে। তাঁহারা সংগৃহীত কার্য্যের উপর, কার্য্যত্যাগ করিলেও এমন কি পুরুষানুক্রমে কমিশন পাইয়া থাকেন। স্থানে স্থানে এজেণ্ট মনোনয়নের ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রধান এজেণ্ট আছেন। এজেন্সি প্রার্থিগণ তাঁহাদের কাছও মন্তব্য সহ আবেদন করিবেন। পত্র লিখিলে নিয়মাবলী ইত্যাদি পাঠান হয়।

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি, এ,

জমিদার, কলিকাতা।

ধনাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী,

জমিদার, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

শারদীয় পূজার আয়োজন

বৎসরান্তে আবার সেই চির মধুর আনন্দ সম্মিলন। চিরপ্রবাসী বৎসরান্তে গৃহাভিমুখে ছুটিয়াছেন। গৃহলক্ষ্মীগণ আনন্দে আত্মহারা—নূতন নূতন বসন ভূষণ হইবে। আপনি যদি বিনা পানে স্বর্ণের গহনা ক্রয় করিয়া পয়সা বাঁচাইতে চান—যদি মনের মতন নূতন নূতন ডিজাইনের অলঙ্কার ব্যবহার করিতে চান—সময় নষ্ট না করিয়া আমাদের কারমে একবার পদধূলি দিউন। মফস্বলবাসী সত্বর পত্র লিখুন আর সময় নাই। নূতন ধরণ—নূতন গঠন—নূতন ফ্যাসন—সব নূতন। রং পালিস কারুকার্য্য দেখিলে আত্মহারা হইবেন। অর্ডার জিনিষ ৩ দিনে প্রস্তুত করিয়া দিই।

রূপার উপর গিনির পাত মোরা **স্বর্ণের শাঁখা** বিন্দুমাত্র পান নাই।

অর্ডার দিলে নানাবিধ "মটো" শাঁখার উপর লিখিয়া থাকি।

প্লেন শাখার মূল্য ১৪৲, নাম লেখাইযুক্ত হইলে ১৯৲ হইতে ২৪৲।

অভিনব আবিষ্কার।

শাঁখা বঙ্গ-ললনার সোহাগের সামগ্রী বাজারে সেকরারা শাঁখা প্রস্তুত করে বটে কিন্তু ইহার কৌশল সম্পূর্ণ নূতন। কেন যে ইহা ঘরে ঘরে সমাদৃত তাহা ১ জোড়া ব্যবহার না করিলে বুঝিতে পারিবেন না।

বিন্দুমাত্র পান নাই। **জাপানী মাকড়ী** বিনা পানের গহনা।

ল্য ১৪৲ হইতে ২২৲

এই মাকড়ী আমরা প্রথমে ভারতে আবিষ্কার করিলাম। ইহা আমাদের নিজস্ব। পার্শী ও ইহুদী ইহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। চকচকে পালিস—নয়ন ঝলসিয়া যাইবে।

পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার।

স্থানাভাবে আমাদের গহনার মূল্যাদি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। পত্র লিখিয়া আমাদের সচিত্র জুয়েলারী ক্যাটলগ লউন।

হাতির দাঁতের শাখার উপর গিনি সোণার পাত মোড়া শাখা এক জোড়া ১৪৲ টাকা

ইহুদি ও পার্সি মাকড়ি

হাই পালিস দেখিলে আত্মহারা হইবেন গিনি স্বর্ণের পার্সি মাকড়ি ১ জোরা ১৫৲ টাকা হইতে ২২৲ টাকা। ইহুদি মাকড়ি (গিনির) ১ জোরা ১৯৲ হইতে ২৫৲ টাকা।

মণিলাল এণ্ড কোং

জুয়েলার এবং গোল্ড স্মিথ—৪০নং গরাণহাটা, কলিকাতা।

অগ্রহায়ণ] [৭ম সংখ্যা।

বঙ্গদর্শন।

(নব পর্য্যায়)

নবম বর্ষ।

—— :০——

এস মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৭।

মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য পুস্তক।

২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—সিরাজদ্দৌলা (৩য় সংস্করণ) ২৲, মিরকাশিম ১৷৷০।

স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার—বিশ্বনাথ ১৷০, ফুলজানি ১৷০, কৃতজ্ঞতা: ৷৹০।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কাব্যগ্রন্থাবলী ৯৲, কাহিনী ১৲, কল্পনা ১৲, গল্পগুচ্ছ (আর্ট পেপারে মুদ্রিত) ২ ভাগ ৫৲, কণিকা ৷৷০, ক্ষণিকা ১০, নব প্রকাশিত গোরা ২০, গান ২৲। গদ্যগ্রন্থাবলী ১০৲, পদরত্নাবলী বৈষ্ণব কবিতার সংগ্রহ) ৷৷৴০।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—বৌদ্ধধর্ম্ম (পেপার) ১৷৷০, ঐ বাঁধাই ২৲।

শ্রীযুক্ত শশধর রায়—রাঘববিষয় কাব্য ১৷৷০, ত্রিদিব বিজয় কাব্য ২৲, বঙ্গদর্পণ ৷০, উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী৷০, ভাষা আদিরস ও পরবশতা ৷৹০, বাঁধাই ১৲, শান্তিশতক ৷৴০।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—দেশী ও বিলাতী ১৷৹০, রমাসুন্দরী ১৷০, ষোড়শী ১৷৷০, (বাঁধাই) ১৷৹০, অভিশাপ ৵০।

কবি ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—যোগেশ (কাব্য) ১৲।

শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার—ইন্দু (২য় সংস্করণ) ৷৷৴০, চিত্র-বিচিত্র ১৷০।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদ কাহিনী (তৃতীয় সংস্করণ) ২৷৷০, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ২৷৷০, প্রতাপাদিত্যের জীবনী ২৷৷০, ইতিকথা ১৷৷০।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী—দক্ষিণা পথ ভ্রমণ ১৷০, শঙ্করাচার্য্য ১৷০, রামানুজ চরিত ১৷৷০।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ—আমি ১৲, জীবন ৷৷০, প্রেম ১৷৷০, হৃদয় ও মনেরভাব ৷০।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস—পলাশবন ১৷৷০, কুমারী ২৲, সীতা ১৷০, স্বকথা ৴০।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—জিজ্ঞাসা ১৷৷০, ধর্ম্মের জয় ৵, বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা ৴০।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ—উড়িষ্যার চিত্র ১৷০, ধ্রুবতারা ১৷৷০।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—বিক্রমপুরের ইতিহাস ২৷৷০।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—জীবন যাপন ৷৷০।

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী—ভারতে অলিকসন্দর ১৷৷০, জালিয়াত ক্লাইব ৷৹০, মহারাজ প্রতাপাদিত্য ১৲।

ডাক্তার সৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত—মেলেরিয়া ৷৹০।

শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত ১৷০।

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু—লক্ষ্মী বৌ ৷৴০, লক্ষ্মীমেয়ে ৷৴০, লক্ষ্মী মা ৷৴০, সতীলক্ষ্মী ৷৷৴০।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য—কমলা ১৷৷০, কালাপাহাড় ১৷৷০, রাজা সীতারাম রায় ১৷০, সুশীলা ও সরলা ৷৷০, নির্ম্মলা ১৲, কর্ম্মবীর ৷৷০, লক্ষ্মী বৌ মা ৷৷০।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—বিদ্যাপতির পদাবলী ৫৲।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র—উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ১৲।

শ্রী৺কৃষ্ণবিহারী সেন—নববিধান কি ১৲।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সকল রকমের পুস্তক অর্ডার পাইলে অতিসত্বর ভি-পিতে পাঠান হয়। নূতন কেটেলগ প্রকাশিত হইয়াছে

বঙ্গদর্শন।

বিলাতে জাপান।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা জাপানকে অসভ্য ভাবিতাম। আর আজ, আমাদের সভ্যতার দাবি যারা সহজে স্বীকার করে না, তারাও জাপানকে আপনাদের সমকক্ষরূপে গ্রহণ করিতেছে। আজ ইংরেজের মুখে জাপানের প্রশংসা ধরে না। এক দিন জাপানের এই অভ্যুদয়ে আমরাও নিজেদেরে কতকটা শ্লাঘান্বিত ভাবিয়াছি। জাপান তো আমাদেরই। জাপান আশিয়ার সভ্যতা ও সাধনার উত্তরাধিকারী। জাপান আপনার সভ্যতা ও সাধনা চীন হইতে, ও চীন আপনার ধর্ম্ম ও দর্শন বহুল পরিমাণে ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছে। শিষ্যের গৌরবে যেমন গুরুর গৌরব, চীন ও জাপানের অভ্যুদয়ে তেমনি ভারতেরও গৌরব। দশ বারো বৎসর পূর্ব্বে আমরা অনেকে এরূপ ভাবিতাম। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে জাপান, বিধাতার আশীর্ব্বাদে, আশিয়ার হৃতগৌরবের পুনরুদ্ধার করিবে, আশিয়ার সনাতন সাধনাকে জগতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার পথটা অন্তত পরিষ্কার করিয়া দিবে।

ইংলণ্ড যে দিন জাপানের সঙ্গে সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, জাপানকে য়ুরোপীয় রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সমান আসন প্রদান করিল, সে দিন আমরা ভাবিয়াছিলাম যে বিধাতা যে উদ্দেশ্যে ইংরেজকে ভারতে আনিয়াছিলেন ভারতের শাসন-শাসিত সম্পর্কে তাহা পণ্ড হইয়া গিয়াছিল, জাপানের সখ্যতায়, বুঝি বা সে নষ্ট লক্ষ্য পুনরায় সিদ্ধ হইবে। আশিয়ার সনাতন সাধনার সঙ্গে য়ুরোপের নূতন সভ্যতার একটা সমন্বয় সাধনের পথ এত দিনে খুলিয়া গেল। জগৎকে দিতে পারে, আশিয়ার এমন অনেক অমূল্য সম্পদ-ঐশ্বর্য্য আছে। য়ুরোপ হইতে লইবার বস্তুও অনেক আছে। বিধাতা কেবল পার্থিবপণ্যের আদান-প্রদানের জন্যই য়ুরোপের সঙ্গে আশিয়ার এ নূতন সম্বন্ধ সংঘটন করান নাই। অপার্থিব, পারমার্থিক জ্ঞান ও সাধনার আদান-প্রদানের জন্যই তাঁর এ অভিনব ব্যবস্থা। কিন্তু ইংরেজ ভারতে আসিয়া রাজত্বই করিতে লাগিল, ভারতের সনাতন সাধনার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া সেই সাধনাকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিল না। আভিজাত্য ভক্তির অন্তরায়। ভাগবত বলেন, ধনী, বিদ্বান্, ব্রাহ্মণ, এঁদের কেহই ভক্তির অধিকারী নহেন। যেখানে ভক্তির সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত

হয় না, সেখানে পারমার্থিক সম্পদের আদান-প্রদানও সম্ভবে না। ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজের এ ভক্তির সম্বন্ধ, রাজৈশ্বর্য্য-সম্ভোগ নিবন্ধন, একান্ত অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে! "শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্"—এই শ্রদ্ধাই জ্ঞানলাভের সার্ব্বজনীন পন্থা। কিন্তু যে যার অধীন হইয়া পড়ে, আপনার শক্তি-সম্পদের জন্য যে যার উপরে সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতে বাধ্য হয়, তাহার প্রতি সে ব্যক্তির শ্রদ্ধার উদ্রেক হওয়া একান্ত অসাধ্য না হইলেও, নিতান্ত সহজ নয়। ফলত ইংরেজ ভারতের প্রতি আজিও সমুচিত শ্রদ্ধাবান হইতে পারে নাই। বর্ত্তমান অবস্থাধীনে কথনো যে হইতে পারিবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। এ জন্য ইংরেজ ভারতের সাচ্চা বস্তুকে আজিও ভাল করিয়া ধরিতে পারে নাই। অথচ তারই জন্য, বিধাতা তাহাকে ভারতবর্ষে আনিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের সাহায্যে যাহা সম্ভব হয় নাই, সম্ভব হইবার নহে, জাপানের সখ্যতায় তাহা সাধিত হইবে। জাপানকে শ্রদ্ধা করিতে, ভক্তি করিতে, সত্যভাবে প্রীতি করিতে শিখিয়া, ইংলণ্ড ও সমগ্র য়ুরোপ ক্রমে জাপান যে সভ্যতা ও সাধনার উত্তরাধিকারী, সেই সভ্যতা ও সাধনাকে ভক্তি করিতে শিখিবে, ও তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া, ক্রমে তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিবে, জাপানের অভিনব অভ্যুদয়ে, আমাদের অনেকের মনে এ আশার সঞ্চার হইয়াছিল। তাই আমরা জাপানের অভ্যুত্থানে এমন ভাবে আস্ফালন করিয়া উঠিয়াছিলাম।

কিন্তু ক্রমেই যেন সে আশা ও সে উৎসাহ ম্রিয়মান হইয়া পড়িতেছে। জাপান আশিয়ার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান। আশিয়ার সনাতন সাধনা, ভারতে বা চীনে যেরূপ পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে, কাজেই জাপানে সেরূপ লাভ করিতে পারে নাই। আর এই কারণেই, বোধ হয়, য়ুরোপীয় শক্তি ও সাধনার সঙ্গে সংঘর্ষে আসিয়া জাপান এক দিকে আপনার শরীরটাকে কেবল বাঁচাইয়া রাখিয়াছে নয়, বরং য়ুরোপের পথ ধরিয়া তাহাকে আরও দৃঢ়িষ্ট ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু অন্য দিকে য়ুরোপেরই মত প্রাণটাকে যেন কৃষ্ট ও ক্ষীণ করিয়া ফেলিতেছে। য়ুরোপের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়া, জাপানকে য়ুরোপের যন্ত্রতন্ত্র আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল, ইহা বুঝি। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাপানের আত্মরক্ষার আর অন্য উপায়ান্তরও ছিল না। এরূপ না করিলে, জাপানকে অপর জাতির ন্যায় য়ুরোপের দ্বারা কালে নিষ্পিষ্ট হইতে হইত। এ সকলই সত্য। আমরা একদিন ভাবিয়াছিলাম যে জাপান এ সকল যন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে যাইয়া, চিরদিনই এ সকলের উপরে প্রভুত্ব করিবে। কিন্তু মানুষ যেমন প্রভুরূপে যন্ত্রবিশেষকে পরিচালিত করিয়া আপনার কার্য্যোদ্ধার করে, সেইরূপ আবার কথনো, তার নিজের যন্ত্রতন্ত্রই তাহার উপরে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া, মানুষকে স্বকীয় লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়াও ফেলে। যাহা উপায় মাত্র ছিল, তাহা ক্রমে উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে। জাপানেরও যেন তাহাই হইতেছে। য়ুরোপের সঙ্গে

সমকক্ষতা করিবার জন্য, আপনাকে য়ুরোপের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য, জাপান য়ুরোপের যন্ত্রতন্ত্র শিখিয়াছিল। এখন আপনাকে বাঁচাইবার জন্য নহে, কারণ সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু য়ুরোপেরই মত আপনাকে গড়িয়া তুলিবার জন্য জাপান প্রাণপণ করিয়া সেই সকল যন্ত্রতন্ত্রের ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশিয়ার প্রাচীন আদর্শ সকল যে আশা বুকে লইয়া, জাপানের দিকে চাহিয়াছিল, সে আশার সফলতার সম্ভাবনা কৈ?

জাপান যে আপনাকে একেবারেই ইংরেজের বা ফরাসীদের মত করিয়া তুলিবে, বা তুলিতে পারিবে, এমন কথা বলি না। ব্যক্তিই হউক, আর জাতিই হউক, কেহই আপনাকে একেবারে আর এক ব্যক্তির বা আর এক জাতির মত, করিয়া তুলিতে পারে না। শত অনুকরণের ভিতরেও, তার ব্যক্তিত্ব বা জাতিত্ব, কতকটা থাকিবেই থাকিবে। জাপান ঠিক ইংরেজের বা ফরাসীদের চরিত্র লাভ করিবে, এমন নহে। কিন্তু জাপান, নিজের মতে, নিজের ছাঁচে য়ুরোপীয়দেরই মত হইতেছে, আসিয়ার মত আর থাকিতেছে না। আশিয়ারও য়ুরোপের মধ্যে একটা বিশেষ প্রভেদ এই যে,আশিয়ার সাধনা, ভালমন্দ, পরিণত-অপরিণত, সকলই স্বল্পবিস্তর অন্তর্মুখীন; য়ুরোপের সাধনা সেইরূপ বহির্মুখীন। এর অর্থ এই নহে যে আশিয়ার বহির্মুখীনতা নাই, বা য়ুরোপের অন্তর্মুখীনতা নাই। মানুষ সর্ব্বত্রই একটা সমগ্রবস্তু। এক মানুষে বা এক জাতিতে যাহা আছে, মূলে সকলেই এই সমগ্রের অভিব্যক্তি বলিয়া—অপর মানুষে ও অপর জাতিতেও তাহা আছে। কিন্তু প্রকাশের তারতম্যও আছে। কারো মধ্যে এই সমগ্রের এক দিক্ ফুটিয়াছে, কারো মধ্যে অপর দিক্ বা ফুটিয়াছে। কারো ঝোঁক্ এক দিকে, কারো বা অপর দিকে। য়ুরোপের ঝোঁক বাহিরে, বিষয়ে, ইদং-এর দিকে। আশিয়ার ঝোঁক অন্তরে, পরমার্থে, অহং-এর দিকে। জাপান য়ুরোপীয়ের মত হইয়া যাইতেছে বলার অর্থ এই যে জাপানের প্রাণের ঝোঁকটা ক্রমশই এই ইদং-এর উপরে পড়িতেছে। য়ুরোপীয় সাধনা ইদংকে যে ভাবে দেখে, যে ভাবে ইদংকে ব্যবহার করিতেছে, জাপানও সেই ভাবেই দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর এখানেই জাপান আশিয়ার সনাতন লক্ষ্য চ্যুত হইয়া, য়ুরোপের ছাঁচে আপনাকে গড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। জাপান ইংরেজ, বা ফরাসীস্ বা জর্ম্মাণের মত হইবে, এমন কথা বলি না, এরূপ হওয়া অসম্ভব। কিন্তু ইংরেজ, ফরাসীস্, জর্ম্মাণ, রুশ, এরা সকলে যেমন আপন আপন বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াও, সাধারণভাবে য়ুরোপীয় সাধনা ও সভ্যতার অঙ্গীভূত হইয়া আছে, জাপানও সেইরূপ আপনার নিজস্ব চরিত্র রক্ষা করিয়াও, ক্রমে এই য়ুরোপীয় সাধনা ও সভ্যতারই অঙ্গীভূত হইয়া পড়িতেছে। কোনো কোনো বিভাগে য়ুরোপ জাপানের নিকট হইতে সভ্যতার কতকগুলি উপকরণ স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করিবে, সত্য। কিন্তু জাপান কেবল যে য়ুরোপের নিকট হইতে সভ্যতার দু'চারিটা উপকরণ লইয়াই ক্ষান্ত থাকিবে, এমন বোধ

হয় না। জাপান য়ুরোপীয় সভ্যতার সমগ্র প্রাণটাকে টানিয়া লইবার জন্য আপনার হাত বাড়াইয়া আছে। যেমন ইংরেজ, ফরাসীস, জর্ম্মাণ, প্রভৃতি আপনাদের বিশেষ বিশেষ জাতীয় চরিত্র রাখিয়াও, এ সকল বিভিন্নতা সত্বেও, য়ুরোপেরই এক একটা জাতি হইয়া আছে, সেইরূপ জাপান, দেশ সম্বন্ধে আশিয়ার অন্তর্ভূত থাকিয়াও, ক্রমে ইংরেজ, ফরাসীস্ প্রভৃতির ন্যায়, সাধনা ও সভ্যতার আদর্শে, য়ুরোপীয়ই হইয়া উঠিতেছে। এই পরধর্ম্ম জাপানের পক্ষে ভয়াবহ হইবে কি না, ভগবান জানেন।

একটা অবস্থা আছে যখন ব্যক্তিই হউক আর জাতিই হউক, আপনার অপেক্ষা প্রবলতর ব্যক্তি বা জাতির সঙ্গে সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইলে, তার নিজস্বটুকু হারাইয়া ফেলিতে পারে। যতদিন কোনো ব্যক্তির বা জাতির চরিত্র ভাল করিয়া গড়িয়া উঠে নাই, ততদিনই তার এ বিপদের আশঙ্কা থাকে. গঠিত, চরিত্র, পরিণত-বয়ঃ, ব্যক্তির বা জাতির পক্ষে এরূপ ভাবে আপনাকে হারাণ একরূপ অসম্ভব। জাপান এখনো এ পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয় নাই। জাপানের পশ্চাতে একটা বিস্তৃত, বিপুল, ইতিহাস ও সাধনা বিদ্যমান নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে, জাপানের আধুনিক নেতৃবৃন্দ যেমন করিয়া জাপানকে সহসা নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন; তেমন ভাবে কখনই গড়িতে পারিতেন না। ভারতবর্ষে এ চেষ্টা একান্তই বিফল হইয়া যাইত। ভারতের একটা প্রকাণ্ড প্রাচীন ইতিহাস, একটা পরিণত ও জটিল সাধনা আছে। একটা বিশাল সাহিত্য সেই ইতিহাস ও সাধনাকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। একটা প্রাচীন ধর্ম্ম এখানে বহুসহস্রাব্দ ধরিয়া লোকচরিত্রকে গড়িয়া পিটিয়া, একটা বিশেষ আকার দিয়াছে। এখানে ছলা-পরামর্শ করিয়া, দশ জনে মিলিয়া একটা নূতন ধরণের ইতিহাস বা ধর্ম্ম গড়িয়া, জাতীয় জীবনকে একটা নূতন ছাঁচে ঢালা একেবারেই অসাধ্য। এখানে প্রাচীনকে ফুটাইয়া, নূতনের সঙ্গে প্রাচীনের সামঞ্জস্য করিয়া, তবে বর্ত্তমানের উপযোগী জাতীয় জীবন রচনা করিতে হইবে। আর এ জন্য এ ক্ষেত্রে, ভারতের উপরে বাহিরের প্রভাব যতই কেন আসিয়া পড়ুক না, তার নিজস্বটুকু কখনই একেবারে ধুইয়া মুছিয়া যাইবে না, যাইতে পারে না। জাপানে ইহা ঘটিতেছে, কারণ এ পর্য্যন্ত জাপানের একটা নিজস্ব সাধনা ও সভ্যতা একেবারে গড়িয়া উঠে নাই। জাপান চীন হইতেই আপনার সভ্যতা ও সাধনা লাভ করিয়াছে। এ সাধনাও কতকটা ধার করা। ইহাও একেবারে জাপানের অস্থিমজ্জাগত হইয়া যায় নাই। এ জন্য জাপানের পক্ষে আপনাকে বদলান কতকটা সহজ। এই জন্যই জাপান এত অল্প দিনের মধ্যে, এতটা সহসা ও সহজে, য়ুরোপীয় শক্তিসঙ্ঘের মাঝখানে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে। আর এই জন্যই জাপান আশিয়ার অধিবাসী হইয়াও, আশিয়ার নিজস্ব, সনাতন সাধনা হইতে দ্রুতবেগে সরিয়া পড়িতেছে বলিয়া মনে হয়।

বিলাতে জাপানের শিল্প-সভ্যতার যে

প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া এই আশঙ্কাই প্রাণে জাগিয়া উঠে। এ প্রদর্শনীতে দেখিবার বিষয় অনেক, শিখিবার বিষয় অনেক, সুরসিক জনের সম্ভোগের বিষয়ও অনেক। জাপানের চারুশিল্প বিলাতের শিল্পকলাকে কতটা পেছুনে ফেলিয়া রাখিয়াছে, এখানে ইহা প্রত্যক্ষ করা যায়। জাপানের প্রাণটা কবিত্বে পূর্ণ। জাপানের চালচলন, ঘর-দরজা, পথঘাট, বন-উপবন, সকলে মিলিয়া যেন একটা বিশাল দৃশ্যকাব্য রচনা করিয়াছে। জাপানের এ কবিত্ব অতি প্রাচীন বস্তু। চিরদিনই বোধ হয় জাপান সুন্দরের উপাসক ছিল। তাই জাপানের সকলই যেন সুন্দর, সুচারু, সুপরিপাটী। জাপান আপনার এই সৌন্দর্য্যকে লণ্ডন সহরের এক কোণে অদ্ভুতরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। প্রদর্শনীতে প্রবেশ করিয়া, খানিকটা যাইতে না যাইতেই মনে হয় যেন আর বিলাতে নাই, একেবারে, কোনো ইন্দ্রজালপ্রভাবে, জাপানে গিয়া পড়িয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে জাপানের প্রকৃতি দেবী যে সকল বসন পরিধান করেন, যেরূপ কীরণবরণগন্ধে আপনার বরবপুকে সাজাইয়া থাকেন, এখানে তার অবিকল ছবিটী যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। লণ্ডন সহরে, লোহার চালার নীচে, জাপান যেন সশরীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমনি মনে হয়। প্রথমেই শীতঋতুর ছবি। আকাশ কুয়াসাচ্ছন্ন। বনস্থলী কোথাও বা পত্রপল্লবহীন, আর কোথাও বা শুভ্রতুষারাবৃত; আবার কোথাও বা শীতঋতুসুলভ বিরল পুষ্পলতাদি দ্বারা সুসজ্জিত। এই গ্রীষ্মকালেও, এখানে মনে হয় যেন খুব ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছে। তার পর বসন্তের চিত্র। এ সকল ছবি নহে; আঁকা নয়, কিন্তু সত্যিকার ও কৃত্রিম গাছপালা দিয়া সাজান। কাণ্ডপ্রকাণ্ড সকলই সত্যিকার বটে, জাপানের বৃক্ষের নমুনা, জাহাজে করিয়া জাপান হইতে আসিয়াছে। তবে পাতা ও ফুল অবশ্য কৃত্রিম। কিন্তু জাপানের কারুকার্য্যের এমনি বাহাদুরী যে এ সকলও চক্ষে কিছুতেই কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয় না। এতদিন ধরিয়া এখানে রহিয়াছে, কিন্তু ঝড়িয়া পড়ে না, তাই বলিয়া, যুক্তি বিচার করিয়া, এ গুলি যে সত্য নহে, কৃত্রিম এ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। এই বসন্তের চিত্র অতি সুন্দর, এ সৌন্দর্য্যের বর্ণনা হয় না। কত রং-এর কত ফুল, কত রকমের কত পাতা, কত ছোট-বড় গাছ, বরণকীরণের ডালি মাথায় লইয়া যেন হেলিতেছে দুলিতেছে। শীতে প্রকৃতি যেমনই জড়শড় হইয়াছিল, এখানে, নববসন্ত-সমাগমে, বিহগমুখরিত, বরণখচিত, গন্ধপূরিত হইয়া তেমনি যেন নবজীবনের ভরা পসরা লইয়া দাঁড়াইয়াছে। চারিদিকে যেন এক নূতন জীবন জাগিয়া উঠিয়াছে। এই নবজীবনের সঙ্গে সঙ্গে যেন আকাশ-পাতাল জুড়িয়া এক পরমানন্দের স্রোত ছুটিয়াছে, জীবন্ত বসন্তের রস, চারিদিকে যেন উছলিয়া পড়িতেছে। তার পরেই শরৎ। শরদের বনস্থলীতে, শরদের আকাশে ও পৃথিবীতে, প্রকৃতি যেন জীবনের পরিপক্কতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বসন্তের উচ্ছ্বাস থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু জীবনের গতি গভীরতর

হইয়া উঠিয়াছে। যৌবনের চাঞ্চল্য কমিয়া গিয়া, এখানে প্রৌঢ়ের স্থৈর্য্য ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই গাছ, সেই পাতা, সেই ফুল, সেই আকাশ, সকলই বসন্তে যেমন এখানে, শরদেও তেমনিই আছে; অথচ তেমনি যেন নাই। একটা গভীর পরিবর্ত্তনে যেন সকলই আচ্ছন্ন হইয়া আছে। এই ভাবে, জাপান লণ্ডন সহরের মাঝখানে, অতি অদ্ভুতরূপে আপনার ঋতুর বাহার বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। চারুশিল্পে জাপান সিদ্ধহস্ত। দুনিয়ার আর কোনো জাতি, এমন ভাবে, প্রকৃতির ছবিকে, জীবন্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিত না। চিত্রশিল্পে অনেকেই পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। প্রকৃতির ছবি অনেকেই আঁকিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতির তাবেলা (tableau) বা জীবন্ত ছবি, এমনভাবে আর কেহই গড়িয়া তুলিতে পারে না।

তার পর, ইতিহাসের তাবেলা (tableau) প্রথমে জাপান আপনার অন্নময় কোষকে প্রকট করিয়াছে। প্রদর্শনীতে প্রবেশ করিয়াই, ঋতুত্রয়ে জাপানের চেহারা কেমন হয় তাহা দেখিলে, তার পরে জাপানের প্রাণময় কোষ। দেশের মাটি, জলস্থল, আকাশ, তার বহিঃপ্রকৃতি যেমন অন্নময় দেহ, সে দেশে যে জাতি বাস করে, তাহা তেমনি তার প্রাণময় দেহ। ইতিহাসে এই প্রাণ প্রকট হইয়া থাকে। ঐতিহাসিক তাবেলা দ্বারা জাপান এখানে আপনার জাতীয় জীবনের ছবিটা ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্ব হইতে, ভিন্ন ভিন্ন যুগে জাপান কি কি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, এ সকল তাবেলাতে তারই পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছে। আর এই খানেই আধুনিক জাপান কেমন অলক্ষিতে আপনাকে য়ুরোপীয় সাধনা ও সভ্যতার মধ্যে হারাইয়া ফেলিতেছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সকল ছবির স্বতন্ত্র আলোচনা আবশ্যক। বারান্তরে সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বাঙ্গালার মাতৃমূর্ত্তি।

সন্তানের উপর জননীর প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এ কথা সর্ব্ববাদী-সম্মত। সুতরাং জননী-জাতির অবস্থা ও চরিত্র যে সে জাতির উন্নতি ও অবনতিকে বহুপরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই কারণে সাধারণত প্রত্যেক জাতির জাতীয় বিশেষত্ব বিশেষ পরিস্ফুট আকারে সে জাতির রমণী-চরিত্রে প্রকাশ পায় এবং যতদিন রমণী-চরিত্রে সেই বিশেষত্বের অভাব না হয় ততদিন সে জাতির জাতীয় চরিত্রে সে বিশেষত্বের সম্পূর্ণ অভাব হয় না।

জাতীয় বিশেষত্ব জাতির স্থিতি ও উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য্য। বহু সহস্র বৎসর ও

শতাব্দী ধরিয়া যে শিক্ষা, যে অভ্যাস, যে আচার, যে অনুষ্ঠান কোন জাতির অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া কোন জাতি স্থিতি বা উন্নতি লাভ করিতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে এই বিশেষত্বই জাতির জাতীয়ত্ব—ইহার অভাবে জাতীয়ত্ব বিলুপ্ত হয়।

হিন্দুজাতির এই বিশেষত্ব তাহার সংযম-ত্যাগ ও ধর্ম্মপ্রাণতা। প্রত্যেক কর্ম্মের ভিতর দিয়া, আচারের ভিতর দিয়া, জীবন যাত্রাপ্রণালীর ভিতর দিয়া, এই বিশেষত্ব হিন্দুসমাজে বিকাশ লাভ করিয়াছে। সুতরাং হিন্দুর জাতীয়ত্ব কখনও বিকাশের জন্য এই সকল বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ থাকা প্রয়োজন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই বিশেষত্ব হিন্দু-সমাজ হইতে দিন দিন বিলুপ্ত হইতেছে এবং বাঙ্গালার জননী-সমাজও এ প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পান নাই। জাতীয়-উন্নতি-প্রয়াসী ব্যক্তি মাত্রেরই এ কথা আলোচ্য।

ইংরাজী-শিক্ষার প্রথম যুগ হইতে এই ধ্বংস আরম্ভ হইয়াছিল এবং আজিও সে ধ্বংস ক্রিয়া সম্পূর্ণ ক্ষান্ত হয় নাই।

সে অধিক দিনের কথা নহে, যে দিন বাঙ্গালী ইংরাজী-শিক্ষার প্রথম যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতার জ্বালাময়ী জ্যোতি দর্শনে উদ্ভ্রান্ত চিত্তে "পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষু"—দলে দলে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার রমণী-সমাজকেও আপনাদের ধ্বংসপথের সাথী করিবার চেষ্টায় ত্রুটি করে নাই। সে দিনের সে অন্ধ-গতি-বেগ যদি অব্যাহত থাকিত তাহা হইলে হয় ত এত দিন বাঙ্গালার জাতীয় আদর্শ ও বিশেষত্ব সম্পূর্ণ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু বাঙ্গলার সৌভাগ্য ক্রমে অধিক দিন সে গতিবেগ অব্যাহত থাকিতে পায় নাই—এমন দুর্দ্দিনেও বাঙ্গালার পথপ্রদর্শক মহাপুরুষের অভাব ঘটে নাই।

রাজা রামমোহন রায় এই দুর্দ্দিনে অভ্র-ভেদী হিমালয়ের ন্যায় অটল রহিয়া বজ্রকণ্ঠে স্বদেশবাসীকে ঘরে ফিরিবার জন্য প্রথম আহ্বান করিলেন। তাঁহার সে প্রীতিপূর্ণ কণ্ঠধ্বনি দিকে দিকে ধ্বনিত হইল, কিন্তু অধিক লোক সে আহ্বান-বাণী শ্রবণ করিল না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও মনস্বী কেশব-চন্দ্রও রাজার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইলেন, কিন্তু ফল অধিক হইল না। ধর্ম্মের আহ্বানে ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালীর চিত্ত আকৃষ্ট হইল না। বাঙ্গালী আপনার অবলম্বিত স্রোতপথে যন্ত্রচালিতের ন্যায় ভাসিয়া চলিল। তখন ঐন্দ্রজালিক তুলিকা হস্তে প্রতিভা-শালী বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। যে গৃহ, যে সমাজ, যে দৃশ্য, যে উৎসব তুচ্ছ ঘৃণ্য বোধে বাঙ্গালী উপেক্ষা করিয়া ঘরের বাহির হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র আপনার মায়া-তুলিকাপাতে তাহাদের স্বর্গীয় শোভায় উদ্ভাসিত করিয়া সহাস্য মুখে প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে আপনার স্বদেশ-বাসীকে আহ্বান করিয়া মধুর কণ্ঠে বলিলেন—"এই শোভায় অতুলনীয়, ঐশ্বর্য্যে অপূর্ব্ব, মহিমায় পরিপূর্ণ—এই সুখময়, শান্তিময়, প্রীতিময় গৃহ ছাড়িয়া কোন্ অনির্দ্দেশ্য সুখের

আশায় বিদেশীর চরণতলে ছুটিয়া চলিয়াছে?" বাঙ্গালী স্তব্ধ নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া বাঙ্গালী ঐন্দ্রজালিকের অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল দেখিল, দেখিয়া দেখিয়া শেষে আর চক্ষু ফিরাইতে পারিল না—স্কটলণ্ডের "লেকে"র মায়া ভুলিয়া "বারুণীর" ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল—"জুলিয়েট","মিরাণ্ডা","ডেসডিমোনা" ভুলিয়া "সূর্য্যমুখী", "ভ্রমর," "কপালকুণ্ডলা"র সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইল।

প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র অসামান্য কৌশলে স্বদেশবাসীকে বিদেশের কুহক হইতে মুক্ত করিলেন, তাহাদিগকে একেবারে ঘরে পৌঁছাইয়া দিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু গৃহাভিমুখ করিয়া দিলেন; তিনি যে চিত্র দেখাইয়া উন্মার্গ বাঙ্গালীকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন তাহা ঠিক বাঙ্গালীর জাতীয় চিত্র নহে। তিনি বাঙ্গালীর স্বাভাবিক চিত্রে পাশ্চাত্য বিলাস ও ভোগের মাদকতা মিলাইয়াছিলেন—বর্ণকে উজ্জ্বলতর করিবার আশায় স্বদেশের খাটি সোণায় বিদেশী ভাবের 'খাদ' মিলাইয়াছিলেন। সে সময়ে সমাজের যে অবস্থা, বাঙ্গালীর মনের যে গতি, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের অবলম্বিত পন্থা ভিন্ন সহজে সে স্রোত ফিরিবার কোন উপায় ছিল না। আমাদের সে উদ্ভ্রান্ত যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসাদে আমরা পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত পত্নীত্বের উজ্জ্বল চিত্র পাইলাম। সে অনুকরণে বঙ্গরমণী বিদেশের মোহ-মুগ্ধ স্বামীকে-গৃহে আকৃষ্ট করিতে শিখিল। কিন্তু তখনও সংযমে প্রতিষ্ঠিত, ত্যাগে বিশদীকৃত, প্রীতিতে বিকশিত, ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত—মহিমাময়ী ঐশ্বর্য্যময়ী, পবিত্রতাময়ী জগতে অতুলনীয় বাঙ্গালার মাতৃমূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই নাই। তখনও যেন বঙ্গরমণী পূর্ব্বের মত স্বার্থকে বিসর্জ্জন করিতে, ভোগকে ধর্ম্মের মন্দিরে বলি দিতে মাতৃস্নেহে সকলকে হৃদয়ে স্থান দিতে—শিখে নাই—তখন সে প্রেমকে পূজা করিতে গিয়া ভগবানকে ভুলিয়াছিল—নিজের ও স্বামীর মুখ দেখিতে গিয়া বৃহত্তর সংসারকে উপেক্ষা করিতেছিল। বঙ্গরমণী হিন্দুর চিরন্তন আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছেন। "যেনাহং নামৃতং স্যাম তেনাহং কিমকুর্য্যাম্"—এ কথা আর তাহার মুখ দিয়া বাহির হইত না। এই ভ্রষ্ট আদর্শ আজও দেশ হইতে অপসারিত হয় নাই—তাই আজ বাঙ্গালার রমণীসমাজ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের জন্য আকুল হইয়া উঠিতেছে—ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা পুনর্বিবাহ বাঙ্গালীর চক্ষে শ্রেয়তর বিবেচিত হইতেছে—আর্ত্ত, পীড়িত, দরিদ্র বাঙ্গালীর অতিথিশালায় স্থান পাইতেছে না! কিন্তু জাতীয় উন্নতির জন্য জাতীয় বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা যদি অপরিহার্য্য হয় তাহা হইলে এ আদর্শ অনুসরণ করিলে সুফল ফলিবে না। বাঙ্গালার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র একথা সুস্পষ্ট ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাই তিনি তাঁহার প্রথম উপন্যাস "শক্তি-কাননের উৎসর্গ পত্রে লিখিয়াছিলেন" বাঙ্গালার আসল যে মহত্ব তাহা খাঁটি বাঙ্গালিত্ব হইতেই সম্ভবে। যাহা কিছু সেই বাঙ্গালিত্বের বিঘ্নকর তাহাতে সুফল ফলিবে না। তাই শ্রীশচন্দ্র তাঁহার প্রত্যেক উপন্যাসে বাঙ্গালীর জাতীয় আদর্শ যথাযথ চিত্রিত করিতে

চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সম্ভ্রান্ত গৃহস্থচিত্র হইতে দস্যুচরিত্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক চিত্র হিন্দুর বিশেষত্বে বিশেষিত তাঁহার "হৈমবতী", "নিস্তারিণী" "ফুলকুমারী", "সরলা", "মীরা" প্রত্যেকেই হিন্দু-চরিত্রের বিশেষত্বে বিশদীকৃত।

ধর্ম্ম ইহাঁদের চরিত্রের ভিত্তি—সংযম ও স্বার্থবিসর্জ্জন তাহার মেরুদণ্ড! ধর্ম্মপ্রাণা 'হৈমবতী' পরম ভাগবত 'জগন্নাথ আচার্য্যে'র উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী।—গৃহদেবতা গোপীনাথের সেবার বিপুল আয়োজন তাঁহারই ভক্ত-হস্তস্পর্শে সমুজ্জ্বল—তাঁহার আনন্দময় বসন্তোৎসব তাঁহারই নিষ্ঠা ও ভক্তিতে সার্থক ও সুন্দর! ননদিনী মৃণ্ময়ী ঠাকুরাণীর হস্তে সংসারের সমস্ত কর্ত্তৃত্বভার সমর্পণ করিয়া এই আত্মবিসর্জ্জন-পরায়ণা বঙ্গকুললক্ষ্মী শুধু সংসারের কাজ লইয়াই সন্তুষ্ট—উৎসবের আনন্দময় মুহূর্ত্তে যখন সকলে অপনার সুখ লইয়া বিব্রত তখনও এই বঙ্গ-জননীর মাতৃহৃদয় আর্ত্ত, পীড়িত, ও শোকার্ত্তের জন্য ব্যথিত। স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রীতি,—কিন্তু বাহিরে তাহার লক্ষণ মাত্র নাই। "আপনাতে আপনি অটল" এই সংযত কল্যাণময় প্রেম—ইহাই হিন্দু-প্রেমের বিশেষত্ব।

"সূর্য্যমুখী"র যেখানে স্বামীর সঙ্গে গাড়ী হাকাইয়াও তৃপ্তি নাই—"হৈমবতীর" আধ হাত ঘোমটা সেখানে কিছুতেই কপালের উপর উঠে না—অথচ হৈমবতীর প্রেম সূর্য্যমুখীর প্রেম অপেক্ষা গভীরতা বা আন্তরিকতার কোন অংশে হীন নহে। "সরলা," 'মীরা,' 'ফুলকুমারী,' 'নিস্তারিণী' সকলের পক্ষেই এ কথা খাটে। শ্রীশচন্দ্রের দস্যু পর্য্যন্ত হিন্দু। "বিশ্বনাথ" দস্যুতার মধ্যেও সংযমী। দস্যুতা করিতে বসিয়াও "বিশ্বনাথ" দুঃখী ও দুর্ব্বলের প্রতি করুণাপর—স্ত্রীলোকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং বিলাসিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ। শ্বশুর কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা, স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা "প্রফুল্ল" সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে বসিয়াও "রাণী-গিরি"র অভিনয় করিতেছিল—"বিশ্বনাথ" প্রকৃত দস্যু হইয়াও নিজে মাথায় করিয়া "সরলা"র "মোট" তাহার স্বামী-গৃহে পৌঁছিয়া দিতে গিয়াছিল।

তাই বলিতেছিলাম বাঙ্গালীকে জাতীয় আদর্শে ফিরিতে হইলে শ্রীশচন্দ্রের আদর্শ ধরিয়াই তাহাকে ফিরিতে হইবে—আধুনিক আদর্শ ধরিয়া নহে। আমি এমন বলিতেছি না যে বাঙ্গালী উন্নতি লাভ কামনা করিলে তাহাকে সেই দেড়শত বৎসরের পূর্ব্বের কালেই স্থির হইয়া থাকিতে হইবে।

আমি বলিতে চাই যে জাতীয় বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে জাতীয় বিশেষত্বকে আবার প্রাণপণ চেষ্টায় ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। যত দিন বঙ্গরমণী আবার তাঁহার মাতৃভাব না ফিরিয়া পাইবেন—যতদিন না হিন্দুসন্তান আবার সংযম, ব্রহ্মচর্য্য ও নিষ্ঠার মর্য্যাদা বুঝিতে শিখিবে, ততদিন সহস্র রাজনৈতিক আন্দোলন, লক্ষ শিক্ষা-প্রণালীর বিধিনিয়ম—তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিবে না।

প্রবৃত্তির পথ স্বভাবতই চিত্তাকর্ষক—ভোগের পথ—বিলাসের পথ সহজেই মনোরম—সেই পথ আবার অসাধারণ প্রতিভা-

শালী শক্তিশালী লেখনী বলে উজ্জ্বলীকৃত—তাই শ্রীশচন্দ্রের স্নিগ্ধ, শুভ্র, পবিত্র চিত্র বাঙ্গালীর মুগ্ধ হৃদয়কে আকর্ষণ করে নাই। আজ জাতীয় উন্নতির আগ্রহের দিনে তাই আর একবার আমরা বাঙ্গালীকে তাহার চিরন্তন মাতৃমূর্ত্তিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সাগ্রহে আহ্বান করিতেছি। বঙ্গের মাতৃমূর্ত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার সন্তানের জন্য আর পৃথক করিয়া আয়োজন করার আবশ্যক হইবে না।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

অব্যক্ত-জীবন।

শ্বাসযন্ত্র ও হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়ালোপ, দেহের শীতলতা, এবং সংজ্ঞাহীনতা প্রভৃতি কয়েকটি লক্ষণ প্রকাশ হইলে আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে প্রাণীদিগকে মৃত বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। শরীরবিদ্‌গণকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা এই সকল স্থূল লক্ষণের উল্লেখ না করিয়া বলিবেন, সজীব প্রাণী বাহিরের বিবিধ পদার্থ নানা উপায়ে অবিরাম দেহস্থ করিয়া এবং দেহের নানা আবর্জ্জনা বাহিরে ছাড়িয়া,— যে আদান-প্রদান চালায় তাহাই জীবনের প্রধান লক্ষণ এবং ইহারই অভাব মৃত্যু। আরো সূক্ষ্ম লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে, তখন ইঁহারা শক্তির কথা আনিয়া ফেলেন। প্রাণিগণ খাদ্য হইতেই তাহাদের শক্তি আহরণ করে। যে শক্তি খাদ্যে অব্যক্ত ছিল, দেহযন্ত্রের মধ্যে পড়িয়া তাহাই তাপ, গতি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি নানা শক্তিতে মূর্ত্তিমান হইয়া পড়ে। অব্যক্ত-শক্তিকে এই প্রকারে ব্যক্ত করাকেই শরীর-বিদ্‌গণ জীবনের লক্ষণ বলিবেন। এবং তাহারই অভাবকে মৃত্যু বলিয়া প্রচার করিবেন।

জীবন-মৃত্যুর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলির সাহায্যে প্রাণিদেহ পরীক্ষা করিলে মোটামুটি কাজ চলিয়া যায় বটে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিতে গেলে, ঐ গুলিই সময়ে সময়ে নানা ভ্রমের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অল্পদিন হইল স্পেনের কোন সহরে একটি বালিকার মৃত্যু হয়। দেহে মৃত্যুর স্থূল-লক্ষণ গুলিকে দেখিতে পাইয়া ডাক্তার মৃতদেহটিকে শবাধারে পূরিবার আদেশ দিয়াছিলেন। শবাধার সমাধিস্থলে লইয়াও যাওয়া হইল। কিন্তু মৃৎপ্রোথিত করার আবশ্যক হইল না। বালিকাটি সজীব হইয়া স্বহস্তে শবাধারের ডালা ভাঙ্গিয়া সকলকে চমকিত করিয়াছিল। এই ঘটনার সত্যতায় সন্দিহান হইবার কারণ নাই। যাঁহারা স্বচক্ষে ব্যাপারটি দেখিয়াছিলেন, তাঁহারাই নানা বৈজ্ঞানিক পত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাজেই বলিতে হয়, জীবন-মৃত্যুর যে সকল সাধারণ লক্ষণ আমাদের জানা আছে, তাহা অভ্রান্ত নয়। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে এক অব্যক্ত জীবন আছে, তাহা জীবনের সাধারণ লক্ষণগুলির দ্বারা ধরা পড়ে না।

প্রাণীর কথা ছাড়িয়া উদ্ভিদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, জীবন-মৃত্যুর লক্ষণে আরো গোলযোগ দেখা যায়। বাজার হইতে যে সকল বীজ লইয়া বপন করা যায়, তাহার সকলগুলি অঙ্কুরিত হয় না। কাজেই বাহিরের আকার প্রকার পরীক্ষা করিয়া যে বীজকে আমরা সজীব মনে করি, তাহা সত্যই জীবিত নয়। পাঠক হয় ত বলিবেন, অঙ্কুরিত হওয়াই বীজের সজীবতার লক্ষণ। কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু এই লক্ষণ দ্বারা সজীবতা বুঝিতে গেলে, বীজকে নষ্ট করা হয়। প্রাণীর সজীবতা পরীক্ষা করিতে গিয়া যদি তাহার মুণ্ডচ্ছেদের ব্যবস্থা করা যায়, তবে পরীক্ষা সার্থক হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছুই লাভ করা যায় না। যে পরীক্ষায় জিনিসটি অবিকৃত থাকিয়া নিজের সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ করে, তাহাই প্রকৃত পরীক্ষা।

আধুনিক জীবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থে ঐ প্রকার তিনটি পরীক্ষার উল্লেখ দেখা যায়। কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের সজীবতা পরীক্ষা করিতে গেলে, তাহা অক্সিজেন এবং অঙ্গারক বাষ্প আদান-প্রদান করে কি না, তাহাই সর্ব্ব প্রথমে দেখা হয়। তার পর দেহের তাপ পরীক্ষা করা হইয়া থাকে, এবং সর্ব্বশেষে শরীরের কোন অংশে আঘাত দিয়া আহত ও অনাহত অংশের মধ্যে কোন বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিতেছে কি না, তাহা সূক্ষ্ম যন্ত্র সাহায্যে নির্ণয় করা হইয়া থাকে। প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহ পচিতে আরম্ভ করিলে তাহা জীবনহীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করার প্রথা আছে। কিন্তু ইহাকে কখনই মৃত্যুলক্ষণ বলা যায় না। ডিম্ব জিনিসটাকে প্রাণী বা উদ্ভিদ কোন জীবেরই কোটায় ফেলা যায় না। কাজেই উহাকে নির্জীব বলিয়াই মানিয়া লইতে হয়। অথচ মৃত পদার্থের ন্যায়ই ডিম্ব পচিতে আরম্ভ করে। কেবল ইহা দেখিয়াই যদি কেহ ডিম্বকে মৃত পদার্থ বলেন, তবে অন্যায় করা হয়। যাহা কোন কালে সজীব ছিল না, তাহা কখনই মৃত হইতে পারে না। সুতরাং প্রাণী বা উদ্ভিদের জীবন-মৃত্যু সাধারণ নিয়মে পরীক্ষা করিতে গেলে, পূর্ব্বোক্ত তিনটি পরীক্ষা অবলম্বন করা ছাড়া আর উপায় দেখা যায় না।

আজ কাল জীবন-মৃত্যুর লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত উপায়েই স্থির করা হইতেছে বটে, কিন্তু পরীক্ষাকালে এ গুলিরও ব্যভিচার দেখা যায়। জীবমাত্রেই কখন কখন এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায়, যখন ঐ সকল পরীক্ষার কোনটিতেই তাহারা সাড়া দেয় না। রটিফার (Rotifer) নামক ক্ষুদ্র প্রাণি-গুলিকে শুষ্ক স্থানে রাখিলে তাহারা বহু বৎসর ধরিয়া ধূলিকণার ন্যায় পড়িয়া থাকে। এই অবস্থায় পরীক্ষা করিলে জীবনের কোন লক্ষণই দেখা যায় না। কিন্তু কয়েক মিনিট মাত্র জলে ভিজাইয়া রাখিলে তাহারাই নড়া-চড়া করিয়া জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করিতে থাকে। কেবল রটিফার নয়, ইহা ছাড়া আরও অনেক ক্ষুদ্র প্রাণীর এইপ্রকার অব্যক্ত জীবন দেখা যায়। এইগুলি আমোবা প্রভৃতির ন্যায় এককোষ জীব নয়। সাধারণ প্রাণীদিগের ন্যায় ইহাদেরও দেহে পাক-যন্ত্রাদির সুব্যবস্থা আছে। সুতরাং বলিতে হয়, জীবন ও মৃত্যুর মাঝে অব্যক্ত-জীবন

বলিয়া একটা অবস্থা ছোট বড় প্রাণী বা উদ্ভিদের মধ্যে নিশ্চয়ই আছে।

যে সকল প্রাণীর রক্ত শীতল তাহাদিগের মধ্যে অব্যক্ত জীবন বেশ ভাল করিয়া লক্ষ্য করা যায়। মেরুপ্রদেশের তুষাররাশির মধ্যে যখন ভেক জমাট বাঁধিয়া থাকে, তখন তাহার দেহে জীবনের একটুও লক্ষণ দেখা যায় না। তার পর বরফ গলিয়া জল হইলেই, তাহারা সজীব হইয়া বিচরণ আরম্ভ করে। মেরুপ্রদেশের বরফের মধ্যে মৎস্য এমন জমিয়া যায় যে, একটু চাপ দিলেই তাহাদের দেহ ধূলির ন্যায় চূর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু গ্রীষ্মের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল মৎস্যই আবার সজীব হইয়া বরফ-গলা জলে আনন্দে বিচরণ আরম্ভ করে। সুপ্রসিদ্ধ মেরু-পর্য্যটক স্যাকলটন্ সাহেব দক্ষিণ মেরু-প্রদেশে বৎসরের মধ্যে প্রায় দশ মাস কাল কতকগুলি প্রাণীকে একেবারে নির্জীব অবস্থায় থাকিতে দেখিয়াছিলেন।

উষ্ণ-শোণিতযুক্ত উন্নত প্রাণীর কথা আলোচনা করিলে, ইহাদেরও অব্যক্ত জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। কর্ণেল টাউন্‌সেণ্ড নামক এক ব্যক্তির অদ্ভুত কার্য্যের কথা হয় ত পাঠক শুনিয়া থাকিবেন। ডব্‌লিনের ডাক্তার চনিস্ (Cheynes) স্বচক্ষে দেখিয়া বলিয়াছেন, লোকটি ইচ্ছা করিলেই মরিতে পারিত, এবং একটু চেষ্টা করিলেই আবার সজীব হইয়া পড়িত। যখন মরিবার জন্য প্রস্তুত হইত, সত্যসত্যই তখন নাড়ী ক্ষীণতর হইয়া শেষে নিস্পন্দ হইয়া যাইত। এই অবস্থায় চিকিৎসকগণ হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা করিয়া জীবনের একটুও লক্ষণ ধরিতে পারিতেন না। আমাদের দেশের যোগীদিগের সমাধির অবস্থা সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনা যায়, তাহার বিশেষ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। অধিক দিনের কথা নয়, রণজিৎ সিংহের রাজত্বকালে সাধারণের সম্মুখে সাধু হরিদাসের যে পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহার বিবরণ শুনিলে, মরা ও বাঁচার মধ্যে জীবনের যে একটা নিশ্চেষ্ট অবস্থা আছে তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। আয়র্ল্যাণ্ডের টাউন্‌সেণ্ড সাহেবের ইচ্ছামৃত্যুর কথা সত্য হইলে, ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যুতে, এবং রঘুবংশের রাজাদিগের "যোগেনান্তে তনুত্যজাম্" বিশেষণটিকে কেন অমূলক বলিব বুঝিতে পারি না। সুতরাং দেখা যাইতেছে অব্যক্ত-জীবন মানুষ প্রভৃতি উন্নত প্রাণীদিগের মধ্যে খুব সুলভ না হইলেও, ব্যাপারটির অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

উদ্ভিদ ও জীবাণু প্রভৃতি অনুন্নত জীবের মধ্যে অব্যক্ত-জীবনের উদাহরণ সর্ব্বদাই দেখা যায়। যে বীজ শত বৎসর মৃতবৎ থাকিয়া মৃত্তিকায় পড়িলেই অঙ্কুরিত হয়, তাহার জীবন যে এই দীর্ঘকাল ধরিয়া অব্যক্ত অবস্থায় সেই বীজেই ছিল তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। অধ্যাপক ম্যাক্‌ফ্যাডেন্ (Macfadyen) কতকগুলি ব্যাধি-জীবাণুকে তরল-বায়ুর শীতলতার মধ্যে রাখিয়াও একবারে নির্জীব করিতে পারেন নাই। তরল-বায়ুর উষ্ণতা বরফের উষ্ণতা অপেক্ষা প্রায় দুই শত ডিগ্রি কম। এই ভয়ানক শীতে জীবাণুগুলি এমন জমাট হইয়া গিয়াছিল যে, অঙ্গুলিস্পর্শে তাহারা ধূলির ন্যায় চূর্ণ হইয়া পড়িত, কিন্তু নির্জীব হয় নাই।

এখন অব্যক্ত-জীবন সম্বন্ধে আধুনিক শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ কি বলেন, আলোচনা করা যাউক। ইঁহারা বলেন, প্রাণ নামক কোন জিনিস দেহের কোন বিশেষ অংশে নাই। যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ দ্বারা জীবদেহ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক-টিতেই জীবন বর্ত্তমান। কিন্তু সকলগুলি সমান ভাবে জীবিত নয়। কাহারো জীবনের মাত্রা অধিক এবং কাহারো কম। প্রাণীদিগের নখদন্ত এবং কেশাদির বহিরাবরণ যে সকল কোষ দ্বারা গঠিত, তাহা আবার সম্পূর্ণ নির্জ্জীব। দেহের সজীব কোষগুলির সমবেত জীবনীশক্তি যে প্রাণী বা উদ্ভিদে অধিক, সেই জীবকেই আমরা খুব সপ্রাণ দেখি। সার্ উইলিয়ম্ রক্সের ন্যায় কর্ম্মী পুরুষ এবং বায়ুরোগগ্রস্ত জড়বৎ ব্যক্তি উভয়েই সজীব বটে, কিন্তু সজীবতার মাত্রা দুইয়ে এক নয়। বায়ুরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তি সত্যই অল্প অক্সিজেন গ্রহণ করে, এবং অতি অল্প অঙ্গারক বাষ্প ত্যাগ করে। ইহার কেবল মস্তিষ্কই দুর্ব্বল নয়, পেশী, ত্বক্, হৃদ্‌যন্ত্র এবং পাক-যন্ত্র প্রভৃতি শরীরের সকল অংশটিকেই নির্জ্জীব দেখা যায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, জীবন এবং মৃত্যু এই দুই সীমার মধ্যে জীবনের নানা পর্য্যায় বর্ত্তমান। প্রাণী বা উদ্ভিদ যখন পূর্ণজীবন হইতে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়, তখন তাহাকে ঐ সকল পর্য্যায়ের মধ্য দিয়াই যাইতে হয়। কিন্তু এগুলির সংখ্যা যে কত তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। আমরা সূর্য্যালোকের সেই মৌলিক সাতটি রঙকে চিনি। কিন্তু কত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বর্ণছত্রের (spectrum) লাল রঙ পীত হইয়া দাঁড়ায় এবং পীত রঙ বেগুণে হইয়া পড়ে, তাহার হিসাব চলে না। আমরা জীবনকে জানি এবং মৃত্যুকেও জানি, কিন্তু কত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া জীবনই মৃত্যু হইয়া দাঁড়ায় তাহার হিসাব করিতে পারি না। শরীরবিদ্‌গণ জীবন ও মৃত্যুর মাঝেকার কোন এক অবস্থাকেই অব্যক্ত-জীবন বলিতে চাহিতেছেন।

জীবন ব্যাপারটা যে কি, তাহা আজও ঘোর কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এই কুহেলিকার আবরণ কোন দিন অপনীত হইবে কি না জানি না। যতদূর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে সকল অণু দ্বারা দেহ গঠিত, তাহাদেরই সংযোগ-বিয়োগের বিশেষ বিশেষ শক্তি-গুলি জীবনের কার্য্য প্রকাশ করে। এই সংযোগ-বিয়োগ আমাদের পরিচিত রাসা-য়ণিক সংযোগ-বিয়োগেরই অনুরূপ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক জটিল। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ জীবনীশক্তির এই রাসায়ণিক ভিত্তিকে স্বীকার করিয়া বলিতেছেন, 'প্রাণী ও উদ্ভি-দের অব্যক্ত-জীবন এবং দেহের অণুর নিশ্চেষ্ট অবস্থা একই ব্যাপার। অণুর সংযোগ-বিয়োগের ধর্ম্ম এই অবস্থায় লোপ পায় না, সুপ্তাবস্থায় থাকে মাত্র। তার পর তাহাই কালক্রমে ব্যক্ত হইয়া পড়িলে জীবনের ক্রিয়াও ব্যক্ত হইয়া পড়ে। জীবের যখন মৃত্যু হয়, কেবল তখনি সেই সকল ধর্ম্ম একেবারে লোপ পাইয়া যায়। বাহিরের সঙ্গের যোগ রাখিয়া অণুগুলি যে সকল কার্য্য দেখাইত, তখন মৃত অণুতে তাহা আর দেখা যায় না।

সাধারণ জড়পদার্থের স্থূল রাসায়নিক গুলিই সেই অবস্থায় উহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে দেহের অণু-গুলির চঞ্চলভাব অর্থাৎ জঙ্গমত্বই জীবন। ঘড়ির কাঁটা জোর করিয়া চাপিয়া ধরিলে ঘড়িটিকে যেমন অল্পক্ষণের জন্য বন্ধ রাখা যায়, সেই প্রকারে দেহের জলীয় অংশকে টানিয়া লইলে বা তাপের মাত্রাকে কমাইয়া ফেলিলে অণুর জঙ্গমত্বের ক্ষণিক রোধ সম্ভব হয়। তার পর সেই বাধাগুলিকে নষ্ট করিলেই, ঘড়ির কলের ন্যায় দেহের কলটি আপনিই চলিতে আরম্ভ করে।

প্রাণিদেহে নানা প্রকার ঔষধের যে সকল ক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও আণবিক জঙ্গমত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাণীকে অজ্ঞান করিতে হইলে ক্লোরোফরম্ প্রয়োগের রীতি আছে। জিনিসটা নিশ্চয়ই দেহের অণুর সংস্পর্শে আসিয়া রাসায়নিক কার্য্য সুরু করিয়া দেয়, এবং তাহারই ফলে সমগ্র অণু নিশ্চল হইয়া পড়ে। মস্তিষ্কের অণুর নিশ্চলতায় রোগী সংজ্ঞাহীন হয় এবং হৃদ্‌পিণ্ড ও শ্বাসযন্ত্রের নিশ্চেষ্টতায় মৃত্যু পর্য্যন্ত দেখা দেয়। প্রুসিক্ এসিড (Prussic acid) জিনিসটা ভয়ানক বিষ। প্রাণীর শ্বাসযন্ত্রে অণুগুলিকে নিষ্ক্রিয় করাই ইহার কাজ।

জীবনীশক্তিকে রাসায়নিক কার্য্য বলিয়া মানিয়া লইয়াও জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ অব্যক্ত জীবনের ইহা ছাড়া আর কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। ইতর প্রাণী বা উদ্ভিদ যখন শীতে জমাট বাঁধিয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকে, আমরা তখন উহাদের দেহের আণবিক নিশ্চলতার কারণ দেখিতে পাই। কিন্তু টাউন্‌সেণ্ড বা সাধু হরিদাসের মত কোন এক ব্যক্তি যখন স্বেচ্ছায় জীবনকে অব্যক্ত করে, তখন কোন্ মহাশক্তি দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অণুপুঞ্জের রাসায়নিক শক্তিকে অপহরণ করে, তাহা এখনো জানা যায় নাই।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

গোবিন্দদাস।

বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে কবি গোবিন্দ-দাস প্রখ্যাতনামা। কিন্তু আমরা নিঃসংশয় চিত্তে বলিতে পারি না যে, গোবিন্দদাসের পদাবলী বলিয়া যত গুলি পদ প্রচলিত আছে, সকল গুলিই একই কবির রচিত; কারণ ইদানীং আমরা অনেকগুলি গোবিন্দ-দাসের কথা শুনিতে পাইতেছি। অথচ ইহাও নিঃসঙ্কোচে বলা যায় না যে, গোবিন্দদাসের বিরচিত পদাবলী বলিয়া যাহা প্রচলিত আছে তাহা একই ব্যক্তির হওয়া অসম্ভব, কিম্বা ইহাদের মধ্যে পরে বিজ্ঞাত কোনও গোবিন্দদাসের পদ নিশ্চয়ই মিশ্রিত হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ প্রমাণ এতৎ সম্বন্ধে এত প্রবল নহে যে আমাদিগকে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার কালে দ্বিধাশূন্য করিতে পারে। যাবৎ

তাহা না হয় তাবৎ গোবিন্দদাসের পদাবলী নামধেয় পদগুলিকে এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া ধরিয়া লইলে বিশেষ কোনও ক্ষতি বা আপত্তির হেতু দেখিতে পাই না। আমরা সেইরূপ ধরিয়া লইয়াই এই পদাবলী গুলির বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমাদিগের বিবেচনায় এই পদগুলির ভিতর একটী এমন সূত্র আছে, যাহা দ্বারা তাহাদিগকে পরস্পর সংশ্লিষ্ট বলিয়া বোধ করিতে পারা যায়; অন্তত অধিকাংশ স্থলেই এই এক জাতীয়ত্ব অনুভব করিবার জন্য কোনও ক্লেশ করিতে হয় না। এই সূত্রটী তাঁহার রচিত পদগুলির মধুরতা। এই বিষয়ে গোবিন্দদাসের স্থান বৈষ্ণব কবিদিগের ভিতর একটু স্বতন্ত্র। বৈষ্ণব গীতির বাহ্য প্রকৃতি ও বাহ্য পরিচ্ছদ উপাদেয় হইলেও তাহা যে সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিবার উপযুক্ত এ কথা কেহ স্বীকার করিবেন না। তাহার কারণ, বৈষ্ণব কবিগণ কবিতার বাহ্যোপকরণের প্রতি তত মন দেন নাই, মনের আবেগে যখন যে কথা যে ছন্দে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন, সুকবির হস্তে পড়িয়া সেই সকল কথাই অনেক স্থলে এমন সুন্দর ভাবে কথিত হইয়াছে ও এমন সুন্দর বেশ ধারণ করিয়াছে যে তাহা দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহাও বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, কবিতার ছন্দোবন্ধ বা বাক্য-বিন্যাস তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য নহে, প্রাণের কথা বলাই তাঁহাদের প্রথম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ভাবের গাম্ভীর্য্য এবং মর্ম্মের উচ্ছ্বাসই তাঁহারা বিশেষ যত্ন সহকারে প্রকাশ করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহাদের পদে সর্ব্বদা চাক্‌চিক্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহাদের পদে যে মাধুর্য্য নাই এমন কথা আমি বলি না। তবে অনেক স্থলেই যে তাহাতে বচন-চাতুর্য্য ও ছন্দোপারিপাট্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা সকলেই জানেন। এ বিষয়ে বৈষ্ণব কবিগণের যে কোনও আন্তরিক আস্থা ছিল তাহা বোধ হয় না।

অন্যান্য বৈষ্ণব কবি হইতে কবি গোবিন্দদাসের এই খানেই স্বাতন্ত্র্য। বৈষ্ণব কবির আদি গুরু জয়দেবের আদর্শে গোবিন্দদাস তাঁহার পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। গোবিন্দদাস তাঁহার পদাবলীর ভিতর একটু মধুরতা, একটু গঠন-পারিপাট্য, একটু কোমলকান্তি আনিবার জন্য যেন সর্ব্বদাই চেষ্টা করিয়াছেন। মসৃণ পেলবতায় তাঁহার পদাবলী সদাই যেন সমৃদ্ধ। জয়দেবের অনুকরণে তিনি প্রথমেই কোমলকান্ত পদের দ্বারা শ্রীশ্যামসুন্দরের বন্দনা করিয়াছেন, তাহা জয়দেবের গীতির ন্যায় মধুর—

> ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজকলিতম্।
> ব্রজবনিতাকুচ কুঙ্কুমললিতম্॥
> বন্দে গিরিবর ধরপদকমলম্।
> কমলাকর কমলাঞ্চিতমমলম্।

ইত্যাদি পদে যে ললিত সুর উঠিয়াছে সেই সুর প্রায় তাঁহার সকল কবিতাতেই শুনিতে পাওয়া যায়। এই মধুর ঝঙ্কার এই সুরের বৈচিত্র্যময়ী ভঙ্গী কবি গোবিন্দদাসের নিজস্ব। বাঙ্গালা গীতি-কবিতায় ছন্দোবৈচিত্র্য ও রচনাবিন্যাস-কৌশল তিনিই

প্রথম আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীজয়দেব সংস্কৃত রচনায় যে অপূর্ব্ব ভঙ্গীর আবিষ্কার করিয়াছিলেন সেই অপূর্ব্ব ভঙ্গী বঙ্গভাষায় কবি গোবিন্দদাস প্রথম আমদানি করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের পদাবলীতে কোকিলের পঞ্চম তান, বীণার কোমল নিক্কণ নিয়ত বিরাজিত। গোবিন্দদাসের পদাবলীতে "চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী গুঞ্জ'। গোবিন্দদাস ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব পিতামহ। যে ছন্দ ও ভাষা ভারতচন্দ্র গোবিন্দদাসে পাইয়াছিলেন তাহাই তিনি মার্জ্জিত ও সুসজ্জিত করিয়া নিজ প্রয়োজনে নিযুক্ত করিয়াছেন। গোবিন্দদাস একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী; তাঁহার নির্ম্মিত "ইমারত" কোথাও দেখিতে কুৎসিৎ নহে, সকল স্থলেই সুদৃশ্য। ভারতচন্দ্রের সহিত এই স্থলেই তাঁহার সাম্য; কিন্তু গোবিন্দদাস শুধু শিল্পী নহেন, তিনি কবি। ভারতচন্দ্রের সহিত এইখানে তাঁহার বৈষম্য। যে সরস কবিত্বে গোবিন্দদাস অনুপ্রাণিত, ভারতচন্দ্রে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। গোবিন্দদাসের কবিত্ব ও ভারতচন্দ্রের কবিত্ব বিভিন্ন জাতীয়। ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব কোথায় তাহা অনেকে বলিয়াছেন—সে কথার অবতারণার এখানে প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু গোবিন্দদাসের কথাই বলিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গোবিন্দদাস এক জন সুশিল্পী। এই শিল্পকলা বৈষ্ণব কবিদিগের ভিতর গোবিন্দদাসে যেমন পরিস্ফুট তেমন আর কাহাতেও নহে, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি বা অন্যায় উক্তি হইবে না।

আজু বিপিনে আওল কান,
মূরতি মূরত কুসুম বাণ,
জনু জলধর রুচির অঙ্গ,
ভঙ্গী নটবর সোহিনী।
ঈষৎ হসিত বদন চন্দ,
তরুণী নয়ন নয়ন কন্দ,
বিম্ব অধরে মুরলি খুরলি,
ত্রিভুবন মনোমোহিনী॥
কুসুম মিলিত চিকুরপুঞ্জ,
চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরীগুঞ্জ,
পুচ্ছনিচয় রচিত মুকুট,
মকর-কুণ্ডল দোলনী।
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর,
সঘনে ধাওত শ্রবণ ওর,
গীম শোহন রতন রাজ,
মোতিমহার দোলনী॥
কটি পীত পট কিঙ্কিনী বাজ,
মদগতি অতি কুঞ্জররাজ,
জানু লম্বিত কদম্ব মাল,
মত্ত-মধুকর-ভোরণী।
অরুণ বরণ চরণ কুঞ্জ,
তরুণ অরুণ কিরণ গঞ্জ,
দাস গোবিন্দ হৃদয় রঞ্জ,
মত্ত মঞ্জীর বোলনী॥

এই নূতন ছন্দে গোবিন্দদাস যখন বৈষ্ণব কবিতার আসরে গান ধরিলেন, তখন তাঁহার গানের রিশ শ্রোতৃবর্গের কর্ণে মধু বর্ষণ করিয়া তাহাদের হৃদয়ে এক অভিনব হিল্লোলের সৃষ্টি করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

গোবিন্দদাসের চিত্ত এই নূতন সুরের ঝঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া নিত্য নূতন কলগীতির সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাঁহার ভক্তিপ্রবণ চিত্ত নিজ পরম রমণীয় ইষ্ট মূর্ত্তিদ্বয়ের পরম সৌন্দর্য্যের আবেশে আবিষ্ট হইয়া,

উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া বিবিধ ছন্দে, নিজ মুখরতা প্রকাশ করিয়াছে। কখনও তিনি

নন্দ-নন্দন, চন্দ-চন্দন-
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ সুন্দর, কম্বু কন্দর,
নিন্দিত সুন্দর ভঙ্গ ॥

দেখিয়া বিমুগ্ধ; কখনও তিনি ধ্যানাস্তমিত নয়নে দেখিয়াছেন

সুন্দরী রাধা আওয়ে বনি।
ব্রজ রমণীগণ মুকুট মণি ॥
কুঞ্জর গামিনী, মোতিম দামিনী,
শ্যাম নিহারিণী চমকানি রে।
আভরণ ভারিণী, নব অনুরাগিণী,
রস আবেশিনী তরঙ্গিণী রে ॥
অঙ্গ তরঙ্গিণী, অধর সুরঙ্গিণী,
সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিণী রে।
কুঞ্চিত কেশিনী, নিরুপম বেশিনী,
রস আবেশিনী ভঙ্গিনী রে ॥
নব অনুরাগিণী, নিখিল সোহাগিনী,
পঞ্চম রাগিণী রূপিণী রে।
রাসবিহারিণী, হাস বিকাশিনী,
গোবিন্দদাস চিত মোহিনী রে ॥

অমনি তিনি এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তির কল্পনায় ভক্তিদ্রব চিত্তে নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নূতন ছন্দে গাহিয়া উঠেন—

জয়তি জয়, বৃষভানু নন্দিনী,
শ্যাম মোহিনি রাধিকে।
কনয়া শতবাণ, কান্তি কলেবর,
কিরণে জিত কমলাধিকে ॥

এমনি মধুরতায়, এমনি কোমলতায় গোবিন্দদাসের সুমগ্র পদাবলী পূর্ণ। গোবিন্দদাস প্রথমতঃ আমাদের কর্ণকুহরে মধু বর্ষণ করেন, একটী ভরা সুর আমাদের কাণে ঝঙ্কৃত করিয়া দেন। সেই সুরের মোহে আমাদের হৃদয় স্বতঃই তাঁহার পদাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। গোবিন্দদাসের ছন্দ এত বিচিত্রতার আকর, এত অভিনব তানের সমাবেশে সমৃদ্ধ, এবং এত কালোপযোগী যে তাহার আকর্ষণ এড়াইবার উপায় নাই। ছন্দ সর্ব্বকালেই কবিতার প্রাণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। যে কবিতার ছন্দ ভাল নহে, তাহা খুব উচ্চাঙ্গের হইলেও তাহার আকর্ষণী শক্তির কিছু অভাব হইবেই। পূর্ব্বে বলিয়াছি কবি গোবিন্দদাস একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী। তিনি ছন্দের উপযুক্ত ভাষাও ব্যবহার করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের ভাষার সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয় প্রধানতঃ দুইটী;—অনুপ্রাসের সুব্যবহার ও যুক্তাক্ষরের সমীচীন প্রয়োগ। অনুপ্রাস সুব্যবহৃত হইলে ভাষার অলঙ্কার, নচেৎ তাহা ভাষার প্রপীড়ক হইয়া উঠে। দাশরথি রায়ের অনুপ্রাস ও যমক চর্চ্চা করিলেই তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। গোবিন্দদাস এই দোষ সর্ব্বদা পরিহার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাষা অলঙ্কৃত হইলেও নিতান্ত কৃত্রিম বলিয়া বিবেচিত হইবে না। যে অনুপ্রাসাদি অলঙ্কার তিনি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা যেন আপনি তাঁহার লেখনীর মুখে আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়; হৃদয়ের উল্লাসের সহিত তাঁহার ভাষার চাঞ্চল্যের এত নিকট সম্পর্ক যে সে ভাষা দেখিয়া কবিকে কেহই কৃত্রিমতা দোষে দূষিত করিতে ইচ্ছা করিবেন না। বর্ষায় নদীবক্ষে উচ্ছ্বাস যেমন স্বাভাবিক, কবি গোবিন্দদাসের ভাষার

হিল্লোলও তেমনি স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। ভাবের প্রবাহে তাঁহার ভাষা হেলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে, বীচি-বিক্ষুব্ধ-হৃদয়া শুভ্র ফেন-হাস্যে শোভিতা তরঙ্গিণীর মত তাঁহার ভাষা সুস্মিতশালিনী ও মনোহারিণী, অথচ তাহার ভিতর দিয়াই যেন তাহাতে একটা অব্যক্ত সৌভাগ্য-গর্ব্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে—

গাবই সব মধুমাস।
জনি দহ বিরহ হুতাশ॥
হুতাশ সদৃশ, চাঁদ চন্দন,
মন্দ পবন সন্তাপই।
মাধবী মধু, মত্ত মধুকর,
মধুর মঙ্গল গাবই॥
নব মঞ্জু রঞ্জন, পুঞ্জ রঞ্জিত,
চূত কানন শোভই।
রসলোল কোকিলা কোকিলকুল,
কাকলী মন মোহই॥
মোহই মাধবী মাস।
চৌদিশে কুসুম বিকাশ॥
বিকাশ হাস বিলাস, সুললিত কমলিনী,
রস জিম্ভিতা।
মধুপান চঞ্চল, চঞ্চরীকুল পদ্মিনী,
মুখ স্মিতা॥
মুকুল পুলকিত, বল্লী তরু অরু,
চারু চৌদিশে সঞ্চিতা।
হামসে পাপিনী, বিরহে তাপিনী,
সকল সুখ পরিবঞ্চিতা॥

বসন্ত-শোভা-বিমুগ্ধা বিরহিণীর এই উচ্ছ্বাস আমাদের কাণের কাছে সাগর-গামিনী কলনাদিনীর কুলুকুলুধ্বনির ন্যায় একটা অজ্ঞাত ব্যথার সৃষ্টির সহিত একটী মধুর-কোমল-করুণ রাগিণী গাহিয়া যায়; অথচ বসন্ত-সৌন্দর্য্যান্দোলিত কবি-হৃদয়ের উদ্বেল তরঙ্গ স্পর্শে আমাদের হৃদয়ও যেন সঙ্গে সঙ্গে আনন্দোচ্ছাস-পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ইহার ভিতর অবসাদ নাই, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যেমন পরিস্ফুট, হৃদয়ের যন্ত্রণাও তেমনি সুস্পষ্ট। ভাষা সজ্জিত, কিন্তু সজ্জার জন্য একটা কৃত্রিম চেষ্টা-জাগরণ নহে। যুক্তাক্ষরের সদ্ব্যবহারের কত শক্তি তাহা ইহাতে পরিষ্কার রূপে বুঝা যাইবে।

অনুপ্রাসের সুব্যবহারও গোবিন্দদাসে অনেক মিলিবে। জয়দেবের অনুপ্রাস যেমন চেষ্টা-বিরহিত বলিয়া মনে হয়, গোবিন্দদাসের অনুপ্রাসও তেমনি সহজ ও সরল, তাই সুন্দর।

মদন মোহন মুরতি মাধব,
মধুর মধুপুর তোই।
মুগধ মাধবী, মানি মানদ,
বিছই মারগ জোই॥
বিমল মধু ঋতু, মল্লী মুকুলিত,
মঞ্জু মাধবী কুঞ্জ।
মেলি মধুকরী, মধুর মধুকর,
মাতি মধু পিবি গুঞ্জ॥
মিহিরজা মৃদু মন্দ, মারুত মনই,
মনসিজ মাতি।
মসৃণ মলয়জে মুরছি মানিনী
মহী মাহা গড়ি যাতি॥
মহা মণিময়, মহগ মণ্ডল,
মলিন মুখ অরবিন্দ।
মরমে মৃগমতি মুদিয় ম নাহর,
মোহিত দাস গোবিন্দ॥

গোবিন্দদাস অনুপ্রাস যাহা মাঝে মাঝে

ব্যবহার করিয়াছেন তাহা এমনই মধুর। কিন্তু সত্যের অনুরোধে ইহাও বলা উচিত যে কখনও কখনও গোবিন্দদাসের পদাবলীতে এই কৌশলের অপব্যবহারও দৃষ্ট হয়। অনুপ্রাস লিখিয়া বাহাদুরি দেখাইবার ইচ্ছা কখনও কখনও তাঁহার হয় নাই, এ কথা বলা যায় না। মাঘ, ভারবির মত বড় বড় কবিরাও এ প্রলোভন এড়াইতে পারেন নাই। গোবিন্দদাসও যে একেবারে সে প্রলোভনের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ইহাও বলিতে হইবে যে সে সকল স্থলেও তাঁহার কবিতা কর্কশতা-দোষ-দুষ্ট নহে। তাঁহার ভক্তিবিধৌত সরস হৃদয়ে কোমলতার অভাব কোথাও দৃষ্ট হয় না। এই কোমলতাই গোবিন্দদাসের নিজস্ব। তাই তাঁহার অনুপ্রাসাদিতে পদের কোমলতা সাধিত হইয়াছে, কথা লইয়া বহুকষ্টসাধ্য ব্যায়াম করিবার বিকট প্রয়াস কোথাও প্রকাশ পায় নাই।

কিন্তু এই কারণেই আবার গোবিন্দদাসের পদাবলীতে একটী দোষ প্রবেশ করিয়াছে। অনেকে বলেন গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির পদানুসরণে তাঁহার পদাবলী গঠিত করিয়াছিলেন। কথাটা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে শিষ্য গুরুর গাম্ভীর্য্য ভাল রকম ধরিতে পারেন নাই। গোবিন্দদাসের পদাবলীতে বিদ্যাপতির ডমরু-ধ্বনি আদৌ শুনিতে পাওয়া যায় না। অনেক স্থলে যে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকে অনুকরণ করিয়াছেন তাহা নিশ্চয়, অনুকরণ কেন অনেক স্থলে তিনি বিদ্যাপতির কথাগুলিই লইয়া পদ রচনা করিয়াছেন। এতৎ সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে বিদ্যাপতির গাম্ভীর্য্য তাহাতে নাই। উভয় কবির বর্ষার চিত্র পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলেই এ কথার যাথার্থ্য অনুভূত হইবে। উভয় বর্ণনার ছন্দ ও প্রকরণ একই, উপকরণ ও ভাব একই, কিন্তু দুটীতে যে প্রভেদ তাহা স্পষ্ট লক্ষিত হইবে। বিদ্যাপতির বর্ণনায় গাম্ভীর্য্য; গোবিন্দদাসের বর্ণনায় গাম্ভীর্য্যের ছায়া মাত্র। একের বর্ণনা হৃদয়ের অন্তস্তল উদ্বেলিত করিয়া একটা অব্যক্ত আশঙ্কার সৃষ্টি করে, অপরের বর্ণনায় হৃদয়ে একটা গম্ভীর ভাবের আবেশ মাত্র সৃষ্টি করে, ইহার অধিক আর কিছুই করিতে পারে না। একটী জলদের গভীর নির্ঘোষ, অপরটী মুরজমন্দ্র।

আমরা এতক্ষণ গোবিন্দদাসের পদাবলীর বাহ্যোপকরণ সম্বন্ধে বলিয়াছি, এইবার তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিব। তাঁহার ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিলাম তাহার কারণ যে তিনি বঙ্গ-কবিতায় এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক—বঙ্গকাব্যে তিনিই প্রথম শিল্পী।

কিন্তু আগেই বলিয়াছি যে গোবিন্দদাস কেবল শিল্পী নহেন, তিনি কবি। তাঁহার পদাবলী কেবল সুশ্রাব্য বাক্যের সমষ্টি মাত্র নহে, সরস কবিত্বের উপাদানে গঠিত। তিনি বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করিয়াছেন কি চণ্ডীদাসকে অনুসরণ করিয়াছেন, সে বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার পূর্ব্বে এই অমর কবিদ্বয় বৈষ্ণব কবিতার আসর

ঝাঁকাইয়া বসিয়াছিলেন; তাঁহাদের পদানুসরণ করা তৎপরবর্ত্তী সকল বৈষ্ণব কবিই গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। গোবিন্দদাস যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে নমস্কার করিয়া নিজ পদাবলী আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিলে গোবিন্দদাসের কিছুই মানের লাঘব হইবে না যে তিনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী। বৈষ্ণব কবি মাত্রেই এই দুই মহাকবির কাছে চির ঋণে আবদ্ধ। তাঁহারা যে ভাব-ভাগীরথী বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহার পুণ্যময় সলিলে অবগাহন করিয়া সকল বৈষ্ণব কবিই ধন্য হইয়াছেন; গোবিন্দদাস ও হইয়াছেন। যাহা বৈষ্ণব কবি মাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি, তাহা লইয়া নিজের কাব্যাঙ্গের পুষ্টি করিয়াছেন বলিয়া গোবিন্দদাস দোষ-ভাজন হইতে পারেন না। ইহা করিয়াও গোবিন্দদাস একজন সুকবি, সে কথা কেহই স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। আমরা সেই কবিত্বের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় লইতে চেষ্টা করিব।

গোবিন্দদাসের কবিত্বের বাহ্য উপকরণগুলি তাঁহার ভাষা ও ছন্দের মত সুন্দর। তিনি যে ভাবালঙ্কারগুলি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা অধিকাংশস্থলে তাঁহার কবিগুরু বিদ্যাপতির সমকক্ষ, কোথাও যেন বিদ্যাপতির উপমাকেও পরাস্ত করিয়াছে। শ্রীরাধার বর্ণনায় তিনি যে "পঞ্চম-রাগিণী রূপিণী রে" উপমাটী ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা এত ভাবসমন্বিত ও মধুর যে, বলিতে কি বিদ্যাপতিতেও এমন মনোহর উপমা দেখি নাই। গোবিন্দদাসের বিশেষণগুলিও মাঝে মাঝে এমনই মর্ম্মস্পর্শী ও ভাবব্যঞ্জক। "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী;" "যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই,"প্রভৃতি রাশি রাশি বিশেষণ তাঁহার পদগুলিকে উজ্জ্বল লাবণ্যে বিশেষিত করিয়াছে ইহারা যেন আমাদের হৃদয়ে সংলগ্ন হইয়া যায়; একটী অভিনব ভাবের তরঙ্গে যেন হৃদয় নিমগ্ন হইয়া যায়। তাঁহার উপমাগুলিও এমনি সৌন্দর্য্যময়, এমনি নূতনত্ব-সম্পন্ন।

(১) গুরুজন গৌরব, চৌর সদৃশ ভেল,
দূরেহুঁ দূরে রহুঁ ভাগি।

(২) কানু অনুরাগ— ভুজগে গরাসল,
কুল দাদুরি মতি মন্দ।

(৩) সজনি কানু সে বরজ ভুজঙ্গ
সো মঝু হৃদয়, চন্দন রুহে লাগল,
ভাগল ধরম বিহঙ্গ॥

(৪) সজনি কানু সে শৈল সোণার।
মঝু মন কাঞ্চন, আপন প্রেমধন,
জোরি পিঁধায়ল হার॥

(৫) হেরইতে হামারি, সজল দিঠি পঙ্কজে,
দুহুঁ পাদুক করি নেল॥

(৬) ভাল আধ ইন্দু, অমিঞা আগোরাল
তাঁহে তিমির ঘন ঘোর।
কিরণ বিকাশিত, শ্রুতি কুবলয় পরি
ধাবই নয়ন চকোর॥
নাশা শিখর, সুমুখে উদিত পুন,
সিন্দুর ভানু উজোর।
অহনিশি বদন, কমল ভেঞি বিকশিত,
শ্যাম ভ্রমর নাহি ছোর॥
অরুণ কিরণ পুন, অধরে হেরি হেরি,
হায় তরঙ্গিণী তীরে।

কুচ যুগ কোক শোক নাহি জানত
গোবিন্দদাস কহ ফুরে॥

(৭) শুন মাধব তোহে সোঁপনু ব্রজবালা।
মরকত মদন, কোই জন পূজই,
সেই নবকাঞ্চন মালা॥
তুহুঁ অতি চপল, চরিত জনু ষট্‌পদ,
কমলিনী বিপিন গোঙারি।
মৃদুল শিরিষ, কুসুম জনু তোড়ই,
লহু লহু কবরী সঞ্চারি॥

(৮) রাই কানু আলিঙ্গন, নীলমণি কাঞ্চন,
হেরইতে লোচন ভোর।
আবেশে অবশ তনু ভেল অতি আকুল
জলধরে বিজুরী উজোর॥

এমনি সুন্দর উপমায় গোবিন্দদাসের পদাবলী অধিক সমৃদ্ধ। এই সকল উপমায় একটু নূতনত্ব আছে; কতকগুলি এত সুন্দর যে রাধাশ্যামের বর্ণনায় তাহারা এক রকম অপরিহার্য্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। গোবিন্দদাসের কাব্যশিল্পে এই উপমাগুলি উজ্জ্বল মণির মত শোভাশালিনী।

কবি গোবিন্দদাস সকল বৈষ্ণব কবির মত রূপবর্ণনায় সুপটু; অধিকাংশ বৈষ্ণব কবির মত তিনি প্রিয়তমের মুখে—প্রিয়তমার ও প্রিয়তমার মুখে প্রিয়তমের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এমন স্থলে একটু আধটু অত্যুক্তি সহজেই আসিয়া পড়ে, তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। ভালবাসার নিয়মই এই যে প্রিয়জনকে সর্ব্বগুণবিভূষিত ও সকল সৌন্দর্য্যের আধার বলিয়া প্রতিপন্ন করে। ইহাই ভালবাসার সাধারণ ধর্ম্ম। তাহার উপর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা গোবিন্দদাসের ইষ্টদেবতা; সেই ইষ্টদেবতাদ্বয়ের রূপ বর্ণনা করিবার কালে তিনি সকল সময়ে আত্মসংযম রাখিতে পারেন নাই, মধুময়ী কল্পনা সাহায্যে তাঁহার ভক্তিপ্রবণ চিত্ত রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণা করিয়া আমাদের চক্ষের সমক্ষে সজীব ভাবে বিচিত্র করিয়াছে। ভক্তের ভগবৎমূর্ত্তি-কল্পনা ও তাহার বর্ণনা বৈষ্ণব কবিতায় অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। গোবিন্দদাস শুধু রাধাকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেন নাই, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর রূপও বর্ণনা করিয়াছেন। গোবিন্দদাস শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী এবং তাঁহাতে মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রভাব বিলক্ষণ প্রকাশিত। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা—"ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়কশিরোমণি। নায়িকার শিরোমণি রাধাঠাকুরাণী।" গোবিন্দদাস শ্রীকৃষ্ণরাধাকে এই ভাবেই দেখিয়াছেন, এবং ভক্তিবিগলিত প্রাণে ভগবান্ ও তাঁহার হ্লাদিনীশক্তিকে এই হৃদয়োন্মাদক ভাবে ভাবিয়া নিজ ভক্তিসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব নায়ক ও নায়িকা-শিরোমণির রূপ কাজে-কাজেই প্রথমে তাঁহাকে চিত্রিত করিতে হইয়াছে।*

চণ্ডীদাস যে উপাদানে শ্রীরাধার প্রণয়োৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন, গোবিন্দদাসও সেই সেই উপাদান তাঁহার শ্রীরাধার প্রেমোৎপত্তির হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"পহিলে শুনলু হাম, শ্যাম দুই আখর
তৈখনে মন চুরি কেল।

---

* লেখক প্রণীত 'মধুর রস ও বৈষ্ণব কবি' দেখুন—উদ্বোধন ফাল্গুন, ১৩১৬, ১২৫-২৭।

ইত্যাদি পদ চণ্ডীদাসের "সই কে৷ শুনাইল শ্যাম নাম। কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ" এই অমৃতময় পদের রূপান্তর মাত্র। কিন্তু গোবিন্দদাসের শ্রীরাধা চণ্ডীদাসের শ্রীরাধার মত পাগলিনী নহেন, বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকার মত লালসাময়ী। গোবিন্দদাসের রাধা "যোগিনীর পারা" নহেন। তিনি লালসাময়ী সুন্দরী।

কিন্তু সে লালসার ভিতর দিয়াও তাঁহার প্রণয় কবি গোবিন্দদাসের চতুর লেখনীর মুখে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নিশসি নহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে বদন সঘন অবলম্ব॥
ক্ষণে তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ।
অবিরল পুলক মুকুল ভরু অঙ্গ॥

* * * * *

ভাব কি গোপসি গোপত না রহই।
মরমক বেদন বদনে সব কহই॥
যতনে নিবারসি নয়নক লোর।
গদগদ শবদে কহসি আধ বোল॥
আন ছলে অঙ্গ নয়নে ছলে পন্থ।
সঘনে গতাগতি করসি একান্ত॥
দূরে রহু গুরু জন গৌরব লাজ!
গোবিন্দদাস কহে পড়ল অকাজ॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ কবি নিপুণ তুলিকার স্পর্শে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহার ভিতর এক একটী কথা কবিত্বের পরাকাষ্ঠা—

রূপ নিরখিতে আঁখির লাজ
ভাসল নয়ন জলে।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগও কবি বেশ আঁকিয়াছেন।

বঙ্কিম হাসি, বিলোকন অঞ্চলে
মবু পর যো দিঠি দেল।
কিয়ে অনুরাগিণী, কিয়ে বিরাগিণী
বুঝইতে সংশয় ভেল॥

আবার

পেখণু ব্রজ নবনারী।
তরুণিম শৈশব লখই না পারি॥
হৃদয় নয়ন গতি রীতে
সো কিয়ে আন নহত পরতীতে॥
ঐছন হেরইতে গোরী।
হঠ সঞে পৈঠল মনমাহা মোরি॥

গোবিন্দদাসের পূর্ব্বরাগের চিত্রগুলি বড় উজ্জ্বল, বড় স্নিগ্ধ। এই সকল চিত্রে তাঁহার সহৃদয়তা বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। গোবিন্দদাসের শ্রীরাধা এক দিকে যেমন বিদ্যাপতির রাধিকার মত লালসাময়ী অপরদিকে তেমনি চণ্ডীদাসের রাধিকার মত প্রথম দর্শনাবধি প্রেমপরিপ্লুত-হৃদয়া। বিদ্যাপতির মত গোবিন্দদাস শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি বর্ণনা করেন নাই। আমরা যখন গোবিন্দদাসের কবিতায় প্রথম শ্রীরাধার দর্শন পাই, তখনই তিনি প্রেমমুগ্ধা যুবতী নায়িকা। তখন তিনি সখীর কথায়—

চৌদিকে চকিত, নয়ানে ঘন হেরসি
ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
বচনক ভাঁতি বুঝই নাহি পারিয়ে
কাঁহা শিখলি ইহ রঙ্গ॥

সুন্দরি কি কেল পরিজনে বাঁচি।
শ্যাম সুনাগর গুপত প্রেমধন
জানই হিয়া মাহা সাচি॥

তখনই তাঁহার "না জানি কি ব্যাধি

মরমে বাধল।” তখনই তিনি শ্যাম-মোহিতা ও শ্যাম-মোহিনী।

গোবিন্দদাসের শ্রীরাধার হৃদয়ে কৃষ্ণ-সম্ভোগ-লালসা যেমন প্রবল, কৃষ্ণের প্রতি প্রেমও তেমনি প্রবল। গোবিন্দ-দাসের রাধাকৃষ্ণ শুধু উভয়ের রূপ-বন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ আছেন; দুই জনেই দুই জনের “প্রাণ লইয়া খেলা” করিয়াছেন। দুই জনে দুইজনের রূপের উল্লাসে উন্মাদ-প্রীতি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছেন—

রাধা মাধব ভাতি।
কো বিহি নিরমিল, কোন ঘটাওল
শ্যামর গোরী সাঙ্গাতি॥
যব দুহুঁ দুহুঁ হেরি, নয়ন অঞ্জলি ভরি
আন আন পীবইতে চাহ।
তনু তনু পৈঠত, সঘনে আলিঙ্গিত,
কৈছে হোয়ত নিরবাহ॥
আরতি অধর, সুধারস পীবি,
পীবি দুহুঁক পিরীতি উনমাদ।
গোবিন্দ দাস কহে, অধিক রস আবেশে,
কিয়ে নায়ক পরমাদ॥

“নয়ন অঞ্জলি ভরি” কি সুন্দর ভাব ব্যক্ত করিতেছে—আকাঙ্ক্ষার কি উন্মাদ মূর্ত্তি এই ক'টা কথায় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে! গোবিন্দদাসের নায়ক ও নায়িকার হৃদয়ে পরস্পরের জন্য এই আকাঙ্ক্ষা শুধু তাঁহার কাল্পনিক স্বপ্নমাত্র ছিল না; তাঁহারা যে মহাপুরুষের কাছে মধু-ররসাশ্রিত বৈষ্ণবধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই জগৎপূজ্য মহাপ্রভুর জীবনে এই সকল ভাব অহরহঃ স্ফুরিত হইতে দেখা গিয়াছিল।

“রা কহি ধা পঁহু কহই না পারিয়ে
ধারা ধরি বহে লোর।
সোই পুরুন মণি লোটায় ধরণী
পুণি কোহে আরতি ওর॥”

গোবিন্দদাস-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের এই চিত্র একটী জীবন্ত চিত্রের প্রতিচ্ছবি, কল্পনা মাত্র নহে।

গোবিন্দদাস বৈষ্ণব কবিকুলের প্রথা মত মিলন-সম্ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় অনেকে অশ্লীলতা ভিন্ন আর কিছু দেখিতে প্রস্তুত নহেন, তাহা আমাদের অবিদিত নহে। এতৎ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা আমি উদ্বোধন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছি। * এখানে এইটুকু বলিলেই চলিবে যে বৈষ্ণব কবির গান যদি কেবল পার্থিব প্রণয়ের গান বলিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও এই সম্ভোগচিত্রগুলি স্বাভাবিক বৈ অস্বাভাবিক নহে, তাহা মনুষ্য-হৃদয়জ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন। ভালবাসার যাহা স্বাভাবিক পরিণতি তাহাই বৈষ্ণব কবি বর্ণিত করিয়াছেন; শুধু বৈষ্ণব কবি কেন সকল মহাকবিরাই ইহাই বুঝাইয়াছেন। শুধু এই কথা বলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি যে গোবিন্দদাসের সম্ভোগচিত্র কেবল শারীরিক সম্ভোগ নহে, ইহাতে মনের অংশও অনেক পরিমাণে আছে। এ গুলি ভারতচন্দ্রের ও তাঁহার শিষ্যগণের সম্ভোগচিত্রের মত নির্লজ্জ শারীরিক মিলনের একটা ক্ষণিক উত্তেজনা-সঞ্জাত নিরবচ্ছিন্ন দৈহিক আলিঙ্গনের চিত্র নহে।

* উদ্বোধন—১৩১৩ চৈত্র, ১৬১।

ইহাও লক্ষ্য করিতে পারা যায় যে এই সকল চিত্র অঙ্কিত করিবার কালে কবির হৃদয়ে কোনও কুভাব উদিত হয় নাই। বরঞ্চ ইহাদের ভিতর হইতে প্রেমের নিত্য নূতনত্ব ও বর্দ্ধনশীলতা বেশ প্রকটিত হইয়াছে, এবং কবির হৃদয়ে একটী অপার্থিব ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।

দুই জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
দুহুঁ রূপ নিতি নিতি দুহুঁ হিয়ে জাগে॥
দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ পরিরম্ভণে দুহুঁ ভেল ভোর॥
দুহুঁ দোহা যৈছন দারিদ হেম।
নিতি নিতি আরতি নিতি নব প্রেম॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দ দাস॥

কবি গোবিন্দদাসের মন এ সকল বর্ণনার কালে কোথায়? তাঁহার দৃষ্টি কি নিতান্ত নীচ প্রবৃত্তি চালিত হইয়া এই অপূর্ব্ব যুগলমিলন দেখিয়াছে? যাঁহারা অত্যন্ত অন্ধভাবে বৈষ্ণব কবির চর্চ্চা করেন, তাঁহারাই এমন কথা বলিবেন। আমরা দেখিতে পাই যে মিলন-সম্ভোগ-বর্ণনা কালেই যেন কবির চিত্ত আরও ভক্তি-বিধৌত হইয়াছে, যেন তাঁহার আরও ইষ্ট-চরণে মতি বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই বর্ণনার কালেই কবির লেখনী আরও সংযত হইয়াছে, আর সেই সময়েই

চরণে বেড়িয়া চারু অরুণ সরোরুহ
মধুকর গোবিন্দ দাস।

গোবিন্দদাসের সম্ভোগ-বর্ণনা কি জাতীয়, তাহা তাঁহার "রসোদ্গার" শীর্ষক কবিতা-গুলিতে প্রকাশিত।

হৃদয় মন্দিরে, মোর কানু ঘুমাওল,
প্রেম প্রহরী রহু জাগি।
গুরুজন গৌরব, চৌর সদৃশ ভেল,
দূরেহুঁ দূরে রহু ভাগি॥
সজনি এতদিনে ভাঙ্গল ধন্দ।
কানু অনুরাগ— ভুজগে গরাসল,
কুল দাদুরি মতি মন্দ॥
আপনক চরিত আপনি নাহি সমুঝিয়ে
আন করত হোয় আন।
ভাবে ভরল তনু পরিজন বাঁচিতে
গ্রহপতি সপতিক ঠাম॥
নিঁদহু নিঁদ, নয়ানে না হেরিয়ে,
না জানিয়ে কি ভেল আঁখি।
অতএ পরমাদ, কহই না পারিয়ে,
গোবিন্দদাস এক সাখী॥

আমরা আরও দেখিতে পাই যে গোবিন্দ-দাসের কবিত্ব এ সকল বর্ণনায় উছলিয়া উঠিয়াছে, তিনি আর এখানে শুধু শিল্পী নহেন, তিনি এখানে যথার্থ কবি। কত সুন্দর ভাবে তিনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম প্রকটিত করিয়াছেন। বাঙ্গালাসাহিত্যে তাহা একটী নূতন ভাবের প্রবাহ ছুটাইয়াছে। তাঁহার ভাব-প্রকাশ-শক্তি অসীম, সরস ও জটিলতা-দোষ-শূন্য।

মোর অঙ্গ সঙ্গ আশে, লালসা পাইয়া রসে
প্রাণনাথ বলে জিনু জিনু।
নিজ অনুগত জনে গণিয়া রাখিবে মনে
এ তনু তোমারে দিনু দিনু।
বন্ধুয়া বোলয়ে ধনি কালিয়া কস্তুরী খানি
ও রাঙ্গা চরণ তলে মাখি।
সখীর সমাজে তোর ঘোষণা রহুক মোর
নিগূঢ় মরম তার সাখী॥

বিলম্বিত শ্যাম যায় বীজন করয়ে গায়
আপনে ভুলায় গুণা পান।
গোবিন্দ বলয়ে ধনি শুন ওগো ঠাকুরাণী
তুমি সে কান্থর একপ্রাণ॥

গোবিন্দদাসের হৃদয়ের প্রেম এই সকল চিত্র অবলম্বন করিয়া এক অতিশয় নিবিড় রসের প্রস্রবণ সৃষ্টি করিয়াছে—কবিত্বের শীতল বারিতে বাঙ্গালীর হৃদয় সিক্ত ও স্নিগ্ধ করিয়াছে।

ও নব নাগর, রসের সাগর,
আগোর সকল গুণে।
সে সব চরিত, আদর পিরীত
ঝুরিয়া মরি যে মনে॥
পিরীতি বল, কত না ছল,
সে কি নাশে আকুতি সাধে।
মান মাগিয়া, মধুর ভাখিয়া,
হাসিয়া মরম বাঁধে॥
সে মোরে কোলেতে, করিয়া ভাবিয়া,
বদনে বদন দিয়া।
মধুর চুম্বিয়া বিধু বিড়ম্বিয়া
পরাণ লইল পিয়া॥

* * * *

ও দিঠি চাতুরী মুখের মাধুরী
লহরী কত বা আর।
এ সুখ শুনিতে, ঝুরিয়া মরয়ে
দাস গোবিন্দ ছার॥

যদি যুগলমিলনের রসাস্বাদ করিবার ক্ষমতা আমাদের থাকে, তবে এই সকল কবিতা হইতে তাহা সাধিত হইবে; মিলনে শুধু চপলতাই অভিব্যক্ত হয় না, প্রেমও ব্যক্ত হয়, তাহা বেশ বুঝা যাইবে।

গোবিন্দদাস ভক্ত কবি, প্রেমিক কবি। প্রেমের দীনত্ব তিনি এমন সুন্দর ভাবে বুঝাইয়াছেন যে তেমন আমরা চণ্ডীদাসের কাছেও বুঝি নাই।

একলি যাইতে যমুনার ঘাটে।
পদচিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে॥
প্রতি পদ চিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ॥

এমন লালসা কি কেহ কখনও দেখিয়াছেন? বাঙ্গালা-সাহিত্যে গোবিন্দদাস এ সকল অদ্ভুত ভাবের প্রথম পরিচায়ক—

আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে।
ঘুরি ঘুরি জনু ভ্রমরা বুলে॥

এ লালসা ভক্তের প্রতি ভগবানের লালসা, শ্রীরাধার লালসা, ভগবানের প্রতি ভক্তের লালসা, এ কথা আবার যখন আমাদের মনে উদিত হয়, তখন আমাদের হৃদয় আনন্দে ও উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। বৈষ্ণব কবির গানের যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইলে যদি আমাদের এতদুর পরমলাভ, তবে অন্ধের ন্যায় কেন আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা না করিয়া নিজের ক্ষতি ও কবির অযথা নিন্দবাদ করিব?

যথার্থ প্রেমের দৈন্য গোবিন্দদাস "মানের" চিত্রে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। মানের চিত্র প্রায় সকল বৈষ্ণব কবিই আঁকিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দদাসে এ বিষয় একটু সরসত্ব আছে, একটু নূতন সুর আছে। বোধ হয় এ কথা বলিলে নিতান্ত অন্যায় হইবে না যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসেও মানের চিত্র এত সরস নহে। গোবিন্দদাসের মানের চিত্রে; কতকগুলি চরিত্র বড় সুন্দর ফুটিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র

ও সখী চরিত্র। শ্রীরাধার চরিত্রও বেশ কোমলত্ব লাভ করিয়াছে। মান বড় মিষ্ট যেখানে যথার্থ প্রণয় থাকে। সেই ভাল-বাসা গোবিন্দদাসের চিত্রে বড় মধুর রূপ ধারণ করিয়াছে।

সখী-চরিত্র বৈষ্ণব কবিতায় বড় উপাদেয়। নিঃস্বার্থতার মূর্ত্তি-স্বরূপিণী সখীগণ বৈষ্ণব কাব্যের অলঙ্কার-স্বরূপ। রাধাকৃষ্ণের মিলন সাধনই ইহাদের চরম সাধনা, ইহাতেই তাহাদের সুখ, ইহাতেই তাহাদের তৃপ্তি। মানে সখীদের চিত্র অত্যন্ত মনোহর। শ্রীরাধার হৃদয়ের সকল তত্ত্ব সখীদের কাছে বিদিত, যখন শ্রীরাধা কৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান, করিলেন, তখনই সখী বুঝিল যে রাধার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। সখীর কার্য্য আরম্ভ হইল। যখন রাধা কৃষ্ণকে বিদায় দিলেন, তখন সখী তাঁহাকে তীব্র তিরস্কার করিতেছে, কিন্তু যখন আবার রাধার অন্তঃকরণ ব্যথা-বিগলিত বলিয়া জানিতে পারিল, তখন যুগলমিলন সাধিত করিবার জন্ম সখীর চেষ্টার অবশেষ রহিল না। সকলের অপেক্ষা ফুটিয়াছে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র। স্বার্থহীন প্রেম গোবিন্দদাসের কৃষ্ণচরিত্রে সম্যক্ বিকশিত।

রাই অনাদর, হেরি রসিক বর,
অভিমানে করল পয়ান।
নয়নক লোরে পথ-লখই না পারই
পীতবাসে মুছই বয়ান॥
হরি হরি নিজ অপরাধ না জান।
সো হেম রসবতী কতি লাগি নিরখল
কাহে করল মোহে মান॥
মোহে উপেখি রাই কৈছে জীয়ব
সো দুখ করি মান
রসবতী হৃদয় বিরহ জরে জারব
ইথে লাগি বিদরে পরাণ॥
রাই সম্বাদ সুধারস সিঞ্চনে
তনু তিরপিত কর মোর।
গোবিন্দ দাস যব যতনে মিলাওব
তব যশ গাওব তোর।

গোবিন্দদাস শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে যে সুন্দর নিঃস্বার্থতার আরোপ করিয়াছেন তাহা আমরা বিদ্যাপতির অথবা চণ্ডীদাসের মানের চিত্রেও দেখিতে পাই না, ইহা তাঁহার কম ক্ষমতার পরিচয় দেয় না। ইহাই তাঁহার কবিত্বের প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ। কবি এই স্থলে তাঁহার মনুষ্য-চরিত্র-চিত্রণক্ষমতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

গোবিন্দদাসের প্রেম—সাধারণতঃ বৈষ্ণব কবির প্রেম—যে কি অলৌকিক পদার্থ তাহা যাঁহারা তাঁহার "প্রেম-বৈচিত্র্য" মনঃসংযোগ সহকারে চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। তাঁহারা বুঝিবেন যে বৈষ্ণব কবির "সম্ভোগ" ইন্দ্রিয়-চপলতা ও জঘন্য লালসার বিলাস-ক্ষেত্র-মাত্র নহে। মহাকবি চণ্ডীদাস তাঁহার অমর ভাষায় এই প্রেম-বৈচিত্র্যের সূত্রপাত করিয়াছেন—"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"। গোবিন্দদাসে "প্রেম-বৈচিত্র্য" আরও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে; তাঁহার চিত্রে "বিচ্ছেদ ভাবিয়া" নাই; পূর্ণ আলিঙ্গনের মধ্যেই পূর্ণ বিরহ। যাঁহারা পার্থিব প্রণয়ের কবি তাঁহারা মিলনে বিরহের আশঙ্কাটুকু পর্য্যন্তই ভাবিতে পারেন —

"I am afraid
Being in right, all this is but
a dream,
Too fratterning, sweet to be substantial."
—Romeo-Juliet.

চণ্ডীদাসের চিত্র ইহার অনেক উপরে। যে মিলনে বিরহের আশঙ্কা আছে সে মিলন ক্ষণিক ইন্দ্রিয়-সুখান্বেষণের মিলন নহে, চণ্ডীদাসের "দুহুঁ কোরে দুঁহু কাঁদে বিরহ ভাবিয়া" এই আমাদিগকে এই তথ্য শিক্ষা দেয়। কিন্তু গোবিন্দদাসের

রোদিতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর॥
জানহুঁ রে সখি প্রেম আগয়ান।
নাগর কোরে নাগরী নাহি জান॥
মুরছলি নাগর মুরছলি রাই।
বিরহে বিয়াকুল কুল না পাই॥

আরও গভীরতর তত্ত্ব প্রচার করিতেছে। গোবিন্দদাস আমাদিগকে শিখাইয়াছেন যে প্রেম অপার্থিব সামগ্রী, ইহা অঙ্গের সঙ্গ দ্বারা ধরা যায় না; রাধাকৃষ্ণের যে অপার্থিব ভালবাসা তাহাতে অঙ্গ সঙ্গের উপলব্ধি পর্য্যন্ত নাই। বৈষ্ণব কবির ভালবাসার আধ্যাত্মিকতা এইখানে উজ্জ্বল বর্ণে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। প্রেমের অস্তিত্ব অঙ্গসঙ্গে নহে, প্রেমের স্থান হৃদয়ে। তাই কবি গোবিন্দদাস বলিয়াছেন, যে অসীম লালসায় বিচলিত হইয়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মিলন কামনা করিয়াছিলেন, সেই লালসায় সম্পূর্ণ পরিণতি ফল প্রাপ্তির কালেই এই প্রেমিক যুগল বুঝিতে পারিলেন যে, সম্পূর্ণ দৈহিক মিলনেই পূর্ণ বিরহাবস্থা উপস্থিত হয়। বিদ্যাপতি প্রেমের লালসা, চণ্ডীদাস প্রেমের উন্মাদ ও গোবিন্দদাস প্রেমের আধ্যাত্মিকতা দেখাইয়াছেন। বৈষ্ণব কবিতার পবিত্র ভাবে অনুপ্রাণিত আধুনিক ক্ষমতাশালী কবি রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দদাসের এই চিত্রের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া লিখিয়াছেন—"হৃদয়ের ধন কিরে ধরা যায় দেহে"। প্রেম-বৈচিত্র্যে প্রেমের আদর্শ ও আধ্যাত্মিকতা চিত্রিত হইয়াছে।

প্রেমের সাধনায় লালসা বড় উপকারী। তীব্র লালসা মনে না আসিলে আকাঙ্ক্ষিতের জন্য লালায়িত হইতে পারা যায় না। যদি প্রাণ ঢালিয়া ভাল বাসিয়াছ ত হৃদয়ে প্রিয়-সঙ্গের জন্য অসীম লালসা পোষণ কর, তোমার প্রতি অঙ্গকে বাঞ্ছিতের প্রতি অঙ্গের আশ্লেষ-সুখ-সম্ভোগের অমৃত রসাস্বাদনে প্রেরিত কর; তবে ইষ্টলাভ কামনা হৃদয়ে জাগিয়া থাকিবে। রূপ—রূপ নয়, যে অবধি সে রূপ প্রিয়তমের সুখ উৎপাদন না করে; অঙ্গ—অঙ্গ নয়, যে অবধি তাহার দ্বারা প্রিয়তমের সেবা না হয়; দেহ—দেহ নয়, যে অবধি তাহা প্রিয়তমের ভোগার্থ উৎসর্গীকৃত না হয়। মনকে সর্ব্বদা প্রিয়-চিন্তায় নিযুক্ত রাখ। কিন্তু মনে আকাঙ্ক্ষার বা লালসার বিন্দুমাত্র লোপ করিও না। মনের সমস্তটাই প্রিয়তমের সঙ্গ-কামনারূপ অতল জলে ডুবাইয়া দাও। গোবিন্দদাসের পদাবলীর প্রথম স্তর এই ভাবে বিরচিত। গোবিন্দদাসের প্রথম স্তরে কেবল সৌন্দর্য্য ও লালসা, রূপ ও আকাঙ্ক্ষা। এখানে

দেখিবে রূপের জয়, রূপতৃষ্ণা, আসঙ্গলিপ্সা, মিলনের চাঞ্চল্য, হৃদয়ের তরলতা, মান অভিমান, সকলই কিন্তু একটী সুবর্ণসূত্রে গ্রথিত অনন্ত ভালবাসা। তিনি বলিতেছেন তুমি মনে মনে ভালবাস, তাহাতে তোমার প্রিয়তমের কি আসে যায়, তোমার যাহা কিছু—দেহ, মন, ইন্দ্রিয়—সব তাঁহাকে অর্পণ কর, তাঁহার রূপসম্ভোগ-তৃষ্ণা মিটাও, তোমার অঙ্গ-সঙ্গ-কামনা চরিতার্থ কর, প্রিয়তমকে বুকে রাখ; মনকে সাক্ষীস্বরূপ এ সকল কাজেই নিযুক্ত কর, কিন্তু তাহার বেশী এখন আর তাহার কর্ত্তব্য নাই, তাহার বেশী তাহাকে আর কিছু করিতে দিও না। লালসার দ্বারা প্রিয়তমকে লাভ কর। স্বভাবজ্ঞ কবি এই স্তরে মনুষ্য-স্বভাবের নিখুঁত ছবি তুলিয়াছেন।

তাঁহার দ্বিতীয় স্তরে উপস্থিত হইয়া আমরা প্রেম-সাধনার দ্বিতীয় তত্ত্ব জানিতে পারি। প্রেম-বৈচিত্র্য এই স্তরের অন্তর্গত। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে লালসা দ্বারা প্রিয়তমের কাছে উপনীত হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিবার ইচ্ছা করা স্বাভাবিক বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে ধরিবার উপায় নাই, সেই অমৃত স্বরূপের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাম পরাভূত, ইন্দ্রিয়ের কার্য্য একেবারে বিলুপ্ত, ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার অনুভূতি হইয়াও হয় না। এখানে আর গোবিন্দদাস প্রণয়ের কথা কহিতেছেন না, এখানে তিনি প্রেমের কথা, ভক্তির কথা কহিতেছেন। এখানে আর তাঁহার নায়ক-নায়িকা নরনারী নহে, ভক্ত ও ভগবান্। কিন্তু তাঁহার যে অমৃতময় উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মিলন-ব্যপদেশে বিবৃত হইয়াছে, তাহা যদি পার্থিব প্রণয়ের আদর্শ করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলেও আমাদের অশেষ উপকার।

গোবিন্দদাসের তৃতীয় স্তর আরও উপাদেয়। এই স্তরে শ্রীরাধার বিরহ, দিব্যোন্মাদ, ভাবোল্লাস, ও ভাবসম্মিলন বর্ণিত হইয়াছে। এখানে উপস্থিত হইয়া গোবিন্দদাস দেহ বিস্মৃত হইয়াছেন, যে টুকু ইন্দ্রিয়-স্মৃতি আছে, তাহাও আর স্বার্থময়ী নহে, যে টুকু ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহাও আধ্যাত্মিকতায় উন্নীত হইয়াছে। এমন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জাগরূক আছে মন; আর জাগিয়াছে মনের প্রবর্ত্তক আত্মা। এখন রসাস্বাদ, সম্ভোগ-বাসনার পরিবর্ত্তে আছে একীকরণ বাসনা, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রেমাস্পদের সহিত মিশাইয়া দিবার বাসনা—হৃদয় দিয়া বাঁধিবার আকুল আকাঙ্ক্ষা। এখন শ্রীরাধার মনে দেহের কথা আসে না, আসে প্রাণের কথা; নিজের সুখের কথা আসে না কেবল বঁধুর সুখের চিন্তা লইয়া, বঁধুর স্মৃতি লইয়া, তাঁহাকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিবার কামনা লইয়া এখন তাঁহার দিন কাটিতেছে। গোবিন্দদাস এই খানে কবিত্বের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া অমর সঙ্গীত গাহিয়াছেন:—

এই তো মাধবী তলে, আমার লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সতত ধেয়ায়।
পিয়া বিনে হিয়া কেন ফাটিয়া না পড়ে গো
নিলাজ পরাণ নাহি যায়॥

প্রভৃতি পদ হৃদয়ের অন্তস্তল আলোড়িত

করিয়া চণ্ডীদাসের মর্ম্ম-গীতির প্রতিধ্বনি আনয়ন করে। পিয়ার বিরহে বিরহিণী রাধিকার শরীর আর শরীর নাই, জীবনে আত্মা নাই, কেবল মর্ম্মভেদী গম্ভীর ক্রন্দন।

যো যদি জানিতাম পিয়া যাবেরে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বাঁধিয়া॥

নবপ্রবুদ্ধা রাধিকার চৈতন্য ফিরিয়া আসিয়াছে, তাঁহাতে মনের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, আত্মার কাজ আরম্ভ হইয়াছে; এখন তাঁহার কাছে শরীর নিতান্ত ছার, প্রাণ উপেক্ষার বিষয়—

এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণি।

যাঁহার মান-অভিমান, সাজ-সজ্জা, চাঞ্চল্য ছিল, তাঁহার এখন একমাত্র চিন্তা

সো গুণনিধি যদি প্রেম হামে ছোড়।
তিল এক হেরইতে লাজ বহু মোর॥
তহু বড় বাসল হৃদি মাহা এহ।
কিয়ে সুখ লাগি ভবম নহ দেহ॥

এখন সেই মানিনী, গর্ব্বিতা শ্রীরাধা, যিনি কথায় কথায় শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সেই প্রেম-দর্পিতার ঐকান্তিক বাসনা—

জনমে জনমে হউ সে পিয়া আমার।
বিধি পায়ে মাঙ বুঝি এই বর সার॥

যে রাধিকা মিলনের সময়ে বলিয়াছিলেন—

আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে।
ঘুরি ঘুরি যেন ভ্রমরা বুলে॥

তিনিই এখন সেই অঙ্গের একমাত্র সদ্ব্যবহার করিতে চাহেন কেমন করিয়া?

যাঁহা পহু অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইও মঝু গাত॥
যো দরপণে পহু নিজ মুখ চাহ।
হাম অঙ্গ জ্যোতিঃ হইও তহু মাহ।
যো সরোবরে পহু নিতি নিতি নাহ।
হাম অঙ্গ জ্যোতিঃ হইও তহু মাহ॥
যোই বীজনে পহু বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহে হইও মৃদু বাত॥
যাঁহা পহু ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হইও তহু ঠাম॥

ইহা ভক্তের আত্মসমর্পণ সত্য, কিন্তু প্রেমের আত্মসমর্পণ ও ভক্তির আত্মসমর্পণে প্রভেদ নাই, যাহা ভক্তের আত্মসমর্পণ তাহাই প্রেমিকের আত্মসমর্পণ। এমনি মধুর নিঃস্বতায় গোবিন্দদাসের পদাবলী সমাপ্ত হইয়াছে, এমনি দীনতায় তাঁহার শ্রীরাধার বিরহ-তপস্যার পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজ বিহারি।
হৃদি মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি॥
গুরুজন গঞ্জন অঙ্গভূষা।
রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা॥
শৈলসম কুলমান দুর করি।
তব চরণে শরণাগত কিশোরী॥
আমি কুরূপা গুণহীনা গোপনারী।
তুঁহি জগরঞ্জন মোহন বংশীধারী॥
আমি কুলটা কলঙ্কী সৌভাগ্যহীনী।
তুঁহি রস পণ্ডিত রসিক চূড়ামণি॥

শ্রীরাধার সহিত সায় দিয়া ভক্ত কবি কহিয়াছেন—

গোবিন্দদাস কহে শুন শ্যামরায়।
তুয়া বিনে মোর মনে আন নাহি ভায়॥

এইরূপ ভক্তিমিশ্র আত্ম পুষ্পাঞ্জলি প্রিয়তমের পবিত্র চরণে ভক্তি-নম্র হৃদয়ে প্রেম-বিগলিত চিত্তে সমর্পণ করিয়া ভক্ত কবি গোবিন্দদাস তাঁহার পদাবলীর উপসংহার

করিয়াছেন। আমরাও কি তাঁহার সহিত বলিতে পারিব—

তুয়া বিনে মোর মনে আন নাহি ভায়?

গোবিন্দদাসের কবিত্বের এই যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় লইয়াই আমরা বুঝিতে পারিলাম যে তাঁহার শিল্পকৌশল বিচিত্র, তাঁহার কবিত্ব সরস ও প্রগাঢ়। বৈষ্ণব সাহিত্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস তিনটী উজ্জ্বল নক্ষত্র। বিদ্যাপতি রসিক, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস ভক্ত, তিন জনেই প্রেমিক, তিন জনেরই কবিত্ব বঙ্গসাহিত্যে এক অভাবনীয় ভাব-বন্যার সৃষ্টি করিয়াছে, প্রেমরাজ্যে এক অভূতপূর্ব্ব উল্লাসের অবতারণা করিয়াছে, বৈষ্ণব দার্শনিকের পথ সুগম করিয়াছে, বৈষ্ণব ভক্তের হৃদয়ে মন্দার-সুরভি মলয়ানিল প্রবাহিত করিয়াছে, প্রেমিকের প্রেমতৃষ্ণা মিটাইয়াছে, ভবিষ্যৎ কবির ভাব-প্রসূন বিকশিত করিয়াছে, সাহিত্যসেবী মাত্রেরই হৃদয়ে পবিত্র আনন্দের উৎস উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

মানবের জন্মকথা। *

সমস্ত মানবকে যদি একটী জাতি মনে করা যায় তবে এই জাতির বিস্তৃতি অত্যন্ত অধিক দেখা যায়। কিন্তু ইহার কতিপয় বর্গের বিস্তৃতিও সামান্য নহে। জীব-বিজ্ঞানের এক সুপরিজ্ঞাত নিয়ম এই যে, সংকীর্ণ জাতি অপেক্ষা বিস্তৃত জাতি অধিকতর পরিবর্ত্তনশীল। মানবের পরিবর্ত্তনশীলতা বিস্তৃত জাতির পরিবর্ত্তনশীলতার সহিত তুলনীয়; গৃহপালিত জন্তুর পরিবর্ত্তনের সহিত তাদৃশ তুলনীয় নহে।

মানবের এবং ইতর জন্তুগণের পরিবর্ত্তন একই প্রকার সাধারণ কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। শুধু তাহাই নহে, উভয়ের দেহের তুল্যাংশগুলিও প্রাণতুল্য রূপেই পরিবর্ত্তিত হয়। গড্রুণ এবং কোয়াত্রাফেজেস্ এই কথা এত বিশদরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে। ঐরূপ পরিবর্ত্তন, যাহা ক্রমে ক্রমে অতি বিকৃতাবস্থায় পরিণত হয়, তাহাও মানবে এবং ইতর জন্তুতে এত

---

* Lobule—নতি
Cartilege—কোমলাস্থি।
Coccum—অন্ত্রাগ্র।
Vertebra—কশেরু, মেরুদণ্ডাস্থি।
Sacrum—ত্রিকাস্থি।
Convoluted—কুণ্ডলীকৃত।
Monstrosity—বিকৃতি।
Optic-nerve—দর্শন-স্নায়ু।
Humerus—প্রগণ্ডাস্থি।
Ulna-radius—প্রকোষ্ঠাস্থি।
Development—পরিবর্দ্ধন, বিবর্দ্ধন
Growth—বৃদ্ধি।
Anatomy—গঠন বিদ্যা।
Constitution—ধাতু।
Molar Bone—গণ্ডাস্থি।
Metatarsus—প্রপদাস্থি, পদাস্থি
Metacarpus—করভাস্থি।
Cornua—শৃঙ্গ (জরায়ুর)।

সমভাবাপন্ন যে তাহাদিগকে তুল্যরূপেই শ্রেণী বিভাগ করা যায়, এবং তুল্য নামাকরণও করা যাইতে পারে ; জিওফ্রী সেণ্ট হিলেয়ার ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। গৃহপালিত জন্তগণের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমি যে পুস্তক রচনা করিয়াছি, তাহাতে পরিবর্ত্তনের কারণ সকল মোটামোটি নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। (১) অবস্থার পরিবর্ত্তনে যে সকল নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তন সাক্ষাৎস্বরূপে উৎপন্ন হয়, যথায় একবর্গীয় সমস্ত অথবা প্রায় সমস্ত প্রাণীই তুল্য অবস্থায় তুল্যরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। (২) দীর্ঘকাল কোন অঙ্গের ব্যবহারে অথবা অব্যবহারে যে পরিবর্ত্তন উৎপন্ন হয়। (৩) তুল্য অঙ্গের সংযোজন। (৪) অঙ্গিকাঙ্গের * অতিমাত্র পরিবর্ত্তন। (৫) ক্ষতিপূরণ ;† কিন্তু মানবে আমি এই নিয়মের উত্তম দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হই নাই। (৬) এক অঙ্গের চাপবশতঃ অন্য অঙ্গের যে পরিবর্ত্তন হয় ; যেমন বস্তিগহ্বরের চাপে গর্ভস্থ ভ্রূণের করোটির আকার-পরিবর্ত্তন। ‡ (৭) পরিবর্দ্ধন রুদ্ধ হওয়ায় কোন অঙ্গের খর্ব্বতা অথবা লোপ-প্রাপ্তি। (৮) যে অঙ্গ কোন পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাণীর ছিল কিন্তু পরবর্ত্তী প্রাণীদেহে উৎপন্ন হয় নাই, তৎপরিবর্ত্তিগণের মধ্যে কাহারও দেহে সেই অঙ্গের পুনরুৎপত্তি, ইহা পুনরাবর্ত্তন-বশত হইয়া থাকে। * (৯) সহ-পরিবর্ত্তন। এই সকল তথাকথিত বিধান সকল মনুষ্যে এবং ইতর জন্তুতে তুল্যরূপেই খাটে ; এবং এ সকল মধ্যে অনেকগুলি উদ্ভিদেও প্রযোজ্য। সকলগুলির আলোচনা করা এ স্থলে বাহুল্য মাত্র ; কিন্তু কতকগুলি এত গুরুতর যে এ স্থলে তাহাদিগের বিস্তৃত আলোচনা করা অত্যাবশ্যক।

অবস্থার পরিবর্ত্তনে সাক্ষাৎস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তন।—এইটী অতীত জটিল বিষয়। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, অবস্থার পরিবর্ত্তনে সকল জীবদেহেই কিছু কিছু, কখন বা গুরুতর, পরিবর্ত্তন উৎপন্ন হয়। প্রথমে মনে হয় যেন দীর্ঘ সময় পাইলে এইরূপ ফল সর্ব্বত্রই উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সানুকূলে আমি পরিষ্কার প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই ; পক্ষান্তরে ইহার প্রতিকূলেও সঙ্গত আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে। অন্তত যে সকল অসংখ্য দেহাংশ বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনসিদ্ধির উপযোগী, তাহাদিগের সম্বন্ধে ত বিপরীত তর্ক উপস্থিত হইতে পারে-ই। পরিবর্ত্তিত অবস্থা হইতে যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তন উৎপন্ন হইতে পারে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। ইহাতে সমস্ত জীবদেহটাই পরিবর্ত্তনশীল হইয়া পড়ে।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ১০,০০,০০০ দশ লক্ষ সৈন্যের দেহ মাপ করা হইয়াছিল।

* যদি কোন অঙ্গ অতিরিক্ত থাকে, যথা ৬টী অঙ্গুলি থাকিলে, তবে যেটী অতিরিক্ত, তাহার পরিবর্ত্তনও কিছু বেশী মাত্রায় হইয়া থাকে।

† কোন অঙ্গের ক্ষতি হইলে অন্য অঙ্গ বা তাহার ক্রিয়া কিছু বর্দ্ধিত হইয়া ঐ ক্ষতি পূরণ করে।

‡ একব্যক্তির দেহে ও বিভিন্ন অঙ্গে এই রূপ হইতে পারে।

* পুনরাবর্ত্তন বিধি আর পূর্ব্ববৎ স্বীকৃত হইতেছে না। একণে লুপ্ত অঙ্গের, কিম্বা বর্ণের পুনরাবির্ভাব মেণ্ডেলের বিধান অনুসারে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

উহারা গত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। উহারা যে যে প্রদেশে জন্মিয়াছিল ও যে যে প্রদেশে প্রতিপালিত হইয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। ইহাতে দেখা গেল যে স্থানীয় কারণ সকল সাক্ষাৎস্বরূপে সৈন্যগণের দৈর্ঘ্যের তারতম্য উৎপাদন করিয়াছিল। ইহাতে আরও বুঝা গেল যে "যে প্রদেশে উহারা বংশানুক্রমে জন্মিয়াছিল তাহার এবং জন্মাবধি অধিকাংশ কাল যে প্রদেশে বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল তাহার, উভয়েরই অবস্থানুসারে দৈর্ঘ্য স্পষ্টত নিয়মিত হয়। যথা, "বৃদ্ধির সময় যাহারা পশ্চিম প্রদেশে বাস করিয়াছিল তাহাদিগের দৈর্ঘ্য বাড়িয়া গিয়াছিল"। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে নাবিকগণের জীবন যেরূপ ভাবে অতিবাহিত হয়, তাহাতে নিশ্চয় তাহাদিগের শরীরের বিনাশ কম হয়। "১৭।১৮ বৎসর বয়সের সৈন্য ও নাবিকদিগের মধ্যে দৈর্ঘ্যের অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়।" মিষ্টার বি, এ, গোগু দৈর্ঘ্যের এইরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। তিনি কেবল এইমাত্র স্থির করিয়াছিলেন যে জলবায়ু উহার কারণ নহে, প্রদেশের উচ্চতাও কারণ নহে, মাটির অবস্থাও নহে, বিলাসোপকরণের সদ্ভাব কি অভাবও উহার বিশেষ কারণ নহে। ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশের সৈন্যগণের দৈর্ঘ্য মাপিয়া যে তালিকা সংগ্রহ হইয়াছিল, ভিলার্মি তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মিষ্টার গোগুের সিদ্ধান্ত তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। একই পলিনেসিয়া দ্বীপের দলপতিদিগের দৈর্ঘ্যের সহিত নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের দৈর্ঘ্য তুলনা করিলে, একই সমুদ্রের আগ্নেয় উৎপাতজাত উর্ব্বর প্রবালদ্বীপের অধিবাসীদিগের সহিত অনুর্ব্বর অনুচ্চ প্রবালদ্বীপ সমূহের অধিবাসিগণের দৈর্ঘ্য তুলনা করিলে, ফিউজিয়ানদিগের দেশের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলের অধিবাসিগণের দৈর্ঘ্য তুলনা করিলে,—(পূর্ব্বে ও পশ্চিমে আহার-সংস্থানের ইতরবিশেষ আছে,)—এই সকল তুলনা করিলে এ সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা অতীব অসম্ভব যে, উত্তম আহার এবং অধিক আরাম ও সুবিধাবশত দৈর্ঘ্যের তারতম্য হয়। কিন্তু উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই ইহা বুঝা যাইতেছে যে এ বিষয় স্থির মীমাংসা করা কত কঠিন। ডাক্তার বিডো সম্প্রতি প্রমাণ করিয়াছেন যে, ব্রিটনের অধিবাসিগণ মধ্যে নগরে বাস এবং কোন কোন বিশেষ ব্যবসা অবলম্বন হেতু আকৃতি খর্ব্ব হয়। তিনি বিবেচনা করেন যে ঐ খর্ব্বাকৃতি কিয়দংশে বংশানুগত হয়। যুক্তরাজ্যেও, তদ্রূপই হয়। ডাঃ বিডো বিশ্বাস করেন যে, যে স্থলে কোন মানব-বর্গ দৈহিক বৃদ্ধির চরম সীমায় উপনীত হয়, সে স্থলে তাহার মানসিক শক্তি এবং তেজস্বিতাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নত হয়।

বাহ্যিক অবস্থা পরিবর্ত্তনবশত মানব সাক্ষাৎস্বরূপে অন্য কোন বিষয়ে পরিবর্ত্তিত হয় কি না, তাহা জানা যায় নাই। জল-বায়ুর পরিবর্ত্তনে মানবের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইবে, এরূপ আশা করা যায়; কারণ

তাপের ন্যূনতা হইলে ফুস্‌ফুস্ ও মূত্রপিণ্ড অধিক ক্রিয়াশীল হয়, এবং বৃদ্ধি হইলে যকৃৎ ও চর্ম্মের ক্রিয়াশক্তি বর্দ্ধিত হয়, আলোক এবং উত্তাপবশতঃ চর্ম্মের বর্ণ এবং কেশের আকৃতির ইতর বিশেষ হয়, এইরূপ পূর্ব্বে বিবেচনা করা হইত। যদিও কিছু কিঞ্চিৎ হওয়া অস্বীকার করা যায় না, তথাপি প্রায় সকল পরিদর্শকগণই এখন এক বাক্যে বলিতেছেন যে বর্ণ ও কেশের আকৃতি সম্বন্ধে আলোক অথবা উত্তাপের ক্রিয়া থাকিলেও অতীব কম। এমন কি বহুযুগ উহারা ক্রিয়া করিলেও বিশেষ কিছু ফল দেখা যায় না। যাহা হউক, মানবজাতির বিভিন্ন বর্ণের বিষয় যখন আলোচনা করিব সেই সময়ই এই বিষয় বিবেচনার যোগ্য হইবে। আমাদিগের গৃহপালিত জন্তুগণের চুল বা রোম-বৃদ্ধি সাক্ষাৎস্বরূপে হিম ও শৈত্য দ্বারা আক্রান্ত হয়, এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ আছে। কিন্তু মানবের এইরূপ হওয়ার কোন প্রমাণ আমি পাই নাই।

কোন অঙ্গের অধিক ব্যবহার অথবা অব্যবহারের ফল।—ইহা সকলেই জানেন যে কোন ব্যক্তির পেশির ব্যবহার থাকিলে উহা সবল হয়, এবং ব্যবহার না থাকিলে, অথবা পেশি-চালক স্নায়ু বিনষ্ট হইলে ঐ পেশি দুর্ব্বল হয়। চক্ষু নষ্ট হইলে দর্শন-স্নায়ু হ্রস্ব ও অকর্ম্মা হয়। একটী ধমনীকে বাঁধিলে, (বাঁধাস্থানের উপর দিকে) পার্শ্বের প্রণালীগুলির ব্যাস ও বৃদ্ধি হয়-ই, উহাদিগের বহিরাবরণও অধিক পুরু এবং সবল হয়। একটী মূত্রপিণ্ড পীড়াবশতঃ অকর্ম্মা হইলে দ্বিতীয়টী আয়তনে বাড়ে, এবং দ্বিগুণ কর্ম্ম করে। অধিক ভার বহিতে বহিতে অস্থি অধিক পুরু হয় এবং দীর্ঘ হয়। ব্যবসায়-ভেদে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাণও বিভিন্ন হয়; অর্থাৎ দীর্ঘকাল কোন ব্যবসা করিলে অঙ্গও তদুপযোগী ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। (আমেরিকার) যুক্তরাজ্যের কমিশন অবধারণ করিয়াছেন যে, গত যুদ্ধে সে সকল নাবিক কার্য্য করিয়াছিল, তাহাদিগের জঙ্ঘা সৈন্যদিগের জঙ্ঘা অপেক্ষা প্রায় $\frac{1}{4}$" ইঞ্চি অধিক দীর্ঘ; কিন্তু সৈন্যদিগের দেহ অপেক্ষা নাবিকদিগের দেহ হ্রস্ব। নাবিকদিগের প্রগণ্ড (অর্থাৎ হাত) সৈন্যদিগের হাত অপেক্ষা প্রায় ১$\frac{1}{5}$" ইঞ্চি ছোট, সুতরাং দেহের অনুপাত অনুসারে অমিল দেখায়। নাবিকদিগের হাতের ব্যবহার অধিক, সুতরাং হাত ছোট হইয়া যাওয়া এক আশ্চর্য্য ঘটনা, কিন্তু নাবিকগণের হস্ত প্রায়শঃ টানা-কার্য্যে* ব্যবহৃত হয়, ভারবহা-কার্য্যে নহে। সৈন্যদিগের অপেক্ষা নাবিক-দিগের গ্রীবা এবং পাদোর্দ্ধভাগ অধিক মোটা; কিন্তু বক্ষের, কটির ও নিতম্বের পরিধি কম।

বংশানুক্রমে দীর্ঘকাল ঐ সকল কর্ম্ম করিলে উপরের বর্ণিত পরিবর্ত্তনগুলি বংশানুগত হইবে কি না তাহা জানা যায় না; কিন্তু হওয়া সম্ভব। † পায়াগ্না ইণ্ডিয়ান-দিগের জঙ্ঘা সরু এবং বাহু মোটা। রেঞ্জার

* দড়ি টানা, পাল টানা ইত্যাদি।

† ওয়াইস্‌ম্যান প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন যে কোন কালেও বংশানুগত হইতে পারে না।

বিবেচনা করেন যে উহারা বংশানুক্রমে নৌকায় বাস করে, তাহাতে উহাদিগের পায়ের বেশি ব্যবহার নাই, সুতরাং ঐরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই প্রকার অন্যান্য স্থলে অপর লেখকগণও এইরূপ কারণই অনুমান করেন। ক্রানৎস্ এস্‌কুইসক্‌দিগের মধ্যে বহু দিন বাস করিয়াছিলেন; তিনি বলেন যে সিল-শিকারে দক্ষতা বংশানুগত বলিয়া উহাদিগের বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের মূলে কিছু আছে, কারণ শৈশবে পিতৃবিয়োগ হইলেও এস্‌কুইসক্ বালক পিতার ন্যায় সিল-শিকারে দক্ষ হইয়া থাকে।* কিন্তু এ স্থলে দেহ-গঠনের ন্যায় মনের উৎকর্ষতাও বংশানুগত হয় বলিয়া বিবেচনা করা যায়। অনেকে বলেন ইংরাজ শ্রমজীবিগণের হস্ত ভদ্রলোকের হস্ত অপেক্ষা জন্মাবধিই দীর্ঘ। হস্তপদের সহিত হনুর (চুয়ালের) যেরূপ সমপরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, অন্তত কতিপয় স্থলে যেরূপ জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, যে সকল ব্যক্তির হস্তপদের ব্যবহার কম, তাহাদিগের হনুর আয়তনও এই কারণবশতঃ কমিয়া যাইতে পারে। শ্রমজীবী এবং অসভ্যদিগের অপেক্ষা সভ্য মানবের হনু সাধারণতঃ ছোট, ইহা নিশ্চিত। অসভ্যগণ কাঁচা খাদ্য খায়, রন্ধন করে না। এই সকল কাঁচা, মোটা আহার্য্য বস্তু চর্ব্বণ করিতে তাহাদিগের চর্ব্বণ-পেশি সকল এবং তৎসংলগ্ন অস্থিও ঐ কারণবশতঃই পরিবর্ত্তিত হয়। সদ্যোজাত শিশুর পদতলের চর্ম্ম পুরু, অন্যান্য স্থানের চর্ম্ম তদ্রূপ নহে। দীর্ঘকাল বহু পুরুষ-পরম্পরায় পদতলে (সমস্ত দেহের) চাপ পড়াতে বংশানুক্রমের বিধানানুসারে এইরূপ হইয়াছে, এ কথা অবিশ্বাস করা যায় না। *

ইহা সকলেই জানেন যে ঘড়ী-প্রস্তুতকারকগণের ও খোদাই-কারিকরগণের দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যায়; তাহারা দূরের বস্তু ভাল দেখিতে পায় না। আর যাহারা বাড়ীর বাহিরে কার্য্য করে তাহারা এবং অসভ্যগণ দূরের বস্তুই ভাল দেখে, নিকটের বস্তু তত ভাল দেখে না। হ্রস্ব-দৃষ্টি ও দূর-দৃষ্টি বংশানুগত হয়। অসভ্যগণের তুলনায় ইউরোপীয়দিগের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলের শক্তি কম; এই ভাব বহু পুরুষপরম্পরায় ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার হ্রাস হওয়ার পুঞ্জীকৃত ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ রেঙ্গার বলেন যে তিনি অনেক ইউরোপীয় ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন, যাহারা অসভ্য ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে চিরদিন লালিত-পালিত হইয়াছে এবং চিরজীবন তাহাদিগের মধ্যেই বাস করিয়া আসিতেছে, কিন্তু তথাপিও ইণ্ডিয়ানদিগের ন্যায় ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি বলেন যে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা আমেরিকার

* কর্ম্ম বংশানুগত হয় না। যে সকল দেহাংশ ঐ কর্ম্মের উপযোগী, সেই সকল দেহাংশ বংশানুগত হয়। সিল-শিকার কর্ম্ম বহু পুরুষ করিলেও তৎপরবর্ত্তিগণ নূতন করিয়া শিক্ষা না করিলে স্বভাবতঃ পারিবে না। —অনুবাদক।

* একণে ঈদৃশ কারণ এরূপ স্থলে স্বীকৃত হয় না। ব্যক্তির জীবনে যে সকল পরিবর্ত্তন অর্জ্জিত হয়, তাহা বংশানুগত হইবার প্রমাণাভাব, সুতরাং পণ্ডিতগণ একণে উহা বংশানুগত হওয়া আর স্বীকার করেন না।

আদিম নিবাসিগণের মাথার খুলীতে যে সকল ইন্দ্রিয় গহ্বর আছে, তাহা কিছু বড়। ইহা হইতে বোধ হয় যে ঐ সকল ইন্দ্রিয়ও আমেরিকানদিগের বড়। তাহাদিগের খর্পরের নাসারন্ধ্রও ইউরোপীয়ানদিগের অপেক্ষা বড়; এ কথা ব্লুম্যান ব্যাস বলিয়াছেন; এবং তিনি বিবেচনা করেন যে এই কারণবশতঃই তাহাদিগের ঘ্রাণশক্তি অধিক। প্যালাস্ বলেন যে উত্তর আশিয়া-খণ্ডের সমতলবাসী মঙ্গলীয়গণের ইন্দ্রিয়সকল চমৎকার শক্তিশালী। এবং প্রীচাড্ বিশ্বাস করেন যে তাহাদিগের ইন্দ্রিয় সকল অতিশয় পরিপুষ্ট হওয়াতেই হনু ও শঙ্খের মধ্যবর্ত্তী করোটীর * বিস্তৃতিও অধিক।

দক্ষিণ আমেরিকার পেরু-প্রদেশের অধিত্যকাবাসী কোয়েচুয়া ইণ্ডিয়ানদিগের ফুস্ফুস্ এবং বক্ষের আয়তন অত্যন্ত বেশি; য়্যাল্সিডি ডিয়র্বিণী বলেন যে তাঁহারা উচ্চ প্রদেশের অতিশয় সূক্ষ্ম বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাস করাতেই ঐরূপ হইয়াছে। ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা তাহাদিগের ফুস্ফুসের কোষ সকল আয়তনেও বড় এবং সংখ্যায়ও অধিক। এই সকল পরীক্ষার ফল কেহ কেহ সন্দেহের চক্ষে দেখেন; কিন্তু মিষ্টার ডিকর্ব্বেস্ কোয়েচা ইণ্ডিয়ানদিগের সমশ্রেণীর অনেক আইমারাদিগের দেহ যত্নপূর্ব্বক মাপিয়াছেন; উহারা ১০ হাজার হইতে ১৫ হাজার ফুট উচ্চে বাস করে; তিনি আমাকে জানাইয়াছেন যে তাঁহার পরীক্ষিত সমস্ত মানবের সহিত উহাদিগের দৈর্ঘ্য এবং পরিধির প্রভেদ স্পষ্ট দেখা যায়। তাঁহার মাপের তালিকায় প্রত্যেক ব্যক্তির দৈর্ঘ্যকে ১০০০ গণ্য করিয়া অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাপ ঐ অনুপাতে হিসাব করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, আইমারাদিগের বাহু ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা ছোট, এবং নিগ্রোদিগের অপেক্ষা অনেক ছোট, জঙ্ঘাও ছোট। আর তাহাদের এই একটা বিশেষত্ব দেখা যায় যে প্রত্যেক আইমারার টিবিয়া * নামক জঙ্ঘাস্থি অপেক্ষা ফিমার † নামক উর্ব্বস্থি ছোট। উহাদিগের দৈর্ঘ্যের গড় অনুপাত ২১১ : ২৫২। ইউরোপীয়দিগের ফিমার ও টিবিয়ার দৈর্ঘ্যানুপাত ২৪৪ : ২৩০ এবং তিন জন কাফ্রির ঐ অনুপাত ২৫৮ : ২৪১। আইমারাদিগের প্রকোষ্ঠাস্থি অপেক্ষা প্রগণ্ডাস্থি ছোট। উহাদিগের দেহ অত্যন্ত দীর্ঘ বাহুর এবং উরুর অস্থি ছোট হইবার কারণ বোধ হয় ক্ষতিপূরণবিধির দৃষ্টান্তস্থল; ‡ এ বিষয়ে মিষ্টার ফর্ব্স্ সাহেবও আমাকে এইরূপই বলিয়াছেন। আইমারাদিগের দেহগঠনে আরও কয়েকটী আশ্চর্য্যজনক বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে; তাহার মধ্যে একটী এই যে, তাহাদিগের গুল্ফ বাহিরের দিকে অল্প পরিমাণে আসে মাত্র।

এই সকল লোক অত্যুচ্চ শীতপ্রধান

---

* Zygoma.

* জঙ্ঘাতে দুই খানি অস্থি আছে; টিবিয়া ও ফিবুলা। ইহাদিগকে দীর্ঘাস্থি ও শলাস্থি বলে।

† উরুর অস্থিকে ফিমার অর্থাৎ উর্ব্বস্থি বলা যায়।

‡ বাহু ছোট হওয়ার ক্ষতি দেহ দীর্ঘ হওয়াতেই পূরণ হইয়াছে। একাঙ্গ বড় আর একাঙ্গ ছোট হওয়াকে ক্ষতিপূরণ অথবা সমীকরণ বলা যায়।

দেশে বাস করিতে এরূপ অভ্যস্ত হইয়াছে যে, স্প্যানিয়ার্ডরা যখন ইহাদিগকে পূর্ব্ব প্রদেশের সমতল ক্ষেত্রে নাবাইয়া আনিয়াছিল, এবং অদ্যাপিও যে সময় ইহারা অধিক বেতনের লোভে * নিম্ন সমতলে আগমন করে, তখন ইহারা অত্যন্ত অধিক সংখ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যাহা হউক, মিঃ ফর্বেস্ কয়েকটী আইমারা-পরিবার চিনিতেন, উহারা দুই পুরুষ সমতলে বাস করিতেছিল; তথাপি উহাদিগের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ সকল এখনও বংশানুগত হইয়া থাকে। কিন্তু অঙ্ক পরিমাপ না করিয়াও শুধু চক্ষে দেখিয়াই বুঝা যায় যে সেই সকল বিশেষ লক্ষণ কমিয়া আসিয়াছে। পরে পরিমাপান্তে দেখা গেল যে সমতলবাসীদিগের দৈর্ঘ্য উচ্চ অধিত্যকাবাসীদিগের অপেক্ষা কম হইয়াছে, তাহাদিগের ফিমার একটু লম্বা হইয়াছে, এবং টিবিয়াও কিছু লম্বা হইয়াছে, কিন্তু ফিমারের ন্যায় নহে। মিঃ ফর্ব্বেসের পুস্তিকা দেখিলেই প্রকৃত মাপাদি অবগত হওয়া যায়। এই সকল হইতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বহুপুরুষ ক্রমে অত্যুচ্চ প্রদেশে বাস করিলে সাক্ষাৎস্বরূপেই হউক অথবা গৌণভাবেই হউক, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ্যাদির ইতর বিশেষ হইয়া থাকে।

যদিও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অধিক ব্যবহার অথবা অব্যবহারবশতঃ মানবজাতি শেষযুগে বেশি পরিবর্ত্তিত হয় নাই, কিন্তু উল্লিখিত ঘটনাসমূহ হইতে বুঝা যায় যে মানবের প্রথমাবস্থায় ঐ কারণবশতঃ যে পরিবর্ত্তন উৎপন্ন হইত, এখনও সেই পরিবর্ত্তনশীলতা নষ্ট হয় নাই। ইতর প্রাণীদিগের সম্বন্ধে এ কথা সত্য, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ জানি। সুতরাং মানবের সম্বন্ধেও ইহা অনুমিত হইতে পারে যে, যখন সুদূর অতীত কালে মানবের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, এবং চতুষ্পদ অবস্থা হইতে দ্বিপদ অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছিল * তখন অঙ্গাদির অধিক-ব্যবহার বা অব্যবহারজনিত ফল বংশানুগত হইয়া প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। † (ক্রমশ)

শ্রীশশধর রায়।

* অর্থাৎ দাঁড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

† পরিবর্ত্তনের মূল সহায় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এবং অতি-ব্যবহার বা অব্যবহার তাহার সঙ্গীমাত্র, ইহাই বলা হইল।

* সুবর্ণ ব্যবসায়ীরা স্বর্ণ ধুইয়া বাহির করিবার ব্যবসায়ে ইহাদিগকে অধিক বেতনে নিযুক্ত করে।

বেদান্ত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে অজ্ঞান দুঃখের কারণ, জ্ঞান দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয় এবং অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে তৎসঙ্গে দুঃখ বিদূরিত হইয়া থাকে। যদি অজ্ঞান আমাদের দুঃখের কারণ হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত আমাদের কোনরূপ সম্বন্ধ অবশ্যই থাকিবে। যেহেতু কোনরূপ অসংস্থষ্ট পদার্থ, কখনও কাহারও দুঃখের কারণ হইতে পারে না।

তবে অজ্ঞানের সহিত আমাদের কিরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে? তাহাই প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। আমরা অর্থাৎ আমাদের আত্মা অসীম এবং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে, কোন সময়ে কোনরূপ সংশয় হয় না, তাহাই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। আমাদের নিজ নিজ অস্তিত্ব সম্বন্ধে, কখনও কোন সন্দেহ হয় না, সুতরাং আমরা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য বলিয়াই বিবেচিত হয়। জ্ঞান আলোকের মত স্বপ্রকাশ, ইহা নিজকে এবং অপরকে প্রকাশ করিতে পারে। অজ্ঞান তাহার বিপরীত। ইহা জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, এবং স্বয়ং জড়তা-সম্পন্ন। আমাদের আত্মা অসীম, স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ হইলেও, অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হওয়ায়, সসীমভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। এই সসীমত্ব তাহার স্বাভাবিক নহে, ইহা অজ্ঞান দ্বারা কল্পিত। যেমন আত্মার সসীমত্ব অজ্ঞানকল্পিত, সেইরূপ তাহার দুঃখাদিও অজ্ঞানের কার্য্য, সুতরাং কল্পিত। যাহা অজ্ঞানকল্পিত, তাহা জ্ঞান-নাশ্য, এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বসম্মত। অজ্ঞান দ্বারা আবৃত থাকায়, আত্মার অসীমতা, দুঃখহীনতা ও সুখরূপতা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের মন ও শরীর আত্মা হইতে ভিন্ন, কিন্তু আমরা এ উভয়কেই 'এক' মনে করিয়া থাকি। সে জন্য, শারীরিক ও মানসিক দুঃখ দ্বারা, আমরা আত্মাকে দুঃখী মনে করিতে পারি। যদি কোন ব্যক্তির কখনও কোন বৃক্ষে মনুষ্য ভ্রম উৎপন্ন হয়; তখন সে ব্যক্তি সে বৃক্ষে মনুষ্যের গতি ও হস্ত-সঞ্চালনাদি প্রভৃতি পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতেছে, এইরূপ মনে করিয়া থাকে। সেইরূপ, যখন আমরা শরীর মনের সঙ্গে আত্মাকে এক বলিয়া মনে করি, তখন শরীর ও মনের দুঃখ প্রভৃতি আত্মাতেই অবস্থিত এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। এই শরীর, মন প্রভৃতির একতা-জ্ঞান বেদান্ত শাস্ত্রে অধ্যাস নামে অভিহিত। এই অধ্যাস দ্বিবিধ, তাদাত্ম্যাধ্যাস ও সংসর্গাধ্যাস। এক বস্তুকে অপর পদার্থস্বরূপে জানার নাম তাদাত্ম্যাধ্যাস, এবং এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর কোন রূপ সম্বন্ধ জ্ঞানের নাম সংসর্গাধ্যাস। আমাদের শরীরও মনের সহিত আত্মার একীভাব জ্ঞান তাদাত্ম্যাধ্যাস, এবং বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতিতে, আমাদের সম্বন্ধ জ্ঞান সংসর্গাধ্যাস। যাহাতে আমাদের অধিক স্নেহ তাহাতে তাদাত্ম্যাধ্যাস, এবং যাহাতে তাহার অল্পতা তাহাতে সংসর্গাধ্যাস হইয়া থাকে। বস্ত্রালঙ্কার অপেক্ষা শরীরের প্রতি অধিক স্নেহ, সে জন্য তাহাতে তাদাত্ম্যাধ্যাস এবং শরীর অপেক্ষা বস্ত্রালঙ্কারাদিতে স্নেহের অল্পতা প্রযুক্ত তাহাতে সংসর্গাধ্যাস হয়। আমাদের আত্মা স্বভাবতঃ নির্ব্বিকার। তাহার কোন রূপ দুঃখাদি নাই। দুঃখাদি মন ও শরীর প্রভৃতির ধর্ম্ম। যখন মন ও শরীর প্রভৃতির সহিত আত্মার একতা ও সংসর্গ বোধ (অর্থাৎ অধ্যাস) হয়, তখন মন প্রভৃতির সেই সকল দুঃখ আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে, আরোপিত বা কল্পিত পদার্থের নিবৃত্তির কারণ, বস্তুবিষয়ক বা প্রকৃত জ্ঞান। সুতরাং আত্মার প্রকৃত স্বরূপ

জ্ঞান এই দুঃখনিবৃত্তির কারণ। ভাষ্যকার শঙ্কর প্রথমেই আত্মা ও তদ্ভিন্ন পদার্থের পরস্পর অধ্যাস প্রদর্শন করিয়াছেন। তদ্বারা তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে এই জাগতিক দুঃখ কল্পিত, তাহার সহিত আমাদের আত্মার বাস্তবিক কোন সম্বন্ধ নাই, ভ্রান্ত সংস্কার বা অজ্ঞানের বশবর্ত্তী বলিয়া, আমরা ঐরূপ দুঃখ সম্বন্ধ অনুভব করিয়া থাকি। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞান প্রভাবে অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে ঐরূপ দুঃখসত্তা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই জন্য তিনি ভাষ্যের প্রথমেই দুঃখের কারণ অধ্যাস নিরূপণ করিয়াছেন।

শঙ্করের এই সিদ্ধান্তের মূল "তরতি শোকমাত্মবিৎ" "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" এই দুইটী শ্রুতি। এই দুইটীর সংক্ষিপ্তার্থ এই যে আত্মজ্ঞান মুক্তির (দুঃখবিনাশের) কারণ, তদ্ভিন্ন মুক্তির (দুঃখবিনাশের) আর কোন উপায় নাই। এই শ্রুতিদ্বয় হইতে তিনি, আত্ম ভিন্ন জগৎ কল্পিত, এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, সত্য পদার্থ কখনও জ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে না, কল্পিত পদার্থই তদ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। যখন শ্রুতি বলিতেছেন যে আত্মজ্ঞান দ্বারা দুঃখের বিনাশ সাধিত হয়, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে দুঃখ আত্মবিষয়ক অজ্ঞান দ্বারা কল্পিত। যাহা জ্ঞাত হইলে পদার্থের বিনাশ সাধিত হয়, সে পদার্থ তাহার অজ্ঞান দ্বারা কল্পিত। যেমন বৃক্ষে কল্পিত মনুষ্য; ইহা বৃক্ষজ্ঞান দ্বারা উৎপন্ন এবং বৃক্ষবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা তাহা বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হইয়া থাকে। যদি দুঃখ কল্পিত হয়, তবে তাহার কারণ অবশ্যই কল্পিত পদার্থ হইবে। কল্পিত পদার্থের কারণ কখনও সত্য পদার্থ হইতে পারে না। সত্য পদার্থ তাহার কারণ হইলে, কারণের অবস্থিতি সময়ে, সেই কল্পিত পদার্থের বিনাশ, কোন মতেই সম্ভাবিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। আমাদের শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দুঃখের কারণ, সুতরাং তাহাদের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী; যদি শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মবিষয়ক অজ্ঞান প্রভাবে কল্পিত হয়, তবেই তাহা আত্মজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হইতে পারে। এই সকল বিবেচনা করিয়াই শঙ্কর প্রথমে দুঃখ ও তৎকারণ শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কল্পিত ইহা জ্ঞাপন করিতে চেষ্টা করিয়া, অনন্তর তাহার বিনাশ বা বিলোপকারক ব্রহ্মজ্ঞান নিরূপণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম সর্ব্বগত, যখন তিনি কল্পনা বা অজ্ঞান দ্বারা মন ও শরীর প্রভৃতির সহিত অভিন্নভাবে প্রতীত হন, তখনই তাঁহার জীব-ভাব উপস্থিত হয়; এবং সে সময়ে তিনি মন ও শরীরাদির দুঃখ প্রভৃতি দ্বারা সমাচ্ছন্ন রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। সুতরাং এই পরিচ্ছিন্ন জীবভাব ব্রহ্মে কল্পিত। অসীমভাবে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ রূপে জানিতে পারিলে ইহা থাকিতে পারে না।

বেদান্তাদ্বৈতবাদানুসারে, জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, জীবভাব আমরা সর্ব্বদা অনুভব করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মভাব সকল সময়ে অনুভব করিতে পারি না। তাহার কারণ অজ্ঞানপ্রসূত পরিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি জীবভাব দ্বারা ব্রহ্মের অসীমতা প্রভৃতি আচ্ছাদিত থাকে। যুক্তি সহকৃত

বিচার প্রভাবে, যদি প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয়, তাহা হইলে জীব ও ব্রহ্ম উভয়ই "এক" এইরূপ প্রতীত হইতে থাকে। তখন অজ্ঞান বিদূরিত হওয়ায়, তৎকল্পিত দুঃখকারণ ভূত পরিদৃশ্যমান জগৎ, স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাঘ্রাদির মত অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই অনুভূত হয়।

বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদিগণ জীব ও ব্রহ্ম এক, এইরূপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু অন্যান্য দার্শনিকগণ তাহা স্বীকার করেন না। সুতরাং এই স্থলে জীবাত্মা সম্বন্ধে দার্শনিকগণের বিভিন্ন মত প্রদর্শন করা যাইতেছে।—

(১) লোকায়ত মত—ইহা চার্ব্বাকমত নামে অভিহিত। ইহাদের মধ্যে আত্মা সম্বন্ধে ত্রিবিধ মত দৃষ্ট হয়—

১ম—শরীরাত্মবাদ;

২য়—ইন্দ্রিয়াত্মবাদ;

৩য়—মন-আত্মবাদ।

এই ত্রিবিধ মতই বৃহস্পতিশিষ্যগণের প্রবর্ত্তিত। ইঁহারা পুনর্জন্ম স্বীকার করেন না। ইঁহাদের মতে মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব থাকে না। ইঁহারা স্বাধীনতাকে মুক্তিনামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

(২) বৌদ্ধমত—ইহাদের মধ্যে দুইটী মত প্রচলিত আছে—

১ম—বিজ্ঞানাত্মবাদ;

২য়—সর্ব্বশূন্যাত্মবাদ।

বিজ্ঞানাত্মবাদিগণ ক্ষণিক জ্ঞানকেই আত্মা বলিয়া থাকেন। এই মতে এক আত্মা হইতে অন্য আত্মার উৎপত্তি হয়। ইঁহারা প্রত্যেক প্রাণীরই অসংখ্য আত্মা স্বীকার করেন। ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ এক আত্মার বিনাশ হওয়া মাত্র অন্য ক্ষণিক আত্মার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইঁহাদের মতে বিজ্ঞান ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা। নীল পীতাদি বিষয় সকল জ্ঞানেরই একপ্রকার আকার বিশেষ। জ্ঞানের বিষয়শূন্যতাই ইঁহাদের মতে মুক্তি।

শূন্যাত্মবাদীর মতে বিজ্ঞান ও বাহ্য বিষয় সমস্তই মিথ্যা। সুতরাং সর্ব্বশূন্যতা-অভাবই আত্মা এবং ইহাই সত্য। আমাদের সুষুপ্তি সময়ে বিজ্ঞান ও বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না, কিন্তু তখনও সকলেই আত্মাস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বশূন্যতা স্বাভাবিক, বিজ্ঞান প্রভৃতি আগন্তুক, সুতরাং অস্বাভাবিক। যাহা অস্বাভাবিক তাহা মিথ্যা, যাহা মিথ্যা তাহা আত্মা নহে; আত্মা সত্য, অতএব সর্ব্বশূন্যতাই আত্মা। এই উভয় মতেই পুনর্জ্জন্ম স্বীকৃত হইয়াছে। ইঁহাদের মতে মৃত্যুর পরেও বিজ্ঞানজনিত সংস্কার থাকে। সেই সংস্কার দ্বারা পুনর্জ্জন্ম হয়। যোগপ্রভাবে সংস্কারের বিনাশ হইলে মুক্তি হইয়া থাকে। বিজ্ঞান ও শূন্যবাদীর মধ্যে মুক্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বিজ্ঞানবাদীর মতে মুক্তি সময়ে বিজ্ঞান থাকে, কিন্তু তাহার বিষয় গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকে না। শূন্যবাদীর মতে সে সময়ে বিজ্ঞানও থাকে না। যে বিজ্ঞানের বিষয়-গ্রহণক্ষমতা নাই, সে বিজ্ঞানের থাকা ও না থাকা উভয়ই সমান। বিষয়-গ্রহণ-ক্ষমতারহিত বিজ্ঞান কোন রূপেই প্রমাণ-গম্য হইতে পারে না, সুতরাং শূন্যবাদী এরূপ অপ্রামাণিক বিজ্ঞান স্বীকার করা সঙ্গত মনে করেন না।

(৩) জৈনমত—ইহাদের মতে আত্মা স্বপ্রকাশ, নিত্য এবং সাবয়ব, আত্মা যখন যে শরীরে অবস্থান করে তখন সেই শরীরের পরিমাণ অনুসারে তাহার পরিমাণ হইয়া থাকে। এই মতে আত্মার পুনর্জন্ম আছে। মুক্তি অবস্থায় আত্মা উপরে উঠিয়া যায়।

(৪)—ন্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসক মত—ইহাদের মতে আত্মা নিত্য, সর্ব্বব্যাপী এবং জড়স্বভাব। মনসংযোগবশতঃ তাহার জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ন, সুখদুঃখ প্রভৃতি গুণ উৎপন্ন হয়। মোক্ষাবস্থায় তাহার ঐ সকল গুণ থাকে না। ন্যায় বৈশেষিক মতে সে সময়ে কোনরূপ সুখ থাকে না, কিন্তু মীমাংসকেরা সে সময়েও অবিনাশী সুখ স্বীকার করেন। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক দার্শনিকগণ আত্মার অতিরিক্ত ঈশ্বর স্বীকার করেন। মীমাংসক ঈশ্বর মানেন না। লোকায়ত, বৌদ্ধ, জৈন, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, মীমাংসক ইঁহারা সকলেই আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব স্বীকার করেন এবং আত্মা অসংখ্য এইরূপ বলিয়া থাকেন।

(৫) সাংখ্য পাতঞ্জল মত—ইহাদের মতে আত্মা জ্ঞানরূপ স্বপ্রকাশ, নিত্য এবং সর্ব্বব্যাপী। আত্মা স্বভাবতঃ কোন কার্য্য করিতে পারে না এবং কোনরূপ সুখ দুঃখ ভোগ করে না। তাহার কোনরূপ বিকার নাই, সুতরাং জ্ঞান, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি তাহার গুণ নহে। এই সমস্তই মনের ধর্ম্ম, মনের সহিত আত্মার অভিন্নতা বোধ হওয়ায়, মনের ঐ সকল ধর্ম্ম বা গুণ আত্মাতে অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাদের মতেও আত্মা অসংখ্য। মুক্তি সময়ে মনের সহিত আত্মার অভিন্নতা বোধ বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং সে সময়ে তাহার কোনরূপ সুখ-দুঃখ প্রতিভাস থাকে না, তখন আত্মা বিশুদ্ধ চিৎ (জ্ঞান) রূপে অবস্থিত থাকে। সাংখ্য ও পতঞ্জলি এ দুইয়ের মধ্যে পতঞ্জলি ঈশ্বরবাদী, সাংখ্যবাদী কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। সে জন্য পতঞ্জলি সেশ্বর এবং কপিল নিরীশ্বর সাংখ্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত।

(৬) বেদান্তাদ্বৈত মত—ইহাদের সহিত পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ সাংখ্য মতেরই অনেক অংশে সামঞ্জস্য আছে। কারণ, বৈদান্তিক ও উভয় সাংখ্যই আত্মার নির্গুণত্ব, নির্ব্বিকারত্ব, অসীমত্ব জ্ঞানরূপত্ব স্বীকার করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক মতে আত্মা সৎচিৎ ও আনন্দরূপ, সর্ব্বব্যাপী এবং নির্ব্বিকার। ইঁহারা একাত্মবাদী, অর্থাৎ এই মতে সকলেরই এক আত্মা। মন ও শরীরের বিভিন্নতা প্রযুক্ত সকল সময়ে সকল ব্যক্তি সুখ দুঃখাদি ভোগ করে না। এই মতে আত্মা ও ব্রহ্মের ভেদ নাই। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে "অহং ব্রহ্মাস্মি" আমিই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞানই মুক্তির কারণ। এই জ্ঞান হইলে পরিদৃশ্যমান জগৎ বিলুপ্ত হয়; কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই জগৎ অজ্ঞানপ্রভাবে ব্রহ্মে কল্পিত, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান হইলে তাহার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। ইহার মতে মুক্তি সময়ে এই জগতের অস্তিত্ব থাকে না। এই জগৎ দুঃখের কারণ, এবং ইহা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা কল্পিত, জীব ও ব্রহ্ম এক; এই বেদান্ত সিদ্ধান্ত।

যদি ব্রহ্ম ও জীব এক হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞান ও জীবতত্ত্বজ্ঞান একই পদার্থ এবং ব্রহ্মকে জানিলেই জীবকে জানা যাইবে। সুতরাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা প্রদর্শন ক্রমে, সূত্রকার বাদরায়ণ জীব-জিজ্ঞাসাই প্রকাশিত করিয়াছেন। কোন বিষয়ে সংশয় হইলেই জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে। আত্মা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ মত দেখিলে, লোকের মনে সহজেই সন্দেহের উদয় হয়। সেই সন্দেহমূলক ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, প্রথম সূত্রে জিজ্ঞাসা প্রদর্শন করিয়া, দ্বিতীয় সূত্রে তাহার লক্ষণ, এবং তৃতীয় সূত্রে ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রের অর্থ প্রথম প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। সে জন্য এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। ব্রহ্মসম্বন্ধে উপনিষদবাক্যই প্রমাণ, ইহা তৃতীয় সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু উপ-নিষদ-বাক্যের অন্যরূপ অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে, ব্রহ্মবিষয়ে তাহার প্রামাণ্যে সংশয়ের উদয় হইতে পারে। অতএব উপনিষদের ব্রহ্মপরতা (একমাত্র ব্রহ্মই উপ-নিষদের তাৎপর্য্য) নির্ণয়ার্থ চতুর্থ সূত্র বলা হইয়াছে—

"তত্তু সমন্বয়াৎ ১।১।৪"

তিনি (ব্রহ্ম)ই উপনিষদ-প্রতিপাদ্য; কারণ, তাহাতে (ব্রহ্মে) উপনিষদের সমন্বয় (তাৎপর্য্য) পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যাহা যে শব্দের তাৎপর্য্য বিষয়, তাহাই সেই শব্দের অর্থ। ব্রহ্ম উপনিষদের তাৎপর্য্য বিষয়, অতএব ব্রহ্মই তাহার অর্থ। ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই উপনিষদের তাৎপর্য্য বিষয় নহে। সে জন্য তাহারা উপনিষদ-প্রতি-পাদ্য নহে, এই বিষয়টীর যথাবিশদ বর্ণনা করা যাইতেছে।

জৈমিনি-শিষ্য পূর্ব্বমীমাংসকগণ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড প্রামাণ্যবাদী। তাঁহারা "স্বর্গ-কামো যজেত" স্বর্গকামী ব্যক্তির যজ্ঞ করা উচিত, "পাণ্ডিত্যকামো জন্মতিথাবামিষং ন ভুঞ্জীত" পাণ্ডিত্যাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে জন্মতিথিতে আমিষ ভোজন কর্ত্তব্য নহে, ইত্যাদি ক্রিয়া ও নিষেধ এবং তৎসংসৃষ্ট অর্থবোধক বাক্যেরই প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহাদের মতে বেদবাক্য চারিভাগে বিভক্ত। মন্ত্র, বিধি, নিষেধ ও অর্থবাদ। বেদের সংহিতাভাগ মন্ত্রনামে অভিহিত। অবশিষ্ট তিন ভাগের সাধারণ নাম ব্রাহ্মণ। যে বাক্য দ্বারা কোন কার্য্যে লোকের প্রবৃত্তি হয় তাহা বিধি, এবং যে বাক্য দ্বারা কোন কার্য্য হইতে লোক নিবৃত্ত হয় তাহা নিষেধ। যে বাক্য দ্বারা প্রবৃত্তির উপযোগী প্রশংসা প্রভৃতি অথবা নিবৃত্তির উপযোগী নিন্দা প্রভৃতি জ্ঞাত হওয়া যায় তাহার নাম অর্থবাদ। বিধিবোধিত কর্ম্ম করিবার সময়ে সেই সেই মন্ত্রের উচ্চারণ পূর্ব্বক, তত্তৎকর্ম্মাঙ্গ দ্রব্যের প্রয়োগ করিতে হয়, অর্থবাদবাক্য প্রশংসা ও নিন্দা প্রভৃতি দ্বারা বিধি ও নিষেধ বাক্যের প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক শক্তির উত্তেজনা করে, অতএব বিধি ও নিষেধ বাক্যের সাহায্যকারী বলিয়া, মন্ত্র ও অর্থবাদ বাক্য প্রমাণ মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ প্রধানভাবে তাহার কোন প্রামাণ্য নাই। যে বাক্য কোনরূপ ক্রিয়াবিষয়ক প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির কারণ নহে,

অথবা যাহার কোনরূপ ফল নাই, এইরূপ বাক্য উন্মত্তবাক্যের মত, কখনও প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। "তত্ত্বমসি" তুমিই সেই ব্রহ্ম, "অহং ব্রহ্মা'স্মি" আমিই ব্রহ্ম, ইত্যাদি উপনিষদবাক্য, কোনরূপ ক্রিয়া বিষয়ে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির কারণ নহে, এবং উক্ত বাক্য জন্য জ্ঞান হইতে কোন রূপ ফলও দৃষ্ট হয় না। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, বেদান্তবাক্য দ্বারা আত্মবোধ হইলেই মুক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল বাক্য জন্য জ্ঞান সত্বেও আমাদের মুক্তি লাভ হইতেছে না, এই অবস্থায় উপনিষদ বা বেদান্তবাক্যকে প্রমাণ বলা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বমীমাংসকগণ বেদান্ত-বাক্যের প্রামাণ্য সম্বন্ধে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া থাকেন। এই পূর্ব্বপক্ষ সমাধানের জন্য, মহর্ষি বাদরায়ণ "তত্তু সমন্বয়াৎ" এই সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। শঙ্কর উক্ত সূত্রের এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিধি ও নিষেধ অর্থাৎ ক্রিয়া-বিষয়ে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির কারণ না হইলে কোন বাক্যই প্রমাণ হইবে না; এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করার মূলে কোন রূপ যুক্তি বা প্রমাণ নাই, এবং বেদান্তবাক্য জন্য জ্ঞানের কোন রূপ ফল নাই, এই কথাও স্বীকার করা যাইতে পারে না। ক্রমশঃ এই উভয় বিষয়ের যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতেছে। কোন বাক্য শুনিলেই, সেই বাক্য দ্বারা তৎক্ষণাৎ আমাদের এক প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং সে সময়ে সেই জ্ঞানকে আমরা যথার্থ জ্ঞান বলিয়াই মনে করিয়া থাকি। উক্ত জ্ঞান আমাদের প্রবৃত্তির কারণ, তৎসম্বন্ধে আমরা সে সময়ে কোন রূপ বিচার করি না। সুতরাং প্রবৃত্তির কারণ হওয়া বা না হওয়া দ্বারা, প্রামাণ্যের কোন রূপ উপকার বা ক্ষতি হয় না। যে বাক্য দ্বারা যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহাই প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বেদান্তবাক্য দ্বারা আমাদের যথার্থ জ্ঞান হয়, সুতরাং তাহা প্রমাণ। উপনিষদের পৌর্ব্বাপর্য্য আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মই তাহার একমাত্র লক্ষ্য, এই অবস্থায় তাহাকে অপ্রমাণ বলা যায় না। দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষ বেদান্তবাক্য জন্য জ্ঞানের কোন ফল নাই; এই সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি বাক্য দ্বারা আমাদের যে জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা ঠিক প্রত্যক্ষ ভাবে ব্রহ্মজ্ঞান নহে। ঐ সকল বাক্য-প্রভাবে প্রত্যক্ষভাবে যখন ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হইবে, তখনই মুক্তি-লাভের সম্ভাবনা। সম্প্রতি ঐ সমস্ত বাক্য জন্য আমাদের যে জ্ঞান আছে, তাহা অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান, প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে; সুতরাং ঐরূপ অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান নিষ্ফল হইলেও, প্রত্যক্ষ জ্ঞান অবশ্যই নিষ্ফল নহে। তাহার ফল বেদান্ত-প্রতিপাদ্য অজ্ঞান-নিবৃত্তি বা ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ

উৎকল-প্রসঙ্গে।

উৎকলে এতই প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ রহিয়াছে, এতই হিন্দুরাজাদিগের ক্ষীণকীর্ত্তি ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে যে, একবার দেখিয়াও সেগুলিকে পুনঃপুনঃ দেখিতে ইচ্ছা হয়, পুনঃপুনঃ দেখিয়াও অবলোকন-স্পৃহা বিলুপ্ত হয় না। ইহা আশ্চর্য্য, বিস্ময়, ও গৌরবের বিষয় যে, সেই হিন্দুকীর্ত্তিগুলি মহাকালের সহিত, কালযবনের সহিত, যবনসেনানী কালাপাহাড়ের সহিত, বর্ষাতপ, ভূকম্প, ঝঞ্ঝাবাত, জলপ্লাবনের সহিত যুদ্ধ করিয়াও লোকলোচনের সমক্ষে আত্ম-সত্তা জ্ঞাপন করিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ পুরুষোত্তমের মন্দির, ভুবনেশ্বরের মঠ, কোণার্কের সূর্য্যদেবের প্রাসাদ, প্রভৃতি দেবমণ্ডপগুলির, অরুণস্তম্ভ প্রভৃতি স্তম্ভ ও প্রশস্ত আকাশগর্ভ তোরণগুলির ভগ্ন ভিন্ন দেবমূর্ত্তি-সমূহের উল্লেখ করিতে পারি, সেই সঙ্গে সঙ্গে কাঠযুড়ীর জলপ্লাবন হইতে নগর ও দেশরক্ষার উদ্দেশে নির্ম্মিত সোপানশ্রেণী দ্বারা অলঙ্কৃত বজ্রকল্প বন্ধনীর উল্লেখ করিতে পারি। প্রভূত অর্থবৃষ্টি করিয়া কেশরীরাজগণ এই সকল কীর্ত্তির উৎপাদন করিয়াছেন, উৎকলের উচ্চসভ্যতার সময়ে উৎকলে শিক্ষিত স্থপতি, শিক্ষিত-ভাস্করের সত্তা ছিল বলিয়াই তাঁহারা অর্থের বিনিময়ে এই সকল কীর্ত্তি ক্রয় করিতে পারিয়াছেন; নয় ত অসভ্যদেশ হইলে কখনই তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতেন না।* সেই দেশের সহিত বর্ত্তমান কালের এই বর্ত্তমান দেশের তুলনা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়, বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। এই অল্পকালের ভিতরে এইরূপ শোচনীয় পরিবর্ত্তন কোন দেশে হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই, ইতিহাস এতদ্ভিন্ন আর অন্য দেশের সম্বন্ধে এইরূপ অচিন্তনীয় অবনতির সাক্ষ্য প্রদান করে নাই। উৎকল যে কারণে তীব্রবেগে এইরূপে শোচনীয় অবনতির দিকে প্রপতিত হইয়াছে, তাহার কারণ-নির্দ্দেশের অবসর এক্ষণে নাই। ইহাও আমরা নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিতে পারি যে, যে দেশের বা সমাজের রাজা বা ধনীদিগের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান বা সৌন্দর্য্যে রুচি নাই, সে দেশে বা সমাজে স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা ও চিত্রকলার উন্নতি হয় না। আবার যে দেশের বা সমাজের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান বা সৌন্দর্য্যে রুচি নাই, সেই দেশের ও সমাজের রাজা বা ধনীদিগেরও সেইরূপ জ্ঞান বা রুচি হয় না। আবার যে দেশে বা সমাজে সভ্যতা-বিস্তার হয় নাই, সেই দেশবাসীদিগের ও সেই সমাজের কখনই

---

* "The skill and resource both of builders and masons are clearly shown by the fact that they were able to move and lay in place, without mortar, such gigantic stone blocks, and to produce the vigorous and often exquisitely carved figures ; foliage and arabesque patterns, which lend a charm to the carvings adorning these shrines."—Gazetteer of the Puri District, p. 27.

সেরূপ জ্ঞান বা রুচি হয় না। যে দেশে বা সমাজে শিক্ষাবিস্তার নাই, সে দেশ বা সমাজ কখনই সভ্যতার উপরে অধিরূঢ় হয় না। এই সকল কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া আমরা অবধারণ করিতে পারি, উৎকলবাসীদিগের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ছিল, সৌন্দর্য্যে রুচি ছিল, সভ্যতা ছিল, ও উৎকলে শিক্ষাবিস্তার ছিল। * সৌন্দর্য্য-জ্ঞান সৌন্দর্য্যে রুচি জন্মায়, সৌন্দর্য্য-রুচি সুন্দর দ্রব্যের সৃষ্টি করে, আবার সেই সুন্দর দ্রব্য যখন অল্প সময়ে নষ্ট হইয়া যায়, তখন তাহার স্থায়িত্বের জন্য সৃষ্টিকর্ত্তার চিন্তা আসে, সেই চিন্তা দ্বারা স্থাপত্যের উন্নতি। উৎকলে যখন ইহার চরম উন্নতি বুঝিতে পারি, তখন বলিতে হইবে উৎকল যুগযুগান্তর ধরিয়া এই সাধনায় প্রবৃত্ত ছিল।

মনুসংহিতা লিখিত হইবার পূর্ব্বেও উৎকল ও কলিঙ্গের সত্তা ছিল, "ওড্র" উৎকলেরই নামান্তর। পরবর্ত্তি-সময়ে এই উভয় দেশ এক রাজার অধীন ছিল। কখনও কলিঙ্গরাজ এই উভয় দেশের শাসন করিতেন, কখনও বা উৎকলরাজ এই উভয় দেশের ভাগ্যবিধাতা ছিলেন। এই সমস্ত কীর্ত্তি এক রাজার যত্নে এক সময়ে সম্পন্ন হয় নাই। এই সকল রাজাদিগের রাজপ্রাসাদ কোন্ স্থানে নির্দ্দিষ্টরূপে অবস্থিত ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার সম্ভাবনা নাই। নানাস্থানে ইঁহাদিগের রাজপ্রাসাদের চিহ্ন লক্ষিত হয়। সে সময়ে রাজাদিগের অধিকারের ভিতরে একটি মাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটি মাত্র রাজপ্রাসাদ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। যে স্থানটি তাঁহারা শত্রু-প্রবেশের উন্মুক্ত দ্বার বলিয়া মনে করিতেন, শত্রুদিগকে বাধা দিবার জন্য সেই স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেন; আর যে যে স্থান শত্রুর দুরতিক্রম্য ও দুরধিগম্য বলিয়া অবধারিত হইত, সেই সেই স্থানে নিজের ও পুরস্ত্রীবর্গের রক্ষণবিধানের নিমিত্ত প্রাসাদ ও দুর্গনির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইত। যে সময়ে হিমালয়-শৃঙ্গের ন্যায় উচ্চতরঙ্গরাশির উৎপাদন করিয়া জলরাশির উপরে সন্তরণশীল ভীষণ যাদঃকুলের ভীষণ আকার প্রদর্শন করিয়া রুদ্ররূপী অসীম সমুদ্র মানবমনে বিভীষিকা উৎপাদন করিত, সে সময়ে শত্রুর অনধিগম্য মনে করিয়া তাহার বেলাভূমিতে রাজারা রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন; আবার যখন বিদেশেও পোত-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি ও সমুদ্রবক্ষে পোতসঞ্চালনের শিক্ষা প্রসার লাভ করিল, বিদেশীয়দিগের নিকটেও যখন সমুদ্র অবাধ প্রশস্ত রাজমার্গ বলিয়া পরিচিত হইল; তখন সেই দ্বারে শত্রুদিগকে বাধা দিবার নিমিত্ত সেই স্থানে সেই প্রাসাদের সঙ্গে দুর্ভেদ্য রাজদুর্গের সৃষ্টি হইল। সেই সেই কারণে সমুদ্রকূলে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে দুর্গনির্ম্মাণ, একাম্র-কাননে (ভুবনেশ্বরে) প্রাসাদ-নির্ম্মাণ, বৈতরণীতীরে যাজপুরে রাজদুর্গনির্ম্মাণ ও

* কটকে আমি যে বাসায় অবস্থিতি করিতেছি, তাহার সন্নিধানে কয়েকটি অশিক্ষিত মৎস্যজীবী বাস করে। তাহারা সময়ে অসময়ে উৎকলি-ভাষায় অনুদিত গীতগোবিন্দের গান করে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে মূল গীতগোবিন্দের ২।১টি দীর্ঘ ছন্দের কবিতা আবৃত্তি করে; আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই নিরক্ষর ইতর শ্রেণীর উচ্চারণে অতি অল্পই ছন্দপাত লক্ষিত হয়। আমার পূর্ব্বোক্ত অনুমানের ইহাও একটি সাধক।

মহানদী দ্বারা বলয়াকারে বেষ্টিত কটক নগরে দুর্ভেদ্য রাজদুর্গের সৃষ্টি হইয়াছে।

উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল ঘাট পর্ব্বত-শ্রেণীর পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ গিরিনিঃসৃত নির্ঝরমালা দ্বারা স্ফীতবক্ষা মহানদীর তীরভূমিতে দুর্গম কটকদুর্গ অবস্থিত ছিল, দুর্গের চতুর্দ্দিকে হীরক-হারের ন্যায় স্বচ্ছবীচিমালালঙ্কৃত দুর্গপরিখা ছিল, মহানদীর সহিত সেই পরিখার সম্বন্ধ ছিল, ইচ্ছা করিলে যন্ত্র দ্বারা পরিখার জল নিঃসারিত করিয়া পরিখাকে শুষ্ক করা যাইত, আবার ইচ্ছা করিলে মহানদীর জলরাশি দ্বারা পরিখাকে পূর্ণ করা যাইত। আজ কেবল শুষ্ক কর্ত্তিত ভূমিভাগ ও তাহার সহিত মহানদীর সন্ধিস্থান দেখিয়া আমরা তাহার অবধারণ করিতে পারি। এক্ষণে সে দৃঢ় দুর্গের কিছুই নাই, আছে কেবল তোরণদ্বারের কিয়দংশ আর দুর্গমধ্যে অবস্থিত শ্রেণীবদ্ধ চূড়াত্রিতয় বিশিষ্ট একটি মাত্র গৃহ। দূর হইতে গৃহটির চূড়ার অবস্থান দেখিলে মুসলমানের সমাধি-মন্দির বা উপাসনা-মন্দির বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু এই গৃহে কটকেশ্বরী কটকচণ্ডী বাস করিতেন। বলিতে হইবে, মুসলমানেরা হিন্দুস্থানে আসিয়া নানা আকারের হিন্দুর দেবমন্দির ও বাসভবন দেখিয়াছিলেন; তন্মধ্যে যে প্রণালীর গৃহ মুসলমানদিগের মনোনীত হইয়াছিল, তাঁহারা হিন্দুস্থপতি দ্বারা উপাসনার জন্য ও সমাধির জন্য সেই প্রণালীর গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। পরে হিন্দুরা মুসলমান-গৃহীত প্রণালী পরিহার করিয়া মুসলমানের অবলম্বিত প্রণালীর গৃহ হইতে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিবার উদ্দেশে স্বতন্ত্র প্রণালীতে দেবমন্দির নির্ম্মাণ করাইতেন। হিন্দুগৃহের আকার স্বতন্ত্র, বৌদ্ধ-গৃহের আকার স্বতন্ত্র, মুসলমান-গৃহের আকার স্বতন্ত্র, এই সিদ্ধান্তের মূলে কটকচণ্ডীর সেই প্রাচীন মন্দিরটি সবলে কুঠারাঘাত করিতেছে। সুতরাং দেবগৃহের আকৃতি-গঠন দেখিয়া আমরা আর কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছি না।

দুর্গের ও রাজ্যের কটকচণ্ডীই রক্ষা-বিধাত্রী ছিলেন। রামায়ণে দেখিতে পাই, রাবণপূজিতা কোন শক্তির সহিত হনুমানের প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। হিন্দুরা যখন শক্তির উপাসক ছিলেন, জাগ্রতশক্তিও তখন হিন্দুর ও হিন্দুস্থানের রক্ষা বিধান করিতেন, তাই প্রত্যেক হিন্দুর রাজপ্রাসাদে শক্তিমূর্ত্তির বিকাশ। এতদ্দেশের প্রচলিত কিম্বদন্তী,—বিজয়ী মুসলমানেরা এই দুর্গের কিছুই করিতে পারেন নাই, হিন্দুসেনানী পরাভূত হইলে হিন্দুসৈন্য চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইলে স্বয়ং কটকচণ্ডী দুর্গদ্বারে অবতীর্ণ হইয়া স্বহস্তে তোপ চালাইয়াছিলেন। তাই, বলোন্মত্ত কালাপাহাড়ের কঠোরঅমেধ্য হস্তে অন্যান্য দেবমূর্ত্তির মত কটকচণ্ডীর লাঞ্ছনা হয় নাই, তিনি সেই পবিত্র মূর্ত্তিকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। যে কারণেই হউক, কটকচণ্ডী আজও অক্ষত শরীরে কটকে অবস্থান করিতেছেন। কটকচণ্ডী ভগ্ন দুর্গ হইতে অন্যত্র নীত হইয়া অপেক্ষাকৃত নবনির্ম্মিত-একটি গৃহে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কত যুগযুগান্তর অতিবাহিত হইয়াছে, এখনও দেবীমূর্ত্তির অঙ্গজ্যোতিঃ

বিনষ্ট হয় নাই, এখনও প্রত্যেক অঙ্গে মসৃণতা আছে, স্নিগ্ধতা আছে; বোধ হয় যেন প্রবীণ ভাস্কর এইমাত্র কৃষ্ণপ্রস্তর-ফলক হইতে মূর্ত্তিটির উৎকীরণ করিয়াছেন। চণ্ডীর সস্মিত মুখমণ্ডল দেখিলে, তাঁহার বিস্তৃত দয়ার্দ্র নয়ন-ত্রিতয় দেখিলে, হস্ত-চতুষ্টয়ের মধ্যে দুইখানি হস্তে বরাভয়ের ভাব স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করিলে স্বতঃই দেবভাব আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করে, মনঃপ্রাণ মুগ্ধ হইয়া যায়, ভক্তিতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। ইহাই প্রকৃত ভাস্কর্য্যের নিদর্শন, ইহাই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের বিজ্ঞাপক। এই স্থানে কোন অভিমানী শিক্ষিত বাঙ্গালীর মুখে শুনিলাম, "কোন অজ্ঞাত কারণে মুসলমানের হাত হইতে কটকচণ্ডীর রক্ষা হইয়াছিল বলিয়া এইরূপ আখ্যায়িকার সৃষ্টি হইয়াছে, নয় ত হিন্দুরা তোপ পাইবেন কি করিয়া? মুসলমানের অধিকারের সময়ে এ দেশে ইউরোপীয়দিগের আগমন হইয়াছিল, তাঁহাদিগের নিকট হইতে মুসলমানেরা অনেকটা ইয়ুরোপীয় প্রণালীর যুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে এদেশে আগ্নেয়াস্ত্রের আমদানি হইয়াছে।" তাঁহাদিগের এই কথার পূর্ব্বাংশ সত্য হইলেও হইতে পারে; কিন্তু শেষাংশের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই যখন সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন; তখন ভারতে বাস করিয়া ভারতবাসী জগদ্গুরু ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কি করিয়া তাঁহাদিগের এই মতের সমর্থন করিব? কল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় এক বেদ হইতেই প্রাচীন ভারতে আগ্নেয়াস্ত্র (তোপ), বাষ্পীয়-পোত, বাষ্পীয়-শকট, তদুপযোগী লৌহবর্ত্ম, ব্যোমযান প্রভৃতি ছিল প্রমাণ করিতেছেন। তাঁহার সেই যুক্তিভিত্তিক গবেষণাপূর্ণ নিদ্ধারণের উপরে কাহারও কিছু বলিবার নাই। তবে তিনি যে "আয়স" এই বিশেষণ পদ দেখিয়া বেদোক্ত "বজ্র"শব্দের তোপ অর্থ করিয়াছেন, সেই বিষয়ে আমি সংশয়শূন্য হইতে পারি নাই। বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা ইন্দ্র বজ্র নির্ম্মাণ করাইতেন, মহাভারত ও পুরাণে আছে; তোপ ও বন্দুকের ন্যায় বজ্রও লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হইত, এ কথা বেদে আছে; তথাপি বজ্রকে তোপ ও বন্দুক বলিতে সাহস হয় না। বজ্রের অপর নাম"শতকোটি"; অস্ত্রের অগ্রের নাম কোটি, যে অস্ত্রের একশত বা বহু অগ্রভাগ আছে, তাহার নাম শতকোটি। তোপ বা বন্দুকে আমরা বহুসংখ্যক অগ্রভাগ দেখিতে পাই না। বীরপুরুষের দেহ বজ্রের ন্যায় কঠিন,—"বজ্রসংহননো যুবা"। সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা এ ভাবের কথা অনেকবার দেখিয়াছি, লৌহনির্ম্মিত বজ্র এই জন্য বজ্রের ন্যায় কঠিন বলা অপেক্ষা লৌহবৎ-কঠিন বলাই সহজ ও সুবোধ্য। লৌহ দ্বারা বজ্র নির্ম্মিত হইলেও কোন রূপ প্রণালীতে বজ্রকে লৌহ অপেক্ষা কঠিন করা হইত। বজ্রের ন্যায় কঠিন বলিয়াই হয় ত হীরকের নাম বজ্র হইয়াছে। বাষ্পীয়-পোত, বাষ্পীয়-শকট, লৌহবর্ত্ম, ব্যোমযান প্রভৃতি বেদে আছে বলিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় যে সকল যুক্তি প্রদান করেন, তাহাতে একমত হইলেও উল্লিখিত কারণে "বজ্র"কে তোপ, বন্দুক বলিতে পারি

না। আমার বিশ্বাস, পূর্ব্বকালে বিদ্যুৎব-র্ষী কোনরূপ অস্ত্র ছিল, সেই অস্ত্রের তীক্ষ্ণধার অনেকগুলি অগ্রভাগ ছিল, সেই প্রত্যেক অগ্রভাগ হইতে বিদ্যুৎ ক্ষরিত হইত, তাহাকেই হিন্দুরা বজ্র বলিতেন। এই বজ্রাস্ত্রের আবিষ্কার করিতে যাইয়া সেই বজ্রাগ্নি দ্বারা মহর্ষি দধীচি দগ্ধ হইয়াছিলেন। তাই, দধীচির অস্থি দ্বারা বজ্র নির্ম্মিত, পুরাণে এই কথা লিখিত হইয়াছে। দধির আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়াই হউক, বা বজ্রাগ্নি হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বাঙ্গে দধি ম্রক্ষণ করিয়াছেন বলিয়াই হউক দধীচির নাম দধীচি হইয়াছে। থিমিস্‌টিয়াস (Themistias), এলফিন্‌ষ্টোন্ (Elphinstone) হিন্দুদিগের বিদ্যুৎবজ্র দ্বারা যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। এ্যালেকজাণ্ডার (Alexander the Great) তাঁহার গুরু আরিষ্টোটলকে (Aristotle)ও ঐরূপ মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছিলেন। ফিলোস্‌ট্রেটাস্ "হিন্দুরা ঝটিকা ও বজ্র দ্বারা শত্রুকে বাধা দিতে সমর্থ" স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন। ঝটিকার উল্লেখ করাতে স্পষ্টতঃ বায়ব্যাস্ত্রের কথা বুঝিতে পারা যায়। বিশ্ববিজয়ী গ্রীক্ সৈনিক-পুরুষগণ ও জ্ঞানী গ্রীক্ পরিব্রাজকগণ যখন সমস্বরে হিন্দুর এই অদ্ভুত ক্ষমতার বর্ণনা করিয়াছেন, তখন রামায়ণ-মহাভারতে কথিত অগ্নি, বায়ু, জল প্রভৃতি দৈবাস্ত্রগুলিকে সম্মোহন অস্ত্র দ্বারা সহস্র সহস্র শত্রু-সৈন্যের সম্মোহনের উল্লেখকে গঞ্জিকা-সেবনের ফল বলিয়া বৃদ্ধা পিতামহীর মুখনিঃসৃত বিহঙ্গম-বিহঙ্গমীর রূপকথা বলিয়া, আরব্যোপন্যাস বলিয়া, ভদ্র ভাষায় কবিকল্পনার সৃষ্টি বলিয়া আর উড়াইতে পারা যায় না। যতদিন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা ব্যোমযানের আবিষ্কার করেন নাই; ততদিন সংস্কৃত সাহিত্যে এবং সংস্কৃত অভিধানে একার্থ বুঝাইবার জন্য এক পর্য্যায়ে "ব্যোমযান" ও "বিমানের" উল্লেখ থাকিলেও, আমরা তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই, কল্পনা-প্রসূত বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছি। বলা বাহুল্য কল্পনাই বিজ্ঞানের জনয়িত্রী। প্রথমে মানুষের মনে কল্পনার আবির্ভাব হয়, সেই কল্পনাই মানুষকে সেই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, কল্পনা কাব্যের সৃষ্টি করিয়া তাহার ফল আনয়নে সমর্থ হইলে সভ্য জগতে বিজ্ঞান বলিয়া পরিচিত হয়। ইউরোপে অদ্যাপি তাদৃশ বিজ্ঞানের উন্নতি হয় নাই, প্রাচীন ভারতের মত ইচ্ছাচালিত ব্যোমযানের সৃষ্টি করিতে ইউরোপ অদ্যাপি অসমর্থ রহিয়াছে। সর্ব্ববিধ্বংসকারী কুরুক্ষেত্রের সেই মহাসমরে বীরপুরুষদিগের, স্থপতিদিগের, চিকিৎসকদিগের মহাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জ্ঞান, বিজ্ঞান অন্তর্দ্ধান করিয়াছে; ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, স্থাপত্য-বিদ্যাও অন্তর্হিত হইয়াছে। সেই মহাসমরের পরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরু মহর্ষিরা কোন্ পথে কোন্ অচিন্ত্য দেশে চলিয়া গিয়াছেন, কেহ বলিতে পারে না। শিক্ষকের অভাবে রাজমহিষীরা শিশুরাজকুমারদিগের শিক্ষা-বিধান করিতে পারেন নাই। এই ভাবে বৈদ্যকুমারদিগের আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা হয় নাই, স্থপতিকুমারেরা স্থাপত্যবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে নাই। সেই দিন হইতেই ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, যে দিন ভ্রাতার বিরুদ্ধে ভ্রাতা, পিতামহের বিরুদ্ধে পৌত্র, গুরুর বিরুদ্ধে শিষ্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছে, পূজনীয়া অনিন্দ্যচরিতা পুরস্ত্রীর লাঞ্ছনা করিবার জন্য যে দিন দুর্ব্বৃত্তের পাপহস্ত প্রসারিত হইয়াছিল, অথচ সমাজের নেতৃবৃন্দ

তাহাকে বাধা দিবার জন্য সাহসী হয়েন নাই, সেই দিন হইতেই ভারতের অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছে। এই সূত্রে ভারতের ভাগ্যবিধাতা ভারতের ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। আর ময়নির্ম্মিত ইন্দ্রপ্রস্থের সেই জগৎবিস্ময়কর সভামণ্ডপের মত সভাগৃহ ভারতের বক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই, মনুষ্যের বর্জ্জনীয় দেহাবয়বে বলিষ্ঠ পশুর দেহাংশ সংযোজিত হইবার সম্ভাবনা নাই, বিমানে আরোহণ করিয়া মেঘবিদ্যুৎবিভূষিত নীলাকাশে বিচরণ করিয়া পৃথিবীর চিত্র বিলোকন করিয়া মুগ্ধ হইবার আশা নাই। অভিজ্ঞান শকুন্তলে রাজা দুষ্মন্তের স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতরণের বর্ণনা পাঠ করিয়া কে বলিবে কবি কালিদাস ভারতেশ্বরের সহায়তায় অন্ততঃ একবারও আকাশপথে বিচরণ করেন নাই। যে দেশে মুদ্রার পরিবর্ত্তে মুক্তাই দ্রব্যসমূহের মূল্য প্রদানের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, * সে দেশে এক্ষণে মুক্তা দুর্লভ, শুক্তি আর নিজগর্ভে মুক্তা ধারণ করে না, রাজমহিষীরাও আর মুক্তাহার দ্বারা লাবণ্য তরঙ্গিত উন্নত বক্ষঃস্থলের শোভাবর্দ্ধন করিতে সমর্থ হয়েন না। পুরাকালের মত ভূতত্ত্ববিৎ খনিলক্ষণবিৎ পণ্ডিতের অভাবে হীরকখচিত স্বর্ণসিংহাসনে আরোহণ করা দূরের কথা, উৎকলের রাজবৃন্দ ক্ষুদ্র অঙ্গুরীয়কেও এক্ষণে ক্ষুদ্র হীরক সংযোগ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। ভারতবাসীর অজ্ঞাতসারেই ভূগর্ভ হইতে খনি হইতে ধাতুসংগ্রহের ব্যবস্থা, রত্ন-আহরণের প্রণালী অন্তর্হিত হইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিক্‌কুলের করুণায় যেমন দেশীয় বস্ত্রবয়নের পদ্ধতি নির্ব্বাণোন্মুখ হইতেছিল, স্বদেশী আন্দোলন না হইলে ভবিষ্যৎ বিংশতি বর্ষের মধ্যে যেমন তন্তুবায়কুল বয়ন-পদ্ধতি একেবারে ভুলিয়া যাইত, বিদেশীয় বণিকদিগের অনুকম্পায় ভারতে সেইরূপ মণি-আহরণবিদ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে। রত্নাকরের তীরে অবস্থিত রত্নাকরসমূহ বক্ষে ধারণ করিয়াও আর উৎকল সেই খনিগুলি চিনিয়া বাহির করিতে পারে না, গড়জাতের রাজন্যবৃন্দ প্রজার নিকট হইতে বার্ষিক কর আহরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত, আর সেই সমস্ত খনির অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি করিতে পারেন না, কেহ বা বুঝিয়াও অর্থব্যয়ের সফলতায় ও পরিশ্রমের কৃতার্থতায় সন্দিহান হয়েন। এখনও উড়িষ্যার নানা স্থানের দরিদ্র কর্ম্মকারকুল প্রস্তরখণ্ড হইতে লৌহ সংগ্রহ করে ও সেই লৌহ হইতে মণ্ডুর (লৌহমল) নিঃসরণ করিয়া কার্য্যোপযোগী করিয়া লয়। বলা বাহুল্য যে, ইউরোপীয়দিগের ভারতাগমনের পূর্ব্বেও ভারতবাসী কাংস্যপাত্র ও পিত্তলের ভাণ্ড ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত ছিল, সুতরাং তাহারা কাংস্য প্রস্তুত ও পিত্তল-প্রস্তুতের পদ্ধতি অবগত ছিল। কল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের সংগৃহীত "রত্নপরীক্ষা" পাঠ করিলেই আমার কথার যাথার্থ্য পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন। তাহা পাঠে জানা যায়, এদেশে ব্রোঞ্জ (Bronze) পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইত। কোণার্কের মন্দিরের সন্নিধানে অবস্থিত সুদীর্ঘ লৌহময় বীম দেখিবার পূর্ব্বে কে বিশ্বাস করিত যে বিগত বৎসরের ভিতরে যে লৌহময় বীম ব্যবহারের প্রচলন হইয়াছে, তাহার অনেক শত বর্ষ পূর্ব্বেও ভারতে তাহার ব্যবহার ছিল।

(ক্রমশ)

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

* Travels of Yuan Chwang, Mr. Watters, II. 196-7

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য পুস্তক।

২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দিনচর্য্যা

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত। প্রত্যেক হিন্দুজীবনকে সুন্দর, মহৎ ও সার্থক করিবার জন্য ও আদর্শের পথে পরিচালিত করিবার জন্য অত্যাবশ্যকীয় গ্রন্থ। এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় আর নাই। বিচারপতি সারদা বাবু, কবিবর রবীন্দ্র বাবু প্রভৃতি দেশমান্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ও বহু পত্রিকায় এক বাক্যে প্রশংসিত। মূল্য চারি আনা মাত্র।

আশ্রম চতুষ্টয়।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত। জীবনের লক্ষ্য কি ও কোন্ আদর্শে তাহাকে গঠিত করা উচিত, এ গ্রন্থে তাহা যথাসম্ভব আলোচিত হইয়াছে।

মূল্য ৷৷০ আট আনা।

নিরুপায়ে চিকিৎসক

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা সুবিখ্যাত ফরাসী কবি মোলিয়ার রচিত একখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন অবলম্বনে লিখিত। কৌতুক-উদ্দীপন ও মানবচরিত্র প্রদর্শন নৈপুণ্যে এই প্রহসন চির প্রসিদ্ধ। মূল্য ৷৵০ স্থলে ।০

দাম্পত্য-চিত্র।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ দাস প্রণীত। যদি কাব্যরস উপভোগ করিতে চান, যদি অমৃতময়ী বঙ্গভাষায় আপনাকে ডুবাইতে চান তবে নাট্য কাব্য দাম্পত্য-চিত্র পাঠ করুন। বিবাহিত যুবকযুবতীর জন্য প্রিয়জনকে উপহার দিবার জন্য এই অপূর্ব্ব নাট্যকাব্য দাম্পত্য-চিত্র। মূল্য ৸০ (বাঁধাই) ১।০

বৌ-কথা-কও।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ দাস প্রণীত। আমাদের বৌ-সমাজের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া যদি সাবধান হইতে চান, দাম্পত্যজগতের বিবিধ ঔপন্যাসিক চিত্রের সমালোচনা দেখিয়া যদি মুগ্ধ হইতে চান তবে এই সরল গদ্য কাব্য পাঠ করুন। মূল্য ৶১০

দলীল।

রাজগোপাল রায় সঙ্কলিত। রেজেষ্টারী আফিস সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দস্তাবেজ এবং ভিন্ন ভিন্ন দলীলের আদর্শ ও তাহাদের আইন মত সাধারণের বোধগম্য সরল ব্যাখ্যা ও প্রত্যেক দলীল সম্বন্ধীয় আইন মত অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়; আইন ও আদালত সংক্রান্ত কার্য্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় রেজেষ্টারী আইন, চুক্তি আইন, হস্তান্তর করণ আইন, উইল সম্বন্ধীয় আইন ইত্যাদির ধারা ও তৎসম্বন্ধীয় নজির ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিষয়ী ব্যক্তি মাত্রেরই আবশ্যকীয় গ্রন্থ। ৪২২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, বাঁধাই মূল্য ১৷৷০।

চাকমা জাতি।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, এম্-আই-আর-এস্ প্রণীত, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই কর্ত্তৃক ভূমিকা লিখিত এই গ্রন্থখানি চাকমা নামক পার্ব্বত্য জাতি বিশেষের অপূর্ব্ব রহস্য পূর্ণ জাতীয় চিত্র বা ইতিবৃত্ত। বঙ্গের বিচারপতিগণ, সাহিত্যরথিগণ, কবিগণ ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এক বাক্যে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। ১৮খানা হাফ্‌টোন ছবি ও একখানি রঙ্গিন ম্যাপে সুশোভিত। মূল্য ৩৲ টাকা।

বঙ্গ-গৌরব।

নব্যভারতের যুগ প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি যে সকল মহাপুরুষ বঙ্গে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছেন, তাঁহাদের উৎকৃষ্ট বৃহৎ প্রতিকৃতি ও জীবনের সুলিখিত নক্সা। উপহার কি পুরস্কার দিবার পক্ষে এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর উপযুক্ত পুস্তক বঙ্গভাষায় আর নাই। মূল্য ৪৲ স্থলে ৩৲।

মতিচুর।

মিসেস আর, এস্, হোসেন প্রণীত প্রবন্ধ পুস্তক। ইহাতে পিপাসা, স্ত্রীজাতির অবনতি, নিরীহ বাঙ্গালী, সুগৃহিণী প্রভৃতি সাতটি প্রবন্ধ আছে। সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ৸০।

পুরাতন বঙ্গদর্শন।

১৩০৯ সাল হইতে ১৩১৬ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষের মূল্য ডাকমাশুল সমেত দুই টাকা।

হিন্দু ধর্ম্ম-নীতি।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত। মন্বাদি-স্মৃতি, মহাভারত, রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, হিতোপদেশ, প্রভৃতি প্রধান প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত। নীতি শিক্ষার এমন পুস্তক আর নাই বলিলেও চলে। মূল্য ১৲ স্কুলে ॥০ (বাঁধাই) ৸০ আনা।

সরল বর্ণ জ্ঞান।

ডাক্তার ব্রজনাথ সাহা প্রণীত। কিণ্ডার গার্টেন প্রণালী অনুসারে শিশুদিগের বাঙ্গালা অক্ষর পরিচায়ক সচিত্র পুস্তক। সুন্দর সুন্দর ছবি। মূল্য ৶০।

লিপি-সংগ্রহ।

সবজজ বিনোদবিহারী মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বের লিখিত সুমধুর বাঙ্গালায় উপদেশ পূর্ণ চিঠী পত্র। মূল্য ॥৶০।

দুর্গালীলা-তরঙ্গিণী।

৺কৃষ্ণকিশোর রায় প্রণীত। গ্রন্থের প্রণেতা প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে একজন। ইহাতে আনুপূর্ব্বিক দুর্গালীলা সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। সৃষ্টি-প্রকরণ হইতে দক্ষযজ্ঞ, তৎপরে গিরিরাজের ঘরে শিবের বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত আখ্যান পদ্য ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য ১৲।

প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত বা প্রাণী রাজ্য।

শ্রীবাস চট্টরাজ সঙ্কলিত নূতন রকমের বই। যদি অসীম জ্ঞান সূক্ষ্মদর্শী সৃষ্টিকর্ত্তার অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৌশল দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে চান; যদি নদী, হ্রদ, অরণ্য ও প্রান্তরবাসী এবং আকাশচারী প্রাণিগণের বিবরণ পাঠে পুলকিত হইতে চান তবে ইহা পাঠ করুন। মূল্য ১৲।

কাব্যগ্রন্থ।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ও ৺মোহিতচন্দ্র সেন, এম্, এ সম্পাদিত। ত্রয়োদশ খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য ৯৲ নয় টাকা।

গল্পগুচ্ছ।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। আর্ট পেপারে মুদ্রিত, দুই খণ্ডে সুন্দর বাঁধাই। মূল্য ৫৲।

মূক শিক্ষা।

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মজুমদার প্রণীত। মূক বধিরের শিক্ষা এ দেশে নূতন জিনিষ। জন্মবধির হইলেই মূক হয়। এই পুস্তকের সাহায্যে মূক-বধিরকে কথা ও লেখাপড়া শিক্ষা দিতে পারা যায়। সচিত্র উত্তম বাঁধাই মূল্য ৸০।

পঞ্চ প্রদীপ।

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদার, বি, এ প্রণীত নূতন গল্পের বই। ঋষিকল্প কাউণ্ট টলষ্টয়ের গল্পের অনুকরণে আমাদের দেশের মত করিয়া গল্পগুলি লিখিত। বালক-বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগের পাঠ্য। পুরস্কারের উপযোগ্য। সুন্দর বাঁধাই। মূল্য ৸৶০।

পুণ্যের জয়।

শ্রীযুক্ত সুধাকৃষ্ণ বাগচি প্রণীত ও শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে সম্পাদিত, অভিনব রহস্যময় ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। মূল্য সুন্দর বাঁধাই ১৲

নববিধান সমাজের বই।

ব্রহ্ম সঙ্গীত প্রথম ২৲ দ্বিতীয় ৸৶০ আচার্য্য কেশবচন্দ্র (বিস্তৃত জীবন চরিত) ১৲ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম ১॥০ গীতা সমন্বয় ভাষ্য ৫৲ বেদান্ত সমন্বয় (১২ খণ্ড) ৬৲ বিবিধ ধর্ম্ম সঙ্গীত (প্রসন্নকুমার সেন কৃত ২৲ গুরু নানকের জীবন চরিত ১॥০ শাক্যমুনি চরিত ১।০ উপাধ্যায়ের বক্তৃতা ১৲ হদিশের বঙ্গানুবাদ, পূর্ব্ব বিভাগ ৪৲ উত্তর বিভাগ ২৲ কোরাণশরিফের বঙ্গানুবাদ ৪৲ মোহম্মদের বিস্তৃত জীবনী ৩, হাফেজের বঙ্গানুবাদ প্রথমভাগ ১৲ তাপসমালা (৬ খণ্ড) ৩৲ জীবন-বেদ ১৲ মহাপুরুষ চরিত ৸০।

শারদীয় পূজার আয়োজন

বৎসরান্তে আবার সেই চির মধুর আনন্দ সম্মিলন। চির প্রবাসী বৎসরান্তে গৃহাভিমুখে ছুটিয়াছেন। গৃহলক্ষ্মীগণ আনন্দে আত্মহারা—নূতন নূতন বসন ভূষণ হইবে। আপনি যদি বিনা পাইনে স্বর্ণের গহনা ক্রয় করিয়া পয়সা বাঁচাইতে চান—যদি মনের মতন নূতন নূতন ডিজাইনের অলঙ্কার ব্যবহার করিতে চান—সময় নষ্ট না করিয়া আমাদের ফারমে একবার পদধূলি দিউন। মফস্বলবাসী সত্বর পত্র লিখুন আর সময় নাই। নূতন ধরণ—নূতন গঠন—নূতন ফ্যাসন—সব নূতন। রং পালিস কারুকার্য্য দেখিলে আত্মহারা হইবেন। অর্ডার জিনিষ ৩ দিনে প্রস্তুত করিয়া দিই।

রূপার উপর গিনির পাত মোড়া **স্বর্ণের শাঁখা** বিন্দুমাত্র পান নাই।

অর্ডার দিলে নানাবিধ "মটো" শাঁখার উপর লিখিয়া থাকি।

প্লেন শাখার মূল্য ১৪৲, নাম লেখাইযুক্ত হইলে ১৯৲ হইতে ২৪৲।

অভিনব আবিষ্কার।
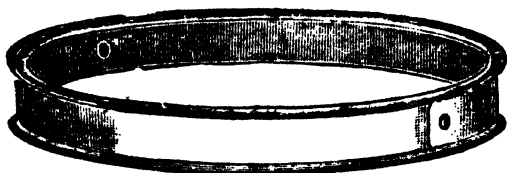
শাঁখা বঙ্গ-ললনার সোহাগের সামগ্রী বাজারে সেকরারা শাঁখা প্রস্তুত করে বটে কিন্তু ইহার কৌশল সম্পূর্ণ নূতন। কেন যে ইহা ঘরে ঘরে সমাদৃত তাহা ১ জোড়া ব্যবহার না করিলে বুঝিতে পারিবেন না।

বিন্দুমাত্র পান নাই। **জাপানী মাকড়ী** বিনা পানের গহনা।

মূল্য ১৪৲ হইতে ২২৲

এই মাকড়ী আমরা প্রথমে ভারতে আবিষ্কার করিলাম। ইহা আমাদের নিজস্ব। পার্শী ও ইহুদী ইহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। চকচকে পালিস—নয়ন ঝলসিয়া যাইবে।

পূজার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ উপহার।

স্থানাভাবে আমাদের গহনার মূল্যাদি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। পত্র লিখিয়া আমাদের সচিত্র জুয়েলারী ক্যাটলগ লউন।

হাতির দাঁতের শাখার উপর গিনি সোণার পাত মোড়া শাখা এক জোড়া ১৪৲ টাকা

ইহুদি ও পার্সি মাকড়ি

হাই পালিস দেখিলে আত্মহারা হইবেন গিনি স্বর্ণের পার্সি মাকড়ি ১ জোরা ১৫৲ টাকা হইতে ২২৲ টাকা। ইহুদি মাকড়ি (গিনির) ১ জোরা ১৯৲ হইতে ২৫৲ টাকা।

মণিলাল এণ্ড কোং

জুয়েলার এবং গোল্ড স্মিথ—৪০নং গরাণহাটা, কলিকাতা।

পৌষ]　　　　　　　　　　　　[৯ম সংখ্যা।

বঙ্গদর্শন।

(নব পর্য্যায়)

দশম বর্ষ।

এস মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৭

বঙ্গদর্শন।

বরেন্দ্র-ভ্রমণ।

১

পতুম-সহর।

বরেন্দ্রভূমির পল্লীপথ কখন ধূলায়, কখন কাদায় সম্পূর্ণ সমাচ্ছন্ন থাকে। দরিদ্র পল্লীবাসিগণকে তাহার উপর দিয়াই প্রতি দিবসের সুখদুঃখ লইয়া যথাসম্ভব অধ্যবসায়ের সঙ্গে ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতে হয়। সে পথ নাগরিকবর্গের পক্ষে নিয়ত দুঃখজনক। কিন্তু তাহারই উভয় পার্শ্বে অতীত গৌরবের নানা কীর্ত্তিচিহ্ন ভস্মাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। দেশের কথা জানিতে হইলে, সে পথে পদার্পণ করিতে হইবে। তাহা সকল সময়ে সকলের পক্ষে সুখকর বলিয়া কথিত হইতে পারে না। যানবাহন সর্ব্বত্র সুলভ নয়, সকল স্থানে তাহাদের গতিবিধির পক্ষে সুব্যবস্থা করাও সকল সময়ে সম্ভব হয় না, সুতরাং পদার্পণ-ব্যাপারটি কখন কখন নিষ্ঠুর গদ্যের মত প্রতিভাত হইতে পারে। জলাশয়ের অভাব নাই,—সুপেয় সলিলের অভাব; দর্শনীয় বস্তুর অভাব নাই,—আশ্রয়-স্থানের অভাব। এরূপ অনেক অভাব অনেক স্থলেই পরিদর্শন-ব্যাপারের অনিবার্য্য ক্লেশ চিরসঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে।

এবার শীতের শেষে,—বসন্তোদয় সময়ে, বরেন্দ্রের এইরূপ দুরধিগম্য পল্লীপথে একটি সুদীর্ঘ ভ্রমণ-ব্যাপারের আয়োজন আরব্ধ হইয়াছিল। "মৃগয়া" না হইলেও, কাহারও কাহারও বিচারে তাহা "ব্যসন" বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। কারণ, এই অভিযানটি কেবল ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই সংকল্পিত হইয়াছিল। তজ্জন্য বিশ্বনিন্দুকের মুখে নানা তর্ক ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—"মাথা নাই, মাথা ব্যথা; ইতিহাস নাই, ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধান!" কিন্তু অভিযানটি কিছুতেই "মাঠে মারা" গেল না; কুমার শরৎকুমার রায় বাহাদুরের পরিচালন-কৌশলে সকল দ্বিধা, সকল অতিসাবধানতা, সকল বাধা, সকল বিতর্ক অতিক্রম করিয়া, যাত্রাপথে দণ্ডায়মান হইল।

নিরক্ষর পল্লীবাসীর নিকট তাহা প্রথমে একটি মৃগয়া-ব্যাপার বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকিবে। কারণ, হস্তী ছিল, বন্দুক ছিল, লোকলস্কর ছিল, পট্টাবাস ছিল, চিত্রসংগ্রহের জন্য বিচিত্র যন্ত্রপত্র ছিল। লোটা

কম্বল ছিল, বিছানা-বালিশ ছিল, বোতল-গেলাশ ছিল, খন্তা কুড়ালি ও কোদালিগুলি গোযানের উপর হইতে তাহাদের চিরপরিচিত অশোভন অঙ্গশোভা বাহির করিয়া, পল্লীবাসিগণকে বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিল।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়; সাহেব নয়, কেবল বাঙ্গালী; ছোট, বড়, মাঝারী;—কায়া, বপু, কলেবর! কেহ বাঘের সন্ধান লইতে লালায়িত নয়; অথচ বাঘের দেশে অগ্রসর হইতেছে। এরূপ উদ্দেশ্য লইয়া, এরূপ অভিযান ইহার পূর্ব্বে এ দেশে আর কখনও এরূপ বিজয়-যাত্রায় বহির্গত হয় নাই। সুতরাং যাঁহারা অকারণ বিভীষিকায় বা স্বভাবসুলভ নিদ্রাপরতন্ত্রতায় ইহার সঙ্গে যোগদান করিতে পারিলেন না, তাঁহারা "শিবাস্তে পন্থানঃ" বলিয়া বিদায় দান করিলেন। যাঁহারা অগ্রসর হইলেন, তাঁহারা কথা-কৌতুকে পল্লীপথ মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

পথপার্শ্ব হইতে গোপালকগণের সকল শাসন অতিক্রম করিয়া, সুরভিনন্দিনীগণ ঊর্দ্ধপুচ্ছে পলায়নপর হইল; মহিষেরা কিছু সাহসী,—দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করিতে করিতে, চাহিয়া দেখিতে লাগিল;—চারিদিকে ধূলা উড়িয়া, বসন্তের সকল শোভা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল! নগর হইতে পাঁচ ক্রোশের মধ্যেই প্রথম 'জয়-স্কন্ধাবারে'র স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। রথারোহণে অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিতে না করিতেই, কেহ কেহ জলযোগের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ব্যবস্থাগুণে ধূলার মধ্যেও তাহার অসুবিধা ঘটিতে পারিল না।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু অন্ধকার ঘনীভূত হইতে পারিল না। মেঘমুক্ত সুনীল গগনতলে শুক্লপক্ষের সুবিমল শীতল কিরণ চারিদিক এক অপূর্ব্ব শোভায় উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। যাহা কিছু কুৎসিত ছিল, তাহা আর দেখা যায় না; যাহা দেখা যায়, তাহার উপর রজতকিরণের বিচিত্র মোহাবরণ ইন্দ্রজালের মত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। দূরে দীপ জ্বলিয়া উঠিল,—একটি, দুইটি, অনেকটি,—ক্রমে তাহা নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। তাহাই অবশেষে 'জয়স্কন্ধাবারে'র আলোকমালা বলিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

পথের ধারে মাঠ,—মাঠের ধারে একটি ক্ষুদ্র খাড়ি, খাড়ির ধারে কয়েকটি অতীত সাক্ষী মহামহীরুহ,—তাহারই অনতিদূরে এক সদ্য-সুমার্জ্জিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণভূমির এক পার্শ্বে একখানি সুসজ্জিত কুটির; অপর পার্শ্বে ছোটবড় পট্টাবাস;—তাহার সম্মুখে কদলী তোরণ, পুষ্পগুচ্ছ, আলোক-মালা, পূর্ণকুম্ভের উপর নববিকশিত আম্র-মঞ্জরীর মাঙ্গলিক বিচিত্র বিন্যাস। পথশ্রান্ত সাহিত্যিকবর্গ সে প্রাঙ্গণে আসন গ্রহণ করিবা মাত্র, চা, ডাব, সরবৎ আসিয়া তাহাদিগকে যথোপচারে অভ্যর্থনা করিয়া লইল।

তখন "দিবসাঃ পরিণাম-রমণীয়াঃ";—কিছু কিঞ্চিৎ শীত থাকিলেও, তাহা "উপ-ভোগক্ষমঃ।" কেবল শীত কেন, সকল ব্যবস্থাই "উপভোগক্ষমা" বলিয়া মানিয়া লইতে হইল। বরেন্দ্রভূমির পুরাতন আতিথ্য-গৌরবের মর্য্যাদা-রক্ষার প্রশংসনীয় প্রবল

উদ্যমে জনৈক মুসলমান জমিদার তাঁহার পাত্রমিত্র সমভিব্যাহারে সময়োচিত বিনম্র আপ্যায়নে সাহিত্যিকবর্গের যেরূপ সাদর অভ্যর্থনা সুসম্পন্ন করিলেন, তাহাতে কাহারও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের অবসর রহিল না। গড়গড়ার উপর হইতে তাম্রকূটের কুণ্ডলায়িত ধূমপুঞ্জ আকাশমণ্ডলে সুগন্ধ বিস্তার করিয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে 'জয়স্কন্ধাবারে'র সকল স্থানে আরাম-আনন্দের সুসমাচার প্রচারিত করিয়া দিল।

বরেন্দ্রের নতোন্নত পুরাতন পল্লীভূমি বহুদিন জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল। সম্প্রতি সাঁওতাল পাহাড়িয়া প্রভৃতি কর্ম্মঠ কৃষক আসিয়া হলকর্ষণের সূত্রপাত করিতেছে। তাহারা জয়স্কন্ধাবার হইতে সসম্ভ্রমে দূরে দাঁড়াইয়া, তাহাদের কৌতূহল-পূর্ণ নয়ন সকল আলোকপুলকে "ঝলকিত" করিয়া তুলিতেছিল। কোন কোন সাহিত্যিক তাহাদিগকে পট্টাবাসের মধ্যে টানিয়া আনিয়া যন্ত্র সাহায্যে তাহাদের মাথা মাপিতে প্রবৃত্ত হইবা মাত্র, তাহাদের সকল কৌতূহল এক অনির্ব্বচনীয় বিভীষিকায় পরিণত হইয়া পড়িল। কাব্যামোদিগণ প্রভাতে পল্লীচিত্র সংগৃহীত করিবার আশায়, যন্ত্রগৃহ সুবিন্যস্ত করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ঐতিহাসিক সম্প্রদায় পল্লীবাসিগণকে সস্নেহে প্রত্যভিবাদন করিয়া, বিচিত্র মানচিত্রের উপর রেখাপাত করিতে করিতে নানা স্থানের পরিচয় সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে দৃশ্য অনুভব করিবার,— অনুভব করিয়া বঙ্গসাহিত্যের গৌরব উপভোগ করিবার;—তাহা ভাষায় প্রকাশিত করিবার নহে। সদ্ভাব, সদালাপ, সাধু-সংকল্প, উদ্যম, অধ্যবসায়, অপরাজিত উৎসাহ, যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেদীপ্যমান!

যেখানে এই "জয়স্কন্ধাবার" এরূপ সুব্যবস্থায় সুসংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নাম পলাশবাড়ী, থানা গোদাগাড়ী, জেলা রাজসাহী। পলাশবাড়ীর অনতিদূরে এক দিকে পালপুর,—তাহার উত্তরে পশ্চিমে এবং দক্ষিণে দুর্গপরিখার পুরাতন চিহ্ন এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। তাহার নিকটে ধরমপুর; তাহার ডাকনাম পালপুর, ধরমপুর, উপকণ্ঠ এখনও "মালঞ্চ" নামে কথিত হইয়া আসিতেছে। পলাশবাড়ীর একপার্শ্বে যে খাড়িটি বর্ত্তমান, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও, সুগভীর। তাহার উপর একটি সেতু; তাহা উত্তীর্ণ হইলেই একটি পুরাতন পল্লী। তাহা এখন "দেওপাড়া" নামে সুপরিচিত। দেওপাড়ার নাম সকল সভ্য-দেশের সাহিত্যেই স্থানলাভ করিয়াছে; সুতরাং তাহা এক্ষণে জগদ্বিখ্যাত। এই খ্যাতির মূল একখানি পুরাতন প্রস্তরলিপি।

এই পল্লীটি এখনও একরূপ জনশূন্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না; অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ইহার অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মেটকাফ্ সাহেব এখানে মৃগয়া উপলক্ষে উপনীত হইয়া, একটি বিস্তৃত সরোবর তীরে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে একখানি প্রস্তরে একটি প্রাচীন লিপি খোদিত থাকা দেখিতে পাইয়া, তাহা এসিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সে প্রস্তর-লিপি এখন

কলিকাতার "যাদুঘরে" সযত্নে সুরক্ষিত হইতেছে।

যে সরোবরতীরে এই পুরাতন প্রস্তর-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে;—এখনও তাহার জল তক্ তক্ করিতেছে। এক পার্শ্বে পদ্মবন সমুদ্ভূত হইয়া, তাহার স্বাভাবিক শোভা বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছে। এই সরোবরে অবতরণের জন্য সোপানাবলী ছিল; তাহা অদৃশ্য হইলেও, তাহার স্থান-নির্দ্দেশের সম্ভাবনা তিরোহিত হয় নাই। সাহিত্যিক-বর্গ প্রত্যুষে শিবির ত্যাগ করিয়া, পদব্রজে এই সরোবরতীরে উপনীত হইবা মাত্র, ইহার শোভা-সন্দর্শনে পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

"কিবা মধুর সরসী শোভা।
নিরমল পরিপূরিত জল,
এহি কত কত ভাঁতি কমল,
অতুলিত অলি বলিত মঞ্জু গুঞ্জত চিতলোভা॥"

সরোবরটি সুবিস্তৃত বলিয়াই কথিত হইতে পারে। তীরভূমিতে পুরাতন প্রাসাদাবলীর ধ্বংসাবশেষ ভূগর্ভে বিলীন হইয়া রহিয়াছে। উত্তরতীরে একটি সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডের সকল স্থানে ইষ্টকচিহ্ন; একটি স্থান "দরগা" বলিয়া সুপরিচিত। কাহার "দরগা" কবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কতদিন হইতে ভগ্নরূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে, কেহ তাহার সন্ধান প্রদান করিতে পারে না। মুসলমান-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার প্রবল প্রকোপের সময়ে যে সকল "দরগা" গৌরবে আকাশে মস্তকোত্তোলন করিয়াছিল, তাহার অনেক "দরগা"ই এখন এই রূপে ভূমি চুম্বন করিয়া, ক্রমে চিহ্নহীন হইয়া পড়িতেছে! ইহাও সেইরূপ একটি জয়-পরাজয়ের কীর্ত্তিচিহ্ন;—কালের কঠোর শাসনের অসংদিগ্ধ নিদর্শন। "দরগা" ছিল; তাহার স্মৃতি এখনও একেবারে বিলুপ্ত হইয়া পড়ে নাই। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কি ছিল, সে স্মৃতি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কেবল একটি অতীত সাক্ষী স্মৃতিচিহ্ন "দরগা"র ধ্বংসাবশেষের পার্শ্বদেশে নীরবে কালগণনা করিতেছিল। তাহা একখানি মসৃণ কৃষ্ণপ্রস্তর;—সুবিন্যস্ত শিল্পকৌশলে সুরচিত মকরযুগের ভগ্নাবশেষ!

এখানে একদিন এক দেবমন্দির ছিল, তাহার উপর "দরগা" উঠিয়াছিল; এখন আবার "দরগা"র ধ্বংসাবশেষের উপর এক বিল্ববৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। লোকে তাহার ফলের উপর হস্তার্পণ করে না; ভূপতিত হইলেও, আহরণ করিবার জন্য সাহস প্রকাশ করে না। একবার এক হতভাগ্য যুবক একটি ফল পাড়িতে গিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে; তাহার কথা এখনও পল্লীসমাজকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে; পল্লীবাসিগণ যুবকের দুরাকাঙ্ক্ষা প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল;—যুবক ইংরাজ;—সে কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, যেমন তাহার বন্দুকের সাহায্যে ফল পাড়িবার উপক্রম করিল, অমনি তাহার গুলি তাহারই মস্তক ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল! যুবকের নাম বারক্লে। হতভাগ্য বারক্লে জীবনের কত আশা লইয়া এদেশে আসিয়া, এইরূপে অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল! বারক্লে লেখকের সহিত সুপরিচিত

ছিল;—এই গ্রামে এই সরোবর-তীরে তাহার আপন বন্ধুকেই তাহার অকাল মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল;—এ সকলই সত্য কথা। কিন্তু এইরূপে এই চৈত্যবৃক্ষের ফলাহরণ করিতে গিয়াই যে দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা এখানে আসিয়া প্রথম অবগত হইলাম। কি জানি কেন,—একটি ফল লইয়া বারুরুর সমাধির উপর রাখিয়া আসিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু বৃক্ষে তখন ফল ছিল না! তাহার উদ্দেশে অজ্ঞাতসারে একবিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল!

সরোবরটির নাম "পদুম-সহর"। পল্লীর মধ্যে আরও দুইটি পুরাতন সরোবর আছে,—একটির নাম "শীতল সহর", আর একটির নাম "তপ্সহর", সরোবরের এরূপ নাম অন্য কোন স্থানে প্রচলিত আছে কি না, জানি না। এরূপ নামকরণের কারণ কি, কেহ তাহার সন্ধান প্রদান করিতে পারে না। "পদুম-সহরের" পূর্ব্বতীরে এক বিস্তৃত ভূমিখণ্ড; তাহার উপর দিয়া আধুনিক রাজপথটি উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। সেই পথের পূর্ব্বধারে—পথ হইতে অনতিদূরে—মেট্‌কাফ্‌ সাহেব প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লিপিটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত, পুরাতন বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ। তাহা এখন "বিজয়সেন-প্রশস্তি" বলিয়া সুধী-সমাজে সুপরিচিত।

দাক্ষিণাত্যের ব্রহ্মক্ষত্রিয়দিগের সুপরিচিত চন্দ্রবংশে বীরসেন প্রভৃতি কীর্ত্তিমানগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, বিজয়ী বিজয়সেন এখানে একটি অত্যুচ্চ মন্দির নির্ম্মিত করাইয়া, তন্মধ্যে হরিহর-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সকল কথা রাজকবি উমাপতি ধরের রচনা-কৌশলে সুলিখিত, এবং "বারেন্দ্রক-শিল্পি-গোষ্ঠি-চূড়ামণি রাণক শূলপাণি" কর্ত্তৃক প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বিজয় সেন দেব সুবিখ্যাত বল্লালসেনের পিতা;—সেন-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা;—তাঁহার কথা এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই দেব-মন্দিরের কথা প্রস্তরফলকে যেরূপ ভাবে লিখিত আছে, তাহা একটি ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, অতিশয়োক্তির আধার বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। সেকালে এবং একালে,—কোন কালেই মানুষ অতিশয়োক্তির হাত হইতে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে নাই; কখনও পারিবে বলিয়াও বোধ হয় না।

সেকালের আলঙ্কারিকগণের বিচারে অতিশয়োক্তি দোষ-পরিচ্ছেদে স্থান লাভ করিত না, কাব্যের অলঙ্কার বলিয়াই বিবেচিত হইত। এখন এই বিজ্ঞান-যুগের রুচিবিবর্ত্তনে তাহা দোষের মধ্যেই গণ্য হইয়া পড়িয়াছে। এখন মাপকাঠি হাতে লইয়া রচনা-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার দিন পড়িয়াছে;—একচুল ইতরবিশেষ হইলেই সর্ব্বনাশ! কিন্তু অতিশয়োক্তি যে অতিশয়োক্তি, তাহা ত বালকেও বুঝিতে পারিত। তবে সেকালে তাহা অলঙ্কার বলিয়া মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল কেন? তাহা একটি সাহিত্য-সমস্যা। সাহিত্যিকগণ তাহার মীমাংসার জন্য সময় নষ্ট করিতে পারিলেন না;—সরোবরতীরে কোথায় সেই পুরাতন দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ভূগর্ভে বিলীন

হইয়া রহিয়াছে, তাহারই অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন।

আমরা একালের রচনারুচি লইয়া অতিশয়োক্তির উপর একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু,—কেহ কেহ বলিবেন, ইহাতে আবার "কিন্তু" কি? কিন্তু ইহাতেই কিন্তু "কিন্তু"র অভাব নাই। সরোবরতীরে বসিয়া, তাহার সুবিস্তৃত সলিলরাশির দিকে চাহিয়া, তাহার তীরে কিরূপ আয়তনের দেবমন্দির গঠিত হইলে, সামঞ্জস্য সুরক্ষিত হইতে পারিত, তাহার কথা চিন্তা করিলেই, "কিন্তু"র সন্ধান লাভ করা যায়। রচনা-সামঞ্জস্যের মধ্যে যে বিচিত্র সুষমা আপনা হইতে আত্মবিকাশ করে, তাহার কোন আকার নাই;—মাপ-কাঠি লইয়া তাহার আয়তন মাপিয়া লইবার সম্ভাবনা কোথায়? কবি সে চেষ্টায় সময় নষ্ট করেন নাই। মন্দির-তলে উপবেশন করিয়া, তাহার রচনাগাম্ভীর্য্য যে পরিমাণে অনুভূতির আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই অনুভূতি তাঁহাকে সকল প্রকার ক্ষুদ্রসীমা অতিক্রম করাইয়া, একেবারে মেঘলোকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। তাই তিনি মন্দিরবর্ণনা করিতে গিয়া লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,—

দিক্ শাখা-মূলকাণ্ডং গগন
তলমহাম্ভোধিমধ্যা-স্তরীয়ং
ভানোঃ প্রাক্‌প্রত্যগদ্রিস্থিতিমিল-
দুদয়াস্তস্য মধ্যাহ্ন শৈলম্।
আলম্বস্তম্ভমেকং ত্রিভুবন
ভবনস্যৈকশেষং গিরীণাং
সপ্রদ্যুম্নেশ্বরস্য বাধিত
বসুমতীবাসবঃ সৌধমুচ্চৈঃ॥

ইহা কদাপি রচনা-দোষ বলিয়া কথিত হইতে পারে না;—ইহা কাব্যালঙ্কার মাত্র। মন্দির মধ্যে যে দেবমূর্ত্তি অর্চ্চনা লাভ করিত, তাহা হরিহর-মূর্ত্তি,—"প্রদ্যুম্নেশ্বর" নামে পরিচিত ছিল। প্রদ্যুম্ন (হরি) ঈশ্বর (হর) এই অর্থে প্রদ্যুম্নেশ্বর। তাহারই ক্ষীণস্মৃতি এখনও সরোবরকে "পদুম-সহর" বলিয়া পরিচিত করিয়া রাখিয়াছে। সাহিত্যিকগণ বুঝিলেন,—শীতল-সহর এবং তপ্‌-সহর নামক অপর দুইটি সরোবরের নামের মধ্যেও এইরূপ ঐতিহাসিক রহস্য নিহিত রহিয়াছে;—সে দুইটি সরোবরতীরেও এক সময়ে শীতলেশ্বরের এবং তপেশ্বরের দেবমন্দির বর্ত্তমান ছিল।

এ অঞ্চলে যে আরও অনেক সরোবর এবং দেবমন্দির বর্ত্তমান ছিল, এখনও তাহার কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। উমাপতি ধর কাব্যচ্ছলে তাহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। বিজয়সেন দেব নিয়ত শত্রুনিপাত করিতেন। নিহত অরাতিবৃন্দ সংগ্রাম মৃত্যু লাভ করিয়া, স্বর্গলোকে আশ্রয় প্রাপ্ত হইত। বিজয়সেন দেব নিয়ত যাগযজ্ঞ করিতেন। আহূত দেববৃন্দ আহুতির লোভে মর্ত্ত্য-লোকেই অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইতেন। তজ্জন্য এখানে অনেক 'সুরসদ্ম' এবং অনেক 'বিতত তল্প' দেখিতে পাওয়া যাইত। তাহাতে স্বর্গমর্ত্ত্যের মধ্যে 'ব্যত্যাস' সংস্থাপিত হইয়াছিল;—স্বর্গ মর্ত্ত্য হইয়া উঠিয়াছিল, মর্ত্ত্যই স্বর্গলোক বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। এখন 'দেওপাড়া' জগদ্বিখ্যাত; সেকালে তাহা এইরূপে

বিশ্ববিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। কবি লিখিয়া গিয়াছেন,—

মেরোরাহৃতবৈরিসঙ্কুল
তটাদাহৃয় যজ্বামরান্
ব্যত্যাসং পুরবাসিনাম
কৃত যঃ স্বর্গস্য মর্ত্ত্যস্য চ।
উত্তুঙ্গৈঃ সুরসদ্মভিশ্চ
বিততৈস্তল্লৈশ্চ শেষীকৃতং
চক্রে যেন পরস্পরস্য চ
সমং দ্যাবাপৃথিব্যোর্বপুঃ ॥২৫॥

ইহাও কাব্যালঙ্কারের নিদর্শন। কিন্তু ইহা আবার ঐতিহাসিক তথ্যেরও আধার। বিজয়সেন যুদ্ধজয় করিতেন, তিনি যাগযজ্ঞ করিতেন, বিস্তৃত সরোবর খনন করাইতেন, দেবালয় নির্ম্মিত করাইতেন,—ইহার সকল কথাই ইতিহাসের কথা। আর একটি কথা আরও বিশিষ্ট কারণে ইতিহাসের কথা। সেকালে সরোবরের নাম ছিল 'তল্ল,'—কথাটি সংস্কৃতমূলক না হইয়াও, প্রবল প্রচলন গৌরবে কাব্য মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। একালের 'তালাও' যে মুসলমানী ভাষা হইতে জন্মলাভ করে নাই, মুসলমানাগমনের পূর্ব্বকালবর্ত্তী প্রস্তরলিপির এই 'তল্ল'-শব্দ তাহারই অভ্রান্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ। এই শব্দ এখন সাহিত্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে। সাহিত্যিকগণ এক বাক্যে ইহাকে আবার সাহিত্যে স্থান দান করিবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

প্রদ্যুম্নেশ্বরের পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ কোথায় ভূগর্ভে নিহিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার সন্ধান লাভ করিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইল না। কৃষকেরা দেখাইয়া দিল,—একটি স্থানে তাহাদের হলকর্ষণের বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। সেখানে ভূগর্ভে এক প্রস্তর নির্ম্মিত "রাজার মার ঢেঁকি" পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার অনতিদূরে আরও একটি ঐরূপ ঢেঁকি; তাহা হয় ত "রাজার বাপের ঢেঁকি" হইবে! তাহাদের মূল পাতালে চলিয়া গিয়াছে,—কতবার কত লোকে ভূমি খনন করিয়া তুলিয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারে নাই; একবার এক কালেক্টার সাহেব পর্য্যন্ত বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন!" একজন খুব গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে দৃঢ়স্বরেই ব্যক্ত করিল,—"রাজা বা রাজপুত্র না আসিলে, ঢেঁকি উঠিবে না!" সাহিত্যিকগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইয়া, খননকার্য্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ব্যস্ত হইলে কি হইবে;—অর্থলোভ, অনুনয়-বিনয়, ব্যর্থ হইয়া গেল;—কেহ খননকার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। একজন একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল! তখন সাহিত্যিকগণ কোদালী ধরিলেন। বরেন্দ্রভূমির কঠিন মৃত্তিকা প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে "পাথর" হইয়া উঠিয়াছিল;—সুকুমার সাহিত্যের সুকুমার সাধকগণ সমালোচনা-পটুত্বের পরিচয় প্রদানে সিদ্ধহস্ত হইলেও, খনন-পটুত্বের পরিচয় দান করিতে পারিলেন না। অবশেষে হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ সাঁওতালগণ সেই দুরূহকার্য্যে নিযুক্ত হইল। বুঝিতে পারা গেল;—ধৈর্য্য ভিন্ন উপায় নাস্তি; প্রতীক্ষা ভিন্ন কৌতূহল চরিতার্থ কি[illegible] সরল পথ নাই। খনন-কার্য্য চলিতে [illegible]লপুরের —সাহিত্যিকগণ চারিদিকে [illegible]তলে বৃক্ষ-[illegible]লক্ষের নানা [illegible] সকল স্থানের

করিয়া স্বরসংযোগে প্রশস্তি পাঠ করিয়া, সেই পুরাতন দেবভূমিকে আবার সংস্কৃত শ্লোক পাঠে মুখরিত করিয়া তুলিলেন। আবার,—কিন্তু কতদিন পরে,—সেখানে দেবভাষায় সুললিত রচনা-মাধুর্য্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তখন ক্ষণকালের জন্য "সেকাল" যেন কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া, প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল, রচনা-কৌশলের অমোঘ মাহাত্ম্যে প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির, মন্দির মধ্যস্থ দেবমূর্ত্তি, তাহার বসন-ভূষণ, তাহার অর্চ্চনা-আরাধনা, সকলই যেন এক সঙ্গে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সরোবর নূতন শোভায় বিকশিত হইল, তাহার তীরভূমি যেন নূপুরশিঞ্জনে মুখরিত হইয়া গেল। যখন প্রশস্তি-পাঠক সকলকে বুঝাইয়া বুঝাইয়া শুনাইতে লাগিলেন,—এই সেই সরোবর, যেখানে পুরাঙ্গনাগণের স্তনচন্দন-সৌরভে উচ্ছলিত মধুকরনিকর নিতান্ত বিভ্রান্ত হইয়া, জলের উপর নিরন্তর সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইত;—এই সেই সরোবর, যাহার পাতালস্পর্শী তলদেশ নাগরাণীর মুকুটমণির স্নিগ্ধজ্যোতি বিচ্ছুরিত করিয়া দিত;—এই সেই সরোবর, যাহার শীতল সলিলে আকণ্ঠমগ্ন পুরাঙ্গনাগণের অঙ্গজ্যোতি আবৃত হইয়াও, সমধিক বিকশিত হইয়া উঠিত; তখন সহসা মনে পড়িয়া গেল, আজ দোলপূর্ণিমা! এই দিনে, এমন স্থানে, সেকালে না জানি কত আনন্দ, কত কৌতুক, কত কোলাহল সরোবরতীরকে লালে লাল করিয়া তুলিত। বলিতে না বলিতেই ব্যবস্থাকুশল ভৃত্যগণ আবীর-ভাণ্ড উপস্থিত করিল। তখন আর গুরুলঘু বিচারের অবসর রহিল না। অনেক দিনের পর, প্রদ্যুম্নেশ্বরের সরোবরতীর আবার আবীরে লালে লাল হইয়া গেল। তখনকার সাহিত্যিকগণের শোভা—তাঁহাদের কলহ-কৌতুক, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সরোবরে অবতরণ করিবার একান্ত আগ্রহ,—কেবল অনুভূতির বিষয় হইয়া, সুখের স্মৃতিকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে। তজ্জন্য উমাপতি ধরের সেই সুরচিত শ্লোক এখনও থাকিয়া থাকিয়া ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে।

> বিলেশয়বিলাসিনী-মুকুটকোটিরত্নাঙ্কুর-
> স্ফুরৎকিরণমঞ্জরীচ্ছুরিতবারিপূরং পুরঃ।
> চখান পুরবৈরিণঃ সজলমগ্নপৌরাঙ্গনা-
> স্তনৈণমদসৌরভোচ্ছলিতচঞ্চরীকং সরঃ॥

বিশ্বরূপ আত্মপ্রকাশ করিলে, চিরাভ্যস্ত পূজার মন্ত্র বিস্মৃত হইতে হয়, হাতের পুষ্পাঞ্জলি স্খলিত হইয়া পড়ে, পাদপদ্মে অর্পণ করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয় না, অনুভূতিই অর্চ্চনার সকল অঙ্গ অধিকার করিয়া লয়। তখন আর স্থানকালের ব্যবধান অন্তরায় হইতে পারে না। সরোবরতীরে সাহিত্যিকগণ কি দেখিয়াছিলেন, জানি না; সকলেই আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন ভগবান্ মরীচিমালী মধ্যগগনে চরণ সঞ্চার করিয়া, ত্রিবিক্রম নামের পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন; তথাপি সাহিত্যিকগণের উৎসবানন্দ বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই।

স্নানাহারের পর, অত্যল্পকাল বিশ্রাম লাভ করিয়া, সাহিত্যিকগণ দুই দলে বিভক্ত হইলেন। এক দল পদব্রজে পুনরায় খনন-কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন।

আর একদল দুইটি হস্তী লইয়া,নিকটস্থ গ্রাম-মণ্ডলী পর্য্যটন করিয়া, ভৌগোলিক তত্ত্বের আবিষ্কার-সাধনের জন্য অগ্রসর হইলেন। মধ্য এসিয়ায় বা মধ্য আফ্রিকায় এবং (সাহস ও সুযোগ পাইলে,) তুষারাচ্ছন্ন তিব্বতের উপত্যকায় ভৌগোলিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করাই শোভা পায়। দেশের মধ্যে, গৃহের কোণে, আবার ভৌগোলিক তত্ত্বের অনুসন্ধান কি? আমরা কি সত্য সত্যই এমন কথা বলিয়া, উপহাস করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছি? আমরা বরং মেরুমণ্ডলের মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া, তাহার উপর প্রত্যেক ভ্রমণকারীর ভ্রমণপথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারি;—দেশের মধ্যে, গৃহের কোণে, কোথায় কাহার প্রকৃত অবস্থান, তাহার কিছুমাত্র সন্ধান প্রদান করিতে পারি না! আমাদের সাহিত্যে "দেওপাড়া"র নাম একেবারে অপরিজ্ঞাত নয়;—কিন্তু "দেওপাড়া" কোথায়, তাহার আসে-পাশে কি ছিল, এখনই বা কি আছে, তাহার কথা আমাদের সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। তর্ক ছাড়িয়া, সরল ভাবে ইহার আলোচনা করিতে গেলে, ধিক্কার ধ্বনিত হইয়া উঠে। আমরা সন্ধান লই নাই বলিয়াই আমাদের দেশ আমাদের কাছে এরূপ অপরিচিত!

আমাদের ইতিহাস নাই, তাহা অল্প কথা। উপাদান সংগৃহীত হইলে, ইতিহাস রচিত হইতে কতক্ষণ? কিন্তু উপাদান সংকলিত করা কোনরূপেই অনায়াস সাধ্য বলিয়া স্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহার সংখ্যা অল্প হইলে,—অনায়াসলভ্য হইলে,—সাধারণ শিক্ষার অধিগম্য হইলে,—সংকলনকার্য্য সহজ হইতে পারিত। সৌভাগ্যক্রমে উপাদানের সংখ্যা সীমাশূন্য;—দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা যথাযোগ্য জ্ঞানে অধিগত করিবার উপযুক্ত বিশিষ্ট শিক্ষা এখনও অপরিজ্ঞাত। এখনও তথ্যানুসন্ধানের ভার নিরক্ষর পল্লীবাসীর উপরেই ন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহারাই তাহার প্রথম সন্ধান-দাতা;—অনেক স্থলে তাহারাই প্রকৃত আবিষ্কর্ত্তা। তাহারা নিরক্ষর বলিয়াই অশেষ ঐতিহাসিক কৌতূহলের আধার "অশোকের লাট" দেশের লোকের নিকট "ভীমের গদা",—বরেন্দ্রভূমির "গরুড়-স্তম্ভ" এখনও "ভীমের পান্তি,"—দেওপাড়ার "রাজার মার ঢেঁকিও" তাহার অধিক পরিচয় লাভ করিতে পারে নাই। যেখানে এত যত্নে, এত অর্থব্যয়ে, এরূপ সরোবর এবং দেব-মন্দির অস্তিত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান কখনও মরুভূমির মত নিরন্তর ধূ ধূ করিত না,—সেখানেও জন-নিবাস ছিল, সেখানেও তাহার প্রকৃতি-বিজ্ঞাপক নানা চিহ্ন বর্ত্তমান থাকিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাহার প্রকৃতি কিরূপ, কৃষক তাহার সন্ধান প্রদান করিতে পারে না। তাহার সন্ধান লইবার জন্যই এই আয়াস-স্বীকারের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল।

সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল না, পালপুরের পরিখা, ধরমপুরের মহামহীরুহতলে বৃক্ষ-মূলাচ্ছন্ন পুরাতন দেবমূর্ত্তি, মালঞ্চের নানা শ্রীমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ এই সকল স্থানের

পুরাতন অবস্থানের এবং বিলুপ্তগৌরবের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, যগপুর নামক পল্লী দেখিতে পাওয়া গেল। একটি সুদীর্ঘ সরোবর, তাহার তীরে একটি পুরাতন বৃক্ষ, বৃক্ষমূলে এক সুবৃহৎ দেবমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ;—গ্রামের মধ্যে একখানি প্রস্তরফলকে যোগাসনোপবিষ্ট নয়টি নারীমূর্ত্তি, দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া কৌতুহল বৰ্দ্ধিত করিয়া তুলিল। গ্রামের লোকে সন্ধান দিল,—মাঠের মধ্যে একটি সরোবর আছে, তাহার নাম—"মঠ-পুকুর।" সেখানে গিয়া বিস্ময়ের অবধি রহিল না। গ্রামের লোকে ইষ্টকাহরণের লোভে সরোবরতীরে মৃত্তিকা খনন করিয়া, এক অতিপুরাতন মঠের ভিত্তি বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের খননশ্রমই সার হইয়াছে। মঠ এত পুরাতন যে তাহার ইষ্টকরাশি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নিকটে একখানি সুবৃহৎ কৃষ্ণপ্রস্তরের দ্বারফলক পড়িয়া রহিয়াছে।

তখন সূর্য্যদেব অস্তাচলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, বরেন্দ্রের নতোন্নত বিস্তৃত প্রান্তরের উপর সন্ধ্যার অঞ্চলছায়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিবার আয়োজন করিতেছে। হস্তী পরিশ্রান্ত হইয়া থাকিয়া থাকিয়া আর্ত্তনাদ জ্ঞাপন করিতেছে। পিপাসার জল অনেকক্ষণ ফুরাইয়া গিয়াছে, মাহুত পথ ভুলিয়া যে সীমাশূন্য প্রান্তরের মধ্যে হস্তীকে চালিত করিয়া আনিয়াছে, তাহার কোন্ খানে আরম্ভ এবং কোন্ খানে শেষ, তাহা আর প্রতিভাত হইতেছে না। অবশেষে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনকারী জনৈক কৃষকের নির্দ্দেশে কোনরূপে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে রাত্রি অধিক হইয়া গেল।

শিবিরে আনন্দ কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। "রাজার বাপের ঢেঁকি" উঠিয়াছে, তাহাকে একেবারে মাঠের সমতলক্ষেত্রের উপর তুলিয়া রাখা হইয়াছে। "রাজার মার ঢেঁকি" সম্পূর্ণরূপে শেষ পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে;—পঞ্চাশ জন সাঁওতাল দড়িদড়া লইয়াও তাহাকে উপরে টানিয়া তুলিতে পারে নাই! দুইটি ঢেঁকির দৈর্ঘ্য প্রায় এক-রূপ;—ঢেঁকি নহে,—প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের দ্বারফলক,—চৌকাঠের উপরের এবং নীচের প্রস্তরফলক,—কারুকার্য্য খচিত,—আট হাত,—বার ফিট,"—ইত্যাদি সংবাদ (হস্তীর উপর হইতে অবতরণ করিতে না করিতেই) অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। কৌতুহল প্রবল হইলেও, সে রজনীতে আর চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জনের অবসর রহিল না।

বরেন্দ্রের নন্দনাবাসী গ্রামনিবাসী দিবাকর ভট্টের সুযোগ্য পুত্র কুল্লুক ভট্ট "মনুসংহিতার" টীকা রচনা করিয়া, অমর হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার নাম, তাঁহার পাণ্ডিত্য, সভ্যসমাজে সুপরিচিত। বরেন্দ্রের এক নিভৃত পল্লীতে,—ভাণপুর নামক গ্রামে,—কুল্লুক ভট্টের এক বংশধর এখনও বাস করিয়া থাকেন। আমরা প্রত্যুষে ভাণপুরের নিকটবর্ত্তী কোন কোন গ্রামে তথ্যানুসন্ধানে বহির্গত হইব, মধ্যাহ্নে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিব না, এই সকল বিবেচনা করিয়া, কুল্লুকবংশধর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহার গৃহে মধ্যাহ্নে আতিথ্য-স্বীকারের

জন্য অনুরোধ জানাইতে শিবিরে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। ইহা এত অল্প কথায়, এত সরল ভাবে, অভিব্যক্ত হইল যে, ইহাকে "অনুকূল গলহস্ত" অপেক্ষাও অধিক অনুকূল বলিয়া মানিয়া লইতে হইল। ভট্ট সহাস্য মুখে বিদায় গ্রহণ করিলে, সাহিত্যিকগণ সে রজনীতে বড় অধিকক্ষণ বিশ্রামের অবসর লাভ করিলেন না। নগর হইতে পত্র আসিয়াছিল; ফলমূল-মিষ্টান্ন আসিয়াছিল; ডাব এবং বরফ আসিয়াছিল; আলোকচিত্রের মালমসলা আসিয়াছিল; সে সকল বুঝিয়া লইতে, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে, ধন্যবাদ সহ পত্রোত্তর প্রদান করিতে, এবং অনুসন্ধানসমিতির সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভার নগরে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে, রজনী অধিক হইয়া পড়িল। তথাপি ভাল করিয়া প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই, বনগাহন কোলাহলে শিবির প্রতিবোধিত হইয়া উঠিল। কেহ দেখাইবার জন্য, কেহ দেখিবার জন্য, প্রবল আগ্রহের অনিবার্য্য তাড়নায়, শয্যাত্যাগ করিতে কাতরোক্তি করিলেন না। সূর্য্যোদয়কালে সকলেই সেই পুরাতন মন্দিরের দ্বারফলকের নিকটে উপনীত হইয়া, তাহার পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। মন্দির-দ্বার প্রায় আট হাত প্রশস্ত ছিল; সুতরাং তাহার উচ্চতা প্রায় ষোল হাত। না জানি কত লোকের দেবদর্শনের সৌকর্য্যসাধনের উদ্দেশ্যে এরূপ আয়তন নির্দিষ্ট হইয়াছিল! দ্বারের উচ্চতার সঙ্গে বেদিকার ও দেবমূর্ত্তির উচ্চতার, এবং বেদিকার উচ্চতার সঙ্গে দেবমূর্ত্তির উচ্চতার একটি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ-সামঞ্জস্য সেকালের মন্দির-রচনায় সুরক্ষিত হইত। তজ্জন্য মূর্ত্তি পাইলে, তাহা ধরিয়া মন্দিরের আয়তন কিরূপ ছিল, তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়;—মন্দির-দ্বার পাইলেও, তাহা ধরিয়া শ্রীমূর্ত্তির আয়তন কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। দ্বার যত উচ্চ, তাহার অষ্টমাংশ বিয়োগ করিলে যাহা থাকে, তাহাই বেদিকা এবং শ্রীমূর্ত্তির উচ্চতার সমষ্টি;—এই সমষ্টির এক-চতুর্থাংশ বেদিকার, ও তিন-চতুর্থাংশ শ্রীমূর্ত্তির উচ্চতা বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকে। এই নিয়মের অনুসরণ করিলে বুঝিতে পারা যায়,—প্রদ্যুম্নেশ্বরের বিগ্রহমূর্ত্তি নিতান্ত ক্ষুদ্রমূর্ত্তি বলিয়া পরিচিত ছিল না।

এত বড় মূর্ত্তি কোথায় গেল? মন্দির ধ্বংসের সময়ে, তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও, তাহার ধ্বংসাবশেষ কোথায় গেল? তাহাতে কাহারও কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহা হয় ত সরোবরের জলে নিহিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাই সম্ভব বলিয়া মনে হইয়াছিল। তজ্জন্য কোন উৎসাহী সাহিত্যরথী কদলীবৃক্ষে ভেলা রচনা করিয়া, সরোবরের জলে শ্রীমূর্ত্তির অনুসন্ধানের আয়োজন করিয়াছিলেন। বরেন্দ্রের বিশীর্ণ কদলীতরু সাহিত্যিকের গুরুভার সহ্য করিতে পারে নাই,—অগত্যা শ্রীমূর্ত্তির অনুসন্ধানব্যাপার অসম্পন্ন রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং সকলে মিলিয়া দ্বার-ফলক ধৌত করিয়া, তাহার আলোকচিত্র লইয়া, ভট্টবংশধরের আতিথ্যের উপর নির্ভর করিয়া, একটি দিনব্যাপী দীর্ঘভ্রমণের জন্য বিজয়যাত্রায় বহির্গত হইলেন। তখন প্রভাতবায়ু সংস্পর্শে আম্রবনের মধ্যে কোকিলের কলকণ্ঠে বসন্তের বিজয়বার্ত্তা সগৌরবে বিঘোষিত হইয়া উঠিতেছিল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

উৎকল-প্রসঙ্গে।

(২)

রাজা মরকত কেশরী যে স্থানে মহানদী দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে, সেই স্থানটিকে প্রাকৃতিক দুস্তর পরিখা-বেষ্টিত মনে করিয়া সেই স্থানেই কটক রাজধানী স্থাপন করেন। বর্ষাকালে এই নদী ভীষণ আকার ধারণ করে, নানা স্থানে ভীতি-উৎপাদক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আবর্ত্ত উৎপাদিত হয়, নানা নদী আসিয়া মহানদীর কলেবর-বৃদ্ধির সহায়তা করে; সুতরাং বহিঃশত্রু আসিয়া এই দুরাক্রম্য স্থানে সহসা উপস্থিত হইতে পারিবে না—রাজা এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়াই স্থানটি মনোনীত করিয়াছিলেন। রাজধানী-নির্ম্মাণের পর যখন দেখিলেন, মহানদীর জলপ্লাবনে অচিরেই নগরটি বিনষ্ট হইতে পারে, তখন তিনি মহানদীর দ্বিতীয় শাখা কাঠযুড়ীর তীরভূমিতে বজ্রকল্প প্রস্তরখণ্ড দ্বারা বিপুল বজ্রকল্প বন্ধনীর (Revetment) সৃষ্টি করিলেন। বলয়াকারে মহানদী এই স্থানটিকে বেষ্টন করিয়াছে বলিয়া এই স্থানটি বলয়বাটী কটক এই নামে অভিহিত হইয়াছে; চক্রাকারে নগরটি পরিদৃশ্যমান হইত বলিয়া স্থানটি চক্রবাটী কটক নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভূ কবলিত পর্ব্বতের সমতলভূমিতে নগরটি অবস্থিত বলিয়া সানুবাটী কটক নামে কথিত হইয়াছে, অথবা এই নগরে সেনানিবাস স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া সেনাবাটী কটক এই নামে নগরের নামকরণ হইয়াছে বলিতে পারি না। নগরের নামে পরে জনপদেরও নামের সৃষ্টি হয়। কটক-দুর্গের নাম বারবাটী, এই দুর্গের মধ্যে বারটি চত্বর ছিল, * এই জন্যই দুর্গের নাম বারবাটী হইয়াছে। আইন-ই-আকবরি পাঠে জানা যায়, এই দুর্গে ধূসর বর্ণের গ্রানাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত নবতল গৃহ ছিল। কেহ কেহ এই দুর্গের নির্ম্মাতা উড়িষ্যার শেষ রাজা মুকুন্দদেব, কেহ কেহ পুরুষোত্তম-মন্দিরের নির্ম্মাতা অনঙ্গ ভীমদেব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যিনিই হউন, তাঁহার যে উন্মুক্ত বিপুল রাজকোষ বহু বর্ষের জন্য শূন্য করিয়া এই দুর্গ-প্রাসাদের নির্ম্মাণের জন্য বহুবর্ষ ব্যাপী ধনধারার মহ সৃষ্টি হইয়া ছিল, সন্দেহ নাই। যে দুর্গ-প্রাসাদের নির্ম্মাণের জন্য দেশের প্রধান প্রধান স্থপতির, প্রধান প্রধান শিল্পীর, প্রধান প্রধান ভাস্করের চিন্তানিপুণ বুদ্ধি ও কর্ম্মনিপুণ হস্ত বহু বর্ষ ব্যাপিয়া নিয়োজিত ছিল, যে বিপুল রাজ-প্রাসাদকে সুসজ্জিত করিবার জন্য, বিভূষিত করিবার জন্য নানা দিগ্‌দেশ হইতে বহুবর্ষ ব্যাপিয়া বহুমূল্য সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক

---

* ঐতিহাসিকদিগের এইরূপ একটি ভ্রম হইয়াছিল; এই ভ্রমে পতিত হইয়া আইন-ই-আকবরিকার দুর্গস্থ নয়টি চত্বর দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক আবার "বার" শব্দের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত "বরাহ" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। উৎকলে "বাটী" একটি ভূমির পরিমাণ, বার বাটী পরিমিত ভূমিতে দুর্গটি স্থাপিত হইয়াছিল, সেই জন্য দুর্গটির নাম বারবাটী হইয়াছে। ৩ বিঘায় এক মান, ২০ মানে এক বাটী।

অগণিত দ্রব্যসম্ভার আনীত হইয়াছিল, ভাগ্যলক্ষ্মীর অপ্রসন্নতায় এক দিন তাহা হিন্দু রাজার হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া গেল। মুসলমান রাজার উৎকট ভোগতৃষ্ণা-নিবারণের জন্য তাঁহার শোণিতসিক্ত হস্তে ভগবান্ অর্পণ করিলেন। সুবর্ণস্তম্ভ-নিবদ্ধ পার্শ্বলম্বমান বহুমূল্য মুক্তাজালে উদ্‌গ্রথিত, মহার্ঘ্য রত্নসমূহে উদ্ভাসিত, সুবর্ণসূত্রে বিস্ফুরিত, বহুমূল্য কৌশেয় বস্ত্রে নির্ম্মিত, চন্দ্রাতপের নিম্নে সুবর্ণসূত্রে গ্রথিত ফল, পুষ্প, লতা, বৃক্ষ, পশু, পক্ষীর চিত্র-সমাকুল কোমল পশুলোমনির্ম্মিত বহুমূল্য আস্তরণে সমাচ্ছাদিত গৃহাভ্যন্তরের মধ্যস্থলে রক্ত বর্ণের মকমল-নির্ম্মিত সুবৃহৎ উপাধানে পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়া উপবিষ্ট দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি গর্ব্বিত আগা মহম্মদ জমানকে দেখিয়া, আর সেইরূপ ভাস্বর রত্নসমূহে সমুদ্ভাসিত গৃহসজ্জা দেখিয়া উইলিয়ম ব্রুটন বিস্মিত, মোহিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। * বলা বাহুল্য যে, ইহার একটিও মুসলমান রাজা বা রাজপ্রতিনিধির আহৃত ও আনীত নহে, সমস্ত গৃহোপকরণই হিন্দু রাজার বহু শতাব্দীর পোষিত সৌন্দর্য্য-স্পৃহা, যত্ন চেষ্টা ও অজস্র ধনধারা-বর্ষণের কর্ম্মলব্ধ মহার্ঘ্য মহাফল।

উৎকল-কলিঙ্গরাজের কীদৃশ শক্তি ও প্রতাপ ছিল, ইহা দ্বারাই তাহার অনুমান করা যাইতে পারে যে, রাজনীতি বিশারদ মহাশক্তি দিল্লীশ্বর আকবরের রাজদূত হাসান খাঁ উৎকল-কলিঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা মুকুন্দদেবের রাজসভায় সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতেন। মুকুন্দদেব যখন কেটসমা নামক সীমান্ত দুর্গে—অসতর্ক ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে গৌড়েশ্বর সোলেমান কোরাণীর জামাতা ও সেনাপতি, একটাকিয়া ভাদুড়ী কুলে সমুৎপন্ন রাজা নয়ানচাঁদ রায়ের পুত্র কালাচাঁদ বা রাজচন্দ্র নামে অভিহিত, মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণের পর কালাপাহাড় নামে বিখ্যাত, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ—গৌড়েশ্বরের অনুমতি লইয়া দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত তীব্রবেগে ময়ূরভঞ্জে উপস্থিত হয়েন; সে স্থানের রাজ-প্রতিনিধিকে পরাভূত করিয়া যাজপুরের সন্নিধানে মুকুন্দদেবের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করেন। সেই যুদ্ধে হিন্দুর সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সহিত উৎকলরাজ মুকুন্দদেব নিহত হয়েন। কেহ কেহ বলেন, উৎকলের দক্ষিণাংশে একটি বিদ্রোহী দলের সৃষ্টি হয়, সেই বিদ্রোহ দমনের জন্য রাজা মুকুন্দদেব দক্ষিণ উৎকলে গমন করেন। বিদ্রোহীর হস্তে মুকুন্দদেবের মৃত্যু হয়, সেই সুযোগে কালাপাহাড় উৎকলে প্রবেশ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন কুম্ভকর্ণের মত রাজা মুকুন্দদেব ছ'মাস জাগিয়া থাকিতেন, আর ছ'মাস নিদ্রাদেবীর উপাসনা করিতেন। রাজা যখন নিদ্রিত থাকিতেন, সে সময়ে মন্ত্রী, সেনাপতি এবং সেনাবৃন্দ সকলেই একরূপ বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিবার সুযোগ পাইত। কুম্ভকর্ণ যখন নিদ্রায় অভিভূত, সেই সময়ে ভগবান্ রামচন্দ্র লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, আর আজ স্বধর্ম্মত্যাগী নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দু ও হিন্দুধর্ম্মের

---

* Mr Wilson's 'The Early Annals of the English of Bengal'.

উপরে খড়্গহস্ত বলোন্মত্ত কালাপাহাড় সেইরূপ নিদ্রাভিভূত রাজা মুকুন্দদেবের দুর্গে প্রবেশ করিলেন, কুম্ভকর্ণের মত অকাল-জাগ্রত রাজা মুকুন্দদেবকে নিহত করিলেন; যে উৎকল কলিঙ্গে মহাবীর বৌদ্ধরাজা অশোক লক্ষ মস্তক ছিন্ন করিয়াও দীর্ঘকাল বৌদ্ধসাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারেন নাই, আজও উদয়াচলের প্রস্তরগাত্রে অশোকের উৎকীর্ণ শাসন-শিলালিপি রহিয়াছে; কিন্তু অশোকের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে একরূপ উৎকল-কলিঙ্গ হইতে বৌদ্ধসাম্রাজ্যও অন্তর্হিত হইয়াছে, বঙ্গবিজয়ী বক্তিয়ার খিলিজি সেনাপতি মহম্মদ-ই-সিরাণ দ্বারা ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া উড়িষ্যা-রাজের শৌর্য্য, বীর্য্য, প্রবল প্রতাপ বুঝিয়াছিলেন, বঙ্গদেশের মত সহজে উৎকলে দন্তস্ফুট করিবার সম্ভাবনা নাই অবধারণ করিয়া আর দ্বিতীয় বার যে উৎকল-কলিঙ্গ আক্রমণের জন্য সাহসী হয়েন নাই, মহারাজ অনঙ্গভীমের মন্ত্রী শৌর্য্যবীর্য্যের অবতার ব্রাহ্মণবংশাবতংস বিষ্ণুর ভুজবীর্য্যে ভীত ও বিত্রস্ত হইয়া যবন-সেনা যে উৎকলের সীমা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, যে বীর-প্রসবিত্রী উৎকল-কলিঙ্গভূমির সাহসী বীর-কুমারেরা বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া বঙ্গেশ্বর তুগ্রিণ-ই তুগান খাঁকে ব্যতিব্যস্ত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, বঙ্গেশ্বর তুগান খাঁ যে উৎকল আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া পলায়ন ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই অবধারণ করেন, যে উৎকল-কলিঙ্গের অধিপতি কোণার্ক-মন্দিরের নির্ম্মাতা মহারাজ নরসিংহ দেবের জামাতা ও সেনাপতি সামন্ত রায় কর্ত্তৃক চালিত আড়াইশত মাত্র সৈন্যের আক্রমণে পরাভূত ও ভীত হইয়া সেনানীর সহিত পাঁচ সহস্র মুসলমান সৈন্য 'কটাসেন' ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গরাশির মত যে উৎকল-সেনার অপ্রতিহত তীব্রবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া গৌড়ের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী পুনঃপুনঃ কম্পিত হইতেছিল; আজ সেই বীরপ্রসূ গিরিবপ্রা সাগরপরিখা বিপুলকলেবরা নদীসহস্রে অগম্যা উৎকলকলিঙ্গভূমি কুলপাংশুল ব্রাহ্মণকুমার পাপিষ্ঠ কালা-পাহাড়ের পাপ হস্তে বিপর্য্যস্ত, বিধ্বস্ত ও লাঞ্ছিত হইল! মহাত্মা মহর্ষি কশ্যপের পুত্র হিরণাক্ষ, হিরণ্যকশিপু; ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিসত্তম পুলস্ত্যের পৌত্র রাবণ, কুম্ভকর্ণ; রাজর্ষি উগ্রসেনের পুত্র কংসাসুর; আসুরভাবাপন্ন ভ্রাতার হস্তে দেবভাবাপন্ন ভ্রাতার নিগ্রহ চিরকাল আছে, অসুরের হস্তে দেবতার নিগ্রহ চিরকাল আছে। কালাপাহাড়ের পাপমলিন কঠোর হস্ত কেবল রাজার ন্যায় নিদ্রিত-অচেতন দেবপ্রতিমাগুলির লাঞ্ছনা করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত সচেতন জাগ্রত দেবপ্রতিমারূপিণী পূজনীয়া হিন্দুপুরস্ত্রীদিগেরও লাঞ্ছনা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে অনেক দেব-প্রতিমা কালাপাহাড়ের কঠোর হস্ত দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, যবনের পাপহস্তস্পর্শের ভয়ে অনেক জীবন্ত সচেতন প্রতিমা আপনা হইতেই আকাশস্পর্শী-সর্ব্বভক্ষ্যের কুক্ষিগত হইয়াছিল; সচেতন অচেতন অনেক দেব-প্রতিমা আবার আত্মসম্মানাভিজ্ঞ অনেক

ভক্তের পবিত্র দুঃখকম্পিত হস্ত দ্বারা অতল জলরাশির অগাধ বক্ষে নিমজ্জিত হইয়াছিল; উৎকল-কলিঙ্গে হাহাকার উঠিয়াছিল! এ প্রস্তাবে দুর্বৃত্ত কালা-পাহাড়ের সকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত, পরি-দেবনাময়, পরিতাপময়, শোচনীয় পরিণাম বলিবার অবকাশ নাই। পাঠকবর্গের জানি-বার আকাঙ্ক্ষা হইলে "বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস" পাঠ করিতে পারেন।

কটকদুর্গ মুসলমানের হস্তগত হইয়া মুসলমান-রাজপ্রতিনিধির বিলাস-নিকেতন হইয়া উঠিল, মুসলমানেরা হিন্দুর মত কটকদুর্গের ব্যবহার করিতে লাগিলেন। দুঃখের বিষয়! সভ্য ইংরাজ রাজার হস্তে পড়িয়া কটকদুর্গের আর তাদৃশ ব্যবহারের সৌভাগ্য রহিল না। পাব্‌লিক ওয়ার্কসের নির্দ্দয় হস্ত সেই দুর্গের অস্থিপঞ্জরগুলি একে একে নির্দ্দয়ভাবে উন্মুক্ত করিয়া রাজপথে ও অন্যান্য কার্য্যে নিয়োজিত করিতে লাগিল। বিজ্ঞ ম্যালি সাহেবও এজন্য ইঙ্গিতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া-ছেন।* লর্ড কর্জ্জনের লোকে যতই কেন দোষ কীর্ত্তন করুক না, তিনি যে ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর ছিলেন, তিনি যে ভারতের প্রাচীন গৌরবের নিদর্শনস্বরূপ প্রাচীন সৌধ, প্রাচীন সেতু, প্রাচীন গুহা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার যত্নের একশেষ ছিল, তিনি যে এজন্য গৌড়ের দুর্গম অরণ্যানীতে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিলেন, এ কথা কৃতজ্ঞহৃদয়ে ভারতবাসীর একান্ত স্বীকার্য্য; কটকদুর্গের ধ্বংসের পূর্ব্বে যদি লর্ড কর্জ্জন এদেশে আসিতেন; তবে আমরা দুর্গের এরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখিতাম না।

কটকে অনেক দেবমন্দির ও তাহাতে অনেক দেবমূর্ত্তি ছিল, ইতস্ততঃ তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। আমি যে বাড়ীতে বাস করিতেছি, তাহার অদূরে একটি শিবের নূতন ক্ষুদ্র মঠের কুরঙ্গাতে একটি বরাহদেবের সুন্দর মূর্ত্তি রহিয়াছে। এইরূপ নানা স্থানে নানা দেবমূর্ত্তি অযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহারা হিন্দু-নরনারীর মনে দেবভাব জাগ্রত করিবার জন্য, হিন্দু নরনারীর সভক্তি পূজোপহার গ্রহণ করিবার জন্য অবস্থিত নহেন, প্রত্নতত্ত্বান্বেষীদিগের প্রত্নতত্ত্ব-জ্ঞানের উন্মেষণ করিবার জন্য, তাহাদিগকে প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা বুঝাইবার জন্য যেন মলিনভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। মহা-নদীর বেলাভূমিতে গড়গড়েশ্বর মহাদেবের মন্দির রহিয়াছে, প্রকম্পিত হইয়া পৃথিবী অন্যান্য প্রাচীন মন্দিরের মত তাহার অর্দ্ধাংশ উদরস্থ করিয়াছে, পরবর্ত্তী সময়ে সেই মন্দিরের অভ্যন্তরে অবতরণ করিবার উদ্দেশে সোপান নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের অগ্রভাগে প্রস্তরনির্ম্মিত সুন্দর বৃষভ-মূর্ত্তি; মন্দিরের সেই অংশ ভূমিকম্পে প্রোথিত হয় নাই, হয় ত উহা পরবর্ত্তী সময়ে

* "The Public Works Department, in early vandal days, stripped the old buildings for the sake of their stone, which they used for the False Point light-house and other buildings as well as for metalling the roads, and thus converted the fort into an unsightly series of mounds, and the ground within the moat into a wilderness of stone pit."

নির্ম্মিত। তরী-সহায়ে চৈতন্যদেব মহানদী উত্তরণ করিয়া এই ঘাটে অবতরণ করিয়াছিলেন। ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া ভাবোন্মত্ত মহাপ্রভু অবতারণ করিয়াই গড়াগড়ি দিতে দিতে মহাদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন; তদবধি সেই কারণে মহাদেবের নাম গড়গড়েশ্বর হইয়াছে। রাভেন্সা-কলেজের নিকটে লণ্ডা দেউল; এই প্রাসাদে শিবলিঙ্গ আছেন, আর একটি উদাসীন-রক্ষিত প্রস্তরে স্বভাবজাত অনন্তদেবের ক্রোড়ে শালগ্রাম চক্র আছেন। পূর্ব্বে মন্দিরটির চূড়া নির্ম্মিত হয় নাই, * সেই জন্য লোকে লণ্ডা দেউল বলিত, এক্ষণে চূড়া নির্ম্মিত হওয়াতেও আর সে নামের পরিবর্ত্তন হয় নাই। অন্যত্র একটি মন্দিরে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানেই কালীবাড়ী আছে, বাঙ্গালীর আরাধ্যা কালী সর্ব্বত্র বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠিত। এখানেও সেইরূপ ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে কোন ভক্ত বাঙ্গালী কালী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, অদ্যাপি বাঙ্গালীর চাঁদায় ধূমধামের সহিত দেবীর পূজা চলিতেছে। কটকে সোপান-মন্দির প্রভৃতি আরও কয়েকটি দেবমন্দির আছে, সর্ব্বত্র রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। সে সকল মন্দিরেও নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে, ধূমধামের সহিত সাময়িক উৎসব আছে। গোপাল-মন্দিরের বাড়ীর অভ্যন্তরে ও কালীমন্দিরের বাড়ীর অভ্যন্তরে ময়রার দোকান আছে, সেই ময়রার দোকানের সন্দেশই শ্রীগোপালের ও দেবীর ভোগে নিয়োজিত হয়; আশ্চর্য্য ও বিস্ময়ের বিষয়, সেই দোকানে কাঁচা সন্দেশের সহিত একত্র জিলাপী প্রভৃতি পক্কান্নও রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এদেশে ময়রার প্রস্তুত পক্কান্ন দেবভোগে দিবার রীতি আছে। দেওয়ানি কাচারি-গৃহের নিকটে হরিবল্লভ বাবুর কয়েকটি ভাড়াটে বাড়ী আছে; সেই বাড়ীগুলি যে স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে, পূর্ব্বে সেই স্থানে দেবীগিরি-মঠ ছিল, সেই সুবৃহৎ মঠের ৩৬৫ টি পৃথক্ পৃথক্ গৃহ ছিল, মঠস্বামী একবৎসর কাল প্রত্যহ এক একটি গৃহে বাস করিতেন। এই মঠে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী বাস করিতেন। এক্ষণে সেই মঠের কিঞ্চিন্মাত্র চিহ্নও নাই; কোন সুবৃহৎ দীর্ঘিকা ও দীর্ঘিকার ঠিক মধ্যস্থলে একটি বিশ্রামগৃহ। কটক নগর হইতে কিঞ্চিদ্দূরে মহানদীর পর পারে মহানদীবেষ্টিত একটি অনুচ্চ পর্ব্বত আছে। পর্ব্বতের নাম ধবলাগিরি, এই পর্ব্বতে ধবলেশ্বর মহাদেব আছেন, ও তাঁহার মন্দির আছে। স্থানটি অত্যন্ত মনোহর; দেবভক্তি ও প্রাকৃতিক শোভা যুগপৎ মানুষের মনকে অধিকার করে। বৈদ্যনাথ, তারকেশ্বরের মত এস্থানেও রোগক্লিষ্ট ব্যক্তি মহাদেবের পবিত্র সম্মুখে হত্যা দিয়া থাকে।

উৎকল-কলিঙ্গেশ্বরের অধীনে অনেকগুলি সামন্ত রাজা ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের এক একটি দুর্গ ছিল, সৈন্য ছিল,

* সংস্কৃত "মুণ্ডিত" শব্দ হইতে বাঙ্গালায় "নেড়া" শব্দের উৎপত্তি এবং উড়িষ্যা ও হিন্দিতে "লণ্ডা" শব্দের উৎপত্তি। রঙ্গপুরি-ভাষায় শাখামস্তকশূন্য বৃক্ষমূলকে "মুড়া" বলে। কেহ কেহ স্বৈরিণী স্ত্রীবাচক "রণ্ডা" শব্দ হইতে নেড়া শব্দের উৎপত্তি বলেন।

যুদ্ধোপকরণ অস্ত্রশস্ত্র ছিল। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাঁহারা সৈন্যসামন্ত লইয়া কলিঙ্গেশ্বরের সাহায্য করিতেন, কলিঙ্গেশ্বরকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিতেন; তাঁহাদিগের এতদ্ভিন্ন অন্য কর ছিল না। ব্রিটিশরাজও তাঁহাদিগের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করেন নাই, অদ্যাপি তাঁহারা স্বাধীন রাজা বলিয়া খ্যাত, আজও তাঁহাদিগের অধীনে দেওয়ানি, ফৌজদারি বিচারালয় আছে। এক্ষণে তাঁহারা গড়জাত রাজা বলিয়া রাজপুরুষদিগের নিকটে ও দেশীয়দিগের নিকটে পরিচিত। এই গড়জাতের মধ্যে ময়ুরভঞ্জও অন্তর্নিবিষ্ট। কণিকার রাজা গড়জাতের রাজা নহেন, ইনি বাঙ্গালার জমীদারের মত এক জন জমীদার মাত্র। ইংরাজের প্রথম অধিকারের সময়ে কণিকার রাজাই উড়িয়াদিগকে উত্তেজিত করিয়া বিদ্রোহী করিয়াছিলেন; তাহারা ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। দুর্দ্ধর্ষ উড়িয়াদিগকে শাসন ও দমন করিতে বিজ্ঞ রাজপুরুষদিগকে ভীম ও কান্ত উভয় নীতির অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

গড়জাতের দুর্গসমূহ ভিন্ন কলিঙ্গেশ্বরের নিজের অধীনে পাঁচটি দুর্গ ছিল। তন্মধ্যে যাজপুরের অনতিদূরে চাতিয়া পর্ব্বতের উপরে অমরাবতী দুর্গ ও বিরূপা নদীর উত্তর তীরে চৌদুয়ার নামক গ্রামে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। অমরাবতী দুর্গ প্রস্তরনির্ম্মিত, দুর্গ-প্রবেশের নিমিত্ত সুখারোহ সোপান আছে, সব স্তম্ভগুলি নাই, কতকগুলি ভগ্ন স্তম্ভ দণ্ডায়মান থাকিয়া নিজেদের উচ্চতা ও বিস্তার দর্শকদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে। দুর্গের সমতল স্থানে একটি ভগ্নমন্দিরে পুরুষ-পরিমিত ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর মূর্ত্তি রহিয়াছে, দেখিলে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইতে হয়; উৎকলের প্রত্যেক দেবমূর্ত্তিতেই ভাস্করের রুচি ও হস্তনৈপুণ্য প্রকাশ পায়। দুর্গটি দুই মাইল স্থান অধিকার করিয়া অবস্থিত। পাবলিক্ ওয়ার্কস বিভাগের কর্ম্মচারী মহাত্মাদিগের কৃপায় মেঘচুম্বী বিস্তীর্ণ সুবৃহৎ দুর্গপ্রাচীর দেখিয়া আর চক্ষুকে কৃতার্থ করিবার সম্ভাবনা নাই, প্রাচীরাবয়বপ্রস্তরে ট্রাঙ্ক রোডের বৃহৎ কলেবরের ক্ষতস্থানে চিকিৎসা-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।* দ্বিতীয় দুর্গটি এক এক দিকে দুই মাইল করিয়া বিস্তৃত ছিল, এক্ষণে কিছুই নাই, ভগ্নাবশেষ মাত্র আছে। ভূগর্ভ হইতে উত্থাপিত তাম্রশাসন দেখিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সেখানি ষষ্ঠ শতাব্দীর বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। যাজপুরের অনতিদূরে ১১ কুকার বিশিষ্ট ২৪০ ফিট লম্বা নানা কারুকার্য্যে খচিত নানা উৎকীর্ণ মূর্ত্তিতে অলঙ্কৃত প্রসিদ্ধ তেন্তুলীমল সেতু। এ সেতুটিও "আঠারনালা সেতুর" মত প্রসিদ্ধ। যাজপুর হইতে দুই মাইল দূরে ব্রাহ্মণী নদী দ্বারা বেষ্টিত দেউলি পর্ব্বত; সেই পর্ব্বতের উপরে গোকর্ণেশ্বরের প্রাচীন মন্দির, নিকটে বটবৃক্ষের মূলে নদী হইতে উত্তোলিত মনুষ্যপরিমিত শায়িত বিষ্ণু-

* "......the great wall which surrounded it was demolished by the Public Works Department for the sake of the stone, which was used for the construction of the Orissa Trunk Road"—Gazetteer of Cuttack, p. 200.

মূর্ত্তি। * ভগবানের ভুবনমোহন মূর্ত্তির স্পষ্ট ছায়া এই সুদৃশ্য মনুষ্যনির্ম্মিত মূর্ত্তিতে প্রতিফলিত ও প্রতিভাত হইতেছে; হয় ত এক দিন এই মূর্ত্তির মেঘচুম্বী মন্দিরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া, অর্চ্চনার আড়ম্বর ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের সগর্ব্ব পরিচালন দেখিয়া দর্শকমাত্রই চকিত, বিস্মিত, পুলকিত ও ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইত; আজ সেই দেবপ্রতিমা বৃক্ষমূলে ধূলীধূসরিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার মন্দির যে কোথায় অবস্থিত ছিল, নির্ণয় করিবার সম্ভাবনা নাই; আজ তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। দেবভক্ত উৎকল-কলিঙ্গের রাজারা যে কত স্থানে কত দেবমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন, কত স্থানেই যে তাঁহাদিগের উত্থাপিত কত শত দেবমন্দিরের উচ্চপতাকা সমুদ্র-বায়ুহিল্লোলে গর্ব্ব ও আনন্দে প্রকম্পিত হইত, আকাশমার্গে ক্রীড়া করিত, তাহার সংখ্যা করিবার সম্ভাবনা নাই। এক যাজপুরেই সহস্রাধিক শিবমন্দির ছিল। আজ তাহার কি আছে? সমস্তই বিনষ্ট, থাকিবার মধ্যে আখণ্ডলেশ্বর, অগ্নীশ্বর, ত্রিলোচনেশ্বর, বিরজা, যজ্ঞবরাহ বা আদিবরাহ ও বৈতরণী নদীর তীরে অষ্টমাতৃকার সামান্য মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। স্বয়ং ব্রহ্মা যে স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া পৌরাণিকেরা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন; সেই যাজপুরের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে, বিশ্ববিশ্রুত কোণার্ক-মন্দিরের ধ্বংস-পরিণাম দেখিলে ক্ষোভে, দুঃখে ও অধীরতায় অভিভূত হইতে হয়, আবার সেই বিনাশের উপরে ভারত-সমৃদ্ধির, বিশ্ববিজয়ী রাজাদিগের কীর্ত্তি-সুন্দরীর ক্ষীণ পদচিহ্ন দেখিয়া বিস্ময়ে আপ্লুত হইতে হয়। চন্দ্রভাগা নদীর পবিত্র তীরে অর্কক্ষেত্রে বহুমূল্য কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত সৌরজগতের রাজা সূর্য্যদেবের রাজপ্রাসাদ। কপিল সংহিতার প্রাচীন মাহাত্ম্য পাঠ করিলে এই তীর্থের প্রাচীনত্বে সন্দেহ থাকে না। এই স্থানেই উদীয়মান সূর্য্যের প্রথম রশ্মিপাত হয়। এই তীর্থমাহাত্ম্য দেখিয়া, এই স্থানের সহিত প্রাভাতিক সূর্য্যের সুবর্ণকিরণ-স্পর্শের আদি সম্বন্ধ অবধারণ করিয়া উৎকলরাজ নরসিংহদেব এই স্থানেই সবিতার মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; স্থানের ভঙ্গপ্রবণতার দিকে লক্ষ্য করিয়াও সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। কে বলিতে পারে, উৎকলরাজ-নির্ম্মিত এই সুবৃহৎ সূর্য্যমন্দিরের পূর্ব্বে এ স্থানে সূর্য্যদেবের অন্য মন্দির ছিল না; কে বলিতে পারে যে উৎকলরাজই এই স্থানের আদি নির্দ্দেশক। ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া নানা স্থানে তীর্থভূমি আছে, যুগযুগান্তর ধরিয়া সেই সকল তীর্থ হিন্দুর নিকটে পূজিত, হিন্দুনরনারী যোগবিশেষে সেই সেই তীর্থ যাত্রা করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিয়া আসিতেছে। প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাইর জন্মের বহুকাল পূর্ব্বে মগধে গয়াতীর্থ ছিল, বিষ্ণুর পবিত্র পদচিহ্ন ছিল; রণবীর রণজিৎ সিংহের জন্মিবার বহুপূর্ব্বে পবিত্রতীর্থ কাশীক্ষেত্র ছিল। অহল্যাবাই গয়াক্ষেত্রে গদাধরের মন্দির নির্ম্মাণ, রণজিৎ সিংহ কাশী-

* "At the foot of a vanyan tree is a life-sized monolithic image of the four-handed Vishnu, which was recovered some years ago from the river-bed"—Gazetteer of Cuttack, p. 203.

বিশ্বনাথের মঠ সুবর্ণ পত্রে আবৃত, করিয়াছেন। এই বৃহৎ দেবপ্রাসাদের পুরোভাগে শত হস্ত উচ্চ অরুণ-স্তম্ভ ছিল; সেটি এক্ষণে শ্রীক্ষেত্রে নীত হইয়া পুরুষোত্তমের শ্রীমন্দিরের সম্মুখে স্থাপিত রহিয়াছে। এক্ষণে সূর্য্যদেবের মন্দিরটি নাই, আছে কেবল নাটমন্দির। সেই নাটমন্দিরের উচ্চতা, তাহার ভাস্কর্য্য, তাহার স্থাপত্য ও উপরিভাগে উত্তোলিত সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দেখিয়া ইংরাজ দর্শকমাত্রই বিস্মিত হইয়াছেন। নাটমন্দিরেরও চূড়া ও কুম্ভ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। নাটমন্দিরটি ১২৮ ফিট উচ্চ। নয়টি সোপানের উপরে উত্তীর্ণ হইলে গৃহের সুবৃহৎ অভ্যন্তর ভাগ বিস্মিত চক্ষুর উপরে পতিত হয়। গৃহের ছাদ কড়ি-বর্গার উপরে স্থাপিত নয়, প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে খিলান। মেলি সাহেব অনুমান করেন, প্রকৃত সূর্য্য-মন্দির ১৯০ ফিট উচ্চ ছিল; কিন্তু আইন-ই-আকবরির গ্রন্থকার স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন, সূর্য্যমন্দির ২২৫ ফিট উচ্চ। চতুর্দ্দিকের প্রাচীর ১৫০ হস্ত পরিমিত উচ্চ, পার্শ্বের বিস্তৃতি উনিশ হাত। প্রাচীরের তিনটি তোরণ আছে, পূর্ব্ব তোরণ দ্বারে দুইটি সুদৃশ্য প্রস্তর ক্ষোদিত হস্তী, পশ্চিমে উচ্চ অশ্বদ্বয়ের উপরে বীরবেশে সজ্জিত অশ্বারোহী-দ্বয়, উত্তরদ্বারে সিংহমথিত হস্তীদ্বয়। পূর্ব্ব দ্বারের উপরে উনিশ ফিট উচ্চ নবগ্রহের মূর্ত্তি আছে। গৃহের ছাদেও নবগ্রহের মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। ১৫০ ফিট উচ্চে অবস্থিত, চূড়ার নিকটে সম্মুখভাগে নিঃসারিত, হস্তীর উপরে সন্নিবেশিত প্রকাণ্ড সিংহমূর্ত্তি উত্তোলিত ও স্থাপিত হইয়াছে। * হস্তী ও সিংহের প্রতিকৃতিটি ২০ ফিট উচ্চ। কি করিয়া এই প্রকাণ্ড মূর্ত্তি অক্ষতরূপে অত্যুচ্চ স্থানে উত্থাপিত হইয়াছে? কি করিয়াই বা পচিশ ফিট ঘন দুই হাজার টন (৫৪ হাজার ৫০০ মণ) ওজনের বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সেই উচ্চ মন্দিরের শিরোভাগে উত্তোলিত হইয়া সংযোজিত হইয়াছে? ফার্গুসেন সাহেব বিস্মিত, মেলি সাহেব বিস্মিত, আরকিউলজিকাল বিভাগের ডিরেক্টার জেনেরাল মার্সেল সাহেব বিস্মিত; বিস্ময়ের আরও কারণ, চতুর্দ্দিকে ২৫ মাইলের ভিতরে কোনও রূপ প্রস্তরের খনি নাই, যে ষ্টেটিট (Steatite) প্রস্তরের ব্যবহার হইয়াছে, তাহার খনি ৮০ মাইলের ভিতরে নাই।* এই প্রস্তরগুলি দূর হইতে আনীত হইয়াছে, তবে কি সে সময়ে ভীষণ সমুদ্রের বক্ষে হিন্দুদিগের সুবৃহৎ পোতের ইতস্ততঃ বিচরণ ছিল? সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উচ্চে উঠাইবার জন্য হিন্দুরা কপিকলের ব্যবহার জানিতেন? জেনারেল মার্সেল সাহেব বলেন, ফার্গুসেন সাহেব ইহার অর্দ্ধাংশ দেখিয়াই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। তখনও সূর্য্যের রথ ও অশ্ব ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হয় নাই। যাহার অপূর্ব্ব কারু-

* "This colossal figure was cut out of two solid blocks of stone, and both these stones had to be raised to a height of 150 feet above ground, where they were fastened into the wall."—Report, Arch. Surv., Ind., pp. 48-49.

* "There are no stone quarries within a radius of 25 miles, and no steatite slabs like those found in the temple are available within 80 miles."—Report,, Arch. Surv. Ind., pp. 48-49.

কার্য্য দেখিলে, রথ-অশ্বের গঠন-প্রণালী দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই সকল উৎকীর্ণ মূর্ত্তির সর্ব্বত্র অবয়বের উপযুক্ত পরিমাণ (Proportion) ঠিক আছে, সৌন্দর্য্য ও ভাবব্যঞ্জকতা আছে, ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব চাতুর্য্য আছে। বহু পূর্ব্বে একদিন চীন-পরিব্রাজক হুয়েঙ্গ সাঙ্গ উৎকল-কলিঙ্গের ঐশ্বর্য্য ও সভ্যতা দেখিয়া শত মুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন, আর এক দিন মুসলমান-গ্রন্থকার আবুল ফজল কোণার্ক-মন্দিরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন; আর আজ সভ্যতাভিমানী, সভ্যতার খরস্রোতে ভাসমান, জ্ঞানবিজ্ঞানে দৃপ্ত, অহঙ্কৃত ইংরাজের মুখেও কোণার্ক-মন্দিরের প্রশংসা! বিদেশীর মুখে ভারতের পূর্ব্ব-গৌরবের কথা শুনিলে কাহার মনে পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতি জাগরূক না হয়? কাহার মনে পূর্ব্বপুরুষদিগের উপরে কূলপ্লাবী ভক্তি-উচ্ছ্বাসের প্রবর্ত্তনা না হয়? এই অল্প দিনে এই সভ্যজাতির শোচনীয় পরিণাম ও অধঃপতন দেখিয়া কালের অপ্রতিহত প্রভাবে স্তম্ভিত হইতে হয়; শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতার উপরে অণুমাত্র আস্থা স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

কোণার্কের সহিত তুলনা করিলে ভগবৎ-প্রসাদে যাজপুর এখনও সমৃদ্ধিশালী আছে বলিতে হয়, আবার যাজপুরের সহিত তুলনায় এখনও ভুবনেশ্বর জগতের সমক্ষে আত্ম-জ্ঞাপন করিতে সমর্থ, বলিতে হয়। এক দিন দিল্লীশ্বরের সেনানায়ক মুনিম খাঁ দুর্দ্ধর্ষ পাঠানরাজ দাউদ খাঁকে পরাজিত করিয়া, বিজয়োল্লাসে গর্ব্বিত হইয়া ভুবনেশ্বরে প্রবেশ করেন ও ভুবনেশ্বরের মেঘচুম্বী মন্দিরসমূহ, দেবপ্রতিমানিবহের পূজাড়ম্বর, দেবতার সম্মুখে ব্রাহ্মণদিগের প্রদত্ত সভক্তি উপহার, ব্রাহ্মণের সংখ্যাধিক্য ও নগরের সমৃদ্ধি দেখিয়া বিস্ময় সহকারে বলিয়াছিলেন, "এ পবিত্র স্থান মানুষের বিজয়ের উপযোগী নয়, ইহা ঈশ্বরাধিকৃত ভূমি, তীর্থযাত্রীর গন্তব্য মহাতীর্থ, মনুষ্য-হৃদয়ের দুরাকাঙ্ক্ষা ও কল্পনার অনেক উপরে অবস্থিত।" * মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ লতা, পত্র, পুষ্পদাম, পশু, পক্ষী, মনুষ্য ও দেবতার মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া কাণ্ডসেন সাহেব বলিয়াছিলেন, "এই মন্দিরগুলির নির্ম্মাণে যে অর্থব্যয় হইয়াছে, তাহার তিনগুণ অর্থ সম্ভবতঃ এই সমস্ত ক্ষোদিত কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে" † ভুবনেশ্বরের প্রত্যেক দেব-মন্দিরই বিবিধ কারুকার্য্যে অলঙ্কৃত, লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বরের আকাশস্পর্শী মন্দিরের ত কথাই নাই। সেই সুবৃহৎ মন্দিরের পাদ-দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তকের নিম্ন পর্য্যন্ত কতরূপ যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাস্কর্য্যের নিদর্শন আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই ভাস্কর্য্যের ভিতরে প্রাচীন ভারতের কত যে প্রত্ন-তত্ত্ব গূঢ়ভাবে অবস্থিত

* "This country is no fit subject for conquest or for schemes of human ambition. It belongs entirely to the gods and is one great region of pilgrimage throughout." —Puri by L. S. S. O' Malley, p. 32.

† "It is perhaps not an exaggeration to say that if it would take, say lakh of rupees, to erect such a building as this, it would take three lakhs to carve it as this one is carved."—History of India and Eastern Architecture, Book v, Ch. vi, pp. 421-3.

রহিয়াছে, যাঁহার চক্ষু আছে, তিনিই তাহা বাহির করিতে পারেন। ইতিহাস-জগতে সুগৃহীতনামা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় যদি দীর্ঘকাল ভুবনেশ্বরে অবস্থিতি করেন; তাহা হইলে আমরা ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের অনেকগুলি পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হই। কলিকাতা হাইকোর্টের উজ্জ্বলরত্ন ভক্ত জ্ঞানী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় চৈতন্যদেবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উৎকল ভ্রমণ করিয়াছেন, বিশ্বকোষের প্রণেতা প্রত্ন-তাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ময়ূরভঞ্জে আসিয়া অনেকগুলি তাম্রশাসন ও শিলালিপি সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন; সূক্ষ্মদর্শী মৈত্রেয় মহাশয়ও উৎকলে আসিয়া দর্শনীয় স্থান, মন্দির ও গুহাগুলি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। এই পুরুষত্রয়ের যত্ন-চেষ্টায় আমরা অচিরে উৎকলের সম্পূর্ণ প্রাচীন ইতিহাস দেখিতে পাইব, এইরূপ আশা করিবার আমার অধিকার আছে। পৃথিবীর আদি-কাব্য রামায়ণ ও জগতের অদ্বিতীয় পুস্তক মহাভারতকে অবলম্বন করিয়া, সংস্কৃতের সমস্ত কাব্যগ্রন্থ লিখিত। পৃথিবীর সমস্ত ভাষায় রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ হইয়াছে, অদ্যাপি হইতেছে। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রচলিত ভাষাতেই রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ আছে, কাব্য আছে, নাটক আছে, গান আছে। কবি হউক, অকবি হউক, সকলেই রামায়ণ মহাভারত অবলম্বনে পুস্তক লিখিতে ইচ্ছা করে, উৎকল-কলিঙ্গে আসিয়া উৎকল-কলিঙ্গের অতীত ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তত্ত্বনির্দ্ধারণে শক্তি থাকুক বা না থাকুক, সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিবার জন্য সকলেরই আগ্রহ হয়। সেই প্রলোভনের হস্ত হইতে আমিও দূরে অবস্থান করিতে পারিলাম না, তাই আমার এই লিপি-কণ্ডূয়ন। আমি পাঠকবর্গের নিকটে কোনও রূপ প্রত্ন-তত্ত্বের উপহার দিতে পারিব, এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা আমার নাই, স্থূলচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই আজ উপস্থাপিত করিতেছি। লিঙ্গরাজের মন্দিরের উত্তরাংশের ভিত্তিতে ও ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের গাত্রে অশ্বারোহী সৈনিকের চিত্র আছে, অশ্বের পৃষ্ঠে আধুনিক প্রণালীর চর্ম্মময় জিন আছে, আরোহীর পায়ে আধুনিক প্রণালীর বুট জুতা আছে এবং জুতার নিম্নে রেকাব আছে। অশ্বারোহীর পরিচ্ছদ আধুনিক প্রণালীর পরিচ্ছদ। উদয়গিরির রাণী-গুম্ফার উপরের দক্ষিণাংশেও উৎকীর্ণ সৈনিক পুরুষের চিত্র আছে, তাহার পার্শ্বে লম্বিত কোষবদ্ধ আধুনিক প্রণালীর দীর্ঘ ঋজু তরবারি আছে। * অভিজ্ঞান শকুন্তলে রাজা দুষ্মন্তের শরীর-রক্ষিকা ধনুর্ব্বাণহস্তা যুবতী বীরাঙ্গনা আছে, লিঙ্গরাজের মন্দিরেও বীরোচিত বেশে সজ্জিত অশ্বারোহী স্ত্রীসৈনিকের চিত্র দেখিতে পাই। ইহা দ্বারা প্রাচীন ভারতের সামাজিক চিত্র অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। ভুবনেশ্বরের বৈতাল দেউলের চূড়ার গঠনবৈলক্ষণ্যে

---

* "........a kilted warrior, 4 feet 4 inches high, booted and turbaned, with a straight sword in a scabbard hanging from his left side.'—Gazetteer of Puri., p. 252.

দর্শকের বিশেষতঃ প্রত্ন-তাত্ত্বিকের চক্ষু স্বভাবতঃ সেই চূড়ার উপরে আকৃষ্ট হয়। বাঙ্গালাদেশে মিষ্ট কুষ্মাণ্ড "বিলাতি কুমড়া" নামে পরিচিত। যে দেশে যে বস্তু পূর্ব্বে ছিল না, পরে অন্য দেশ হইতে আনীত হইয়াছে, সেই দেশবাসী সেই নবানীত বস্তুটিকে "বিলাতি" বলিয়া ব্যবহার করে। এই "বিলাতি" বিশেষণ পদ দেখিয়া বাঙ্গালী-মাত্রেই এই জাতীয় কুষ্মাণ্ডকে বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন সম্পত্তি মনে করে না। উৎকল-বাসী মিষ্ট কুষ্মাণ্ডকে "বৈতাল" বলে। রঙ্গ-পুরবাসী রাজবংশীদিগের মধ্যেও "বৈতাল" শব্দের প্রচলন আছে। তাহারা স্বৈরিণী স্ত্রীলোককে বৈতালী বলিয়া গালি দেয়, অনেক সময়ে "জাহাজী মায়া"ও বলে। আমরা এই "জাহাজী" শব্দ দেখিয়া "বৈতালী" শব্দের ভিতরেও "জাহাজ"বাচক কোন শব্দের সম্বন্ধ আছে মনে করিতে পারি। সংস্কৃত "বহিত্র" শব্দ হইতে ক্রমে "বহিতর" "বহিতল" "বইতল" "বৈতল" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। উড়িয়া ভাষায় প্রচলিত "বৈত" শব্দের অর্থ জাহাজ। সম্ভবতঃ যখন উৎকল, কলিঙ্গে জাহাজ অর্থে "বৈতল" শব্দের ব্যবহার ছিল, সেই সময়ে তাদৃশ চূড়াবিশিষ্ট মঠের "বৈতাল" নামের সৃষ্টি হইয়াছে ও বিদেশ হইতে জাহাজে আনীত বলিয়া এই নবাগত কুষ্মাণ্ডের "বৈতাল" এই নামকরণ হইয়াছে। সমুদ্রের বেলাভূমিতে অবস্থিত উৎকলের সহিত সুদূর হিমালয়ের পাদবর্ত্তী রঙ্গপুরের ভাষা-সাম্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।*

উদয়গিরিস্থ হস্তিগুম্ফার শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, কলিঙ্গরাজ মহামেঘবাহন ব্রাহ্মণ ও অর্হৎ উভয়ের উপরে তুল্যভাবে শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতেন, উভয়ের উপরে তাঁহার বদান্যতা ও দাক্ষিণ্য ছিল, তিনি অনেক গুহা ক্ষোদিত ও অনেক স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন, অনাথাশ্রমগুলির পুনঃ সংস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিযানে তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্যে ভীত হইয়া মগধরাজ তাঁহার সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।* কলিঙ্গ যে প্রাচীন সময়ে একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল, কলিঙ্গ যে সেকালে সভ্যতার চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহার অনেক নিদর্শন আছে। চরক-সংহিতার কল্পস্থানে অভিনব চিকিৎসার উদ্ভাবনের জন্য কলিঙ্গের উল্লেখ আছে, বৃহৎ সংহিতায়, কলিঙ্গের খনি হইতে উত্থাপিত, কর্ত্তিত ও বিশোধিত হীরকের কথা আছে। মালয় উপদ্বীপে ভারতবর্ষীয়েরা ক্লিং নামে পরিচিত, ক্লিং যে কলিঙ্গেরই স্খলিত শব্দ, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। বৌদ্ধনরপতি অশোক কলিঙ্গ জয় করিয়া উৎকল, কলিঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রচার

---

* উড়িয়া ভাষায় ভোয়াসিন্ শব্দের অর্থ অসূর্য্যম্পশ্যা, রঙ্গপুরি ভাষায় বোয়াসিন শব্দের অর্থ কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ। উড়িয়া ও রঙ্গপুরি উভয় ভাষাতেই শেফালিকা পুষ্পের নাম শিঙ্গাহার, নাটমন্দিরের নাম জগমোহন। রথযাত্রায় রথে আরোহণ করিয়া জগন্নাথ দেব যে বাড়ীতে অবতরণ করিয়া অবস্থিতি করেন, উড়িয়া ভাষায় সেই বাড়ীর নাম গুণ্ডিকা বাড়ী, রঙ্গপুরি ভাষায় গুঞ্জাবাড়ী, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

* Report Arch. Surv., Eastern Circle, 1905-06.

করিয়াছিলেন, পর্ব্বত-গাত্রে গুহা নির্ম্মাণ, শিলালিপির উৎকীরণ ও স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। অশোকের তিরোধানের পর বৌদ্ধনৃপতি বীরসঙ্কুল উৎকল-কলিঙ্গকে আর আয়ত্ত রাখিতে পারিলেন না, উৎকল-কলিঙ্গ তাঁহাদিগের শিথিলমুষ্টি হইতে স্খলিত হইয়া আবার হিন্দুনৃপতির বীর্য্যপ্রসারিত হস্তের আশ্রয় গ্রহণ করিল। বৌদ্ধাধিকারের সময়ে উৎকল-কলিঙ্গের অনেক অধিবাসী বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। রাজনীতিজ্ঞ রাজা মহামেঘবাহন প্রজারঞ্জনের জন্য রাজার উপরে প্রজার ভক্তি আকর্ষণের জন্য নিজে হিন্দু হইলেও বৌদ্ধসন্ন্যাসীর উপরে, বৌদ্ধমঠের উপরে সমধিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। সে সময়ে হিন্দু-দেবমন্দিরের মত হিন্দু-দেবমন্দিরের পার্শ্বে বৌদ্ধস্তূপ, স্তম্ভ, মঠ ও পর্ব্বতোৎকীর্ণ গুহাগুলি তুল্যভাবে অর্চ্চিত ও রক্ষিত হইত। মহামেঘবাহনের লোকান্তরে প্রস্থানের পর বৌদ্ধমঠ ও সঙ্ঘারাম তাদৃশ রাজসাহায্য পাইতে সমর্থ হইল না, প্রজাদিগেরও বৌদ্ধধর্ম্মের উপরে ক্রমে শ্রদ্ধা কমিয়া গেল, ক্রমে তাহারা হিন্দুধর্ম্মে শ্রদ্ধালু হইয়া আবার সেই সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল। হিন্দু-ধর্ম্মে বার মাসে তের পার্ব্বণ আছে, বারব্রত আছে, বিপদে পড়িলে বিপদ উদ্ধারের জন্য দেবতার সহায়তা লইবার ব্যবস্থা আছে, বিপন্নের বন্ধু ভগবান্ আছেন, আবার প্রতিমা-পূজা আছে। নিপুণ শিল্পীর শিক্ষিত হস্তে উৎকীর্ণ পাষাণ-মূর্ত্তি, দক্ষ কুম্ভকারের কুশল হস্তে নির্ম্মিত ভাব-প্রভাবে উদ্ভাসিত প্রসন্নবদনা দেব-প্রতিমা বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া পূজামণ্ডপে উচ্চবেদীর উপরে স্থাপিত হইলে সুগন্ধী সুদৃশ্য পুষ্পভারে, নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারে, সুগন্ধিধূমোদ্‌গারি ধূপে ও নির্ম্মলদীপে অর্চ্চিত, বন্দিত ও ভক্তি-গদ্‌গদ ভাষায় সংস্তুত হইলে দর্শকের মন স্বভাবতঃ গলিয়া যায়, সেই দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না; পক্ষান্তরে, বৌদ্ধধর্ম্মের কঠোর দার্শনিকতায় মনের অবস্থান্তর হইবার সম্ভবনা নাই। মনের উপরে যাহার আধিপত্য করিবার শিক্ষা আছে, প্রতিমা-পূজায়, দেবভক্তি ও ঈশ্বর-ভক্তিতে তাহার মনের আকর্ষণ না হইতে পারে, যাহারা সেইরূপ কঠোর অভ্যাসের বশবর্ত্তী হয় নাই, তাহাদিগের যে স্বভাবতঃ সেই দিকে আকর্ষণ হইবে, তাহা আর যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে হইবে না। যখন বঙ্গ, কলিঙ্গ, উৎকলের বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দুরা বৌদ্ধধর্ম্মের পরিহার করিয়া দলে দলে প্রায়শ্চিত্তান্তে আবার হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল, তখন বৌদ্ধাচার্য্যেরা হিন্দুধর্ম্মে আকর্ষণের মূল কারণ বুঝিতে পারিলেন; ব্রতোপবাস, প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা না থাকিলে দেবার্চ্চনা ও দেবপ্রতিমা-স্থাপনের পদ্ধতি না থাকিলে, আর বৌদ্ধধর্ম্ম টিকে না অবধারণ করিলেন। সেই অবধারণের ফলেই মহাযান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। আচার্য্যেরা হিন্দুতন্ত্র দেখিয়া সেই আকারের কতকগুলি বৌদ্ধতন্ত্র প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে বোধিসত্ত্বদিগের

মন-কল্পিত ধ্যান, প্রণাম ও তন্ত্রোক্ত মন্ত্রতুল্য বীজসংযুক্ত কতকগুলি মন্ত্র সন্নিবেশিত হইল। ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত তারা, লোকনাথ, হয়গ্রীব প্রভৃতি বোধিসত্বদিগের প্রতিমা নানা স্থানে স্থাপিত ও পূজিত হইতে লাগিল।

উপনিষদ, তন্ত্র ও পুরাণে দেবযান ও ধূমযানের উল্লেখ আছে। মৃত্যুর পরে কর্ম্মানুসারে কেহ দেবযানে স্বর্গলোকে গমন করে, কেহ বা ধূমযানে পিতৃলোকে প্রস্থান করে। বৌদ্ধেরা এই শাস্ত্রোক্ত যান স্বীকার করিতেন না বলিয়া হিন্দুরা তাঁহাদিগকে হীনযান নামে আখ্যাত করিতেন। শাক্য-প্রচারিত তত্বজ্ঞানের বলে বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণে অধিকারী, তাঁহাদিগের কোন পথে যাইতে হইবে না, এই জন্য তাঁহারাও এই উপাধি গৌরবের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের এক সম্প্রদায়ে যখন দেবদেবীর পূজা, মন্ত্র-জপ, প্রতিমা-স্থাপনের ব্যবস্থা হইল, সেই সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বুদ্ধি-প্রসূত তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রচার হইল, তখন বৌদ্ধনৃপতির শাসিত মগধের অধিবাসী বৌদ্ধেরা এই প্রতিমা-পূজক বৌদ্ধদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন ও হিন্দু অপেক্ষাও ইহারা অধঃপতিত মনে করিয়া মহাযান এই নামে ইঁহাদিগকে অভিহিত করিলেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে যে সকল শব্দে পথ বা যাত্রা বুঝায়, সেই সকল শব্দের পূর্ব্বে মহৎ শব্দ দিলে তাহার অর্থ মৃত্যু হয়। এই সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা মৃত্যুমুখে পতিত এই নিন্দিত অর্থ বুঝাইবার উদ্দেশে হীনযানের বৌদ্ধেরা মহাযান শব্দের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আবার মহাযানের বৌদ্ধেরা আপনাদিগের অবলম্বিত পথ উৎকৃষ্ট মনে করিয়া মহাযান উপাধি গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই, হীনযানের বৌদ্ধদিগের অবলম্বিত পথ অতি নিকৃষ্ট এই অর্থ করিয়া তাঁহাদিগকে হীনযান বলিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। বেদের অনেক সূক্তে অসু (প্রাণের) দাতা বলিয়া অসুর শব্দের প্রয়োগ আছে। সুন্দররূপে যাঁহারা দান করেন, তাঁহারা সুর; যাঁহারা সুন্দর-দানের পরিপন্থী, তাঁহারা অসুর, এ অর্থেরও সমাবেশ অনেক সূক্তে আছে। দেবতার নিকটে নিন্দিত অর্থে অসুর হইলেও জেন্দাভেস্তায় পূজিত অর্থে তাহার ব্যবহার হইয়াছে। অদ্যাপি সম্প্রদায়-বিশেষের নিকটে সম্প্রদায়-বিশেষের নাম ঘৃণ্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্ত্তির পার্শ্বে কৃতাঞ্জলিপুটে হিন্দুর অনেক দেবমূর্ত্তিরও সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যে শাক্যসিংহের উপদেশে দেবদেবী দূরের কথা, ঈশ্বরের পর্য্যন্ত নাম-গন্ধ নাই, যে বুদ্ধ শাক্যসিংহ নিরীশ্বর-বাদের প্রবর্ত্তক বলিয়া তাৎকালিক দার্শনিকদিগের নিকটে, হিন্দু জনসাধারণের নিকটে পরিচিত, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে প্রতিমা-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা, প্রতিমা-পূজার পদ্ধতি, তন্ত্র-মন্ত্র থাকিবে, অসম্ভব। ইংরাজের চক্ষে এবং ইংরাজ-গুরুর নিকটে বা ইংরাজি পুস্তকের নিকটে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়া, সেই ভাব-মদিরার উন্মাদনায় যাঁহারা অধিকৃত, তাঁহাদের রাগবিচ্ছুরিত চক্ষুর সম্মুখে উপলব্ধি হইতে পারে যে, হিন্দুরা বৌদ্ধের নিকট

হইতে প্রতিমা-পূজা, তন্ত্র মন্ত্র নির্ব্বাণ-মুক্তি গ্রহণ করিয়াছে, আরও কত কি গ্রহণ করিয়াছে। যাঁহারা বুদ্ধপ্রচারিত দার্শনিক মত আলোচনা করিয়াছেন, যাঁহারা তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের ধারাবাহিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহারা কখনই ঐরূপ বিদেশী মতে মত দিতে পারিবেন না। যদি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিমা-পূজার চমকে হিন্দুর মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে, নির্ব্বাণের জন্য লালায়িত হইয়া হিন্দু যদি সেই দিকে ধাবিত হইয়া থাকে, তবে যাহাতে সত্য আছে, ভক্তি আছে, জ্ঞান আছে, নির্ব্বাণ আছে, আবার অকাট্য যুক্তি দ্বারা স্থাপিত জন্মান্তরবাদ আছে, হিন্দুর পক্ষে একেবারে সেই সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ছিল। তাহা না করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সমস্ত মালমসলা লইয়া বৌদ্ধপ্রণালীতে মন্দির রচনা করিয়া তাহার হিন্দুমন্দির এই নামকরণ করিয়া লাভ কি? বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্মে যাহার বিশ্বাস আছে, বুদ্ধদেবের উপরেও তাহার ভক্তি আছে, ইহাই স্বাভাবিক, ইহাই প্রকৃতির অচ্ছেদ্য নিয়ম। বুদ্ধদেবকে ভক্তি না করিয়া তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া বেমালুম তাহা নিজের করিয়া লইলাম, ইহা কোন্ নিয়মের অধীন, কোন তর্ক দ্বারা ইহার অবধারণ, বুঝিতে পারি না। আমি হিন্দু, আমি কোন ধার্ম্মিক মুসলমানকে, কোন ধার্ম্মিক খ্রীষ্টিয়ানকে ভক্তি করিতে পারি; কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত ধর্ম্ম-পুস্তকের বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে পারি না। তাহা করিলে ত আর হিন্দু থাকিব না, হয় মুসলমান হইব, নয় খ্রীষ্টিয়ান হইব। পক্ষান্তরে, মুসলমান এবং খ্রীষ্টিয়ানও কোন ধার্ম্মিক হিন্দুকে ভক্তির চক্ষে দেখিতে পারেন; কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের আদিষ্ট নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারেন না। এই জন্যই আমরা বৌদ্ধধর্ম্মকে না মানিয়াও বুদ্ধদেবকে ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, নাস্তিক চূড়ামণি চার্ব্বাককে বৃহস্পতির অবতার বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি। এই পাশ্চাত্য ভাবের খরস্রোতে আপ্লাবিত দেশে ও কালে অবস্থান করিয়াও যখন উদ্যানের শোভা-বর্দ্ধক মোরগ্ ফুলে অদ্যাপি হিন্দু দেবতার পূজা করেন না, ও দেবভোগে পলাণ্ডুর প্রয়োগ করেন না, তখন সেই আদিযুগে শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দু কি করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম আত্মসাৎ করিলেন, বুঝি না। আর বুঝি না, যে হিন্দু-বিধবা রোগে শোকে ক্লিষ্ট হইয়াও নিজে পাক করিয়া লয়েন, একবেলা দুটি অন্ন ভোজন করিয়া দীর্ঘ দিবা রজনী কাটাইয়া দেন, পুরীগমনের পথে পূর্ব্বদিনেও যিনি সেই ভাবে আহার করিয়াছেন, সেই সদাচারনিরতা হিন্দুবিধবা আজ পুরীক্ষেত্রে অর্থাৎ বুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াই সমস্ত সদাচার ভুলিয়া গেলেন, পুরুষোত্তম বুদ্ধদেবের দারুময় শ্রীমূর্ত্তি অবলোকন করিয়াই জাতিভেদ ভুলিয়া গেলেন, অম্লান মুখে অসন্দিগ্ধ চিত্তে সকল বর্ণের স্পৃষ্ট, উচ্ছিষ্ট প্রদত্ত বুদ্ধদেবের প্রসাদ দিনের ভিতরে বহুবার ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। অন্য কোন বৌদ্ধতীর্থে এইরূপ আচার আছে কি না জানি না, শুনি নাই, কল্পনার চক্ষেও

দেখি নাই। যাহা বৌদ্ধশাস্ত্রে নাই, বৌদ্ধ আচারে নাই, প্রবাদে নাই, হিন্দু কিন্তু বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া বৌদ্ধের নিকট হইতে সেই আচার গ্রহণ করিয়া জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিবার উদ্দেশে নিজেদের ভিতরে তাহার প্রবর্ত্তনা করিল। কত যুগযুগান্তর অতীত হইল, শ্রীপুরুষোত্তমের তথাবিধ প্রসাদ ভক্ষণ করিয়াও হিন্দুর হিন্দুত্ব বিলুপ্ত হইল না, জাতিভেদ অক্ষুণ্ণ রহিল। এই সকল কল্পনাপ্রসূত তর্কের মূলে কি আছে আমরা তাহা অবধারণ করিতে পারি না; পারেন কেবল তাঁহারা, যাঁহারা বেদ অপেক্ষা বিদেশী গুরুর কথাতে শ্রদ্ধালু। পুরুষোত্তম বুদ্ধমূর্ত্তি; সে সম্বন্ধে আর একটি অখণ্ডনীয় তর্ক আছে, একথা কাহারো কাহারো মুখে শুনিতে পাই। ভারতীয় স্থূলবুদ্ধি গোতম বুঝিতে পারিবেন না। তর্কটি এই, পুরুষোত্তমের মন্দিরে আমরা তিনটি মূর্ত্তি দেখিতে পাই, একটি জগন্নাথের, একটি বলভদ্রের, একটি সুভদ্রার। যতগুলি বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কোন কোনটিতে তিনটি মূর্ত্তি আছে, একটি বুদ্ধের, একটি ধর্ম্মের ও একটি সঙ্ঘের। যখন কোন বুদ্ধপ্রতিমার সঙ্গে আমরা আরও দুইটি মূর্ত্তি দেখিতে পাই, তখন বলিতে হইবে, বুদ্ধের প্রতিকৃতিতে ত্রিমূর্ত্তির সমাবেশ আছে; যাহাতে ত্রিমূর্ত্তির সমাবেশ আছে, বলিতে হইবে, তাহা বুদ্ধের প্রতিকৃতি; যখন জগন্নাথমূর্ত্তিতে আরও দুইটি মূর্ত্তির সমাবেশ আছে, তখন সে ত্রিমূর্ত্তি; যখন সে ত্রিমূর্ত্তি, তখন সে বুদ্ধের প্রতিকৃতি। * এই তর্কের উপরে আর বলিবার কি আছে? বলিবার কিছুই নাই, জিজ্ঞাসা করিবার কিছু আছে। খ্রীষ্টয়ানের ত্রিত্ববাদ বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত? না, খ্রীষ্টধর্ম্মের নিকট হইতে এই ত্রিত্ববাদ বৌদ্ধধর্ম্মে সংক্রামিত? খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধধর্ম্মে ত্রিত্ববাদ সংগৃহীত হইল, আবার হিন্দুধর্ম্মে বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে সেই ত্রিত্ববাদ গোপনে অপহৃত হইল; এই যুক্তিতেই বিনিগমনা আছে, অনুকূল তর্ক আছে, এই মূল সত্যের অনুসরণ না করিয়া শাখার আশ্রয় গ্রহণ করা সুসঙ্গত হয় নাই। তাহা হইলে আর বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকাল লইয়াও গোলযোগে পড়িতে হয় না। খ্রীষ্ট জন্মিবার অন্ততঃ দুইশত বৎসর পরে বুদ্ধের আবির্ভাবের কাল অবধারণ করা যাইতে পারে। আর, হিন্দুর বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ সমস্তই তৎপরে অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর ভিতরে রচিত হইয়াছে, সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। তন্ত্র ত ইংরাজাধিকারের পরে লিখিত, সে সম্বন্ধে অভ্রান্ত যুক্তি আছে, ক্রাইষ্টের নাম দেখিয়াই তন্ত্রে ক্রীঁ বীজ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বলা আবশ্যক, হিন্দুর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব বৌদ্ধের নিকট হইতে বা খ্রীষ্টয়ানের নিকট হইতে গৃহীত। অনেকের গৃহে রাম, লক্ষ্মণ, সীতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, অনেকের গৃহে গণেশজননীর মূর্ত্তি ও মহাদেব আছেন; এ সমস্তই বুদ্ধ, সঙ্ঘ ও ধর্ম্মমূর্ত্তি। রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির সহিত শালগ্রাম চক্র আছেন; বলা বাহুল্য যে, সে মূর্ত্তিত্রয়ও বুদ্ধ, সঙ্ঘ ও ধর্ম্মের মূর্ত্তি। বুদ্ধ ও ধর্ম্মের পুরুষ মূর্ত্তি, সঙ্ঘের স্ত্রী-মূর্ত্তি। পূর্ব্ব কথিত হিন্দুদেবমূর্ত্তিগুলির ভিতরেও এক

* জেনারেল কনিংহাম কৃত The Ancient Geography of India দ্রষ্টব্য।

একটি স্ত্রী-মূর্ত্তি, অপর দুই দুইটি পুরুষ-মূর্ত্তি আছে; সুতরাং জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি যে বুদ্ধমূর্ত্তি, এই অনুমানে কোনরূপ হেত্বাভাসের (Fallacy) সম্ভাবনা নাই। এই ত্রিমূর্ত্তির নিকটে প্রস্তরনির্ম্মিত সুদর্শনচক্র আছে। আর কি? ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ কি থাকিতে পারে? বুদ্ধেরও যে চক্র আছে, এই চক্রই যে বুদ্ধত্বসাধক অব্যর্থ প্রমাণ। ষড়্‌বর্ষবয়স্কা সরোজকুমারী তাহার পিত্রালয়ের সন্নিধানে একটি ক্ষুদ্র গৃহে বৃদ্ধা গৌরার নিকটে যাইয়া তাহার মুখে রূপকথা শুনিত। দরিদ্রা গৌরা তাহাকে রূপকথা শুনাইত, আর হাতে চরকার সূতা প্রস্তুত করিত। সরোজকুমারী গৌরীর চরকা ভিন্ন আর কখনও চরকা দেখে নাই। কোন এক সময়ে সরোজকুমারী মাতার সঙ্গে মাতামহের গৃহে যাইয়া কোন এক দাসীর একটি চরকা দেখিতে পায় ও সেই চরকা দেখিয়াই জিদ্‌ ধরে, গৌরী ঠানদিদিকে ডাকিয়া দেও, আমি তাহার মুখে রূপকথা শুনিব। সকলে বলিল, গৌরী কে? গৌরীনামে এখানে কেহ নাই, কাহাকে ডাকিব? সরোজকুমারী চরকা দেখাইয়া বলিল, কেন থাকিবে না? যখন ওটা আছে, তখন গৌরী ঠানদিদিও আছে, ওটা যে গৌরী ঠানদিদির। এই বিদেশী অনুমান শুনিয়া সরোজকুমারীর অনুমানের কথা মনে হয়, হায়, সুদর্শনচক্র! তোমাকে লইয়াও বিব্রতে পড়িতে হইল! চীন, জাপান, তিব্বত, বর্ম্মা, ভারত যে স্থানেরই বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিবে, সমস্ত মূর্ত্তিরই একরূপ গঠন, চক্ষুঃমুখ, নাসিকা এক ভাবেই গঠিত, সর্ব্বত্র এক সাম্য বিদ্যমান। আবার সমস্ত মূর্ত্তিই যোগাসনে উপবিষ্ট, চক্ষু ভ্রূমধ্যে সন্নিবেশিত, পাণিতল অঙ্কে স্থাপিত। জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, জগন্নাথদেবের মূর্ত্তিতে ইহার কি আছে? বুদ্ধ মূর্ত্তির সহিত জগন্নাথদেবের মূর্ত্তির কতটুকু সৌসাদৃশ্য আছে? অর্দ্ধনিমীলিত বুদ্ধনেত্রের সহিত জগন্নাথদেবের ভীষণ বিশাল নেত্রদ্বয়ের কি সাদৃশ্য আছে? আর অঙ্কন্যস্ত পাণিতলের সহিত পাণি-তলবিহীন এবং ঋজুভাবে সম্মুখে শূন্যে প্রসারিত বাহুযুগলের কিরূপ সাম্য আছে? কলিঙ্গ-উৎকলের ভাস্কর্য্য এক সময়ে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, উৎকল-কলিঙ্গের শিল্পী কঠোর প্রস্তরফলক হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাণিতলের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র রেখাপাতগুলি পর্য্যন্ত বাটালীর মুখে বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছিল; আর কোমল কাষ্ঠফলকে জগন্নাথদেবের কমনীয় মূর্ত্তি বাহির করিতে পারিল না, অস্বাভাবিক ভাবে বাহুদ্বয়ের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে পাণিতলের সন্নিবেশ করিতে পারিল না; ইহার অর্থ কি? জগন্নাথদেবকে বুদ্ধমূর্ত্তি স্বীকার করিলে এ প্রশ্নের উত্তর হইবে না, হিন্দুর নিকটে জিজ্ঞাসা করিলে সহজেই মীমাংসা হইবে। শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে জগন্নাথ প্রণবমূর্ত্তি;—অর্থেও প্রণব, আকারেও প্রণব। দেবনাগর-বর্ণমালায় ওকরের পৃথক্ আকার নাই, যে প্রণালীতে ব্যঞ্জনবর্ণে ওকারের সংযোগ করা হয়, অকারে সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া ওকারের চিত্র লিখিত হয়, যাঁহারা দেবনাগর-বর্ণমালার গঠন হইতে সমস্ত ভারতীয় বর্ণমালার সৃষ্টি

হইয়াছে বলেন, তাঁহাদিগকে এই বিষয়ে মনোযোগ প্রদানের জন্য অনুরোধ করি। বাঙ্গালা অক্ষর আধুনিক নয়, বাঙ্গালা অক্ষরের বর্ণনা আছে বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রও আধুনিক নয়। তন্ত্র প্রাচীন প্রমাণ করিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের আবশ্যকতা হইবে। বুদ্ধদেব যখন বাঙ্গালা অক্ষর শিখিয়াছিলেন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন বাঙ্গালা বর্ণমালা যে প্রাচীন, সে সম্বন্ধে আর প্রমাণান্তরের প্রয়োজন করে না। প্রণবের শীর্ষস্থ বিন্দুটি জগন্নাথদেবের মস্তক, চন্দ্রটি ঋজু বাহুযুগল, ওকারের উর্দ্ধাংশ নাভি পর্য্যন্ত বক্ষঃস্থল, নিম্নাংশ নাভি হইতে নিম্নাবয়ব। অবশ্য, বাঙ্গালা প্রণবই এই ভগবন্মূর্ত্তির আদর্শ। তন্ত্রের অনেক বাঙ্গালা অক্ষরকে আদর্শ করিয়া লিখিবার ব্যবস্থা আছে। "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ" পাতঞ্জল-দর্শনের সূত্র, সেই ঈশ্বরের বাচক-শব্দ প্রণব, উপনিষদে তাহাই আছে, ভগবদ্গীতাতেও তাহাই আছে। অকার, উকার, মকার এই তিনবর্ণের ঘনসন্নিবেশে এই বর্ণের সংস্থান। তিন বেদ; জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন বৃত্তি; ভূর্লোক, ভুবোলোক, স্বর্লোক, এই তিন ভুবন; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন দেবতা প্রণবের অর্থ। ধরিতে গেলে ভগবানের বিশ্বরূপই প্রণব। আবার নাদবিন্দু শক্তি, অকার বিষ্ণু, উকার ব্রহ্মা ও শিব। অর্থ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারের কারণ। বিন্দু তুরীয়ব্রহ্মা; নাদ শক্তি; অকার, উকার ঈশ্বর। এক প্রণবেই বেদান্ততত্ত্ব নিগূঢ় ভাবে অবস্থিত। বেদ, উপনিষদ, তন্ত্রে যাহা বলা হইয়াছে, এক প্রণবেই তাহা বিদ্যমান, ভগবানের বিশ্বরূপ এক প্রণবেই নিহিত। একদিন ক্ষত্রিয়ান্তকারী প্রলয়-সমুদ্রের তীরভূমি কুরুক্ষেত্রে ভক্ত অর্জ্জুন ভগবানের এই বিশ্বরূপ অবলোকন করিয়াছিলেন, আর আজ এই কল্লোলময় মহাসমুদ্রের বেলাভূমিতে প্রাণের পিপাসা মিটাইয়া চক্ষু ভরিয়া ভগবানের এই ভীষণ জলময় মূর্ত্তি এই বিশ্বরূপ বিলোকন করিয়া সাধক তুমি, ভক্ত তুমি, মানব জন্ম সার্থক কর। অর্জ্জুনে প্রদর্শিত বিশ্বরূপে সহস্র চক্ষু, সহস্র বক্ত্র, সহস্র বাহু, সহস্র উদর ছিল; আর এ বিশ্বমূর্ত্তিতে বিশাল ভয়ানক লোচনদ্বয়ে সহস্র চক্ষুর সত্তা আছে, আকাশরূপ বিশাল ললাটে উদ্ভাসিত বিশাল নেত্রদ্বয়ে সহস্র সহস্র উজ্জ্বল চন্দ্র-সূর্য্যের সত্তা আছে, কালানল-স্বরূপ জ্বালাময় ভয়ানক বিশাল বদনমণ্ডলে সহস্র মুখের সত্তা আছে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের জন্য অগ্রপ্রেরিত বাহুযুগলে বাহুসহস্রের ভাবসমাবেশ আছে। কে বলিবে কোন্ কর্ম্ম করিবার জন্য এই বাহুদ্বয়ের অগ্রভাগ প্রবৃত্ত বা নিযুক্ত? কর্ম্ম অনন্ত, কর্ম্মের শেষ নাই, বিশ্বরূপের বাহুযুগলেরও শেষ নাই, অগ্রভাগ নাই; তুমি জ্ঞানী, তুমি সাধক, তোমাকে বুঝাইবার জন্য বাহুর কিয়দংশ প্রদর্শিত হইয়াছে, বুঝাইবার জন্যও আবার অগ্রভাগ পাণিতল প্রদর্শিত হয় নাই। এক মূর্ত্তিতে যেমন ত্রিমূর্ত্তির সমাহার, সেইরূপ পৃথক্ পৃথক্ তিন মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়া এই তিন মূর্ত্তির সমষ্টিতে একমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। দক্ষিণে ধূম্রবান, বামে সংকর্ষণ বলরাম, সুভদ্রা মহাশক্তির আশ্রয়ে ব্রহ্মরূপে

সৃষ্টি, রুদ্ররূপে প্রলয় সূচিত হইতেছে, বামে দেবযান, বামে অবস্থিত হইয়া জগন্নাথ এক মূর্ত্তিরই আশ্রয়ে জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব, স্থিতি-তত্ত্ব, প্রলয়-তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া আত্মস্বরূপ বুঝাইয়া দিতেছেন; ইহাকেই বলে পুরুষোত্তম দর্শন। পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে বিমলা দেবী আছেন, সরস্বতী আছেন, লক্ষ্মী আছেন, চামুণ্ডা আছেন। লোকনাথ মহাদেব, মার্কণ্ডেশ্বর মহাদেব, ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর মহাদেব অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যাজপুর বিরজাক্ষেত্র, পুরী শ্রীক্ষেত্র বা বিমলাক্ষেত্র। ভদ্রাও অন্যকেহ নহেন, স্বয়ং দুর্গা ভুবনেশ্বরী, ইহা একটি যোগী সন্ন্যাসীর মুখে শুনিয়াছি। এ সন্ন্যাসী কখনও পুরীতে, কখনও কাশীতে, কখনও উত্তরাপথে থাকিতেন। যাজপুরে বিরজার কর্ত্তৃত্ব, শ্রীক্ষেত্রে বিমলার আধিপত্য, বিল্বপত্র তুলসী পত্রের সংযোগে দ্বাদশাক্ষরি বাসুদেব-মন্ত্রে শ্রীভুবনেশ্বরের অর্চ্চনা দেখিয়া শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীমন্দিরে রক্ষিত তাল-পত্রে লিখিত উৎকলের ইতিহাস-মাদলপঞ্জিকা পাঠ করিয়া বিদেশী ভাবে শিক্ষিত মহাত্মাদিগের মনঃকল্পিত শৈবযুগ, শাক্তযুগ, বৈষ্ণবযুগের সিদ্ধান্তে সম্মতি প্রদান করিতে না পারিয়াও একান্ত দুঃখিত হইতেছি। উৎকল-কলিঙ্গের রাজা যে যযাতি-কেশরী ভুবনেশ্বরের বিশ্ববিশ্রুত মন্দির নির্ম্মাণের আরম্ভ করেন, ; তিনিই সমুদ্রকূলের বালুকাস্তূপ উৎসারিত করিয়া স্বপ্নাদিষ্ট এই ভগবৎ-মূর্ত্তিত্রয় লাভ করেন ও পুরুষোত্তমের প্রাচীন মন্দির নির্ম্মাণ করেন। নবীন সন্ন্যাসী বৈষ্ণবধর্ম্মের নবীন প্রবর্ত্তক চৈতন্য দেবের একান্ত ভক্ত হইয়াও রাজা প্রতাপ-রুদ্র ধবলেশ্বর প্রভৃতির মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। স্বয়ং চৈতন্যদেবও সর্ব্বত্র মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অর্চ্চনা বন্দনা ও স্তোত্র পাঠ করিয়াছেন। আজ যেমন শাক্তের গৃহে রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, শালগ্রামচক্র অর্চ্চিত হইতেছেন, আজ যেমন বৈষ্ণবের গৃহে শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা আছে, আড়ম্বরের সহিত শারদীয়া দুর্গাপূজা সম্পন্ন হইতেছে, যুগযুগান্তর পূর্ব্বেও তাহাই ছিল। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সহচর রাজা যুধিষ্ঠির দুর্গার স্তোত্র পাঠ করিয়াছেন, অর্জ্জুন শিবের তপস্যা করিয়াছেন, ব্রজ-কুমারীরা কাত্যায়নীব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। সুতরাং ঐ সমস্ত যুগবিভাগ যে একান্ত মনঃকল্পিত, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

বৌদ্ধাচার্য্যেরা অনুষ্ঠান-প্রবল মহাযান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াও ভারতবর্ষে অধিক দিন বৌদ্ধধর্ম্মের রক্ষা করিতে পারেন নাই; বৈদিক ধর্ম্মের প্রখরমার্ত্তণ্ডপ্রভায় তামস ধর্ম্ম স্থির থাকিতে না পারিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া দিগ্‌দিগন্তরে প্রস্থান করিয়াছে; উৎকল-কলিঙ্গে আজ একটিও বৌদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। উদয়গিরি, খণ্ডগিরির গাত্রে ক্ষোদিত গুম্ফাগুলি না থাকিলে, পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ অশোকের শাসনলিপি না থাকিলে এক সময়ে যে উৎকল-কলিঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা বলিবার উপায় থাকে না। উৎকল-কলিঙ্গে প্রত্নতত্ত্বের অনেক উপকরণ,—অনেক নিদর্শন ইতস্তত

পড়িয়া রহিয়াছে, এক জীবনে বহুবর্ষব্যাপী পরিশ্রম করিলেও সমস্ত সংগ্রহ করিবার আশা করা যাইতে পারে না।

উৎকল-প্রসঙ্গ লিখিতে যাইয়া বাধ্য হইয়া আমার অনেক অবান্তর কথা বলিতে হইয়াছে। দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া আমি পাঠক পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি জন্মাইয়াছি বলিয়া শঙ্কিত হইয়াছি। উপসংহারে তাঁহাদিগের নিকটে একমাত্র ক্ষমা প্রার্থনা ভিন্ন আর আমার বলিবার কিছু নাই।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

ঊষার তারা।

বিরলে গগণ কোলে কে তুমি যাপিছ নিশি
ম্লান আঁখি বিরহিণী প্রায়,
কি ব্যথা ধরিয়া বুকে বল কি আশার আশে
অনিমেষ চাহিছ ধরায়?
সাথী কি এসেছ ফেলি তাই পথ চেয়ে চেয়ে
নাহি সুখ, বিনিদ্র অধীর?
বিরহের মর্ম্মব্যথা শিশির সম্পাতে কি গো
ঝরিতেছে,—তব আঁখি নীর?

অথবা কি ধ্যানমগ্না আছ তুমি নভতলে
উমা যথা হিমগিরি পরে,
সংজ্ঞাহীন হর লাগি ছিলেন কঠোর ব্রতে
একাসনে মিলনের তরে।
যুগযুগান্তর হতে সাধনা সমাধি মাঝে
বল দেবি কতকাল হায়!
ওগো প্রেম-সন্ন্যাসিনী কোন পুণ্যক্ষণ লাগি।
রবে তুমি চাহি দেবতায়।

শ্রীপ্রফুল্লনারায়ণ রায়।

'কৃষ্ণ-চরিত'

সাহিত্যাচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম নব্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষ্ণভক্তি প্রচারের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে তিনি কৃষ্ণের মানব-চরিত্রেরই আলোচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কৃষ্ণকে যে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে যে তাঁহার সেই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল, উক্ত গ্রন্থেই তিনি এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্তি দ্বারা বিশেষতঃ ভগবদ্ভক্তি দ্বারা, মানুষ উন্নত হয়; কিন্তু ভগবচ্চরিত্র সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা থাকিলে সেই উন্নতির ব্যাঘাত ঘটে। "কৃষ্ণ আমাদের দেশে সর্ব্বব্যাপক," সুতরাং কৃষ্ণ-চরিত্র সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান আমাদের জাতীয় উন্নতির পক্ষে তিনি একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। সেই চরিত্র সম্বন্ধে লোকের অমূলক বিশ্বাস দূর করিবার ইচ্ছায় তিনি যথাসাধ্য পুরাণ-ইতিহাসাদির আলোচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিমল শুভ্র চরিত্র তাঁহার গ্রন্থে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বিষয়টি যেরূপ সুবিস্তৃত ও বহু আলোচনাসাপেক্ষ এবং আচার্য্য-দেবের জীবন যেরূপ কর্ম্মবহুল ছিল, তাহাতে এরূপ গুরুতর বিষয়ে অনন্য-সহায় ব্যক্তিবিশেষের সিদ্ধান্তের উপর সর্ব্বাংশে নির্ভর না করিয়া এদিকে সমবেত চেষ্টা প্রয়োগই সাহিত্য-সেবকগণের পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়।

এবম্বিধ কার্য্যে আমার মত অযোগ্য লোকের হস্তক্ষেপ দেখিয়া অনেকেই মনে করিবেন (এবং সেরূপ মনে করা অসঙ্গতও হইবে না) যে "Fools rush in where Angels fear to tread" কিন্তু এইরূপ ধৃষ্টতার সমর্থন-কল্পে আমার বিনীত উত্তর এই যে, একটি সমবেত চেষ্টার সূত্রপাত করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

পূজ্যপাদ বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণ-চরিত্র বুঝিবার জন্য প্রধানতঃ মহাভারতের উপর নির্ভর করিয়াছেন, এবং কৃষ্ণের কলঙ্কমোচন-প্রয়াসে মহাভারতের অনেকগুলি অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। নৈতিক ধর্ম্মাধিকরণে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে প্রধান প্রধান অভিযোগ যাহা আছে, তৎসম্পর্কীয় প্রমাণ-সমূহের বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বুঝিয়াছেন যে, সে অভিযোগ ভিত্তিহীন; ঘটনাগুলি সত্য নহে—কাজেই তিনি কৃষ্ণকে নির্দ্দোষ বলিয়াছেন! বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে, ঐ ঘটনাগুলি সত্য হইলেও উহারা কৃষ্ণ চরিত্রের কলঙ্ক নহে।

"অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" ও বৃন্দাবনের গোপী—এই দুইটিকে কৃষ্ণের প্রধান অপবাদ ধরিয়া প্রথমটি সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন —"বৃত্তান্তটি নিতান্তই যে উপহাস্য তাহার সাত রকম প্রমাণ দিলাম।" কিন্তু যাহাকে তিনি 'প্রমাণ' নাম দিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না,—অনুমান মাত্র। বৃত্তান্তটি যে প্রক্ষিপ্ত নহে এ কথা অবশ্য আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না; তবে আমার বক্তব্য এই যে উহা সত্য হইলেও উহাতে কলঙ্কের কারণ প্রকৃত পক্ষে কিছুই নাই। ইহা দেখাইতে হইলে কৃষ্ণ কথিত ধর্ম্মতত্ত্ব বঙ্কিম বাবু যেরূপ বুঝিয়াছেন, তাহা একবার দেখা উচিত।

তিনি কৃষ্ণ-প্রোক্ত ধর্ম্মতত্ত্বের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

সত্য, শৌচ, দান, অহিংসাদি শ্রুতিবিহিত বিধিসমূহের সকলগুলিই সাধারণতঃ ধর্ম্ম, আবার অবস্থা-বিশেষে অর্থাৎ অনুপযুক্ত প্রয়োগে সকলগুলিই অধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়; পক্ষান্তরে, অসত্য হিংসাদি যে সকল কার্য্য সাধারণতঃ অধর্ম্ম অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তাহারাও স্থলবিশেষে ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—(১) দস্যুর নিকট সত্য কথা কহিয়া প্রাণভয়ে পলায়িত ব্যক্তির সন্ধান বলিয়া দেওয়াতে সত্যনিষ্ঠ কৌশিক নরকে গিয়াছিলেন। (২) পাপাত্মাদিগকে ধনাদি দান করা অধর্ম্ম। (৩) লোক-হিংসাকারীর হনন করিয়া বলক-ব্যাধ স্বর্গ লাভ করিয়াছিল; ইত্যাদি। শ্রুতি সাধারণতঃ ধর্ম্মের প্রমাণ হইলেও উহাতে সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট নাই। তজ্জন্য অনুমান দ্বারাও অনেক স্থলে নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য ধর্ম্মের নির্ণয় করিতে হয়। কিন্তু সম্মুখে একটি আদর্শ না থাকিলে কি ধরিয়া অনুমান অগ্রসর হইবে? তাই ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ের জন্য একটি সর্ব্বত্র প্রযোজ্য, বিশ্বজনীন মূলসূত্র চাই। শ্রীকৃষ্ণের মতে সেই মূলসূত্রটি এই— "যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম্ম। পাশ্চাত্য হিতবাদী Sidgwickএর সহিত এই মতের ঐক্য আছে। Kant, Hegel প্রমুখ নৈতিক ও দার্শনিকদিগেরও এইরূপ

এক একটি মূলসূত্র আছে। উহাকে ভিত্তি বা আদর্শ ধরিয়া সমস্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণীত হয়।

অহিংসা সত্যাদি শ্রুতি-বিহিত স্থূল নীতি-গুলি যখন উক্ত লোকহিতরূপ চরম লক্ষ্যের প্রতিকূল হয়, তখন তাহারা অধর্ম্ম। আবার অসত্য হিংসাদি সাধারণতঃ নিষিদ্ধ কার্য্যগুলি উহার অনুকূল হইলে ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়। ইহাই বর্জ্জিত তত্ত্ব। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই মতে অহিংসা ও লোক-রক্ষাই পরম চরম ও অনন্যসাপেক্ষ ধর্ম্ম। অন্যান্য বিধিসমূহের নৈতিক মূল্য আপেক্ষিক, অর্থাৎ উক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মানুকূল্যসাপেক্ষ। সত্য —শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, কেননা ইহা লোক স্থিতির অনুকূল ও উপায়ীভূত। সত্য ও অহিংসার বিরোধ স্থলে অহিংসাকেই প্রাধান্য দিতে হয়। আবার লোক-স্থিতির সহিত অহিংসার বিরোধ স্থলে লোকস্থিতিকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। অর্থাৎ লোকরক্ষার্থ দুষ্টের প্রতি হিংসাচরণ ধর্ম্ম্য। কৌশিক ও বালকের বৃত্তান্তে এই দুই কথার উল্লেখ হইয়াছে।

লোকরক্ষার্থ স্থূল নীতির বর্জ্জন অপরিহার্য্য হইলে তাহার ঔচিত্য সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন,—যথা “স্থলবিশেষে সত্য মিথ্যাস্বরূপ এবং মিথ্যা সত্যস্বরূপ হয়।” গীতা ও মহাভারত হইতে ইহার অনুরূপ আরও ২।৪টি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

“কর্ত্তব্য কি এবং অকর্ত্তব্য বা কি, এই তত্ত্ব পণ্ডিতজনের পক্ষেও অতি দুর্জ্ঞেয়। স্থলবিশেষে অর্থাৎ প্রয়োগ-ভেদে কর্ত্তব্য কর্ম্মও অকর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্যও কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হয়। বুদ্ধিমান্, যোগযুক্ত ব্যক্তি কর্ম্মের এই গহন গতি বুঝিতে পারেন।” (গীতা, ৪র্থ অধ্যায়ে কৃষ্ণোক্তি) “কোন স্থলে অধর্ম্ম ধর্ম্মের ন্যায় এবং কোন স্থানে ধর্ম্ম অধর্ম্মের ন্যায় লক্ষিত হয়; কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিরা কোন্‌টি যথার্থ ধর্ম্ম আর কোন্‌টি যথার্থ অধর্ম্ম, তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।” (শান্তিপর্ব্ব, ৩৩শ অধ্যায়)। “ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, বিজ্ঞেরাও তাহা সম্যক নিরূপণ করিতে পারেন না।” (সভাপর্ব্বে ভীষ্মোক্তি) এক ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া একটি কুল, এবং একটি কুলকে নির্ম্মূল করিয়া রাজ্যরক্ষা করা ধর্ম্ম।” “কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।” ইত্যাদি।

“যাহা ৫২ তাহা ৫৩” বলিয়া একটি গল্প আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে কোন সতীর উপর অত্যাচার করণোদ্যত জনৈক দুষ্ট লোকের বিনাশ করায় এক দস্যু তাহার সমস্ত নর-হত্যা জনিত পাপ হইতে মুক্তি-লাভ করিয়াছিল। বস্তুতঃ সঙ্কীর্ণ, লৌকিক দৃষ্টিতে যাহা সাধারণতঃ পাপ বা পুণ্য বলিয়া বোধ হয় তাহা দেখিয়া, দেশ কাল পাত্র ও আনুসঙ্গিক অবস্থাদির বিচারক্ষম, সূক্ষ্মার্থ-দর্শী ধর্ম্মরাজ অনেক সময়েই হয় ত বলিয়া থাকেন—

“থাক তব ক্ষুদ্র মাপ, ক্ষুদ্র পুণ্য ক্ষুদ্র পাপ,
সংসারের পারে।”

বঙ্কিম বাবুর ব্যাখ্যাত ও অনুমোদিত কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের বর্জ্জিত তত্ত্বানুসারে লোক-রক্ষার্থ সত্য ও অহিংসা এই স্থূলনীতিদ্বয়ের ব্যতিক্রম দ্বারা দ্রোণভীষ্মাদির বধ ব্যাপারে

তাঁহার কোন আপত্তি থাকা উচিত ছিল না। তাঁহার ব্যাখ্যানুসারে কৃষ্ণের ধর্ম্মতত্ত্ব পাশ্চাত্য হিতবাদেরই অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়। এই ব্যাখ্যাকে সত্য ধরিয়া লইলে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদির কলঙ্কমোচন আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য হইত। কিন্তু ইহার মধ্যে আর একটি অতি জটিল বিবেচ্য বিষয় আছে। বর্জ্জিত তত্ত্বানুসারে সত্য অহিংসাদি স্থূলনীতির ব্যতিক্রমে কি একেবারেই পাপ নাই? ঐরূপ ব্যতিক্রম সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্ম্য, না মোটের উপর ধর্ম্ম্য? বঙ্কিম বাবু এই প্রশ্নটি তোলেন নাই। কৃষ্ণেরও এ সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কোন উক্তি পাওয়া যায় না। তবে মহাভারত ও অন্যান্য গ্রন্থে কৃষ্ণের ভক্ত ও মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের এরূপ অনেক উক্তি আছে যাহা হইতে বুঝা যায় যে সত্য অহিংসাদির ব্যতিক্রম মাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে পাপ আছে। নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে না পারিলে হিংসা মাত্রই পাপজনক। এই ভাবের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি:—"সকল কার্য্যেই আংশিক দোষ ও আংশিক গুণ থাকে। দুর্ব্বলের রক্ষার্থ, প্রবলের বিনাশ সাধন পক্ষেও এই কথা।" (শান্তিপর্ব্ব ৫ম অধ্যায়)। "রাজ্যলাভ ও রাজ্যরক্ষা উভয়েই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম আছে।" (শান্তিপর্ব্ব ১৭শ অধ্যায়)। "যুদ্ধান্তে তীর্থযাত্রাং বং প্রক্রতে যাদৃর ঋণঃ। তেন জানীমহে হিংসা ধর্ম্মাহপি দুরিত-প্রদা॥" (আদিপর্ব্বে নীলকণ্ঠধৃতা গাণেশী টীকা)। শ্যেনযজ্ঞ দ্বারা শত্রুক্ষয়রূপ শ্রেয়োলাভ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে জীবহিংসাজনিত নরকভোগরূপ প্রেয়োলাভও হইয়া থাকে। সাংখ্যকারিকা ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র ধৃত পঞ্চশিখাচার্য্যের "স্বল্পসঙ্করঃ সপরিহারঃ সপ্রত্যবমর্ষঃ" এই উক্তিও উক্ত মতের সমর্থন করিতেছে। হিংসা মাত্রেই পাপ; এমন কি অজ্ঞান-কৃত হিংসাতেও পাপ আছে। চুল্লী, জাঁতা, উদূখলাদি দ্বারা অনিচ্ছাকৃত জীবহিংসাহেতু পঞ্চশূনাদি পাপ হইতে মুক্তিলাভার্থ গৃহস্থকে পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। জৈনদিগের মধ্যেও অজ্ঞানকৃত জীবহিংসা নিবারণার্থ আহার-বিহার সম্বন্ধে অনেক সতর্কতাবলম্বন করিবার বিধি আছে। কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মেরও প্রথম কথা "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" ইহা বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন। বস্তুতঃ সর্ব্বপ্রকার হিংসাই পাপজনক, হিন্দু-শাস্ত্রের অভিপ্রায় এইরূপই বোধ হয়। আবার ইহার বিপরীত ভাবের কথাও আছে, যথা:—"আততায়ী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলেও তাহার বিনাশে ব্রহ্মহত্যা পাপ হয় না।" "লোকরক্ষার্থ হিংসাকারীর বিনাশ স্থলে অধর্ম্মই ধর্ম্মস্বরূপ হয়।" এক ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া একটি কুল এবং একটি কুলকে বিনাশ করিয়া রাজ্যরক্ষা করা ধর্ম্ম।" ইত্যাদি। এই সকল উক্তি এই ভাবে বুঝিতে হইবে যে, ঐ সকল স্থলে হিংসা মোটের উপর ধর্ম্ম্য, কেননা উহাতে পাপ অপেক্ষা পুণ্যই বেশী হয়। বস্তুতঃ অবিমিশ্র শ্রেয়োলাভ মানুষের ভাগ্যে সাধারণতঃ ঘটে না। মন্দের ভাল লইয়াই তাহাকে সন্তুষ্ট হইতে হয়। বৃহত্তর শ্রেয়োলাভার্থ ক্ষুদ্র অশ্রেয়ঃ স্বীকার করিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি মোটের উপর লাভবান্ হয়েন।

সুতরাং যে যে স্থলে বর্জ্জিত তত্ত্বানুসারে স্থূলনীতির ব্যতিক্রম ধর্ম্ম্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তত্তৎ স্থলে ধর্ম্ম্য অর্থে মোটের উপর ধর্ম্ম্য এইরূপ বুঝিতে হইবে।

অজ্ঞানকৃত বা অনিচ্ছাকৃত হিংসায় ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই, তথাপি তাহাতে পাপ হয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। তবে ইহা বুঝা যায় যে প্রাণিগণের রক্ষাতেই যদি ধর্ম্ম হয় তবে যে পরিমাণে জীবহিংসা হইবে সেই পরিমাণে অধর্ম্মও হইবে, সুতরাং অধিকাংশ লোকের রক্ষার্থ স্বল্পসংখ্যক দুষ্টের সংহার স্থলে কিয়ৎ পরিমাণে পাপ হইবেই। কিন্তু ঐরূপ হিংসা মোটের উপর ধর্ম্ম্য, কেননা উহাতে অধিক লোকের হিত ও অল্প লোকের অহিত হয়। এবং যে পরিমাণে অহিত হয় সেই পরিমাণে পাপও হয়।

লোকরক্ষারূপ শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মের প্রতিকূল হইলে অহিংসা সত্যাদি যেরূপ অধর্ম্মে পরিণত হয়, ক্ষমা, প্রেম, দয়া, দান, ভক্তি প্রভৃতিও তদ্রূপ হইয়া থাকে। ইহার অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য আশঙ্কায় তাহা দিলাম না।

আর একটি কথার উল্লেখ করা উচিত। লোকরক্ষারূপ মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনার্থ স্থূলনীতির ব্যতিক্রম যে স্থলে নিতান্তই অপরিহার্য্য, এবং যে স্থলে উক্ত উদ্দেশ্য সাধন হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর মাত্রও নাই, কেবল তদ্রূপ সুনিশ্চিত শ্রেয়োলাভের স্থলেই স্থূলনীতির বর্জ্জন ধর্ম্ম্য (অর্থাৎ মোটের উপর ধর্ম্ম্য)। কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যাকালে সত্যের অনিত্যত্ব সম্পর্কে বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন যে—'এ বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে ঘোর মতভেদ।' কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। এ বিষয়ে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে বড় মতভেদ দৃষ্ট হয় না। প্রথমেই বলা উচিত প্রতীচ্য বা পাশ্চাত্য মত বলিয়া কোন একটা মত নাই। আমাদের দেশের মত পাশ্চাত্য নৈতিকদিগের মধ্যেও নানা মুনির নানা মত। কিন্তু ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে নিত্যত্ববাদিগণের অগ্রণী যে Dr. Martineau, তিনিও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে স্থলবিশেষে, মিথ্যাপ্রয়োগই ধর্ম্ম্য। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন, রোগীর কাছে তাহার প্রকৃত অবস্থা জানাইলে যে স্থলে রোগবৃদ্ধির সম্ভাবনা, সে স্থলে পরিণাম ফলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়স্কর। কৃষ্ণোক্ত কৌশিক বৃত্তান্তের সহিত এই কথার সাদৃশ্য আছে। হিতবাদী Sidgwickএরও এই মত। প্রাচীন গ্রীক মনীষী Aristotleএর মতেও নৈতিক বিধিসমূহ নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয় নহে, কিন্তু অবস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ প্রয়োজনীয়।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে, বিশেষতঃ দ্রোণাদির বধব্যাপারে, উল্লিখিত ধর্ম্মতত্ত্বের প্রয়োগ বিষয়ে এখন আলোচনা করিব।

সকলেই জানেন কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা দুর্য্যোধনের দোষে বিফল হওয়াতেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমবায়ে কুরুক্ষেত্র-প্রান্তরে লোক-ভয়ঙ্কর সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। পরস্বাপহারক অস্থায়াবতার দুর্য্যোধন ধর্ম্মতঃ পাণ্ডবদের বধ্য। ভীষ্মদ্রোণাদি মহাত্মাগণ তাহার রক্ষক, সুতরাং ধর্ম্মস্থাপনের পথে অন্তরায় বলিয়া

তাঁহারাও বধ্য। এ পর্য্যন্ত কোন গোল নাই। কিন্তু বিষম সমস্যার কথা এই যে ন্যায় যুদ্ধে অর্থাৎ ধৃত-শস্ত্রাবস্থায় ভীষ্ম দ্রোণ অপরাজেয়। যুদ্ধের প্রাক্কালে যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাঁহার উক্তিই ইহার প্রমাণ। কৌরব পাণ্ডব কোন পক্ষকেই ইঁহারা ছাড়িতে পারেন না। একদিকে অর্থ দ্বারা বদ্ধ; অন্যদিকে ধার্ম্মিকের প্রতি ধার্ম্মিকের স্বাভাবিক আকর্ষণ ও সহানুভূতি। ধর্ম্মনিষ্ঠ পাণ্ডবদিগেরই যে জয়ী হওয়া উচিত, ইঁহারা তাহা বুঝেন এবং মনে মনে তদ্রূপ আকাঙ্ক্ষাও করেন। সুতরাং উভয় পক্ষের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের জন্য ইঁহারা কৌরব পক্ষে থাকিয়াই যথাসাধ্য যুদ্ধ করিলেন বটে, কিন্তু পাণ্ডবেরা যাহাতে জয়ী হয় (যুধিষ্ঠির প্রার্থনাক্রমে) তদ্রূপ মন্ত্রণা, এমন কি নিজেদের বধের উপায় পর্য্যন্ত বলিয়া দিলেন। অধিকন্তু "তাঁহারা প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সংযত হইয়া 'পাণ্ডবদিগের জয় হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন।" তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন ভীষ্ম-দ্রোণ কর্ত্তৃক এই আশীর্ব্বচন-রূপ আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রয়োগ পাণ্ডবদিগের পক্ষে অল্প লাভের বিষয় ছিল না। অতএব দেখা যাইতেছে কৃষ্ণ যেমন উভয় পক্ষের প্রার্থনা ক্রমে ক্ষাত্রধর্ম্মানুরোধে উভয় পক্ষকেই সাহায্য দান করিয়াছিলেন,—একপক্ষে তাঁহার দৈহিক বলের প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁহার সমযোদ্ধা নারায়ণী সেনা, অন্য পক্ষে তাঁহার মানসিক বল বা মন্ত্রণাশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণভক্ত ভীষ্ম ও ভীষ্ম-ভক্ত দ্রোণও তদ্রূপ একপক্ষে বাহুবল, অন্যপক্ষে মন্ত্রণা ও আশীর্ব্বাদরূপ আধ্যাত্মিকী শক্তি-দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। ভীষ্মদ্রোণের ন্যায় কৃপ-শল্যও পাণ্ডবদিগকে মন্ত্রণা ও আশীঃশক্তি দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। এই রূপে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে কৃষ্ণ-ভীষ্ম-প্রমুখ পাঁচ জন প্রধান অধিনায়কের বাহুবল এক দিকে এবং বুদ্ধিবল ও অধ্যাত্ম-বল অন্য দিকে প্রযুক্ত হইয়াছিল; এবং পরিণামে মানসিক বলই জয়-লাভ করিয়াছিল। ভীষ্ম দ্রোণ ন্যায় যুদ্ধে অপরাজেয়। তাঁহাদিগের দ্বারা যখন রাশি রাশি পাণ্ডব-সৈন্যের ধ্বংস হইতে লাগিল, তখন তাঁহাদিগের নির্দ্দেশিত অন্যায়োপায় অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাদের বধ-সাধন পাণ্ডবপক্ষে অপরিহার্য্য হইল। কিন্তু যিনি ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিবেন, তাঁহাকে নিরয়-গামী হইতে হইবে। এরূপ স্থলে ধর্ম্ম-সংস্থাপন ও লোকরক্ষার্থ ব্যক্তি-বিশেষের নিরয়-গমন কি শ্রেয়স্কর? এ বড় কঠিন সমস্যার কথা।

পরার্থে স্বার্থত্যাগ মহত্ত্বের পরিচায়ক। স্বার্থত্যাগের আবার ইতর-বিশেষ আছে। যিনি আত্ম-সুখ কিয়ৎ-পরিমাণে খর্ব্ব করিয়া স্বকীয় অর্থ দ্বারা আত্মীয়-স্বজনের হিত সাধন করিতে পারেন, সেই স্বজন-প্রতিপালক ব্যক্তি অতি মহৎ, সন্দেহ নাই। আবার তাঁহার বদান্যতা যখন স্বজন, স্বজাতি ও স্বদেশের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক বিশ্ব-প্রীতিতে পরিণত হইয়া উহার বিশ্ববিস্তৃত স্নেহচ্ছায়ার আশ্রয়ে ত্রিতাপ-দগ্ধ জীবমাত্রকে টানিয়া লয়, তখন তাঁহার মহত্ত্ব আরও অধিক। এ স্থলে কার্য্যক্ষেত্রের ব্যাপ্তি বা বিস্তৃতি দ্বারা আত্ম-ত্যাগের মাত্রাধিক্য সূচিত হইতেছে।

পক্ষান্তরে আবার দত্ত-পদার্থ দাতার নিকট যে পরিমাণে প্রিয় ও মূল্যবান, অর্থাৎ উহার ত্যাগহেতু তাঁহার যে পরিমাণে কষ্ট হইবার কথা, তাঁহার আত্মত্যাগের গভীরতাও সেই পরিমাণে অধিক। পরার্থে আত্ম-প্রাণ-বিসর্জ্জন সাধারণতঃ দুষ্কর। সেই জন্য দধীচি, দামিয়েন, রেগুলাস্ প্রভৃতির আত্মত্যাগ বিশ্ব-বিশ্রুত। আবার আত্মপ্রাণ-দান অপেক্ষা পুত্রবলিদান অধিকতর দুষ্কর বলিয়া ধাত্রী পান্না, ভেটুরিয়া, ব্রুটাস্, ব্রেহাম, কর্ণ প্রভৃতির আত্মত্যাগের গভীরতা অধিকতর। অর্থদান অপেক্ষা প্রাণদান সাধারণতঃ দুষ্কর হইলেও, যে কৃপণ ব্যক্তি দস্যুর নিকট গুপ্তধনের সন্ধান বলিয়া দেওয়ার পরিবর্ত্তে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়, পরার্থে তাহার আজন্ম-সঞ্চিত অর্থরাশি দান বড় শ্রেষ্ঠ দান বলিতে হইবে। বুদ্ধভক্ত অনাথা রমণীর একমাত্র পরিধেয়খানির দান অতিশ্রেষ্ঠ দান, কেননা লজ্জাত্যাগ স্ত্রীলোকের পক্ষে নিরতিশয় দুষ্কর। মহাভারতোক্ত বুভুক্ষা-পীড়িত ঋচীক ঋষির ভিক্ষালব্ধ শক্‌তুপ্রস্থ দান, বাইবেলে বর্ণিত বিধবারমণীর কপর্দ্দকদান, মুমূর্ষু Sydney Smith-এর পানীয়দান, প্রভৃতি পরিমাণে অল্প হইলেও অবস্থানুসারে অতিশ্রেষ্ঠ দান। পৃথু, হরিশ্চন্দ্র, উশীনর, যুধিষ্ঠির, জোব্, রিড্‌লি, ল্যাটিমার প্রভৃতি ধর্ম্মবীরের পক্ষে পরার্থে ধর্ম্মবিসর্জ্জনই সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্কর আত্মত্যাগ। পদ্মিনী, সরোজিনী প্রমুখ রাজপুত-ললনা সতীত্ব ও সম্মানরক্ষার্থ জহরব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক জীবন আহুতি দিয়াছিলেন। আবার প্রবাদ আছে কোন সাধ্বী নারী পতির প্রাণরক্ষার্থ তাঁহার অজ্ঞাতসারে স্ত্রীলোকের শেষরত্ন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়া শেষে লুক্রেশিয়ার মত আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। পরলোকের ধর্ম্মাধিকরণে তাঁহার কার্য্যের বিচার-কালে ধর্ম্মরাজের সূক্ষ্ম নিক্তির কাঁটা কোন্ দিকে হেলিয়াছিল বলিতে পারি না। "শাস্ত্র এখানে মূক, মনুষ্যের জ্ঞান এখানে অসমর্থ।" সতীত্বরক্ষার্থ প্রাণবিসর্জ্জন যত দুষ্কর, পতিপ্রাণ-রক্ষার্থ সতীত্ববিসর্জ্জন তদপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক দুষ্কর। পরার্থে সাধ্বীনারীর আত্মত্যাগের ইহাই বোধ হয় শেষ সীমা। আর লোকহিতার্থ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষে ক্ষণকালের জন্যও ধর্ম্ম-বিসর্জ্জন সাধ্বী রমণীর সতীত্ব-বিসর্জ্জনের ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্কর, সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর। Abraham ও Brutus-এর, ধাত্রী পান্না ও কর্ণের পুত্র-বলিদান অপেক্ষাও ইহা কঠোরতর কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম-বিসর্জ্জনেই স্বর্গ-বর্জ্জন ও নিরয়-গমন; স্বর্গ-বিসর্জ্জনেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ-বিসর্জ্জন ও ক্লেশ-স্বীকারকরণ। সকাম ব্যক্তির পক্ষে ইহাই আত্মত্যাগের চরম সীমা।

নিরপেক্ষ বিচারক্ষম পাঠক! যুধিষ্ঠিরের 'হত ইতি গজ' বিষয়ক আচরণ এখন একবার চিন্তা করুন। পূর্ব্বে সত্য প্রভাবে যুধিষ্ঠিরের রথ চতুরঙ্গুল পরিমাণে উচ্ছ্রিত ছিল; দ্রোণবধ কালে অসত্যাচরণবশতঃ তাঁহার রথ-চক্র ভূতল-স্পর্শ করিল। এই উক্তিটির মধ্যেই কৃষ্ণোক্ত জটিল ধর্ম্ম-তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত রহিয়াছে। লোকরক্ষারূপ মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনার্থ ব্যক্তিবিশেষকে যদি ধর্ম্মচ্যুত ও নিরয়গামী হইতে হয়, তবে ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সেই

লোকরক্ষার সহায়তা করিতে হইবে। এই স্থলেই যথার্থ আত্মত্যাগের পরিচয়। সাধ্বী ভার্য্যাকে সভামধ্যে দুষ্ট কর্ত্তৃক নিগৃহীতা দেখিয়াও তিনি ধর্ম্মচ্যুত হয়েন নাই; আততায়ী কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ লাঞ্ছিত, হৃতসর্ব্বস্ব ও নির্ব্বাসিত হইয়াও যিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ধর্ম্মধনকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই, অনৃতাচরণ দ্বারা গুরুহত্যা ও ব্রহ্ম-হত্যা রূপ অনার্য্যোচিত জঘন্য কার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তি কেন হইল? ইহার একমাত্র উত্তর—নিজে ডুবিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য। ধর্ম্মসংস্থাপন দ্বারা লোক রক্ষার অভিপ্রায়েই তিনি আজন্মসঞ্চিত মহামূল্য তপঃপ্রভাব খর্ব্ব করিয়া তাঁহার সত্যোচ্ছ্রিত রথখানি পৃথিবীর ধুলিতে সংলগ্ন করিয়াছিলেন। যাঁহারা পরের জন্য ভাবেন, তাঁহাদিগকে সময়ে সময়ে এইরূপ একটু নীচে নামিতে হয়; পরের জন্য পৃথিবীর ধূলিতে দেহ মলিন করিতে হয়। পরহিতার্থ ধন-বিসর্জ্জনকে যদি মহত্ব বল, আর্ত্তত্রাণার্থ নিয়ম ভঙ্গ করিয়া বনবাস স্বীকার করাকে যদি আত্মত্যাগ বল, পরার্থে পুত্র-বলিদান বা আত্ম-বলিদান দেখিয়া যদি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হও, তবে ধন-প্রাণ-পুত্রাদি অপেক্ষাও সত্য যাঁহার নিকট প্রিয় ও মূল্যবান, লোকহিতার্থ তাঁহার সত্য-বিসর্জ্জন ও নরকালিঙ্গন দেখিয়া কেন যে অধোবদন হইবে তাহা ত আমি বুঝিতে পারি না

শ্রীকৃষ্ণের উপদিষ্ট এবং যুধিষ্ঠিরের অনুবর্ত্তিত এই নীতিকে Machiavellian policy বলিয়া ভ্রম হওয়া অন্যায় হইলেও, বিচিত্র নহে। এমন কি স্বয়ং অর্জ্জুনও যুধিষ্ঠিরের দ্রোণবধ-বিষয়ক আচরণকে রামচন্দ্রের বালিবধের ন্যায় চির-অকীর্ত্তিকর বলিয়াছিলেন। লৌকিক দৃষ্টিতে যে ইহা অকীর্ত্তিকর তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু তাঁহার এই অকীর্ত্তি-কালিমা জগতের হিতার্থ নীলকণ্ঠের বিষধারণের ন্যায় মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। মহাপ্রাণ ব্যক্তি ব্যতীত আর কে লোকরক্ষার্থ নরক-যন্ত্রণারূপ তীব্র হলাহল পান ও কলঙ্ককালিমা ধারণ করিতে পারেন? দ্রোণবধ না হইলে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ফল পৃথিবীর পক্ষে কিরূপ অকল্যাণ-কর হইত, তাহা চিন্তা করিলে পাঠকবর্গ আমার মতাবলম্বী হইবেন আশা করা যায়। দ্রোণাচার্য্য অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র-প্রয়োগরূপ অধর্ম্ম যুদ্ধ করিতেছিলেন এবং তৎপূর্ব্বে অভিমন্যু-বধ কালেও তিনি সপ্তরথীর অন্যতম হইয়া অন্যায় যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ অন্যায় যুদ্ধ যদি তিনি নাও করিতেন তথাপি ধর্ম্ম সংস্থাপন পক্ষে তাঁহার বধ অপরিহার্য্য ছিল। এবং বৈধ উপায়ে তাহা করা অসম্ভব বলিয়াই অবৈধ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল।

দ্রোণবধের ন্যায় ভীষ্ম-কর্ণ-দুর্য্যোধনাদির বধ-কালেও অল্পাধিক পরিমাণে অবৈধ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল এবং কৃষ্ণের উপদেশ-ক্রমেই সেরূপ হইয়াছিল। কথা উঠিতে পারে,—কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে কোন ন্যায়-সঙ্গত উপায়ে কি ইহাদের বধ সাধন করিতে পারিতেন না? কোন প্রকৃষ্টতর উপায় কি ছিল না?—না, মনুষ্য-সাধ্য উপায়ান্তর ছিল না। তবে অতি-মানুষ উপায়ে কৃষ্ণ ইচ্ছামাত্র

দ্রোণাদিকে উড়াইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও উহা অবৈধ উপায়ই হইত। যে উপায় বিপক্ষের আয়ত্ত নহে, তদবলম্বনে বিপক্ষের পরাভব অবৈধ উপায় মধ্যেই গণ্য। গন্ধর্ব-অসুরাদির মায়াযুদ্ধ এইজন্য অধর্ম্ম যুদ্ধ। প্রাকৃতই হউক বা অতি প্রাকৃতই হউক অবৈধ উপায় প্রয়োগ ভিন্ন ভীষ্ম-দ্রোণাদির নিপাত অসম্ভব ছিল। যে অবৈধ উপায়াবলম্বন দেখিয়া আপনি আপত্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা অবলম্বিত না হইলে যুদ্ধের যে ফল হইত তাহাতে আপনি আরও অধিক অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। "কোন কার্য্যই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে।" পূর্ব্বে উদ্ধৃত মহাভারতের সেই উক্তিটি স্মরণ করুন। মন্দের ভাল লইয়াই মানুষকে তুষ্ট হইতে হয়। ষোল আনা শ্রেয়োলাভ তাহার ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে না। দুষ্ট ব্যক্তির দোষে, বাধ্য হইয়া নির্লোভ ব্যক্তিকে সময়ে সময়ে অনিচ্ছাসত্ত্বে ধর্ম্ম চ্যুত হইতে হয়। ইহাতে তাঁহার দোষ হয় না (অর্থাৎ পাপ অপেক্ষা পুণ্যই অধিক হয়)। যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিতে ইহা পাওয়া যায়। কৌশল ও অধর্ম্ম ঐরূপ স্থলে পরপীড়নের অস্ত্র-স্বরূপ নহে, কিন্তু আত্মরক্ষার্থ ও লোকরক্ষার্থ অপরিহার্য্য বলিয়াই বাধ্য হইয়া একান্ত অপ্রীতিকর কর্ত্তব্যরূপে উহা স্বীকার করিতে হয়। জল দিয়া কাণের জল বাহির করার মত, বিষনাশের জন্য বিষান্তর প্রয়োগ করার মত, দেহরক্ষার্থ ব্রণ-দুষ্ট অঙ্গে অস্ত্রপ্রয়োগ করার মত, ঐরূপ ধর্ম্ম-সঙ্কট স্থলে ধর্ম্মকে বিশ্বংক্ষণের জন্য আঘাত করিয়াই তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। অধর্ম্মই সে স্থলে ধর্ম্ম, অকর্ম্মই সে স্থলে কর্ম্ম। অধর্ম্মই সেস্থলে ধর্ম্ম অর্থাৎ মোটের উপর ধর্ম্ম। ধর্ম্মার্থে আচরিত ঐ পাপ পাপই থাকিবে। এক নিষ্কাম কর্ম্ম ব্যতীত তাহা একেবারে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই (বলা বাহুল্য যুধিষ্ঠির নিষ্কাম ছিলেন না)। সে পাপের ভোগ ভুগিতেই হইবে। একজনকে সেই বিষ পান করিতেই হইবে। তাই মহাদেবের প্রয়োজন। মহাপ্রাণ ব্যক্তি ঐ পাপের বোঝা মাথায় লইয়া জগতের উদ্ধার সাধন করুন, পরার্থে আত্ম-শ্রেয়োরূপ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া নরক-যন্ত্রণা স্বীকার করুন, একা একা স্বর্গে না যাইয়া আর সকলকে সঙ্গে লইতে চেষ্টা করুন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, ইহাই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অন্যতম শিক্ষা। তপোবনে দুর্দ্ধর্ষ, বর-প্রভাবে অবধ্য বা অপরাজেয় আসুর শক্তি যখন বল দর্পান্ধ হইয়া স্বায় ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়া জগতের উন্নতি-স্রোত রুদ্ধ করিতে থাকে, তখন কৌশলাবলম্বন পূর্ব্বক উহার ধ্বংস-সাধন কর্ত্তব্য কি না এই জটিল ধর্ম্ম-সমস্যার সমাধান পুরাকালে দেবাসুর-সংগ্রামে একবার হইয়াছিল। কলির প্রারম্ভে লোকশিক্ষার্থ কুরুক্ষেত্র-প্রান্তরে পুনরায় সেই দুরূহ সমস্যারই সমাধান হইল। ধর্ম্মস্থাপন ও লোকরক্ষার্থ ক্ষণিক অধর্ম্মাশ্রয় নিতান্তই অপরিহার্য্য হইলে, তদবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মের উদ্ধার সাধন করিয়া তৎপর পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত কর। যুদ্ধান্তে নির্ব্বিণ্ণ-হৃদয় যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ব্যাসদেবের উপদেশক্রমে অশ্বমেধ যজ্ঞ ও নানাবিধ দানের অনুষ্ঠান এবং

তৎপর প্রজারঞ্জন ও রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনাদি সদনুষ্ঠান দ্বারাও তাঁহার পাপের খণ্ডন হয় নাই; অবশেষে নরক-ভোগ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ করিতে হইয়াছিল। অর্জ্জুনকে মণিপুরে স্বীয় পুত্র বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়া শিখণ্ডী সাহায্যে ভীষ্মবধ জনিত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। আর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও সতীর অভিসম্পাত-গ্রহণচ্ছলে ন্যায়ের মর্য্যাদাই রক্ষা করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির যে প্রধানতঃ পর-হিতৈষণা প্রেরিত হইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত এবং কৃষ্ণের ইঙ্গিত অনুসারে কাজ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ হইবে না। অধিকন্তু তাঁহার মত ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মাদিগের স্বার্থ ও পরার্থ পৃথক্ নহে। স্বার্থকে তাঁহারা পরার্থ-সাধনের উপায় মাত্র মনে করেন। তাঁহাদের অর্থ-সংগ্রহ মেঘের বারি-সংগ্রহের ন্যায় একমাত্র জগতের হিতার্থই হইয়া থাকে।

অতএব ভীষ্ম-দ্রোণাদির বধ-বিষয়ক প্রচলিত মতগুলি যদি ঐতিহাসিক সত্যও হয়, তথাপি উহারা বস্তুতঃ কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরাদির চরিত্রে কলঙ্ক নহে, আমার এইরূপ ধারণা। আমি যেরূপ বুঝিয়াছি তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিলাম, ইহার বিচার-ভার এখন সহৃদয় বিদ্বম্মণ্ডলীর উপর। কৃষ্ণের ধর্ম্মমতকে ঠিক আধুনিক হিতবাদ বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বে আপাতবিরোধী হিতবাদ ও নিত্যত্ববাদের সামঞ্জস্য আছে বলিয়া বোধ হয়। প্রবন্ধান্তরে এ বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

দুষ্কৃদ্‌গণের বিনাশ দ্বারা ধরার পাপভার হরণ এবং সাধু-পরিত্রাণ দ্বারা ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্যই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ; আবার কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ফলেই ন্যায়ের মর্য্যাদা-রক্ষার্থ প্রভাসের তীরে কৃষ্ণের আত্মবংশ-নাশ, ব্যাধ হস্তে আত্ম-জীবন-বিসর্জ্জন এবং যুধিষ্ঠিরাদি প্রিয়-ভক্তের নিরয়-গমন। অতএব বলা যাইতে পারে যে, অসুর-গ্রাস হইতে পৃথিবীর উদ্ধারার্থ ধর্ম্ম-সংস্থাপন দ্বারা বিশ্বমানবের পরিত্রাণার্থ, শ্রীকৃষ্ণ আত্ম-বলিদান ও ভক্ত-বলিদান করিয়া ন্যায়ের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ বঙ্কিম বাবু কর্ত্তৃক আরব্ধ কার্য্যের অগ্রসর-সাধনই আমার অভিপ্রেত। "বঙ্গের নরকাঙ্কাকারে যিনি শাপভ্রষ্ট দেবতা" রূপে মহৎকার্য্য-সাধনার্থ আসিয়াছিলেন, বাল্যকালে আমোদের লোভে যাঁহার গ্রন্থমধ্যে প্রবেশ করিয়া পুণ্যচরিত্রের পাবনী শক্তি অনুভব করিতে করিতে ভক্তি-বিস্ময়-পূর্ণ হৃদয়ে গ্রন্থ শেষ করিয়া উঠিতাম, যে বিশাল-বুদ্ধি ব্রাহ্মণ স্বাধীন চিন্তাপ্রভাবে কুহকময়ী পাশ্চাত্যশিক্ষার মোহপাশ ছিন্ন করিয়া বিভ্রান্ত দেশবাসীর উদ্ধারার্থ তাহাদের সুপ্ত আত্মানুভূতিকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন; ইয়ুরোপীয়েরা যাহা জানে না এমন সত্যও জগতে আছে,—ইয়ুরোপীয়েরা এ পর্য্যন্ত যাহা জানিতে পারে নাই এমন তত্ত্বও ঋষিদিগের জানা ছিল—এই মহতী শিক্ষা সর্ব্বপ্রথম যাঁহার নিকট প্রাপ্ত হইয়া নূতন জীবন লাভ করিয়াছিলাম;—আজ আমি তাঁহারই অঙ্গে অস্ত্রনিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছি, কেহ যেন এরূপ মনে না করেন। কৃষ্ণ-চরিত্রের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিবশতঃই মহাভারতের কতকগুলি

অংশকে প্রক্ষিপ্ত ও অমৌলিক বলিয়া আচার্য্যদেবের মনে সন্দেহ হয়। পরে তিনি চিন্তা ও আলোচনা দ্বারা তাঁহার সন্দেহের সমর্থন-কল্পে কতকগুলি যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যাহা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই, যাহা কৃষ্ণ-চরিত্রের কলঙ্ক বলিয়া তাঁহার ধারণা, তাহার প্রতিকূল যুক্তিও স্বভাবতঃ তাঁহার মনে উপস্থিত হইয়াছে। সেই যুক্তিগুলি পরীক্ষা ও বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য মনে করি। আমার অবলম্বিত প্রণালী কিঞ্চিৎ ভিন্ন হইলেও চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার বিভিন্নতা কিছুমাত্র নাই। তাঁহার ন্যায় এ ক্ষুদ্র লেখকেরও উদ্দেশ্য কৃষ্ণ চরিত্রের কলঙ্ক-মোচন ও মাহাত্ম্য প্রচার। তবে একটু ভিন্ন পথে আমি সেই উদ্দেশ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছি মাত্র।

বঙ্কিম বাবু অতি প্রকৃতে অবিশ্বাসী ছিলেন না। তবে অন্য কারণে তিনি মহাভারতের অনৈসর্গিক ঘটনাপূর্ণ অংশগুলিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তির পর এবং কিয়ৎকাল পূর্ব্বে জ্ঞান-পিপাসু থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ের অজস্র অনুসন্ধান এবং লণ্ডনের "Society For Psycical Researches" প্রভৃতি সমিতি ও অন্যান্য বিদ্বন্মণ্ডলীর দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টার ফলে বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-জগতের অনেক অজ্ঞাত ও লুপ্তপ্রায় তত্ত্ব মনুষ্যের জ্ঞান-গোচর হইয়াছে। আচার্য্যদেব তৎ সমুদয়ের সাহায্য পান নাই, বিশেষতঃ তত্ত্ববিদ্যার প্রতি তিনি কিছু বীতশ্রদ্ধও ছিলেন। নচেৎ তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি সম্ভবতঃ আরও পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করিত। এখন তাঁহার আত্মা পূর্ণজ্ঞানের পরিপন্থী দেহ মনের নিগড় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে তাঁহার নিকট যাহা জটিল, অসম্পূর্ণ ও অবোধ-গম্য ছিল, তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি—

"জন্মান্তের নব প্রান্তে, সে হয় ত আপনাতে
পেয়েছে উত্তর।"

শ্রীপ্রাণনাথ সরকার।

বেদান্ত।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, বেদান্ত-বাক্য দ্বারা যথার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, সুতরাং বেদান্তবাক্য প্রমাণ, এবং তজ্জনিত জ্ঞানের ফল মুক্তি। এই দুইটি বিষয়ে একটু বলা কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, যদ্দ্বারা প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার নাম প্রমাণ। যদি বেদান্তবাক্য দ্বারা যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং জ্ঞানের সেই যথার্থতা আমরা অনুভব করিতে পারি, তবেই বেদান্তবাক্যকে প্রমাণ বলা যাইতে পারে। এই অবস্থায় প্রথমতঃ বেদান্তবাক্য প্রমাণ কি না? এই বিষয়ের মীমাংসার পূর্ব্বে প্রামাণ্য অর্থাৎ জ্ঞানের প্রমত্বাবধারণ সম্বন্ধে আমাদের

দার্শনিক মতভেদ প্রদর্শন করা যাইতেছে—

প্রমাণত্বাপ্রমাণত্বে স্বতঃ সাংখ্যাঃ সমাশ্রিতাঃ
নৈয়ায়িকাস্তে পরতঃ সৌগতাশ্চরমং স্বতঃ।
প্রথমং পরতঃ প্রাহুঃ প্রামাণ্যং, বেদবাদিনঃ
প্রমাণত্ব স্বতঃ প্রাহুঃ পরতশ্চাপ্রমাণতাং॥

(সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ)

সাংখ্যমতাবলম্বিগণের মতে প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য অর্থাৎ জ্ঞানের প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব উভয়ই স্বতঃসিদ্ধ, নৈয়ায়িকগণের মতে উভয়ই প্রমাণান্তরসিদ্ধ। বৌদ্ধ প্রভৃতির মতে অপ্রামাণ্য (অযথার্থত্ব) স্বতঃসিদ্ধ এবং প্রামাণ্য (যথার্থত্ব) প্রমাণান্তরসিদ্ধ, বেদবাদিগণের (বৈদান্তিক ও মীমাংসকের) মতে প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ এবং অপ্রামাণ্য প্রমাণান্তরসিদ্ধ। যাঁহারা জ্ঞানের যথার্থতা অর্থাৎ প্রমাত্ব স্বতঃসিদ্ধ বলেন, তাঁহারা প্রমাণ অর্থাৎ জ্ঞান-কারণের স্বতঃসিদ্ধতা-বাদী এবং যাঁহারা তাহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা প্রামাণ্যের প্রমাণান্তরগ্রাহ্যতা-বাদী।

সাংখ্যমতে, প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্যের স্বতঃসিদ্ধতা স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের মতে, সকল জ্ঞানেই, এক সময়ে প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য উভয় গৃহীত হইতে পারে, এবং তাহা হইলে কোন জ্ঞানই প্রমাণ বলিয়া বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্যের প্রমাণান্তর-সিদ্ধতাবাদী নৈয়ায়িক। তাঁহাদের মতে প্রমাণ্য বা অপ্রামাণ্যের জ্ঞান হওয়া এক প্রকার অসম্ভাব্য বলিয়াই মনে হয়। কারণ যে প্রমাণ দ্বারা প্রামাণ্য সিদ্ধ করিতে হইবে, সে প্রমাণের প্রামাণ্য অন্য প্রমাণসিদ্ধ, আবার তাহার প্রামাণ্যও অন্য প্রমাণসিদ্ধ, সুতরাং অনবস্থা-দোষ-প্রযুক্ত কোন জ্ঞানেই প্রামাণ্য অবধারিত হইতে পারে না।

বৌদ্ধমতে অপ্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ, প্রামাণ্য প্রমাণান্তরসিদ্ধ। তাঁহাদের মতেও প্রামাণ্য অজ্ঞেয় বলিয়াই বিবেচিত হয়। যে প্রমাণ দ্বারা প্রামাণ্য জানিতে হইবে, সেই প্রমাণের স্বতঃসিদ্ধ অপ্রামাণ্য নিরাস করিবার জন্য প্রমাণান্তরের অন্বেষণ করা আবশ্যক এবং সেই প্রমাণান্তরের স্বাভাবিক অপ্রামাণ্য নিরসনার্থও প্রমাণান্তর ইত্যাদি রূপে ন্যায়মতোক্ত অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়ে। সেই দোষ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার কোন রূপ সম্ভাবনা নাই।

বৈদান্তিক ও মীমাংসক উভয়েই স্বতঃ-প্রামাণ্যবাদী। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, যখনই কোন বিষয়ে আমাদের জ্ঞান হয়, তখনই সেই জ্ঞানকে আমরা যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকি। জ্ঞান হওয়া মাত্রই, তাহাকে অপ্রমাণ মনে হয় না। জ্ঞানের কারণে কোনরূপ দোষ-সংসর্গ আছে, এইরূপ জানিতে পারিলেই, সেই জ্ঞানের অপ্রামাণ্য অনুমীত হইয়া থাকে।

এই অবস্থায় উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে বেদান্তবাক্য জন্য জ্ঞানের যথার্থত্ব স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং বেদান্তবাক্যের প্রামাণ্যও স্বতঃসিদ্ধ। কারণ, বেদান্তবাক্য দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হওয়া মাত্রই, সেই জ্ঞানের যথার্থতা নিশ্চয় হইয়া যাইবে। যদি বেদান্তবাক্য জন্য জ্ঞানের যথার্থতা প্রথমেই অবধারিত হয়, তবে তৎসম্বন্ধে অযথার্থতা-জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে না। অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ বেদান্তবাক্য, তাহাতে কোন রূপ

দোষ-সংসর্গ প্রমাণিত হইলে, তজ্জন্য জ্ঞানে অপ্রামাণ্য-বোধের সম্ভাবনা করা যায় কিন্তু তাহাতে কোন রূপ দোষ-সংসর্গ প্রমাণসিদ্ধ নহে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বেদ সকল প্রতারক বাক্য, তদ্বারা কোন রূপ যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। কিন্তু এই কথার অনুকূলে, তাঁহারা কোন প্রমাণ দিতে পারেন না। বৈদান্তিক-গণ বলিয়াছেন যে, জ্ঞানের যথার্থতা স্বতঃসিদ্ধ, জ্ঞান হওয়া মাত্রই তাহাকে আমরা যথার্থ বলিয়া বুঝিয়া থাকি। এমন কি, ভ্রম-জ্ঞানকেও প্রথমে আমরা যথার্থ বলিয়াই মনে করিয়া থাকি। যদি কোন ব্যক্তির দিক্‌ভ্রম হয়, তবে সে ব্যক্তি ভ্রম হওয়া মাত্র সেই জ্ঞানকে যথার্থ বলিয়াই মনে করেন। অনন্তর যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা উক্ত জ্ঞানের অযথার্থতা সাধিত হইয়া থাকে। সেই রূপ, যিনি বৈদিক জ্ঞানের অযথার্থতা সিদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, তিনিই তাহার অনুকূল প্রমাণ প্রদর্শন করিতে বাধ্য। অযথার্থতা সম্বন্ধে প্রমাণ প্রদর্শিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও রূপে তাহাকে মিথ্যা বলা যাইতে পারে না। বেদাপ্রামাণ্যবাদিগণ বলিতে পারেন যে, যদি বেদপ্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ যথার্থ হয়, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে সকলের বিশ্বাস না হওয়ার কারণ কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, স্বতঃ-সিদ্ধ যথার্থ জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস না হওয়ার কারণ,—অতি প্রাচীন অজ্ঞানজ সংস্কার। যেমন চন্দ্রের স্বাভাবিক আলোক নাই, সৌরালোকেই ইহা আলোকিত হইতেছে, ইহা জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত, কিন্তু এই কথা কোন শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিই, বোধ হয়, স্বীকার করেন না। সেই রূপ যাঁহারা জড় জগৎ সত্য, এইরূপ মনে করেন, তাঁহারা জড়জগৎ সম্বন্ধে সত্যতা-সংস্কারের অসারতা প্রতিপাদন না হওয়া পর্য্যন্ত, কোন ক্রমেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের স্বাভাবিক সত্যতা, স্বীকার বা বিশ্বাস করিতে পারেন না। ভাষ্য-কার শঙ্কর জড়জগতের মিথ্যাত্ব সংস্থাপনের জন্য নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎপ্রদর্শিত যুক্তি দ্বারা জড়জগতের মিথ্যাত্ব স্থাপিত হইলে, অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের সত্যতার প্রতি অসন্দিগ্ধ বিশ্বাস অবশ্যই উৎপন্ন হইবে। যাহার রজ্জুতে চাক্ষুষ সর্পভ্রম হইয়াছে, সে ব্যক্তি "ইহা রজ্জু, সর্প নহে" এই বাক্যের উপর কখনও যুক্তি ব্যতীত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। সেই রূপ আমাদের জড়জগৎ সম্বন্ধে চাক্ষুষ দ্বৈতভ্রম থাকায়, অদ্বৈত বোধে বিশ্বাস স্থাপিত হয় না। জড়জগতের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে যুক্তি জানিতে পারিলেই, তৎসম্বন্ধে বিশ্বাসের সম্ভাবনা করা যায়। এই বিষয়ে মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধির প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন যে "অদ্বৈতসিদ্ধের্দ্বৈতমিথ্যাত্ব সিদ্ধিপূর্ব্বকত্বাৎ প্রথমতোদ্বৈতমিথ্যাত্বং নিরূপ্যতে", দ্বৈত (জড়জগৎ)-এর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলেই অদ্বৈত (ব্রহ্ম)এর সিদ্ধি হইয়া থাকে, অতএব প্রথমে দ্বৈতবর্গের (জড়-জগতের) মিথ্যাত্ব নিরূপণ করা যাইতেছে। জড়জগতের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে গৌড়পাদাচার্য্য বলিয়াছেন যে "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানে-ঽপি তত্তথা। বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতাঃ।" যাহা অতীত ও ভবিষ্যৎ

কালে থাকে না, তাহা বর্ত্তমান কালেও অসৎ, মিথ্যা। কিন্তু তাহা মৃগতৃষ্ণিকা প্রভৃতির মত মিথ্যা হইলেও মূঢ় ব্যক্তিগণের নিকট অজ্ঞানবশতঃ সত্যস্বরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। উক্ত যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা জড়জগতের মিথ্যাত্ব সাধিত হইলে, বেদান্তবাক্য জন্য জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ যথার্থতার প্রতি বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, এইরূপে উক্ত বিশ্বাস ও একাগ্রতা প্রভাবে অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মভাবের প্রত্যক্ষ হয়, এই প্রত্যক্ষই মুক্তির কারণ। এই সকল বিচার দ্বারা অদ্বৈতবাদ-সম্মত এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইতেছে যে, জ্ঞানের প্রমাত্ব এবং জ্ঞানকারণের প্রমাণত্ব অবধারণের জন্য, প্রমাণান্তর প্রদর্শনের আবশ্যকতা নাই; কারণ, প্রমাত্ব এবং প্রমাণত্ব স্বতঃসিদ্ধ, যেমন জ্ঞান স্বপ্রকাশ, সে জন্য তাহার অস্তিত্ব-সাধনের জন্য জ্ঞানান্তরের অপেক্ষা করে না, সেইরূপ জ্ঞানের স্বীয় প্রমাত্ব অবধারণের জন্যও অন্য জ্ঞানের সাহায্য অপেক্ষা করে না। জ্ঞান স্বয়ংই নিজকে এবং নিজের প্রমাত্বকে অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এবং জ্ঞান-কারণের অস্তিত্ব যে প্রমাণ দ্বারা অবগত হওয়া যায়, সেই প্রমাণই সেই জ্ঞান-কারণের প্রমাণত্ব অবধারণ করিয়া থাকে। যদি জ্ঞানের প্রমাত্ব স্বতঃসিদ্ধ হয়, তবে তাহার কারণের প্রমাণত্ব অবশ্যই স্বতঃসিদ্ধ হইবে। কারণ, যে জ্ঞান দ্বারা তাহার কারণ অনুমিত হয়, সেই জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ প্রমা, সুতরাং তাহার কারণও স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ, এইরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই গৃহীত হওয়ার উপযুক্ত। বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার থাকিলেও এস্থলে প্রকৃত বিষয়ের অনুরোধে তাহা পরিত্যাগ করিলাম। এইক্ষণ বেদান্ত-বাক্য জন্য জ্ঞানের ফল মুক্তি, এই বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিতেছি।

মুক্তি শব্দের অর্থ, বন্ধন-নিবৃত্তি। বন্ধন দুঃখের কারণ, ইহা সর্ব্ববাদি-সিদ্ধ। এই অবস্থায় বন্ধনের কারণ কি? তাহা জানিতে পারিলে, তাহার নিবৃত্তির কারণ বুঝা সহজ হইবে বলিয়া মনে হয়। অতএব অগ্রে বন্ধনের কারণ সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে বলা কর্ত্তব্য। আমরা সংসারে দ্বিবিধ বন্ধন অনুভব করিয়া থাকি। শারীরিক ও মানসিক। শারীরিক বন্ধনের কারণ শৃঙ্খল প্রভৃতি। তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। মানসিক বন্ধনের কারণ অজ্ঞান। তাহা আমরা সাধারণ জ্ঞানে বুঝিতে পারি না, এবং তাহাকে বন্ধন বলিয়াই মনে করি না, বরং বিশেষ প্রীতির চক্ষেই দেখিয়া থাকি। অজ্ঞান প্রযুক্ত আমরা সাংসারিক বিষয়ে আসক্ত হইতেছি। এবং ঐ সকল বিষয়কে আমাদের সুখের উপকরণ মনে করিতেছি, কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ষে আমাদের সুখের কারণ নহে, বরং দুঃখেরই কারণ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ঐ সকল বিষয়ের সংসর্গে আমরা তাহাদের অধীন হইয়া পড়িতেছি। যেমন রজ্জু দ্বারা বদ্ধ পশু প্রভৃতি প্রাণিগণ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারে না, সেরূপ আমরাও অজ্ঞানরূপ রজ্জু দ্বারা সংসার-বৃক্ষে আবদ্ধ হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে

পারিতেছি না। যেরূপ রজ্জুবদ্ধ প্রাণিগণ বন্ধন কর্ত্তার অধীন, সেরূপ অজ্ঞানবদ্ধ মনুষ্যগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে বেদ, স্মৃতি, সদাচার বা যথেচ্ছাচারের অধীন। অজ্ঞান অন্ধকারের মত তাহা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ আচ্ছাদিত করিয়া কল্পিত মিথ্যা ভাবের উৎপাদন করিয়া থাকে। এই পরিদৃশ্যমান সংসারে আমাদের অতিশয় আসক্তি আছে। ইহা পরিত্যাগ করিতে আমাদের কখনও প্রবৃত্তি হয় না। ইহার মূল অজ্ঞান। অজ্ঞান আমাদের নিকট সংসারের প্রকৃত দোষ আচ্ছাদিত করিয়া মিথ্যা ভাবের উদ্ভাবন করিয়া দেয়। আমরা যে সকল বস্তু অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া থাকি, সে সমস্ত প্রকৃত পক্ষে আমাদের প্রিয় হইতে পারে না। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে—

"কলত্র মিত্র পুত্রার্থ গৃহক্ষেত্র ধনাদিকৈঃ।
ক্রিয়তে ন তথা ভূরি সুখং পুংসাং যথাঽসুখং"॥

স্ত্রী, মিত্র, পুত্র, ধন, গৃহ, ক্ষেত্র প্রভৃতি যে পরিমাণ অসুখ সম্পাদন করে, সেই পরিমাণ সুখ উৎপাদন করে না। ইহার অভিপ্রায় এই যে পূর্ব্বোক্ত সুখোপকরণ দ্বারা যখন আমরা সুখ উপভোগ করি, তখনও তাহাদের ভাবী অনিষ্ট-চিন্তা আমাদিগকে দুঃখ প্রদান করিতে থাকে। কিন্তু আমরা অজ্ঞানের মোহিনী শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া, একবারও এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে বা আপাত-মনোহর এই সকল সুখোপকরণ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না। বরং ঐ সকল বিষয়ের নিকটে থাকিতে বা তাহাদিগকে নিকটে রাখিতে ইচ্ছা করিয়া থাকি, এবং যাহাতে তাহাদের পুষ্টি হয়, তজ্জন্য যত্ন করিয়া থাকি; উক্ত বিষয়-সমূহ দুঃখপ্রদ, কিন্তু আমরা তাহাদের আসক্তি ছাড়িতে পারি না, সুতরাং আমরা তাহাদের অধীন। এবং সে অধীনতা প্রযুক্তই আমরা দুঃখ অনুভব করি। এই অধীনতা দৃঢ়তর বন্ধন, ইহার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভই মুক্তি বা মোক্ষ। মুক্তি-লাভের জন্য বৈদান্তিকের উপদেশ অতিশয় সমীচিন বলিয়াই মনে হয়। তাহাদের প্রথম উপদেশ আত্মা নিত্য, নির্ব্বিকার, জ্ঞান ও সুখ-স্বরূপ; দ্বিতীয় উপদেশ জগৎ মিথ্যা এবং সেই আত্মা অদ্বিতীয়। যদি আমরা প্রথম উপদেশ অনুসারে, আত্মা নিত্য, নির্ব্বিকার জ্ঞান ও সুখস্বরূপ এইরূপ ধারণা পুনঃপুনঃ আলোচনা ও যুক্তিপ্রভাবে দৃঢ়ভাবে আয়ত্ত করিতে পারি, তাহা হইলে জন্ম ও মৃত্যুভয়-জনিত কষ্ট আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। দ্বিতীয় উপদেশানুসারে, জগতের মিথ্যাত্ব ও আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব অসন্দিগ্ধভাবে অবধারিত হইলে, "দুঃখের কোনরূপ কারণ নাই"—এই ধারণাই হইবে। যদি আমরা এই ধারণা সাধন করিতে পারি, তাহা হইলে এ জগতের কোন বস্তুই, আমাদের দুঃখদায়ক হইতে পারিবে না। কারণ, যে সকল বস্তু আপাততঃ দুঃখের নিদান, সে সমস্তই মিথ্যা, সুতরাং মিথ্যা পদার্থ দ্বারা কোনরূপ দুঃখ হওয়া সম্ভাবিত নহে। এই বিষয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন,

"কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।
যত্রত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ"॥

যিনি সকল বস্তুকে এক বলিয়া দেখিতে

পান, তাহার শোকই বা কি মোহই বা কি? অর্থাৎ এইরূপ ব্যক্তির কোনরূপ শোক বা মোহ হয় না। যখন তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে জ্ঞানী ব্যক্তি সমুদয়ই আত্মস্বরূপে অনুভব করিতে থাকেন, তখন তিনি কাহা দ্বারা কাহাকে দেখিবেন। অর্থাৎ তখন তিনি কাহাকেও নিজ হইতে ভিন্ন বলিয়া দেখিতে পান না। তাঁহার নিকট সেই অবস্থায় সকলই আত্মস্বরূপ, সুতরাং আত্মা স্বয়ং নিজ দুঃখের কারণ হইতে পারে না। আত্মার সহিত অন্য পদার্থের সম্বন্ধজ্ঞানই দুঃখের কারণ, সে সময়ে সর্ব্বত্র আত্মদর্শনপ্রভাবে অন্য সকলই বিলুপ্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং ঐ সময়ে কোনরূপ দুঃখকারণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা থাকে না। যতক্ষণ রজ্জুতে সর্পভ্রম বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণই ভয়প্রযুক্ত তাহার নিকটে যাইতে সাহস হয় না, কিন্তু সেই ভ্রম বিদূরিত হইলে আর ভয় থাকে না। সেই রূপ বেদান্তবিচার-প্রভাবে অদ্বিতীয় ব্রহ্মভাব জানিতে পারিলে, যখন সংসার-রূপ সর্পভ্রম বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন আর কোনরূপ ভয় বা দুঃখ থাকে না এবং থাকিতেও পারে না।

মুক্তি সম্বন্ধে দর্শনশাস্ত্রে বহুবিধ মতভেদ দৃষ্ট হয়।

(১) নাস্তিক মত—এই মতে অপরাধীনতা বা স্বাধীনতাই মুক্তি। কোন কোন নাস্তিক মৃত্যুকেই মুক্তি বলিয়া থাকেন। এই তাহাদের উক্তি "অপরাধীনতা মুক্তিঃ" "মরণমেবাপবর্গঃ—বার্হস্পত্য সূত্র অপরাধীনতা বা মরণই মুক্তি।

(২) বৌদ্ধমত—তাঁহাদের মধ্যে মাধ্যমক মতে, আত্মনাশ মুক্তি এবং বিজ্ঞানবাদী যোগাচার বৌদ্ধমতে, বিষয়-সংস্কার-শূন্য জ্ঞানই মুক্তি নামে অভিহিত।

"মহোদয়ো নাম সবাসনাসমুচ্ছেদো জ্ঞানো পরম ইত্যেকে"। "নিখিল বাসনোচ্ছেদে বিগতবিষয়াকারোপপ্লব-বিশুদ্ধ-জ্ঞানোদয়ো মহোদয় ইত্যপরে" প্রশস্ত পাদভাষ্য। "রাগাদি-জ্ঞান সন্তান বাসনাচ্ছেদ সম্ভবাচতুর্ণামপি বৌদ্ধানাং মুক্তিরেষা প্রকীর্ত্তিতা (বিবেকবিলাস)

সংস্কার বিনাশ হইলে জ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, এই নিবৃত্তিই কোন কোন বৌদ্ধমতে মুক্তি। কাহারও মতে সংস্কার বিনষ্ট হইলে বিষয়-সংস্কার বা বিষয়াকার-রহিত বিমল জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে, তাঁহাদের মতে সেই বিমল জ্ঞানই মুক্তি। বৌদ্ধমতে মুক্তির অপর নাম মহোদয়।

(৩) জৈন মত—তাহার মতে জ্ঞানজ সংস্কার ও কর্ম্মের নিবৃত্তি হইলে আত্মার ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিতির নাম মুক্তি। কোন কোন জৈন মোক্ষাবস্থায় আত্মার সুখ স্বীকার করেন।

(৪) রামানুজ ও পূর্ণপ্রজ্ঞ মত—ইঁহারা উভয়ই বৈষ্ণব, ইহাদের মতে বিষ্ণুর সহিত এক লোকে অবস্থানই মুক্তি, মুক্ত ব্যক্তি তৎসময়ে জগৎ সৃষ্টি ব্যতীত সকল বিষয়েই বিষ্ণুর মত ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকেন।

আবির্ভবন্তি কল্যাণাঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদয়ো গুণাঃ এবং গুণাঃ সমানাঃ স্যুর্মুক্তানামীশ্বরস্য চ। সর্ব্ব-কর্ত্তৃত্বমেবৈকং তেভ্যো দেবে বিশিষ্যতে॥ (পাঞ্চরাত্র রহস্য) মুক্ত পুরুষের সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি কল্যাণময় গুণ

সকল আবির্ভূত হইয়া থাকে। ঈশ্বর ও মুক্ত পুরুষের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ সমান হইলেও একমাত্র সর্ব্ব কর্তৃত্ব ঈশ্বরেই থাকে। মুক্ত পুরুষে তাহা থাকে না। ঐ সময়ে মুক্ত ব্যক্তির অবিনাশী সুখ হয় এবং মুক্ত ব্যক্তি সে সময়েও বিষ্ণুর সেবা করিতে থাকেন।

(৫) মাহেশ্বর মত—ইঁহাদের মতে মহেশ্বরের নিকটে অবস্থিতিই মুক্তি। এই মতে মুক্তাবস্থায় কোনরূপ দুঃখ থাকে না। এবং মুক্তাত্মা ঈশ্বরের কোনরূপ সেবা করেন না।

"মুক্তাত্মানোঽপি হি শিবাঃ কিন্তু তে তৎপ্রসাদতো মুক্তাঃ। সোঽনাদি মুক্ত একো বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চমন্ত্রতনুঃ"। (তত্ত্বপ্রকাশ)

সকল মুক্তাত্মাই শিব, কিন্তু তাহারা সেই শিবের (ঈশ্বরের) অনুগ্রহে মুক্ত হইয়াছেন। তিনি (শিব) অনাদি মুক্ত এবং পঞ্চমন্ত্রময় শরীরধারী, অর্থাৎ তাহার প্রাকৃতিক শরীর নাই।

মাহেশ্বরদিগের মধ্যে চারি মত প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে (১) নকুলীশ পাশুপত, (২) শৈব, (৩) প্রত্যভিজ্ঞা এবং (৪) রসেশ্বর মত। ১ম ও ২য় মাহেশ্বর মতে মুক্তাত্মা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, এবং মুক্ত পুরুষ প্রাকৃত শরীরধারী নহেন। তৃতীয় মাহেশ্বর—ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞাবাদী—তাঁহার মতে মুক্ত পুরুষ ও ঈশ্বরের তাদাত্ম্য স্বীকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের "সোঽহং" আমিই সেই ঈশ্বর, এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। জীব ও ঈশ্বরের তাদাত্ম্য সম্বন্ধে আগমাধিকারে উক্ত হইয়াছে—

"তদৈক্যেন বিনা নাস্তি সংবিদাং লোক পদ্ধতিঃ প্রকাশৈক্যাত্তদেকত্বং মাতৈকঃ স ইতি স্থিতঃ।"

ঈশ্বর এক এবং স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ, আমরা যে সকল লৌকিক জ্ঞান অনুভব করিয়া থাকি, সে সকল ঈশ্বররূপ জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। বিষয়াংশ পরিত্যাগ করিলে সকল জ্ঞানই স্বপ্রকাশ রূপে পরিস্ফুট হয়, অতএব সর্ব্বজীব সাধারণ, সেই প্রমাতা এক; ইহাই স্থিরীকৃত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। প্রত্যভিজ্ঞ-দর্শনের মতে মুক্তাত্মাসকল ঈশ্বর-ভাবাপন্ন হন এবং তাঁহারা জাগতিক সকল পদার্থকে নিজ হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। তত্ত্বার্থসংগ্রহে কথিত আছে যে—

"মেয়ং সাধারণং মুক্তঃ স্বাত্মাভেদেন মন্যতে মহেশ্বরো যথা বদ্ধঃ পুনরত্যন্তভেদবৎ।"

যেরূপ মহেশ্বর জগতের সমুদয় প্রমেয়কে নিজ হইতে অভিন্ন মনে করিয়া থাকেন, সেইরূপ মুক্তাত্মাও জগতের সকল প্রমেয়কে নিজ হইতে অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু বদ্ধ পুরুষগণ সেরূপ মনে করেন না, তাহারা সকলকে ভিন্ন বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। এই প্রত্যভিজ্ঞাবাদিগণ বিদেহ (দেহরহিত) মুক্তি স্বীকার করেন।

চতুর্থ মাহেশ্বর মত, তাহা রসেশ্বরদর্শন নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহারা মুক্তি সময়ে আত্মার শরীর স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, মুক্তি সময়ে জীবের ঈশ্বর-ভাব হয়, কিন্তু শরীর না থাকিলে সে ভাব অনুভব করা যাইতে পারে না। সে জন্য মুক্তিসময়েও শরীর স্বীকার করা কর্ত্তব্য। ইঁহারা বিদেহ (দেহশূন্য) মুক্তি স্বীকার করেন না। মাত্র জীবন্মুক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। জীবন্মুক্তি সময়ে জীবের ঈশ্বর-ভাব অনুভবের জন্য, যে

শরীর থাকে, তাহা অবিনশ্বর 'আয়ুর্ব্বেদোক্ত সংশোধিত পারদাদি দ্বারা শরীরের অক্ষয়ত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে। মুক্ত পুরুষের শরীর থাকা সম্বন্ধে রসার্ণবে উক্ত হইয়াছে যে—

"ষড়দর্শনেঽপি মুক্তিস্তু দর্শিতা পিণ্ডপাতনে
করামলকবৎ সাপি প্রত্যক্ষেণোপলভ্যতে।
তস্মাত্তং রক্ষয়েৎ পিণ্ডং রসৈশ্চৈব রসায়নৈঃ।„

বৈশেষিকাদি ষড়দর্শনে শরীরপাতের পরে মুক্তি হয়, এইরূপ কথিত হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ মুক্তি, হস্তস্থিত আমলক ফলের মত প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হইতে পারে না। অতএব প্রত্যক্ষভাবে সেই মুক্তির অনুভব করার জন্য, পারদরূপ রসায়ন দ্বারা শরীরের রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

(৬) বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক মত—ইঁহা-দের মতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির নাম নাম মুক্তি। দুঃখের যেরূপ নিবৃত্তি হইলে আর কখনও কোনরূপ দুঃখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ দুঃখ নিবৃত্তিকে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বলা যায়। এই উভয় মতেই বিদেহ মুক্তি সময়ে আত্মার জড়তা স্বীকৃত হইয়া থাকে। ইঁহারা জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি উভয়ই স্বীকার করেন। কিন্তু জীবন্মুক্তি অবস্থায় যে শরীর থাকে, তাহার বিনাশ স্বীকার করিয়া থাকেন।

(৭) সাংখ্য মত—ইঁহাদের মতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মুক্তি। ইঁহারা জীবন্মুক্তি ও বিদেহ-মুক্তি স্বীকার করেন। কিন্তু বিদেহ-মুক্তি সময়ে আত্মার জড়তা স্বীকার করেন না। তখনও আত্মার জ্ঞানরূপতাই স্বীকার করেন।

(৮) পাতঞ্জল মত—এই মতে নির্ব্বিকার ভাবে, জ্ঞানরূপে আত্মার অবস্থানই মুক্তি। "মুক্তির্হিত্বান্যথা ভাবং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" প্রকৃতিসংযোগ জন্য বিকার ভাব পরিহার পূর্ব্বক জ্ঞানস্বরূপে অবস্থানই মুক্তি।

(৯) মীমাংসক মত—এই মতে অবিনশ্বর সুখভোগই মুক্তি নামে অভিহিত হইয়াছে। ইঁহাদের মতে যাগ প্রভৃতিই মুক্তির কারণ, আত্মজ্ঞান মুক্তির কারণ নহে। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ যেমন মুক্তি সময়ে আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করেন, ইঁহারা সে রূপ বলেন না। তাঁহাদের মতে মুক্তি সময়েও জগতের অস্তিত্ব থাকে, এবং মুক্তি সময়ে আত্মা, যে সুখ উপভোগ করেন, সে সুখ আত্মা হইতে ভিন্ন, বেদান্তাদ্বৈতবাদা-নুসারে সেই সুখ আত্মস্বরূপ।

(১০) অদ্বৈতবাদী বেদান্ত ও পাণিনি মত —ইহারা বলেন ব্রহ্মানন্দ লাভ এবং দুঃখ-নিবৃত্তি,উভয়ই মুক্তি। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে "ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি," "তরতি শোক-মাত্মবিৎ" ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মস্বরূপ হন। আত্মজ্ঞানী শোক অর্থাৎ দুঃখ উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদিগণ আত্মার সৎ চিৎ ও আনন্দ-রূপতা স্বীকার করেন। অজ্ঞানের আবরণ প্রযুক্ত সকল সময়ে আনন্দরূপতার অনুভব হয় না। আত্মজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের বিনাশ হইলে, সেই আত্মস্বরূপ সুখ বা ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধ হইতে থাকে। এবং মুক্তি সময়ে আত্মা ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। এক-মাত্র আত্মাই অদ্বিতীয় ভাবে অবস্থিত থাকেন।

শ্রীগুরুচরণ তর্কদর্শন তীর্থ।

বিদুলা-সঞ্জয়-সংবাদ।

(মহাভারত হইতে গৃহীত)

বিদুলা ও সঞ্জয়।

সঞ্জয়—

কেন মা কালিমাময় হেরি ও বদন ?
ক্ষুণ্ণ কি গো পরাজয়ে ? পরাক্রান্ত অরি
ছত্রভঙ্গ করি বল, দিয়েছে আমায়
মা গো রণস্থল হ'তে খেদাইয়ে বলে।
রাখিতে পরাণ মোর, ত্যজি আশাহীন
নিষ্ফল বিরোধ, আসিতে হ'ল মা আজি
পলাইয়ে ; এবে শ্রান্ত দেহ, ক্ষুব্ধ হিয়া
জুড়াইল শ্রীচরণ করিয়ে দর্শন।
বড় ভাগ্যে মা তোমার, এসেছি বাঁচিয়া !
জয় পরাজয় নিত্য সমরপ্রাঙ্গণে ;
ক্ষুব্ধ কেন তার লাগি ? জননী আমার,
পেয়েছ আমারে ফিরে এই ভাগ্য গণি !

বিদুলা—

হীনপ্রাণে নীচ সম শিখেছিস্ বাণী
কুলাঙ্গার ! ভাগ্যে মোর এসেছিস্ ফিরে ?
ঢেকে ফেল্ ঢেকে ফেল্ কলঙ্কমণ্ডিত
কুৎসিৎ বদন তোর মোর আঁখি হ'তে,
নহে মোর মর্ম্মভেদী নয়নের জ্বালা
অতিতীক্ষ্ণ অসহন নারিবি সহিতে।
রে বর্ব্বর ! কেন বহ ঘৃণিত জীবন ?
জন্মি ক্ষত্র কুলে তুই, আশীবিষ সম
নাহি দংশি অরাতিরে, কুক্কুরের প্রায়
পলা'য়ে আনন্দে এত হয়েছ অধীর ?
হাসে যার শত্রুকুল জয় গর্ব্বোল্লাসে
সে কোন্ লজ্জায় বদন দেখাতে চায়
জগত মাঝারে ? ভুলি নিজ মর্য্যাদায়
সে কোন্ লজ্জায় গৃহকোণে পশে আসি
নিশ্চিন্ত হৃদয়ে ? তোর কাজে ভাবি মনে
আমি কি ধরেছি তোরে আমার জঠরে ?
বিধিবিড়ম্বনে আসি অঙ্গার জন্মিল
সুবর্ণ খনির গর্ভে ? দিল মাধবিকা
কিংশুকে জনম ? বায়স আসিল কিয়ে
কোকিলার নীড়ে ? হায় ! কত ছিল আশা
উজ্জ্বল হবে রে মুখ তব বীর্য্যবলে,
বীর-প্রসবিনী খ্যাতি জাগিবে জগতে,
দ্বিগুণ উজ্জ্বল হ'বে পিতার গরিমা।
বড় আশে কুলাঙ্গার !—বীরাঙ্গনা আমি,
অঙ্গের শোণিত দানে পালিনু যে তোরে—
হেরিতে কি তোর শুধু অপকীর্ত্তিরাশি ?
অর্জ্জিতে জগতমাঝে অতি অসহন
কাপুরুষ-ধাত্রী নাম ? কেন, হায় ! যবে
অকলঙ্ক শিশু মুখে, রে কুলঘ্ন, তোর
অর্পিতাম প্রীতিভরে স্তন্য পয়ঃবাহী,
সে ক্ষীর হ'ল না মোর গরলের ধারা ?
তা হ'লে তো আজি এই কলঙ্ক কালিমা
দেখিতে হত না তোর অনিন্দ্য বদনে ;
অনাঘ্রাত ফুলকলি যেত শুকাইয়া
সৌরভবিহীন প্রাণ লভিবার আশে।
কোন্ পাপে, হে বিধাতঃ, অভাগীর ভালে
লিখেছিলে এত জ্বালা ? যার মুখ চেয়ে
এত দিন তুচ্ছ প্রাণ রাখিনু এ ভবে'
সর্ব্বস্ব হারায়ে মোর—সেই আজি মোরে
জীবনের সাধ হ'তে করিল বঞ্চিত।

সঞ্জয়—
মা আমার, আমি তব অঞ্চলের নিধি,
একমাত্র রত্ন কোলে, একটি প্রদীপ
তব এ আঁধার ঘরে, সেই ভাবি মনে
পরাজয়ে রণরঙ্গে না সঁপি জীবন
এসেছি তোমার কাছে, তোমার অঙ্কেতে
লয়েছি আশ্রয় তাই,—কেন দাও গালি ?
কেন তবে চ্যুত করি সুধাক্রোড় হতে
নীরস হৃদয়ে মোরে দিবে ফেলি দূরে ?
কোন্ অবলম্ব ল'য়ে রহিতে জগতে
মরণে বরিলে আমি ? হৃদয় তোমার
কোমল মৃণাল সম, মৃত্যু মোর তারে
মত্ত মাতঙ্গের বলে পীড়িত, জননী !
কেমনে বাঁচিতে তুমি নিষ্ঠুর পেষণে ?
বিহুলা—
আরে মৃত্যু-ভীত ! আপনার হীনপ্রাণ
ভেবেছ মায়ার পথে করি সঞ্চারিত
মোর দৃপ্ত হৃদে তুমি, লক্ষ্যভ্রষ্ট মোরে
পারিবে করিতে ? স্নেহের দোহাই দিয়ে
নিজের ক্ষুদ্রত্ব চাহ ঢাকিয়া ফেলিতে ?
বৃথা সে সাধনা তব। বৃথা ভাব মনে
স্নেহবশে হ'বে মোর হৃদি বিপ্রকৃত।
তুই কি বুঝিবি মোর স্নেহের মহিমা—
রে অবোধ, হীনমতি ? ভ্রান্ত হিয়া ল'য়ে
নারিবি বুঝিতে মোর হৃদয়ের প্রথা।
কূপোদকবাসী ক্ষুদ্র ভেক পারেনা ক'
বুঝিবারে সাগরের বিরাট বিস্তার।
পারিবি না বুঝিবারে কত স্নেহপ্রীতি
ধরে মোর হিয়া। কর্ত্তব্যবিবেকহীন
যে অভাগা, তবে সে কি নিজ হৃদিমাঝে
স্নেহের পবিত্ররূপ পারে ধরিবারে ?
মৃত্যুভয় দেখাও আমারে ? আজি যদি
সমরপ্রাঙ্গণে বিজয়লক্ষ্মীর কৃপা
না পারি লভিতে, ক্ষত্রিয় কুমার তুই,
বক্ষ পাতি ধরিতিস্ সমর-মরণে,—
মৃত্যু হ'ত পরাজিত, লভিতিস তবে
প্রাণ দিয়ে বিশ্বমাঝে অনশ্বর প্রাণে।
প্রতি অস্ত্রলেখা, হৃদয় সমুদ্র মোর
করিয়া মন্থন, তুলিত যে স্নেহসুধা,
সে সুধা পিয়ায়ে চির অমৃতত্ব তোরে
করিতাম দান, অনন্ত জীবন তোর
জীবনবিহীন দেহে হ'ত প্রতিষ্ঠিত।
এবে তোর মূল্যহীন প্রাণ কোন্ লাজে
দিতে চাস্ মোর পায়ে ? চরণদলিত
পত্র-পুষ্পে চাস্ তুই পূজিতে দেবতা ?
তুচ্ছ জীবনের তরে পিতৃ মর্য্যাদায়
অতল সলিল মাঝে দিলি ডুবাইয়া,
চির-মৃত্যু আহ্বানিলি মরণের ভয়ে ?
জীবনের যে মুহূর্ত্ত অনায়াসে তোর
অনন্ত মুহূর্ত্ত হ'ত, আজি শুধু তাহা
অনন্ত অকীর্ত্তিকর হ'ল সর্ব্বনাশী।
গেল মান, তুচ্ছ প্রাণ শব সম দেহে
রাখিবি কি আশে ?
সঞ্জয়।
এত স্নেহ যদি মা হৃদয়ে
এই অভাগার প্রতি, তবে কেন চাহ
ধ্রুব মৃত্যুমুখে মোরে প্রেরিতে আগ্রহে ?
বধি মোরে দিবি কারে সে স্নেহের রাশি ?
শূন্য নগ্ন হৃদি লয়ে বাঁচিবি কেমনে ?
অতৃপ্ত রবে মা তোর সুধারাশি মোরে
পিয়াবার তীব্র আশা, যদি যাই চলে
অকালে হারায় মোর নবীন জীবন।
বিহুলা—
কারে তোর নীচ মুখে ডাক বারে বারে

মা বলিয়ে? আমি তোর নহিয়ে জননী।
তোর কদাচারে দুষ্ট স্নেহ মোর হৃদে
হয়েছে গরল রাশি, সে বিষের দাহ
মৃত্যুভীত কাপুরুষ নারিবি সহিতে।
অমৃত দেবের ভোগ্য, দানবের ভালে
কালকূট। স্নেহ মোর নহে, তোর মত
কর্ত্তব্যবিমুখ হীন ঘৃণিতের তরে।
স্নেহের পেটিকা মাঝে ভেবেছিস্ বুঝি
পূরে রেখে শিখে ধরি ফিরিব অধমে?
ফেলে দিব খুলে দূরে মহিমামণ্ডিত
কিরীট মস্তক হ'তে, বহিতে আদরে
কুৎসিৎ আয়সে শিরে? সিংহিনী হইয়ে
যতনে ধরিব বুকে ফেরুর শাবক?
বজ্রদগ্ধ তরুমূলে অজস্র ধারায়
ঢালিব নিস্ফল রসে? ক্ষত্রিয় ললনা
হেন হীন স্নেহ লয়ে জনমে না ভবে।
আজি হ'তে তোর ফুরাল সংসার মাঝে
জননীর স্নেহ—রহিল যা, মরীচিকা,—
দুস্তর মরুর মাঝে প্রবাসীর প্রাণে
বিফল তৃষ্ণার শান্তি আশা-প্রদায়িনী।

সঞ্জয়—

হতভাগ্য আমি, হারাব মুহূর্ত্তে কি গো
সকলি এ ভবে? এর চেয়ে ছিল না কি
মৃত্যু শ্রেয়ঃ! মৃত্যুশ্রেয়ঃ? নব মুকুলিত
বাসনা কুসুমকলি নিষ্পেষিত করি
এ নব জীবনে, জীর্ণ মরণ কঙ্কালে
ছুটে গিয়ে বাঁধিব কি অভেদ্য বন্ধনে?
এই তো উঠেছে সবে গগনের ভালে
সুধাকর গণে বাঁধি তারকার মালা;
প্রদোষে, কি দোষে হায়! এত সুখময়ী
রজনী ফুরায়ে যাবে, দেখা দিয়ে শুধু?
না না মা কোমল হিয়ে কঠিন ক'র না

স্নেহে দিয়ে জলাঞ্জলি; বৃন্তচ্যুত করে
স্নেহের প্রসূনে তব দ'ল না চরণে।
করাল মূরতি ত্যজি মা হ'য়ে আবার
মেমে এসে লহ পুত্র শ্রী তমাখা মুখে
অভয়ে! অভয় দিয়ে রাখ রাঙা পায়ে।

বিদুলা—

এখনও এখনও, ভ্রান্ত, মৃত্যু-বিভীষিকা
ঘুচিল না তব? এখনও ফিরিতে চাহ
সংসারের ঘনঘোর বিপিনের মাঝে
কোন আশে পুত্র মোর? অমৃত নির্ঝর
অবহেলি মৃগতৃষ্ণা চাহ ধরিবারে?
চাহ যদি মোর স্নেহ, সিংহিনীর শিশু!
সিংহের বিক্রমে, জয়াজয় তুচ্ছ করি
কর আক্রমণ বীরদম্ভে শত্রুকুলে।
ভীমা ভুজঙ্গিনী হেরি মন্ত্রমুগ্ধ যথা
পক্ষীকুল পড়ে লুটি, লুটিবে তেমতি
অরি তোর হেরি তব ভীষণা শকতি।
হায় জিন যাও রণে বীরেন্দ্র-বিক্রমে;
জন্মিলে এ ক্ষুদ্র দেহ অবশ্য ভাঙ্গিবে,
তবে কেন এ দেহের অলীক মমতা?
আর, যদি হেয় প্রাণে হেয় বাসনার
দাস হ'য়ে অমরত্ব ভুলে মৃত্যুভয়ে
থাকিস লুকায়ে গৃহ কোণে, পলে পলে
শতবার হীনমৃত্যু মরিবি জীবনে।
তুমি যদি নাহি যাও কর্ত্তব্য সাধনে
রণরঙ্গিণীর বেশে নিজে যাব আমি।
ঝলসি চপলা সম আকস্মিক তেজে
শত্রু শিরঃ নিভে যাবে কাল মেঘ মাঝে;
নিভে যাবে এ জগতে আশার প্রদীপ
তোর ভালে। আরে ভ্রান্ত! বৃথা দ্বিধা ত্যজি
চল চল বীরসাজে, আকুল আহ্বানে
ডাকিছে কর্ত্তব্য তোরে, চল ত্বরা করি।

চল যাই দোঁহে যথা দামিনীর সাথে
নির্ম্মম অশনি ছোটে মহা মহীরুহে
চূর্ণ দীর্ণ দগ্ধ করি প্রলয় হুঙ্কারে।
মরি যদি কিবা ক্ষতি? ফিরে যদি আসি
গর্জ্জনান্তে বরষিব সহস্র ধারায়
সুধাসম বারি রাশি তোর ক্লান্ত হৃদে।

সঞ্জয়—
থাক থাক এ দেউলে দেবতা আমার
বরাভয়-প্রদায়িনি! প্রচণ্ড শকতি
করিয়াছ সঞ্চারিত হৃদয়ে জননি!
দাও শিরে পদধূলি, চলিনু এখনি
পশিতে সমরে; চূর্ণি অরাতির শির,
ফিরে এসে যোগ্য হস্তে বন্দিব চরণ!

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

তারা।

১

চাষার ঘরে এমন সুন্দর মেয়ে কেহ কখনো দেখে নাই। প্রভাতে সোণার মত সূর্য্যের আলো যেমন করিয়া ক্ষীণ অবকাশ-পথে নিবিড় বনের ঘনান্ধকার বক্ষের উপর ক্ষণেকের জন্য আসিয়া পড়ে, এই স্বর্গের জ্যোতিকণা তেমনি করিয়া বুঝি দরিদ্র হারাধনের অন্ধকার কুটিরে পথ ভুলিয়া আসিয়াছিল!

হারাধন আদর করিয়া কন্যার নাম রাখিয়াছিল—তারা। তারা নৈশাকাশে তারারই মত হারাধনের আঁধার ঘরে দিন রাত্রি ঝক্ মক্ করিত।

হারাধন ও তাহার পত্নী ভবসুন্দরী গুরুতর কর্ম্মের মধ্যে যখনই অবকাশ পাইত, একবার ছুটিয়া আসিয়া তারার কুসুমপেলব মুখখানি সতৃষ্ণ নয়নে দেখিয়া যাইত। তারা কাঁদিতে জানিত না। সে যেখানে থাকিত তাহার আয়তলোচনের স্নিগ্ধরশ্মি সেই স্থানকেই অমৃতময় করিয়া রাখিত। যে দেখিত সেই বলিত "মেয়ে যেন সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী।"

কিন্তু হায় "হাদে লক্ষ্মী, লক্ষ্মীছাড়া!" তারার পিতামাতা অনুরক্ত হৃদয়ের পরিপূর্ণ স্নেহরস দানে তারাকে পরিপুষ্ট করিতে করিতে এক দিন অন্ধকার নিশীথে নিঃশেষিত-রস তরুর মত সংসারারণ্য হইতে উৎপাটিত হইলেন। নিদারুণ বিসূচিকা শুধু দয়া করিয়া তারাকেই ফেলিয়া গেল।

তারা তখন নবমবর্ষীয়া বালিকা। ক্ষুদ্র মুকুল ফুটিবার পূর্ব্বেই হরিত শাখার স্নেহান্তরাল হারাইল। তারার পিতার কিছু জমি-জমা ছিল। তারার পিতামাতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তারার এক মাসী শোকে অধীর হইয়া স্বামী-পুত্র সমভিব্যাহারে গ্রামান্তর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারার এই বিপদের সময়ে কি তাহার মাসী স্থির থাকিতে পারেন? যত দিন ভগ্নী জীবিত ছিলেন, তত দিন কোন খোঁজ-খবর লওয়ার আবশ্যক হয় নাই। কিন্তু মাতৃহীনা

কন্যার এই দুঃসময়ে কি আর নিশ্চিন্ত থাকা যায়! কিন্তু আমরা সত্য কথা বলিব, এখন আর মাসী ছাড়া তারার আপনার কে আছে? তারার মাসী অপেক্ষা মেসোর সহানুভূতিই কিছু অধিক! নিজের লোক-জন থাকিতে সেই দুখের মেয়ে তারা—দেখা শুনার অভাবে—কষ্ট পাইবে? না, তা কিছু-তেই হইতে পারে না। তারার মেসো পুরুষানু-ক্রমের পুরাতন বাস্তু ভিটা এবং পিতৃপুরুষের কৃত, অধুনা জীর্ণ ভগ্ন ঘরগুলি এবং কাংস্য ও মৃত্তিকার তৈজস পত্রের মায়া পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে তারার পিতৃগৃহে উপনীত হইলেন। মেসো ও মাসী প্রথম প্রথম কয়েক দিনে তারার প্রতি সস্নেহ ব্যবহারে, গ্রামবাসীদের সহিত আলাপ-আপ্যায়নে, এবং আত্মীয়তায় সকলেরই মন অধিকার করিল। তারার একটা গতি হইল ভাবিয়া সকলেই যেন নিশ্চিন্ত হইল। এ দিকে সাধারণের মনের সঙ্গে সঙ্গে তারার মেসো তারার পৈত্রিক সমস্ত সম্পত্তিও অধিকার করিয়া বসিল,ক্রমে মেসো ও মাসীর নিজমূর্ত্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। তারা 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হইল! ইহাদের সংস্পর্শে বেচারী যেন দিনে দিনে স্পর্শকাতর লজ্জাবতীর মত নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে লাগিল। সে বসন্তের মুকুল যেন করকাঘাতে ভূমিতলে পড়িয়া দিনে দিনে শুকাইতে লাগিল। তারার পেশীবহুল মেসো মহাশয়ের হাঁকডাক এবং তাহার নবাগত ভ্রাতাভগিনী-গণের লম্ফঝম্ফ তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। তারার দেবতার মত মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া, কুৎসিৎ পুত্রকন্যার জননী তারার মাসী বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার সে অসন্তোষের তীক্ষ্ণকণ্টক তারার কোমল বক্ষকে সর্ব্বদাই বিদ্ধ করিতে লাগিল।

২

তারা অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই এই হীন পরিবারের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারিল না। ছেলেরা পাঁক ও কাদা লইয়া মাতামাতি করিয়া বেড়ায় এবং মেয়েরা কুৎসিৎ ভাষায় পরস্পরকে গালাগালি দেয় ও মারামারি করে, তারা কেমন করিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগদান করে? সে দূর হইতে বড় বড় চক্ষু মেলিয়া এই অসংযত উপদ্রব দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যাইত।

তারার মাসী সর্ব্বদা তাহাকে শাসাইতেন "দেখো, দেখো, এত তেজ থাক্‌বে না।"

তারা এ অনুযোগের হেতু কিছু খুঁজিয়া পাইত না, অনির্দ্দিষ্ট ভয়ে সে শুধু শুকাইয়া যাইত।

সুশীলা তারাকে গ্রামের সকলেই স্নেহ করিতেন, তাহার ম্লান মুখ এবং অশ্রুসিক্ত চক্ষু দেখিয়া অনেকেই তাহাকে আপনার গৃহে ডাকিয়া লইয়া গিয়া তাহার মাসী মাতা ও মেসো মহাশয়ের ব্যবহারের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। তারা কিছুই বলিতে পারিত না। শুধু ছল ছল চক্ষে তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। কোন দিন বা এক ফোঁটা অশ্রু সেই শান্ত চক্ষুর প্রান্ত বহিয়া নীরবে গড়াইয়া পড়িত। দেখিয়া সকলেই সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন, কেহ বা রুষ্ট হইয়া বলিতেন "তারার বাপের বিষয় খেয়েই মানুষ, তবু হতভাগারা মেয়ে-টাকে একটু যত্ন করে না।" এ সকল

অপ্রিয় উক্তি কিরূপে তারার মাসীর কর্ণগোচর হইত, সে এক জটিল প্রহেলিকা।

কিন্তু যে দিন এই সকল মন্তব্য প্রকাশিত হইত, সে দিন আর তারার লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না—সে দিন গ্রামস্থ সমুদয় জীবিত নরনারীর সঙ্গে তারার স্বর্গগত পিতামাতা পর্য্যন্ত মহাসমারোহে অভিনন্দিত হইতেন। তারার মেসো মহাশয়কে ভগবান তাহার মাংসপেশীর ঠিক বিপরীত অনুপাতে মস্তিষ্ক দান করিয়াছিলেন, প্রিয়তমা পত্নীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে এক এক দিন গর্জ্জন করিয়া বলিত "বটে! এত তেজ? এক দিনে মেরে 'গোব্ড়েন' করে দেব না!" এবং সে এত দিন "কথায় যা বলিত তা দেখাইত—কাজে", কিন্তু তারার মাসী জানিত সে "চাষার মরদের লাঠি খাইলে সুকুমারী তারার প্রাণহানি ঘটা বিচিত্র নহে। কাজেই কর্ম্মবীর স্বামীকে বহু কষ্টে সে হস্তচালনা হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাখিত।

৩

কিন্তু কিছু একটা করা প্রয়োজন হইয়া উঠিল। বৎসর অতীত হইতে না হইতে তারার মাসী একদিন সভয়ে শুনিল যে গ্রামের লোকে তারার পিতার বিষয় তাহাদের হাত হইতে কাড়িয়া লইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে। তারার মেসো গোবিন্দের একটি অনুগত ভাগিনেয় ছিল। ভাগীনেয়টি নামে গণেশ এবং রূপে ও গুণে "নরাণাং মাতুলক্রমঃ।" তাহার 'জমি-জারত' 'বাসবাগিচা' কিছু কিছু থাকা সত্বেও, কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি অজন্মা ইত্যাদি কারণে গণেশ ত্রিশ বৎসর বয়সে গৃহশূন্য হইয়া শূন্য গৃহ পূর্ণ করিতে পারে নাই। তাহার হিতৈষী মাতুল ও মাতুলানী তাহারই সঙ্গে তারার শুভ বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিলেন। বংশলোপভয়ে ভীত গণেশ সুন্দরী পাত্রীর লোভে তারার বিষয় সম্বন্ধে সমস্ত দাবি পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইল ও মাতুল গোবিন্দ দয়াপরবশে মাত্র কিছু উপস্বত্ত বৎসরে বৎসরে দিবার বন্দোবস্ত করিল। প্রতিবেশিগণ সম্বন্ধের কথা শুনিয়া উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তারার মাসী 'মন্ত্র-গুপ্তি' ও কুটবুদ্ধির প্রভাবে তাহাদের সমস্ত উদ্যোগ পণ্ড করিয়া দিলেন।

আষাঢ়ের শুভ বাসরে তারার সঙ্গে গণেশের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। আরক্ত চক্ষু স্বামীর যমদূতের মত মূর্ত্তি দেখিয়া তারা সভয়ে চক্ষু মুদিল।

৪

দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিতে না করিতে তারা স্বামীগৃহে নীত হইল। সহসা গৃহস্থালীর ভার পাইয়া অশিক্ষিতা তারা বিষম বিপদে পড়িল। তারার পিতামাতা স্নেহময়ী কন্যাকে কোন কাজ করিতে দিতেন না, তারার মাসীও আক্রোশবশতঃ তাহাকে কোন দ্রব্য স্পর্শ করিতে দেন নাই, কাজেই পরীক্ষার দিনে তারা পদে পদে বিপন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। অঙ্গনে গোময়ের প্রলেপ দিতে তারার চাঁপার মত অঙ্গুলি ফাটিয়া রক্ত পড়ে, আগুন ধরাইতে তাহার বিশাল চক্ষুতে জলের স্রোত বহিয়া যায়, ঘাট হইতে জল আনিতে তাহার সামর্থ্যে কুলায় না, তারা কি করিবে ভাবিয়া পায় না।

সুন্দরী কিশোরী ভার্য্যার দুরবস্থা দেখিয়া গণেশ প্রথম প্রথম তাহাকে যথাসম্ভব সাহায্য করিত। কিন্তু অধিক দিন সে নিজের সংকল্প রক্ষা করিতে পারিল না—'মিসিরঞ্জিতদশনা কৃষকগৃহিণীকুলে'র তীব্র পরিহাস-বাণী তাহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল।

যে দিন প্রতিবেশিনীগণের বাক্যবাণ স্থূলবুদ্ধি গণেশকে অধিক পরিমাণে বিদ্ধ করিত, সে দিন সে ধৈর্য্য হারাইয়া হুঙ্কার করিয়া তারার উদ্দেশে বলিত, সেবা করিবার জন্য সে তাহাকে গৃহে আনে নাই। কিন্তু তাহাতে ফল বিপরীত হইত, যে দিন তারা স্বামীর নিকট তাড়না সহ্য করিত সে দিন তাহার ক্রটির পরিমাণ অসম্ভব রূপে বাড়িয়া যাইত। উত্তেজিত গণেশ ক্রোধান্ধ হইয়া মনে করিত, তারাকে প্রহারের দ্বারা রীতিমত শিক্ষা দেয়, কিন্তু তাহার সকরুণ দৃষ্টি এবং কুসুমপেলব শরীর দেখিয়া তাহার মায়া হইত—প্রহার করা ঘটিয়া উঠিত না।

আজ গণেশ নিজগৃহে আহারের একটু বিশেষ রকম আয়োজন করিয়াছিল, আজ কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাহার গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। গণেশ বিশেষ করিয়া তারাকে শাসাইয়া গিয়াছিল, আজ কোন ক্রটি হইলে তারার আর 'রক্ষা থাকিবে না।' তারা ভয়ে ভয়ে রন্ধনাদি করিতেছিল। গণেশ বাহিরের ঘরে বন্ধুবান্ধবদের লইয়া আমোদ-প্রমোদে মগ্ন ছিল। রন্ধনাদি প্রায় সম্পন্ন হইয়া আসিয়াছিল, মাংসপাত্র নামাইলেই মোটামুটি রন্ধনকার্য্য সমাপ্ত হয়। তারা অত্যন্ত সাবধান হইয়া মাংস পাত্র নামাইতে গেল। ভাল করিয়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া প্রাণপণ শক্তিতে সে পাত্রের গলদেশ চাপিয়া ধরিল। ধরিয়া নামাইতে যাইবে, এমন সময়ে একটা বৃহৎ কুক্কুর লম্ফ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। করিবামাত্র চকিত তারার অঙ্গনিবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া রন্ধনপাত্র সশব্দে মাটিতে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল। তারা ভয়ে পাণ্ডুর হইয়া উঠিল।

শব্দ শুনিয়া 'খাঁটি'-সেবিত গণেশ ছুটিয়া ভিতরে আসিল। আসিয়া দেখিল তাহার সযত্নে আহৃত মাংসখণ্ড চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে এবং তারা পাণ্ডুর মুখে পাষাণ-প্রতিমার মত তাহার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। পান-বিহ্বল গণেশ আজ আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিল না। এক হস্তে তারার গ্রীবা ধারণ করিয়া "খিড়কির" দ্বারের নিকটে লইয়া গিয়া পদাঘাতে তাহাকে বাটির বাহিরে দূরে নিক্ষেপ করিল। বলা বাহুল্য সে রাত্রে বন্ধুবর্গের আহারাদির তেমন সুবিধা হইল না। গণেশ আদরে আপ্যায়নে, গল্পে ও গানে, পানে আহারের ক্রটি মোচন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কাজেই তারার সংবাদ লইবার সে রাত্রে আর তাহার অবকাশ হইল না।

গণেশ তারাকে খিড়কির বাহিরে দিয়া আসিবার পর তারা অনেকক্ষণ "আড়ষ্ট" হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর কি মনে করিয়া কতকটা রমণী-সুলভ আশঙ্কা, কতকটা বা সাধারণ ভয়ের তাড়নায় সে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে খিড়কি বন্ধ করিয়া দিল। তারা সহজে

ভীরু—স্বভাবে মৃদু—লজ্জাবতী লতার মত সে পরুষস্পর্শে মুদিয়া আসে। আজিকার গণেশের এই অমানুষিক ব্যবহারে—পাশব আচারে—সে ভয়ে ঘৃণায় শরমে মরমে মরিয়া গিয়াছিল, তাহার বুকের ভিতর হইতে যেন একটা "কাঁপুনি" উঠিতে লাগিল, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, দাওয়ায় বসিল, বসিয়া বসিয়া শুইয়া পড়িল। তার পর প্রবল জ্বর, জ্বরের দাহে দেহ জ্বলিতে লাগিল, পিপাসায় যেন ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল। সে যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া তারা অনেক কষ্টে উঠিয়া কলসীর জল আকণ্ঠ পান করিল, কিন্তু তৃষ্ণা কমিল না; আবার—আবার—কতবার সে জল খাইল, তবু সেই যেন মরুভূমে বারি বিন্দু! পীড়া কঠিন হইতে কঠিনতর দাঁড়াইল।

বেলা প্রায় দশটার সময় গণেশের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন নেশা ছুটিয়াছে, সহসা তার তারার কথা মনে পড়িল, ছুটিয়া খিড়কির পথে যাইতে দাওয়ায় ভূমিশয্যায় শায়িতা, আলুথালুবেশা তারাকে ছট ফট করিতে দেখিল,—তখন সে ম্লানজ্যোতিঃ প্রভাতের তারা নিভ নিভ হইয়াছে, আকাশের চাঁদ ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে, পূজার প্রস্ফুটিত কুসুম বালকের নখাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কর্দ্দমে লুটাইতেছে!

অনুতপ্ত গণেশ, তখন তারাকে বুকে করিয়া, গৃহমধ্যে শয্যায় শয়ন করাইল, গ্রাম্য চিকিৎসার ত্রুটি করাইল না, কিন্তু সে গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালার মত! হায়!—

"নির্ব্বাণে দীপে কিমু তৈলদানম্!"

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

ভ্রান্তি।

১

মুগ্ধ শিশু সারা বেলা
পথে পথে করে খেলা,
ধূলা মাটী ছাই পাঁশ কত মাখে গায়
স্নেহময়ী মা'র পানে ফিরিয়া না চায়।

২

সন্ধ্যা যবে আসে ধীরে
অন্ধকারে ধরা ঘিরে
ভীত শিশু খেলা ফেলি গৃহমুখে ধায়
আকুল কাতর কণ্ঠে ডাকে মা কোথায়!

৩

ও মা আমি শিশু তোর
মায়া-ঘোরে ছিনু ঘোর
সন্ধ্যা দেখি কাঁপে হিয়া ডাকি 'মা' 'মা' বলে
ঝেড়ে দে মা ধুলামাটী তুলে নে মা কোলে।

৪

মাগো! আমি পথভ্রান্ত
বড় ভীত, বড় শ্রান্ত
জননীর বুক ছাড়া কোথা পাব ঠাঁই?
তুলে নে মা, কোল দে মা, আরামে ঘুমাই।

শ্রীপ্রেমানন্দ গুপ্ত।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

শ্রীশ্রী৺দুর্গা পূজার বলি ও জীব-বলি—শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেব প্রণীত। দুর্গাপূজায় জীব বলির আবশ্যকতা আছে কি না তাহারই আলোচনা। কারুণ্যের অবতার বুদ্ধদেব যে দিন যজ্ঞার্থ বলিদানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া জগত-সমক্ষে মৈত্রীর আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, সে দিন হইতে ভারতবর্ষে এ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। প্রেমাবতার চৈতন্যদেবও অনেক পরিমাণে এই নিঃসহায় জীবের রক্তস্রোত রুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি ধর্ম্মের দোহাই দিয়া,—"জীব জননীর পূজাচ্ছলে"—বলিদান চলিয়া আসিতেছে। আজকালকার এই যুক্তির দিনে গ্রন্থকার শাস্ত্রাদি হইতে জীব-বলির বিরুদ্ধে যে সকল মতবাদ সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন—তাহা বিশেষ বিবেচ্য ও আলোচ্য। সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া করুণ-হৃদয় গ্রন্থকারের ব্যাকুলতা আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হউক—ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

দিনচর্য্যা।—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত—মূল্য চারি আনা।

আশ্রম-চতুষ্টয়।—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত—মূল্য আট আনা।

পাশ্চাত্য-আদর্শের প্রভাবের এই যুগে, ইংরাজী-শিক্ষাপ্লাবিত দেশে এই গ্রন্থ দুইখানি যেন মাতৃভূমির পবিত্র আহ্বানের মত আমাদের সমস্ত হৃদয়কে উদ্বোধিত করিয়াছে। মানুষের সমস্ত জীবন-যাপনের এবং প্রাত্যাহিক কর্ত্তব্যের যে প্রণালী ভারতবর্ষের প্রাচীন আদর্শ তাহাই ভাল, না মানুষে মানুষে কঠোর প্রতিযোগিতা জীবনসংগ্রামের এই নিষ্ঠুরতা, পাশ্চাত্য-আদর্শ "dying in harness"ই ভাল—তাহা আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। পাশ্চাত্য-আদর্শের প্রবল স্রোতে আমাদের দেশের আদর্শ আজ নিমজ্জিত—আমরা পুরাতন হারাইয়াছি এবং নূতনও আমাদের 'ধাতের' সঙ্গে খাপ খায় নাই—তাই শিক্ষা কেবল বহিরাবরণের মত বাহিরেই আছে—তাহা আমাদের চরিত্র-গঠনের কোন কাজেই আসিতেছে না—তাই সকল কর্ম্মে, সকল উদ্যোগে আমাদের এত ব্যর্থতা—এত দৈন্য। আমরা ভাষা শিক্ষা করিতেছি—কিন্তু আমরা মানুষ হইতেছি না। এই গভীর সমস্যার দিনে গ্রন্থকার আমাদের সম্মুখে ভারতবর্ষীয় আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। যে আদর্শে হিন্দুজাতি কর্ম্ম ও জ্ঞানের সর্ব্বোত্তম ফল লাভ করিয়াছিলেন, গ্রন্থকার আজ সেই দিকে ফিরিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। আমরা কি করিব? পরম দুঃখ-দৈন্যের মধ্য দিয়া সর্ব্বকালনিয়ন্তা আমাদিগের সে সমস্যার মীমাংসা করিবেন।

এই গ্রন্থ দুইখানি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার ছিল-কিন্তু সমালোচনার বৃথা বাগজাল বিস্তার করিয়া এই গুরু বিষয়কে লঘু করিবার প্রবৃত্তি নাই। তাই সমস্ত দেশবাসীকে এই গ্রন্থ দুইখানি পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি মাত্র। গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"দিন দিন লইয়া মাস, মাস মাস লইয়া বৎসর, বৎসর বৎসর লইয়া এই জীবন"—এই হিসাবে "দিনচর্য্যা" ও "আশ্রম-চতুষ্টয়" অভিন্ন। যিনি প্রতি দিন সাধুভাবে, সুন্দর ভাবে যাপন করিবেন—তাঁহার কি ব্রহ্মচর্য্য, কি গার্হস্থ্য, কি বাণপ্রস্থ, কি সন্ন্যাস—সকল আশ্রমই সুন্দর, শোভন এবং ভগবন্মুখী হইবে। কিন্তু এই বিলাসিতার দিনে ভারতের কঠোর আদর্শ কি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে?

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

মুখের সৌরভ ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য

মিল্ক অব রোজ

অতি উৎকৃষ্ট উপকরণ। কিছুদিন ধরিয়া ইহা নিয়মিতরূপে মুখে ব্যবহার করিলে মুখত্বক শুভ্র, সুকোমল ও মসৃণ হয়; ক্ষতাদিজনিত ও ব্রণাদিঘটিত বিকৃত চিহ্ন অন্তর্হিত হইয়া মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি হয়। মহিলাগণের ইহা পরম আদরের সামগ্রী।

মূল্য প্রতি বোতল বার আনা।

গোলাপ দন্তমঞ্জন

বিবিধ দন্ত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ; দাঁত থাকিতে সকলেরই দাঁতের মর্য্যাদা বোঝা উচিত। দন্তশ্রেণী শুভ্র, সুদৃঢ়, নিরোগ রাখিবার ইচ্ছা থাকিলে ইহা নিয়মিতরূপে দন্তে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহার সুকোমল গোলাপগন্ধে মুখের দুর্গন্ধ সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়া মুখের সৌরভ বৃদ্ধি করে। ইহা বিলাসীর বড় আদরের সামগ্রী।

মূল্য প্রতি শিশি ছয় আনা।

তাম্বুলীন

পানে ব্যবহারোপযোগী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামগ্রী। পান সুরস রুচিদায়ক ও মুখপ্রিয় করিতে হইলে তাম্বুলীনের ন্যায় মনোরম সামগ্রী আর নাই। যাহারা মিঠা পান ব্যবহার করেন, তাঁহারা অন্য মসলার পরিবর্ত্তে তাহাতে তাম্বুলীন ব্যবহার করিলে বুঝিতে পারিবেন, ইহার তাম্বুলরঞ্জন শক্তি কত অধিক; একবার ব্যবহার করিলে তাম্বুলীনহীন পান ব্যবহার করিতে কখন ইচ্ছা হইবে না। তাম্বুলীন ব্যবহারে মুখে নব প্রস্ফুটিত সুরভিত কুসুমের সৌরভ বাহির হয়—ইহা তাম্বুলীনেরই বিশেষত্ব।

মূল্য প্রতি শিশি আট আনা।

প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্য ব্যবহার্য্য।

বঙ্গদর্শন

(নব পর্য্যায়)

মাসিক পত্র।

কলিকাতা,
২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
মজুমদার লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত।

মাঘ] [১০ম সংখ্যা।

বঙ্গদর্শন।

(নব পর্য্যায়)

দশম বর্ষ।

এস্ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৭

পুরাতন বঙ্গদর্শন।

১৩০৯ সাল হইতে ১৩১৬ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষের মূল্য ডাকমাশুল সমেত দুই টাকা।

হিন্দু ধর্ম্ম নীতি।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত। মন্বাদি-স্মৃতি, মহাভারত, রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, হিতোপদেশ, প্রভৃতি প্রধান প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত। নীতি শিক্ষার এমন পুস্তক আর নাই বলিলেও চলে। মূল্য ১৲ স্থলে ৷৷০ (বাঁধাই) ৸০ আনা।

সরল বর্ণ জ্ঞান।

ডাক্তার ব্রজনাথ সাহা প্রণীত। কিণ্ডার গার্টেন প্রণালী অনুসারে শিশুদিগের বাঙ্গালা অক্ষর পরিচয়ের সচিত্র পুস্তক। সুন্দর সুন্দর ছবি। মূল্য ৶০।

লিপি-সংগ্রহ।

সবজজ বিনোদবিহারী মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বের লিখিত সুমধুর বাঙ্গালায় উপদেশ পূর্ণ চিঠী পত্র। মূল্য ৷৷৶০।

দুর্গালীলা-তরঙ্গিণী।

৺কৃষ্ণকিশোর রায় প্রণীত। গ্রন্থের প্রণেতা প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে একজন। ইহাতে আনুপূর্ব্বিক দুর্গালীলা সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। সৃষ্টি-প্রকরণ হইতে দক্ষযজ্ঞ, তৎপরে গিরিরাজের ঘরে শিবের বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত আখ্যান পদ্য ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য ১৲।

প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত বা প্রাণী রাজ্য।

শ্রীবাস চট্টরাজ সঙ্কলিত নূতন রকমের বই। যদি অসীম জ্ঞান সূক্ষ্মদর্শী সৃষ্টিকর্ত্তার অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৌশল দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে চান; যদি নদী, হ্রদ, অরণ্য ও প্রান্তরবাসী এবং আকাশচারী প্রাণিগণের বিবরণ পাঠে পুলকিত হইতে চান তবে ইহা পাঠ করুন। মূল্য ১৲।

কাব্যগ্রন্থ।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ও ৺মোহিতচন্দ্র সেন, এম্, এ, সম্পাদিত। ত্রয়োদশ খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য ৯৲ নয় টাকা।

গল্পগুচ্ছ।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। আর্ট পেপারে মুদ্রিত, দুই খণ্ডে সুন্দর বাঁধাই। মূল্য ৫৲।

মূক শিক্ষা।

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মজুমদার প্রণীত। মূক বধিরের শিক্ষা এ দেশে নূতন জিনিষ। জন্মবধির হইলেই মূক হয়। এই পুস্তকের সাহায্যে মূক-বধিরকে কথা ও লেখাপড়া শিক্ষা দিতে পারা যায়। সচিত্র উত্তম বাঁধাই মূল্য ৸০।

পঞ্চ প্রদীপ।

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদার, বি, এ প্রণীত নূতন গল্পের বই। ঋষিকল্প কাউণ্ট টলষ্টয়ের গল্পের অনুকরণে আমাদের দেশের মত করিয়া গল্পগুলি লিখিত। বালক-বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগের পাঠ্য। পুরস্কারের উপযোগ্য। সুন্দর বাঁধাই। মূল্য ৷৷৶০।

পুণ্যের জয়।

শ্রীযুক্ত সুধাকৃষ্ণ বাগচি প্রণীত ও শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে সম্পাদিত, অভিনব রহস্যময় ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। মূল্য সুন্দর বাঁধাই ১৲

নববিধান সমাজের বই।

ব্রহ্ম সঙ্গীত প্রথম ২৲ দ্বিতীয় ৷৶০ আচার্য্য কেশবচন্দ্র (বিস্তৃত জীবন চরিত) ১৲ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম ১৷৷০ গীতা সমন্বয় ভাষ্য ৫৲ বেদান্ত সমন্বয় (১২ খণ্ড) ৬৲ বিবিধ ধর্ম্ম সঙ্গীত (প্রসন্নকুমার সেন কৃত ২৲ গুরু নানকের জীবন চরিত ১৷৷০ শাক্যমুনি চরিত ১৷০ উপাধ্যায়ের বক্তৃতা ১৲ হদিশের বঙ্গানুবাদ, পূর্ব্ব বিভাগ ৪৲ উত্তর বিভাগ ২৲ কোরাণশরিফের বঙ্গানুবাদ ৪৲ মোহম্মদের বিস্তৃত জীবনী ৩, হাফেজের বঙ্গানুবাদ প্রথমভাগ ১৲ তাপসমালা (৬ খণ্ড) ৩৲ জীবন-বেদ ১৲ মহাপুরুষ চরিত ৸০।

মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য পুস্তক।

২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দিনচর্য্যা

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত। প্রত্যেক হিন্দুজীবনকে সুন্দর, মহৎ ও সার্থক করিবার জন্য ও আদর্শের পথে পরিচালিত করিবার জন্য অত্যাবশ্যকীয় গ্রন্থ। এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় আর নাই। বিচারপতি সারদা বাবু, কবিবর রবীন্দ্র বাবু প্রভৃতি দেশমান্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ও বহু পত্রিকায় এক বাক্যে প্রশংসিত। মূল্য চারি আনা মাত্র।

আশ্রম চতুষ্টয়।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত। জীবনের লক্ষ্য কি ও কোন্ আদর্শে তাহাকে গঠিত করা উচিত, এ গ্রন্থে তাহা যথাসম্ভব আলোচিত হইয়াছে।

মূল্য ৷৷০ আট আনা।

নিরুপায়ে চিকিৎসক

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা সুবিখ্যাত ফরাসী কবি মোলিয়ার রচিত একখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন অবলম্বনে লিখিত। কৌতুক-উদ্দীপন ও মানবচরিত্র প্রদর্শন নৈপুণ্যে এই প্রহসন চির প্রসিদ্ধ। মূল্য ১০ স্থলে ।০

দাম্পত্য-চিত্র।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ দাস প্রণীত। যদি কাব্য রস উপভোগ করিতে চান, যদি অমৃতময়ী বঙ্গভাষায় আপনাকে ডুবাইতে চান তবে নাট্য কাব্য দাম্পত্য-চিত্র পাঠ করুন। বিবাহিত যুবক-যুবতীর জন্য প্রিয়জনকে উপহার দিবার জন্য এই অপূর্ব্ব নাট্যকাব্য দাম্পত্য-চিত্র। মূল্য ৸০ (বাঁধাই) ১৷০

বৌ-কথা-কও।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ দাস প্রণীত। আমাদের বৌ-সমাজের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া যদি সাবধান হইতে চান, দাম্পত্যজগতের বিবিধ ঔপন্যাসিক চিত্রের সমালোচনা দেখিয়া [illegible] হইতে চান তবে এই সরল গদ্য কাব্য পাঠ করুন। মূল্য ।৶১০

দলীল।

রাজগোপাল রায় সঙ্কলিত। রেজেষ্টারী আফিস সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দরখাস্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন দলীলের আদর্শ ও তাহাদের আইন মত সাধারণের বোধগম্য সরল ব্যাখ্যা ও প্রত্যেক দলীল সম্বন্ধীয় আইন মত অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়; আইন ও আদালত সংক্রান্ত কার্য্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় রেজেষ্টারী আইন, চুক্তি আইন, হস্তান্তর করণ আইন, উইল সম্বন্ধীয় আইন ইত্যাদির ধারা ও তৎসম্বন্ধীয় নজির ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিষয়ী ব্যক্তি মাত্রেরই আবশ্যকীয় গ্রন্থ। ৪২২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, বাঁধাই মূল্য ১৷০।

চাক্‌মা জাতি।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, এম-আই-আর-এস্ প্রণীত, পুরাতত্ত্ববিদ্ রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই কর্ত্তৃক ভূমিকা লিখিত এই গ্রন্থখানি চাকমা নামক পার্ব্বত্য জাতি বিশেষের অপূর্ব্ব রহস্য পূর্ণ জাতীয় চিত্র বা ইতিবৃত্ত। বঙ্গের বিচারপতিগণ, সাহিত্যরথিগণ, কবিগণ ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এক বাক্যে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। ১৮খানা হাফ্‌টোন ছবি ও একখানি রঙ্গিন মেপে সুশোভিত। মূল্য ৩৲ টাকা।

বঙ্গ-গৌরব।

নব্যভারতের নবযুগ প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি যে সকল মহাপুরুষ বঙ্গে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছেন, তাঁহাদের উৎকৃষ্ট বৃহৎ প্রতিকৃতি ও জীবনের সুলিখিত নক্সা। উপহার কি পুরস্কার দিবার পক্ষে এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর উপযুক্ত পুস্তক বঙ্গভাষায় আর নাই। মূল্য ৪৲ স্থলে ৩৲।

মতিচুর।

মিসেস আর, এস্, হোসেন প্রণীত প্রবন্ধ পুস্তক। ইহাতে পিপাসা, স্ত্রীজাতির অবনতি, নিরীহ বাঙ্গালী, সুগৃহিণী প্রভৃতি সাতটি প্রবন্ধ আছে। সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ৸০।

অগুরু
দেবভোগ্য সুগন্ধি
ছোট শিশি ।৶০ বড় শিশি ৸০
বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা।

বঙ্গদর্শন।

সাহিত্য-প্রচার।

"জ্ঞানং সংপ্রাপ্য সংসারে যঃ পরেভ্যো ন যচ্ছতি।
জ্ঞানরূপী হরিস্তস্মৈ প্রসন্ন ইব নেক্ষতে॥"

জ্ঞান অন্তরের বস্তু। ভাষা-গৃহীত প্রতিমূর্ত্তি জ্ঞান,—ভাষার সাহায্যেই জ্ঞান জ্ঞাতার নিকটে পরিস্ফুত ও স্পষ্টীভূত এবং অন্যের নিকটে প্রতীত হয়। কিন্তু ভাষা স্থানে এবং কালে সীমা-বদ্ধ। এই স্থান এবং কালের কঠোর নিগড় হইতে বিমুক্ত করিয়া ভাষাকে পৃথিবী-পরিচ্ছিন্ন স্থানে এবং অপরিচ্ছিন্ন কালে পরিব্যাপ্ত করিবার যে উপায়, তাহাই সাহিত্য। এই কথাই বালক-বোধ্য সহজ ভাষায় বলা হইয়াছে—

"কথায় মুখের শব্দ বাতাসে মিলায়,
লিখিয়া রাখিলে তাহা শতাব্দে না যায়।"

সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেই প্রচারের চেষ্টা দেখা যাইতেছে। শ্রুতি যখন শ্রুতি-নিবদ্ধ ছিল, তখনও জন হইতে জনান্তরে উহা প্রচারিত হইয়াছে, বেদ-প্রচারের জন্যই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রুতি-যুগের পর লিপি-যুগ; তখন হাতে লিখিয়া গ্রন্থ প্রচার করিবার প্রথা ছিল; তখন এক এক খানি গ্রন্থ সহস্র মুদ্রায় বিক্রীত হইত, এক এক খানি গ্রন্থ নকল করিয়া সহস্র সহস্র লেখক পরিবার প্রতিপালন করিত। লিপি-যুগের পর বর্ত্তমান মুদ্রা-যুগ; এই যুগে মুদ্রা-যন্ত্রের প্রভাবে গ্রন্থ-বাহুল্য ঘটিয়াছে, প্রচারের অত্যধিক সুবিধাবশতঃ প্রয়োজন অপেক্ষা যোগান বাড়িয়া উঠিয়াছে, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কত জনের কত গ্রন্থাগার বিবিধ গ্রন্থে পরিশোভিত হইতেছে। এখন আর প্রচারের জন্য ভাবনা নাই, ভাবনা কেবল প্রচার-যোগ্য গ্রন্থের জন্য। তখন আর বাছাই যাচাই করিবার দরকার হইত না, গ্রন্থমাত্রেই তখন গ্রহণ-যোগ্য ছিল; এখন প্রচারের সুবিধার জন্য মালের এতই আমদানি হইতেছে যে, অনেক সময়ে খাঁটি মাল বাছিয়া লওয়া কঠিন হয়। কিন্তু ইহা সাহিত্য-প্রচারের ব্যবসায় মাত্র। প্রচারের প্রয়োজনই বিচার্য্য, ব্যবসায় বিচার্য্য নহে; প্রয়োজন উপলব্ধি হইবার অনেক পরে ব্যবসায়ের সৃষ্টি হয়, আবার ব্যবসায় মাটি হইয়া গেলেও প্রয়োজন থাকিতে পারে।

সর্ব্বাদৌ সাহিত্য-প্রচারের আকাঙ্ক্ষা কেন হইল, এই প্রবন্ধের শীর্ষস্থ শ্লোকটি পাঠ করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এ সংসারে জ্ঞান লাভ করিয়া যে ব্যক্তি পরকে তাহা দান না করে, জ্ঞান-স্বরূপ ভগবান তাহার প্রতি প্রসন্ন হন না। ইহাই সাহিত্য-প্রচারের

প্রথম প্রবর্ত্তক, বিশেষতঃ আর্য্যদেশে। যে সকল তত্ত্বপিপাসু মহর্ষি জ্ঞানানন্দে বিভোর হইয়া সাধন-সমুদ্রে ভাসিতেন, অশান্তির আশঙ্কায় লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিলাস সত্ত্ববিবর্দ্ধক তপোবনে জীবন যাপন করিতেন, লোকের নিন্দা-প্রশংসায় ভ্রূক্ষেপ-শূন্য হইয়া নিরাবিল নির্ভীক চিত্তে একমাত্র সত্যের সেবা এবং সত্যের প্রচারই পরম পুরুষার্থ মনে করিতেন, তাঁহারা কেবল জগতের মঙ্গল-সাধন-সংকল্পেই পরিচালিত হইতেন, নিজের কঠোর তপস্যা-লব্ধ জ্ঞানামৃত জন-সাধারণের কঠোর নীরস হৃদয়-ক্ষেত্রে সিঞ্চন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থন্মন্য করিতেন। জ্ঞান-স্বরূপ ভগবান্ এই বিষয়টা এই ভাবে যে আমার নিকট প্রকাশ করিলেন, এজন্য আমি ধন্য, আর জন-সমাজে ইহার প্রচারই পরম পুণ্য, এই ভাবেই তাঁহারা ভাবিতেন, এই কথাই তাঁহারা বুঝিতেন।

পরম কারুণিক ঋষিদিগের এই পবিত্র জগন্মঙ্গলভাব হতভাগ্য আমাদিগের প্রকৃতি হইতে ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেই, আমাদের আদর্শ হইতেও অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। কিন্তু আশা করি, আমরা এখনও এত দূরে সরিয়া পড়ি নাই, জগদম্বা এখনও আমাদিগকে এতটা অধঃপাতিত করেন নাই যে, এখনও আমরা কল্পনা-চক্ষে তাহা না দেখিতে পারি, ধ্যান-যোগে সেই ভাব হৃদয়ে না আনিতে পারি। যজ্ঞ-ধূম-পূত, বিহঙ্গ-কূজনানন্দিত, শান্তি-রস-সমাপ্লুত সেই তপোবনে যখন তাঁহারা লেখনী হস্তে লইয়া গ্রন্থ লিখিতে বসিতেন, তখন নিন্দা-প্রশংসার চিন্তা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইত না, অনুরাগ-বিরাগের কথা তাঁহাদের মনে উদিত হইত না, ক্ষতি-লাভের গণনা তাঁহাদের হিসাবেও আসিত না। যজ্ঞাগ্নিতে পবিত্র হব্য অর্পণ করিবার সময়ে যে পুণ্য-পবিত্রতা এবং সদ্‌ভাব-সম্পত্তি লইয়া তাঁহারা স্রুগ্‌দণ্ড ধারণ করিতেন, লেখনী-ধারণের সময়েও ঠিক সেই পুণ্য-পবিত্রতা এবং সদ্‌ভাব-সম্পত্তি তাঁহাদের হৃদয়কে স্পন্দিত করিত। তাঁহারা এক এক জন জীবন-ব্যাপী কঠোর তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়া এক একখানি গ্রন্থ লিখিতেন, তাই তাঁহাদের এক একখানি গ্রন্থ এক একটি জ্ঞান-ভাণ্ডার স্বরূপ আজিও বর্ত্তমান থাকিয়া মানবের জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতেছে, সভ্যতার এই উৎকট উৎকর্ষের দিনেও মনীষীদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। তাঁহাদের লেখার আরম্ভ, স্থিতি এবং পরিণাম, সমস্তই পবিত্রতাময়; তাঁহাদের চিন্তা-প্রবাহ পবিত্রভাবে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া পবিত্রভাবেই প্রবাহিত হইত, এবং পাঠক ও শ্রোতার হৃদয়ে সেই পবিত্রভাবই ঢালিয়া দিত। সাহিত্যের সেই সুবর্ণ-যুগে গ্রন্থ বাছিয়া লইবার প্রয়োজন হইত না; যে যাহা পাঠ করিত, সে তাহাতেই যুগপৎ শিক্ষা এবং আনন্দ পাইত। তাঁহারা কেবল তৃপ্তিই দিতেন না; তাঁহারা পাঠককে চিন্তা করিতে শিক্ষা দিতেন, এবং চিন্তা করিবার অবসরও দিতেন। তাহার প্রমাণ, আজিও যিনি ঋষিদিগের গ্রন্থ নিয়মিতরূপে শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করেন, তিনি স্বভাবতঃ চিন্তাশীল হন; ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য এবং প্রগাঢ় বিচার-শক্তি

তাঁহার চরিত্রের অলঙ্কার হয়। তিনি গ্রন্থ-পাঠে ঔদারিকতা পরিহার করেন, ঝোল-অম্বল-নির্ব্বিচারে আকণ্ঠ উদর পূর্ণ করিয়া অজীর্ণ-রোগও জন্মান না।

অধুনা বাঙ্গালায় সাহিত্য-রথীদিগের মধ্যে অনেকেই মহারথী, কেহ কেহ বা 'সাহিত্য-সম্রাট' বলিয়া পরিগণিত। এ সমস্তই তাঁহাদের সাহিত্য-সেবার যোগ্য পুরস্কার এবং নিতান্ত গৌরব, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি সাহিত্য-ঋষি হইয়া বাঙ্গালী জাতিকে ধন্য করিতে পারেন না? তাঁহাদের স্বাভাবিক শক্তি এবং প্রতিভা লইয়া এই পথে চলিলে—আর্ষভাবে অনু-প্রাণিত হইয়া তাঁহারা সাহিত্যের জন্য লেখনী ধারণ করিলে বাঙ্গালী জাতি পবিত্র হইতে পারে, তাঁহারাও কৃতার্থ হইতে পারেন।

সরস্বতী আমাদের দেবতা, সুতরাং তাঁহার অর্চ্চনায় হিংসা-দ্বেষ-স্বার্থ-বিরহিত অনাবিল পবিত্রতার নিতান্ত প্রয়োজন। সরস্বতীর প্রকৃত অর্চ্চনা গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপে নহে, কিন্তু নির্ম্মল হৃদয়-জাত বিশুদ্ধ চিন্তার স্বভাব-সিদ্ধ অবাধ বিজৃম্ভনে। দেবতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে গেলে ভক্তের হস্ত যেমন যুগপৎ ভয় এবং আনন্দভরে কাঁপিতে থাকে, যিনি সাহিত্যের জন্য লেখনী ধারণ করিলে সেইরূপে এবং সেইভাবে হস্ত-কম্প অনুভব করেন, সাহিত্য-সাম্রাজ্যে তিনিই ঋষি-পদবীতে আরোহণ করিবার যোগ্য। জানি না এমন কেহ আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছেন কি না, কিন্তু থাকিলেও তিনি আমি-দুর্ভাগার চক্ষের অন্তরালে রহিয়াছেন।

সাহিত্য-প্রচারের প্রথম কল্পে যেমন জ্ঞান-বিস্তার উদ্দেশ্য ছিল, দ্বিতীয় কল্পে সেইরূপ যশোবিস্তার উদ্দেশ্য হইল—অনেকে "কবি-যশঃপ্রার্থী" হইয়া লেখনী ধারণ করিলেন। জগতের মঙ্গল-সাধনের আকাঙ্ক্ষা হইতে নিজের যশোবাসনা যতটা নিম্নে, জ্ঞান-গাম্ভীর্য্যে এবং গুণ-গরিমায় ঋষিদিগের গ্রন্থ হইতে এই সকল যশঃ-প্রার্থীর গ্রন্থও ততটা নিম্নে। যশ ঋষিদিগের কার্য্যের একটা গৌণফল মাত্র, কিন্তু এই গৌণফলই ইহাদিগের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। ঋষিদিগের ছিল মঙ্গল-সাধন উদ্দেশ্য, জ্ঞান-বিস্তার তাহার উপায়; কবিদিগের হইল যশোলাভ উদ্দেশ্য, পাঠকের চিত্ত-রঞ্জন তাহার উপায়। এই হইতেই সেব্য-সেবকের আসন-বিনিময় হইয়া গেল; ঋষিদিগের সময়ে লেখক সেব্য এবং পাঠক সেবক ছিলেন, এখন হইলেন পাঠক সেব্য এবং লেখক সেবক, সুতরাং লেখকের আসন অনেক নিম্নে পড়িয়া গেল। ঋষিদিগের মধ্যে যাঁহারা কবি ছিলেন, তাহারা যশঃ-প্রার্থী হইয়া আদর্শকে অবনত করেন নাই, তাহারা দুর্ব্বল রোগীর জন্য তিক্ত ঔষধকে মধুর রসে সিক্ত করিয়াছিলেন মাত্র। রামায়ণ এবং মহাভারত একাধারে ইতিহাস, ধর্ম্ম-গ্রন্থ এবং কাব্য; কিন্তু ইহারা কাব্য হইলেও যশঃপ্রার্থীর কাব্য নহে।

কেহ কেহ বলেন, প্রকৃত কবি প্রকৃতির কৃত্রিমতা-বর্জ্জিত সরল সন্তান; তিনি নিন্দা-প্রশংসা-নিরপেক্ষ হইয়া কাব্য এবং সঙ্গীতচ্ছলে তত্ত্ব-কথাই বলিয়া থাকেন, কে

শুনিল বা না শুনিল,সে দিকে ভ্রুক্ষেপ করেন না। ইহা কবির উচ্চ আদর্শ বটে; কোন কোন কবি যে কোন কোন অতিবিরল মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তে এই উচ্চগ্রামে আরোহণ করিতে পারেন, তাহাও স্বীকার করি; কিন্তু এ আদর্শ দৃশ্যমান বাস্তব হইতে অনেক দূরে, অনেক উর্দ্ধে। শুনিয়াছি, ঋষিকল্প পারস্য-কবি সাদি ভাগিনেয়ের বাড়ীতে থাইতেন, আর একটা গাছতলায় সারাদিন বসিয়া চিন্তা করিতেন এবং কবিতা লিখিতেন। তিনি মাটির খাপরায় চক দিয়া কবিতা লিখিয়া খাপরাগুলি ফেলিয়া দিতেন, আর তাহা ফিরিয়া দেখিতেন না। তাঁহার ভাগিনেয় খাপরা এবং চক যোগাইতেন, আর লেখাগুলি নকল করিয়া রাখিতেন, তাই সাদীর রসময়ী কবিতায় আজ পারস্যভাষী পাঠক এত পরিতৃপ্ত, এত মুগ্ধ। এই কবিতার আবির্ভাব যেমন আশ্চর্য্য, স্বাদও সেইরূপ অলৌকিক! শুনিয়াছি, একই মজলিসে উপবিষ্ট সংসারী তাঁহার কবিতা শুনিয়া হাসিয়া আটখান; তত্ত্বজ্ঞানী তাহা শুনিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল। এক সময়ে এক ব্যক্তি একখানি গ্রন্থ সম্মুখে লইয়া উপবিষ্ট ছিল; তাঁহার গণ্ডদ্বয় অশ্রু-জলে প্লাবিত, আবার সে মধ্যে মধ্যে হো হো করিয়া হাসিতেছে; দেখিয়া আর এক জন বলিলেন, "হয় এ ব্যক্তি পাগল হইয়াছে, না হয় সাদির কবিতা পড়িতেছে।" এ সব অতিরঞ্জিত গল্প হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে প্রকৃত স্বভাব-কবি পদার্থটা যে কি, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

অধিক দূরের কথা কেন, কিম্বদন্তীর আশ্রয় লইবার প্রয়োজন কি? আমরা চক্ষের সম্মুখে কি দেখিলাম। যশোহর ঝিকারগাছায় বিরাট জন-সমাগম; কলিকাতা হইতে আমাদের আদরের সুরেন্দ্র-নাথ প্রভৃতি জননায়কগণ আসিয়াছেন, জন-সাধারণকে দুইটা কথা বলিবেন, দেশে প্রজাশক্তির উদ্বোধন করিবেন। কিন্তু তাহাদের কথা বুঝে কে, আর শুনে কে? মহা গণ্ডগোল উপস্থিত, কাণের কাছে চিৎকার করিয়া কথা বলিলেও শ্রুতিগোচর হয় না। গণ্ডগোলে সমস্ত উদ্যোগ পণ্ড হইবার উপক্রম, এমন সময়ে এক মহাপুরুষ সেই বিশাল জন-সঙ্ঘের মধ্যে দাঁড়াইয়া সঙ্গীতের তান ছাড়িলেন, আর অমনি সেই কলরবাকুলিত পঞ্চাশ হাজার লোক তাঁহাকে ঘেরিয়া নিস্তব্ধ পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া গেল! এই মহাপুরুষ কে? না-হিন্দু, না-মুসলমান, বিখ্যাত লালন ফকিরের শিষ্য, একজন দরবেশ, নাম পাগলা কানাই। পাগলা কানাই নিরক্ষর ছিলেন। তিনি পরের গান শিখিতেন না, নিজের গানও ফিরিয়া গাইতে পারিতেন না; কিন্তু যতক্ষণ ইচ্ছা পেটে হাত বুলাইতেন, আর মুখে চমৎকার ভাবব্যঞ্জক নূতন নূতন গান গাইয়া যাইতেন। পাগলা কানাই অতীত যুগের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তিনি বর্ত্তমান যুগের জ্ঞানবিজ্ঞান-কিরণো-দ্ভাসিত দিবালোকেই সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। অন্য দেশে জন্মিলে এতদিনে তাঁহার প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি তদ্দেশীয় শিল্প-কলায় সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিত; কিন্তু আমরা তাঁহার কি আদর করিয়াছি, তাঁহার প্রতি

কি সম্মান প্রদর্শন করিতেছি? বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অতীতের গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিতেছেন, বর্ত্তমানের তৈলচিত্রাদি দ্বারা সারস্বত-মন্দির সাজাইতেছেন; কিন্তু এই দৈব-শক্তি-সম্পন্ন পাগলা কানাইর একটা গান, একটা ফটো, একটুকু জীবন-চরিত সংগ্রহ করিয়াছেন কি না প্রকাশ নাই। সুদূর ভবিষ্যতে এই মহাপুরুষের নাম উপকথায়ও বর্ত্তমান থাকায় সম্ভাবনা দেখি না।

সাহিত্য-প্রচারের তৃতীয় কল্প ব্যক্তিগত মত-বিস্তার। ধর্ম্ম-প্রচার, সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক চর্চ্চা, ঐতিহাসিক বিরোধ প্রভৃতি এই কল্পের অন্তর্নিবিষ্ট। ঝগড়া, বিরোধ, তর্ক-বিতর্ক, গালাগালি, সাক্ষ্য, প্রমাণ, নজির ইত্যাদি ইহার প্রণালী; সংযোগ-বিয়োগ, শত্রুতা-বন্ধুতা, সুখ-দুঃখ, আত্মশ্লাঘা-আত্মগ্লানি প্রভৃতি মিশ্র বিচিত্র অবস্থা ইহার ফল। এই সাহিত্যের আলোচনায় নানা বিষয় জানা যায়, নানা দিকে চক্ষু পড়ে, বিচার-বিতর্কের অভ্যাস এবং প্রবৃত্তি জন্মে, বুদ্ধি-বৃত্তি প্রাখর্য্য লাভ করে, এবং ভাষায় কৌটিল্য ও কৌশল-জাল পাঠকের হৃদয়ে সংক্রামিত হয়। শিক্ষায় মানুষের সরলতা নষ্ট করে বলিয়া যে একটা প্রবাদ আছে, এই শ্রেণীর সাহিত্য তাহার জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী। ফল ভাল হউক আর মন্দ হউক, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ সাহিত্যের প্রচার অনিবার্য্য, ইহা দূর করা সম্ভব হইলেও সমাজ তাহাতে রাজি হইতে পারিত বলিয়া বোধ হয় না।

সাহিত্য-প্রচারের শেষ কল্প—অতি নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য—অর্থাগম। ইহাতে সাহিত্য একটা ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য ব্যবসায় সভ্যসমাজের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ, উন্নতির নিদান। ব্যবসায় যত দিন 'সাধু'র কার্য্য ছিল, যত দিন ইহা 'সাধু'-দিগের পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল, যত দিন ইহাতে অন্যায় প্রতিযোগিতা প্রবেশ করিবার অবসর পায় নাই, তত দিন ব্যবসায় অবিমিশ্র সাধুতার কার্য্যই ছিল, তত দিন ইহা দ্বারা সমাজের অবিমিশ্র মঙ্গলই সাধিত হইতেছিল। কিন্তু যে দিন হইতে ইহাতে অন্যায় প্রতিযোগিতা প্রবেশ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই ইহাকে পাপে স্পর্শ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই মিথ্যা বহুরূপী সাজিয়া ব্যবসায়কে কলুষিত করিতেছে। ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ এই অন্যায় প্রতিযোগিতার বিষময় ফল অনুভব করিয়াই ব্যবসায়কে জাতিগত করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থায় আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলেরই একটা নির্দ্দিষ্ট জীবনোপায় ছিল, এক শ্রেণীর অন্য শ্রেণীর জীবিকার্জ্জনে পরিপন্থী হইবার কোন প্রয়োজন বা প্রলোভন ছিল না। এখন আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা সেই ব্যবস্থা পদ-দলিত করিতেছে, সেই সুন্দর শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, তাই সমাজের নানা দিকে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে। এখন যে বলবান্, সুতরাং প্রতিযোগিতায় সমর্থ, সে একটার উপরে পাঁচটা ব্যবসায়ে হাত দিতেছে; আর যে অসমর্থ, সে নিজের কৌলিক ব্যবসায়ে পর্য্যন্ত নিরবকাশ হইয়া দারিদ্র্য-পেষণে অনাহারে মরিতেছে। হায়

হায়, দেখিতে দেখিতে কি হইল! একদিন হিন্দুর এই দুরবস্থার প্রতি জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে, আমরাও ফিরিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিব; কিন্তু তখন আর সংশোধনের পথ থাকিবে না, তখন দেখিব, আমরা কুপুত্র হইয়া পৈত্রিক সৌভাগ্য ও শান্তি হইতে চিরদিনের তরে বঞ্চিত হইয়াছি!

যাহা হউক, পুস্তক-বিক্রেতাদিগের হাতে ব্যবসায়ের ভারটা চাপাইয়া গ্রন্থকারগণ যদি ব্যবসায় হইতে দূরে থাকিতে পারেন, তাহা হইলেও কতক রক্ষা। গ্রন্থ লইয়া হাজার লোক ব্যবসায় করুক, তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি কি? যাঁহার হাতে সাহিত্যের প্রাণ, সেই গ্রন্থকার যদি আর্থিক লাভ-লোকসান-গণনায় দৃক্‌পাত না করিয়া, সাময়িক নিন্দা-প্রশংসার চিন্তাকে মনে স্থান না দিয়া, কেবল ন্যায়-সত্য-জ্ঞান-ধর্ম্ম-মঙ্গল-পবিত্রতার আদর্শকে ধ্রুবতারার ন্যায় মনশ্চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া চলিতে থাকেন, তাহা হইলে ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ে কি আসে যায়? বৃক্ষ অমৃত ফল প্রসব করে; তাহার কতটা দেব-পূজার লাগে, কতটা আদাড়ে পড়িয়া পঁচে, কতটা দস্যু-তস্করে লইয়া যায়, কতটা লইয়া শিয়াল-কুকুরে কামড়া-কামড়ি করে; কিন্তু তাহাতে বৃক্ষের মাহাত্ম্যের কি লাঘব হয়, আর তাহাতে ফলের আদরই বা কোথায় কমিয়া যায়? গ্রন্থকার ঠিক থাকিলে সাহিত্যের দুর্দ্দশা ঘটে না, কর্ণধার ঠিক থাকিলে নৌকা ডুবে না।

কিন্তু যে কেহ গ্রন্থ লিখিবেন, তিনিই যে এই আদর্শে চলিবেন, এমন আশা করিতে পারি না। যদি ইহা সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমাদের জাতীয়-সাহিত্যে আজ এত আবর্জ্জনা জমিত না। আজ কাল অধিকাংশ পাঠকের রুচি কোন্ দিকে, সাধারণতঃ ইহারা কি পড়িতে এবং কি শুনিতে ভালবাসে, কোন্ বিষয়ে কি প্রণালীতে একখান বই লিখিলে দু'পয়সা আয় হইবে, ইত্যাকার চিন্তা যে গ্রন্থ লিখিবার পূর্ব্বে বহু গ্রন্থকারের হৃদয়কে আন্দোলিত করে, অর্থাৎ বহু গ্রন্থকার যে গ্রন্থ লিখিবার সময়ে কেবল ব্যবসায়-বুদ্ধি দ্বারাই পরিচালিত হন, আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

সৌভাগ্যের বিষয়, মানবের সরল সহজ বুদ্ধি অনেক পরিমাণে তাহাকে রক্ষা করে। প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, কদাদর্শ এবং কুরুচির সাময়িক প্রাবল্য যতই হউক না কেন, সমাজ তাহাতে চিরদিন ভুলিয়া থাকে না, প্রতিভার প্ররোচনায় একবার উদ্‌ভ্রান্ত হইলেও কিছুকাল পরে আবার চক্ষের ধাঁধা সরিয়া যায়, সমাজ গন্তব্য পথ দেখিতে পায়। কিন্তু এই কদাদর্শ এবং কুরুচি ক্ষুদ্র ক্ষণধ্বংসী হইলেও যে অফুরন্ত! ক্ষুদ্র দংশ-মশকের ন্যায় ইহারা সমাজের কর-মর্দ্দনে অনবরত বিনষ্ট হইতেছে, যে একবার দেখা দিতেছে, সে আর প্রায় দ্বিতীয়বার দেখা দিবার আয়ুঃ পাইতেছে না, তথাপি ইহাদের বিরাম নাই, স্রোতের ন্যায় অবিরাম ইহাদের উদ্ভব চলিতেছে। সত্য বটে, যেখানে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইতেছে, যেখানে সমালোচনের প্রখর অগ্নি প্রজ্বালিত হইয়া থাকে, সে স্থানে ইহারা পাখা পুড়িয়া মরিবার ভয়ে

যায় না; কিন্তু আমাদের সমাজে অন্ধকারের ভাগই যে অধিক, জ্ঞানালোকের পরিসর যে নিতান্ত অল্প, সমালোচনার অগ্নি যে নাই বলিলেই হয়! অন্ধকারে দংশ-মশকের উৎপাত-নিবারণের জন্ম মানব-বুদ্ধি মশারির উদ্ভাবন করিয়াছে, সমাজকে কুসাহিত্য হইতে বাঁচাইবার জন্য আমাদের সুধীগণ কি কোন একটা সুষ্ঠু উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন না?

সমাজ এইরূপ একটা কিছু চায়। জল আসিলে তাহার সঙ্গে মাছও আইসে, এই যেমন বিশ্বাস, শরীরে বার্দ্ধক্য আসিলে তাহার সঙ্গে সেইরূপ জ্ঞানও আইসে, এই বিশ্বাসে অনেক সময়ে যুবকেরা ভাল ভাল পুস্তকের একটা তালিকা চাহিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এ ক্ষুদ্র জ্ঞানে তাহা কুলায় না। যুবকেরা যেখানে নিতান্ত না-ছোড় হয়, সেখানে রামায়ণ এবং মহাভারতের অনুবাদ ছাড়া আর কোন গ্রন্থের নাম করা নিরাপদ মনে করি না। যদি আমার সেরূপ জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে বাছা বাছা পুস্তকের একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগের হাতে দিতে পারিতাম। অনেক স্থলে বঙ্গ-সাহিত্যের কোন কোন মহারথীর নাম ও ঠিকানা দিয়া পত্র লিখিতে তাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছি, এবং একাধিক তালিকায় যে সকল গ্রন্থের নাম থাকিবে, তাহাই সংগ্রহ করিতে বলিয়াছি। যুবকেরা ঐরূপ পত্র লিখিয়াছে কি না, অথবা তাহাদের প্রার্থনা সফল হইয়াছে কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই।

যুবকেরা যে বৃদ্ধের নিকট সদ্‌গ্রন্থের তালিকা চায়, ইহা একটা শুভলক্ষণ। ইহাতে বুঝা যায়, তাহাদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের, মঙ্গলকর সাহিত্য-পাঠের পিপাসা জন্মিয়াছে; অথচ তাহারা নিজের বিচার-শক্তিকে বিশ্বাস করে না, বর্ত্তমান ব্যবসায়িক সমালোচনেও নির্ভর করিতে পারে না। কিন্তু এই স্পৃহনীয় অবস্থায় জ্ঞান-বৃদ্ধ সমাজ-নায়কগণ তাহাদের সহায়তার কি ব্যবস্থা করিতেছেন? অনেক স্থানে, অনেক সমৃদ্ধ পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত, আমাদের উৎসাহী যুবক-দিগের যত্নে পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। এই সকল পুস্তকালয় বা পাঠাগার যদি সুব্যবস্থিত হয়, যদি সংগৃহীত পুস্তকগুলি প্রকৃত জ্ঞান-দানে সমর্থ হয়, এবং পল্লীবাসী সকলে যথাযোগ্য ভাবে ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া যাহাতে উপকৃত হইতে পারে, এমন ব্যবস্থা যদি করা যায়, তাহা হইলে বিনা আড়ম্বরে এবং বিনা বাক্যব্যয়েও যে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু উৎসাহ ও অনুষ্ঠানের অনুরূপ সুব্যবস্থা যে সর্ব্বত্র আছে, এমন বোধ হয় না। পল্লীগ্রামে পাঠাগারের সংবাদ পাইলে আনন্দ অনুভব করি, সুযোগ পাইলে দুই একটা দেখিতেও যাই; কিন্তু যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে সচরাচর সুব্যবস্থার ত্রুটিই লক্ষিত হইয়া থাকে। চাঁদা-দাতৃগণ স্বীকৃত চাঁদা দেন না; যাঁহারা তাস পাশা খেলিবার সময় পান, তাঁহারাও পুস্তক পড়িবার সময় পান না; কেহ বা পুস্তক পড়িতে লইয়া যাইয়া পড়েনও না, ফেরতও দেন না; কেহ পুস্তক ফেরত না দিয়াই বলেন দিয়া-

ছেন ; কেহ বা বলেন চুরি হইয়াছে। কেহ পুস্তকাধার হইতেই অধ্যক্ষকে না জানাইয়া পুস্তকখানি স্বায়ত্ত করিয়া ফেলেন, কেহ কেহ বা গোপনে গোপনে পুস্তকের পাতা কাটেন, ছবি সংগ্রহ করেন। পাঠাগারের অনুষ্ঠাতাদিগকে ইত্যাকার অসংখ্য অসুবিধা, অসংখ্য দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করিতে হয়। এত সহ্য করিয়াও যে সকল অনুষ্ঠাতার উৎসাহ থাকে, তাঁহারা অবশ্যই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। ঔষধ যখন ধরিবে, সদ্‌গ্রন্থ পাঠের ফল যখন ফলিবে, পাঠাগারের প্রতি সাধারণের অনুরাগ যখন জন্মিবে, তখন এ সকল অসুবিধা, পাঠকের এরূপ দুর্নীতি ও দুর্ব্যবহার অবশ্যই থাকিবে না। কিন্তু সে শুভদিন কে আনিবে? সদ্‌গ্রন্থের পরিবর্ত্তে আবর্জ্জনা দিয়া গ্রন্থাগার পূর্ণ করিলে কি পড়িয়া, কি শিখিয়া, কাহার প্রভাবে লোকের দুর্নীতি দূর হইবে? অসদ্‌গ্রন্থ পড়া অপেক্ষা না পড়া শতগুণে ভাল। পূর্ব্বে না পড়িয়াও লোক নীতিমান হইত, এখন পড়িয়াও দুর্নীতিপরায়ণ হয়, ইহার কারণ কেবল অসদ্‌গ্রন্থ-পাঠ, এবং অসদ্‌গ্রন্থ-পাঠক-দিগের জীবন-গত দৃষ্টান্ত। পুস্তকে যাহা পড়া যায়, সমাজের মধ্যে অবস্থাপন্ন বা পদস্থ লোকের দৃষ্টান্তেও যদি তাহাই দেখা যায়, তবে অমার্জ্জিত-বুদ্ধি সাধারণ লোকে তাহার অনুসরণ করিবে না কেন? কোন্ শ্রেণীর পাঠক অধিক, সুতরাং কি প্রকার জ্ঞান, কি প্রকার নীতি সমাজে প্রসার লাভ করিতেছে, তাহা অবধারণ করিতে অধিক প্রয়াসের প্রয়োজন হইবে না, প্রত্যেক পাঠাগারের গ্রন্থ-বিলির খাতাখানি একবার দেখিলেই তাহা বেশ জানা যাইবে। দেহ-রক্ষার জন্য আহারের প্রয়োজন, কেবল ইহা জানিলেই যথেষ্ট হইল না; কিরূপ খাদ্য আহার করিলে দেহ রক্ষা হয়, তাহাও জানা চাই ; নতুবা অখাদ্য খাইয়া প্রাণান্ত হওয়া বিচিত্র নহে।

এ সমস্যার একটা সুমীমাংসা হওয়া উচিত, এ অনিষ্ট-নিবারণের একটা সদুপায় উদ্‌ভাবন করা দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুধী-গণের কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট সংপ্রতি এক শ্রেণীর গ্রন্থের বিরুদ্ধে দণ্ড উত্তোলন করিয়াছেন, রাজ-পুরুষগণ যে গ্রন্থকে রাজ-বিদ্বেষের উত্তেজক মনে করিতেছেন, তাঁহারা তাহারই প্রচার বন্ধ করিয়া দিতেছেন। এ ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের শক্তির সিদ্ধান্তই চরম সিদ্ধান্ত, সুতরাং ইহা প্রজা-সাধারণের সমালোচনার অতীত। সাহিত্যের দুর্দ্দশা দেখিয়া এক একবার মনে হয়, যদি দেশে সাহিত্য-প্রচারিত দুর্নীতির প্রতিকূলে পরিচালিত করিবার এইরূপ একটা অমোঘ শক্তি আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জ্ঞান-বৃদ্ধ-দিগের হস্তে ন্যস্ত থাকিত, তাহা হইলে বুঝি এই শ্রেণীর অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারিত। কিন্তু যাহা মনে হয়, তাহাই যে কর্ত্তব্য, এমন নহে। লেখামাত্রেরই গ্রন্থরূপে প্রচারিত হইবার অধিকার থাকিবে ; কিন্তু জ্ঞান-পুণ্য-বিস্তার দ্বারা জগতের মঙ্গলসাধনে যাহার যত শক্তি থাকিবে, সে তত আদর পাইয়া দীর্ঘজীবী হইবে ; আর যাহার সে শক্তি নাই, সে নিরবচ্ছিন্ন অনাদরে এবং অনাহারে মরিয়া যাইবে, এই প্রাকৃতিক নিয়মের সহায়তা-সম্পাদনের কোন সুবিবেচিত

সুচিন্তিত ব্যবস্থা সুধীগণ ইচ্ছা এবং যত্ন করিলে অবশ্যই উদ্ভাবন করিতে পারেন।

মুদ্রা-যন্ত্রের প্রসাদে কত ভাবে, কত প্রকারে এবং কত নামে কত পুস্তক বাহির হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বিজ্ঞাপনের কৌশল এখন একটা বিদ্যায় পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে কেবল বিজ্ঞাপন লেখায় সিদ্ধহস্ত, যেন মূর্ত্তিমান ব্যাস; আবার এই বিদ্যার যথেষ্ট আদরও আছে, কত বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ী কেবল এই বিদ্যার খাতিরেই ইহাদিগকে রীতিমত বেতন দিয়া পুষিতেছে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণের ন্যায়, নবাব-বাদসাহের পুরোগামী নকাবের ন্যায়, পরিক্রমণোৎসবের পুরোবর্ত্তী জয়ঢাকের ন্যায়, অথবা সে কালের যাত্রার দলে সং বাহির হইবার পূর্ব্বে খবর-দারের ন্যায় এই সকল বিজ্ঞাপন যখন নূতন নূতন পুস্তকের সংবাদ লইয়া বাহির হয়, তখন সেই বিজ্ঞাপনের ভাষার চমকে পুস্তক দেখিবার জন্য বৃদ্ধের হৃদয় পর্য্যন্ত নাচিয়া উঠে, তরুণ-বয়স্ক পাঠকের ত কথাই নাই। এই বিজ্ঞাপনের জোরে কত কদর্য্য বিষয়, কত অশ্লীল বিজ্ঞাপন, মাত্র নামে এবং আকারে পুস্তক সাজিয়া দেবী সরস্বতীর পবিত্র পূজা-মণ্ডপে নিঃশঙ্কভাবে নৃত্য করিতেছে, তাহাদিগকে নিষেধ করিবার, সারস্বত-কুঞ্জ হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিবার কেহ নাই!

সমাজে অত্যাচার করিবার অধিকার কাহারও নাই; কিন্তু কেহ কোন অত্যাচার করিলে তাহা হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু অধিকার থাকিলেই শক্তি থাকিবে, এমন নহে। কুগ্রন্থের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন সমাজের মধ্যে পনের আনা পাঠকেরই সে শক্তি নাই। যাঁহারা গ্রন্থের দুই চারি ছত্র পড়িলেই তাহার মূল্য বুঝিতে পারেন, এমন পাঠকের সংখ্যা অতি অল্প; যাহারা ছাপার অক্ষর দেখিলেই তাহাকে ব্রহ্মার বেদের ন্যায় অভ্রান্ত মনে করে, যাহারা গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পড়িয়াও উপকার হইল, কি অপকার হইল বুঝিতে না পারে, পাঠক-সমাজে তাহাদিগের সংখ্যাই অধিক। এই সকল বিচার-বিমূঢ় পাঠককে কুগ্রন্থের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা শক্তিমান পাঠকদিগের কর্ত্তব্য।

অত্যাচার বলিতেছি কেন? অবধান করুন। যাহাতে আমাকে আমার স্বার্থের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে বাধ্য করে, তাহাকেই অত্যাচার বলিতে পারি। কুগ্রন্থ কি করে, এখন তাহাই দেখুন। কুগ্রন্থ পাঠকের অর্থ হরণ করে, ততোধিক মূল্যবান সময় হরণ করে, ততোধিক মূল্যবান আত্মোন্নতির সুযোগ হরণ করে। এখন ভাবিয়া দেখুন, কুগ্রন্থ সমাজের কি সর্ব্বনাশ করে। যেমন অনিত্য শরীরের সহায়তায় জ্ঞান-ধর্ম্মাদি নিত্যবস্তু লাভ করা যায়, সেইরূপ অকিঞ্চিৎ-কর অর্থের সহায়তায় সংসারে নানারূপ ইষ্ট লাভ করা যায়। এমন উপকারী, অথচ কঠোর শ্রমোপার্জ্জিত অর্থকে আমারই দ্বারা নিরর্থক ব্যয় করান কি অত্যাচার নহে? তাহার পরে সময়-হরণ। মানবের সমস্ত সুখ, সৌভাগ্য এবং উন্নতির মূল, সমস্ত সাধন-ভজন এবং সিদ্ধি-লাভের হেতু, এই সময়। সময়ই জীবন—সময় বৃথা গেলে জীবনই বৃথা গেল। যে আমাকে দিয়াই আমার জীবনটা বৃথা

ব্যয় করাইল, তাহার মত অত্যাচারী কে? সর্ব্বশেষে আত্মোন্নতির সুযোগ হরণ। মানবের মনুষ্যত্ব—মানবের দেবত্ব আত্মোন্নতি-সাধনে। যে আমার আত্মান্নতির সুযোগ হরণ করিয়া আমাকে আত্মাবনতির অবসর দিল, যে আমাকে উপল-খণ্ড সংগ্রহে ব্যাপৃত রাখিয়া আমার হীরকখণ্ড সংগ্রহ করিবার সুযোগটা নষ্ট করিল, তাহাকে অত্যাচারী না বলিয়া আর কাহাকে বলিব? এখন যে দিন আসিয়াছে একটি পয়সা উপার্জ্জনে লোকের কত কষ্ট! আর কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের এই ব্যবহার? সমাজে এখন আমোদ-প্রমোদ নাই, গান-বাজনা নাই, জ্ঞান-ধর্ম্মের চর্চ্চা নাই; আছে কেবল জীবন-সংগ্রামের হুড়াহুড়ি পাড়াপাড়ি। পশু-সমাজ যেমন কেবল মাত্র আহার-অন্বেষণে ক্ষিপ্তপ্রায় থাকিয়া সারাটা জীবন অতিবাহিত করে, বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজও সেইরূপ অবিরাম কেবল আহারের জন্য, কেবল ধনের জন্য, কেবল যশোমানের জন্য ব্যাকুল থাকিয়া মানব-জন্ম সার্থক করিতেছে। সাহিত্যের আলোচনায় যাঁহাদের স্বাভাবিক আনন্দ নাই, অথবা সাহিত্যকে যাঁহারা জীবনের প্রধান অবলম্বন করেন নাই, এই অবিরাম ছুটাছুটির মধ্যে সাহিত্য-পাঠের জন্য দুই এক ঘণ্টা সময় বাহির করা যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা যাঁহারা করেন তাঁহারাই জানেন। এত যত্নের, এত কষ্টের এমন যে মূল্যবান সময় তাহার সার্থকতা কি এইরূপ গ্রন্থ-পাঠে? পয়সা দিয়া বই কিনিলাম, সময় ব্যয় করিয়া পড়িলাম, কিন্তু তাহাতে মনের তৃপ্তিদায়ক আত্মার উপজীব্য কিছুই পাইলাম না। ইহা কি ঘোর প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, অত্যাচার নহে?

পুস্তক পড়িয়া ক্ষুব্ধ হইলাম, বিজ্ঞাপনের উপরে রাগ হইল, আবার সেই বিজ্ঞাপন খানি পড়িতে লাগিলাম। কিন্তু পড়িতে বসিয়া দেখি কি চমৎকার চাতুরি, কি অপূর্ব্ব কৌশল, পাঠক ধরিবার কি বিচিত্র বাক্য-জাল! একটি মিথ্যা কথা নাই, অথচ ফাঁকা কথার এমন বিচিত্র গাঁথুনি যে, তাহা পড়িলেই পুস্তকখানি পাইবার জন্য মনের মধ্যে একটা তাড়না উপস্থিত হয়।

কলিকাতায় বড় রাস্তার ধারে বিজ্ঞাপন দিয়া ধূর্ত্তলোকে সং দেখাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। একবার দুইটা ধূর্ত্ত লোক নিঃস্ব হইয়া পয়সা উপার্জ্জনের একটা পরামর্শ করিল, কলিকাতার এক রাস্তার ধারে একখানি ঘর ভাড়া লইল, ঘরের সম্মুখে পরদা টাঙ্গাইল, পরদার উপরে বড় বড় চিত্রবিচিত্র অক্ষরে বিজ্ঞাপন দিল, এবং একজন পরদার বাহিরে দাঁড়াইয়া অনবরত ঘণ্টা নাড়িয়া "অপূর্ব্ব নৃত্য! এক পয়সা!" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। এত বড় জালে কি মাছ না পড়িয়া যায়? রাস্তার জন-স্রোতের মধ্য হইতে অনেকে সেই চিৎকারে আকৃষ্ট হইল, দলে দলে লোক একজন একজন করিয়া একটি পয়সা অগ্রিম দিয়া সেই পরদার ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রবেশ করিয়া দেখিল কি, না একটা নগ্ন-প্রায় মনুষ্য সর্ব্বাঙ্গে চূণকালি মাখিয়া লাফাইতেছে! তখন দণ্ডবিধি জারি হইয়াছিল কি না জানি না। যাহারা সং দেখিল, তাহারা প্রতারিত হইয়া

ক্ষুব্ধচিত্তে ফিরিল, কিন্তু একজনও মুখ ফুটিয়া একটি কথা বলিল না। বলিবে কি? বিজ্ঞাপনের "অপূর্ব্ব নৃত্য" "এক পয়সা" ইহার একটি বর্ণও যে মিথ্যা নয় তাহা ত প্রত্যক্ষই হইল। দুঃখের বিষয় সাহিত্য-সাম্রাজ্যেও এইরূপ বিজ্ঞাপন প্রবেশাধিকার পাইতেছে, বিশুদ্ধ সাহিত্যের উপরেও নিরীহ ভদ্র পাঠকের বিরাগ জন্মাইতে সমর্থ হইতেছে।

তীব্র, কঠোর, নিরপেক্ষ সমালোচনা বর্ত্তমান থাকিলে সাহিত্যের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেরূপ সমালোচনা যে একরূপ অসম্ভব, সাহিত্য-পরিষৎ প্রভৃতি বড় বড় সাহিত্য-সভার তুষ্ণীভাবই তাহার প্রমাণ।

তবে কি একটা উপায় হইবে না? আপনারা বর্ত্তমান থাকিতে সমাজের একটা অমঙ্গল, জাতীয় উন্নতির এত বড় একটা অন্তরায় ঘুচিবে না? আপনারা ইহার একটা ব্যবস্থা করুন, আবর্জ্জনা-রাশির মধ্য হইতে মণি-মুক্তা বাছিয়া দেখাইয়া, বিজন বিপথ নিবিড় সাহিত্যারণ্যে ভীত ও সন্দিগ্ধ পাঠককে অভ্রান্ত পথ প্রদর্শন করিয়া সামাজিক মঙ্গল বিধান করুন।

আপনাদের মধ্যে অনেকেই এ কার্য্যে সমর্থ, জানি; কিন্তু সমর্থ হইলেও চক্ষুলজ্জার খাতিরে অনেকেই যে এ কার্য্যে সম্মত হইবেন না, তাহাও বুঝি। জজ হইতে গেলেই কঠোর হইতে হয়. অনেক সময়েই হৃদয়ের প্রতিকূল হইলেও অপরাধীকে প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনাইতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া কি জজের পদ কেহ গ্রহণ করে না? অথবা বিনা বিচারকে সমাজ কি নিরাপদে চলিতে পারে?

এ বিষয়ে আপনাদিগের নিকটে কোন প্রস্তাব করি, এমন সাহস আমার নাই। তবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যে একটা উপায় ফলপ্রদ হইতে পারে বলিয়া বোধ হইতেছে, আপনাদের অবগতির জন্য তাহা নিয়ে নিবেদন করিলাম।

আপনাদের মধ্যে যাঁহারা সমালোচনার প্রয়োজন অনুভব করেন, এবং সে জন্য কিছু পরিশ্রম স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা একটি সমিতি গঠিত হউক। এই সমিতির উদ্দেশ্য থাকিবে, বাঙ্গালা পুস্তক গুলি রীতিমত পাঠ করিয়া তাহা হইতে সদ্-গ্রন্থগুলি নির্ব্বাচিত করা, এবং মধ্যে মধ্যে ঐ সকল নির্ব্বাচিত গ্রন্থের তালিকা সমিতির নামে ছাপাইয়া সর্ব্বত্র প্রচার করা। ইহাকেই আমি সাহিত্য-প্রচার মনে করি; মুদ্রাযন্ত্র যে ছাপার পুস্তক দিয়া দেশকে প্লাবিত করিতেছে, তাহাকে সাহিত্য-প্রচার বলা বিড়ম্বনা।

ইহাতে দ্বিবিধ উপকার হইবে। প্রথম, যাঁহারা নিজের জন্য, পারিবারিক ব্যবহারের জন্য, অথবা সাধারণ পাঠাগারের জন্য ভাল গ্রন্থের নাম খুজিয়া বেড়ান, তাঁহারা সমিতির তালিকা হইতে প্রচুর উপকার পাইবেন; তাঁহাদের পরিশ্রম, অর্থ এবং সময় অনেক বাঁচিয়া যাইবে, যাহা ব্যয় হইবে তাহাও সম্পূর্ণ সার্থক হইবে। দ্বিতীয়, সমিতি আপনার কর্ত্তব্য যথোচিত রূপে সম্পাদন করিলে দেশে তৎপ্রকাশিত তালিকার একটা প্রয়োজন ক্রমে অনুভূত হইবে, ক্রমে সর্ব্বত্র ইহার

আদর বাড়িবে, অবশেষে এমন এক সময় আসিতে পারে, যখন লোকে সাহিত্যের জন্য বিজ্ঞাপনের দিকে না চাহিয়া সমিতির তালিকার জন্য উৎসুক চিত্তে প্রতীক্ষা করিয়া রহিবে। যদি এমন দিন আইসে তাহা হইলে ব্যবসায়ী লেখকেরাও আর বিজ্ঞাপনের উপরে নির্ভর করিবেন না। তাঁহাদের অনেকেই সাহিত্য-ক্ষেত্র ছাড়িয়া ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিবেন; আর যাঁহারা নাছোড় হইয়া সাহিত্যকেই ধরিয়া থাকিবেন, তাঁহারাও বিজ্ঞাপনের যত্ন ও পরিশ্রমটা লিখিত গ্রন্থেই প্রয়োগ করিবেন।

শুনিয়াছি, কোন কোন প্রসিদ্ধ পরীক্ষায় পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর নাম জানিতে পারেন না, প্রশ্নের উত্তরে একটি সংখ্যা মাত্র থাকে, ফল-প্রকাশের সময়ে প্রত্যেক সংখ্যা-সূচিত নাম বাহির হয়। এ স্থলেও সে নিয়ম গ্রহণ করিলে মন্দ হইবে না। সমিতির সম্পাদক গ্রন্থের প্রথম পাতাগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া কেবল মাত্র মূল গ্রন্থখানিই সমালোচকের হাতে দিবেন। ইহাতেও সমালোচক যদি গ্রন্থকারকে চিনিয়া ফেলেন, তবে তিনি উহা সমালোচন না করিয়া ফেরত দিবেন। সম্পাদক যাঁহাকে যে গ্রন্থ সমালোচনার জন্য দিবেন, তিনি তাহারই সমালোচন করিবেন, অন্য গ্রন্থের নহে। যদি কোন সমালোচক সম্পাদকের নিকট কোন গ্রন্থ চাহেন, তিনি উহা লইয়া পড়িতে পারেন, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে উহার সমালোচন গ্রাহ্য হইবে না।

এরূপ অনুষ্ঠানে অবশ্য কিছু ব্যয় আছে; কিন্তু সে জন্য চিন্তার কারণ দেখি না। দরিদ্র সাহিত্য-সেবকেরা যদি দেশের মঙ্গলের জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন, তবে আমাদের ধনবান সাহিত্য-পোষকেরা কি উদাসীন রহিবেন?

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী।

বরেন্দ্র-ভ্রমণ।

২

চতুর্ভুজা।

দেওপাড়া হইতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইবা মাত্র, বরেন্দ্রের নগ্নমূর্ত্তি প্রকাশিত হইতে লাগিল। যতদূর দৃষ্টি-সঞ্চালনের সম্ভাবনা, ততদূর কেবল এক দৃশ্য;—নতোন্নত প্রান্তরভূমি, কচিৎ "তালীবননীলা," কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই বৃক্ষলতা দেখিতে পাওয়া যায় না। যে তৃণদল ধরিত্রীর শ্যামল অঞ্চল বলিয়া কবিকল্পনায় সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, এখানে তাহা শ্যামল নহে, পীতাভ। কেবল হেমন্ত কালেই বরেন্দ্র-প্রান্তর ভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করে; তখন প্রান্তরভূমি শস্যসম্ভারে পুলকিত হইয়া উঠে; তাহার উপর দিয়া বায়ুহিল্লোল এক অনির্ব্বচনীয় শোভা তরঙ্গায়িত করিয়া রাখে। হেমন্তের শেষে তাহার সন্ধান লাভের উপায় নাই;—তখন কেবল সৌন্দর্য্যের স্থানে অটল

গাম্ভীর্য্য ;—যেন কোন মহাযোগী শ্মশান-ভূমিতে যোগাসন বিস্তৃত করিয়া দীর্ঘধ্যানে সমাধিমগ্ন,—ভয়ে সমীরণ পর্য্যন্ত সতর্ক পদ-বিক্ষেপে বিচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে!

প্রান্তরের অপর প্রান্তে একটি পুরাতন নগর বর্ত্তমান ছিল;—এখন তাহার নাম চব্বিশ-নগর। অধিবাসীর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু শতবর্ষ পূর্ব্বেও গ্রামের অবস্থা এরূপ ছিল না। গ্রামখানির অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান্। তাহাদের মধ্যে একজন শতবর্ষ পূর্ব্বে একটি মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহা এখন ধ্বংসদশায় নিপতিত হইয়াছে। যে প্রস্তরলিপিতে নির্ম্মাণকাল লিখিত ছিল, তাহা গ্রামান্তরে নীত হইয়াছে। এখানে কতকাল হইতে মুসলমান অধিবাসীর প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছে। তাহার কিছু কিছু নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান আছে। তাহা অতি পুরাতন মস্‌জেদ এবং দরগার ধ্বংসাবশেষ।

একটি দরগার ধ্বংশাবশেষের মধ্যে এক খণ্ড প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরের দ্বারের ভগ্নাংশ দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তাহাতে কারু-কার্য্যের আভাস প্রাপ্ত হওয়া গেল। তাহা হয় ত দরগার সোপানরূপে ব্যবহৃত হইত;—সেই ভাবেই তাহা ভূগর্ভে অর্দ্ধ প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে। গ্রামের মধ্যে এরূপ পুরাতন প্রাসাদশিলার অভাব নাই। গ্রামবাসিগণে একস্থানে ইষ্টকাহরণের আশায় ভূমি খনন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; ভূমিতল হইতে বৃহদায়তনের প্রস্তরস্তম্ভ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামবাসিগণের সঙ্গে পদব্রজে গ্রামখানি পরিভ্রমণ করিয়া, এই সকল পুরা-কীর্ত্তির নিদর্শন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতে, সাহিত্যিকগণ গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিলেন। অবশেষে গ্রামের শেষ প্রান্তে আসিয়া, সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন,—বহু "বিতত তল্ল"—একটির পর একটি,—কত কিংবদন্তী অতল সলিলে চিরনিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছে। কাহারও সোপানাবলী কাচপ্রলেপযুক্ত বিচিত্র ইষ্টকাবলীতে সুসজ্জিত ছিল;—কাহারও তীরভূমিকে মন্দির-শোভা সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছিল;—এখন কেবল দেবমূর্ত্তির প্রস্তর-বেদিকা প্রান্তরভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে! একটি "তল্ল" সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য; তাহা এ অঞ্চলের সুবিখ্যাত "তপ্‌সহর";—যেমন বৃহৎ, সেইরূপ সুন্দর;—যেন সরোবর নহে, একটি ক্ষুদ্র হ্রদ, তাহার স্বচ্ছ সলিলে সেকালের সৌভাগ্যগর্ব্ব এখনও প্রতিবিম্বিত করিয়া রাখিয়াছে!

"তপ্‌সহর ছাড়িয়া আবার প্রান্তরভূমি; তাহারই অপর প্রান্তে মাড়ইল গ্রামের সীমা। এখানকার মন্দিরস্তূপ এবং তাহার জনশ্রুতি বরেন্দ্রভূমিকে এখনও শত বিভীষিকায় পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। এখানে একটি প্রস্তর-মন্দিরে এক রক্তভৃষাতুরা দেবীমূর্ত্তি নরবলি গ্রহণ করিতেন। মন্দির এখন ভূগর্ভে নিহিত হইয়া রহিয়াছে;—যখন কিয়ৎ পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হইত, তখন তাহার রুদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিতে গিয়া, কতলোকে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে! এখন কেহ আর তাহার স্থান অঙ্গুলি নির্দ্দেশেও দেখাইয়া দিতে সম্মত হয় না। সাহিত্যিকগণ যেন এখানে পদার্পণ না করেন,—আসিবার সময় অনেক অন্তঃপুর হইতে এরূপ অব্যক্ত

কাতরোক্তি নয়নকোণে সুব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল! কতক্ষণের পরে সকলে শ্মশানভূমিতে সমবেত হইলেন।

সত্য সত্যই তাহা অতীত গৌরবের শ্মশানভূমির ন্যায় প্রতিভাত হইল। নিকটে লোকালয়ের চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান নাই। গ্রামের দক্ষিণে, লোকালয় হইতে বহুদূরে প্রান্তর-সীমায় কবে কি উদ্দেশ্যে কাহার যত্নে এই দেবায়তন নির্ম্মিত হইয়াছিল, কেহ তাহার সন্ধান প্রদান করিতে পারে না। চারিদিকে চারিটি "তল্ল",—তাহাতে এখনও রক্তপদ্ম বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু পূজার জন্য কেহ আর তাহাতে হস্তার্পণ করিতে সাহস প্রকাশ করে না। মধ্যস্থলে মন্দিরস্তূপ; —তাহার উপর এক মহামহীরুহ,—কত কাল দেবমন্দিরটি ভূগর্ভে আশ্রয় লাভ করিয়াছে, তাহারই সাক্ষ্য দান করিতেছে। চতুর্দ্দিকের সমতলভূমি এক সময়ে প্রাঙ্গণ রূপে ব্যবহৃত হইত। তাহা হইতে মন্দির-স্তূপের শীর্ষদেশ চল্লিশ ফিট উচ্চ,—সকল স্থানই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ডে আচ্ছন্ন। কেহ সেখানে পদার্পণ করে না,—ইষ্টক-আহরণের জন্যও সাহস প্রকাশ করে না। তাহার উপর দিয়া ঝড় বৃষ্টি বহিয়া যায়, শীত গ্রীষ্ম চলিয়া যায়,—এইরূপে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, আরও কত শতাব্দী চলিয়া গেলেও স্থানটি চিহ্নহীন হইবে না।

এক সময়ে বরেন্দ্রক্ষেত্র তান্ত্রিক-সাধনার সিদ্ধিক্ষেত্র বলিয়া সুপরিচিত ছিল, কোন্ অতীত যুগে কিরূপ প্রয়োজনে তান্ত্রিকাচার জনসমাজের মধ্যে প্রভাববিস্তারে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, এখন তাহার তথ্য-নির্ণয়ের জন্য সুধীসমাজে নানা তর্কবিতর্ক প্রচলিত হইয়াছে। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বরেন্দ্রদেশে তান্ত্রিকাচারের অবস্থা কিরূপ ছিল, প্রসঙ্গ-ক্রমে একখানি বৈষ্ণবগ্রন্থে তাহার কিছু কিছু বিবরণ লিখিত হইয়াছিল। তখন মুসলমান-শাসনের প্রবল প্রতাপ! কিন্তু দেশের মধ্যে তখনও দেশের লোকের স্বেচ্ছাচারের প্রবল প্রতাপ মন্দীভূত হয় নাই। তাহারা তখনও দেবীর তুষ্টি সম্পাদনের আশায় নরমুণ্ড উৎসর্গ করিয়া দিত।

"এ দেশের লোক দস্যুকর্ম্মে বিচক্ষণ।
না জানয়ে ধর্ম্ম কিবা কর্ম্ম বা কেমন॥
করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে।
ছাগ-মেষ-মহিষ-শোণিত ঘরদ্বারে॥
কেহ কেহ মনুষ্যের কাটামুণ্ড লৈয়া।
খড়্গাকরে করয়ে নর্ত্তন মত্ত হৈয়া॥
সে সময়ে যদি কেহ সেই পথে যায়।
হইলেও বিপ্র তার হাতে না এড়ায়॥
সবে স্ত্রী-লম্পট জাতি-বিচার রহিত।
মদ্যমাংস বিনা না ভুঞ্জয়ে কদাচিত॥"
(নরহরি চক্রবর্ত্তি-বিরচিত নরোত্তম-বিলাসে সপ্তমোবিলাসঃ)

মাড়ইলের মন্দিরস্তূপের সঙ্গে হয় ত এই সকল কাহিনী জড়িত হইয়া, ইহাকে বিভীষিকার আধার করিয়া রাখিয়াছে। সে দেবীমূর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান আছে। তাহা বীভৎস নহে, সুন্দর;—যেমন বৃহৎ, সেইরূপ সুন্দর;—বরেন্দ্র ভাস্কর্য্য-কৌশলের অনির্ব্বচনীয় নিদর্শন। মন্দিরস্তূপের উপর হইতে অদূরে একটি উচ্চভূমি দৃষ্টিপথে পতিত হইল। একটি সুগভীর তল্ল, তাহার পার্শ্বদেশে একটি উচ্চভূমি, তাহার

উপর নানা লতাগুল্ম জন্ম গ্রহণ করিয়া অধিকাংশ স্থান আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার পার্শ্বে একটি বৃক্ষ,—সেই বৃক্ষমূলে দেবী চতুর্ভুজা আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। সাহিত্যিকগণ সেখানে আসিয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন;—তল্ল হইতে সদ্য প্রস্ফুটিত কমলদল আহরণ করিয়া সসম্ভ্রমে, দেবীমূর্ত্তিকে বিভূষিত করিয়া দিলেন। এক সময়ে যে দেবীমূর্ত্তি দেউলের মধ্যে, ধূপদীপের মধ্যে, আলো ও ছায়ার মধ্যে, বসন-ভূষণের চাক্‌চিক্যের মধ্যে, অর্চ্চনা-আরাধনার অনির্ব্বচনীয় মোহমন্ত্রের মধ্যে, দূর হইতে দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়া, ভক্তিসিন্ধু উদ্বেলিত করিত, এখন তাহাকে মুক্ত সমীরণের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে নিকট হইতে নিকটে দেখিয়া, তাহার রচনা-কৌশলের সকল সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি এই শ্রীমূর্ত্তি সে বনভূমিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল।

এই দেবীমূর্ত্তির অনতিদূরে—উচ্চভূমির অপর প্রান্তে—দুইখানি দ্বার-ফলকের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া গেল। একখানি বিচিত্র কারুকার্য্যে খচিত,—কৃষ্ণ-প্রস্তরের স্তরে স্তরে নানা নারীমূর্ত্তির অনিন্দ্যসুন্দর লাস্যবিকাশে উদ্ভাসিত। তখন সমগ্র মন্দির-দ্বারটির অনুসন্ধান আরব্ধ হইল। সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও, আর কোন ভগ্নাবশেষের সন্ধান লাভ করা গেল না। পরে জানিতে পারা গেল,—মন্দির-দ্বারের উপরের অংশটি এবং দেবীপদতললগ্ন বেদিকাপ্রস্তরটি এক ব্রাহ্মণ কুড়াইয়া লইয়া পূজা করিতেন। তাঁহার বাস্তুভূমির উপর এখন এক মুসলমান বাস করিতেছে। প্রস্তর খণ্ডগুলি সেখানেই পড়িয়া রহিয়াছে।

গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইষ্টকাচ্ছাদিত পুরাতন রাজপথের চিহ্ন দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল,—মাড়ইল চিরদিন এরূপ গণ্ডগ্রাম বলিয়া পরিচিত ছিল না। ইহা যে এক সময়ে একটি নগর রূপে পরিচিত ছিল, তাহার নানা নিদর্শন প্রকাশিত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে কারুকার্য্য-খচিত ইষ্টকশোভা পুরাতন প্রাসাদাবলীর রচনা-রীতির পরিচয় দান করিতে লাগিল। কিন্তু সাহিত্যিকগণ তখন সেই মন্দিরদ্বারের সন্ধান লাভের আগ্রহে কোন স্থানে অধিক কাল হরণ না করিয়া, মুসলমান কৃষকের কুটিরদ্বারে উপনীত হইলেন। দ্বারফলক দেখিবামাত্র সকলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। দ্বারফলকের মধ্যস্থলে একটি শিবলিঙ্গ; উভয় পার্শ্বে কত লতাপাতার সাজসজ্জা, তাহার মধ্যে হংসমূর্ত্তি; তাহার উপরে যে স্তরবিন্যাসে চিত্রবিভাগ সূচিত হইয়াছে, তাহাতে আকাশপথ,—সেই আকাশপথে বিদ্যাধর বিদ্যাধরী পূজার অর্ঘ্য লইয়া ভেরী বাদন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে!

কৃষক তাহার কুটিরদ্বারে সাহিত্যিকগণের এরূপ অচিন্তিতপূর্ব্ব সমবেশ দেখিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, আতিথ্যের জন্য একখানি গোযানের উপর আসন নির্দ্দেশ করিয়া তাম্রকূট হস্তে অভ্যর্থনা করিল। এত সরল, এত স্বাভাবিক, এত আন্তরিক, এত মর্ম্মস্পর্শী,—সে অভ্যর্থনা প্রত্যাখ্যাত হইবার সম্ভাবনা

ছিল না। সাহিত্যিকগণ সগৌরবে গোযানের আবরণহীন বংশবিতানের উপর উপবেশন করিয়া, কথা-কৌতুকে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। কৃষক এদেশের অধিবাসী ছিল না;—কিরূপে কাহার অত্যাচারে, কত দিন হইল, স্ত্রীপুত্র লইয়া এদেশে আসিয়া, আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার কাহিনী আদ্যন্ত বিবৃত করিয়া সমবেদনার উদ্রেক করিয়া দিল। বাঙ্গালার কঙ্কালাবশিষ্ট কৃষকদেহের মধ্যেও হৃদয় আছে। বেলা অধিক হইয়া উঠিয়াছে, ভট্টনিবাস এখনও অনেক দূরে,—সুতরাং কৃষক তাহার কুটিরে আতিথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাইতে কুণ্ঠিত হইল না। ভট্টগৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করায় অন্যত্র আতিথ্য গ্রহণের স্বাধীনতা ছিল না, তাহা বুঝিবামাত্র কৃষক পথ দেখাইয়া দিল;—সকলে আবার গজারোহণ করিয়া, সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

গ্রামের বাহিরে আসিলে, অতিদূরে ছায়া-চিত্রের ন্যায় ভট্টভবন দেখিতে পাওয়া গেল। তখন মধ্যাহ্ন গগনের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকিরণ বরেন্দ্রপ্রান্তরের উপর অনল বর্ষণ করিতে-ছিল। ধৈর্য্যের শেষ উপস্থিত না হইলে, দীর্ঘপথের শেষ দেখিতে পাওয়া যায়,—যথাকালে সাহিত্যিকগণ তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। শীতল জলে স্নান করিয়া স্নানের পর বরেন্দ্রভূমির পুরাপ্রচলিত শিষ্টাচার রক্ষার্থ জলযোগ করিয়া, সাহিত্যিকগণ মধ্যাহ্নের আহারের জন্য প্রস্তুত হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। ভট্টবংশধর যথাশাস্ত্র অতিথি-সৎকার করিবার আশায়, একটি মেষ বলি দিয়া, পূজা সাঙ্গ করিয়াছিলেন; সুতরাং প্রসাদলাভে বিলম্ব ছিল। সেই অবসরে পুরাতন পুথির অনুসন্ধান আরব্ধ হইল। জীর্ণবস্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ তন্ত্রসার, কুলার্ণব, তাহার সঙ্গে বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশ, মারণ উচাটন বশীকরণের মন্ত্রসংগ্রহ, স্মরণ করাইয়া দিল;—"অশেষবিৎ পাণিনিরেকসূত্রে শ্বানং যুবানং মঘবানমাহ"।

আর না আর না করিয়াও, মধ্যাহ্ন-ভোজন বড় গুরুভোজন হইল,—মেষমাংস সম্পৃক্ত আতপতণ্ডুলের পলান্ন, তাহার সঙ্গে বিবিধ ব্যঞ্জন, দধি ক্ষীর মিষ্টান্ন এবং পায়স-পিষ্টকের আক্রমণে সাহিত্যরথিগণ রণে ভঙ্গ দিবার উপক্রম করিয়া তুলিলেন। আহারের পর বিশ্রাম করিতে করিতে স্থির হইল,—একটি হস্তী লইয়া একদল নিকটস্থ অন্যান্য গ্রামে ভৌগোলিক তত্ত্বানুসন্ধানে বহির্গত হইবেন; অন্যান্য সকলে ভট্টবংশধরকে সঙ্গে লইয়া, পুনরায় মাড়ইল পরিদর্শনে নিযুক্ত হইবেন।

পুনরায় মাড়ইলে উপনীত হইয়া এক বৃক্ষতলে বহুসংখ্যক শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গেল। একটি শ্রীমূর্ত্তি বৃক্ষকোটরে এরূপ ভাবে বৃক্ষ-ত্বকে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে বৃক্ষমূলের কিয়দংশ ছেদন না করিলে, তাহাকে বাহির করিবার উপায় নাই। কেহ ছেদন করিতে সম্মত হইল না, উপযুক্ত অস্ত্র দান করিতে কাতরতা প্রকাশিত করিল। তখন এই গুরুভার একজন সাহিত্যিকের উপর সমর্পণ করিয়া অন্যান্য সকলে চতুর্ভুজার নিকটে উপনীত হইলেন। বেলা আর অধিক নাই; অনেক অনুসন্ধানের পর গোযান সংগৃহীত হইয়াছে, এখন চতুর্ভুজাকে

ও মন্দিরদ্বারের প্রস্তরফলকগুলিকে তাহাতে বোঝাই করিতে পারিলেই, প্রত্যাবর্ত্তন আরব্ধ হইতে পারে। কিন্তু এই কার্য্য কিছুতেই সহজ হইল না;—সাহিত্যিকগণকে কোদালি ধরিতে হইল, কাঁধ লাগাইতে হইল, গোযানে বোঝাই করিবার সকল শারীরিক ক্লেশই অম্লানবদনে বহন করিতে হইল। বৃক্ষমূল ছেদন করিয়া শ্রীমূর্ত্তিগুলি সঙ্গে লইয়া, অপর সাহিত্যিক সন্ধ্যার সময়ে গো-যানের নিকট উপনীত হইলেন ; কিন্তু যাঁহারা ভৌগোলিক তত্ত্বানুসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন তাঁহাদের আর সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া গেল না। অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, পিপাসা প্রবল হইয়া পড়িল; সুতরাং শিবিরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করাই স্থির হইল। ভট্ট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইতে রাত্রি অধিক হইয়া গেল। কিন্তু তখনও ভৌগোলিক তত্ত্বানুসন্ধানকারিগণ প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। দুই এক বিন্দু বৃষ্টি পতিত হইতেছে, চারিদিক মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে, নিকটে ব্যাঘ্রের উপদ্রবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে,—দুর্ব্বৃত্ত মধ্যাহ্নে গোহত্যা করিয়াছে,—তাহার ভয়ে রজনীতে শিবির রক্ষায় ব্যবস্থা হইতেছে। এমন সময়ে সেই হস্তীটি ফিরিয়া আসিল। বন্ধুগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া জানিতে পারা গেল, —তাঁহারা পথ হারাইয়া বনের মধ্যে পদব্রজে আসিতে আসিতে ব্যাঘ্রের কবলে নিপতিত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। সকলেরই হস্তপদে ক্ষতচিহ্ন,—তাহার সহিত ব্যাঘ্রের সম্বন্ধ থাকিলেও ব্যাঘ্রনখরের সম্বন্ধ ছিল না। তাড়াতাড়ি গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিবার সময়ে কণ্টকবনে হস্তপদ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। বরফজলে ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া, সকলে মিলিয়া নৈশভোজন-ব্যাপারে নিবিষ্ট হইলেন। আবার মাংসসংপৃক্ত পলান্ন,—কিন্তু কেহ আর তাহাতে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিলেন না। চতুর্ভুজার আশীর্ব্বাদে রজনী নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হইয়া গেল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

বিলাতের কথা।

বসন্তের বাহার।

আমাদের বসন্ত কবিকল্পনায় যেরূপ ফুটিয়াছে, বর্ত্তমানে প্রকৃতি-অঙ্গে তেমন ভাবে প্রায়ই ফুটিতে দেখা যায় না। শীত ফুরাইতে না ফুরাইতে, তড়িৎ গতিতে নিদাঘ আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং বসন্তের প্রকৃত বাহার আমরা প্রত্যক্ষ করিবার অবসর পাই না। এক দিন, বোধ হয়, এমন ছিল না। এক দিন হিন্দু বসন্ত কল্পনা করে নাই, প্রত্যক্ষ করিত। তখন হয় ত সে ভারতের অন্য ভূভাগ অধিকার করিয়া ছিল। অথবা তখন হয় ত, দেশে কালপ্রভাবে এমন করিয়া ঋতুরিপর্য্যয় ঘটে

নাই। তখন হয় ত, তাহতেও তুষারপাত হইত, নিদারুণ শীতে প্রকৃতির অঙ্গ কঠোর, শুষ্ক, জীবনের চিহ্নহীন হইয়া পড়িত। সে সময়ে শীতাবসানে বসন্তের বাহারও ফুটিয়া উঠিত। এখানে, আমাদের দেশের মত ঋতুবৈচিত্র্য নাই। এ দেশে চার ঋতুতে বর্ষ শেষ হয়; আমাদের ছয় ঋতুতে বর্ষ গণনা হইত, এখনো হইয়া থাকে। ফলে, এখন আমাদের ঋতু ছয়টা না তিনটা, তাহা বিচার্য্য বটে। এখানে শীত যেমন দুরন্ত, বসন্ত তেমনি সুন্দর, অদ্ভুত, অলৌকিক। এখানে শীতে বহিঃপ্রকৃতি যেন মরিয়া যায়, মাঠে ঘাস থাকে না, গাছে পাতা থাকে না, কোথাও প্রকৃতি-অঙ্গে জীবনের চিহ্ন লক্ষিত হয় না। তার পর, যখন বসন্তের হাওয়া মৃদু মৃদু বহিতে আরম্ভ করে, তখন সহসা এই মৃত প্রকৃতি যেন নবজীবন পাইয়া শিহরিয়া উঠে। এ জন্ত বসন্ত এখানে সত্য সত্যই যেন মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র মুখে লইয়া উপস্থিত হয়। এই দু'মাস পূর্ব্বে—এই লণ্ডন সহরের গাছপালাগুলো শুকনো কাঠ হইয়া যেন দাঁড়াইয়াছিল। এরা যে আবার হরিত-কোমল পত্রপল্লবে সুশোভিত হইয়া উঠিবে, তখন এ কল্পনাও যেন অসম্ভব বোধ হইত। আর আজ সহসা এই মৃত প্রকৃতি জীবন-রসে ভরিয়া উঠিয়াছে। মরা ডালে পল্লব, মরা গাছে ফুল, শুষ্ক বনে হরিত-আচ্ছাদন ছাইয়া গিয়াছে। এমন জীবনের সম্ভার, এমন লতাপাতার বাহার, এমন বরণ-কীরণ-গন্ধের ছড়াছড়ি আমাদের বসন্তে দেখা যায় নাই। আর, যেমন প্রকৃতি তেমনি মানুষেও যেন বসন্ত-সমাগমে এক নূতন আভা ফুটিয়া উঠে। ঋতুতে ঋতুতে এ দেশে প্রকৃতি যেমন বেশপরিবর্ত্তন করে, সাহেব-মেমেরাও তেমনি করিয়া থাকেন। বিশেষ মেম-সাহেবেরা, শীতের গাঢ় কৃষ্ণ পরিহার করিয়া, বসন্তে বিচিত্র বর্ণের পরিধেয়ে আপনাদিগের বরবপু সুসজ্জিত করিয়া থাকেন। বিলাতী বরবর্ণিনীগণ এ সময়ে যেন নিজেরাও বসন্তের বরণ-কীরণ-গন্ধ সম্ভার লইয়া বসন্তের মলয়-হিল্লোলের ন্যায় মুগ্ধ মানবের ক্ষুব্ধ চিত্তকে দোলাইয়া, নাচাইয়া, লুটিয়া, ফেলিয়া চারিদিকে বিলাসের তরঙ্গ তুলিয়া বনে উপবনে, পথে ঘাটে, নাচে ও নাটো, জলে স্থলে, সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে আরম্ভ করেন।

বসন্তের বাহার ও শোকের আঁধার

রাজশোকে এবারে এ বসন্ত লীলায় কতকটা ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। এ দেশে শোকের রং কালো। শোকার্ত্তের চিহ্ন কৃষ্ণ পোষাক। প্রথম অবস্থায় গাঢ় কৃষ্ণতা শোকের নিদর্শন। তখন হ্যাট্-কোট-বুট, টুপি-ওড়না-গাউন, স্ত্রীপুরুষ সকলেরই পরিচ্ছদ নিরবচ্ছিন্ন কালো হওয়া চাই। যত দিন যায়, ততই এই কৃষ্ণত্বের গাঢ়তাও হ্রাস হইতে থাকে। পুরা-শোকে—ইংরেজিতে ইহাকে full mourning কহে,—সকলই নিরবচ্ছিন্ন কালো হওয়া আবশ্যক। তার পর আর্দ্ধেক শোকে বা হাফমোর্ণিংএ (half mourning) কালোর সঙ্গে সাদা মিশিতে পারে। ক্রমে শোকচিহ্ন সরু কালো ফিতায় পর্য্যন্ত পরিণত হয়। সাদায় কালোয় রাষ্ট্রীয়-নীতিতে যতই বেশি কালো হউক না কেন,

পরিচ্ছদ-নীতিতে বড়ই মিলিয়া মিশিয়া যায়। কালোর উপরে সাদার বা সাদার উপরে কালোর বাহার বড় ফুটিয়া উঠে। ক্রমে এখানেও শোকের তীব্রতা যত কমিতেছে, ততই কৃষ্ণের সঙ্গে নানা উজ্জ্বলতার বর্ণের সমাবেশ হইতেছে। এ বর্ণবৈচিত্র্য বসন্তের বাহার নষ্ট না করিয়া বরং বাড়াইয়াই দিয়াছে। সচরাচর বাসন্তী বিহারের মধ্যে একটা অসংযত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। শীতে মানুষ ও উদ্ভিদ সকলেই এ দেশে কতকটা সংকুচিত হইয়া, কতকটা মুশড়িয়া যায়। বসন্তে এ সংকোচভাব নষ্ট করিয়া ফেলে। সকলেই যেন আপনাকে ছড়াইবার জন্ত, বাড়াইবার জন্ত, জগতের জীবন-স্রোতে ভাসাইবার জন্ত, বিশ্বের রসে ডুবাইবার জন্ত, অল্পবিস্তর ব্যাকুল হইয়া পড়ে। এ বাসনা-তরঙ্গে সংযমের অবসর অল্প। বসন্ত সর্ব্বদাই একটু অসংযত। পোষাক-পরিচ্ছদে, আমোদ-প্রমোদে, ক্রীড়াকৌতুকে সকল বিষয়েই বসন্ত একটা অসংযত ভাব আনিয়া দেয়। কিন্তু রাজ-শোকে এ বৎসর বিলাতে বাসন্তী লীলায় কতকটা সংযম আনিয়া দিয়াছে। কৃষ্ণ বর্ণের সমাবেশে বাসন্তী পরিচ্ছদের বর্ণবৈচিত্র্য সংযত হইয়াছে। রাজ-দরবারের অশৌচে নৃত্যগীতের কোলাহল অনেকটা কমিয়াছে, এ জন্ত অভিজাত-সমাজেও কতকটা সংযম আসিয়া পড়িয়াছে। আর শ্রেষ্ঠ জনেরা যাহা করেন, জনসাধারণে সর্ব্বদাই তার অনুকরণ করিয়া চলে; এ জন্ত জনমণ্ডলী মধ্যেও যেন কতকটা সংযম আসিয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, এ বৎসর ঘোড়দৌড়ের মেলায় যে সংযতভাব দেখা গিয়াছে, এমন কখনো পূর্ব্বে দেখা যায় নাই।

আমোদ-প্রমোদ।

কিন্তু সমাজের আমোদ-প্রমোদের কোনই হ্রাস লক্ষিত হয় নাই। ফলতঃ এ দেশের লোক আমোদ-প্রমোদ নহিলে থাকিতে পারে না। প্রাতে নয়টা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা পর্য্যন্ত এরা প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া ধনোপার্জ্জন করে, তার পর একবার নিশ্চিন্ত হইয়া, মনটাকে হাত পা ছড়াইয়া খানিকটা বিশ্রাম করিবার অবসর না দিলে চলে না। শরীরের পক্ষে যেমন অন্ন-পান, মনের পক্ষে এদের সেইরূপ নাচ-তামাসা। এই লণ্ডন সহরে, পাড়ায় পাড়ায় নাট্যশালা ও রঙ্গালয়। আর এই সকল প্রতিদিন লোকে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। অনেক রঙ্গালয়ে ও প্রায় প্রত্যেক নাচঘরে বা মিউজিক হলে (Music hall) দিনে দুবার করিয়া অভিনয়, নাচ-গান হয়। অপরাহ্ন দুই ঘটিকায় একবার, রাত্র ৮৷৷৹ টার আর একবার। আর দু'বারই ঘরগুলো লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। মনে হয় যেন এই লণ্ডন সহরের স্ত্রী-পুরুষ কেহ অন্ততঃ সপ্তাহে একবার করিয়া নাচ-ঘরে বা রঙ্গালয়ে না গিয়া থাকিতে পারে না। এ সকল আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন যে জনতা হয়, এ দেশে যত গীর্জ্জা আছে তার সকলে মিলিয়াও এত লোকের সমাগম হয় না। এই লণ্ডন সহরে শতকরা আশীজন কখনো কোন গীর্জ্জায় যায় না, শতকরা সত্তরজন বোধ হয় সপ্তাহে একবার করিয়া

কোন না কোন নাচ ঘরে বা রঙ্গালয়ে না গিয়া থাকিতে পারে না।

বিলাতী নাট্যকলা।

আর এই সকল আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে জনমণ্ডলীর ভিতরকার চরিত্রের যে প্রমাণ পাওয়া যায় আর কোথাও তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই। নাট্যকলা এক সময়ে ইংরেজ-সমাজে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল সন্দেহ নাই। নাট্যকলার এরূপ উৎকর্ষতা ব্যতীত এ দেশে শেক্ষপীয়রের সম্ভব কখনো সম্ভব হইত না। কিন্তু শেক্ষপীয়রের নাটক এখন শেক্ষপীয়র উৎসব উপলক্ষে কেবল একবার, একটি মাত্র রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়া থাকে। পরলোকগত স্যার হেনরি আইভিং শেক্ষপীয়রের অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার হ্যামলেট অপূর্ব্ব সৃষ্টি ছিল। আইভিংয়ের পরে বিরভসৃষ্টি কতকটা শেক্ষপীয়রের অভিনয়ে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, সত্য; কিন্তু লোকে আর শেক্ষপীয়রের নাটকের অভিনয় পছন্দ করে না। শেক্ষপীয়রের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি যে গুলি তাহাতে আর এখন জনসাধারণের তৃপ্তি হয় না। হ্যামলেট্ বা টেম্পেষ্ট বা ম্যাকবেথ বা জুলিয়াস্ সীজার এ সকলের রস আস্বাদন করিতে হইলে যে অভিনিবেশের প্রয়োজন, এখন ইংরাজ আর সেরূপ ভাবে নিবিষ্ট চিত্তে কোনো বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে পারে না। বিলাসিতা যে পরিমাণে বাড়িয়া যায় সে পরিমাণে গভীরতর রস আস্বাদনে লোকের শক্তি-সামর্থ্যও বোধ হয় হ্রাস হইতে থাকে। একেবারে বর্ব্বরতাতে যেমন নাট্যকলার শ্রীবৃদ্ধি অসম্ভব, একান্ত ভোগবিলাসেও সেইরূপ। দুই-ই মানুষকে একান্তভাবে ইন্দ্রিয়াধীন করে। বিশেষতঃ কলার অনুশীলনে মানুষের অতীন্দ্রিয় বৃত্তি সকলকে সজাগ করিয়া তুলিতে হয়, নতুবা কোন প্রকারের রসাস্বাদনেই মানবের অধিকার ও সামর্থ্য জন্মে না। বর্ত্তমানে ভোগবিলাসিতার তাড়নায় সভ্যসমাজে অতীন্দ্রিয় বৃত্তির অনুশীলনের আত্যন্তিক ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। এ জন্য ক্রমে এত অভূতপূর্ব্ব বর্ব্বরতা আসিয়া এই গর্ব্বিত মদোন্মত্ত সভ্যতাকে অলক্ষিতে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিলাতী নাট্যালয় সকলে ইহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। সর্ব্বত্রই কেবল অদ্ভুত রসের ছড়াছড়ি। বিলাতী রঙ্গমঞ্চে এখন বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় আর দেখা যায় না। ইংরেজ, শোককে সম্ভোগ করিবার যে উচ্চ অধিকার, তাহা হইতে একেবারে বঞ্চিত হইয়াছে। এখন মেলোড্রামারই (melo-drama) এখানে ছড়াছড়ি, আর যা কিছু অভিনীত হউক না কেন তাতেই রংএর ছড়াছড়ি ও হাত-পা নাড়ার ছড়াছড়ি চাই। না হইলে দর্শকমণ্ডলীর মন উঠে না। পান্টোমাইম লোকে ভালবাসে, নাচঘর সকলে কেবলই মাতামাতি ছড়াছড়ির পালা পড়িয়াছে। ইহার শেষ কোথায় হইবে কে জানে? ইংরেজ এখন একটা নতুন কিছু দেখিবার জন্য ব্যগ্র।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

ভবিষ্যতের ভাবনা।

বঙ্গবিভাগের পর আমরা এ কয় বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছি, যাহাতে বিভাগ রহিত হইয়া আবার ছিন্ন অংশদ্বয় যুক্ত হয়। কেননা এই বিভাগের সুযোগে যদি একদিন বাঙ্গালী জাতিও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, তবে এই উদীয়মান জাতির সর্ব্বনাশ হইবে। জাতীয় জীবনের যে সমস্ত শক্তিকেন্দ্র আছে, জনসংখ্যা তাহার মধ্যে একটি সর্ব্বপ্রধান। আরও একটি বিপদ আছে। ভাই যখন ভাইকে পরিত্যাগ করে, অতি সামান্ত ঘরাও কথায় যদিও এই দুর্ঘটনা ঘটে, কিন্তু বিবাদ এমন গুরুতর আকার ধারণ করে যে পরস্পরের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়। পাড়া প্রতিবাসীর সঙ্গে যে সাধারণ সৌহার্দ্দ্য তাহাও উভয়ের মধ্যে থাকে না। এই জন্ত ইংরাজীতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে, সমুদ্রের উভয় তীরবর্ত্তিগণের মধ্যে যে দূরত্ব তাহা অপেক্ষা নদীতীরবর্ত্তীদিগের দূরত্ব বেশী (Brooks make wider difference than Oceans). সেই জন্তই দেখা যায় বাঙ্গালীর সঙ্গে উড়িয়া, আসামী বা বেহারীর যেমন রেষারেষি, দূরবর্ত্তী অন্তান্ত ভারতবাসীর সঙ্গে তেমন নহে। সেই জন্তই বঙ্গবিভাগে আমাদের এত আশঙ্কা। ইহা উপলব্ধি করিয়া আমরা জাগ্রত এবং সতর্ক আছি, ঘুমাইয়া না পড়িলে আর কোন ভাবনা নাই। কিন্তু একটি বিষয় সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য, তাহা এই—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির একতার মূলসূত্র কি? সামাজিক রীতিনীতি, বিধি-ব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার, যাহাদিগকে সাধারণতঃ জাতীয় একতার মূল উপাদান বলিয়া সকল জাতির মধ্যে ধরা যায়, তাহাই কি বাঙ্গালীর সম্বন্ধেও খাটিবে? কিয়ৎপরিমাণে খাটিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ খাটিবে না। বাঙ্গালী দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্ম্মে বিভক্ত। একদেশবাসী বলিয়া আচার-ব্যবহার কিয়ৎপরিমাণে এক হইলেও ধর্ম্মের বিভিন্নতা এ বিষয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ উৎপন্ন করিয়াছে। সুতরাং ইহার উপর আমরা বিশেষ জোর দিতে পারি না। দূরত্ব এবং নিকটবর্ত্তিতাও এখানে মাপদণ্ডরূপে ব্যবহার করা চলিবে না। সিলেটবাসী, কলিকাতাবাসী বা মানভূমবাসী বাঙ্গালী; কিন্তু বালেশ্বরবাসী ও মেদিনীপুরবাসী এক জাতি নহে। অন্ততঃ একজাতি বলিয়া গণনা করা হয় না। এখনই কথা উঠিয়াছে যে, পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গবাসীদিগের কোনও বিষয়েই মিল নাই—আচার-ব্যবহারে মিল নাই, পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি আদান-প্রদান নাই। সুতরাং একত্র থাকিবার আন্দোলনটার যে কোনও মূলগত ভিত্তি আছে তাহা নহে। ইহা কেবল ভারতবাসীর রক্ষণশীল প্রকৃতির একটা উচ্ছ্বাস মাত্র, তাহাদের পরিবর্ত্তন বিরোধিতার একটা বহিঃপ্রকাশ। উড়িয়াকে যদি বাঙ্গালী হইতে একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে উপরোক্ত আপত্তি খণ্ডন করা দায় হইবে। কেননা, বাঙ্গালীর

সহিত মোটের উপর উড়িয়ার যে পার্থক্য, পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্ব্ববঙ্গের পার্থক্য বোধ হয় তাহা অপেক্ষা কম নহে। সুতরাং ভাষার কথা ছাড়িয়া দিলে, উভয়কে দুই দেশে পরিণত করা অতি কষ্টকর ব্যাপার নহে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গ বিভিন্ন শাসনের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আন্দোলন না থামাইতে পারি, কিন্তু উভয়কে একত্র করা আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। এখন যদিও শাসনপ্রণালী একই আছে, কিন্তু চিরদিন এক থাকিবে না। অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান দিন দিন যেমন ভিন্ন হইবে, জাতীয় প্রকৃতিও সেই পরিমাণে ভিন্ন হইবে, ইচ্ছা না করিলেও হইবে। এই তো স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে পূর্ব্ববঙ্গের গবর্ণমেণ্টের কিঞ্চিৎ বেশী আগ্রহ দেখা যাইতেছে। অন্য দিকে আবার পশ্চিমবঙ্গে শাসনের কঠোরতা কিঞ্চিৎ কম। তার পর যদি ইউনিভার্সিটি ও হাইকোর্ট নূতন করা হয় তাহা হইলে বাহিরের দিক্ হইতে একতা-বন্ধন একরূপ ছিন্ন হইয়া যাইবে। চিন্তাস্রোত পর্য্যন্ত বদ্‌লাইয়া যাইবে। বাহির হইতেও যে সময়ে সময়ে মনোমালিন্যের কারণ ঘটিবে না তাহা নহে। রাজনৈতিক দিক্ হইতে দিন দিন বিভিন্নতা বাড়িবেই, আমাদের জাতিভেদ ও রক্ষণশীলতা কোনও প্রকার সামাজিক ঘন নিবিষ্টতার অন্তরায় চিরদিনই রহিয়াছে। তাহা যে আজ আমরা হঠাৎ পরিত্যাগ করিয়া রাজনৈতিক রোগের ভেষজস্বরূপ ব্যবহার করিতে পারিব, তাহা নহে। বরং দিন দিন মেলামেশার ব্যাঘাতই উৎপন্ন হইবে, দুই বঙ্গ একত্র থাকিবার সময় কাজকর্ম্মোপলক্ষে পরস্পরের মধ্যে যাতায়াত ছিল, সুতরাং আদান-প্রদানের একটা সুবিধা ছিল। দিন দিন সেটাও যে কমিয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্ববঙ্গবাসী পাইলে কেন আর পশ্চিমবঙ্গবাসীকে নূতনবঙ্গে চাকুরী দেওয়া হইবে? সুতরাং ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক দিন দিন উভয়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধিই পাইবে। এরূপ স্থলে বাঙ্গালীকে একজাতি রাখিবার উপায় কি? এমনও যাহা সমগ্র বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী করিয়া রাখিয়াছে, সকল বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যবন্ধনের রজ্জু-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, সেই নিয়াশ্রয়ের আশ্রয়কে আরও শক্ত করিয়া ধরিতে হইবে। কে শ্রীহট্ট, শান্তিপুর, পুরুলিয়াকে একসূত্রে গাঁথিয়া বাঙ্গালী-হারে পরিণত করিয়াছে? তিনি আর কেহ নহেন, আমাদের বরণীয়া মাতৃভাষা। যে ভাষা অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছেন, এ বিপদে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া বাঙ্গালীর আর অন্য গতি নাই। অসতর্ক হইলে আমরা নিজেরাই আমাদের বক্ষ বিদীর্ণ করিব। কেন, এখন তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছি।

ভাষার দুই দিক, সংস্কৃত ও প্রাকৃত। কথোপকথনের ভাষা ও লিখনের ভাষা সর্ব্বত্র বিভিন্ন। ইহা কেবল বাঙ্গালীর বিশেষত্ব নহে। একই দেশে একই জাতির মধ্যে কথোপকথনের ভাষা নানা হইতে পারে, কিন্তু লিখিবার ভাষা এক। এই লিখিবার ভাষা একাধিক হইলে জাতীয় একতা বেশী দিন টিকিতে পারে না। বহু

প্রাকৃতের মধ্যে এক সংস্কৃতই কেবল সকলকে এক করিয়া রাখিয়াছে। লণ্ডনের কথিত ভাষা, পার্থের কথিত ভাষা নহে, কিন্তু ইংরাজীর সংস্কৃত এক। শরীরের বিভিন্ন অংশ যেমন একমাত্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু বিভিন্ন অংশের জীবনী শক্তি যদি ভিন্ন ভিন্ন হয়, তবে যেমন অংশ সকলের একতা বিনষ্ট হইয়া যায় তেমনি বিভিন্ন প্রাকৃত সকল এক বন্ধন-রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া তাহার একত্ব বিধান করিতেছে। যে প্রাকৃত ভাষাতেই আমরা কথা কহি না কেন, লিখিবার সময় সকলেরই আশ্রয় এক সংস্কৃত। শ্রীহট্টের প্রাকৃত ভাষা রাঁচিতে সম্পূর্ণ অবোধ্য হইলেও শ্রীহট্ট ও রাঁচিতে লিখিবার ভাষা একই। এই সংস্কৃত ভাষাই একতার ভিত্তি। লিখিয়া যখন মনের ভাব প্রকাশ করিলাম, তখন সকলের নিকট সুবোধ্য। সংস্কৃতের একতা রক্ষাই জাতীয় একতা-রক্ষার একমাত্র উপায়। এই একতা হারাইলে জাতীয় একতা রক্ষা অসম্ভব। আজ যে আসামী ও উড়িয়া বাঙ্গালী হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কারণ এই যে তাঁহাদের লিখিবার ভাষা ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। নতুবা উড়িয়া ভাষার মধ্যে এমন কিছু নাই, যাহাতে উহা বাঙ্গালার একটা প্রাদেশিক ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। শ্রীহট্টের কথোপকথনের ভাষা লিপিবদ্ধ করিলে তাহার সঙ্গে বাঙ্গালার সংস্কৃতের যে বিভিন্নতা দেখা যাইবে, উড়িয়া ভাষার বিভিন্নতা তাহা অপেক্ষা কিছুতেই অধিক দাঁড়াইবে না। অথচ শ্রীহট্টবাসী বাঙ্গালী, কিন্তু উড়িয়া বাঙ্গালী নহেন। অর্থাৎ একটি প্রাকৃতকে সংস্কৃত করিয়া জাতির এক অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এক শাসনাধীনে থাকিয়াও সে বিচ্ছিন্নতা দূর করিবার উপায় মিলিতেছে না। ভাষার বন্ধন ছিন্ন হইলে আর কিছুতেই জাতীয় একতা রক্ষা করা যায় না। এই ভাষাগত বিপত্তিতেই বাঙ্গালী উড়িয়া ও আসামীকে হারাইয়া শক্তিহীন হইয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। বাঙ্গালাভাষার সংস্কৃতের বিশুদ্ধতা সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু সে দিকে সম্প্রতি কিঞ্চিৎ শিথিলতা দৃষ্ট হইতেছে। সেই জন্ম আমরা ভীত হইয়াছি। পশ্চিমবঙ্গে এক নূতন সংস্কৃতের আবির্ভাব হইয়াছে। অন্ততঃ কেহ কেহ পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন প্রাদেশিক ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এরূপ চলিলে বঙ্গবিভাগে আর বেশী বিলম্ব হইবে না। কলিকাতাবাসী যদি তাঁহার কথোপকথনের ভাষায় লেখেন, তবে ঢাকাবাসী না লিখিবেন কেন? এই রূপে বাঙ্গালায় দুইটি সংস্কৃতের সূচনা হইবে। দুইটি সংস্কৃত হওয়াও যা, আর জাতীয় একতা বিনষ্ট হওয়াও তা,—একই কথা। কলিকাতার ভাষাকে সংস্কৃত করিলে যেমন তাহার চতুষ্পার্শ্বে কতকগুলি প্রাকৃত মিলিবে, পূর্ব্ববঙ্গের সংস্কৃতের চারিদিকেও প্রাকৃতের অভাব হইবে না। সুতরাং বাঙ্গালী ধীরে ধীরে দুই জাতিতে বিভক্ত হইয়া যাইবে। তার পর লিপি-পার্থক্য ঘটিলে তো ষোল কলা পূর্ণ। আমাদিগকে এখনই বিশেষ সাবধান হইতে

হইবে। যে পথে সামান্ত একটু আশঙ্কার কারণ সে পথে আমরা যাইতেই পারি না। কেননা, ভাষার একতাই আমাদের এক মাত্র সম্বল। এখন চারিদিকে বাঙ্গালা ভাষায় নানা প্রকার পরিবর্ত্তনের যেরূপ প্রস্তাব সকল উপস্থিত হইতেছে তাহাতে ভয় হয়, এক বঙ্গ তাহা গ্রহণ করিলেও অপর বঙ্গ যদি তাহা গ্রহণ না করে তবে বিপদ ঘনীভূত হইয়া উঠিবে। দুই বঙ্গের শাসন-বিভাগ যখন ভিন্ন, তখন উভয়ের পক্ষে সব বিষয়ে একযোগে চলা সম্ভব হইবে না। পূর্ব্ববঙ্গের কর্ত্তারা যদি বলেন, রোমান অক্ষর প্রচলিত হউক, তাহা হইলে বালকেরা দুই রকম অক্ষর পরিচয়ের পরিশ্রম হইতে রক্ষা পাইবে এবং আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ নেতৃ-বর্গের অনেকে সে প্রস্তাবে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া সায় দিবেন। ইতিপূর্ব্বে একবার ঢাকায় স্বতন্ত্র ভাষা প্রচলনের দেশীয় অনু-মোদনকারী মিলিতে দেরী হয় নাই। আবার সেই প্রস্তাবটিকে পুনর্জ্জীবিত করিলে কি উত্তর দিবার আছে? কলি-কাতার যদি কলিকাতার ভাষায় পুস্তক লেখা অন্যায় না হয়, ঢাকার কেন অন্যায় হইবে? এখন তো সোনায় সোহাগা। ঢাকা এখন স্বতন্ত্র রাজ্যের রাজধানী। ঢাকার ভাষায় বই লিখিয়া দেবনাগর অক্ষরে ছাপাইতে আরম্ভ করিলে কে ঠেকাইয়া রাখিবে। দেবনাগর অক্ষর প্রচলনের জন্যও তো সভা-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এক বঙ্গ তাহা গ্রহণ করিয়া অন্য তাহা গ্রহণ না করিলেই তো কার্য্যসিদ্ধি। এইরূপ যখন চারিদিকে বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে, তখন কোনও প্রাদেশিক ভাষাকে সংস্কৃতের আসনে তুলিয়া দেওয়া নিতান্তই অবিবেচনার কাজ হইতেছে বলিয়া মনে হয়। একদিকে শাসন-বিভাগ ইতিপূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছে, একতাযন্ত্রের এক তার ছিঁড়িয়াছে। আচার-ব্যবহার, ভাবভঙ্গী, শিক্ষাসভ্যতায়, সর্ব্বোপরি কথোপকথনের ভাষায় এক দুরতিক্রমণীয় বিভিন্নতা তো চলিয়াই আসিয়াছে, শাসন বিভক্ত হওয়ায় আরও বাড়িবে। এরূপ স্থলে জাতীয় একতার মেরুদণ্ড স্বরূপ লিখিত ভাষার মধ্যে ভেদ উৎপন্ন করা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের বিনাশ-পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া নয় কি? আমরা বলিতে বাধ্য, যাঁহারা প্রাদেশিক ভাষাকে বাঙ্গালায় সংস্কৃতের পদবীতে উন্নতি করিয়া দিতেছেন, তাঁহারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে খাল কাটিয়া কুমীর ডাকিয়া আনিতেছেন। কোনও বিশেষ প্রাকৃত ভাষা যতই শ্রুতিমধুর হউক না কেন, কথোপকথনের উপযোগিতা তাহার মধ্যে যতই বেশি থাকুক না, ভাষার একতা বিনাশ না করিয়া সে সংস্কৃতের আসন গ্রহণ করিতে পারে না। বাঙ্গালীর পক্ষে ভাষার একতার বিনাশ আর জাতীয় একতার বিনাশ একই কথা। সুধীগণ কথাটা একবার প্রণিধান করেন, এই প্রার্থনা।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

বিষবৃক্ষ।

বিষবৃক্ষে কবি যেরূপ অমৃত ক্ষরণ করিয়াছেন, এরূপ বুঝি আর কুত্রাপি নহে। জীবনের অতি সাধারণ সাধারণ ঘটনা লইয়া, কবি যে ইন্দ্রজাল সৃজন করিয়াছেন, তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, চক্ষের জলে ভাসিতে হয়, কিন্তু সে মায়াপুরী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। তাঁহার পূর্ব্ব-রচিত কাব্যত্রয়ের কবিত্ব প্রধানতঃ কল্পনার উদ্ভাবনশক্তিমূলক, সে শক্তি বৈদেশিক ও জাতীয় সাহিত্যের অধ্যয়ন হইতে সহায়তা লাভ করিয়াছিল। বিষবৃক্ষে উদ্ভাবনশক্তির অভাব লক্ষিত না হইলেও, মূলে ইহার কবিত্ব ভিন্ন প্রকৃতির, এবং এই কাব্যেই কবির আখ্যায়িকা-কাব্য-প্রণয়ন-প্রতিভা প্রথম স্বীয় শক্তিতে প্রতিভাত দেখিতে পাওয়া যায়। ইষ্টকাদি অকিঞ্চিৎকর নির্ম্মাণসামগ্রীর সমাবেশে স্থপতি সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করে। সুনিপুণ শিল্পী বাঙ্গালী জীবনের অতি-প্রাত্যহিক ঘটনাবলী সজ্জিত করিয়া, নিজের অসাধারণ প্রতিভাবলে, যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অবতারণ করিয়াছেন, জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে তাহা চিরদিন অমূল্য রত্নরূপে দীপ্তি প্রদান করিবে। যে কল্পনা, প্রান্তরপার্শ্বে, প্রকৃতি-বিপ্লবমধ্যে, শৈলেশ্বর-মন্দিরে, কুমার জগৎসিংহ ও গড়মন্দারণের অধীশ্বরপুত্রী তিলোত্তমার প্রথম সন্দর্শন ঘটাইয়াছিল; যাহা হইতে বিমলার সাহস ও চতুরতা, এবং বিলাস-ভবনে, ইন্দ্রিয়সেবা-মধ্যে, দেবীপ্রতিমারূপে প্রতিষ্ঠিতা আয়েসার অপ্রাপ্য প্রণয়োৎসর্গ প্রকৃত; যে মহতী উদ্দীপ্ত কল্পনা হইতে সমুদ্র-সৈকতে, বালুকাস্তূপে, বা বিজন কাননে, দয়া ও পর-দুঃখকাতরতার স্বভাবপ্রতিমা এবং কৃত্রিম-ব্যবহারানিয়ন্ত্রিত রমণীপ্রকৃতির আদর্শ কপালকুণ্ডলা, ও তজ্জীবনপিপাসু, অবিচলিত-সংকল্প, অদ্ভুত-তন্ত্রধর্ম্মোপাসক, ভয়াবহচরিত্র কাপালিকের উদ্ভব; সে কল্পনার ক্রীড়াক্ষেত্র এখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। সে কল্পনার নিকৃষ্টতর সৃষ্টি মনোরমারূপ চিত্রও এ কাব্যে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। এখানে যাহা কল্পনার সৃষ্টি, তাহাতেও যেন পরিচিত বস্তুর সমাবেশ। তাহার অভিনবত্ব দেখিয়া চমৎকৃত হইবার কিছু নাই, অথচ তাহার মাধুর্য্য অতুলনীয়। সুতরাং যাহা দেখিলেই সুপরিচিত বলিয়া প্রতীতি হয় না, যাহা চিন্তার আয়ত্ত করিতে প্রয়াস পাইতে হয়, এরূপ জিনিসের এখানে সম্পূর্ণ অভাব। কবি যেন আপনার কিছুই এখানে সন্নিবেশিত করেন নাই, সকলই যেন আমাদের নিজের জিনিস, যাহার সহিত প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে, অতি ঘনিষ্ঠভাবে, প্রীতির ভাবে, মেশামিশি করিতেছি, সকলই তাহাই, কবি কেবল সে সকলকে আপনার মত সাজাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেই সংযোজনার মধ্যে, ঘটনার পর ঘটনা, কাব্যপাত্রগণের কার্য্যের পর কার্য্য, সংগ্রথিত করিতে, পাত্রবিশেষের সহিত পাত্রবিশেষকে সম্বন্ধবিশিষ্ট করিতে, প্রত্যেকের প্রকৃতির পরিস্ফুরণ ও পরিণতি সম্পাদনে, এবং সর্ব্বোপরি, সম্পূর্ণ চিত্রের সুমহৎ ফলস্বরূপ, মানবশিক্ষার জন্য, স্বর্গ-

নরকের প্রকৃতি-ভেদ চিত্রার্পিত করিতে, কবি যেরূপ স্বভাবজ্ঞান ও সৌন্দর্য্যানুভূতি, চিন্তানিয়তি ও কৌশলকুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। শিল্পীর সৌন্দর্য্য-কল্পনার এখানে উচ্চতম প্রকাশ।

কবির স্বসম্পাদিত সাময়িক পত্র বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত কবির কাব্যসমূহ-মধ্যে বিষবৃক্ষই প্রথম। বঙ্গদর্শনকে একখানি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা করিতে কবি যেরূপ প্রয়াসবান ছিলেন, বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত স্বরচিত কাব্যখানিকেও সেইরূপ উচ্চশ্রেণীর করিতে যত্ন পাইয়াছিলেন। কবি সে যত্নে সম্পূর্ণ সফলতা লাভও করিয়াছেন। বিষবৃক্ষ যে তাঁহার বিশেষ যত্নের ফল, তাহা প্রতিপদে পরিলক্ষিত হয়। ইহার ভাষা, আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত, একই ভাবে প্রবহমান, অতি সুমার্জ্জিত, সমগতিবিশিষ্ট, এবং কাব্যের বিষয় বিবেচনায়, সরল ও সুখপাঠ্য, অর্থ সহজে বোধগম্য—এবং স্থলবিশেষে ভাষা বিশেষ অর্থব্যঞ্জক; ইহার গল্পগঠনে জটিলতা নাই, অথচ সেই সরল ঘটনাবিন্যাসমধ্যে কবি যেরূপ চিন্তাশীলতা ও কৌশলকুশলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অসাধারণ বলিতে হইবে; স্বভাব বা দৃশ্য-বর্ণনের বাহুল্য আর কুত্রাপি এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, সে বর্ণনা এরূপ যথাযথ, এরূপ পূর্ণতাময় যে, পড়িতে বোধ হয় দৃশ্য যেন চক্ষের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে, কবি যেন, পাঠককে সম্মুখে দণ্ডায়মান রাখিয়া, অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক, তাহার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রাংশ পর্য্যন্ত দেখাইয়া দিতেছেন—আর দৃশ্য যেখানে কল্পনাপ্রসূত সেখানে তাহা অতীব কবিত্বময়; এ কাব্যে চরিত্রাঙ্কনেও সেইরূপ পূর্ণতা, কবি প্রস্ফুরণ ক্ষমতার একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন; লোকশিক্ষার জন্যই এ কাব্য প্রথম রচিত, সে শিক্ষা ইহাতে হৃদয়স্পর্শী।

আমরা কবির কাব্যান্তর-সমালোচনায় বলিয়াছি, স্বল্পমাত্র ভাষায়, দুই একটি কথায়, অনেক সময়ে একটিমাত্র নাম দ্বারা, অঙ্কিত চরিত্রের আভাস-প্রদানে তাঁহার যেরূপ ক্ষমতা, অতি বিস্তৃত বর্ণনায়ও সেরূপ অভিব্যক্তি সম্ভাবিত হয় না। তাঁহার কাব্যপাত্রগণের নাম-নির্ব্বাচনেও আমরা তাঁহাকে বিশেষ সৌভাগ্যের অধিকারী দেখিয়াছি। বিষবৃক্ষেও, একাধিক স্থলে, কবির সেই সৌভাগ্যশালিতা, চরিত্রস্ফূর্ত্তি-সম্পাদন-ক্ষমতার সেই বিশেষত্ব, দেখিতে পাওয়া যায়। এ কাব্যে, অতি ক্ষুদ্রাংশের সমাবেশেও, চিন্তা ও কৌশল প্রতীয়মান। সূর্য্যমুখী, কমলমণি, কুন্দনন্দিনী, সকলেই নিজ নিজ রমণীয়ত্ব, নিজ নিজ বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য-হেতু, ফুলের সঙ্গে তুলনীয়া। কিন্তু সে তুলনায় প্রভেদ আছে, সেই পৃথকত্বে চরিত্রত্রয়ের প্রকৃতি ও প্রকৃতিভেদ সূচিত হইতেছে। জড়-প্রকৃতিতে মনুষ্যপ্রকৃতির প্রতিচ্ছায়া কবির চক্ষেই সহজে অনুভূত হয়। ফুলেও মনুষ্যপ্রকৃতির ছায়া আছে; ভাষায় তাহা প্রকাশ করা সহজ নহে, কিন্তু কল্পনার চক্ষে দেখিলে সে সাদৃশ্যের অনুভূতি অনিবার্য্য। সূর্য্যমুখী, কমল, ও কুন্দে

যে প্রভেদ, তন্নামক পুষ্পত্রয়ে তাহা প্রতি-
বিম্বিত দেখিতে পাওয়া যায়। গৌরব ও
গাম্ভীর্য্য সূর্য্যমুখীর প্রকৃতির প্রকৃষ্ট লক্ষণ;
তিনি প্রৌঢ়ত্বে উপনীতা, গৃহিণীভাবে
গর্ব্বিতা, তাঁহার বাহ্য সৌন্দর্য্যেও সে বয়সের,
সে প্রকৃতি-গাম্ভীর্য্যের ভাব প্রতিফলিত;
তাঁহার স্বামীপ্রেমেও সেই গৌরব, সেই
গাম্ভীর্য্য, সেই স্থিরশান্ত যোয়ান ভাব, অথচ
তাঁহার পূর্ণপ্রকৃতি প্রকাশমান; তাঁহাতে
কমলমণির চাঞ্চল্যেরও যেমন অভাব, তাঁহার
চরিত্রপ্রভা তেমনই কুন্দনন্দিনীর ন্যায়
স্তিমিতজ্যোতি বা স্বল্পপ্রকাশ নহে। এরূপ
প্রকৃতির প্রতিবিম্ব ফুলের মধ্যে সূর্য্যমুখীতে
ভিন্ন আর কোথায় পাইব? সূর্য্যমুখী
বৃহৎ, উজ্জ্বল, গুরুত্বের ভাবে পরিপূর্ণ।
আবার সূর্য্যমুখী সূর্য্যদেবকে সর্ব্বদা সম্মুখে
রাখিয়া দিক্‌পরিবর্ত্তন করে, সূর্য্যদেব
অস্তমিত হইলে শুকাইয়া যায়। পতি-
মাত্রজীবিতা নগেন্দ্রবনিতাও পতির পশ্চাৎ
অনুসরণ করিয়া চলিতেন, পতির প্রফুল্ল
প্রীতিপূর্ণ মুখপানে তাকাইয়া জীবনের
সার্থকতা বোধ করিতেন; যেই সে সুখ-সূর্য্য
তাঁহার পক্ষে অস্তমিত হইল, অমনি কালিমা
আসিয়া সে সৌন্দর্য্য ঢাকিল, সে গৌরবের
ফুল শুকাইয়া গেল। কমলও ভাস্কর-
প্রদীপ্ত; সে পবিত্র, শুভ্র, বিমল কান্তি,
দিনমণির রশ্মি-সংযোগ ব্যতিরেকে, সারাদিন
তদ্রূপ কোমল অথচ ভাস্বর জ্যোতিঃ প্রতি-
ভাত করিত না। প্রেমময়ী কমলমণি
প্রস্ফুটিত কমলবৎ সর্ব্বদা ফুটিয়াই থাকি-
তেন, কিন্তু সে নিত্য প্রফুল্লতা স্বামীর
আদরে পরিপোষিত না হইলে, তাহার
অস্তিত্বের সম্ভাবনা হীনতাপ্রাপ্ত হইত।
কমলমণিতে নিত্য প্রসন্নতা, তাঁহার প্রকৃতি
চাঞ্চল্যময়; সে চাঞ্চল্য প্রেমময়ীর প্রেম-
পারাবারের তরঙ্গভঙ্গ। সূর্য্যমুখীতে যে
পূর্ণতায় স্থিরতার উদ্ভব করিয়াছে, কমল-
মণিতে সেই পূর্ণতা-হেতুই সে প্রকৃতি টল-
মলায়মান, যেন প্রাবৃট-জল-সম্ভার-সমন্বিতা
স্রোতস্বিনীবৎ কুলপ্লাবনোন্মুখী। সূর্য্য-
মুখীর প্রেমের ঐকান্তিকতা, আপনার
স্বামীতে তাহার কেন্দ্রীভূত ভাব, তাহার
আত্মগত সংযতভাব, আর সূর্য্যমুখী ফুলের
বর্ণগাঢ়তা, তাহার নিবিড়তা, সে উজ্জ্বল
পীতের উপর কৃষ্ণাভার প্রক্ষেপ, আমরা
একই প্রকৃতিব্যঞ্জক বলিয়া বুঝি। অন্য
দিকে, পদ্ম শুভ্র, পবিত্র, নয়নপ্রীতিকর,
সুগন্ধে মনোমুগ্ধকর, ভাস্বর অথচ বিরলবর্ণ,
—সে গাঢ়তাশূন্য, সে অসংযত ভাসাভাসা
ভাবে, সে পবিত্রতার আদর্শে, আমরা
কমলের প্রেমের বিক্ষিপ্ত অথচ বিশুদ্ধ
প্রকৃতি, তাহার অঙ্গে বিভূতি, তাহার
সার্ব্বজনীন ভাব, প্রকাশপ্রাপ্ত দেখিতে
পাই। সূর্য্যমুখীর হৃদয়কৌমার্য্য যেন
একে সমর্পিত, চির-প্রেমময়ী কমলের
প্রীতির ভাব, স্বামীর চতুর্দ্দিকে বিবর্ত্তমান
থাকিয়াও, যেন অন্যে ব্যাপ্তি লাভ করিত।
এই ঐকান্তিক বা আত্মগত এবং বিক্ষিপ্ত
বা সার্ব্বজনীন ভাব সূর্য্যমুখী ও পদ্মপুষ্পে
সাদৃশ্যগত। সেইরূপ, কুন্দনন্দিনীও কি
কুন্দ-প্রকৃতিক নহে?—শুভ্র, পবিত্র,
জ্যোতিষ্মান্, কিন্তু ক্ষুদ্র, মৃদুস্ফূর্ত্তি, অপ্রকাশ
—যেন বিজনে ফুটিয়া বিজনেই পতিত
হয়, মানবচক্ষু কদাচিৎ আকৃষ্ট করে।

নগেন্দ্রনাথ নৌকারোহণে কলিকাতা যাইতেছেন, পথে বিষম ঝড় উঠিল। তাঁহার আদেশক্রমে নাবিকেরা নৌকা কিনারায় বাঁধিল। নগেন্দ্র সঙ্কটে পড়িলেন, ঝড়ের ভয়ে নৌকা হইতে নামিলে নাবিকেরা তাঁহাকে কাপুরুষ মনে করিবে—না নামিলে সূর্য্যমুখীর কাছে মিথ্যাবাদী হইতে হয়, কেননা, ভার্য্যা সূর্য্যমুখী নৌকাযাত্রাকালে মাথার দিব্য দিয়া ঝড়ের সময়ে তাঁহাকে নৌকায় থাকিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছিলেন। ভার্য্যার মনস্তুষ্টির জন্য, তাঁহার রমণীসুলভ অনিষ্টাশঙ্কার নিরাকরণার্থ, কৃত অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণেই বা ক্ষতি কি, এ কথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন মনে করিয়া, আখ্যায়িকাকার উত্তর করিতেছেন, "আমরা জানি না, কিন্তু নগেন্দ্র ক্ষতি বিবেচনা করিতেছিলেন।" নাটককার হয় ত এত টুকুও বলিতেন না, তিনি হয় ত স্বগত বাক্যে নগেন্দ্রকে দিয়া এইরূপ বলাইয়াই সন্তুষ্ট হইতেন, "নৌকা হইতে নামিলে নাবিকেরা আমাকে কাপুরুষ মনে করিবে, কিন্তু আমাকে নামিতেই হইবে, কারণ ভার্য্যা সূর্য্যমুখী মাথার দিব্য দিয়া ঝড়ের সময় আমাকে নৌকায় থাকিতে নিষেধ করিয়াছেন।" পাঠক ইহা হইতেই বুঝিতেছেন, নগেন্দ্রনাথ ভার্য্যার ভক্তি ও ভালবাসায় কতদূর আস্থাবান্ ছিলেন, যে গৌরবান্বিত পতিপ্রেমকে তিনি কতদূর সম্মান করিতেন, অসাক্ষাতেও, কেবলমাত্র কথায় থাকিলেও, সে ভাবের বিনিময় সম্পাদনে তাঁহার মন কিরূপ আগ্রহান্বিত ছিল। অল্প কথায় কবি এই দাম্পত্যপ্রণয়ের প্রকৃতির যেরূপ আভাস প্রদান করিয়াছেন, তাহা অন্যরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হইত না। ইহা কবির কৌশলময় উপায়, তাঁহার নিজস্ব। এ ক্ষমতা সেক্সপীয়র প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর নাটককারদিগের ক্ষমতার সদৃশ।

"স্তিমিত প্রদীপে," "ছায়া," ও "পূর্ব্ববৃত্তান্ত" নামক পরিচ্ছেদত্রয়ে কবি যে অপূর্ব্ব দৃশ্যের অবতারণ করিয়াছেন, তাহার শেষ চিত্রে নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখী পরস্পরের স্কন্ধে মস্তক ন্যস্ত করিয়া বিনা বাক্যে অবিশ্রান্ত রোদন করিতেছেন, রোদনে কত সুখ অনুভব করিতেছেন। সে রোদনসুখবিহ্বলতার অবসানে, সূর্য্যমুখী পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া, নগেন্দ্রনাথের কৌতূহল নিবারণ করিলেন, এবং এই বলিয়া শেষ করিলেন, "এ সুখ যে আমার কপালে হইবে, তাহা জানিতাম না। কিন্তু ছি! তুমি আমায় ভালবাস না। তুমি আমার গায়ে হাত দিয়াও আমাকে চিনিতে পার নাই—আমি তোমার পায়ের বাতাস পাইলেই চিনিতে পারি।" স্বামীর প্রীতিপ্রসন্নতায় পূর্ণবিশ্বাসে সূর্য্যমুখী কেমন পূর্ব্ববৎ সংস্থাপিতা! কি অসাধারণ রমণীসুলভ সরলতা! বিচ্ছেদের পর পুনর্ম্মিলনে সূর্য্যমুখী যেন আপনার স্বামীকে অধিকতর আপনার মনে করিতেছেন, দুঃখের স্মৃতি যেন নিশ্চিহ্নরূপে মুছিয়া গিয়াছে। এ অভিব্যক্তির ভাষা কবির আপনার সম্পত্তি। ইহার তুলনা কেবল প্রথম শ্রেণীর কবিগণের লেখাতেই পরিদৃশ্যমান।

কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নদ্বয়ের কল্পনাও অতীব মনোহর এবং কবিত্ব ও কৌশলপূর্ণ। এই স্বপ্নদ্বয় ও কুন্দচরিত্রই এ কাব্যে বিশেষ উদ্ভাবনশক্তিসম্ভূত, এবং ইহাদের সৌন্দর্য্য কবির অন্যান্য কল্পনা হইতে নিকৃষ্টতর বলিয়া বোধ হয় না। এ স্বপ্নবৃত্ত-বর্ণনায় ভাষাও অতি লালিত্যময় এবং স্বপ্নদ্বয়ের অভিব্যক্তি বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। কুন্দ একাকী রোগশয্যায় পিতার সেবাশুশ্রূষা করিতেছিল, ক্লান্তি ও অনিদ্রা জন্য পিতৃশবপার্শ্বে তন্দ্রাভিভূতা হইয়া আছে, কুন্দের স্বর্গগতা জননী তাহার মস্তক-সান্নিধ্যে স্বপ্নাবির্ভূতা হইলেন। মাতৃমূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময়ী, কিরীটকুণ্ডলাদিভূষণালঙ্কৃতা, শুভ্র-সুবৃহৎ-দীপ্তিময় চন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী, উচ্চ গগন হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া সহস্র শীতলরশ্মি পাত করিতে করিতে, কুন্দনন্দিনীর মস্তকোপরি আসিল, জননীর কারুণ্যপ্রফুল্ল মুখমণ্ডল, স্নেহপরিপূর্ণ হাস্য অধরে স্ফুরিত হইতেছে। তিনি সস্নেহাননে কুন্দকে ভূতল হইতে উঠাইয়া ক্রোড়ে লইলেন এবং মুখচুম্বন করিয়া তাঁহার সহিত নক্ষত্রলোকে যাইবার জন্য আহ্বান করিলেন। কুন্দ যাইতে সাহস করিল না—দেখিয়া তাঁহার কারুণ্য-প্রফুল্ল অথচ গম্ভীর মুখমণ্ডলে অনাহ্লাদজনিতবৎ ভ্রূকুটি বিকাশ হইল। কুন্দ এক সময়ে মনঃপীড়ায় মৃত্যুবসুরিতা হইয়া সেই নক্ষত্রলোকে যাইবার জন্য কাতর হইবে, তখন তিনি পুনরায় দেখা দিবেন, এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিতা হইলেন। যাইবার সময় অঙ্গুলিসঙ্কেতদ্বারা কুন্দকে গগনপ্রান্তে এক পুরুষমূর্ত্তি এবং এক শ্যামাঙ্গী পদ্মপলাশনয়না যুবতীর মূর্ত্তি দেখাইয়া, তাহাদিগকে, ইহ জগতে তাহার অশুভের কারণ-স্বরূপ, পরিহার করিতে উপদেশ করিয়া গেলেন। সে পুরুষমূর্ত্তি দেবনিন্দিত মূর্ত্তি, তাঁহার উন্নত, প্রশস্ত, প্রশান্ত ললাট; সরল সকরুণ কটাক্ষ; তাঁহার মরালবৎ দীর্ঘ ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা এবং অন্যান্য মহাপুরুষলক্ষণ দেখিয়া কাহারও বিশ্বাস হইতে পারে না যে, তাঁহা হইতে আশঙ্কা সম্ভবে। নারীমূর্ত্তিও দেখিতে কুন্দের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করিল না, কিন্তু জননী তাহাকে নারীবেশে রাক্ষসীনির্দ্দেশে তাহাকে বিষধরবৎ প্রত্যাখান করিতে বলিলেন। কুন্দনন্দিনী মাতার সহিত নক্ষত্রলোকভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতার স্বর্লোকে প্রত্যাগমনের পর পিতৃ-সেবারূপ কর্ত্তব্য পালনের জন্য তাঁহাকে এ পৃথিবীতে থাকিতে হইয়াছিল। সে কর্ত্তব্যের অবসানে এখন তাঁহার স্বলোকে প্রত্যাগমন করিয়া এ সংসারের দুঃখক্লেশ হইতে মুক্তিলাভের অবসর ও সময় উপস্থিত। মাতা, যদি তাঁহাকে এই সুযোগসময়ে নক্ষত্রলোকে লইয়া যাইতে পারেন, এই আশাপ্রণোদিত মনে হাস্যময়ী। তাঁহার প্রস্থান পরে পিতৃ-সেবানুরোধে কুন্দনন্দিনীর এ পৃথিবীতে অবস্থান ও তদ্ধেতু এ সংসারের দুঃখভোগ স্মরণ করিয়া সন্তান প্রতি তাঁহার কারুণ্যের সঞ্চার। এ পৃথিবী হইতে লইয়া যাইবার চেষ্টায় সফলতা লাভ না করিলেও কন্যার ইহ জীবনের শুভাশুভ সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা কন্যাকে বলিতে আসিবারও [illegible]

পক্ষে এই অবলম্ব সময়। আর সেই অপূর্ব্বসৌন্দর্য্যময় মূর্ত্তি কুন্দনন্দিনীর মনকে নক্ষত্রলোকের দিকে আকৃষ্ট করিবার সম্পূর্ণ উপকরণসমন্বিত। সুতরাং কুন্দজননীর এই ভাবে স্বপ্নাবির্ভূতা হওয়া তৎকালীন অবস্থার কি উপযোগী! এই স্বপ্ন আবার কেবল কুন্দনন্দিনীর অপার্থিব প্রকৃতির আভাস প্রদান করে নাই, ইহাতে নগেন্দ্র-চরিত্রও অল্প রেখাপাতে চিত্রকল্পিত হইয়াছে, এবং কবি হীরা-চরিত্রেরও স্থূল রেখা ইহাতে অঙ্কিত করিয়াছেন। অন্য দিকে, কুন্দকে নগেন্দ্রনাথের দেবোপম শরীর-কান্তির প্রতি আকৃষ্ট এবং কারুণ্যপূর্ণ মুখভাবের সহিত সুপরিচিত করিয়া, তাঁহাকে অপরিচিত পুরুষসঙ্গে বিদেশগমনজন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। যেমন আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই এক কথায় কবি নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর দাম্পত্যপ্রণয়ের প্রকৃতি সূচিত করিয়াছেন, তেমনই স্বল্প ভাষায় এখানে নগেন্দ্রপ্রকৃতিরও পূর্ণাভাস প্রদান করা হইয়াছে। একত্রে একস্থলে এত উদ্দেশ্যের সাধন কৌশলবুদ্ধি ব্যতিরেকে সম্ভবে না। কুন্দনন্দিনীর দ্বিতীয় স্বপ্নও সেইরূপ অর্থব্যঞ্জক। এবার মাতা "বিতত-জল-চন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী নহেন, এক অতি নিবিড় বর্ষণোন্মুখ নীলনীরদমধ্যে আরোহণ করিয়া অবতরণ করিতেছেন। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে অন্ধকারময় কৃষ্ণবাষ্পের তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সেই অন্ধকার মধ্যে এক মনুষ্যমূর্ত্তি অল্প অল্প হাসিতেছে। তন্মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে সৌদামিনী প্রভাসিত হইতেছে। কুন্দ সভয়ে দেখিল যে, ঐ হাস্যনিরত বদনমণ্ডল, হীরার মুখাবয়ব। আরও দেখিল মাতার করুণাময়ী কান্তি একণে গম্ভীরভাবাপন্ন।" হীরাপ্রদত্ত বিষপানে কুন্দ এই স্বপ্নদর্শনের অব্যবহিত পরেই যে বিষাদের, যে কালিমার দৃশ্যের সংঘটন করিলেন, এই স্বপ্নদৃশ্যে তাহা কি সুন্দর সূচিত হইয়াছে! স্বপ্ন ও প্রকৃতে কি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য! এ উদ্ভাবনে কি সুন্দর কবিত্ব! এই খানে কবি হীরাচিত্রেরও দ্বিতীয় রেখা অঙ্কিত করিয়াছেন।

বিষবৃক্ষের গল্পরচনায় প্রথম কথা এই —কবি কুন্দনন্দিনীকে প্রথম অঙ্কে পরিণীতা করিয়া, বৈধব্যে নগেন্দ্রের প্রণয়পাত্রী করিলেন কেন? নগেন্দ্রের কুন্দানুরাগ প্রকৃত জীবনের ঘটনা হইতে গৃহীত হইয়া থাকিলে, এ প্রশ্নের অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। ঘটনার স্বাভাবিকত্বের অভাব কিছুই নাই, কবি প্রকৃত জীবনে যেরূপ দেখিয়াছেন, বা ঘটনার বিষয় যেরূপ জানিয়াছেন, কাব্যেও সেইরূপই সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অন্যথা এ প্রশ্নের মূলে অনেক কথা নিহিত আছে। ঘটনা সত্য হইলেও, সেই সকল কথা বিবেচনা করিয়াই, অবিকল যাহা ঘটিয়াছিল, কবি তাঁহার কাব্যে তাহা সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া থাকিতে পারেন। বালিকা কুন্দকে পথে কুড়াইয়া পাইয়া নগেন্দ্র তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কুন্দনন্দিনী বালিকা হইলেও, তাঁহার হৃদয়ে তৎকালে নগেন্দ্রনাথের অতুলনীয় রূপের প্রভাব অননুভূত ছিল না। তথাপি উভয়ের পরিণয়ের কল্পনা কাহারও হৃদয়ে স্থানাধিকার করে নাই। কুন্দনন্দিনী বালিকা, তাহার প্রকৃতি আত্মপ্রসারণ-

বিমুখ, আজীবন ঘটনাস্রোত তাহাকে যেরূপে বহন করিয়াছে, তাহারই অনুগমন করিয়া, সসংকোচে, আত্মবিলোপের সহিত, জীবনপাত করিয়াছে; তাহার পক্ষে ইহা স্বভাবোপযোগীই হইয়াছে। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ প্রশ্নের ব্যাখ্যা অন্যরূপ। যদি সেই বালিকার অপার্থিব দর্শনবিলাস, যদি তাহার শান্ত সুন্দর সুকুমার দেহলাবণ্য, তাঁহার হৃদয়ে এত অধিকার লাভই করিয়াছিল, তবে সে আকারগত চন্দ্রকর, সে স্নেহসম্বদ্ধ পুষ্প-সৌরভের সহিত মিলিত হইতে বিরত থাকিলেন কেন? বৈধব্যে যাহার পরিণয় করিতে বিধবাবিবাহ-বিধির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, কুমারীজীবনে তাহাকে গৃহিণী করিয়া সে সমাজ-বিরোধ পরিহার করিতে পারিতেন। ইহার উত্তর এক কথায় নহে। নগেন্দ্রের কুন্দানুরাগের অঙ্কুর যদিও এই সময়েই তাঁহার হৃদয়ে মূলস্থাপন করিয়াছিল, সূর্য্যমুখীর হৃদয়-প্লাবনকারী পতিপ্রেম সে অঙ্কুরকে বৃদ্ধি পাইতে দেয় নাই। নগেন্দ্রনাথকেও কবি প্রণয়ী, ভার্য্যাবৎসল করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি এত সহজে সূর্য্যমুখীর প্রেমানুরাগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কুন্দনন্দিনীর পাণিগ্রহণাভিলাষী হইলে, লোকে তাঁহাকে সে সম্বন্ধে পবিত্রতার হিসাবে দোষারোপ করিবার কারণ কিছু না দেখিলেও, তাঁহার দাম্পত্যপ্রণয়ের বিশেষ প্রশংসা করিত না। আর যুবতীর রূপে চিত্তের যেরূপ বিভ্রম জন্মায়, বালিকার রূপ মনোমুগ্ধকর হইলেও সেরূপ ভ্রান্তির উৎপাদন করে না। কুন্দনন্দিনী সুন্দরী হইলেও এখনও যুবতী নহে। কৌশলী কবি, একদিকে নগেন্দ্রের বিধবা রমণীর প্রতি অনুরাগের দোষাবহ প্রকৃতির লাঘব করিবার জন্য, যেমন সে অনুরাগের বীজ পূর্ব্বেই অবস্থান্তরে তাঁহার হৃদয়ে উপ্ত করিয়া রাখিলেন, অন্য দিকে, সেইরূপ, নগেন্দ্রের চরিত্র-গৌরব রক্ষার জন্য, অনুরোদগম রহিত করিবার অভিপ্রায়ে, নগেন্দ্রের সান্নিধ্য হইতে কুন্দকে স্থানান্তরিত করিলেন। প্রণয়-বীজ হৃদয়-ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা সময়ে কলেবর ধারণ করিবেই। যাহা নগেন্দ্র প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইলেন, তাহা স্বাভাবিক এবং সহসা অনুল্লঙ্ঘনীয় হওয়ায়, আত্মদমনশক্তির অভাবজনিত তাঁহার দোষ লঘুতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। আবার তাঁহার ভার্য্যাবৎসলতারূপ চরিত্রের প্রস্ফুরণেও সুবিধা হইয়াছে। ইহাতেই উত্থাপিত প্রশ্নের সম্পূর্ণ নিরাকরণ হইল না। ইহার মূলে কবির চিন্তাশীলতার অধিকতর অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। কুমারীর প্রতি প্রেমানুরাগ কাব্যের সামগ্রী হইলেও, তাহাতে অপবিত্রতার কথা কিছু না থাকিলেও, বাঙ্গালার হিন্দুসমাজে এরূপ অনুরাগ সামাজিক ভাবে অনুমোদনীয় নহে। হিন্দু-সমাজগঠন-প্রণালী, সে সমাজের ব্যবহাররীতি, এরূপ অনুরাগের অনুকূলও নহে। দাম্পত্য-প্রণয়ই, বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি অনুরাগই, ভক্তিবাৎসল্য ও সেবাসাহচর্য্যই, বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের লক্ষ্য বা উৎকর্ষাদর্শ। নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীতে কবি সেই আদর্শই চিত্রিত করিয়াছেন। সে আদর্শের বিরোধী বলিয়া

কবিকে সুতরাং এ ভাবেও পরিহার করিতে হইয়াছে।

নগেন্দ্রনাথের কুন্দানুরাগ স্বভাব-প্রসূত হইলেও সমাজ-ধর্ম্মের অনুরোধে নগেন্দ্রনাথের তাহা প্রতিহত করিবার প্রয়োজন ছিল। নগেন্দ্রনাথ তাহাতে কৃতকার্য্য হয়েন নাই, ইহাই তাঁহার চরিত্রের দুর্ব্বলতা। মনুষ্য-প্রকৃতি এ দুর্ব্বলতা হইতে কখনও মুক্ত হইতে পারে কি না, তাহাও সন্দেহের কথা। ধর্ম্মবীর প্রতাপও তাঁহার শৈবলিনী-প্রণয়-স্রোত প্রতিরুদ্ধ করিতে পারেন নাই, অবশেষে সমাজ-ধর্ম্মরক্ষার জন্ত আত্মবলিদান করিয়া, সে অবস্থা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিলেন। তবে প্রতাপ ও নগেন্দ্র সমাবস্থাপন্ন ছিলেন না। শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের পরিণীতা ভার্য্যা, তাঁহার প্রতি প্রতাপের প্রেমানুরাগ বাল্যে সঞ্জাত হইয়া থাকিলেও, সে অনুরাগের সফলতার প্রতিবন্ধক সমাজধর্ম্ম, প্রতাপের পক্ষে অধর্ম্মের পথে পদার্পণ না করিলে অলঙ্ঘনীয় হইয়াছিল। নগেন্দ্রের সম্বন্ধে সেরূপ নহে। বিধবা কুন্দনন্দিনীর পরিণয়ের পথে সেরূপ অলঙ্ঘ্য বাধা কিছু ছিল না। সমাজ সাধারণতঃ যদিও তাহার অনুমোদনে তখনও প্রস্তুত নহে, বিধবাবিবাহবিধি শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়াই সংস্থাপিত হইয়াছিল। সে বিধির আশ্রয় লইলেই সমাজধর্ম্মের প্রতিরোধ নিরাকৃত হইল। নগেন্দ্রনাথ সমাজধর্ম্মের অবমাননা হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্ত তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু, সমাজধর্ম্মের বাধার কথা তাঁহার সম্বন্ধে না ঘটিলেও, তিনি তাঁহার এই চিত্তবৃত্তির প্রশ্রয়দানে হওয়ায়, তাঁহাকে ব্যবহারনীতির প্রতিগমন করিতে হইয়াছিল। এখানেও, সমাজের প্রতি তাঁহার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত, কবি তাঁহাকে প্রকাশ্যে এ বিবাহ করিতে দেন নাই। নগেন্দ্র-চরিত্রের গৌরব রক্ষার জন্ত, সুতরাং কবি সর্ব্বতোভাবেই চেষ্টা করিয়াছেন এবং সে চেষ্টায় তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। কিন্তু আমরা এরূপ বুঝিলে ভুল হইবে যে, কবি নগেন্দ্রকে, তাঁহার কুন্দানুরাগ সম্বন্ধে, নির্দ্দোষ প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার সামাজিক উপন্যাসত্রয় অতি উচ্চ নীতির ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত। সমাজধর্ম্মকে তিনি মনুষ্যজীবনে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্য-প্রকৃতি যথাযথ চিত্রিত করা তাঁহার কার্য্য হইলেও, তিনি সে ধর্ম্মের সহিত সর্ব্বত্র তাঁহার চিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তাই তিনি সমাজধর্ম্মের অনুরোধে প্রতাপের জীবন বিসর্জ্জন শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছেন, তাই তিনি শৈবলিনীর পাপক্ষালনজন্ত তদ্রূপ কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন, এবং গোবিন্দলালকে সে ধর্ম্মের প্রতিকূলাচরণের ফলস্বরূপ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী করিয়া ছাড়িয়াছেন। নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর প্রণয়কে তিনি স্বাভাবিক ও মনোহর করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে এরূপ বর্ণ কিছু প্রয়োগ করেন নাই, যাহাতে তৎপ্রতি মানুষের ঘৃণা বা বিরাগের ভাব কিছু হইতে পারে; বরং নগেন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, কুন্দের দুঃখে সহানুভূতির উদ্রেক করিয়া সে চিত্রকে তিনি এরূপই করিয়াছেন, নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর

পুনর্মিলনে তাঁহাদের সুখাতিশয্য প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাদের বিচ্ছেদজনিত দুঃখের এরূপেই নিরাকরণ করিয়াছেন যে, তাঁহার বিষবৃক্ষের শিক্ষার ফল সে চিত্রে যেন ব্যর্থতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি জন্মে। কিন্তু তিনি পাঠককে, এইরূপ সন্দিগ্ধচিত্তে, সেই উচ্চ নীতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতেছেন, নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর প্রণয়ে দোষারোপ করিবার কিছু না থাকিলেও, নগেন্দ্রের পক্ষে সে অনুরাগকে সফলতায় বা ভোগে পরিণত করিবার চেষ্টা এবং কুন্দের পক্ষে সে চেষ্টার প্রতিরোধের অভাব দোষাবহ হইয়াছে। স্বভাবকে প্রতিহত করিতে না পারিলে, তিনি তাঁহাদিগকে জলে ডুবিয়া মরিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি নগেন্দ্রকে যেরূপ গৌরবের চরিত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কুন্দকে যেরূপ পবিত্র অপার্থিব প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদিগের নিকট সেইরূপ অসাধারণ নৈতিক শক্তির আশা করিতে পারিতেন। নগেন্দ্রনাথ সেরূপ শক্তি প্রদর্শনে অকৃতকার্য্য হওয়াতেই, তাঁহার সম্বন্ধে বিষবৃক্ষের ফল ফলিয়াছে বলা যাইতে পারে। কুন্দেরও এ দুর্ব্বলতা দেখাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। কুন্দ নক্ষত্রলোক হইতে শাপভ্রষ্ট হইয়া বা অন্য কারণে পৃথিবীতে মানবী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই মানবীচরিত্রও তাঁহাতে দেখাইবার আবশ্যক ছিল। নগেন্দ্রকে কবি মহাপুরুষতুল্য করিয়াও তাঁহাতে মানুষের দুর্ব্বলতা রাখিয়াছেন। ইহাদের দৃষ্টান্তে মানুষকে পূর্ণতা শিক্ষা দিবার, কবির উচ্চাদর্শ কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইবার, কবির অভিপ্রায়। প্রতাপকেও ধর্ম্মবীর গড়িয়া, প্রতাপ যে মানুষ তাহা দেখাইতে তিনি ভুলেন নাই, কারণ মানব-শিক্ষার জন্য এরূপ করা আবশ্যক। মানুষকে দেবতা দেখাইবার তত প্রয়োজন নাই, যত প্রয়োজন, মানুষে কোন্‌টুকুর অভাবের জন্য মানুষ দেবত্ব লাভ করিতে পারে না, তাহা দেখাইবার। শিক্ষায় যে মানব-চরিত্রের সে অভাব পূরণ হইতে পারে, সে দুর্ব্বলতার সংশোধন সম্ভবপর, তৎপ্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করাই কবির উদ্দেশ্য; এবং তাহা কেবল কবির কল্পনা বা আখ্যায়িকাগত বিষয় না রহিয়া, প্রকৃত জীবনে তৎসাধনের অনুষ্ঠান হইতে পারে, তাহাও তাঁহার অভিপ্রেত। নগেন্দ্রকে নির্দ্দোষ মহাপুরুষ এবং কুন্দকে পূর্ণ স্বর্গের ছবি করিয়া আঁকিলে, সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইত না। অন্য প্রকারেও, স্বগৃহে প্রতি-পালিতা বিধবার প্রতি অনুরাগে, সামাজিক ভাবে যে দোষস্পর্শ হইতে পারে, কবি তাঁহার কাব্যনায়কের চরিত্রগৌরব রক্ষার জন্য, যতদূর সম্ভব, সে দোষের লঘুতাসাধনাভি-প্রায়ে, কৌশলাবলম্বন করিয়াছেন। কুন্দনন্দিনীর পূর্ব্ব-স্বামী তারাচরণকে কবি নগেন্দ্র বা সূর্য্যমুখীর সহিত সম্পর্ক-বিশিষ্ট করেন নাই। স্বগৃহে প্রতিপালিত বা আশ্রিত আত্মীয় বা কুটুম্ব-কন্যার ধর্ম্মরক্ষা গৃহপতির কর্ত্তব্যের মধ্যে, তাহা হিন্দু গৃহস্বামীর ধর্ম্ম। নগেন্দ্রকে সে ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতে না হয়, সম্পর্কবিরুদ্ধ ভাবজনিত দোষ তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন না করে, এ জন্য কবি কুন্দনন্দিনীকে তাঁহার সহিত

নিঃসম্পর্কীয়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহাও কৌশলের কথা। কবি চিন্তা করিয়াই তারাচরণকে বাহিরে স্থাপন করিয়াছেন। নতুবা তারাচরণের সহিত একটি সুন্দরী ভদ্রঘরের কন্যার বিবাহ দিবার যখন সূর্য্যমুখীর আগ্রহাতিশয় ছিল, তখন কবি তাহাকে সূর্য্যমুখীর নিকটতর করিয়া প্রদর্শিত করেন নাই কেন? কুড়াইয়া পাওয়া মেয়ের সঙ্গে যাহার বিবাহ দেওয়া হইল, সূর্য্যমুখী বা নগেন্দ্র দত্তের ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত তাহাকে সম্পর্কবিহীন করাই সুসঙ্গত হইয়াছে, এই কি এ কথার উত্তর? কেন? নগেন্দ্র দত্ত ত কুন্দের পিতৃগৃহে উপস্থিত হইয়া প্রতিবাসিগণের নিকট তাহার কুলের পরিচয় লইয়া আসিয়াছিলেন। কেন? নগেন্দ্রনাথ ত কুন্দকে আপনার গৃহিণী করিতে এরূপ কোন বাধার কথা ভাবেন নাই। তারাচরণ তাঁহাদের স্বসম্পর্কীয় হইলে তাহার বিবাহ কুন্দের অপেক্ষা করিত না, অনেক পূর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়া যাইত। তারাচরণ গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষকতা করিতেও যাইত না, তাহার দেবেন্দ্র দত্তের সংস্রবে আসিবার কারণোদ্ভবও হইত না। উত্থাপিত প্রশ্নের ইত্যাকার অনেক উত্তর হইতে পারে। কিন্তু আমরা যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, সমালোচ্য কাব্যপ্রণয়নে কবির সাধারণ চিন্তাশীলতার সহিত তাহাই সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। অথবা তিনি তারাচরণকে তদ্রূপ অবস্থাপন্ন করিয়া অনেক উদ্দেশ্যই সাধন করিয়াছেন।

যে প্রকৃতির পরিস্ফুরণে যেরূপ সামগ্রীর আবশ্যক, কবি তাহারই আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। সূর্য্যমুখীর প্রীতিবৃত্তি আত্মগত, ধ্যানগত, তাহা বাহ্যবিকাশের সুবিধা তত্টার করে নাই; তাই কবি তাঁহাকে পুত্রবতী করেন নাই। পুত্রবতী করিলে, তাঁহার পত্নীপ্রকৃতির পরিস্ফুরণে বাধা হইত। তাঁহাকে সন্তানবিহীনা করিবার সেও অন্যতম প্রকৃষ্ট কারণ। পতিপ্রেম ও সন্তানবাৎসল্যের প্রকৃতিভেদ থাকিলেও, উভয়ই হৃদয়কৌমার্য্যমূলক, সে কোমলতা বিভক্ত হইলে, পাত্রবিশেষ সম্বন্ধে হ্রাসপ্রাপ্ত না হউক, এক পাত্র হইতে প্রতিহত হইলে, পাত্রান্তরে নির্ভর করে। তাহাতে ঐকান্তিকতার যে গাঢ়তা, যে অনন্যাবলম্ব ভাব, তাহা থাকে না। পতিকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া, সন্তান বিদ্যমানে, সূর্য্যমুখীর হৃদয়কোমলতা সেই সন্তানরূপ অবলম্বনকে আশ্রয় করিলে, তিনি সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইতেন, পতিনিগ্রহদুঃখ তাঁহাকে অতটা ব্যাকুলিত করিতে পারিত না। পুত্র থাকিলে, স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়া সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ সম্ভাবিত হইত না। অথচ সূর্য্যমুখীকে গৃহত্যাগ করাইয়া কবি তাঁহার চরিত্রের স্বাভাবিকত্ব রক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজন সাধন করিয়াছেন। কবি সূর্য্যমুখীকে আদর্শ পত্নী করিয়া সৃজন করিবেন, তাই সে প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকের সংঘটন করেন নাই। অন্য দিকে, কমলমণির হৃদয়প্রবাহ বাহিরে ক্রীড়ার সামগ্রীর অনুসন্ধান করিত, সে উদ্বেল তরঙ্গ প্রতিঘাতের বস্তু না পাইলে সমতা লাভ করিত না। সে হৃদয়তারল্য স্বামীর প্রতি প্রবণতাময় হইলেও, অন্য ভাবে অন্য পাত্রেও বিস্তৃতি

পাইতে চাহিত। তাই স্বামীর কর্মস্থান হইতে প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করা অসহনীয় হইলে, পুত্র সে প্রীতি-ক্রীড়ন-ব্যগ্রতার শমতা বিধান করিত, তাই বাহির হইতে দুঃখ আসিয়াও সে বৃত্তির অংশ-ভাগিনী হইয়াছিল, কমলের বড় ভালবাসার ভ্রাতৃজায়া সূর্য্যমুখীর সুখ-কণ্টক হইয়াও সে কোমলতায় সে বঞ্চিতা হয় নাই। পুত্র এ প্রকৃতির বিকাশের সহায়তা করিয়াছে, কমলের কোলে পুত্র স্থাপন না করিলে, এ চরিত্র অসম্পূর্ণ থাকিত। সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তির জন্ত এক স্থলে যেমন সন্তানের অভাবই সুসঙ্গত হইয়াছে, অন্ত স্থলে সন্তান সমাবেশ করিয়া, কবি সেইরূপ স্বভাবজ্ঞান ও কৌশল-কুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

পূর্ণতা এ কাব্যের একটি সুব্যক্ত লক্ষণ। কি স্বভাব-বর্ণন, কি চরিত্র-প্রকটন, কি চরিত্রবিশেষের সমাবেশ-সাধন, কিছুতেই কুত্রাপি সর্ব্বাঙ্গীন পরিস্ফুরণের অভাব দৃষ্ট হয় না। গোচারণশীল-কৃষক-বালকসমন্বিত গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রান্তরভূমি হইতে, মসীবৎ-মলিন-বস্ত্রপরিধানা রৌপ্যা-লঙ্কারভূষিতা কৃষকপত্নীশোভিত স্নানের ঘাট হইতে, ধনীর সুবৃহৎ সুপ্রশস্ত সুনির্ম্মিত ও সুসজ্জিত, বিবিধ-লোক-সমাগম-চিহ্নিত অট্টালিকা এবং তৎপার্শ্বস্থিত উদ্যান বাপীতট ও বৃক্ষশ্রেণী পর্য্যন্ত, তাঁহার কাব্যের বিষয়-সংশ্লিষ্ট কোন দৃশ্য কবি অবর্ণিত রাখেন নাই, এবং যে কোন দৃশ্যে যাহা কিছু থাকে বা থাকিতে পারে, তত্তাবৎ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে, কবি কোথাও বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। এ কাব্যে প্রেমানুরাগের তিনটি দৃশ্য কবি চিত্রার্পিত করিয়াছেন, তাহাদের প্রকৃতি-পার্থক্য পরস্পরের বিশেষত্ব স্পষ্টীকৃত করিতেছে, এবং প্রেমানুরাগের সফলতা, ফলরাহিত্য, ও বিমিশ্রভাব, পরস্পরের পার্শ্বস্থাপিত হইয়া, এ চিত্রের পূর্ণতা সম্পাদিত হইয়াছে। আবার কেবল সুন্দর দৃশ্যের পূর্ণতা সাধন করিয়াই কবি বিরত হয়েন নাই। সংসার-চিত্রের পূর্ণতা সম্পাদনা-ভিপ্রায়ে, তিনি, এ মনোহর দৃশ্যের বিপরীত সমাবেশে, স্বর্গ ও নরকের প্রভেদ অঙ্কিত করিয়া, যে মহতী শিক্ষা এ কাব্যের উদ্দেশ্য তাহার বিধান করিয়া, পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছেন। সুখবোধ্যতা এ গ্রন্থের আর একটি সুস্পষ্ট রেখা। পাত্রগুলির কথার পর কথা, কার্য্যের পর কার্য্য, একত্র করিয়া দেখিলেই, প্রত্যেকের প্রকৃতি অতি সহজেই হৃদ্গত হইবে, বুঝিবার জন্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন করিবে না। দৃশ্যগুলি অতি সুপরিচিত দ্রব্যের গ্রথনে রচিত, তাহাদের সৌন্দর্য্য সহজে পরিদৃশ্যমান। নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহবর্ণনে অতি মনোমুগ্ধকর নবীনত্ব থাকিলেও, সে দৃশ্যের গঠনসামগ্রী সকল হিন্দুপাঠকের অজ্ঞাত নহে, সহজেই তাহার সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয়। "দীপ-নির্ব্বাণ" ও "ছায়া" নামক পরিচ্ছেদদ্বয়ের দৃশ্যটি অতুলনীয়, এরূপ অপূর্ব্ব চিত্র জগতের সাহিত্যপটে বিরল বলিতে হইবে। এ দৃশ্যে কবি যদি ভবভূতির "উত্তরচরিত" হইতে আভাসমাত্রও গ্রহণ করিয়া থাকেন, কবি স্বীয় প্রতিভাবলে তদুপরি যে উৎকর্ষ

সাধন করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, পুরাতন কবিকে তাঁহার নিকট পরাভব মানিতে হইবে। এরূপ অপূর্ব্ব কবিত্ব ও কৌশলময়তা পৃথিবীর কবিগণমধ্যে সাধারণ নহে, এবং প্রথম শ্রেণীর প্রতিভারই উপযুক্ত। পাঠক প্রণিধান করিবেন উত্তরচরিতের "ছায়া" আর বিষবৃক্ষের "ছায়া" একই কথা নহে, এবং উভয় স্থলেই "ছায়া" শব্দটি একার্থে ব্যবহৃত হয় নাই। উত্তরচরিতের ছায়া কল্পনামাত্র অপ্রাকৃ কেবল কবির উদ্দেশ্যসাধনবিষয়ে উৎকৃষ্ট কৌশল; বিষবৃক্ষের ছায়ায় অপ্রাকৃত কিছু নাই, বরং খুব সম্ভবপর ঘটনা, পাঠক সহজেই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত। কালিদাসকেও, দুষ্মন্তের শকুন্তলাবিস্মৃতি সম্ভবপর করিবার জন্য এবং দুষ্মন্তচরিত্রের গৌরবরক্ষার্থ, দুর্ব্বাসার শাপ ও অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়ের কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছে। সেখানেও পাঠককে কবি ঋষিবাক্যের অব্যর্থতায় বিশ্বাসবান্ হইতে অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু বঙ্গের কবি তাঁহার কৌশল প্রয়োগে পাঠকের বিশ্বাসের উপর এরূপ অপ্রাকৃতিক দাবিদাওয়া কিছু রাখেন নাই। ইহাই বিষবৃক্ষের কবির বিশেষত্ব।

মনুষ্য-হৃদয়ের প্রীতি, প্রেম, বিভিন্ন ধারায় প্রকৃত হইয়া, মানবসমাজে অমৃত সিঞ্চন করে। জননীর সন্তানবাৎসল্য, শিশুহৃদয়ের অস্ফুট আকারব্যক্ত প্রতিদান; পত্নীর পতিপ্রেম ও পতিভক্তি, স্বামীর ভার্য্যানুরাগ; সৌভ্রাত্র, সৌহার্দ্য, স্বজনপ্রীতি; উদার প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের সার্ব্বজনীন প্রেম, পরোপকারীর পরসেবায় আত্মোৎসর্গ; যাহাতে ভূতলে মানবের স্বর্গের সৃজন, বিষবৃক্ষে কবি তাহা চিত্রিত করিতে কুণ্ঠিতহস্ত হয়েন নাই। তাই এ কাব্যের নিত্যনূতনত্ব, পড়িলে কখনও পুরাতন হয় না। বাঙ্গালী, সকল ভুলিয়া, সকল হারাইয়া, এই মোহের বশে জীবনাতিপাত করিতেছে; তাহার শুষ্কতায় রসসিঞ্চন করিয়া, তাহার দারিদ্র্যে রত্নাধিকার প্রদানে, কবি তাহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার্জ্জন করিয়াছেন। সূর্য্যমুখীর পতিপ্রাণতা জগতে অতুলনীয়া,—যে হিন্দুর পত্নীত্বের আদর্শ, সেই হিন্দুর মধ্যেও বিরল। সে সাধ্বী পতিমাত্রজীবিতা গৌরবান্বিতা রমণীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে সম্ভ্রম হৃদয়াধিকার করে; নগেন্দ্রনাথও, তাঁহার সাময়িক চিত্তবৈকল্যসত্বেও, গৌরবান্বিতচরিত্র, ভার্য্যাবৎসল পতির জলন্ত দৃষ্টান্ত, তাঁহারও প্রতি সম্মান ভিন্ন অন্য ভাবের উদয় হয় না; আর শ্রীশ-কমল যুবকযুবতী, প্রথম যৌবনের মত্ততামধ্যে এখনও বিভোরচিত্ত; কবি তাহার মধ্যে স্নেহের পুত্তলি সতীশচন্দ্রকে সংস্থাপন করিয়া, সে উচ্ছ্বসিত প্রবহমান প্রীতিস্রোতের রমণীয়তা সংবর্দ্ধন করিয়াছেন, তাহাতে সে প্রেমপ্রকৃতির পরিস্ফুরণের সহায়তা হইয়াছে;—অনন্তপ্রেমময়ী কমলমণির নিত্যস্ফূর্ত্তি দেখিলে হৃদয় আনন্দসলিলে পরিপ্লুত হয়, চিত্তপ্রসাদ সে চরিত্রের প্রভাবের অবশ্যম্ভাবী ফল। আর কুন্দনন্দিনীও প্রীতিপ্রদ চিত্র, তবে তাহার অদৃষ্ট-লিপি, কবি যে স্বর্গের ছবির সহিত তাহাকে মিলিত করিয়াছিলেন,

তাহার উপর ক্ষণিক বিষাদের ছায়া পাতিত করিয়া, একদিকে যেমন স্বর্গসুখের নিত্যত্বভ্রংশ কিরূপে ঘটে দেখাইয়াছে, অন্ত দিকে, নিয়তির বলে, এ সংসারে স্বর্গের বস্তুও কিরূপে বিলয় প্রাপ্ত হয় প্রমাণ করিয়াছে। কুন্দের প্রতি দৃষ্টি করিলে, দয়া প্রীতি দুঃখ যুগপৎ হৃদয়ে উদ্বেলিত হয়। ভ্রাতার স্নেহ এবং ভগিনীর ভ্রাতৃপ্রেম, কবি বিশিষ্টরূপে চিত্রিত করিয়া না থাকিলেও, আভাসে বা স্বল্পমাত্র রেখাপাতে, নগেন্দ্র-কমলে একরূপ সুস্পষ্ট প্রতীয়মান; শ্রীশ-নগেন্দ্র এবং নগেন্দ্র ও হরদেব ঘোষালের বন্ধুতা সৌহৃদ্যের অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত। কবির অনেক কাব্যেই হিন্দুজীবনাদর্শের অঙ্গীভূত সন্ন্যাসীর চিত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে; হিন্দুর মহতী কল্পনার সৃষ্টি এবং প্রকৃত জীবনের কর্ম্মযোগী সন্ন্যাসিগণ, সার্ব্বজনীন প্রেমের অধীন হইয়া, চিরজীবন পরহিত-ব্রতে নিয়োজিত থাকেন। ব্রহ্মচারী শিব-প্রসাদ শর্ম্মা বিষবৃক্ষের সংসারত্যাগী লোক-হিতব্রতধারী সন্ন্যাসী, মরণোন্মুখী সূর্য্য-মুখীকে পুনর্জীবিতা করিয়া তিনি পাঠকের বিশেষ ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন। কমলকে কেহই ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। অনন্তচিন্তা পতিধ্যানে মগ্না সূর্য্যমুখীও ভাল-বাসিতেন। কমলই সে গাম্ভীর্য্যময়ী রমণী-রত্নের নিভৃতে আলাপের ও মনোদুঃখ প্রকাশের একমাত্র স্থল ছিলেন; কিন্তু সূর্য্যমুখীর প্রতি কমলের ভালবাসা একটু ভিন্ন প্রকৃতির, তাহা কতকটা কমলের অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহের ফল; ভ্রাতৃজায়া এবং ভ্রাতার বিশেষ অনুরাগপাত্রী বলিয়া কমল তাঁহাকে ভাল বাসিতেন, কিন্তু প্রধানতঃ সে ভালবাসা কমলের সার্ব্বজনীন প্রেমের প্রকৃতিসম্ভূত। আমরা বলিয়াছি কমলের এ প্রেমের স্রোত কুন্দনন্দিনীতেও প্রবাহিত হইয়াছিল—বালিকা কুন্দ যখন তাঁহার ভ্রাতা কর্ত্তৃক তাঁহার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল, তখন এক ভাবে, আর যুবতী কুন্দ যখন নগেন্দ্রের প্রণয়পাত্রী এবং নিজেও নগেন্দ্রানুরাগিণী, তখন অন্ত ভাবে,—তাহার প্রণয়নৈরাশ্যে সহানুভূতিরূপে। নগেন্দ্র দত্তের গৃহে অগণিত আত্মীয়া-কুটুম্বিনী প্রতিপাল্য করিয়া কবি হিন্দুর স্বজনপ্রীতি এবং স্বজনোপকার-প্রবৃত্তিরও দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

একদিকে কবি যেমন স্বর্গের প্রকৃতি চিত্রার্পিত করিয়া মানবমনের উৎকর্ষ-সাধনের উপায় বিধান করিয়াছেন—সে চিত্রের ঔজ্জ্বল্যসম্পাদনাভিপ্রায়ে, তাহার প্রভাব মানব-হৃদয়ে গভীরাঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্যে; অন্ত দিকে তেমনই বিপরীত প্রকৃতির চিত্র সংস্থাপন করিয়া তৎপ্রতি ঘৃণার উদ্রেক করিয়া দেওয়ায়, তাঁহার কৌশলময়তা প্রদর্শিত হইয়াছে। হৈমবতী, দেবেন্দ্র দত্ত, হীরা দাসী এ বিসদৃশ চিত্রের স্থূলরেখ মূর্ত্তি। অবশ্য কবি দেবেন্দ্র দত্তকে রূপগুণসম্পন্ন করিয়া, তাঁহার জীবনে চরিত্রচ্যুতির কারণোদ্ভব ঘটাইয়া, অশ্রদ্ধার পাত্র হইলেও তাঁহাকে কতকটা ক্ষমার এবং সহানুভূতির যোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। কেহ কেহ পাঠক হৃদয়ে এরূপ চিত্রের ফল শুভ বলিয়া মনে করিবেন না; কেননা অনেক যুবক, জীবনের অবস্থা দেবেন্দ্র দত্তের সদৃশ হইলে,

তাঁহার পথানুসরণ তথায় সমর্থন করিতে পারেন; জীবনে দুঃখের কারণকে চরিত্র-ভ্রষ্টতার দলিলস্বরূপ দোষদর্শীর সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া, স্বপথের স্বাভাবিকত্ব সংস্থাপনে চেষ্টিত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভাবিত। তবে অন্য দিকে নির্মল স্বর্গসুখের ছবি নয়নসমক্ষে প্রতিভাত থাকিতে, দেবেন্দ্র দত্তের দৃষ্টান্ত, অনিষ্টের পথে তত কার্য্যকরী হইবে না, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ কবি, এ স্থলেও তাঁহার স্বাভাবিক কৌশলময়তার অনুসরণ করিয়া, দেবেন্দ্রের মাতুলপুত্র এবং হিতকামী সহৃদয় শীতলকান্তি বিশুদ্ধচরিত্র সুরেন্দ্রকে তৎপার্শ্বে সংস্থাপিত করিয়া,—সেই ইন্দ্রিয়সেবার দৃশ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও তিনি কেমন আপন চরিত্রপবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন, পাপীকে ভালবাসিয়াও কেমন নিজকে পাপমুক্ত রাখিয়াছেন,—তাহা প্রদর্শন দ্বারা, সে দৃষ্টান্তের বিষময় ফলের একরূপ নিরাকরণ করিয়াছেন। দেবেন্দ্র স্বভাবতঃ রূপগুণসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যারও অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁহার আত্মদমনের ক্ষমতার অভাবে সে সকলই বৃথা হইল; ইহাও শিক্ষার কথা, এবং সামান্য শিক্ষার কথা নহে। এই শিক্ষার জন্যই দেবেন্দ্র দত্তকে চরিত্রচ্যুত করিয়াও, কবি সে চরিত্রে গুণের সমাবেশ করিয়াছেন, এ শিক্ষাও কবির সেই উচ্চ নীতির কথা। চিত্তদমনের শিক্ষার অভাবে মানুষের চিত্তবিকার ঘটে, তাহা হইতেই মানুষের অধঃপতন ও দুঃখভোগ। তাহার এ বিকার সাময়িক, দুঃখভোগও সাময়িক, যেমন নগেন্দ্র দত্তের; তাহার অধঃপতনে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিলয়, যেমন দেবেন্দ্র দত্তের। গোবিন্দলাল ইহ জীবনেই দুঃখভোগ দ্বারা সংশোধিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহ জীবনের সুখের অধিকার আর পুনঃ প্রাপ্ত হয়েন নাই, সর্বদুঃখহরের পাদারবিন্দে মনোনিবেশ করিয়া হৃদয়ের শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রের অধঃপতন বহুদূরগত, তাঁহার উদ্ধার, পরকালের দুঃখভোগ ব্যতিরেকে, অসম্ভাবিত। দেবেন্দ্রের ইহ জীবনের পরিণাম রোগভোগ, সুখের অনুসন্ধানে নিরন্তর চিত্তের অশান্তি, এবং মনুষ্য-সমাজে চিরদিনের জন্য আত্মবিলোপ। ইহা কি প্রত্যেক যুবকের পক্ষেই শিক্ষাস্থল নহে? দেবেন্দ্র দত্তে কবি স্বাভাবিক চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন, শিক্ষার মানসে দৃষ্টি করিলে, সে চিত্রে শিক্ষার নিষ্ফলতা কিছু আছে বা তাহা নৈতিক অধোগতিকে প্রোৎসাহিত করিতে পারে, এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না। আর একটি বড় কথা। মানুষ কদাচিৎ ইচ্ছা করিয়া নরকের পথে হাঁটে। মনুষ্য-প্রকৃতির দুর্বলতাই প্রায় সর্বত্র মানুষের অধঃপতনের কারণ, এবং অনেক স্থলেই সে দুর্বলতা ক্ষমার চক্ষে দেখিবার যোগ্য হইতে পারে। এ কথায় ব্যত্যয় থাকিলে তাহা কাব্যে চিত্রিত করিয়া মনুষ্য-সমাজের কোন উপকার করা হয় কি না সন্দেহ। এরূপ স্থলে, কঠোর নৈতিকের চক্ষে দৃষ্টি করিয়া, দুর্বলকে নিরবচ্ছিন্ন ঘৃণার পাত্র করিয়া প্রদর্শিত করাই সমাজের মঙ্গলকর, না, পাপের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করিয়া দিয়া, পাপীকে ভালবাসাইতে পারিলেই, মনুষ্য-

সমাজকে অধিকতর সুখের স্থান করিতে পারা যায়? আমাদের বিশ্বাস, মানুষ যতই মানুষকে বুঝিবে, মনুষ্যমধ্যে যতই প্রীতির ভাব বিস্তৃতি লাভ করিবে, মনুষ্যসমাজ ততই উন্নত ও সুখশান্তির স্থান হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাই তাঁহার কাব্যসমূহে প্রীতির সংসার সৃজনে প্রয়াস পাইয়াছেন, অবিমিশ্র ঘৃণার পাত্র সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করেন নাই; কেননা, সেরূপ চিত্র দ্বারা সংসারের প্রকৃত উপকার সাধিত হয় না। ইয়াগো-চিত্রে চিত্রকরের নৈপুণ্য থাকিলেও, সেরূপ চিত্র সমাজের বিশেষ কাজে আসে বলিয়া বোধ হয় না। মানুষে দেবচরিত্র সম্পূর্ণ অনুকরণ-যোগ্য না হইলেও, তাহা আদর্শের কাজ করে; কিন্তু নিরন্তর দুর্জ্জনতার চিত্র, কলে যাহা তৎসামগ্রীতে গঠিত না হইলে কেহ অনুকরণ করে না এবং করিতেও পারে না, কল্পিত বা কদাচিৎ দৃষ্ট সেই প্রকৃতির প্রতি মনুষ্য-মনের কঠোর ঘৃণার ভাব জন্মাইয়া দিয়া কতক পরিমাণে মানুষের প্রতি মানুষের বিরাগের ভাব উদ্ভূত করে। মন্দ মানুষও সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার দেবেন্দ্র দত্ত, সুতরাং, মন্দ হইলেও নিরন্তর দুর্জ্জনতার চিত্র নহে। দেবেন্দ্রের অধঃ-পতনের স্বাভাবিক কারণ সংযোজনার জন্য দেবেন্দ্র স্বয়ং দায়ী ছিলেন না, তাঁহার পিতা কর্তৃক ইহার সংঘটন হইয়াছিল। যদিও তাঁহার পিতা সদুদ্দেশ্যেই, পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবস্থাঘটিত অন্ধতাবশতঃ এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি সে দিকেও সমাজের শিক্ষার প্রয়োজন আছে, কবি বোধ হয় তাহাও অনুভব করিয়া-ছিলেন। আবার হৈমবতীদিগের প্রভাবে সমাজে কি কুফলের আবির্ভাব হইতে পারে, তাহাও কি পাঠিকাগণের পক্ষে প্রদর্শনীয় নহে? হীরাচরিত্রের কতক ভাগ স্বাভাবিক কারণ-সম্ভূত এবং ক্ষমার চক্ষে দেখিবার যোগ্য হইলেও, তাহার ঈর্ষা ও পরের অহিতচিন্তামূলক চরিত্র অতি ঘৃণার জিনিস এবং তাহা নরকেরই চিত্র। হৈমবতীই এ সুখবিরোধী চিত্রের প্রধান দ্রষ্টব্যস্থল, এবং কবি অতি অল্প রেখাপাতে তাহা সুস্পষ্ট করিয়াছেন। অন্যান্য কথা বারান্তরে।

শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্ত্রৈণ।

নিত্যানন্দপুরের যজ্ঞেশ্বর চাটুয্যের দাড়ি-গোঁফ-বর্জ্জিত শ্রীমুখ-পঙ্কজ কোন দিন প্রভাতে কাহারও দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলে আর তাহার রক্ষা নাই; সে দিন তাহার উপবাস সুনিশ্চিত, ইহা গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতার দৃঢ় বিশ্বাস।

যজ্ঞেশ্বরের পিতা ৺গোপীমোহন চট্টো-পাধ্যায় ভঙ্গকে ভগীঠাকুর মহাকুলীনের সন্তান ছিলেন, তিনি যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে সাঁইত্রিশটি, যৌবনে ছাপ্পান্নটি ও বার্দ্ধক্যে ছয়টি মাত্র বিবাহ করিয়া নিয়েনক ইহি কন্যাদায়-গ্রস্ত উমেদারের দুশ্চিন্তার ভার

হরণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি যে মহা পুণ্যবান প্রাতঃস্মরণীয় লোক ছিলেন সন্দেহ কি? এমন পুণ্যাত্মা লোকের সন্তান হইয়া যজ্ঞেশ্বর প্রভাতে যাহাকে মুখ দেখাইত, তাহার অদৃষ্টে সে দিন অন্ন জুটিত না, ইহা বিধাতার ভ্রম ভিন্ন আর কি বলিব?

গুপীঠাকুর গঙ্গালাভের পূর্ব্বে কি করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, বলা কঠিন। কারণ তাঁহার জীবনের ইতিহাস এ পর্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। তবে বিবাহই যে তাঁহার উপজীবিকা বা পেষা ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে তিনি বড় ভাগ্যবান ছিলেন, তিনি দুইবার পূর্ব্ববঙ্গে কোন আত্মীয়ের বিবাহে বরযাত্রী হইয়া গিয়াছিলেন, সেই দুইবারই তিনি দুইটি কুলীন-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন, একটি কুলীনকুমারী তাঁহার অপেক্ষা সাতাশ বৎসরের বড়, আর একটি ছত্রিশ বৎসরের ছোট, কিন্তু বয়স সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, তাঁহার কৌলীন্য-মর্য্যাদা বজায় থাকিলে অন্ধ খঞ্জ বিকলাঙ্গ বালিকা বৃদ্ধা কিছুতেই তাঁহার আপত্তি ছিল না। তিনি বলিতেন, ভদ্র লোকের কন্যাদায় মোচন করা বড় ভাগ্যের কথা।

গুপীঠাকুরের বয়স যখন ছাপান্ন বৎসর সেই সময় নিত্যানন্দপুরের জোতদার যষ্ঠীবর মুখোপাধ্যায় তাঁহার একমাত্র কন্যা কালীতারাকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করেন। যষ্ঠীবর বড় ধর্ম্মনিষ্ঠ ও আচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, কুলীনপুত্রদের তিনি সাক্ষাৎ দেবতা মনে করিতেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন, গোপীমোহন রূপে গুণে কুলে শীলে সকল বিষয়ে কালীতারার যোগ্যবর,—তবে কি না বয়স একটু বেশী, তা কুলীনের ঘরে এমন হইয়া থাকে।

সম্বৎসরকাল শ্বশুরবাড়ী গুলিতে ঘুরিয়া গুপীঠাকুরের অশন-বসনের সংস্থান হইত, তিনি এক আধটু গুলি ভক্ষণ করিতেন—এজন্ত সর্ব্বদা স্থান পরিবর্ত্তনে তাঁহার মৌতাতের বড় ব্যাঘাত ঘটিত, কিন্তু রতনে রতন চেনে, তিনি যেখানেই যাইতেন, আড্ডা খুঁজিয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব হইত না। একবার কোন দূরতর পল্লীস্থ শ্বশুর-বাড়ী গমনোপলক্ষে তাঁহাকে নিত্যানন্দ-পুরের ভিতর দিয়া যাইতে হয়, সেখানকার এক আড্ডায় যষ্ঠীবরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়,—সেখানেই যষ্ঠীবর গোপীমোহনের সহিত কন্যার সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

যষ্ঠীবরের সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল। কালীতারা ভিন্ন তাঁহার অন্য সন্তান সন্ততি ছিল না; গোপীমোহন ভাবিয়া দেখিল, বৃদ্ধাবস্থায় উদরান্নের চেষ্টায় দেশে দেশে শ্বশুরবাড়ী ঘুরিয়া বেড়ানো বড় কষ্টকর, বিশেষতঃ তাহার শ্বশুরেরা প্রায় সকলেই দরিদ্র, সকলে তাহার কৌলীন্য-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না, এ অবস্থায় যষ্ঠীবরের কন্যাটির পাণিগ্রহণ করিয়া এই নূতন শ্বশুরের স্কন্ধে কায়েমীভাবে ভর করিলে অন্নবস্ত্র-সংগ্রহের চেষ্টা হইতে সে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে; সুতরাং বিবাহে তাহার আপত্তি হইল না। যষ্ঠীবরের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সে সেখানেই

রহিয়া গেল। এবং গ্রামে 'জামাই-ঠাকুর' নামে সর্ব্বজন পরিচিত হইয়া উঠিল।

২

গুপীঠাকুর ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে যষ্টীবরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী একপুত্র রাখিয়া এবং নিরনব্বুইটি রমণীর হাতের নোয়া ও সিঁথির সিন্দুর ঘুচাইয়া সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিলে, গ্রামের লোকেরা বলিল, এতদিনে বাঙ্গালাদেশে একটি খাঁটি মহা-কুলীনের অভাব ঘটিল, কুলীন-সমাজের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল।

গোপীমোহনের পুত্র যজ্ঞেশ্বর বিবাহ বিষয়ে পিতার আদর্শের অনুকরণ করে নাই। সে এক পত্নীতেই সন্তুষ্ট ছিল; মাতামহের জোত-জমাতেই তাহার সংসার চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু সে উচ্চাভিলাষী ছিল, তেজারতি, মহাজনী প্রভৃতি নানা উপায়ে সে সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে তাহার অর্থপিপাসা প্রশমিত হইল না. শেষে সে বহু চেষ্টায় একটা ষ্ট্যাম্প-ভেণ্ডরী জুটাইয়া লইয়া নিত্যানন্দপুরের মুনসেফী আদালতের কাছে একটা বট-গাছের তলায় দোকান খুলিয়া বসিল এবং ডেমী, কোর্টফি, 'ইষ্টাম্বর' কাগজ প্রভৃতি বিক্রয় করিতে লাগিল।

যজ্ঞেশ্বরের উপার্জ্জনের আরও একটা পন্থা ছিল। মফস্বলের অনেক লোক মুনসেফী আদালতে মামলা করিতে আসিত; কাহারও হঠাৎ দুই পাঁচ টাকার আবশ্যক হইলে যজ্ঞেশ্বরের নিকটে আসিলেই সে টাকা পাইত, কিন্তু তাহাকে অঙ্গীকার করিতে হইত, পরদিন এক টাকা সুদসমেত সে ঋণ পরিশোধ করিবে। মামলা নষ্ট হয় দেখিয়া অনেক মক্কেল উকীলকে জামিন রাখিয়া যজ্ঞেশ্বরের নিকট এই ভাবে টাকা কর্জ্জ লইত। যজ্ঞেশ্বর পয়সা হাতে রাখিত না, কোন উপায়ে আটটি পয়সা হাতে হইলেই সে দুয়ানি গাঁথিত, ক্রমে দুয়ানি হইতে শিকি, শিকি হইতে আধুলি—তাহার পর টাকা। কোনরূপে একটি টাকা জমিলে যজ্ঞেশ্বর কখন তাহা ভাঙ্গাইত না।

যজ্ঞেশ্বরের স্ত্রী একটি পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলে সে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, যজ্ঞেশ্বর সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিয়া বলিত তাহার স্ত্রীর ন্যায় অমিতব্যয়ী ভূ-ভারতে আর দেখা যায় না। যজ্ঞেশ্বরের স্ত্রী পূজা-পার্ব্বণে দুই চারিটি পয়সা খরচ করিতেন ইহাই তাহার অভিযোগের কারণ। একটা প্রধান অপব্যয়ের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া যজ্ঞেশ্বর কিছুদিন নিশ্চিন্ত মনে অর্থ সঞ্চয় করিল, তাহার পর সুযোগ বুঝিয়া এক দিন পাকাচুলে কলপ লাগাইয়া, লাল চেলি পরিয়া ও টোপড় মাথায় দিয়া কালান্তর হইতে একটি পঞ্চদশী যুবতীকে বিবাহ করিয়া আনিল। সে সময় তাহার কন্যা হীরামণির বয়স কুড়ি বৎসর, চারি বৎসরের একটি পুত্র কোলে লইয়া সেইবার হীরামণি বিধবা হইয়াছিল। শ্বশুরকুলে তাহার কেহ ছিল না বলিয়া হীরামণি পিতৃগৃহেই বাস করিতে আসিল।

যজ্ঞেশ্বরের পুত্র বিশ্বেশ্বর হীরামণির দুই বৎসরের বড়, সে কলিকাতায় বিবাহ করিয়া সেখানে শ্বশুরালয়ে বাস করিত, একটা আফিসে কেরাণীগিরি করিয়া তাহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। বিশ্বেশ্বর

উপার্জ্জনের সমস্ত টাকা পিতাকে পাঠাইত না বলিয়া যজ্ঞেশ্বর পুত্রের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। চাকরী আরম্ভ করিয়া বিশ্বেশ্বর দুই একবার পূজার ছুটিতে সস্ত্রীক বাড়ী আসিয়াছিল, কিন্তু পিতার কার্পণ্যে ও বিমাতার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া সে নিত্যানন্দপুরের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছিল। বিধবা ভগিনীটিকে সে মধ্যে মধ্যে সাহায্য করিত।

যজ্ঞেশ্বর বন্ধুগণের নিকট আক্ষেপ করিয়া বলিত, "একালের ছেলেগুলা স্ত্রীর অত্যন্ত বাধ্য, মা বাপকে গ্রাহ্য করে না, অপব্যয়ী, সাহেবী মেজাজ, ঘোরতর বেতরিবৎ"—ইত্যাদি।

৩

কলিতে যে বয়সে বাণপ্রস্থাবলম্বনের ব্যবস্থা আছে—তাহা অপেক্ষাও অধিক বয়সে যজ্ঞেশ্বর সেই পঞ্চদশবর্ষীয়া কুলীন দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিল। গৃহে অন্নবস্ত্রের সংস্থান থাকিলে কেহ এমন পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করে না, সুতরাং বিবাহের পর পিত্রালয়ের সহিত নব বধূর সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইল।

বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়া ট্র্যাম্পকেণ্ডর যজ্ঞেশ্বরের যৌবনকাল আবার নূতন করিয়া ফিরিয়া আসিল। সে পাকা গোঁফ কামাইয়া ফেলিল; কলপ-ব্যবহারের সুযোগ থাকিলে না কামাইলেও চলিত বটে, কিন্তু কলপ কিনিতে পয়সা খরচ হয় এবং কাহারও নিকট হইতে নিত্য তাহা চাহিয়াও গোঁফ কালো করা চলে না। তাহার মাথায় একটি টিকি ছিল—ছাঁটিয়া তাহার আকার ছোট করিয়া লইল এবং স্বদেশ-প্রেমিক ব্যক্তিরা একালে যেমন বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন করিয়াছেন, সে সেই ভাবে থান বর্জ্জন করিয়া কালাপেড়ে ধুতি পরিতে আরম্ভ করিল। এ সময় যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, 'চাটুয্যে মশায়, আপনার বয়স কত হই য়াছে?' তাহা হইলে যজ্ঞেশ্বর খুব গম্ভীর হইয়া বলিত, "বয়স আর কম কি, চল্লিশ পার হয়ে গিয়েছে!"

মায়ের মৃত্যুর পর হইতে হীরামণি সংসারের কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিতেছিল। বিবাহের পর দুই মাস যাইতে না যাইতে সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া, যজ্ঞেশ্বরের 'দ্বিতীয় পক্ষে'র সহিত তাহার মনান্তর আরম্ভ হইল, এবং ক্রমে মনান্তর হইতে কলহের সৃষ্টি হইল। যজ্ঞেশ্বরের সংসারে অশন-বসনের ব্যবস্থা যে অতি শোচনীয় ছিল তাহা না বলিলেও চলে; এক পয়সার চিংড়ি বা পুঁটী মাছ ও দুই পয়সার তরকারী দৈনন্দিন বাজার নির্দ্দিষ্ট ছিল। নূতন গৃহিণী হওয়ার পর কি ভাবিয়া জানি না বাজারের বরাদ্দ কিছু বাড়িয়াছিল,কোন দিন দেড় পয়সা কোন দিন বা দুই পয়সা পর্য্যন্ত 'দুনো দুনি আর কি' বেশী খরচ হইত! শেষ বয়সের বিবাহের পর যজ্ঞেশ্বরের হাত খুলিয়া গিয়াছিল, লোকে বলাবলি করিত, লক্ষণ ভাল নয়।

হীরামণি স্বয়ং রন্ধন করিত; বিশ্বেশ্বর তাহার ছেলের জন্য দৈনিক আধসের দুধের রোজ করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু আধসের দুধে চারিবৎসরের ছেলের পেট ভরে না, কাজেই সে বার দুই মাছভাত খাইত, পিতার পাতে সুতরাং চিংড়ি পুঁটী বড় বেশী স্থান পাইত না। যজ্ঞেশ্বর কোনদিন সে

জন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিত না। কিন্তু নূতন বৌ কুসুম হীরামণির পক্ষপাত দেখিয়া দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। একদিন রাত্রে আহারাদির পর যজ্ঞেশ্বর তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে গুড়গুড়িতে তামাক খাইতেছে এমন সময় শয্যাপ্রান্তস্থিত নববধূর অস্ফুট ক্রন্দনোচ্ছ্বাস তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল।

যজ্ঞেশ্বর গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া ব্যগ্র ভাবে বলিল, "কুসুম, কাঁদিতেছ কেন?" কুসুম বলিল, "আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, আমি এখানে এত কষ্ট সহ্য করিতে পারিব না।"

যজ্ঞেশ্বর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "কেন, তোমার কষ্টটা কি?"

কুসুম বলিল, "কষ্ট নয় কি, কষ্ট দিতে বাকি রাখচো কি? তুমি বুড়ো হয়েছ, চোখে কিছু দেখতে পাও না। যে মাছ আন, তোমার মেয়ে ছেলের পাতেই সব ঢেলে দেয়, আর যারা আছে তারা কি দিয়ে ভাত খায় সে বিবেচনা নেই। বুড়ো বাপকে পর্য্যন্ত ফাঁকি দেয়! তা বলতে গেলেই আবার যা নয় তাই বলে গাল, কেনরে বাপু আমি ত নিজের জন্ত বলিনি 'যে এলো চষে সে থাকবে বসে' বাড়ীর কর্ত্তার উপর যেখানে দরদ নেই এমন সংসারে কি মানুষ থাকে?"

যজ্ঞেশ্বর বলিল, "আচ্ছা আমি কাল তোমার এ দুঃখ দূর করবো। তুমি কেঁদ না।" স্ত্রী যে সংসারে পদার্পণ করিয়াই তাহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে শিখিয়াছে, ইহাতে তাহার আনন্দের সীমা রহিল না।

পরদিন যজ্ঞেশ্বর হীরামণিকে বলিল, "হীরেমণি আমার সংসারের অবস্থা ত এই, কত কষ্টে যে তোকে প্রতিপালন করচি, তা মা কালীই জানেন; তা তোর আক্কেল কি রকম বল দেখি! তোর নূতন মা ছেলে মানুষ, সে লজ্জায় তোকে কোন কথা বলতে পারে না, তার খাওয়া দাওয়ার সুবিধা অসুবিধা ত তোকে দেখ্‌তে হয়। মাছ র'াধিস্‌ তাকে দু'এক খান দিস্‌। তোর এত বয়স হলো, আজ ও মাকে ভক্তি করতে শিখ্‌লি নে?"

হীরামণি কিঞ্চিৎ মুখরা, সে গালে হাত দিয়া জিহ্বা দংশন করিয়া বলিল, "ও মা কি লজ্জার কথা! আমি নূতন মাকে মাছ তরকারী খেতে দিইনে, শুধু ভাত দিই, এ কথা তোমাকে কে বল্লে? তুমি বাজার থেকে এক পয়সার মাছ আন, রেঁধে বেড়ে তা তোমাদেরই দিই; আমি বিধবা মানুষ, আমি কি মাছ খাই যে তুমি আমাকে এমন কথা বলচো? আমার রাম মাছ খেতে একটু ভাল বাসে, তা তোমাদের কম পড়বে ভেবে আমি তাকে এক খানার বেশী দু'খানা মাছ দিইনে। আচ্ছা, কাল থেকে আর তাকে মাছ খেতে দেব না।"

যজ্ঞেশ্বর বলিল, "এই উলটো বুঝলি। আমি কি তোর ছেলেকে মাছ খাওয়াতে বারণ করচি? আমি বলচি, রামা ছেলে মানুষ, বেশী মাছ খাওয়ালে ওর পেটের ব্যারাম হতে পারে। খাওয়ার দোষেই ছেলে পিলের ব্যামো হয়।"

হীরামণি হাত নাড়িয়া বলিল, "আমার

দুধের ছেলে, দুধ পায় না তাই দু'বেলা দু'মুঠো ভাত খায়, এই জন্যে এত খোঁটা। আমার অদেষ্টে বেস্তর দুঃখ না থাক্‌লে আমারই বা হাতের নোয়া ঘুচবে কেন, আর তুমিই বা, বুড়ো বয়সে আবার একটা বিয়ে করে বস্‌বে কেন?"

দ্বিতীয় বার বিবাহ করিবার পর, যজ্ঞেশ্বরকে কেহ বুড়া বলিলে, সে কথা তাহার সহ্য হইত না। সে আগুণ হইয়া বলিল, "কি, তোর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? আমি বুড়ো! ফের যদি তুই আমার বয়স তুলে কথা বলবি ত তোর ভাল হবে না বল্‌চি। বাপ বলে আমি অনেক সহ্য করচি, পড়েছিস্ ভাল মানুষের হাতে—" যজ্ঞেশ্বর রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ষ্ট্যাম্প ও ডেমির বাণ্ডিল লইয়া কাছারি চলিল।

কুসুম বলিল "পান নিয়ে যাও, তোমার জন্যে যে মসলা দিয়ে পান তৈয়ারী করে রেখেছি। আমার মাথা খাও পান খেয়ে যাও।"

যজ্ঞেশ্বর তৎক্ষণাৎ জল হইয়া গেল।

৪

সেই দিন হইতে হীরামণি ছেলের পাতে মাছ দেওয়া বন্ধ করিল।

কিন্তু আর এক উপসর্গ উপস্থিত হইল, যজ্ঞেশ্বরের আফিংয়ের ধাত, রাত্রে একটু দুধ না খাইলে সে বাঁচিত না। সেই জন্ত সে নিজের জন্ত আধসের দুধের বরাদ্দ করিয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীকে বঞ্চিত করিয়া অতি কৃপণেও স্বয়ং দুধ খাইতে পারে না, এই জন্ত আর আধসের দুধের রোজ ছিল। এই এক সের দুধ জাল দিয়া হীরামণি তাহা পিতার ও বিমাতার জন্ত তুলিয়া রাখিত। তাহার ছেলের দুধ সে পৃথক ভাবে জাল দিত।

যজ্ঞেশ্বরের নিকট ঘোষাণীর অনেক টাকা পড়িয়াছিল। ক্রমাগত তাগাদায় টাকা না পাইয়া সে দুধে জলের মাত্রা বাড়াইয়া দিল। যজ্ঞেশ্বর দেখিল, দুধ সাদা বটে, কিন্তু তাহার কোন স্বাদ নাই! একদিন রাত্রে সে আহারে বসিয়া বলিল, "কুসুম, ঘোষাণী আজ কাল কি রকম দুধ দিচ্ছে? গুড় দিয়েও যে এ দুধ মিষ্টি হয় না।"

কুসুম বলিল, "ঘোষাণীর দোষ কি? তোমার মেয়ে নিজের ছেলেকে দিয়ে সব দুধ খাইয়ে জল ঢেলে রাখ্‌বে, তা দুধ মিষ্টি হবে কোথা হ'তে?"

পরদিন যজ্ঞেশ্বর আবার হীরামণিকে তিরস্কার করিল। অনাথা নিরুপায় বিধবা পিতার তিরস্কার শুনিয়া ছেলেকে কোলে লইয়া অনেক ক্ষণ নীরবে কাঁদিল। তাহার পর চক্ষু মুছিয়া ভাত রাঁধিতে গেল।

কয়েকদিন উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটিল না। একদিন যজ্ঞেশ্বর বাজার হইতে আধ পয়সার নত্তি (পটলের পাতা) আনিয়া হীরামণিকে বলিল, "আজ নত্তির বড়া কর, অনেক দিন নত্তির বড়া খাওয়া হয়নি।"

হীরামণি বলিল, "এ আর শক্ত কাজ কি? ছটাক খানেক তেল এনে দাও।"

আধ পয়সার নত্তির বড়ায় একছটাক তেল! যজ্ঞেশ্বর রাগে জলিয়া উঠিল, বলিল "সংসার খরচের জন্ত আধপোয়া তেলের বরাদ্দ আছে, তিনটি মানুষের রান্নায় কি সব তেল খরচ হয়, সংসার করিস—আধ ছটাক তেলও বাঁচাতে পারিস্‌নে? যা পারি সব

খরচ করে বস্‌বি, নিজের সংসার হলে কি করতিস্?"

হীরামণি বলিল "আমাকে এক মুঠো খেতে দিয়ে আজকাল তুমি সদাই খোঁটা দেও, আমার যেমন আর মরবার যায়গা নেই, তাই তোমার দুয়োরে দাসীগিরি করতে হচ্ছে! তেল কি আমি চুমুক দিয়ে খাই? আধ পোয়া তেলই বা কতটুকু? রান্না, মাথা, প্রদীপ-জ্বালা—সব সেই তেলে, তার উপর আবার বাঁচাতে হবে! এমন গিন্নিমো আমাকে দিয়ে হবে না, যে পারে সে করুক।"

"আমার যেমন কাজ ছিল না, চড্ডোর বড়া!" বলিয়া যজ্ঞেশ্বর সরোষে নস্তির আটিটা আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করিল। সে দিন সে রাগ করিয়া কিছু খাইল না, শুকমুখে দপ্তরটি লইয়া কাছারী চলিল।

কুসুম স্বামীর জন্ত কিছু জলখাবার আনাইয়া রাখিল। স্বয়ং দুধ না খাইয়া সমস্ত দুধ ভাল করিয়া জাল দিয়া রাখিল। সন্ধ্যার সময় যজ্ঞেশ্বর ভোগুারী করিয়া বাড়ী ফিরিলে কুসুম পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তাহাকে জল খাইতে দিল। ক্ষুধাতুর বৃদ্ধ 'দ্বিতীয় পক্ষে'র পতি-ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া পরিতৃপ্ত ভাবে বলিল "আজ ত দুধটা বেশ লাগলো।"

কুসুম বলিল, "বেশ লাগবে না কেন? আজ যে আমি নিজে জাল দিয়েছি, আজ তোমার মেয়ে দুধে জল মিশাতে পারেনি। তুমি ওবেলা তাকে তেলের কথা কি বলেছিলে, সে সমস্ত দিন রাগে গর গর করচে, বলেছে সে আর সংসারের কাজ করতে পারবে না; তাইকে পত্র লিখে তোমাকে জব্দ করবে। মা গো মা, এমন মেয়ে বাপের জন্মে দেখিনি! বাপের একটা কথা গায়ে সয় না? এত তেজ! আমি তো চোখের মাথা খাইনি, সে কি করে না করে আমি সব দেখতে পাই। চাল বল, তেল বল, নুন বল—সব জিনিষ সে ভুলোর মাকে দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বিক্রী করে। হাতে কি কম পয়সা জমিয়েছে, গয়না বন্ধক রেখে মহাজনী করচে।"

যজ্ঞেশ্বর বলিল "বটে! এ কথা এতদিন বলতে হয়! তাই ত বলি, মাসে দেড় মণ চাল কিনি, তাতেও কুলোয় না, দু'সের নুনে মাস যায় না। হারামজাদী দেখচি আমাকে ফেরার করবে, এমন উপায়?"

কুসুম বলিল, "উপায় আর কি? ভাড়ারের ভার ওর হাতে থাকলে কিছুতেই কুলোবে না!"

যজ্ঞেশ্বর বলিল, "তবে তুমি ভাঁড়ারের ভার লও। ও দু'বেলা দু'টো রেঁধে দিতে পারে দেক—না পারে তুমি ছেলেমানুষ দু'বেলা হাঁড়ি ঠেলতে পারবে কি?"

কুসুম বলিল, "আমার সংসার আমি না পারলে আর কে পারবে? দু'বেলা দু'টো রাঁধে, সে জন্ত ওর কথা শুনতে হয়, তুমি ত সে সব কথা শুনতে পাও না। আমার কাণ ঝালাপালা হয়ে গেল। আমি বলি কি, ওকে এক বেলার মত চাল ডাল দিয়ে বলা যাক্ ও আলাদা যায়গায় রান্না করে খাক্, আমাদের কোন জিনিষ ওর হাত দেবার দরকার নেই।"

যজ্ঞেশ্বর বলিল, "তুমি খুব ভাল কথা

বলেছ, পাকা গিন্নির মত কথা বলেছ, কাল থেকে দাও ওকে পৃথক করে। কি করি গলায় পড়েছে, তাড়াতে ত পারবো না।"

কুসুম বলিল "আহা তা কেন করতে গেলে! হাজার হোক নিজের মেয়ে ত বটে, ও যাই কেন করুক না, ওকে দু'মুঠো খেতে দিতেই হবে। এত ধর্ম্মজ্ঞান, বুড়া একেবারে গলিয়া গেল।

৫

যজ্ঞেশ্বরের যে কথা সেই কাজ। পর দিন হইতে কুসুম সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইল। সে হীরামণিকে একবেলার উপযুক্ত চাউল, ডাল, লবণ, তেল দিয়া বলিল "তোমাকে আর আমাদের সংসারের কাজও করতে হবে না, দশ কথা শুনিয়েও কাজ নাই, এই নাও তোমার সিদে, আলাদা করে রেঁধে খাও।"

হীরামণি পিতার ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইল। সে বলিল, "আমার চাল-ডালে দরকার নেই, আমার দু'তোলা সোনাদানা আছে, তাই বিক্রি করে আমার যে দশদিন চলে চলুক, তার পর অদৃষ্টে যা থাকে হবে, চাল-ডাল দিয়ে আমার কোন দিন কি খোঁটা দেবে, অমন ভাতের পায়ে দণ্ডবৎ।"

হীরামণি শৈশবকালে অল্প লেখাপড়া শিখিয়াছিল, সে কোথা হইতে কাগজ ও দোয়াত-কলম সংগ্রহ করিয়া আনিল, তাহার পর দাদাকে পত্র লিখিতে বসিল। পত্রে সে পিতার ও বিমাতার ব্যবহারের সকল কথা আনুপূর্ব্বিক লিখিল, পিতার সংসারে আর তাহার স্থান নাই, স্বামীর কুলেও আর তাহার কেহ নাই, এখন দাদা যদি তাহাকে দু'টি খাইতে না দেন, তাহা হইলে তাহাকে অনাহারে মরিতে হইবে। আত্মহত্যা করিয়া সে সকল জ্বালা জুড়াইতে পারিত, কিন্তু রামার মুখ চাহিয়া সে মরিতে পারিতেছে না—ইত্যাদি। পত্রখানি লিখিয়া ঘোষাণীকে দিয়া সে তাহা ডাকঘরে পাঠাইল।

বিশ্বেশ্বর যথাকালে সকল কথা জানিতে পারিয়া মনে বড় আঘাত পাইল। কিন্তু সে শ্বশুরবাড়ীতে বাস করে, সেখানে ভগিনীকে লইয়া যাইবার সুবিধা নাই, অগত্যা সে তাহার ভরণ-পোষণের ব্যয় স্বয়ং গ্রহণ করিতে সম্মত হইল, এবং প্রতিমাসে তাহার খোরাকীর টাকা পাঠাইতে লাগিল, সেই টাকায় হীরামণি পৃথক ভাবে রাঁধিয়া খাইতে লাগিল। বিশ্বেশ্বর পিতাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা না লেখায় যজ্ঞেশ্বর পুত্রের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল।

হীরামণি ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া অতি কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিল। এই ভাবে এক বৎসর কাটিয়া গেল। রামা পাঁচ বৎসরের হইল।

রামা ছেলেমানুষ হইলেও দাদা মহাশয়ের উপেক্ষা বেশ বুঝিতে পারিত। সে দেখিত আজা মশায় তার দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেটিকে আদর যত্ন করে, তাহাকে পোষাক পরাইয়া কোলে করিয়া বেড়ায়, আর রামাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করে না, কখন তাহাকে একখানি কাপড় দেয় না, একটু আদর করিয়া কাছে ডাকে না। সে ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া এক এক দিন তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিত, "মা, আজা মশায় আমাকে আর ভালবাসে না কেন?" হীরামণি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সন্তানের মুখ চুম্বন

করিত, মায়ের আদরে বালকের মনোবেদনা দূর হইত।

পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে হীরামণি রামাকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিল।

রামা একদিন মধ্যাহ্নে পাঠশালা হইতে আসিয়া শয্যায় শয়ন করিল। মা বলিল, "পাঠশালা থেকে এসে শুলি যে!"

রামা বলিল, "মা, আমার জ্বর এসেছে, আমি বস্‌তে পারচিনে, বড় শীত লাগছে, একখান কাঁথা দে।"

হীরামণি পুত্রের ললাটে হাত দিয়া দেখিল, কপাল পুড়িয়া যাইতেছে, তাহার সুন্দর মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে। জ্বরের যন্ত্রণায় সে চক্ষু মেলিয়া চাহিতে পারিতেছে না।

সমস্ত রাত্রি সেই ভাবে কাটিয়া গেল। হীরামণি পুত্রের পাশে বসিয়া বিনিদ্র বিভাবরী অতিবাহিত করিল।

প্রভাতে বালক চক্ষু মেলিয়া চাহিল, কাতর ভাবে বলিল, "মা, দাদা মশায়কে একবার ডাক, আমি আর বাঁচবো না।"

হীরামণি বলিল, "ষাঠ, ষাঠ, ষেঠের বাছা ও কথা বলে না।" পুত্রের এরূপ জ্বর দেখিয়া হীরামণির উদ্বেগের সীমা রহিল না। এ বিপদে সে কাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে? সে চারি দিক অন্ধকার দেখিল, তাহার পর পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "বাবা, রামার বড় জ্বর, এক বার হাত খানা দেখে এস।"

যজ্ঞেশ্বর অনিচ্ছার সহিত কন্যার গৃহে প্রবেশ করিল, দৌহিত্রের হাত দেখিয়া বলিল, "তোর সকল কাজেই তাড়াতাড়ি, অল্প একটু জ্বর হয়েছে, দিন দুই উপোস দিলেই সেরে যাবে, এ জন্যে ডাক্তার কবরেজ ডাক্‌তে হবে না।"

৬

জ্বর ছাড়িল না। কিন্তু সে জন্য যজ্ঞেশ্বরকে কিছু মাত্র চিন্তিত দেখা গেল না। সে যথা নিয়মে আহার, আমোদ ষ্ট্যাম্প বিক্রয় করিতে লাগিল। হীরমণি আহার নিদ্রা বন্ধ করিয়া পুত্রের শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কুসুম কোন দিন তাহার দ্বারের নিকটও আসিত না। সে হীরামণিকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল, "দাদার খেতে পরতে দিচ্ছে, সে এসে এখন ভাগনের চিকিস্যে করাক না কেন! বাপের অমান্যি করে বোনকে টাকা পাঠানো হয়, যেমন ভাই, তেমনি বোন্!"

গ্রামের কবিরাজ ভোলানাথ কবিভূষণ নিদান-সিন্ধু ভিষক্‌রত্ন যজ্ঞেশ্বরের প্রতিবেশী, যজ্ঞেশ্বরের সহিত তাহার পিতার বন্ধুত্ব ছিল। যজ্ঞেশ্বর কন্যার কাতরতা উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় ভোলানাথকে ডাকিয়া আনিল, সে জানিত ভোলানাথ তাহার নিকট টাকা লইতে পারিবে না। সুচিকিৎসক বলিয়া গ্রামে ভোলানাথের প্রতিষ্ঠা না থাকিলেও, সংবাদ-পত্রের বহু বিজ্ঞাপনে ভোলানাথের নাম ছাপা হইত। ভোলানাথের এলোপ্যাথিক চিকিৎসাও নাকি কিছু কিছু জানা ছিল। কবিভূষণ, নিদানসিন্ধু ও ভিষক্‌রত্ন, এই তিনটি উপাধি সে কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা কেহই জানিত না। ভোলানাথ থর্ম্মমেটার দিয়া জ্বর পরীক্ষা করিল, এবং রোগীর মাথায় Ice bag বসাইবার ব্যবস্থা

দিয়া প্রস্থান করিল। ভোলানাথ জানিত পল্লীগ্রামে Ice ও Ice bag উভয়ই অপ্রাপ্য, কিন্তু সে যে অসাধারণ কবিরাজ তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্ত অসাধারণ জিনিসের ফরমাইস করা আবশ্যক।

তিন দিনেই জ্বর বিকারে দাঁড়াইয়াছিল, ভোলানাথ কবিরাজ তাহার কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে সে বলিল "শ্লেষ্মার প্রকোপ অত্যন্ত অধিক, সাধারণ ঔষধে কোন ফল হইবে না, তিব্বত দেশ হইতে আমার বন্ধু তাসিলামা শীঘ্রই কিছু কস্তুরী পাঠাইবেন, তাহার একমাত্রা সেবনে রোগ সারিয়া যাইবে।"

যজ্ঞেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "ততদিন ছেলেটা বাঁচিবে ত?"

নিদানসিন্ধু বলিল, "সে উহার অদৃষ্ট, আমরা চিকিৎসা করিতে পারি বটে, কিন্তু পরমায়ু দিতে পারি না।" তাসিলামার প্রেরিত কস্তুরী আসিল না, রোগীকে ডবল নিউমোনিয়ায় ধরিল।

হীরামণি অন্ত উপায় না দেখিয়া তাহার দাদাকে টেলিগ্রাম করিল। রেলের ষ্টেসন গ্রাম হইতে অধিক দূরে নহে।

পরদিন প্রভাতে বিশ্বেশ্বর ব্যাগহস্তে পিতৃগৃহে উপস্থিত হইল। ভাগিনেয়ের অবস্থা দেখিয়া তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। রামাকে দেখিয়া আর চিনিতে পারা যায় না, এই কয় দিনের রোগেই তাহার দেহ চর্ম্মসার, চক্ষু নিষ্প্রভ, গণ্ডস্থল শুষ্ক। রামা তাহাকে দেখিয়াই 'মামা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হীরামণি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিল, দাদা, বাছাকে বাঁচাও, আমার যে আর কেউ নেই দাদা।

বিশ্বেশ্বরের চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল, তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না।

পুত্রের আকস্মিক আবির্ভাবে যজ্ঞেশ্বর বিরক্ত হইয়া বলিল, "হাঁপাতে হাঁপাতে হঠাৎ আসবার কি দরকার ছিল! জ্বর হয়েছে দু'পাঁচ দিন ভুগে সেরে উঠবে, জ্বর কি কারও হয় না? তোমাদের সকল তাতেই বাড়াবাড়ি, পয়সা খুব সস্তা কি না!"

বিশ্বেশ্বর বলিল, "না এসে করি কি? রামার যে রকম কঠিন রোগ, তার মত চিকিৎসা হচ্ছে কৈ?"

যজ্ঞেশ্বর বলিল, "চিকিৎসা হচ্ছে না, কলকাতা থেকে, ডাক্তার আনতে হবে না কি? ভোলানাথের মত কবিরাজ এ তল্লাটে নাই, খবরের কাগজে পর্য্যন্ত তার নাম ছুটেছে, সে দু'বেলা এসে দেখে যাচ্ছে, তাতেও ভাল চিকিৎসা হচ্ছে না? আমাদের ব্যারাম স্যারাম হ'লে যে কবিরাজও ডাকতে হয় না, অমনি সেরে যায়।"

বিশ্বেশ্বর কিছু উত্তর দিল না, অবিলম্বে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী গঙ্গারামপুর হইতে একজন এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন লইয়া আসিল। ডাক্তার রোগী দেখিয়া বলিলেন, "প্রথম হইতে একেবারেই চিকিৎসা হয় নাই, 'কোলাপ্স ষ্টেটে' আসিয়া আমি কি করিব?"

ডাক্তার আসিয়াছে শুনিয়া কবিরাজ নিদানসিন্ধু বলিল, "এখন পুত্তিকাভরণ ব্যবস্থা, ডাক্তার মর্ফিয়া ইন্‌জেক্ট করিবে

বুঝি? তাহাতে কি ফল হইবে?”

নিদানসিন্ধুর কথাই ফলিল, ডাক্তার কিছুই করিতে পারিলেন না। অভাগিনী হীরামণি তাহার নয়ন-পুত্তলি পাঁচ বৎসরের পুত্রটিকে হারাইয়া মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বিশ্বেশ্বর আর অগ্রপশ্চাত না ভাবিয়া পুত্রহারা ভগ্নীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। আমরা জানি বিদায়ের সময় বৃদ্ধ যজ্ঞেশ্বর কিন্তু চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারে নাই, তাহার মনটা যেন উদাস হইয়া গেল, কিন্তু সে বেশী ক্ষণের জন্য নহে, কুসুমের প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া, তাহার ক্রোড়স্থ কনিষ্ঠ পুত্রের কচি মুখে মিষ্টি কথা শুনিয়া আবার প্রকৃতিস্থ হইল।

শ্রীদীনেন্দ্র কুমার রায়।

বেদান্ত।

মুক্তি সম্বন্ধে, নাস্তিক ও আস্তিকদিগের যে সকল মতভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সকল মতেই মোক্ষাবস্থায় দুঃখ-নিবৃত্তি অবশ্য স্বীকার্য্য এবং বৈষ্ণব ভিন্ন সকল দার্শনিকই ঐ অবস্থায় অধীনতার অভাব স্বীকার করিতে বাধ্য। কারণ, তাহাদের মতে মোক্ষাবস্থায় কোন রূপ সম্বন্ধজ্ঞান থাকে না, সম্বন্ধজ্ঞান না থাকিলে অধীনতা থাকিতে পারে না। বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজ ও পূর্ণপ্রজ্ঞ মোক্ষাবস্থায় ঈশ্বরের সহিত সেব্য-সেবকত্ব সম্বন্ধ স্বীকার করেন, সুতরাং তাঁহাদের মতে সে সময়েও অধীনতা অপরিহার্য্য। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের শৈবমত প্রারম্ভে মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন “তদেতদ্বৈষ্ণবমতং পরতন্ত্রদুঃখাবহত্বান্নেপ্সিতাস্পদং” বৈষ্ণবদিগের দাসত্ববাদ সংস্থাপক মত, পরাধীনতা-জনিত দুঃখবোধক; সে জন্য ইহা অভিলষিত হইতে পারে না। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ঐ সময়ে পরাধীনতা দুঃখ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, যখন মুক্ত পুরুষ ঈশ্বর-সেবায় নিযুক্ত থাকেন, তখন তাহার কোন রূপ দুঃখ হয় না, প্রত্যুত বিমল সুখ হইয়া থাকে। বাস্তবিক বিশেষ যুক্তি সহকারে বিচার করিলে, সে সময়ে অল্প পরিমাণ দুঃখ থাকারই সম্ভাবনা বলিয়া মনে হয়। তবে সেই দুঃখ, সে সময়ের সুখের তুলনায় অত্যন্ত অল্প, সুতরাং তাহা “স প্রত্যবমর্ষঃ” অর্থাৎ সহিষ্ণুতার সহিত অনুভবনীয় হইতে পারে। যদিও বৈষ্ণব ভিন্ন সকল দার্শনিকের মতেই অধীনতা দুঃখের কারণ তথাপি বৈষ্ণবদিগের উক্ত মত, শঙ্করসম্মত অদ্বৈত মুক্তির সোপান বলিয়া আদৃত হওয়ার যোগ্য। কারণ, চিত্তশুদ্ধি অদ্বৈতাত্মা-সাক্ষাৎকারের কারণ, এবং চিত্তশুদ্ধির হেতু ঈশ্বরোপাসনা। সুতরাং বৈষ্ণবসম্মত মোক্ষাবস্থায় ঈশ্বরোপাসনাপ্রভাবে চিত্তের নির্ম্মলতা বা শুদ্ধি সাধিত হইলে, অদ্বৈত ব্রহ্মরূপ আত্ম-সাক্ষাৎকার অবশ্যম্ভাবী। অতএব বৈষ্ণবসম্মত ঈশ্বরোপাসনা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি রূপ মুক্তির কারণ না

হইলেও, মুক্তির হেতু পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ বলিয়া মুক্তির বিশেষ উপযোগী। ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন

"লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা
পুরাপ্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং
কর্ম্মযোগেন যোগিনাং। ৩।৩।

হে নিষ্পাপ! আমি পূর্ব্বেই কল্যাণাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যগণের জন্য দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথা বলিয়াছি। একটি জ্ঞাননিষ্ঠা এবং অপর কর্ম্মনিষ্ঠা। যাহারা সাংখ্য অর্থাৎ আত্মবিষয়ে বিবেকসম্পন্ন ও শুদ্ধচিত্ত তাহারা জ্ঞাননিষ্ঠায় অধিকারী, এবং যাহারা আত্মবিবেক রহিত ও অশুদ্ধচিত্ত তাহারা কর্ম্মনিষ্ঠায় অধিকারী। এই বাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে যাহাদিগের চিত্তের কলুষতা বিদূরিত হয় নাই, তাহারা চিত্তের বিশুদ্ধতা সম্পাদনের জন্য ঈশ্বরোপাসনা প্রভৃতি কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। এবং যাহারা শুদ্ধচিত্ত, তাহাদের পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন। এই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে যে

"নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ৩।১৮

যে জ্ঞানী ব্যক্তি বৈষয়িক সুখের ক্ষণিকতাদি দর্শনে আত্মসুখে নিরতিশয় প্রীতিযুক্ত এবং তাহাতেই পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট তাহার পক্ষে কর্ম্ম করা ও না করা উভয়ই সমান, অর্থাৎ নিষ্ফল। কারণ এই জগতের কোনও পদার্থেই, ঐরূপ ব্যক্তির কোনরূপ প্রয়োজন সম্বন্ধ নাই। ইহার ভাবার্থ এই যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রয়োজনাভিলাষ থাকে, ততক্ষণই কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হয়। জ্ঞানী ব্যক্তির কোনও রূপ প্রয়োজনাভিলাষ নাই। তিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রভাবে বিমল ও অবিনাশী ব্রহ্মানন্দ লাভ করায় তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকেন। ব্রহ্মানন্দ সকল আনন্দের শীর্ষস্থানীয়। যে ব্যক্তি এইরূপ উৎকৃষ্টতর আনন্দ লাভ করিতে পারেন, সে ব্যক্তি কোনরূপ কর্ম্ম করিতে অভিলাষ করেন না। উপাসনা প্রভৃতি কর্ম্ম ঈশ্বরের সন্তোষার্থ করা হইয়া থাকে। কারণ, ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া উপাসকের সুখ বিধান করেন। যখন জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মানন্দে পরিতৃপ্ত এবং এই আত্মানন্দ অবিনশ্বর ও স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া অনুভব করিতে পারেন, তখন তাহার অন্য বিধ সুখাভিলাষ থাকে না, সুতরাং সে সময়ে তিনি নিষ্প্রয়োজন ঈশ্বরোপাসনা হইতে বিরত থাকিবেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত। বিশেষতঃ জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট জগতের সকলই আত্মস্বরূপ, কিছুই জ্ঞানী ব্যক্তি হইতে ভিন্ন নহে, ঈশ্বর ও জ্ঞানী ব্যক্তি উভয়ই এক, সুতরাং উপাস্য ও উপাসক এ উভয়ের ভেদজ্ঞান না থাকিলে উপাসনা হইতে পারে না। এই অবস্থায় বৈষ্ণবসম্মত সেব্যসেবকভাব— চিত্তের অশুদ্ধাবস্থার কার্য্য; ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত।

অদ্বৈত মতে মুক্তি দ্বিবিধ। জীবন্মুক্তি ও বিদেহ-মুক্তি। জীবন্মুক্তিসময়ে শরীর থাকে, বিদেহমুক্তিসময়ে শরীর থাকে না। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাববশতঃ অজ্ঞানের মোহিনী শক্তি দ্বারা অভিভূত হন না। তিনি অজ্ঞান ও তৎ

কার্য্য সকলকেই মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারেন, এবং শারীরিক দুঃখ প্রভৃতি দ্বারাও তিনি কোনরূপ উদ্বেগ অনুভব করেন না। ব্রহ্মজ্ঞানীর সপ্তবিধ অবস্থা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পরবর্ত্তী তিনটি জীবন্মুক্তের অবস্থা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

"চতুর্থী ভূমিকাজ্ঞানং তিস্রঃ স্যুঃ সাধনং পুরা।
জীবন্মুক্তেরবস্থাস্তু পরা স্তিস্রঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

প্রথম তিনটি সাধনাবস্থা, চতুর্থটি জ্ঞানাবস্থা এবং পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম জীবন্মুক্তাবস্থা বলিয়া কথিত আছে। উক্ত সপ্তবিধ অবস্থা সম্বন্ধে লিখিত আছে যে

"জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা পরিকীর্ত্তিতা।
বিচারণা দ্বিতীয়াস্যা তৃতীয়া তনুমানসা।
সত্তাপত্তিশ্চতুর্থীস্যাৎ ততোঽসংসক্তিনামিকা।
পদার্থাভাবনীষষ্ঠী সপ্তমী তুর্য্যগা স্মৃতা।

প্রথম মুমুক্ষাবস্থা, দ্বিতীয় বিচারাবস্থা, তৃতীয় বিচারজ একাগ্রতাজনিত সূক্ষ্মবস্তু গ্রহণ যোগ্যতাবস্থা, চতুর্থ ব্রহ্মসাক্ষাৎ কারাবস্থা, পঞ্চম নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থা, ষষ্ঠ নির্ব্বিকল্প সমাধির চিরস্থায়িতাবস্থা এবং সপ্তম সর্ব্বদা পরিপূর্ণানন্দ অবস্থা। প্রথম অবস্থাত্রয় জাগ্রৎ অবস্থা নামে অভিহিত। কারণ, আমাদের জাগ্রৎ সময়ের ন্যায় সে সময়েও জাগৎ প্রপঞ্চ সত্য-রূপে অনুভূত হইয়া থাকে। চতুর্থ জ্ঞানা-বস্থা, ইহা স্বপ্নাবস্থাতুল্য; কারণ, সে সময়ে জগৎ প্রপঞ্চ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মত অনুভূত হইতে থাকে। চতুর্থাবস্থাপ্রাপ্ত জ্ঞানীকে ব্রহ্মবিৎ বলা যায়। পঞ্চম নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থা, ইহা সুষুপ্তি নামে অভিহিত, কারণ, এই অবস্থায় কোনরূপ জাগৎ প্রপঞ্চ অনুভূত হয় না। স্বভাবতঃই জ্ঞানী ব্যক্তির এই অবস্থা ভঙ্গ হইয়া থাকে। এই অবস্থাপন্ন জ্ঞানীকে ব্রহ্মবিদ্বর বলা যায়। ষষ্ঠ অবস্থা গাঢ় সুষুপ্তি নামে অভিহিত, এই অবস্থায় নির্ব্বিকল্প সমাধি অধিক সময় স্থায়ী, এবং অন্যের চেষ্টা ব্যতীত এই অবস্থায় ভঙ্গ হয় না। এই অবস্থায় জ্ঞানীকে ব্রহ্মবিদ্বরিয়ান্ বলা হইয়া থাকে। সপ্তম তুরীয়াবস্থা, এই অবস্থায় সর্ব্বদা পরিপূর্ণ ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হয়, কখনও এই অবস্থার ভঙ্গ হয় না। এই অবস্থাপন্ন জ্ঞানী ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় জ্ঞানী ব্যক্তির নিশ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতির জন্যও কোনরূপ যত্ন থাকে না। এই অবস্থা হইতে যখন শরীর বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন বিদেহ-মুক্তি হইয়া থাকে। এ স্থলে আর একটি কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সকলেই বলিয়া থাকেন যে, দর্শনশাস্ত্র নীরস। সে জন্য তাহার প্রতি অনেকেরই আংশিক উপেক্ষা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে দর্শনশাস্ত্র 'নীরস' নহে, তাহাতে 'রস' আছে। সে রসের নাম 'অদ্ভুত রস' ও 'শান্ত রস'। সকল দর্শনেই উভয় বিধ রস নাই। যথাসম্ভব কোন দর্শনে 'অদ্ভুত' ও কোন দর্শনে বা 'শান্ত' রস বর্ত্তমান আছে। যে সকল দর্শনের বিচারপ্রণালী দ্বারা বুদ্ধি-বৃত্তি সূক্ষ্ম হয়, সে সকল দর্শনে অদ্ভুত রস, যথা বৌদ্ধ ও ন্যায়াদি দর্শন। যে সকল দর্শনের বিচার দ্বারা সংসারের প্রতি যথা-সম্ভব আসক্তি নিবৃত্তি এবং আত্মজ্ঞানের প্রতি অগ্রসর হওয়া যায় সে সকল দর্শনের

শান্ত রস। যথা সাংখ্য ও বেদান্ত-দর্শন। সাহিত্যদর্পণকারের মতে অদ্ভুত রসের লক্ষণ যথা—"অদ্ভুতো বিস্ময় স্থায়ি ভাবঃ" বিস্ময় হইতে যে রস প্রকাশিত হয়, তাহার নাম অদ্ভুত রস। সাধারণবুদ্ধির অগম্য বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তির বিস্তৃতি, বিস্ময় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধ ও ন্যায়াদি দর্শনের বিচারপ্রণালী দেখিলে, উক্ত দর্শন-প্রণেতৃগণের বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ প্রশান্ততা অনুভূত হয়, সুতরাং ঐ সকল দর্শনে অদ্ভুত রসই যুক্তিসিদ্ধ। সাহিত্যদর্পণকারের মতে শান্ত রসের লক্ষণ যথা "শান্তঃ শম স্থায়ি ভাবঃ" "অনিত্যত্বাদিনাঽশেষ বস্তু-নিঃসারতাতু বা, পরমাত্মস্বরূপং বা তস্যালম্বন-মিষ্যতে" শম হইতে যে রস প্রকাশিত হয়, তাহার নাম শান্ত রস, বিষয়াসক্তি শূন্যাবস্থায় আত্মানন্দে বিশ্রামজনিত সুখকে শম বলা যায়। অনিত্যত্ব প্রভৃতি দোষপ্রযুক্ত সকল পদার্থে অকিঞ্চিৎকরত্ব-জ্ঞান অথবা সচ্চিদানন্দরূপ আত্মা এই রসের অবলম্বন। কাব্যপ্রকাশকারের মতে শান্ত রসের লক্ষণ অন্যরূপ বর্ণিত হইয়াছে, যথা "নির্ব্বেদ স্থায়িভাবোঽস্তি শান্তোঽপিশমোরসঃ" তত্ত্বজ্ঞান আপদ্ বা ঈর্ষা প্রভৃতি প্রযুক্ত 'অহংকারে'র প্রতি অবজ্ঞা-বুদ্ধি হয়, সেই অবজ্ঞাবুদ্ধির নাম নির্ব্বেদ, এই নির্ব্বেদ হইতে অভিব্যক্ত রসের নাম শান্তরস। সাংখ্য ও বেদান্তের বিচার এবং যুক্তির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকিলে শম বা নির্ব্বেদের উদয় হইতে পারে। সুতরাং উক্ত দর্শনসমূহে শান্ত রস থাকা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস এই সপ্তবিধ রস সাধারণের উপভোগ্য। কাব্য-নাটকাদিতে বিশেষভাবে এই সপ্তবিধ রসেরই বর্ণনা আছে, সে জন্য কাব্য-নাটকা-দির প্রতি সহজেই সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অদ্ভুত এবং শান্ত রস সাধারণ বুদ্ধির উপভোগ্য নহে, বিচারের আতিশয্য ও মানসিক একাগ্রতা প্রভাবে উক্ত রসদ্বয়ের উপভোগ সম্পাদিত হইতে পারে। সাধারণ বুদ্ধি ও বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণ এই রসাস্বাদের তাদৃশ অধিকারী নয়, সে জন্য দর্শনশাস্ত্রের উপর, সাধারণের দৃষ্টি পতিত হয় না, এই অবস্থায় দর্শনশাস্ত্রের নীরসত্বপ্রবাদ যুক্তি ও অনুভব-বিরুদ্ধ বলিয়া উপেক্ষার যোগ্যই মনে হয়।

শ্রীগুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ।

প্রকৃত নির্ব্বাণ কি ?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এখানে একটা বিষয়ের উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। একটা বৃহৎ তত্ত্ব বৌদ্ধধর্ম্মে গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। সেই তত্ত্বটির প্রসর বহুল বিস্তৃত। সেই তত্ত্বটি কি ?—না, কর্ম্ম। কর্ম্মই বৌদ্ধধর্ম্ম-নীতির মূল ভিত্তি। কর্ম্ম কি ? না, নৈতিক ফলা-ফল ; কর্ম্মের এই নিয়ম যে, ভালই হোক মন্দই হোক,—আমাদের প্রত্যেক কার্য্যের

মধ্যেই দণ্ড পুরস্কার গূঢ়রূপে নিহিত আছে ; মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপ অবস্থা লাভ করিবে, তাহার কার্য্য স্বতই তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। ইহাতে প্রত্যেক মানুষের স্বকীয় কার্য্য নির্ব্বাচনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কেননা, প্রত্যেক মনুষ্যই আপনার মোক্ষ আপনিই সাধন করিতে পারে, এবং প্রত্যেক মনুষ্যকেই তাহা সাধন করিতে হইবে।

ভাল কাজ করিলে আমাদের সদ্‌গতি হইবে, আমাদের উন্নত অবস্থা হইবে, এমন কি আমরা মোক্ষলাভও করিতে পারিব। পক্ষান্তরে, মন্দ কাজ করিলে, আমরা দুঃখময় লোকে আবদ্ধ হইয়া থাকিব। এই তত্ত্বটির পরিণাম অতীব ফলগর্ভ। এই তত্ত্বটি মানুষকে বহু পরিমাণে নৈতিক কার্য্যোদ্যম ও নৈতিক বলবীর্য্য প্রদান করে। বৌদ্ধেরা জানে—মন্দ কার্য্যের পরিণাম হইতে স্বয়ং ভগবান্‌ও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না, অথবা কোন মধ্যবর্ত্তী সিদ্ধ পুরুষ তাহাদের হইয়া ভগবানের নিকট দরবার করিলেও কোন ফল হইবে না। আবার ভাল কাজ করিলে, কি মানব কি দৈব কোন শক্তিই সেই কাজের পুণ্যফল ও পুরস্কার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না ; বৌদ্ধেরা আপনা ছাড়া আর কাহারো উপর নির্ভর করে না ; কার্য্য-কারণের ফলাফল বেশ বুঝিয়াই তাহারা স্বকীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে।

মঠে দান করা, ভিক্ষা দেওয়া, পূর্ত্ত-কার্য্যের অনুষ্ঠান করা,—এই সব বাহ্য অনুষ্ঠানে তেমন পুণ্য নাই ; কারণ, যাহারা এইরূপ অনুষ্ঠান করে, তাহাদের ক্ষণিক সন্তোষ হয় মাত্র ; কর্ম্মের নিয়ম এই সকল অনুষ্ঠানেই বদ্ধ নহে। কর্ম্মের নিয়ম আরও বিশেষরূপে এই কথা বলে যে, শুধু জীবের কল্যাণ-সাধন ও দুঃখহ্রাস করিবার মানসেই কার্য্যসকল অনুষ্ঠান করিবে। ফলতঃ, কোন কাজে পুণ্য হওয়া না হওয়া সঙ্কল্পের বিশুদ্ধতার উপরেই নির্ভর করে।

পুণ্য কিংবা বিশুদ্ধ সংকল্পের অনুষ্ঠান তিন প্রকার। প্রথম—ইহলোকে পুরস্কারের আশায় যে পুণ্য কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে মুক্তি হয় না। দ্বিতীয়—পারলৌকিক মুক্তির উদ্দেশে পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। ইহা উচ্চতর পুণ্য কর্ম্ম। এই কার্য্য-ফলে কার্য্য-কর্ত্তার উৎকৃষ্ট গতি হয় ও পরলোকে সে পুরস্কার লাভ করে। তৃতীয়—হিতৈষণা ও মৈত্রীর বশবর্ত্তী হইয়া যে কাজ নিঃস্বার্থ-ভাবে করা হয়। শুধু এইরূপ কাজের দ্বারাই নির্ব্বাণ লাভ করা যাইতে পারে। শুধু আপনার প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিলে এই নির্ব্বাণে উপনীত হওয়া যায় না। ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের চূড়ান্ত উপদেশ। আপনার প্রতি কর্ত্তব্য—এ জিনিসটা আসলে কি ? ইহা স্বার্থপরতার একটা ছুতামাত্র এবং এই স্বার্থপরতা হইতেই আমাদের যত অশুভ, যত ভ্রম, যত মন্দ কার্য্য উৎপন্ন হয়। অতএব স্বার্থপরতাকে নির্ম্মূল করিতে হইবে ; এবং বৌদ্ধধর্ম্ম, স্বার্থপরতাকে যে নির্ম্মূল করিতে চেষ্টা করিয়াছে, ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের পরম গৌরব বলিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম এ কথা বলিতে ভয় পায় নাই

যে, অহংকে পর্য্যন্ত উচ্ছেদ করিয়া যে আত্ম-বিসর্জ্জন--তাহাও একটা সদ্‌গুণ, এবং অহংকে লোপ করিতে পারিলে তবেই পরম পুরস্কার লাভ করা যাইতে পারে। এরূপ আত্মবিসর্জ্জন মানুষের পক্ষে একটা অলৌকিক বীরত্বের কাজ সন্দেহ নাই; কেননা, এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, মানুষ প্রায় স্বার্থের উদ্দেশেই সকল কাজ করে; এবং কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান-জনিত যে সুখ কিংবা বিবেকের কথা শুনিয়া চলিলে মনের যে শান্তি হয় তাহাও স্বার্থেরই প্রকারান্তর মাত্র। অতএব, বুদ্ধের মতে যদি কোন মনুষ্য শুধু আপনার হিতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, এবং অন্যের অহিত হইবে কি না তাহার প্রতি কিছু মাত্র লক্ষ্য না করিয়া, কোন স্বার্থপর কাজ করে, এবং তাহাতে বাস্তবিকও যদি কাহারও কোন অনিষ্ট না হয়, তবু তাহার সেই কাজকে খারাপ কাজ বলিতে হইবে। সদ্‌গুণের যাহা ভাণমাত্র তাহাকে বাস্তবিক সদ্‌গুণ বলিয়া লোকে যাহাতে ভ্রম না করে, এই মর্ম্মে বুদ্ধদেবের অনেক উপদেশ আছে। চক্ষু কর্ণকে মন্দ হইতে রক্ষা করিতে পারিলেই চরম সিদ্ধি লাভ করা যায় না; কেননা, তাহা হইলে বধির ও অন্ধেরাও চরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারিত। বস্তুত, শুভ সংকল্পের দ্বারাই পুণ্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। বাক্য যদি কার্য্যে পরিণত না হয়, তবে সে বাক্যের কোন মূল্য নাই।

অতএব কর্ম্মবাদ ন্যায়ের ধারণার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। পাপপুণ্য অনুসারেই মানুষ দণ্ডিত কিংবা পুরস্কৃত হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষের পাপক্ষালন করিবার জন্য যদি প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না, সেই প্রায়শ্চিত্ত অনন্তকাল ধরিয়া চলিবে; কেননা, সসীম সময়ের মধ্যে যে অপরাধ কৃত হয়, তাহার ফলে অনন্ত শাস্তি কখনই হইতে পারে না। তাহা ন্যায়-বিরুদ্ধ। সেই-রূপ পুরস্কার লাভ ভাল কার্য্যেরই ফল; খৃষ্টানেরা যাহাকে ঈশ্বর-প্রসাদ (grace) বলে, এ স্থলে সেই ঈশ্বর-প্রসাদের কোন কার্য্যকারিতা দেখা যায় না। কারণ, রোমানদিগের প্রতি সম্ভাবিত পত্রে, সেণ্ট-পল্‌ বলিয়াছেন, "ঈশ্বর যাহাকে স্বর্গ দিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই তিনি স্বর্গ দান করেন"; তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে কে স্বর্গে যাবে, কে নরকে যাবে তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, যে সকল লোক ঈশ্বরের নির্ব্বাচিত, তাহা-দের প্রতি কে দোষারোপ করিবে? ঈশ্বর স্বয়ংই তাহাদের কার্য্যকে সমর্থন করেন। কারণ, ঈশ্বর মুসাকে বলিয়াছিলেন, "আমার যাহাকে ইচ্ছা আমি তাহাকে দুঃখ দিব, আমার যাহাকে ইচ্ছা আমি তাহার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিব। অন্যের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর কিছুই নির্ভর করে না, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই কেহ দুঃখ পায়, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই কেহ দৃঢ়তা লাভ করে (৭১)।" ইহা সহজেই বুঝা যায়, বৌদ্ধেরা এমন কোন পদ্ধতি কখনই গ্রহণ করিবে না, যাহাতে স্থায়িত্বের কোন প্রতিভূ নাই—যাহা সর্ব্ব-শক্তিমানের কেবল কৃপার উপরেই নির্ভর করে। Schlaginweite এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন। ভুটানের লামার সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হয়

তাহার বিবরণ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। Huc ও Gabet এই দুই ধর্ম্মপ্রচারক পাদ্রির সহিত লামার একবার সাক্ষাৎ হয়। সেই সময়ে, লামা খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে এইরূপ তর্ক করেন যে খৃষ্টধর্ম্মে মোক্ষলাভের কোন পন্থা নাই। তিনি বলিলেন—"কারণ, খৃষ্টভক্তেরা, স্বকর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ, ঈশ্বরের সেবকদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিবে। অতএব, উহারা পুনর্জ্জন্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। আবার যদি তাহারা স্বকীয় কর্ত্তব্যে শৈথিল্য করে, তাহারা ঈশ্বর-লোক হইতে বহিষ্কৃত হইয়া, তাহাদের অপরাধের দণ্ডস্বরূপ, কোন দুঃখময় লোকে জন্ম গ্রহণ করিবে না তাহা কে বলিতে পারে?" শেষে তিনি এই কথা বলিলেন—তোমাদের মত অপেক্ষা বৌদ্ধমত ঢের ভাল। বৌদ্ধ মতানুসারে "মানুষ স্বকীয় সুকৃতির ফল হইতে বঞ্চিত হয় না, এবং যদি একবার সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তাহা হইলে আর তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না।" কর্ম্মের আর একটা পরিণাম এই, কর্ম্ম মানুষের পৈতৃক অপরাধকে বা গোড়ার অপরাধকে (original sin) রহিত করে। মানুষকে পৈতৃক অপরাধের জন্য দায়ী করা একটা অন্যায় কার্য্য। ফলত, এক জনের দোষে আর এক জনের কষ্ট পাওয়া ন্যায়সঙ্গত নহে; ইহাই সনাতন ধর্ম্মনিয়ম।

আর যদি আত্মহত্যার কথা বল—বৌদ্ধধর্ম্মে আত্মহত্যা একেবারেই নিষিদ্ধ। "ভগবানের উপদেশ এই—আত্মহত্যা কখনই করিবে না।" বুদ্ধের মতে আত্মহত্যা একটা নৈতিক দুর্ব্বলতা, ইহা মোক্ষের পরিপন্থী। আত্মহত্যা করিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। সংসারী বৌদ্ধদিগকে যে সকল কর্ম্ম অনুসরণ ও যে সকল কর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিতে হয়—সেই সকল বিধিনিষেধের মুখ্য উপদেশগুলি আমি প্রায় সমস্তই বিবৃত করিয়াছি। যাহা বলিয়াছি, তাহাতে আমার মনে হয় বৌদ্ধধর্ম্মের মহত্বও যথেষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। আমি দেখাইয়াছি যে, এই ধর্ম্ম,—অহিংসা, মৈত্রী ও ইন্দ্রিয়দমনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বৌদ্ধধর্ম্ম, যে চরম লক্ষ্যের কথা বলেন, তাহার সহিত যদিও আমাদের স্পৃহা ও আকাঙ্ক্ষার মিল হয় না, কিন্তু সেই চরম লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার জন্য যে সকল সদ্‌গুণের সাধনা আবশ্যক, তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বৌদ্ধধর্ম্মে এমন কিছুই নাই, যাহা বিশুদ্ধ যুক্তির বিরোধী; কেননা, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রকৃতিরও বিরুদ্ধ নহে, দর্শনশাস্ত্রেরও বিরুদ্ধ নহে। মানুষ যে পুণ্য অর্জ্জন করে,—সে তাহা নিজ বলেই অর্জ্জন করে। যে দীন, যে অজ্ঞ,—তাহাকে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশোধিত করিয়া সমুন্নত করে; কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি পণ্ডিত, তাহাদের সকলকেই বৌদ্ধধর্ম্ম এই শিক্ষা দেয় যে, জগৎ অসার শূন্যময়, এবং কেবল সদ্‌গুণের সাধনার দ্বারাই নির্ব্বাণে উপনীত হওয়া যায়, এবং এই শিক্ষাই তাহাদিগকে বিনীত করিয়া তুলে। তা ছাড়া, সেই জগদ্‌গুরু কি আমাদের পথ-প্রদর্শক নহেন—যিনি আমাদের মধ্যে আনন্দ আনিয়াছেন, যিনি জগতের প্রতি অনুকম্পা করিয়া, জগতের উদ্ধারের জন্য, মানুষের সমুন্নতি ও মোক্ষের জন্য,

জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন; যিনি ধর্ম্মের পরম মিত্র, সেই বুদ্ধদেব অবিরাম এই উপদেশ দিতেছেন যে,—"বাসনা হইতে মুক্তিলাভ করাই মানুষের পরম কর্ত্তব্য; উহাই চিত্ত-শুদ্ধির একমাত্র পন্থা। তোমাদিগের নিকট আমি এই পথের ঘোষণা করিতেছি, কেননা আমি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, জন্মমাত্রই নশ্বর ও দুঃখময়; এবং এই জন্ম, পূর্ব্ব জন্মেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মাত্র! যে শীলসম্পন্ন সাধু ব্যক্তি আমার কথা বুঝিয়াছেন, তাঁহার নির্ব্বাণের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে—সেই নির্ব্বাণ যাহার উপর আর সুখ নাই।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেদনা।

যতবার আলো জ্বালাতে চাই নিবে যায় বারে বারে;
আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে।
যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল,
কুঁড়ি ধরে শুধু নাহি ফোটে ফুল;
আমার জীবনে তব সেবা তাই বেদনার উপহারে।
পূজাগৌরব পুণ্যবিভব কিছু নাহি, নাহি লেশ,
এ তব পূজারি পরিয়া এসেছে লজ্জার দীন বেশ।
উৎসবে তার আসে নাই কেহ,
বাজে নাই বাঁশী সাজে নাই গেহ,
কাঁদিয়া তোমায় এনেছে ডাকিয়া ভাঙা মন্দির দ্বারে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রকাশ।

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে কত গানে কত ছন্দে
অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয় পুর
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর।
তোমায় আমায় মিলন হলে সকলি যায় খুলে
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই ত ছায়া আমার মাঝে পায় সে কায়া
হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দর বিধুর
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মালদহ সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির
অভিভাষণের সারাংশ।

সম্মিলন প্রকৃতভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে না; তাহাতে সাহিত্যের পরিচালনা, জ্ঞান-প্রচারের আয়োজন এবং সাহিত্য-ক্ষেত্রে সকলের মিলিত চেষ্টার সমবায় সাধিত হয় মাত্র।

ভাষা, জাতি বা ধর্ম্মের অধীন নহে। তাহা প্রকৃতির জিনিস, প্রকৃতির পথেই চালিত হয়। এই 'সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা' বঙ্গদেশ যাঁহাদের একমাত্র জননী, তাহার জলবায়ুতে যাঁহাদের অস্থিমজ্জা গঠিত, 'আপনার ভূমি' বলিতে হইলে যাঁহাদিগকে বঙ্গদেশের প্রতিই তাকাইতে হয়, তাঁহারাই বাঙ্গালী, তাঁহারা যে জাতিরই বা ধর্ম্মেরই হউন না কেন। বঙ্গভাষার জন্ম তাঁহারাই দিয়াছেন, এবং সেই বঙ্গভাষা দ্বারা তাঁহারাই পুষ্ট হইতেছেন। একমাত্র এই বঙ্গভাষার ভিতর দিয়াই, তাঁহাদের সর্ব্বোচ্চ চিন্তা ভাব কল্পনা, তাঁহাদের বাঙ্গালিত্ব, পরিস্ফুট হইতেছে। তাই ভারতের সুদূরতম প্রান্ত-বাসী বাঙ্গালীও আজ বাঙ্গালী। ভারতের অন্যান্ত সাহিত্য-হীন জাতির ন্যায়, বিভিন্ন জাতি এবং ভাষার প্রভাবের মধ্যে থাকিয়াও সে আজ আপনার বাঙ্গালিত্বটুকু হারায় নাই। বঙ্গ-সাহিত্যই তাহার একমাত্র কারণ। উপরন্তু উদার বঙ্গ-সাহিত্য কত বিভিন্ন দেশবাসীকে একেবারে কোলের ছেলে করিয়া লইয়াছেন। আমাদের 'পাঁড়ে' এবং 'মিশ্র' সাহিত্য-সেবিগণকে, 'এ পাণ্ডে' বা 'মিছির হো' বলিয়া আজ সম্বোধন করিলে তাহা শুধু তাঁহাদের অপমান স্বরূপই হইবে, কারণ তাঁহারা আজ পুরো বাঙ্গালী। গণেশ-তনয় সখারামের বাঙ্গলা পড়িয়া তাঁহাকে দেউস-নগরাগত বলিয়া কে বিশ্বাস করিবে? 'তেওয়ারীজী' কতকাল হইল 'টিকি'টিকে লুপ্ত হকার করিয়া, বঙ্গ-গৃহে ত্রিবেদীরূপে অজ্ঞাতবাস করিতেছেন তাহা ইতিহাসের একটা লুপ্ত তত্ত্ব।

সুতরাং, যখন বঙ্গভাষা এত উদার এত প্রভাবশালী, তখন, পুরুষানুক্রমে যাঁহারা বাঙ্গলার অধিবাসী—আমি মুসলমান ভ্রাতাগণের কথা বলিতেছি—তাঁহাদের পক্ষে, তাহার প্রভাব হইতে দূরে থাকা তাঁহাদের অনিষ্টেরই কারণ, এবং ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইলে, তাহা অধিক কাল সম্ভবপরও হইবে না। জনসাধারণের নিত্য ব্যবহারের ভাষার কথা, এবং সাহিত্যের ভাষার নিয়ম লইয়া আমি তাহা বুঝাইব।

প্রথম—জনসাধারণের ভাষা। ভাষার উৎপত্তি ও গতি প্রকৃতি-অনুযায়ী; তাহা প্রকৃতির পথে, সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে চলে। আমাদের নিত্যকার আলাপ-ব্যবহারই আমাদের ভাষার উপাদান, আশপাশের লোকের কথাবার্ত্তা হইতেই আমরা ভাষা শিখি। তাই বিভিন্ন দেশের ভাষাও বিভিন্ন—একস্থানের ভাষা জোর করিয়া অন্যস্থানে চালান যায় না; কারণ

ভাষার বিশেষত্ব ব্যাকরণে—শব্দসমষ্টিতে নহে। সুতরাং বিদেশী শব্দাবলী যদি দেশী ব্যাকরণানুমোদিত ভাবে ভাষার সহিত চালান যায়, তাহা হইলে ভাষাও ঠিক থাকে এবং তাহার পুষ্টিও হয়। এবং সেই নিয়মে বঙ্গভাষার মধ্যে ফারসী ও আরবী শব্দ প্রচলন করিলেও ভাষার কোন হানি হয় না। কিন্তু, তাই বলিয়া বঙ্গভাষাকে ত্যাগ করিলে, যে কোন ধর্ম্মের বাঙ্গালীই হউন না কেন, নিত্য তাঁহাকে স্বভাবের প্রতিকূলে যুঝিতে হইবে; কারণ, সমস্ত বাঙ্গালীর প্রকৃতি-অনুমোদিত ভাষা বাঙ্গলা—এটা তাঁহাদের আপন সম্পত্তি।

সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধেও সেই নিয়মই খাটে। বঙ্গভাষার দৃষ্টান্ত লইয়াই দেখুন। যে পণ্ডিতগণ বাঙ্গলাকে বিভক্তিহীন সংস্কৃত করিতে চান, বা যে শব্দ-শিল্পিগণ একেবারে গ্রাম্য ভাষায় সাহিত্যচর্চ্চা করিতে চান, তাঁহাদের উভয়েরই চেষ্টা বিফল হইতেছে, হইবেও। কারণ, একদিকে—দুরূহ শব্দবহুল ভাষা, যাহাতে পদে পদে অভিধানের প্রয়োজন--সেরূপ ভাষা দু'একজন পণ্ডিতেরই উপযোগী, সাধারণে তাহার কখন আদর করিবে না; অপরদিকে—গ্রাম্যভাষা শ্রেণীবিশেষে আবদ্ধ, এবং স্থানভেদে বিভিন্ন আকারের; সুতরাং তাহা সর্ব্ববিভাগের ভাষা হইতে পারে না; বিশেষতঃ, আমাদের উচ্চতম চিন্তা ভাব কল্পনা যাহা সরল ভাষায় পরিস্ফুট হয়, তাহা লঘু গ্রাম্য ভাষায় কখনও পরিব্যক্ত হইতে পারে না। তাই মধ্যবর্ত্তী কোন পথ খুঁজিয়া লইতে হইতে হইবে প্রকৃতিই সে পথ দেখাইয়া দেন। কারণ, ভাষা কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে। তাহার উপর জোর খাটে না। সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে তাহার গতির পরিবর্ত্তন করিতে হয়। সে ক্ষমতা মহাপুরুষগণের আছে। তাঁহারা প্রকৃতির অনুচর, বা তাহারাই প্রকৃতি সৃষ্টি করেন। তাঁহারা আপনাদের প্রতিভার বলে আপনাদের রচনার মধ্যে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেন যাহার কুহকে লোকে আপনাদের অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের শিষ্য হইয়া, তাঁহাদের শব্দ-বিন্যাস প্রথা, তাঁহাদের প্রদর্শিত শব্দাবলী অবলম্বন করে। এইরূপে ভাষার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এ ক্ষমতা শুধু প্রতিভাবান লেখকেরই আছে, ইহা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। ইতিহাস তাহারই প্রমাণ দিতেছে।

আশী বৎসর পূর্ব্বে যখন নব গ্রীস স্বাধীন হয়, তখন স্বদেশপ্রেমিকেরা দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার সেই প্রাচীন গ্রীক ভাষা, যাহার সাহিত্য, যাহার রাজনৈতিক প্রণালী তদানীন্তন এবং পরবর্ত্তী যুগে জগতে অতুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সেই ভাষার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন। শিক্ষক, লেখক এবং সম্পাদকবর্গ প্রাচীন গ্রীসভাষার পথানুবর্ত্তী হইলেন। কিন্তু ৫।৬ বৎসর পরে দেখা গেল—[illegible] বিপরীত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক শেখা দূরে থাক, লোকে বাধ্য হইয়া লেখাপড়ার চর্চ্চায় পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছে। তখন গ্রীস আবার নব পথে ফিরিয়া আসিল।

ইংলণ্ডেও, নর্ম্মাণগণ প্রথম ইংলণ্ড জয় করিয়া দেশের যাবতীয় কার্য্যে তাহাদের পৈত্রিক ফরাসী ভাষার প্রচলন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু, ইংলণ্ডের লোক তাহার কিছুই

বুঝিল না। এদিকে আবার, বহুকাল ফ্রান্সের সহিত বিচ্ছিন্ন থাকায়, কালক্রমে ইংলণ্ডস্থ নর্ম্মাণদের ভাষা হাস্যাস্পদ রূপে বিকৃত হইয়া উঠিল, সে ভাষায় আর তখন ভাল পুস্তকাদি লেখা চলিল না। তিনশত বৎসর পরে তাঁহারা তখন বুঝিলেন যে তাঁহারা নর্ম্মাণ হইলেও ইংরাজ; সুতরাং ইংরাজী ভাষা অবলম্বন করা তাঁহাদের শ্রেয়। সেইদিন হইতেই অপূর্ব্ব ইংরাজী-সাহিত্যের সূচনা হইল। কবি চসার তাহার আদিগুরু। তাঁহারই ভাষা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া আজিও চলিতেছে।

পারস্য এবং তুরস্কও এ সত্যের সাক্ষ্য দেয়। ৬৪৪ খৃঃ নাহাবন্দ যুদ্ধে পারস্য জয় করিয়া আরবেরা সেখানে মহম্মদীয় ধর্ম্ম ও আরবী ভাষার প্রতিষ্ঠা করিলেন। গ্রন্থ ও দলিলদস্তাবেজাদি আরবীভাষায় লেখা আরম্ভ হইল এবং পারস্য হরফে আরবী গ্রন্থসমূহ পুনর্লিখিত হইল। জনসাধারণ তাহা বুঝিল না, তাহাদের জ্ঞানবিস্তার সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। অবশেষে ফের্দৌসী জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি গ্রাম্য ভাষায় কাব্য লিখিয়া সকলের মনোহরণ করিলেন। সেই হইতেই ফারসী পারস্যের ভাষা হইল। তুরস্কের কবিগণও একদিন এইরূপে তুর্ক-দেশে পারস্য ভাষা চালাইতে গিয়া নিরাশ হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে তুর্কী ভাষাকেই মুখপত্র করিতে বাধ্য হন।

ভারতেও তাহাই ঘটিয়াছে। মুসলমানের উত্তরভারত-জয়ের একশত বৎসর যাইতে না যাইতে, উপরোক্ত কারণে, আরবী ছাড়িয়া ফারসীতে বই লেখা আরম্ভ হইল, এবং আরবী গ্রন্থগুলিকে ফারসীতে অনুবাদিত করা আবশ্যক হইল, কারণ তখন আরবী ভাষা লোকে ভুলিয়াছে। চারিশত বৎসর পরে আবার ফারসী ভাষাও মুসলমানের নিকট 'পর' হইয়া আসিল, তখন ভারতীয় উর্দ্দুর প্রচলন হইল। আরবী 'আখ্' বা ফারসী 'বেরাদর' ছাড়িয়া তাঁহারা হিন্দী 'ভাই' ও 'দাদা' ধরিলেন। 'পুঁটি বিবি' 'মতি বেগম' প্রভৃতি দেশী কথাও তাঁহাদের পরিবারে প্রবেশ করিল। শাহজাহান যে উর্দ্দুতে অতি সুন্দর গান রচনা করিতেন ও গাহিতেন পাদিশাহনামাই তাহার প্রমাণ দেয়। এখন যাহা গানের ভাষা তাহাই প্রাণের ভাষা; সুতরাং, আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পাই যে, শাহজাহানের সময় হইতেই উর্দ্দু বাদশাহদিগের আপনার ভাষা হইয়াছিল।

অতএব, যদি দিল্লীর বাদশাহগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আরবী ফারসী তুর্কী ছাড়িয়া উর্দ্দু গ্রহণ করিলে তাঁহাদের খানদান বা ধর্ম্মের কোন হানি না হইয়া থাকে, তবে বঙ্গের মুসলমানগণ উর্দ্দু ছাড়িয়া বাঙ্গলা ধরিলে তাঁহাদের সেরূপ কোন হানি হইবে কেন, আমি বুঝি না। উপরোক্ত সকল কারণে মুসলমানগণের বঙ্গভাষা গ্রহণ করা অনিবার্য্য। যাহা প্রকৃতির সনাতন নিয়ম, দেশভেদে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না। এ বিষয়ে মুসলমানদের উদাসীনতায় তাঁহারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন।

সেই ক্ষতির পরিমাণ আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত আবদুল

করিয়া দেখাইয়াছেন যে উর্দ্দুর মধ্য দিয়া উচ্চ শিক্ষা দিবার চেষ্টায় মুসলমান বালকগণকে হিন্দুর অপেক্ষা দুইটি অর্থাৎ পাঁচটী ভাষা শিখিতে হয়। ফলে, ভাষার বোঝা ঘাড়ে লইয়া তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দিরে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে না। তাহারা অনেকেই ভাল উর্দ্দু শেখে না, অথচ বাঙ্গলার চর্চ্চাতেও লজ্জা পায়। ইংলিস ভার্ণাকুলার লইয়া পরীক্ষায় পাশ হইলেও, কর্ম্মক্ষেত্রে—যেখানে মাতৃভাষার নিত্য প্রয়োজন,—সেখানের পরীক্ষায় ইহাদের অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়তঃ, পারত্রিক ক্ষতি। মধ্য যুগে ইউরোপে যে বিভ্রাট ঘটিয়াছিল, আধুনিক যুগে বাঙ্গালায়ও তাহাই হইতেছে। ইয়ুরোপে তখন আদি-বাইবেল খানা গ্রীক ও হিব্রু হইতে ল্যাটিনে অনুবাদিত করিয়া গীর্জ্জায় গীর্জ্জায়-পাঠ হইত এবং ঐ ভাষাতেই ভজনা ও সঙ্গীত চলিত। সাধারণে তোতাপাখীর মত তাহা আবৃত্তি করিত, কিছু বুঝিত না; কাজেই ধর্ম্ম তাহাদের নিকট একটা বাহিরের বস্তুতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। তারপর ষোড়শ শতাব্দীতে লুথার যখন ধর্ম্মসংস্কার করিলেন, তখনই দেশী ভাষায় ধর্ম্মকথা শুনিয়া এবং পড়িয়া, লোকে ধর্ম্মকে যথার্থ প্রাণের বস্তু বলিয়া ধরিতে শিখিল। এখানে, এ বাঙ্গালা দেশেও, কোরাণ হদিস উর্দ্দুতে অনুবাদিত করিয়া উর্দ্দু ব্যাখ্যার সাহায্যে পড়ান হয়। ইহাতে ফল এই হয় যে ধর্ম্মপুস্তকগুলি অপরিচিত ভাষায় থাকিয়া যায়। মোল্লাগণ যদি বাঙ্গলা অনুবাদ গুলিকে ঘৃণার চক্ষে না দেখিতেন, তবে কত মুসলমান মাতৃভাষায় ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া ধন্য হইতে পারিতেন। ইহা বেশ মনে রাখা উচিত যে ধর্ম্মের সহিত ভাষার সম্বন্ধ নাই। ধর্ম্ম সীমাবদ্ধ নহে, তাহা কোন বিশেষ ভাষায় লিখিত পুস্তকে আবদ্ধ নহে। ধর্ম্ম সার্ব্বজনিক এবং সনাতন।

তৃতীয়তঃ, তাঁহাদের পক্ষে উর্দ্দুর পরিচালন সম্ভবপর হইলেও তাঁহাদের রমণীগণের তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে। বাঙ্গলা-বর্জ্জন এবং জ্ঞান-বর্জ্জন তাঁহাদের পক্ষে একই কথা। বাঙ্গলাভাষা শিক্ষার পক্ষে তাঁহাদের যেরূপ সুযোগ আছে, উর্দ্দু শিখিবার পক্ষে সেরূপ নাই। কাজেই বাঙ্গলা ত্যাগ করিলে তাঁহাদের সমাজের এক অঙ্গ বিকল হইয়া থাকিবে।

চতুর্থতঃ, বাঙ্গালী মুসলমানেরা প্রায়ই ভাল উর্দ্দুতে সুশিক্ষিত হন না। ফলে, অনেকস্থলে তাঁহাদিগকে অপরের কাছে লজ্জিত হইতে হয়। বাঙ্গলাভাষায় কথা বার্ত্তা কহিবার আগ্রহ যে তাঁহাদের সর্ব্বদাই হয় বিদেশস্থ অনেক মুসলমান তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। তবে সে ভাষাকে মুসলমান সম্প্রদায় ত্যাগ করিতে চান কেন?

পঞ্চমতঃ, উর্দ্দুভাষার আদর্শ অতি পুরাতন। মধ্যযুগের সেই নিরাশা অবসাদ তাহার প্রতি কাব্য এবং রচনায় মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু জগতের গতি আজ ভিন্ন প্রকার। যে নব ভাব উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবাহিত হইয়া জগতের কর্ম্মে ধর্ম্মে এক নূতন তেজ আনিয়া জগতের আকৃতির পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার তরঙ্গ বঙ্গ-

সাহিত্য-নদীতেই প্রবেশ করিয়াছে। বাঙ্গলাসাহিত্য আজ জগতের এই নব শক্তির সহিত আপন সংযোগ রক্ষা করিতেছে। প্রথম যুগযুগান্তরব্যাপী জড়তা, নিদ্রার অলসতা, ঔদাসীনতা পরিত্যাগ করিয়া, পৃথিবীর রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে হইবে। সে যুদ্ধের সমরসঙ্গীতের উৎসাহধ্বনি বঙ্গসাহিত্যেই মিলিবে, উর্দ্দুতে নহে। অবশ্য উর্দ্দুক আমি অবহেলা করি না, তাহার মধ্যে অতীতের অনেক রত্ন আছে। কিন্তু, সে ভাষা আধুনিক যুগের উপযোগী নহে।

সম্প্রদায়বিশেষের কথা ছাড়িয়া আমি সাহিত্যসেবিগণের নিকট একটি নিবেদন করি।—

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এইরূপ সভা-সম্মিলন সাহিত্য-সৃজন করিতে পারে না। ইহারা পথ দেখায় মাত্র। কারণ, যেমন "A poet is born not made", তেমনি শুধু প্রতিভাই —চেষ্টা নহে—সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর মৌলিক সাহিত্য সৃজন করিতে পারে না। কিন্তু তবু চেষ্টা দ্বারা অনেক কাজ হয়। বাঙ্গলা-সাহিত্য এখন শিশুর ন্যায় চঞ্চল, শিশুর ন্যায় অশান্ত। তাহাকে সংযত করিয়া তাহার উচ্ছ্বসিত আবেগকে যোগ্য পথে পরিচালিত করিয়া তাহার পূর্ণ পরিণতির অভিমুখে তাহাকে চালিত করিতে হইবে। ছোট বড় সব জিনিসই জ্ঞান শিক্ষা দেয়; জগতে কিছুই উপেক্ষণীয় নহে। নবযুগের এই বিচিত্র ভাবের ও জ্ঞানের দিনে, জ্ঞান ক্ষেত্রের বিভাগ করিয়া প্রত্যেক লেখককে তাঁহার নিজের বিভাগ দেখাইয়া দিয়া, তাঁহাকে উপদেশ দিয়া, তাঁহার ব্যক্তিগত কার্য্যের সমালোচনা দ্বারা, যথার্থ সাহিত্য-সেবীর দল গড়িতে হইবে। তাঁহাদের ব্যক্তিগত চেষ্টার সমবায়ে এক বিশাল ব্যাপার এইরূপে সহজে স্বাভাবিকভাবে সম্পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইবে।

উত্তরবঙ্গে ভাবিবার এবং খুঁজিবার জিনিস অনেক আছে। প্রাচীনতম ভারতের ইতিহাস, ভাষার ক্রমবিকাশের ইতিহাস, ধর্ম্মের পারম্পরিক ইতিহাসের উপকরণ এখানে যত আছে অন্যত্র কোথাও তত নাই। দুইটি পুরাতন পথে এখানে অতীত আপনার লেখা রাখিয়া গিয়াছে। পশ্চিম ভারতে যাহা মিলে না এখানে তাহা মিলে সুতরাং সেই সকলের এবং এই প্রদেশের বিশেষ তত্ত্বাদির উদ্ধার সাধনে এই সম্মিলনীর সচেষ্ট হইতে হইবে। স্থানীয় অনার্য্য জাতিদের পূজা-পদ্ধতি, আচার-বিচার, ভূতপ্রেত-বিশ্বাস, ভাষা-উপভাষার বিশেষত্ব প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা দ্বারা তাহাদের আদিম সভ্যতার কালানুসন্ধান প্রভৃতি বহু তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু সে পরিশ্রমে অভিনিবেশ চাই। সাহিত্যের সেবা সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া করিতে হয়, তাহাতে জ্ঞান চাই, অধ্যবসায় চাই। তাহা শুধু খেয়ালের ঝোঁক নহে, তাহা অসম্পূর্ণ শিক্ষায় সম্ভবপর নহে। বাঙ্গলা-সাহিত্যে যাহা নাই, বিদেশী সাহিত্য হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে। কারণ যাহা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সত্য বা প্রাকৃতিক তত্ত্ব তাহা সাহিত্য-বিশেষের সম্পত্তি নহে; তাহা সমগ্র মানব-জাতির সম্পত্তি — তাহা সার্ব্বজনীন। প্রত্যেককে তাই জ্ঞানের সকল বিভাগেই

স্বদেশ-বিদেশের রত্নরাজি আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে সাজাইতে হইবে এবং প্রত্যেক বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান লাভকেই জীবনের কামনার বস্তু বলিয়া ধরিতে হইবে।

এই সম্মিলন, বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্য দিয়া সেই উচ্চ আদর্শের প্রতি যেন আমাদের লইয়া যায়। আমরা যেন সমস্ত সঙ্কীর্ণতা, প্রাদেশিকতা, জাতিগত বিদ্বেষ, অজ্ঞানজ ভেদবুদ্ধি দ্বারা চালিত না হইয়া, দুঃখ-জরা-দৈন্যরহিত সেই সর্ব্বোচ্চ সাহিত্যজগতে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারি,—যেখানে শুধু বিশ্বব্যাপী মহান্ শান্তি, মহা সংযম, মহা আনন্দ, মহা স্বাধীনতা বিরাজ করিতেছে! *

মানবের জন্মকথা।

পরিবর্দ্ধনের রোধ। পরিবর্দ্ধনের রোধ এবং বৃদ্ধির রোধ, এতদুভয় মধ্যে প্রভেদ আছে; পরিবর্দ্ধন রুদ্ধ হইলেও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রাথমিক আকারেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে। বিবিধ অঙ্গ-বিকৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। খণ্ডিত তালু প্রভৃতি কতিপয় বিকৃতি সময় সময় বংশানুগত হয়। আজন্ম জড়-ভাবাপন্ন অবোধদিগের মস্তিষ্কের পরিবর্দ্ধন রুদ্ধ থাকে; ইহা উল্লেখ করিলেই এ স্থলে যথেষ্ট হইতে পারে। ভগ্ট প্রণীত পুস্তিকাতে এ বিষয় বিবৃত রহিয়াছে। সাধারণ মানবের তুলনায়, ঐ সকল অবোধের মাথার খুলী ছোট, এবং মস্তিষ্কের আবর্ত্তগুলিও কম জটিল। কপালের নালী অথবা ভ্রূযুগলের উপরিভাগ বর্দ্ধিত, এবং হনু বাহিরের দিকে পরিপুষ্ট। এই অবোধেরা নিম্নশ্রেণীস্থ (অর্থাৎ অসভ্য) মানবের ন্যায়। তাহাদিগের বুদ্ধি এবং প্রায় সকল মনো-বৃত্তিই দুর্ব্বল। তাহারা কথা বলিবার শক্তি লাভ করিতে অক্ষম; তাহারা দীর্ঘকাল কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারে না, কিন্তু অনুকরণ করিতে বিশেষ পটু। তাহারা বলিষ্ঠ এবং অত্যন্ত কর্ম্মঠ, সর্ব্বদাই লাফঝাঁফ খেলাধূলা করে, এবং নানারূপ মুখভঙ্গি করিয়া থাকে। তাহারা অনেক সময়ে চারি পায়ের উপর হামাগুড়ি দিয়া সিঁড়িতে উঠে; এবং কোন জিনিষের কি বৃক্ষের উপরে চড়িতে ভাল বাসে। এই কথায় বালকদিগের কথা মনে পড়ে, উহারা প্রায় সকলেই গাছে চড়িতে ভাল-বাসে; ইহাতে মেষ এবং মেষশাবকের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, উহারা মূলে পার্ব্বত্য জন্তু, তাই সামান্য একটু উঁচু স্থান পাইলেই তাহার উপর উঠিয়া নৃত্য করিতে ভালবাসে। উক্ত অবোধেরা আরও কতিপয় বিষয়ে নিম্নশ্রেণীর জন্তুর মত ব্যবহার করে। অনেকগুলি অবোধের কথা লিপিবদ্ধ আছে, উহারা খাইবার সময় প্রত্যেক গ্রাসের ঘ্রাণ লইয়া খায়। একটি অবোধের কথা লেখা আছে যে, সে যখন উকুন মারে তখন হাত ও মুখ দুই-ই ব্যবহার করে। অনেক সময় তাহাদিগের চাল-চলন নোংরা; এবং তাহাদের লজ্জাশীলতার জ্ঞানই নাই। ঐ প্রকার অবোধদিগের দেহ অতিশয় লোমশ হইয়া থাকে, এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ আছে।

পুনরাবর্ত্তন। এই সম্বন্ধে যে সকল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব, তাহার মধ্যে অনেক-গুলি উপরের লিখিত বিভাগেও লিখা যাইত। যখন দেহের কোন অংশ প্রাথমিক অবস্থাতেই থাকিয়া যায়, এবং ঐ অবস্থাতেই বর্দ্ধিত হইয়া কোন নিম্নশ্রেণীস্থ প্রাপ্তবয়স্ক প্রাণীর ঐরূপ দেহাংশের ন্যায় হয়, তখন তাহাকে এক অর্থে পুনরাবৃত্তি বলা যাইতে

* সভাপতি অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, এম্-এ।

পারে। কোন এক শ্রেণীর জীবগণ মধ্যে যাহারা নিম্নশ্রেণীস্থ (অর্থাৎ অমুন্নত), তাহাদিগকে দেখিলেই কতকটা বুঝা যাইতে পারে, উহাদিগের আদি পুরুষ কিরূপ ছিল। ভ্রূণাবস্থাতেই যদি কোন জটিল দেহাংশের বিবর্দ্ধন * রুদ্ধ হয়, অথচ উহা ঐ প্রাথমিক আকারেই বাড়িতে থাকে, এবং অবশেষে উহার স্বকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে বিবেচনা করিতে হয় যে, ঐ অবিবর্দ্ধিত অঙ্গ যখন কোন অতীত কালে কোন নিম্ন প্রাণীর দেহে সাধারণতঃই জাত হইত, তখনই উহা ঐরূপ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছে। অন্য কোন সিদ্ধান্ত বিশ্বাসযোগ্য হয় না। আজন্ম জড়বুদ্ধি নির্ব্বোধের মস্তিষ্ক যে পরিমাণে বানরের মস্তিষ্কের ন্যায়, সেই পরিমাণে উহাকে পুনরাবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত স্থল বলা যাইতে পারে। † সে যাহাই হউক, আরও অন্যান্য কতিপয় স্থলকে অধিকতর সঙ্গত রূপেই পুনরাবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। মানব যে শ্রেণীর জীব সেই শ্রেণীর নিম্নতর জন্তুর দেহস্থ কতিপয় সাধারণ গঠন কদাচিৎ মানব দেহেও দেখা যায়, কিন্তু মানবীয় ভ্রূণে তাহা দৃষ্ট হয় না; অথবা ভ্রূণ-দেহে দৃষ্ট হইলেও পরে বিসদৃশভাবে বিবর্দ্ধিত হয়, কিন্তু ঐ সকল নিম্নতর জন্তুর দেহে উক্ত গঠনগুলি সাধারণতঃই ঐ ভাবে জাত হইয়া থাকে। এই সকল কথা নীচের দৃষ্টান্তগুলি বিবেচনা করিলে আরও বিশদরূপে বুঝা যাইবে।

অনেক স্তন্যপায়ী জীবের জরায়ু দ্বিমুখ এবং দ্বিরন্ধ্র। যথা মার্সুপিয়াল দিগের। * এইরূপ জরায়ুকে ডবল যন্ত্র বলা যায়। ইহা অপর স্তন্যপায়ী জীব-দেহে ক্রমে একটি যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। ইহার ভিতরে একটি ভাঁজ আছে। তদ্ভিন্ন ডবলের কোন লক্ষণই নাই। এই ভাঁজ উচ্চ শ্রেণীর বানরে ও মানবেও দেখা যায়। দ্বিরন্ধ্র জরায়ু ক্রমে কিরূপে এক রন্ধ্রে পরিণত হইয়াছে তাহা দন্তুর শ্রেণীতে (Rodants) সুন্দর দেখা যায়। সকল স্তন্যপায়ীর জরায়ুই দুইটি সরল নল হইতে গঠিত হয়, উহাদিগের নীচের অংশ হইতে জরায়ু-শৃঙ্গ উৎপন্ন হয়। ডাক্তার ফ্যারে বলেন যে "ঐ শৃঙ্গ দুইটির নীচের ভাগ পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া মানবীয় জরায়ুর মধ্য ভাগ গঠিত হয়; কিন্তু যে সকল জন্তুর জরায়ুর মধ্যভাগ নাই, তাহাদিগের উহা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হয় না। জীবরাজ্যে জরায়ুর বিবর্দ্ধন যেমন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে, তেমনই শৃঙ্গ দ্বয় ক্রমে হ্রস্ব হইতে হইতে জরায়ুর মধ্যভাগে লুপ্ত হইয়া যায়।" অদ্যাপিও লোঙ্গর এবং বানরের উন্নত জীব শ্রেণীতেও জরায়ুর কোণ বর্দ্ধিত হইয়া শৃঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নারীদেহেও পরিণত জরায়ুর শৃঙ্গ থাকা সময় সময় দেখা যায়, কখন বা জরায়ু বিভক্ত হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে ডবল হইয়া উঠে। এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। ওয়েন্ বলেন এরূপ স্থলে দন্তুরগণের জরায়ুর ন্যায় দ্বিরন্ধ্র হইতে একরন্ধ্র পরিণামের পর্য্যায় সকল পর পর লক্ষিত হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে বোধ হয় ভ্রূণাবস্থাতেই জরায়ুর বিবর্দ্ধন বদ্ধ হইয়া যায়, কি ঐ প্রাথমিক ভাবেই উহা বাড়িতে থাকে, এবং অবশেষে

---

* Development—Growth বৃদ্ধি

† ডারুইন এ স্থলে দীর্ঘ পাদটীকাতে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নম্রতা ও সত্যপ্রিয়তা বশতঃ পূর্ব্বের কয়েকটি ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে কতিপয় নরনারীর বক্ষে দুইটি স্তনের অধিক থাকা জানিয়া তিনি "পুনরাবর্ত্তন" বিবেচনা করিতেন। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে, কারণ বক্ষের ন্যায় পেটে, উরুতে এবং পৃষ্ঠেও ঐরূপ স্তন পাওয়া গিয়াছে। আর হস্ত-পদে অধিক অঙ্গুলি থাকিলেও তিনি পুনরাবর্ত্তন বিবেচনা করিতেন; তাহাও [illegible] এই সম্বন্ধে ঐরূপ ত এক্ষণে ত্যাগ করাই উচিত।

* কাঙ্গারু এই শ্রেণীভুক্ত।

সম্পূর্ণ কর্ম্মক্ষম হয়। কারণ ঐরূপ অংশ ডবল জরায়ুর দুই দিকই গর্ভধারণ কার্য্যোপযোগী। অত্যল্প স্থলে মানবীয় জরায়ুতেও দুইটি পৃথক মুখ, পৃথক রন্ধ্র এবং পৃথক গহ্বর থাকা দেখা যায়। কিন্তু যাহাদিগের এইরূপ থাকে তাহাদিগের ভ্রূণাবস্থায় উহার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। কাঙ্গারু শ্রেণীতে যেরূপ দুইটি পৃথক মুখ ও রন্ধ্র যুক্ত দুইটি জরায়ু থাকে, এবং প্রত্যেকের পৃথক পেশি, স্নায়ু, স্নায়ুগণ্ড এবং রক্ত কোণ থাকে, তদ্রূপ দুইটি পৃথক জরায়ু গঠন করিবার পূর্ব্ব হইতে অভ্যস্ত (*) না থাকিলে ঐ প্রাথমিক নল দুইটি স্বয়ং জাত থাকিত, ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব না হইলেও কঠিন। নারী-দেহে ঐরূপ অ-মানবীয় ডবল জরায়ু অমন পূর্ণগঠিত ও কার্য্যক্ষম ভাবে যদিচ্ছা বশতঃ উৎপন্ন হয়, এরূপ কেহই বলিবে না। কিন্তু দেহের কোন অংশ নিম্ন প্রাণীর ছিল, অথচ কালে উহা পরিত্যক্ত হইয়া উচ্চ প্রাণীতে আর দেখা যায় না, এরূপ স্থলে যদি কখনও উচ্চ প্রাণীর দেহেও উহা পূর্ণাবস্থায় দৃষ্ট হয় তবে পুনরাবর্ত্তনের বিধান স্বীকার করিলেই তাহা দুর্ব্বোধ্য হয় না। †

এই সকল দৃষ্টান্ত এবং এইরূপ অন্যান্য অনেক দৃষ্টান্ত আলোচনা করিয়া অধ্যাপক ক্যানেষ্ট্রিণীও এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। তিনি আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন, উহা গণ্ডাস্থি। ঐ অস্থি কতিপয় মানবের এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবের সচরাচর দুই অংশে বিভক্ত দেখা যায়। দুইমাস বয়সের মানব-ভ্রূণে উহা এই প্রকার। উহার বিবর্দ্ধন বন্ধ হওয়ায় উহা কখন কখন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরও ঐ আকারেই রহিয়া যায়। বিশেষতঃ যে সকল অসভ্য জাতির হনু বাহিরের দিকে বর্দ্ধিত, তাহাদিগের মধ্যে ঐ অস্থি ঐরূপ আকারের অনেক সময় দেখা যায়। এ নিমিত্ত ক্যানেষ্ট্রিণী অনুমান করেন যে মানবের দূরবর্ত্তী পূর্ব্ব পুরুষের ঐ অস্থি সচরাচর ঐ রূপই হইত, পরে উহা যুক্ত হইয়া গিয়াছে। বয়স্থ মানবের কপালের উর্দ্ধভাগের অস্থি এক খণ্ড মাত্র; কিন্তু মানবগণের এবং শিশুগণের ও নিম্নশ্রেণীস্থ প্রায় সকল স্তন্যপায়ী জন্তুরই উহা দুই খণ্ড একত্রে শেলাইর মত যুড়িয়া গিয়া একখণ্ডের মত হইয়াছে। মানব পূর্ণবয়স প্রাপ্ত হইলে পরেও এই সেলাইটি কখন কখন অল্পাধিক স্পষ্টভাবে থাকিয়া যায়। বর্ত্তমান কালীয় অপেক্ষা প্রাচীন কালীয় মাথার খুলিতেই অপেক্ষাকৃত অধিকস্থলে এই সেলাই দেখা যায়। ক্যানেষ্ট্রিণী দেখাইয়াছেন যে ঐরূপ অস্থি চওড়া-খুলিতেই বেশি পাওয়া যায়, এবং উহা ষ্ট্রীকট্ মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। গণ্ডাস্থি অস্থি সম্বন্ধেও তিনি যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এ ক্ষেত্রেও তিনি তদ্রূপ সিদ্ধান্তই করেন। আমি আরও কতিপয় দৃষ্টান্ত পরে উল্লেখ করিতেছি। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যাইবে যে, নিম্নতর জীবদেহের কোন কোন অংশে প্রাচীনকালীয় মানবের দেহে, বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা অনেক সময় অল্প-বিস্তর দেখা যাইত। এক্ষণে তাদৃশ দেখা যায় না। তাহারা কারণ বোধ হয় যে প্রাচীনকালীয়গণ বর্দ্ধমানবৎ পূর্ব্বপুরুষের অধিকতর নিকটবর্ত্তী ছিলেন, (আমরা এখন অনেক দূরে পড়িয়া গিয়াছি)।

উপরের লিখিত গুলি ছাড়া আরও অনেক ইতরজন্তু-সুলভ দেহাংশ মানুষে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারগণ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা ঐ সকলকেও পুনরাবর্ত্তন বলিয়াই ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু তাহাতে আমার কিঞ্চিৎ দ্বিধা হয়; কারণ ঐ সকল দেহাংশ ইতর জন্তুতে পূর্ণভাবে দেখিতে হইলে স্তন্যপায়িগণের অতি নিম্নশ্রেণীতে যাইতে হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশধর রায়।

* নিম্নতর জরায়ুজগণের দেহে ঐ নলদ্বয় ডবল জরায়ুতে পরিণত হইত, তাহাকেই পূর্ব্বের অভ্যাস বলা গেল। অনুঃ

† অধুনা অনেকেই এই বিধান স্বীকার করেন না; বিশেষতঃ বেতেলিয়ানগণ।

দশম বর্ষ।] ফাল্গুন, ১৩১৭ [১১শ সংখ্যা।

বঙ্গদর্শন

(নব পর্য্যায়)

মাসিক পত্র।

কলিকাতা,

২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

মজুমদার লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত।

বর্ত্তমান সংখ্যার মূল্য ।০ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৷৵

পুরাতন বঙ্গদর্শন।

১৩০৯ সাল হইতে ১৩১৬ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষের মূল্য ডাকমাশুল সমেত দুই টাকা।

হিন্দু ধর্ম্ম-নীতি।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত। মন্বাদি-স্মৃতি, মহাভারত, রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, হিতোপদেশ, প্রভৃতি প্রধান প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত। নীতি শিক্ষার এমন পুস্তক আর নাই বলিলেও চলে। মূল্য ১৲ স্থলে ||০ (বাঁধাই) ৸০ আনা।

সরল বর্ণ জ্ঞান।

ডাক্তার ব্রজনাথ সাহা প্রণীত। কিণ্ডার গার্টেন প্রণালী অনুসারে শিশুদিগের বাঙ্গালা অক্ষর পরিচয়ের সচিত্র পুস্তক। সুন্দর সুন্দর ছবি। মূল্য ৶০।

লিপি-সংগ্রহ।

সবজজ বিনোদবিহারী মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বের লিখিত সুমধুর বাঙ্গালায় উপদেশ পূর্ণ চিঠী পত্র। মূল্য ||৶০।

দুর্গালীলা-তরঙ্গিণী।

৺কৃষ্ণকিশোর রায় প্রণীত। গ্রন্থের প্রণেতা প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে একজন। ইহাতে আনুপূর্ব্বিক দুর্গালীলা সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। সৃষ্টি-প্রকরণ হইতে দক্ষযজ্ঞ, তৎপরে গিরিরাজের ঘরে শিবের বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত আখ্যান পদ্য ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য ১৲।

প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত বা প্রাণী রাজ্য।

শ্রীবাস চট্টরাজ সঙ্কলিত নূতন রকমের বই। যদি অসীম জ্ঞান সূক্ষ্মদর্শী সৃষ্টিকর্ত্তার অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৌশল দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে চান; যদি নদী, হ্রদ, অরণ্য প্রান্তরবাসী এবং আকাশচারী প্রাণিগণের বিবরণ পাঠে পুলকিত হইতে চান তবে ইহা ক্রয় করুন। মূল্য ১৲।

কাব্যগ্রন্থ।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ও ৺মোহিতচন্দ্র সেন, এম্, এ সম্পাদিত। ত্রয়োদশ খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য ৯৲ নয় টাকা।

গল্পগুচ্ছ।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। আর্ট পেপারে মুদ্রিত, দুই খণ্ডে সুন্দর বাঁধাই। মূল্য ৫৲।

মূক শিক্ষা।

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মজুমদার প্রণীত। মূক বধিরের শিক্ষা এ দেশে নূতন জিনিষ। জন্মবধির হইলেই মূক হয়। এই পুস্তকের সাহায্যে মূক-বধিরকে কথা ও লেখাপড়া শিক্ষা দিতে পারা যায়। সচিত্র উত্তম বাঁধাই মূল্য ৸০।

পঞ্চ প্রদীপ।

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদার, বি, এ প্রণীত নূতন গল্পের বই। খ্যাতনামা কাউন্ট টলষ্টয়ের গল্পের অনুকরণে আমাদের দেশের মত করিয়া গল্পগুলি লিখিত। বালক-বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগের পাঠ্য। পুরস্কারের উপযোগী। সুন্দর বাঁধাই। মূল্য ৶০।

পুণ্যের জয়।

শ্রীযুক্ত সুধাকৃষ্ণ বাগচি প্রণীত ও শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে সম্পাদিত, অভিনব রহস্যময় ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। মূল্য সুন্দর বাঁধাই ১৲

নববিধান সমাজের বই।

ব্রহ্ম সঙ্গীত প্রথম ২৲ দ্বিতীয় ৸৶০ আচার্য্য কেশবচন্দ্র (বিস্তৃত জীবন চরিত) ১৲ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম ১||০ গীতা সমন্বয় ভাষ্য ৫৲ বেদান্ত সমন্বয় (১২ খণ্ড) ৬৲ বিধান ধর্ম্ম সঙ্গীত (প্রসন্নকুমার সেন কৃত ২৲ গুরু নানকের জীবন চরিত ১||০ শাক্যমুনি চরিত ১|০ উপাধ্যায়ের বক্তৃতা ১৲ হদিশের বঙ্গানুবাদ, পূর্ব্ব বিভাগ ৪৲ উত্তর বিভাগ ২৲ কোরাণশরিফের বঙ্গানুবাদ ৪৲ মোহম্মদের বিস্তৃত জীবনী ৩, তাপসমালা বঙ্গানুবাদ প্রথমভাগ ১৲ তাপসমালা (৬ খণ্ড) ৩৲ জীবন-বেদ ১৲ মহাপুরুষ চরিত ৸০।

ফাল্গুন] [১১শ সংখ্যা।

বঙ্গদর্শন।

(নব পর্য্যায়)

দশম বর্ষ।

সূচী।

এস্ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৭

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র।

১

পূর্ব্বাভাস।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীকে অবিসম্বাদ বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াছেন, এবং কথিত আছে যে রাজা রামমোহন রায় একবার কাব্যপ্রণয়নে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত লিখিতে পারিবেন না বুঝিয়, সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এতৎসত্ত্বেও ইহা দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, মুকুন্দরাম আজকাল শিক্ষিতসমাজে উপেক্ষিত, এবং ভারতচন্দ্র অত্যন্ত অবজ্ঞাত। ভারতচন্দ্রকে অবজ্ঞা করিবার যে কারণ সাধারণতঃ নির্দ্দেশিত হয়, তাহা অনেক পরিমাণে ন্যায্য; কিন্তু মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীকে অবহেলা করিবার কোনও ন্যায্য কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু তিনি যে অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে পরিচিত নহেন, এ কথা নিশ্চিত সত্য।

কেন এমন হয়, যে কবিদ্বয়ের গীত এক কালে সাধারণের এত প্রিয় ছিল, এখন তাঁহারা কেন অনাদৃত, এ বিষয় অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এখন যে জীবসমষ্টি বাঙ্গালী বলিয়া অভিহিত, তাহারা ঠিক বাঙ্গালী নহে, আমরা এখন আমরা নহি, আমাদের সঙ্গে বিদেশীয় ভাবের এরূপ মাখামাখি হইয়া গিয়াছে যে এখন কোনও বিষয়েই খাঁটি বাঙ্গালাজিনিষ আমাদের মনোমত হয় না। আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, "এখন আর খাঁটি বাঙ্গালা কাব্য হয় না, হইয়াও কাজ নাই।" "খাঁটি বাঙ্গালা কাব্য হয় না" সেটা সত্য, কিন্তু "হইয়াও কাজ নাই" এ কথা এখন আবার সকলে নত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত হইবেন কি না জানি না। মুকুন্দরামের "চণ্ডী"কে আমরা খাঁটি বাঙ্গালার কাব্য বলিতে পারি। এমন একখানি কাব্য আজকাল যদি হয়, তাহা যে আদৃত কেন হইবে না তাহা বুঝিতে পারি না। কাব্যসম্বন্ধে আমরা যে একটা ধারণা গড়িয়া লইয়াছি, সেই ধারণার পোষক না হইলেই সেই কাব্যকে আমরা নিস্পৃহ চক্ষে দেখিয়া থাকি। আজকালকার কাব্যনিচয় সেই ধারণাপ্রসূত বলিয়া আমাদের কাছে, অর্থাৎ মুষ্টিমেয়ের কাছে আদৃত। আগেকার কাব্যগুলি সাধারণের জন্য, আজকালকার কাব্যগুলি বিদেশীভাবাপন্নের জন্য লিখিত। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, সাধারণ বাঙ্গালী আজকালকার কাব্য পড়ে না, আর ইংরাজী-ভাবাপন্ন বাঙ্গালী আগেকার কাব্যগুলি,

পড়ে না। কিন্তু কোনও ক্ষমতাপন্ন কবি যদি বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জাগত ভাব বুঝিয়া বাঙ্গালীর কাব্য লেখেন, তাহা হইলে সে কাব্য 'হওয়া কাজ নাই,' বা তাহার অনাদর হওয়াই আবশ্যক, এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারিতেছি না।

একদিন হঠাৎ আমরা শিখিয়া ফেলিয়াছিলাম যে, "ইংরাজী পুস্তকাগারের একটি সেল্‌ফে যে পুস্তক থাকিতে পারে, তাহাই এসিয়ার সমস্ত পুস্তকাগারের সমস্ত পুস্তকরাশির অপেক্ষা মূল্যবান্।" এই শিক্ষা আমাদিগকে বহুদিন দৃষ্টিহীন করিয়া রাখিয়াছিল; বহুদিন আমরা বিশ্বাস করিয়াছিলাম যে, যাহা ইউরোপীয় ভাবে ওতঃপ্রোত নয়, তাহা ভাল জিনিষ হইতে পারে না, তা সাহিত্যেই হউক বা অন্য কিছুতেই হউক। নূতনত্বের মদিরাকর্ষণে আমরা অনেক দিন মত্তাবস্থায় কাটাইয়াছি, সে নেশা যে এখনও কাটিয়াছে তাহা বলিতে পারি না; তবে নেশা কাটাইবার প্রয়াস হইতেছে, এবং তাহার ফলও যেন একটু একটু দেখা যাইতেছে। বাঙ্গালী আবার নিজের স্বাতন্ত্র্য কোথায় তাহা খুঁজিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, বাঙ্গালী আবার বাঙ্গালিত্বের গৌরব অনুভব করিতে চেষ্টা করিতেছে। বাঙ্গালী আবার নিজের দোষগুণ খুঁজিয়া লইয়া বাঙ্গালী-জীবন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে; বাঙ্গালী বুঝিতে শিখিতেছে যে, ভারতবর্ষের জল-হাওয়ায় যে শরীর গঠিত, ভারতবর্ষের তপোভূমিতে যে মন যুগযুগান্তর ধরিয়া পরিপুষ্ট, তাহা বিদেশীয় আদর্শে গঠিত বা পুষ্ট করিবার অভিলাষ অত্যন্ত অসমীচিন। তাই বলিতেছিলাম, এখন যদি কোনও ক্ষমতাশালী কবি কবিকঙ্কণের আদর্শে কাব্য রচনা করিয়া বাঙ্গালীর সমক্ষে আনয়ন করেন, তাহা হইলে এমন কাব্য হইয়া কাজ নাই, এমন কথা কি আমরা বলিতে পারি?

কিন্তু তাহার এখনও বড় বিলম্ব আছে। যে চেষ্টার কথা বলিয়াছি, তাহা জনকতক সূক্ষ্মদর্শিগণের মধ্যেই নিবদ্ধ আছে, সাধারণে প্রসৃত হয় নাই। এখনও অনেক শিক্ষিত-নামধেয় বাঙ্গালী আছেন, যাঁহারা বাঙ্গালার পূর্ব্ব কবিগণের নাম পর্য্যন্ত অবগত আছেন কি না সন্দেহ। অনেকের এখনও বদ্ধমূল ধারণা আছে যে বাঙ্গালায় মাইকেলের পূর্ব্বে সাহিত্য ছিল না; বাঙ্গালার পূর্ব্ব কবিগণ অপাঠ্য। ইহার একটি কারণ অবিসম্বাদে এই নির্দ্দেশ করা যায় যে তাঁহারা বাঙ্গালাভাষাটা এমন পরিপাটী ভাবে ভুলিয়াছেন যে, পূর্ব বঙ্গকবিগণের কাব্য বুঝিতে হইলে তাঁহাদের মাথার ঘাম পায়ে পড়িবার সম্ভাবনা; কাজেই তাঁহারা নিজ অলস বিলাসী জীবনটাকে এই দুরূহ শ্রম স্বীকার করাইতে নিতান্ত নারাজ। দ্বিতীয় কারণ—সেই ধারণা যে—কাব্য এমন একটা জমকালো জিনিষ হওয়া চাই যাহাতে সাধাসিধে ঘরোয়া কথা কিছু থাকিবে না, সোজাসুজি নিত্যদৃষ্ট ঘটনা বা নিত্যপ্রযুক্ত ভাষা তাহাতে কিছুই থাকিবে না। তাহা যদি কোনও কাব্যে থাকিল তবেই সে কাব্য অপাঠ্য। আমরা একটা নূতন কথার মোহে এখনও বিশেষরূপে আবিষ্ট রহিয়াছি, সেটা "Sublime". কাব্য sublime হও য়া

প্রয়োজন এই বিশ্বাস আমাদের খুব, কিন্তু sublime জিনিষটা কি তাহা যে ঠিক বুঝিতে পারি, বা, বুঝিবার চেষ্টা করি, তাহা বোধ হয় না। কাব্যের ভাষাসম্বন্ধেও আমরা এমনই একটা কথার মোহে আবদ্ধ; সে কথাটা "Sonorous". আমাদের পূর্ব্ব কবিগণ যে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কাব্য লিখিয়াছেন তাহা নহে, বরং তাঁহারা ভাবিতেন যে যেখানে সেখানে ভাষা খুব বিশুদ্ধ হওয়ার আবশ্যক করে না, ফলতঃ ভাষাসম্বন্ধে কোনও একটা অপরিহার্য্য নিয়ম তাঁহারা মানিতেন না। ইহাও বোধ হয় তাঁহারা স্বীকার করিতেন না যে, যাহা নিত্য-সঙ্ঘটিত ঘটনা তাহাতে উচ্চতা (sublimity) আসিতে পারে না। কাজেই তাঁহাদের কাব্যে এমন ঘটনা অনেক আছে। কাব্যের উচ্চতা প্রধান কবির ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, তাহা কোন্ কবি কত দূর করিতে পারিয়াছেন, তাহা কাব্য সমালোচনা করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা এখনও অনেক পরিমাণে নেশার ঘোরে রহিয়াছি, তাই সে চেষ্টা করিতে প্রস্তুত হই না। যাঁহারা তাহা করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে পূর্ব্বকালের বঙ্গকাব্য বহুমূল্য সম্পদে সম্পন্ন। সে সম্পদ অবহেলার বা অবমাননার উপযোগী নহে। সুখের বিষয় যে আমরা এই কথাটা আবার বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি—অন্ততঃ এটুকু বুঝিতেছি যে বাঙ্গালাভাষার আদি কবিগণকে তাচ্ছিল্য না করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝিবার চেষ্টা করিলে লাভ বৈ লোকসান নাই। তাঁহাদিগের চর্চ্চা করিলে অন্ততঃ বাঙ্গালীর পূর্ব্বাবস্থাও বেশ জানিতে পারা যাইবে। এরূপ স্থলে পূর্ব্ব বঙ্গকবিগণের কাব্য-সমালোচনায় কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার করিলে সময় নিতান্ত অপব্যয় হইবে না ভাবিয়া, আমি মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের তুলনায় সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের তুলনায় সমালোচনা এ কথা শুনিলে আপাততঃ একটু মনে খট্‌কা লাগিতে পারে বটে। প্রথমেই এই প্রশ্ন উঠিবে যে, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রে কি সাম্য আছে যে তাঁহাদের তুলনা হইতে পারে? তুলনায় সমালোচনা অর্থে দুই কবিকে পাশাপাশি রাখিয়া দেখা, তা তাহাতে সাম্যই দেখা যাউক অথবা বৈষম্যই দেখা যাউক। এই হিসাবেই আমি তুলনায় সমালোচনা কথাটি ব্যবহার করিয়াছি। ইহার ফলাফল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে, কিন্তু এ কার্য্য যে নিতান্ত নিষ্ফল নহে, তাহাই বলিবার ইচ্ছা আছে। আর কিছু ফল না পাওয়া যাইলেও অন্ততঃ এইটুকু বেশ বুঝা যাইবে যে বাঙ্গালীর কাব্যের আদর্শ-সম্বন্ধে, এবং জীবনের আদর্শসম্বন্ধে কতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। দুই কালের মানুষের মূর্ত্তি দুই কালের দুই কবির কাব্যদ্বয় হইতে বেশ চিনিতে পারা যাইবে।

মুকুন্দরামে ও ভারতচন্দ্রে যে সাম্য আছে তাহা অনেকটা বিষয়গত। রবির উজ্জ্বল কিরণ আর চাঁদের মৃদু চন্দ্রিকায় যে সাম্য আছে, ইহাও সেইরূপ। দুইই এক বস্তু, একটি অপরের প্রতিবিম্ব মাত্র। চাঁদের

আলো মিষ্ট ও সুদৃশ্য, কিন্তু তাহাতে জগৎ উদ্ভাসিত হয় না, তাহার জন্য সূর্য্যের রশ্মির প্রয়োজন হয়। মুকুন্দরামের কাব্য সূর্য্যালোক, ভারতচন্দ্রের কাব্য চন্দ্ররশ্মি; ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামে যাহা পাইয়াছিলেন, অনেক স্থলে তাহাই নিজ কাব্যে আনয়ন করিয়াছেন, কিন্তু মুকুন্দরামে যাহা উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট, ভারতচন্দ্রে তাহাই স্তিমিত ও কৃত্রিম। উভয় কবির তুলনা-স্থল তাঁহাদের সাংসারিক জ্ঞান। কিন্তু এই সাংসারিক জ্ঞান প্রকাশ করিবার কৌশল দুই কবিতে বিভিন্ন। দুই কবিই আমাদের ঘরের কথা অনেক পরিমাণে নিজ-কাব্য-বিষয়ীভূত করিয়াছেন, কিন্তু যেমন সূর্য্যালোকে সমস্ত জগৎ আলোকিত হইয়া, সমস্ত দ্রষ্টব্য জিনিষ দেখা যায়, আর চন্দ্রালোকে লোকের মনে একটু সুখের আবেগ আসিলেও তাহা দ্বারা জগতের অন্য কোনও কার্য্য হয় না, সেইরূপ মুকুন্দরাম নিজ সহৃদয়তা ও রসাবতারণ-শক্তির সাহায্যে তাঁহার সাংসারিক জ্ঞান ও মনুষ্য হৃদয়জ্ঞতা অপূর্ব্ব কৌশলে আমাদের হৃদয়ে ও মর্ম্মে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন, আমাদের দৃষ্টি উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, আমরা তাঁহার সৃষ্ট জগতের সমস্তটুকু পরিষ্কাররূপে দেখিতে ও বুঝিতে পারি। ভারতচন্দ্র তাঁহার সাংসারিক জ্ঞান বা মনুষ্য-হৃদয়জ্ঞতা লইয়া যেন খেলা করিয়াছেন, কোথাও তাহা তাঁহার চন্দ্ররশ্মি স্পর্শে অর্দ্ধ প্রকাশিত হইয়া ঝিকিমিকি করিতেছে, কোথাও বা শুধু আভাস মাত্র দেখা যাইতেছে; চন্দ্রালোকে মানুষ চেনা বড় কঠিন, শুধু একটা মানুষ আছে এই টুকুই বোঝা যায়। ভারতচন্দ্রও যে মানুষ বুঝিতেন তাহা নিশ্চয়, কিন্তু বোঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। মনুষ্যের সুখদুঃখ লইয়া, মনুষ্যের মন লইয়া ভারতচন্দ্র সোহাগই করিয়াছেন, তাহার সমগ্রতা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন নাই, অথবা করিতে পারেন নাই; চাঁদের আলোতে মানুষ সোহাগই করিতে ভালবাসে। এই প্রকার বিভিন্নতা থাকিলেও বলিতে হইবে যে কবিদ্বয়ের ভিতর কথঞ্চিৎ ঐক্য আছে।

ঐক্য শুধু ভাবে নহে, বিষয়েও। অতএব এ কথা নিঃসংশয় বলা যায় যে ভারতচন্দ্র অনেক স্থলে মুকুন্দরামকে অনুকরণ করিয়াছেন। এক জন সৃষ্টি করিয়াছেন, আর এক জন নকল করিয়াছেন। অনুকরণের যে দোষ তাহা ভারতচন্দ্রে বিশেষরূপে লক্ষিত হইবে। অনুকৃত বস্তুকে কথা সাজাইয়া লুকাইবার চেষ্টা ভারতচন্দ্রে সর্ব্বদা জাগরূক। ফল হইয়াছে এই যে, কৃষ্ণনগরের কারিগর এমন একটি মৃণ্ময় আম্র গড়িয়াছেন যে তাহা দূর হইতে দেখিলে তাহাতে আম্র-ভ্রম অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিতে যাও, রসের বদলে মাটীতে মুখ পূরিয়া যাইবে। ভ্রান্তি দূর হইলেও কিন্তু বিস্ময় ঘুচে না, লোকে তখনও বলিতে বাধ্য হয় কি নিপুণ কারিগরি!

একটা বিষয় লইয়া এই কথাটা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা যাউক। কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী'কাব্যে ও ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' হরগৌরীর কথা আছে সকলেই জানেন। বিষয়টি দুই কাব্যে প্রায়ই এক রকম। এই হরগৌরীর কথায় ব্যপদেশে বাঙ্গালীর

ঘরের যে কথাটুকু প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই এখন আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে। এই ঘরের কথাটুকুর বর্ণনা রবি বাবুর মর্ম্ম-স্পর্শী ভাষায় জানান তাল। তাহার মধ্যে হরগৌরীর কথা আমাদের ঘরের কথা। সেই হরগৌরীর কথায় আমাদের বাঙ্গালা দেশের একটা বড় মর্ম্মের কথা আছে। কন্যা আমাদের গৃহের এক মস্ত ভার। কন্যাদায়ের মত দায় নাই। * * * কন্যাকে অযোগ্য পাত্রে সমর্পণ করা ইহা আমাদের সমাজের নিত্য নৈমিত্তিক দুর্ঘটনা। ইহা লইয়া দুশ্চিন্তা, অনুতাপ, অশ্রুপাত, জামাতৃ-পরিবারের সহিত বিরোধ, পিতৃকুল ও পতিকুলের মধ্যবর্ত্তিনী বালিকার নিষ্ঠুর মর্ম্মবেদনা সর্ব্বদাই ঘরে ঘরে উদ্ভূত হইয়া থাকে। একান্ন পরিবারে আমরা দূর ও নিকট এমন কি নামমাত্র আত্মীয়কেও বাঁধিয়া রাখিতে চাই, কেবল কন্যাকেই ফেলিয়া দিতে হয়। যে সমাজে স্বামী স্ত্রী ব্যতীত পুত্র কন্যা প্রভৃতি সকলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহারা আমাদের এই দুঃসহ বেদনা কল্পনা করিতে পারিবে না। আমাদের মিলনধর্ম্মী পরিবারে এই একমাত্র বিচ্ছেদ। সুতরাং ঘুরিয়া ফিরিয়া সর্ব্বদাই সেই ক্ষত বেদনায় হাত পড়ে। হরগৌরীর কথা বাঙ্গালার একান্ন পরিবারের সেই প্রধান বেদনার কথা। শরৎ-সপ্তমীর দিনে সমস্ত বঙ্গভূমির ভিখারী বধূ কন্যা মাতৃগৃহে আগমন করে, এবং বিজয়ার দিনে সেই ভিখারী ঘরের অন্নপূর্ণা যখন স্বামীগৃহে ফিরিয়া যায় তখন সমস্ত বাঙ্গালাদেশের চোখে জল ভরিয়া আসে।

এই সকল কারণে হরগৌরীসম্বন্ধীয় গ্রাম্যছড়াগুলি বাস্তব ভাবের। তাহা রচয়িতার ও শ্রোতৃবর্গের একান্ত নিজের কথা। সেই সকল কাব্যে জামাতার নিন্দা স্ত্রীপুরুষের কলহ ও গৃহস্থালীর বর্ণনা যাহা আছে, তাহাতে রাজভাব বা দেবভাব কিছুই নাই; তাহাতে বাঙ্গালাদেশের গ্রাম্য কুটীরের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিম্বিত।

হরগৌরীর কথা সম্পূর্ণরূপে দুই কাব্যের কোনও কাব্যেই নাই, তবে যতটুকু আছে তাহাতেই একটা গৃহচিত্র আবরণমুক্ত হইয়া আমাদের সমক্ষে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই গৃহচিত্রাঙ্কণে দুই কবির মধ্যে একটু বৈলক্ষণ্য আছে। বিষয় প্রায়ই এক, দক্ষযজ্ঞ হইতে আরম্ভ করিয়া, শিব-পার্ব্বতীর কলহ পর্য্যন্ত দুই কাব্যেই অঙ্কিত ও বর্ণিত হইয়াছে। দুই কাব্যেই দারিদ্র্য নিবন্ধন শ্বশুরের কাছে জামতার অপমান, স্ত্রীর পতিনিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ, পতির স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, আবার পতিপত্নী-সংযোগ ও শেষে দারিদ্র্যদোষে পতিপত্নীর কলহ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। হরগৌরীর কথার ব্যপদেশে লিখিত হইলেও ইহা যে আমাদের ঘরের কথা সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। এই সকল চিত্র আঁকিবার সময় দুই কবিই হরগৌরীর দেবত্ব বিস্মৃত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মুকুন্দরাম আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া সেই চিত্রের মধ্যে নিমগ্ন হইয়াছিলেন; ভারতচন্দ্র ভুলিতে পারেন নাই যে শ্রীভারতচন্দ্র রায় গুণাকর কবিতা লিখিতেছেন। মুকুন্দরাম দক্ষের মুখে শিব-

নিন্দা প্রচারিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, ভারতচন্দ্র নিন্দাচ্ছলে স্তুতি লিখিতে গিয়া কথা সাজাইয়াছেন; তাহাতে ধনী শ্বশুরের দরিদ্র জামাতার প্রতি শ্লেষ একেবারেই ব্যক্ত হয় নাই। মেনকার মুখে মুকুন্দরাম স্বামীর সহিত নিজগৃহে অবস্থিতা কন্যার প্রতি যে কথাগুলি বসাইয়াছেন এবং ছদ্মবেশে উমার কার্য্য বঙ্গগৃহের একটা দারুণ চিত্র প্রকাশ করিয়াছে; ভারতচন্দ্র সে চিত্র মোটেই আঁকেন নাই। মুকুন্দরামের চিত্রগুলি আমাদের নয়নের সমক্ষে দারিদ্র্যের একটি সম্পূর্ণ ছবি আঁকিয়া তোলে, ভারতচন্দ্রের চিত্রগুলি দারিদ্র্যের চিত্র হইলেও তাহা অসম্পূর্ণ ও অনেক স্থলে অসংলগ্নও বটে। ভারতচন্দ্র একবার গৌরী দ্বারা "মেলানী ভার" পূরণ করাইতেছেন, আবার পরক্ষণেই দারিদ্র্যের জন্য হরগৌরীর কোন্দল বাঁধাইতেছেন। মুকুন্দরামের দরিদ্র-গৃহ হঠাৎ সম্পদে পূর্ণ হইয়া উঠে নাই; তিনি অকাতরে গৌরী দ্বারা শিবকে ত্রিশূল বাঁধা দিবার পরামর্শ দেওয়াইয়াছেন। ইহাতে লোকের একটু রাগ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মহাদেব যেন একটু দায়ে পড়িয়া কন্দল উপস্থিত করিয়াছেন। মুকুন্দরামের গৌরী শিবের মুখের সম্মুখে "আমি আত্মঘাতী হব" ভিন্ন আর কিছু বলেন নাই, ভারতচন্দ্রের গৌরী খুব এক-পালা মহাদেবকে শুনাইয়া দিয়াছেন। মুকুন্দরামের গৌরী খেদ করিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের গৌরী ঝগড়া করিয়াছেন। মুকুন্দরামের কবিতার ন্যায় তাঁহার গৌরীও দরিদ্রা, কিন্তু হৃদয়হীনা নহেন, বরং স্নিগ্ধা। ভারতচন্দ্রের গৌরী তাঁহার কবিতারই মত সখ করিয়া মুখরা, যিনি এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে শূন্য ভাণ্ডার খাদ্যে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন, ও পরক্ষণেই অন্নপূর্ণা হইয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার সখ করিয়া বাক্যযন্ত্রণা দিয়া স্বামীকে ভিক্ষা করিতে পাঠাইবার প্রয়োজন কি? কিন্তু সে যাহাই হোক, এই চিত্রে অনেক স্থলে স্বাভাবিকতার দৃষ্টান্তও আছে, এবং সংসারিক জ্ঞানের পরিচয়ও আছে। বৃদ্ধ-বরে কন্যা-সম্প্রদান-প্রথার প্রতি যে তীব্র কটাক্ষপাত আছে, তাহা স্বাভাবিক ও হৃদয়-গ্রাহী। জয়া কুপিতা গৌরীর পিতৃগৃহগমন-সংকল্প রোধ করিবার জন্য যে উপদেশ দিয়াছে, তাহা অমূল্য—

"কহে সখী জয়া শুনগো অভয়া
একি কর ঠাকুরালি।
ক্রোধে করি ভর যাবে বাপ ঘর
খেয়াতি হবে কাঙালি ॥
মিছে ক্রোধ করি আপনা পাসরি
কি কর ছাবাল খেলা।
সুখ মোক্ষধাম অন্নপূর্ণা নাম
সংসার সাগর ভেলা ॥
অন্নপূর্ণা হয়ে অন্ন দেহ ক'য়ে
দাঁড়াবে কাহার কাছে।
দেখিয়া কাঙালি সবে দিবে গালি
রহিতে না দিবে পাছে ॥
জননীর আশে যাবে পিতৃবাসে
ভাজে দিবে সদা তাড়া।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া ॥

বলা বাহুল্য যে এই উপদেশ বড় খাঁটি। কবি মুকুন্দরাম উপদেশচ্ছলে এই তথ্য

প্রকাশ না করিয়া ইহার সজীব চিত্র আঁকিয়াছেন ঃ—

"তোমা ঝি হাতে মোর মজিল গিরিয়াল।
ঘরে জামাই রাখিয়া পুষিব কতকাল।
প্রভাতে খেজাড়ি মাঙ্গি কার্ত্তিক গণাই
চারি কড়ার সম্ভাবনা তোর ঘরে নাই।"

ইত্যাদি।

যে স্ত্রী পতির দারিদ্র্যে ভীত হইয়া বাপ মায়ের কাছে থাকিয়া সোহাগে খাইবার ও পাইবার আশা করে, তাহার ভাগ্যে এইরূপ বিড়ম্বনাই ঘটিয়া থাকে। তাই মুকুন্দরামের গৌরী "এই খোঁটা" খাওয়া অপেক্ষা তৎক্ষণাৎ পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুক পতির সহিত ভিক্ষাসম্বল করিয়াও নিজ ঘরে প্রস্থান করিলেন। এবং ভারতচন্দ্রের গৌরীও পিতৃগৃহ গমন সংকল্প ত্যাগ করিলেন। এই স্থলে এবং অন্যান্য অনেক স্থলে ভারতচন্দ্রের সাংসারিক জ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে।

তাই বলিতেছিলাম যে এই হরগৌরীর চিত্রে মুকুন্দরামের সহিত ভারতচন্দ্রের অনেকটা সাম্য আছে। কিন্তু সাম্যও যেমন আছে তেমনি এই সকল চিত্রেই দুই কবির মধ্যে যে বৈষম্য তাহাও বিশেষ রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কবিকঙ্কণের চিত্র একটি সমগ্র দৈন্যের গৃহচিত্র, ভারতচন্দ্রের চিত্র সমগ্র নহে, খণ্ড চিত্র মাত্র। কিন্তু কেবল এইটুকুতেই সে বৈষম্য প্রকাশিত হয় নাই। আর একটি বিষয়ে তাহা বিশেষভাবে লক্ষিত হইবে। সে বিষয়টি গৌরীর বিবাহের পূর্ব্বের চিত্রগুলি। এইগুলি পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলেই বেশ বুঝা যাইবে যে মুকুন্দরামে ও ভারতচন্দ্রে মৌলিক পার্থক্য কোথায়। মুকুন্দরাম আত্মসংযম, ভারতচন্দ্র উচ্ছৃঙ্খলতা। ইহাই তাঁহাদের ভিতর যথার্থ পার্থক্য। মুকুন্দরাম দুঃখ, ভারতচন্দ্র সুখ; এ কথা বলিলে তাঁহাদের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা ঠিক বুঝা যাইবে না। এই কথার পুনরুত্থাপন প্রয়োজন হইবে, এইজন্য এখানে দুই কবির মধ্যে যে প্রভেদের বিষয় উল্লেখ করিলাম তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। এখন দেখা যাউক এই হরগৌরীর কথার ভিতর এই পার্থক্য কিরূপে বিকশিত হইয়াছে।

হিমালয়ের গৃহে সতী গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করিবার পর হইতে শিবের সহিত তাঁহার বিবাহ পর্য্যন্ত ঘটনাবলী উভয় কবিই তাঁহাদের কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই বর্ণনাতেই উভয়ের শিল্প-কৌশলের পার্থক্য উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কাব্য উচ্ছৃঙ্খলতার লীলাক্ষেত্র নহে, তাহা একজন যেমন সুন্দরভাবে হৃদয়ে ধারণা করিয়াছেন, অপর একজন তেমনি তাহা ভুলিয়া গিয়া সুন্দর আদর্শ খর্ব্ব করিয়াছেন। দুই জনের সমক্ষেই একটি মহান্ বিরাট আদর্শ পড়িয়াছিল— কালিদাসের অমরসৃষ্টি কুমারসম্ভব। দুই জনেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন; ইহাও দেখা যায় ভারতচন্দ্রের মনে সে সময় কুমারসম্ভবের কথা একটু [illegible] হইয়াছিল, কতকগুলি বর্ণনা তিনি কুমারসম্ভব হইতে সংগ্রহও করিয়াছিলেন। মুকুন্দরাম শুধু কবি ছিলেন না, তিনি সুবিবেচক ও রসগ্রাহীও ছিলেন, তাই তিনি কালিদাসের

কাছে ঋণ গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই, গৌরীর শিবপূজা, ব্রহ্মার পরামর্শ, দেবগণ কর্ত্তৃক মদনকে প্রেরণ, মদন কর্ত্তৃক শিবের প্রতি অস্ত্রক্ষেপ, মদন-ভস্ম, গৌরীর তপস্যা ও ছলনা ও পরে বিবাহ এই সকল ঘটনাগুলি তিনি কুমারসম্ভব হইতে গ্রহণ করিয়া নিজ কাব্য মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মহাকবির বিরাট, অখণ্ডিত রস তিনি কোথাও খণ্ডন করিবার প্রয়াস পান নাই। ইহা দ্বারা তাঁহার কাব্য-সৌভাগ্য কত দূর পুষ্ট হইয়াছে তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। মহাযোগী যতক্ষণ গার্হস্থ্য অবলম্বন না করিয়াছেন, ততক্ষণ তাঁহাকে গৃহস্থভাবে চিত্রিত করা, সামান্য মানবভাবে চিত্রিত করা আদৌ শোভন নহে, তাহা তিনি বুঝিতেন। সেই বিবেচনার ফলে আমরা বাঙ্গালায় কালিদাসের অতুলনীয় কাব্যের কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছি। তাঁহার হাতে পড়িয়া একটি মহান্ আদর্শ দীর্ণ হইয়া যায় নাই। মুকুন্দরামের প্রতিভা সহজ বুদ্ধিশালিনী তাই তিনি বুঝিতেন যে মহাকবি কালিদাস যে বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে কোনও নূতনত্ব প্রদানের চেষ্টা করা, বিকশিত শতদলে রং ফলানর চেষ্টার ন্যায় বিড়ম্বনাজনক। তাই তিনি কালিদাসের ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবারই প্রয়াস করিয়াছেন। যেখানে সেই পথ ঈষৎ পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোল কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, সেই খানেই একটু রসভঙ্গ হইয়াছে এবং সমালোচকের তীব্রোক্তির হেতু হইয়াছে। কিন্তু এখানেও তিনি ততটা দোষার্হ নন; কেন তাহা পরে বলিতেছি। সে যাহা হউক ইহা স্পষ্টতঃ প্রমাণ হয় যে মুকুন্দরাম প্রণয়ের মাহাত্ম্য বুঝিতেন, প্রেম যে কেবল কলুষিত ইন্দ্রিয় বিকারমাত্র নহে, তাহা তিনি বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

কিন্তু ভারতচন্দ্র এই সুন্দর অবকাশ, কবিত্বের এই মনোরম লীলাক্ষেত্র ছাড়িয়া দিয়া শুধু নিজের অবিবেকিত্বই প্রকাশ করেন নাই, নিজের অসারত্ব ও অরসিকত্ব উজ্জ্বল অক্ষরে প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে কোনও উচ্চ আদর্শ তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না, কোনও মহৎ ভাব তিনি ধারণা করিতে পারেন না। তাঁহার কলুষিত কল্পনায় মহাযোগী মহাদেবেরও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অসম্ভব। মদন-ভস্মব্যাপারটা তাঁহার মাথায় একেবারে প্রবেশ লাভ করে নাই, তাই এই আধ্যাত্মিক ব্যাপারটা লইয়া তিনি ছেলেখেলা করিয়াছেন। মুকুন্দরামও যাহা ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই, সেই মহোচ্চ ভাব ভারতচন্দ্রের মত দরের কবির হস্তে পড়িয়া একেবারে বিকৃত ও কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। যে মদনবাণে এত কাতর, সে আবার মদনকে ভস্ম করিবে কি করিয়া, এ কথাটা তাঁহার বিচারবিহীন মস্তিকে প্রবেশ করিল না। মহাদেবের এই সাত্ত্বিক ক্রোধ ধারণা করিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি তাঁহার হইল না; তিনি শুধু শুধু মদন বেচারাকে ভস্ম করাইয়া, শেষ আবার সেই মদন-জ্বালায় মহাযোগী মহাদেবকে পাগল সাজাইয়া দেখাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। কি ঘৃণিত প্রবৃত্তি! কি অন্ধ ইন্দ্রিয়-

বিকৃতিপাংশুল হৃদয়! অনেকে ভারতচন্দ্রকে বিদ্যাসুন্দর প্রণয়ন জন্য নিন্দা করেন, অনেকে ভাবেন যে এই বিদ্যাসুন্দর কাব্যেই ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমার বিবেচনায় ভারতচন্দ্রের অন্তর্নিহিত অশ্লীলতা আর কোথাও ততদূর ব্যক্ত হয় নাই যতটা এই শিবের তপোভঙ্গের চিত্রে হইয়াছে। যে কবি অপর এক মহাকবির আদর্শ নির্ম্মম ভাবে, কুৎসিত ভাবে চূর্ণ করিয়া, দেবতার স্থানে পশুর চিত্র আঁকিতে সঙ্কোচের লেশ মাত্র বোধ করেন না, যিনি আদর্শ যোগীকে কামোন্মত্ত পশুর সাজে সাজাইতে দ্বিধা বোধ করেন না, তিনি পরনারীর কামোন্মত্ততা প্রদর্শক বিদ্যাসুন্দর লিখিয়া নিজের বিকৃত রুচির পরিচয় দিয়াছেন, এ কথা কেমন করিয়া স্বীকার করা যায়। ভারতচন্দ্রের বিকৃত রুচির বিকাশ সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্ব প্রধানভাবে এই খানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভারতচন্দ্রের প্রধান দোষ, তাঁহার হৃদয়-হীনতা, অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতা, সবই এই এক চিত্রে একত্র হইয়া দেখা দিয়াছে। কোনও কবির জাতীয় মহান্ আদর্শ খর্ব্ব করিবার অধিকার নাই, বিশেষতঃ হিন্দু কবি হইয়া হিন্দুর পরম দেবতার মহোপকারী আদর্শ বিনষ্ট করিবার অধিকার ভারতচন্দ্রের আদৌ ছিল না। ইহা দ্বারা তিনি নিজ হৃদয়ের যে হীনত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কথায় ব্যক্ত করা যায় না। ফলতঃ এই কলুষ-কলঙ্কিত ইন্দ্রিয়বিকৃতিই ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রধান দোষ। কোনও সুসমালোচক বলিয়াছেন যে ইহা ভারতচন্দ্রের দোষ ততটা নহে যতটা তাঁহার সময়ের দোষ। কথাটা অনেক পরিমাণে সত্য হইলেও তাহা দ্বারা ভারতচন্দ্রের দোষ একেবারে ক্ষালিত হয় না। তিনি যদি বিদ্যাসুন্দর কাব্যেই এই দোষযুক্ত হইতেন তাহা হইলে আমি সে কথায় সায় দিতে পারিতাম, কিন্তু তিনি চক্ষের সমক্ষে একটি বিরাট আদর্শ বর্ত্তমান থাকিতেও তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া, অনায়াসে দেব-চরিত্র বিকৃত করিয়া যে নিজত্বের প্রমাণ দিয়াছেন, সে আত্মবিস্মৃত, ইন্দ্রিয়পরাভূত চঞ্চল ও বিবেকবিহীন নিজত্বের অপরাধ কেবল সময়ের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিলে রাম বাবুর নিকট নিমচাঁদ দত্তের দোষস্খালন চেষ্টার ন্যায় হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে। আমি সেরূপ কোনও চেষ্টার পক্ষপাতী নহি।

কবিকঙ্কণ প্রায়ই সমগ্র চিত্রে আত্ম-সংযম রাখিতে পারিয়াছেন, কেবল এক স্থলে একটু আদর্শ-ভ্রষ্ট হইয়াছেন ও এক স্থলে নিজের কথা কহিয়া আদর্শ নষ্ট করিয়াছেন। মহাকবি কালিদাস ধ্যান-মগ্ন মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করেন নাই, তিনি বলিয়াছেন যে মহাদেব যখন যোগ ভঙ্গ করিয়া পার্ব্বতী-দত্ত মালা গ্রহণ করিতে গেলেন তখন কাম সম্মোহন বাণ প্রয়োগে তাঁহাকে ঈষৎ ধৈর্য্যচ্যুত করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই যোগী মহাদেব হৃদয়বলে ইন্দ্রিয়-বিকার নিগ্রহ করিয়া, মদনকে ভস্মীভূত করিলেন। এই স্বাভাবিক এবং উচ্চ ভাব মুকুন্দরাম একটু সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি

ধ্যানমগ্ন মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গাইয়াছেন। তিনিও ঠিক বুঝিতে পারেন নাই যে, যে চিত্ত পরমাত্মজ্যোতিঃ নিরীক্ষণে পর্য্যবসিত সে চিত্তে কামবিকার সম্ভব নহে। এই স্থলে আদর্শ কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইয়াছে। আর এক স্থলে কবিকঙ্কণ স্বকপোল-কল্পিত একটি ঘটনা সংযোজিত করিয়াছেন, শিবের কুৎসিৎ রূপে আবির্ভাব, পরে মোহনবেশ ধারণ এবং নারীগণের পতিনিন্দা। এ গুলি দ্বারা কাব্যের কোনও শোভা বৃদ্ধি হয় নাই বরং ক্ষতিই হইয়াছে। যাহা কবিকঙ্কণ শেষকালে করিয়াছেন তাহা কালিদাস পূর্ব্ব হইতেই করিয়াছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বাবধিই কালিদাসের মহাদেব বরবেশে সজ্জিত। এবং কালিদাস মহাদেবদর্শনে মুগ্ধ স্ত্রীগণের মুখে উদার বচনাবলীই বসাইয়াছেন—সহৃদয় ও সাধারণতঃ সদ্বিবেচক কবি মুকুন্দরাম তবে কেন এই ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন? একজন সমালোচক কহিয়াছেন "সুপুরুষ দেখিলেই নারীগণের দ্বারা স্বীয় পতির নিন্দা করিতে হইবে, প্রাচীন কবিদের এ এক সাধারণ রোগ। যে দেশে পতিপূজা দেব-পূজায় উন্নীত, সে দেশে এরূপ বিকৃত রুচি কোথা হইতে আসিল?" এই প্রশ্নের মীমাংসা আমাদের সমাজের একটি ভয়ঙ্কর কুপ্রথার উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই ভালরূপে হইবে; সেই কুপ্রথা দেবীবর ঘটক প্রচারিত কৌলীন্যপ্রথা। এই কৌলীন্যপ্রথার মোহে আবিষ্ট হইয়া আমাদিগের কুলবালাগণকে যে রাশি রাশি কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, অযোগ্য বরের হস্তে ন্যস্ত হইয়া সারা জীবন যে অসহ্য কষ্টে ব্যথিত করিতে হইয়াছে তাহারই ফলে আমাদের সতীসাবিত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত বঙ্গদেশেও এই অসহ্য-যন্ত্রণা-নিপীড়িতা ললনাগণের মুখে পতিনিন্দা প্রকাশ পাইয়াছে। এই ভীষণ কুপ্রথা মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবিগণের সময় সম্পূর্ণ রূপে সমাজে উৎপাত করিতেছিল, এবং অসহায় কুলীন-ললনাগণের বৃদ্ধ নির্গুণ বরের সহিত বিবাহিত হওয়া নিত্য ঘটনার মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাই মহাদেবের সহিত গৌরীর বিবাহ বর্ণন কালে কবির মনে সহজেই এই বিসদৃশ চিত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল; এবং পরে সুন্দর মহাদেবকে দেখিয়া নারীগণের নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিবার প্রবৃত্তি অশোভন হইলেও নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। মুকুন্দরাম ঘরের কথা কহিতে এত ভালবাসেন যে তাহার সুযোগ পাইলে আর ছাড়িতে পারেন না। তাঁহার রচিত নারীগণের পতিনিন্দা উচ্চ আদর্শানুমত নহে তাহা সত্য, কিন্তু তাহাতে অত্যন্ত কুভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না, তাহাতে অদৃষ্টে ধিক্কার ভিন্ন ইন্দ্রিয়চপলতা প্রকাশ পায় নাই। যে টুকু আছে তাহাতে মনে হয় যেন সেই নারীগণের দুরদৃষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি লিখিতে বসিয়াছেন। ইহা উত্তম রুচির অনুমোদিত না হইলেও, ইহা দ্বারা কবির হৃদয়ের কোনও বিসদৃশ ভাবের প্রকটন হয় নাই। কবি এই নিন্দার ভিতরও নিপুণ অঙ্গুলি সঙ্কেতে সেইরূপ কোনও জঘন্য ভাবের পথ রোধ করিয়া রাখিয়াছেন।

"আপন স্বামী কণকচাঁপা পর শিমুলের ফুল।" ইহা দ্বারা কবি নিজ সংযম বজায় রাখিয়াছেন। ভারতচন্দ্রেও নারীগণের পতি-

নিন্দা আছে—তাহার পরিচয় এখানে দেওয়া প্রয়োজন নাই, এইটুকু বলিলেই চলিবে যে মুকুন্দরামে যাহা বাস্তব দৃশ্য, ভারতচন্দ্রে তাহাই হাস্যরস অবতারণের চেষ্টা। তা ছাড়া আরও যাহা আছে তাহা বড় গৌরবের বিষয় নহে। সে কথা পরে বলিব।

এই হাস্য রসাবতারণ প্রসঙ্গে এইটুকু লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে যে মুকুন্দরাম যে হাস্যরসের অবতারণা করেন তাহা নাটককারের মত চরিত্রসৃষ্টির ব্যপদেশে। ভারতচন্দ্রের হাস্যরসের ভিতর একটু নষ্টামি আছে; তাঁহার পরকে অপদস্থ করিয়া হাসিবার ইচ্ছা করে, তাঁহার হাস্যরস একটু Mischievous. এ সম্বন্ধে তাঁহার অনেকটা নিজসৃষ্ট নারদের সহিত তুলনা হয়। ঝগড়া বাধাইয়া মজা দেখিতে তিনি বেশ কৌতুক অনুভব করেন, লোকের সহিত কার্য্যতঃ পরিহাস (Practical joke) করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার নারদের মতই প্রবল। হরগৌরীর চিত্রের মধ্যে মুকুন্দরাম তদীয় পরিহাস রসিকতার পরিচয় দেন নাই, ভারতচন্দ্র দিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি চরিত্রের গৌরব ভারতচন্দ্রের যেন দ্রষ্টব্যই ছিল না, অতএব দেবচরিত্র লইয়াও তিনি ঠাট্টা-তামাসা করিতে বিরত হন নাই। এই দেখুন শিবের বরসজ্জা লইয়া দুষ্ট নারদ কেবল practical joke করিতেছেন—

নারদ বসিয়া　　হাসিয়া হাসিয়া
সাজাইতে গেলা বর।
বসিছিলা হর　　উঠিল সত্বর
নারদ কহে তৎপর॥
জটা জুটে চূড়া　　সাপে বান্ধ খুড়া
মুকুটে কি দিবে শোভা।
কি কাজ মুক্তায়　　হাড়ের মালায়
কন্যার মা হ'বে লোভা॥
কস্তুরী কেশরে　　চন্দন কি করে
ঘন করে মাখ ছাই।
কি করে মণিতে　　যে শোভা ফণিতে
হেন বর কোথা পাই॥
ফুল মালা যত　　শোভা দিবে কত
যে শোভা মুণ্ডের মালে।
কাপড়ে কি শোভা　　জগমন লোভা
যে শোভা বাঘের ছালে॥
রথ হস্তী আর　　কি কাজ তোমার
যে বুড়া বলদ আছে।
তোমার যে গুণ　　কব কোটিগুণ
আমি মেনকার কাছে॥"

এমন না করিলে নারদের হাসিবার একটা মস্ত সুযোগ ভাসিয়া যায় তাই কবি মহাকবি কালিদাসের বর্ণনা রূপান্তর করিয়া একটু হাসিয়া লইয়াছেন—

কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখ বাজায় নারদ মুনি হাসে॥

আদর্শহীনতার দোষ ছাড়িয়া দিলে, আমি ঠিক বলিতে পারি না যে মদনভস্মের দৃশ্যে মহাদেবের ছবি আঁকিবার সময় এই নষ্টামিপ্রিয় হাস্যপ্রবণতা কবির মনে একেবারে উদিত হয় নাই। যে কৌতুকময় চিত্রের রেখাপাত সেখানে হইয়াছে তাহাই হাস্যরসিক কবি দীনবন্ধুর হাতে পড়িয়া বিয়েপাগ্লা বুড়োয়" দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সে কথা আর না তোলাই ভাল, কারণ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই চিত্রে কবির যে

দিক্ দৃষ্টিগোচর হয় তাহা আদৌ সুখকর নহে। এই স্থলে ভারতচন্দ্রের পরিহাস-প্রিয়তার যে টুকু পরিচয় পাইয়াছি তাহারই আভাস দিয়া রাখিলাম। ইহা আমরা আরও বিকশিতভাবে পরে দেখিতে পাইব।

এক্ষণে ভারতচন্দ্রের ও মুকুন্দরামের হরগৌরীচিত্রে তাঁহাদের কতটুকু ক্ষমতার বিকাশ হইয়াছে, এবং তাঁহাদের অপরাপর দোষগুণই বা কি রকমে ধরা পড়িতেছে তাহারই প্রসঙ্গক্রমে আর দুই একটি কথা বলিয়া রাখিলে ক্ষতি নাই। অবান্তর হইলেও উভয় কবির কাব্যেই রতিবিলাপ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই রতিবিলাপ-ব্যাপার লইয়া দুই কবির মধ্যে বেশ একটু তারতম্য লক্ষিত হয়। আমরা দেখিতে পাই যে কবিকঙ্কণ জীবনের ঘটনার স্বাভাবিকতায় যে কবিত্ব তদ্ভিন্ন অপর কোনও কবিত্বের প্রতি আস্থাবান্ ছিলেন না; তাঁহার রতি-বিলাপ যথার্থ ই বিলাপ, তাহার ভিতর দিয়া পতিহীনা রমণীর আর্ত্ত ক্রন্দন ফুটিয়া উঠিতেছে।

"মোর পরমাণু লয়্যা, চিরকাল থাক জীয়া
আমি মরি তোমার বদলে।"

কি সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী করুণাসিক্ত আর্ত্তধ্বনি! ইহাতে উহু-উহুর বাড়াবাড়ি নাই, মরি মরি নাই কিন্তু এ ক্রন্দন প্রাণের সহিত ক্রন্দন। স্বভাবজ্ঞ কবি যতটুকু স্বভাবানুযায়ী ততটুকু লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, এই রতিবিলাপের ভিতর কথা বসাইবার বা কবিত্ব প্রকাশ করিবার চেষ্টা মোটেই নাই। অথচ ইহা দ্বারা একটি গভীর শোকের মূর্ত্তি সজীব ভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

রতিবিলাপে ভারতচন্দ্র অনেক কথা বলিয়াছেন, অনেকগুলি "উহু" বসাইয়াছেন, কবিত্ব প্রকাশ করিবার সুযোগ ছাড়েন নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বুঝিতে কষ্ট হয় না যে রতির বিলাপ কবির মর্ম্মে তো অনেক দূরের কথা, তাঁহার কানেও প্রবেশ করিয়াছিল কি না সন্দেহ।

আহা আহা হরি হরি, উহু উহু মরি মরি
হায় হায় গোঁসাই গোঁসাই।
হৃদয়েতে দিতে স্থান করিতে কতেক মান
এখন দেখিতে আর নাই॥

* * * * *

শিবের কপালে রয়ে প্রভুরে আহুতি ল'য়ে
না জানি বা ডল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে আরের কপাল দহে
আগুণের কপালে আগুণ॥

ইত্যাদি কবিতায় স্বাভাবিকতার পরিবর্ত্তে বাহাদুরি দেখাইবার চেষ্টাই বেশী। কোনও গভীর শোকমগ্না বিধবার প্রাণে "একের কপালে রাহু" প্রভৃতি হেঁয়ালি পড়িবার প্রবৃত্তি-আনা যে নিতান্ত অস্বাভাবিক তাহা কবি ভাবিবার সময় পান নাই।

"আরে নিদারুণ প্রাণ, কোন পথে পতি যান
আগে যারে পথ দেখাইয়া।
রাজীব চরণ রাজে মনঃশিলা পাছে বাজে
হৃদে ধরি লহরে বাহিয়া॥"

ইহাতে ভাব আছে সত্য, ভাবটি মনোরমও বটে, কিন্তু কথাগুলি ঠিক স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। গভীর শোক ভাবের উৎপাদক নহে, তাহা নিদারুণ মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণারই উৎপাদক। এই চারিটি ছত্রে একটি কোমল ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে সন্দেহ

নাই; কিন্তু মর্ম্মের বেদনা তেমন ব্যক্ত হয় নাই। যে ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি পাঠকের হৃদয়ে ব্যথার সৃষ্টি করে না, ঘাতপ্রতিঘাতের সৃষ্টি করে না, তাহা কবিত্বময় হইলেও রস হিসাবে তাহার সার্থকতা বড় বেশী নহে। কারণ রসের স্থায়ীভাব শোক, সেই শোকের উত্তাপ যত অধিক ফুটিবে, ততই করুণ রসের গাঢ়তা সম্পাদিত হইবে। শোকের সময় কবিত্ব স্ফূর্ত্ত হয় না, তাই এই ছত্রচতুষ্টয়ে যাহা সাধিত হইয়াছে তাহাতে রস প্রগাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, বরং রসাভাসদোষ আসিয়া পড়িয়াছে। মনুষ্যচরিত্র বিশ্লেষণ কালে আমরা ভারতচন্দ্রের ও মুকুন্দরামের রসাবতারণ-শক্তির আরও বিশেষ পরিচয় লইবার অবকাশ পাইব, অতএব এখানে তাহার উল্লেখমাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

এই সময়েই বলিয়া রাখা উচিত যে হরগৌরীর কথাতে ভারতচন্দ্রের প্রধান দোষ যেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, তেমনই তাঁহার প্রধান গুণের বিকাশও ইহাতেই দেখা দিয়াছে। যে অদ্ভুত শব্দ যোজন শক্তি লইয়া তিনি বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে চিরজীবী হইয়া আছেন, সেই শক্তি এই হরগৌরীর কথায় সম্পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে তাঁহার শক্তি অসীম, বঙ্গসাহিত্যে এই এক বিষয়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী এখনও হইল না। অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রাণ এই শব্দমন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত। স্বরাধ্যায় বীণায় কি বাজিতেছে বুঝি বা না বুঝি তাহার ধ্বনি কর্ণে মধু বর্ষণ করে; কোকিল কি গায় তাহা কেহ বুঝিতে না পারিলেও তাহার গানে প্রাণ আকৃষ্ট হয়। ভারতচন্দ্রের কলধ্বনিও এমনি মধুর, এমনি চিত্তাকর্ষক।

কল কোকিল অলিকুল বকুল ফুলে
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি দেউলে,
কমল পরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢল ঢল উছলে কুলে॥
বসন্ত রাজা আনি ছয় রাগিণী রাণী
করিল রাজধানী অশোক মূলে
কুসুমে পুণ পুণ ভ্রমর গুণ গুণ
মদন দিল গুণ ধনুক হুলে,
যতেক উপবন কুসুমে সুশোভন
মধু মুদিত মন ভারত ভুলে।

বহু কাল পরে বঙ্গসাহিত্যে আবার এই শব্দ মন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাস যে শব্দযোজনা-শিল্প আবিষ্কার করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রের হস্তে সেই শিল্প বহু গৌরবসম্পন্ন হইয়াছে। আধুনিক কবিগণের মধ্যে কবিবর রবীন্দ্রনাথ অনেক পরিমাণে এই শব্দবৈভবের অধিকারী হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনিও ভারতচন্দ্রের কাছে পরাস্ত। কেবল শব্দের সাহায্যে একটি গম্ভীর বিরাট চিত্র অঙ্কিত করিবার ক্ষমতা ভারতচন্দ্রের মত আর কোনও কবিতে দেখি নাই। "ভারতচন্দ্রের লিপিচাতুর্য্যের গুণ এই যে তাহাতে শ্রমজনিত একটি স্বেদবিন্দুও পাঠকের নেত্র গোচর হইবে না, শিশুর হাসি ও পাখীর ডাকের ন্যায় তাহা আয়াস ও আড়ম্বর শূন্য। * * * * * * * * * এই শব্দ ও ছন্দৈশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অনেক সমালোচক ভারতচন্দ্রে

কাব্যগুলকে 'ভাষার তাজমহল' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।" *

বলা বাহুল্য যে এ শব্দচাতুর্য্য বা এই অদ্ভুত শিল্পের পরিচয় আমরা মুকুন্দরামে পাইবার আশা করি না। মুকুন্দরাম নামে কবি, কার্য্যতঃ নাটককার। যাহা স্বাভাবিক—ভাব বা ভাষা দ্বারাই স্বাভাবিক, কবি অবিকল তাহা নিজ কাব্য মধ্যে বসাইয়া গিয়াছেন। তাহাতে সাজসজ্জা অর্পণ করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিবার তাঁহার অবকাশ ছিল না। লিপিচাতুর্য্য মুকুন্দরামে একেবারে নাই—লেখার মুখে যাহা বাহির হইয়াছে তাহাই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। তাই বলিয়া তিনি যে আগাগোড়াই গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নহে, যখন যাহা ব্যবহার করিবার আবশ্যক হইয়াছে তখন তাহাই ব্যবহার করিয়াছেন—তা সে সংস্কৃতই হউক বা গ্রাম্যই হউক। আমার বক্তব্য এই যে মুকুন্দরাম পাঠককে কোথাও শব্দমোহে সমাচ্ছন্ন করিবার প্রয়াস করেন নাই, প্রয়াস করিলেও পারিতেন কি না সন্দেহ, কারণ তাঁহার হৃদয় অন্যদিকে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু ভারতচন্দ্রের শক্তির বিকাশ এই শব্দচাতুর্য্যকে অবলম্বন করিয়াই হইয়াছিল। তাঁহার মত কথায় চিত্ত হরণ করিতে প্রাচীন কালের অন্য কোনও কবি সক্ষম হ'ন নাই।" দীনেশ বাবুর এই উক্তি আংশিকমাত্র সত্য; ফলতঃ তাঁহার মত কথায় চিত্ত হরণ করিতে এ কালেরও কোনও কবি সক্ষম হ'ন নাই বলিলে সম্পূর্ণ সত্য হইত।

যাহা হউক এই শব্দপ্রয়োগশক্তি কবির চিত্রাঙ্কণী প্রতিভার সহিত এত সংশ্লিষ্ট যে সেই কথা বলিবার কালেই এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে। হরগৌরীর কথা উভয় কাব্যের মুখবন্ধ স্বরূপ। সেই মুখবন্ধে দুই কবির যে আভাস পাইয়াছি তাহাই এখন প্রকটিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। কবিদ্বয়ের পূর্ণ প্রকাশ তাঁহাদিগের কাব্য মধ্যে প্রবেশ করিলে তবে পাওয়া যাইবে, বারান্তরে তাহা করিবার ইচ্ছা রহিল। (ক্রমশ)

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

বাঙ্গালা-ব্যাকরণের একাংশ।

উপযুক্ত অভিধান ও ব্যাকরণ অভাবে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বাঙ্গালাভাষার পর্য্যালোচনা দুরূহ—অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অভিধান বা ব্যাকরণ সর্ব্বাঙ্গীন করা ব্যক্তিগত চেষ্টার অসাধ্য। সমবেত ধারাবাহী চেষ্টা বিনা এ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার নহে।

ব্যক্তিগত পরিশ্রমলব্ধ ফল সুধীমণ্ডলীর সমক্ষে যাচাই না হইলে ব্যর্থ হয়। এই বুদ্ধিতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত। পরীক্ষান্তে প্রত্যাখ্যাত হইলেও ইহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইবে না। সম্বাদী ভ্রমেরও সার্থকতা আছে। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন মহাশয় প্রবন্ধ প্রণয়নে সৎ পরামর্শ দিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন

---

* দীনেশ বাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

হইয়াছেন। মতামতের জন্য তিনি দায়ী নহেন। ১৩০৭ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রণীত "বাঙ্গালা শব্দদ্বৈত" (৬০ পৃষ্ঠা) ও "বাঙ্গালা ধ্বন্যাত্মক শব্দ" (২৫২ পৃষ্ঠা) এবং শ্রীযুক্ত বাবু ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত "ভাষা-তত্ত্ব" (১৬৮ পৃষ্ঠা) প্রবন্ধগুলিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের ক্ষুদ্র একাংশ মাত্র উপস্থিত আলোচনার বিষয়। শব্দের দ্বিত্ব ও দ্বিত্বাভাসের বহুমুখী প্রয়োগ উত্তর ভারতীয় ভাষার একটি বিশেষত্ব। অন্যান্য ভাষায় ইহার চিহ্নমাত্র লক্ষিত হয়। যেমন, ইংরেজীতে wide wide world, hugger-mugger ইত্যাদি। সংস্কৃতে পরস্পর, পরম্পরা, কিলকিলা ইত্যাদি। কিন্তু এই এক সাধনায় বাঙ্গালায় যত প্রকার বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত বোধ হয় ভাষান্তরে অপ্রাপ্য। অনাদরে বাঙ্গালা-ভাষার অধ্যয়ন অধ্যাপন। এজন্য ইহার নগণ্য একাংশের আলোচনাতেও অজ্ঞাতসারে বলিয়া উঠিতে হয়—

মাতৃভাষারূপী খনি পূর্ণ মণিজালে।

বাঙ্গালা-ব্যাকরণের একাংশ।

দ্বিরুক্তি।

১। উপর্য্যুপরি ব্যবহৃত একই শব্দের প্রত্যেকের অর্থ স্বাতন্ত্র্য থাকিলে তাহাকে দ্বিরুক্তি বলা যায়। যথা, রাম রাম, হরি হরি, ধিক্ ধিক্, হায় হায়, রে রে, আসুন আসুন ইত্যাদি।

২। মনোবৃত্তির প্রবলতা বশতঃ শব্দের একবার প্রয়োগে আক্ষেপ নিবৃত্তি না হইলে দ্বিরুক্তি বা বহূক্তি হয়। যথা, ভয়ে—সাপ সাপ, আগুণ আগুণ, পালাও পালাও। বিস্ময়ে—অ্যাঁ অ্যাঁ, দেখ দেখ, তাই ত তাই ত। ক্রোধে—মার মার, কাট কাট। ঘৃণায়—মহাভারত মহাভারত, রাম রাম, ধিক্ ধিক্। অবজ্ঞায়—ছি ছি, দুয়ো দুয়ো। দুঃখে—হায় হায়, যাই যাই। আনন্দে—বেশ বেশ, বাহবা বাহবা, সাধু সাধু। লজ্জায়—ছ্যা ছ্যা, রাম রাম। সম্বোধনে—রে রে, হে হে, পুত্র পুত্র, মা মা। আহ্বানে—আসুন আসুন, প্রত্যাখ্যানে—যাও যাও। সম্মতিতে—আচ্ছা আচ্ছা। অসম্মতিতে—না না, ইত্যাদি।

৩। মনোবৃত্তির আধিমাত্রিক প্রবলতায় বহূক্তি হয়। যথা, রে রে রে, হা হা হা, না না না ইত্যাদি।

৪। শব্দ ও বাক্যের দ্বিরুক্তি ও বহূক্তির একই সাধারণ নিয়ম। যথা, শুনিব না শুনিব না; যাব না, যাব না, যাব না ইত্যাদি।

৫। প্রতিজ্ঞা সূচক বাক্য উপর্য্যুপরি তিন বার উচ্চারণে শপথ হয়। যথা, যাব যাব যাব অর্থাৎ শপথ করিতেছি যে যাইব।

৬। মনোবৃত্তির প্রবলতাধিক্যে বাক্‌শক্তি রোধ হয় বলিয়া বাক্য অপেক্ষা শব্দের দ্বিরুক্তিতে মনোবৃত্তির অধিকতর প্রবলতা সূচিত হয়। যথা, (১) তোমাকে দেব না। (২) তোমাকে দেব না তোমাকে দেব না। (৩) দেবনা, দেবনা। (৪) না, না।

[এখানে উত্তরোত্তর মনোবৃত্তির প্রবলতার বৃদ্ধি সূচিত হইতেছে।]

দ্বিত্ব।

১। উপর্য্যুপরি ব্যবহৃত একই শব্দের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অর্থলোপ হইয়া একটি মাত্র অর্থ নিষ্পন্ন হইলে তাহাকে শব্দের দ্বিত্ব বলা যায়। যথা, ডালে ডালে ফল ধরিয়াছে।

[এখানে "ডালে ডালে" একটী দ্বিত্ব শব্দ। ইহার আদ্য ও অন্ত্য ডালে শব্দের স্বতন্ত্র অর্থ লোপ পাইয়া বহু ডালে বা প্রতি-ডালে এই অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে।]

২। গুণ, ক্রিয়া, কাল, সংখ্যা, অবস্থা নির্দ্দেশার্থে শব্দের দ্বিত্ব হয়। যথা, গুণ নির্দ্দেশার্থে—লাল লাল ফুল। ক্রিয়া নির্দ্দেশার্থে—যাইতে যাইতে দেখিও। কাল নির্দ্দেশার্থে—যখন যখন যাইবে। সংখ্যা নির্দ্দেশার্থে—এক এক জন। অবস্থা নির্দ্দেশার্থে—পরে পরে রাখ।

৩। অপ্রিয় বা সন্দিগ্ধ প্রিয়ভাব সূচনায় ও অনুরূপ অর্থে নিষ্পন্ন দ্বিত্ব শব্দে মূল শব্দের অর্থ হ্রাস হয়। যথা, অপ্রিয় সূচক—লোকটা পাগলপাগল, মাথাটা গরম গরম, গাড়ী ছাড়িল ছাড়িল। [এখানে পাগল, গরম, গাড়ী ছাড়া অপ্রিয় বলিয়া মূল শব্দের অর্থ হ্রাস হইয়াছে।]

সন্দিগ্ধ-প্রিয়—কথা শুনিলে ইহাকে পণ্ডিত পণ্ডিত বা জ্ঞানী জ্ঞানী বোধ হয় দেখিতে জোয়ান জোয়ান।

[এখানে পণ্ডিত, জ্ঞানী, জোয়ান, প্রিয় হইলেও প্রস্তাবিত ব্যক্তি সে প্রিয় গুণের আধার কি না সে বিষয়ে সন্দেহ বলিয়া দ্বিত্ব স্থলে মূল শব্দের অর্থ হ্রাস হইয়াছে।]

অনুরূপ—চোর চোর মূর্ত্তি, রাগ-রাগ দৃষ্টি, হাসি-হাসি মুখ, কান্না-কান্না সুর।

[এখানে চোর, রাগ, হাসি, কান্না অনুরূপ অর্থে দ্বিত্ব বলিয়া মূল শব্দের অর্থ হ্রাস হইয়াছে।]

৪। বর্ত্তমানে যে ক্রিয়া ঘটিলে মনের অনুকূল তাহার ঘটিবার বিলম্বের তারতম্য অনুসারে, সেই ক্রিয়াবাচক শব্দের ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালীয় রূপের দ্বিত্ব হয় এবং বিলম্ব অপ্রিয় বলিয়া মূল শব্দের হ্রাস হয়। যথা, গাড়ী ছাড়িয়াছে ছাড়িয়াছে এমন সময় দেখিলাম, গাড়ী ছাড়িল ছাড়িল এমন সময় পাইলাম, গাড়ী ছাড়িবে ছাড়িবে এমন সময় উঠিলাম।

[এখানে প্রত্যেক পরবর্ত্তী উদাহরণে বিলম্বাধিক্য সূচিত এবং বিলম্ব অপ্রিয় বলিয়া প্রত্যেক উদাহরণেই মূল শব্দের অর্থ হ্রাস হইয়াছে।]

৫। অন্য সর্ব্বত্র দ্বিত্ব শব্দে মূল শব্দের অর্থ বৃদ্ধি হয়। অর্থ বৃদ্ধি পরিমাণে, কালে ও সংখ্যায় এই তিন প্রকারে হয়। যথা, পরিমাণে—মধুর মধুর রাত্তি, মৃদু মৃদু সমীরণ, শীঘ্র শীঘ্র চল। কালে—কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাও, বলিয়া বলিয়া ক্লান্ত। সংখ্যায় —কাল কাল দাগ, বড় বড় জিনিষ, মুখে মুখে উত্তর।

৬। ব্যাপ্তি ও পৌনঃপুন্য কালে অর্থ-বৃদ্ধি এই দুই প্রকার। যথা, ব্যাপ্তি—কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাও। [এখানে ক্রন্দন ক্রিয়ার দীর্ঘতর কাল ব্যাপ্তি সূচিত।] পৌনঃপুন্য —বলিয়া বলিয়া ক্লান্ত। [এখানে বলা ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য সূচিত।]

৭। প্রত্যেকতা, বহুত্ব, সাকল্য ও পারম্পর্য্য এই চারি প্রকার সংখ্যায় অর্থবৃদ্ধি।

যথা, এক এক ঘরে চারি চারি জন। [এখানে প্রত্যেক ঘর ও প্রতি চারি জন সূচিত।] বহুত্ব—কাল কাল দাগ। [এখানে কাল দাগের বহুত্ব সূচিত।] সাকল্য—বড় বড় জিনিস। [এখানে বড় জিনিসের সাকল্য সূচিত অর্থাৎ সকল জিনিসই বড়।] পারম্পর্য্য—মুখে মুখে উত্তর। [এখানে প্রশ্নকর্ত্তা ও উত্তর-দাতার মুখের পারম্পর্য্য সূচিত।]

দ্বিত্বাভাস।

১। দ্বিত্ব হইবার সময় শব্দের রূপ বিকৃত হইলে তাহাকে দ্বিত্বাভাস বলা যায়। যথা, গাড়ী-টাড়ী, কাল-কোল ইত্যাদি।

২। দ্বিত্বাভাসের একাংশ নিরর্থক বা উভয়াংশই ধ্বন্যাত্মক হয়। যথা, পূর্ব্ব উদাহরণে 'টাড়ী' ও 'কোল' নিরর্থক। ছট্‌ফট, চটপট প্রভৃতিতে উভয় অংশই ধ্বন্যাত্মক।

৩। অর্থের বৈচিত্র্য অনুসারে দ্বিত্বাভাসের শেষাংশে আদ্যাংশের আদ্য আকার, ঋকার, ঔকার ভিন্ন স্বর ও ব্যঞ্জনের পরিবর্ত্তন হয়। যথা, লাকলিক, ফিটফাট ঝোপ-ঝাপ, বোকা-সোকা, গজর-মজর দান-টান ইত্যাদি।

৪। দ্বিত্বাভাসে স্বর ও ব্যঞ্জনের যুগপৎ পরিবর্ত্তন হয় না। প্রস্তাবে ধৃত সমুদয় দ্বিত্বাভাসই ইহার উদাহরণ।

৫। দ্বিত্বাভাসের আদ্যাংশে যাহা সূচিত হয় তাহার সহিত তাহার সজাতীয় আনুষঙ্গিক পদার্থের সমুচ্চয় সূচনায় আদ্যাংশের অ ঋ ঔ ভিন্ন স্বর শেষাংশে পরিবর্ত্তিত হয়। যথা, ডাক-ডোক, ছিট্-ছাট, কাল-কোল, গোল-গাল, ধুপ-ধাপ ঝাড়া-ঝোড়া, খোপ-খাপ ইত্যাদি।

৬। বিদ্রূপাত্মক দ্বিত্বাভাসে আদ্য আ-কার স্থানে শেষাংশে ই-কার হয়। যথা, লাট লিট, লাখ লিখ ইত্যাদি।

৭। দ্বিত্বাভাসে আদ্য আ-কারের পরবর্ত্তী স্বর উকার হইলে শেষাংশে আকার স্থানে উকার হয়। যথা, নাদুস নুদুস, গাবুর গুবুর, হাপুর হুপুর ইত্যাদি।

৮। ক্রিয়াপদের দ্বিত্বাভাসে আদ্য, আ-কার, ই-কার ও এ-কার স্থানে শেষাংশে উ-কার হয়। যথা, ডেকে ডুকে, টিপে টুপে, পেঁচিয়ে পুঁচিয়ে, ইত্যাদি।

৯। ক্রিয়াপদ হইতে নিষ্পন্ন বিশেষ্য ও বিশেষণপদের দ্বিত্বাভাসে আদ্য আ-কার ও এ-কার স্থানে শেষাংশে ও-কার হয়। যথা, সাফ সোফ, কাল কোল, ঘাঁটা ঘোঁটা, ঘেরা ঘোরা, ছেঁড়া ছোঁড়া, চেরা চোরা ইত্যাদি।

১০। অন্যত্র আকার ভিন্ন পরিবর্ত্তনশীল আদ্যস্বর স্থানে শেষাংশে আ-কার হয়। যথা, ঠিক ঠাক, ভিড় ভাড়, মিট মাট, ফুট ফাট, ঘুষ ঘাষ, টুপ টাপ, ফের ফার, বেগ বাগ, টের টার, খোপ খাপ, গোছ গাছ, থোক থাক ইত্যাদি।

১১। দ্বিত্বাভাসে তীব্র কার্য্যের কালে বৃদ্ধি সূচনায় হসন্ত বা অ-কারান্ত ধ্বন্যাত্মক আদ্য শব্দের শেষে আ-কার হয়। যথা, পটাপট, চটাচট, ঝটাঝট, গপাগপ, সপাসপ, কচাকচ ইত্যাদি।

১২। পারম্পর্য্য অর্থে দ্বিত্বাভাসে মুখ্য

শব্দের অন্ত্য স্বরের স্থানে আ-কার হয় এবং সর্ব্বশেষে ই-কার হয়। যথা, কাণাকাণি, হাতাহাতি, ঘুষাঘুষি, জড়াজড়ি ইত্যাদি।

১৩। শেষোক্ত প্রকারের দ্বিত্বাভাসে মূল শব্দের আদিতে এ-কার থাকিলে তাহার স্থানে শেষাংশে ই-কার হয়, ও-কার থাকিলে তাহার স্থানে উ-কার হয়। লেখালিখি, ঘেরাঘিরি, পেজাপিজি, লোফালুফি, হোড়াহুড়ি, খোলাখুলি ইত্যাদি।

১৪। দ্বিত্বাভাসের আদ্য বা সার্থক শব্দে যাহা সূচিত হয় তাহার সহিত সজাতীয় বিজাতীয় আনুষঙ্গিক পদার্থের সমুচ্চয় সূচনায় সার্থক বা আদ্য শব্দের ট-কার ভিন্ন আদ্য ব্যঞ্জন বর্ণ নিরর্থক বা শেষ অংশে পরিবর্ত্তিত হয়। ট-কারের পরিবর্ত্তন হয় না। যথা, গাড়ী টাড়ী, নৌকাটৌকা, টাকাটাকা, টবটব ইত্যাদি।

১৫। ট-কার আদ্য ব্যঞ্জন হইলে শব্দের রূপ হয় দ্বিত্ব, কিন্তু অর্থ হয়, দ্বিত্বাভাসের নিয়মানুগত। যথা, টাকাটাকা, টাকটাক, টকটক ইত্যাদি।

১৬। ক্রোধ, তাচ্ছীল্য প্রভৃতি নিগ্রহ রসাত্মক দ্বিত্বাভাসে শেষাংশের আদ্য ব্যঞ্জন বর্ণ হয় ফ-কার। যথা, ফেলে দে তোর কাপড়-ফাপড়, রেখে দে তোর টাকা-ফাকা, ভাত ফাত ছড়িয়েছে ইত্যাদি।

১৭। অনুকম্পা প্রভৃতি অনুগ্রহ রসাত্মক দ্বিত্বাভাসে শেষাংশের আদ্য ব্যঞ্জন বর্ণ হয় স-কার। যথা, বোকাসোকা, মোটাসোটা, রোগাসোগা, কষ্টেসষ্টে ইত্যাদি।

১৮। বিরসাত্মক দ্বিত্বাভাসে শেষাংশের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণ হয় ম-কার। যথা, চিন্তে-মিন্তে, গজরমজর, কচরমচর, কচমচ, কটমট, ঘজমজ, টলমল, কাচুমাচু, থাবড়া-মাবড়া ইত্যাদি।

১৯। গতিসূচক দ্বিত্বাভাসে শেষাংশের আদ্যস্বর হয় প-কার কিম্বা ব-কার। যথা, চটপট, ছটপট, লটপট, তড়বড়, টগবগ, ঘড়বড়, কিলবিল ইত্যাদি।

২০। বিশৃঙ্খলতা সূচক দ্বিত্বাভাসে বর্ণের বিশৃঙ্খল প্রয়োগ হয়। যথা, ইলবিল, উসখুস, উস্কখুস্ক ইত্যাদি।

দ্বিত্বগন্ধী।

১। অবিরল সন্নিবিষ্ট সার্থক, সম-মাত্রিক, অনুপ্রাসবদ্ধ বা মিত্রাক্ষর শব্দ-দ্বয়কে দ্বিত্বগন্ধী বলা যায়। যথা, চালচলন, চাঁচাছোলা, মাজাঘষা ইত্যাদি।

২। দ্বিত্ব-গন্ধী শব্দদ্বয়ের শেষ শব্দ ভাষান্তর হইতেও গৃহীত হয়। যথা, কাজ-কর্ম্ম, লজ্জাসরম, কলকৌশল ইত্যাদি।

৩। দ্বিত্বের ন্যায় দ্বিত্বগন্ধী শব্দেও প্রত্যেকের অর্থলোপ হইয়া একটি মাত্র অর্থ নিষ্পন্ন হয়। সেই নিষ্পন্ন অর্থ প্রত্যেক শব্দের অর্থের তুলনায় আধিমাত্রিক। যথা, কাজকর্ম্ম, সাজসজ্জা, বাচবিচার ইত্যাদি।*

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বরেন্দ্র-ভ্রমণ।

৩

সোণার গৌরাঙ্গ।

কুমারপুরের অনতিদূরে, পদ্মাবতী-তীরে, বরেন্দ্র তত্বানুসন্ধানসমিতির দ্বিতীয় "জয়স্কন্ধাবারের" স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাহা প্রথম "জয়স্কন্ধাবার" হইতে পাঁচ ক্রোশ মাত্র। কিন্তু প্রত্যূষে যাত্রা করিয়াও, এই পাঁচ ক্রোশ অতিক্রম করিতে মধ্যাহ্নকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল। সে দিন আকাশে মেঘ ছিল, প্রান্তর মধ্যে বায়ুপ্রবাহের অভাব ছিল না। তথাপি নানাস্থান পরিদর্শন করিতে গিয়া, সাহিত্যিকগণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এখন সে সকল স্থানে জনসংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে; কোন কোন পুরাতন জননিবাস প্রান্তর-ভূমিতেও পরিণত হইয়াছে। তথাপি তাহার সকল স্থানই ভাল করিয়া পরিদর্শন করিবার প্রয়োজন ছিল। কারণ, যাহা এক সময়ে একটি সম্পন্ন রাজনগর ছিল, তাহাই কালপ্রভাবে বহুসংখ্যক গণ্ডগ্রামে এবং নির্জ্জন প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। পলাশবাড়ীর পার্শ্বে পালপুর-ধরমপুরের পুরাতন পরিখার চিহ্ন এখনও সেকালের সেনানিবাসের অবস্থান সূচিত করিতেছে। দক্ষিণে একটি প্রান্তর এখনও "গড়খাই" নামে মানচিত্রে লিখিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকে এখন আর সে সকল স্থানের জনশ্রুতির সন্ধান প্রদান করিতে পারে না। কেবল একটি জনশ্রুতি এত কালেও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই; তাহা হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রেণীর অধিবাসীর মধ্যেই সমানভাবে প্রচলিত আছে। তাহা এই;—"এক সময়ে কুমারপুরে কুমার রাজা নামে এক রাজা বাস করিতেন; তাহার পর বিজয়নগর নামক স্থানে বিজয় রাজা নামে আর এক রাজা বাস করিয়াছিলেন। বিজয় রাজার দুই ভ্রাতা, শীতল রাজা এবং উদয় রাজা, নিকটবর্ত্তী শীতলপুরে এবং উদয়পুরে বাস করিতেন। এই সকল স্থানে তাঁহাদের রাজবাড়ীর কিছু কিছু চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।" এতক্ষণে সাহিত্যিকগণ বুঝিলেন,—দেওপাড়ায় "শীতল-সহর" নামক যে তল্লটি দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা বিজয় রাজার ভ্রাতা শীতল রাজার নামের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। তখন কৌতূহল বড় প্রবল হইল;—কুমারপুর আর কত দূরে,—সকলে পুনঃ পুনঃ সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে একটি বিস্তৃত প্রান্তরের অপর প্রান্তে কুমারপুর দেখিতে পাওয়া গেল। তাহা তখনও বহু দূরে। নিকটে, সম্মুখে, উভয়পার্শ্বে, কেবল জনশূন্য প্রান্তরভূমি, তাহার মধ্যে তল্লের পর তল্ল। এই সকল তল্ল এখন আর বঙ্গসাহিত্যে সমাদর লাভ করে না। কিন্তু একদিন ইহারাই বঙ্গকবির কল্পনাপ্রবাহে কত ভাব-তরঙ্গ সঞ্চারিত করিয়া দিত।

"প্রমুদিত চিত্ত নিরখত ঘন শ্যাম সরসী-শোভা।
নির্ম্মল পরিপূর্ণ বারি,
পীযূষভর গরবহারি,
মন্দ পবন পরশত মৃদুবীচি ভুবনলোভা॥
বিকশিত নব কুঞ্জ নিকর,
গুঞ্জত মধুমত্ত ভ্রমর,
মঞ্জু নটত খঞ্জন জনরঞ্জন অনুপামা।
সারস লস্ হংস লাখ, কিরতহি তহি চক্রবাক
ক্রৌঞ্চ-কীর-কোকিল-শিখি-কলরব অভিরামা॥
ঝলকত সর তীর অতুল,
কুসুমিত তরুবল্লী বকুল,
বলরিত জল ছলক ছাঁহ ছুটত ছবি ভারি।
অভিনব কুটি-মণ্ডপগণ,
মণ্ডিত কত বেদী রতন,
সুগঠন মণিজড়িত ঘাট লোচন-রুচিকারী॥"

কুমারপুরের উত্তরপ্রান্তে প্রান্তরের মধ্যে এইরূপ একটি "বিতত তল্ল" দেখিতে পাওয়া গেল। তাহা এখনও নির্ম্মল-বারি-পূর্ণ, এখনও মৃদুমন্দপবন সংস্পর্শে বীচিমালায় সুশোভিত। কিন্তু এখন আর তাহার তীরে "কুঞ্জনিকর" বর্ত্তমান নাই, কেবল অযত্নসম্ভূত লতাগুল্ম। তথাপি মধুলুব্ধ মধুপবৃন্দের আনন্দ-সঙ্গীত নিরস্ত হয় নাই, তাহার সহিত তাল রক্ষা করিয়া এখনও—"মঞ্জু নটত খঞ্জন জনরঞ্জন অনুপামা।" ঘাট নাই, ঘাটের মণিজড়িত সুগঠনের চিহ্নমাত্রও বর্ত্তমান নাই; তাহার প্রয়োজন পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। কারণ, এখন আর ইহাতে কে অবগাহন করিতে আসিবে? এখন কেবল কুম্ভীরগণ নিঃশঙ্কচিত্তে সঞ্চারণ করিয়া বেড়াইতেছে! এই তল্লের দক্ষিণতীরে একটি দেবমন্দির ছিল। এখন তাহার চিহ্ন না থাকিলেও, সেখানে একটি "থান" আছে;—তাহা বাশুলী দেবীর "থান",—তাহার উপর এখনও বর্ষে বর্ষে পূজা হইয়া থাকে। উড়িষ্যার নাল্তিগিরি-শিখরে যে বাশুলী-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে বৌদ্ধপ্রভাব অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। কুমার-পুরের বাশুলী-মন্দিরও কি সেইরূপ ছিল? গ্রামের নাম কুমারপুর, দেবীর নাম বাশুলী দেবী, রাজার নাম কুমার রাজা,—এ সকল কি পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপাল কুমার পালকে সূচিত করিতেছে না? কুমার রাজার পরে যে বিজয় রাজার আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনিই কি সেনরাজ-বংশের বিজয়ী বিজয় সেন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন না? দেওপাড়ার প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হইবার পর এ সকল প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর ভিন্ন দ্বিতীয় উত্তর প্রদত্ত হইতে পারে না। এই সেই পুরাতন রাজনগর,—কুমার পালের শেষ আশ্রয়স্থান—সেনরাজ বংশের প্রথম রাজধানী। ইহার কথা ব্যক্ত করিবার জন্যই বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন স্বকৃত "দান-সাগর" গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন;—

"তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীদ্বরেন্দ্রে।"

কোন্ গ্রামের পর কোন্ গ্রাম পরিদর্শন করিতে হইবে, তাহা যেরূপ কৌশলে স্থিরী-কৃত হইয়াছিল, তাহাতে এই সকল ভৌগোলিকতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে কাহাকেও আয়াস স্বীকার করিতে হইল না। কুমার-পুরে প্রবেশ করিবামাত্র প্রাসাদ-শিলার এবং প্রতিমা-শিলার সন্ধান লাভ করিয়া, সাহিত্যিকগণ জনশ্রুতিকে "নহ্যমূলা"

বলিয়াই স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। গ্রামের মধ্যে একটি স্থান সমধিক উচ্চ; তাহার পার্শ্বে পুরাতন পরিখা-চিহ্ন, উপরে বিজন বন, তাহার মধ্যে ব্যাঘ্রের আশ্রয়স্থান। তাহার অনতিদূরে অনেক জরাজীর্ণ দেব-মন্দির; এক স্থানে একটি ক্ষুদ্র সরোবর-তীরে চারিটি শিবমন্দির বৃক্ষমূলে জড়িত হইয়া কোনরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তাহার নিকটে নানা বৃক্ষমূলে দেবদেবীর পাষাণমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। পদ্মাবতী-তীরে উচ্চভূমিখণ্ডের উপর কুমার-পুর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। নদী সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু যেখানে তাহার পুরাতন খাত বর্ত্তমান ছিল, তাহা এখনও "খাড়ি জগাতি" নামে কথিত হইতেছে। তাহার ধার দিয়া আধুনিক রাজপথ গোদাগাড়ী অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। তাহার পার্শ্বে, একটি উচ্চভূমির উপর, এক প্রস্তরমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কৃত করিয়া, জনৈক সম্পন্ন মুসলমান আমীর এক সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও কুমারপুরকে কৌতূহলের আধার করিয়া রাখিয়াছে।

হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট থাকিয়া সাহিত্যিকগণ এই সকল পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন দর্শন করিতে করিতে, পদ্মাতীরে উপনীত হইলেন। পদ্মা বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে; সৈকতভূমি সাহারার মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতেছে! তাহার উপরে যে উচ্চ তট, তাহাতে অলিপুর নামে একটি গ্রাম বসিয়াছে। সেখানে এক হিন্দু ভূস্বামীর কাছারীবাড়ীর পার্শ্বে শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল। ভূস্বামী অশীতিপর, চিররুগ্ন, প্রায় চলচ্ছক্তিহীন; তিনি বহুদূরে বাস করেন। তথাপি সাহিত্যিকগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্বয়ং শিবিরে আসিয়া অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। তাঁহার কাছারীবাড়ীর সম্মুখে কদলীতোরণ, মঙ্গলঘট, লোকারণ্য। কিন্তু তখন শিষ্টাচারের সময় অতীত হইয়া গিয়াছিল;—ধৈর্য্যের সীমাও অতিক্রান্ত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। অগত্যা সাহিত্যিকগণ স্নানাহারে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন।

এক সময়ে সমগ্র বঙ্গভূমির প্রাণ বরেন্দ্র-ভূমির এই নিভৃত প্রদেশেই স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কথা বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সাহিত্যকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে। "জয়স্কন্ধাবারের" অনতিদূরে—সেকালের পদ্মাবতী-তীরে—গোপালপুর নামক স্থানে একটি রাজধানী ছিল। এখনও রাজপথ-পার্শ্বে বনভূমির মধ্যে তাহার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। একখানি সংস্কৃত নাটকে সেই রাজধানীর নাম উল্লিখিত আছে। গোবিন্দ কবিরাজ "সঙ্গীত-মাধব" নাটকের প্রস্তাবনায় লিখিয়া গিয়াছেন,—

"পদ্মাবতীতীরবর্ত্তি-গোপালপুর নগর-বাসি-গৌড়াধিরাজমহামাত্য-শ্রীপুরুষোত্তমদত্ত সপ্তমতনুজঃ শ্রীসন্তোষদত্তঃ। স হি শ্রী-নরোত্তমদত্তসপ্তম-মহাশয়ানাং কনীয়ান্ যঃ পিতৃব্যভ্রাতৃশিষ্যঃ। তেন চ শ্রীরাধামাধ-বয়োঃ প্রকট লীলানুসারেণ লৌকিকরীত্যা পূর্ব্বরাগাদিবিলাসার্হং সঙ্গীতমাধবং নাটকং বিরচয্য নানারত্নাদিদানেন নাম্না পুরস্কৃত্য সমর্পিতোঽস্তি॥"

গৌড়াধিপালের মহামাত্য পুরুষোত্তম দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র ভক্ত কবি নরোত্তম দত্ত বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত; বৈষ্ণবসমাজে মহাজনরূপে সুপূজিত। তিনি বঙ্গসাহিত্যের অদ্বিতীয় আশ্রয়দাতা ছিলেন। তাঁহার সাধুজীবন নিরন্তর ধর্ম্মপ্রচারেই অতিবাহিত হইয়াছিল। রাজ্যভোগে জলাঞ্জলি দিয়া, আকুমার ব্রহ্মচারী নরোত্তম দাস কিরূপে ভক্তিমন্ত্রের প্রচারকামনায় আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা নরহরি-বিরচিত সুবিখ্যাত "ভক্তিরত্নাকরে" সংক্ষেপে এবং "নরোত্তমবিলাসে" বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। তাঁহার অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ-কাহিনী মহাকবি বসন্তের একটি গীতে এখনও কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

"প্রভু নরোত্তম গুণনিধি॥
কনক কমল জিনি, সুকোমল তনুখানি,
না জানি গড়িল কোন্ বিধি॥
গোরা-প্রেমে মত্ত হৈয়া, রাজ্যভোগ তেয়াগিয়া,
পরম আনন্দ বৃন্দাবনে;—
পাইয়া অমূল্য ধন, কৈলা আত্মসমর্পণ,
প্রভু লোকনাথের চরণে॥
কৃপা করি লোকনাথ, করিলেন আত্মসাৎ,
হইল গমন গৌড়দেশ;—
শ্রীগৌড় ভ্রমণ করি, গিয়া নীলাচলপুরী,
পুন গৌড়ে করিলা প্রবেশ॥
প্রভু পরিকর যত, অনুগ্রহ কৈল কত,
কি অদ্ভুত গীত প্রকাশিলা;—
এ দাস বসন্ত ভণে, পাষণ্ড অসুরগণে,
করুণা করিয়া উদ্ধারিলা॥"

ইহাই সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী,—অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ-কাহিনী,—অনির্ব্বচনীয় প্রেমভক্তি-কাহিনী,—অলৌকিক পতিতোদ্ধার-কাহিনী। তাহা এখনও শতকণ্ঠে গীত হইয়া থাকে, জয়কন্ধাবারের অনতিদূরে সেই পুণ্যতপোবন, যেখানে এই মানবপ্রীতি এবং দেবপ্রীতি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার নাম খেতরি,—বৈষ্ণবসমাজের এবং বঙ্গসাহিত্যের চিরস্মরণীয় তীর্থক্ষেত্র। সেখানে এখনও বর্ষে বর্ষে মেলা বসিয়া থাকে। নরোত্তমের যত্নে রাজা সন্তোষদত্তের আশ্রয়ে এই তীর্থক্ষেত্রে প্রথম "বৈষ্ণবমহাধিবেশন" সুসম্পন্ন হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে প্রথম মহাধিবেশনের স্থান বলিয়া সপ্তপর্ণী-গুহা যেরূপ সুপরিচিত, বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাসে খেতরি গ্রামও সেইরূপ। এখানে নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের "সোণার গৌরাঙ্গ" এখনও প্রতিদিন অর্চ্চিত হইতেছেন। সুতরাং সাহিত্যিকগণ অপরাহ্নে সেই তীর্থক্ষেত্র দর্শন করিতে বহির্গত হইলেন।

তখনও হোরীর দিন অতীত হইয়া যায় নাই। সে নিভৃত নিকেতনে আবীর-কুঙ্কুম "চড়াইবার" লোক বড় অধিক না থাকিলেও মহাপ্রভু তখনও হোরার বেশেই বিরাজ করিতেছিলেন। শ্রীবিগ্রহ অলিন্দে আসিয়া আবীর গ্রহণ করিলেন;—প্রাঙ্গণ, অলিন্দ এবং শ্রীমূর্ত্তি লালে লাল হইয়া গেল। খোল ছিল না, করতাল ছিল না, সংকীর্ত্তন ছিল না;—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল, দিবসের শেষ আলোকরেখাও ধীরে ধীরে অপসৃত হইতেছিল,—তথাপি সে নীরব হোরী যেন সরবে গর্জ্জন করিয়া গাহিয়া উঠিতেছিল;—

'আজু পরম রঙ্গে হরষে শ্যাম রসিকরাজ।
বেশ বিরচি বিলসত নব কুঞ্জভবনমাঝ॥
ললিতাদলিতাঞ্জনজল
নাগর শিরে ঢালি;—
হো! হো! হো! হরি উচরি,
বিরচই করতালি॥

সাহিত্যিকগণ খেতরি ছাড়িয়া, প্রেমতলি পার হইয়া, শিবিরের দিকে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই, আকাশ একেবারে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল; কোনরূপে শিবিরে উপনীত হইতে না হইতে, ঝড় উঠিয়া পড়িল! বৃষ্টি নাই কেবল ঝড়,—পদ্মাতীরের প্রবল ঝড়,—তাহাতে বালুকারাশি সবলে শিবির আক্রমণ করায়, সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পট্টাবাসগুলি যায় যায় হইয়া উঠিল; দড়াদড়ি ধরিয়া কায়ক্লেশে শিবির রক্ষা করিতে গিয়া, কেহ কেহ বিলক্ষণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন। ঝড় থামিয়া গেলে, আবার আকাশ পরিষ্কৃত হইল, আবার চন্দ্রমা বিলসিত হইল, আবার পদ্মাতীর শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, নূতন শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু রজনী বড় নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইল না! শিবিরে ফিরিবার সময়ে শিবিরের অনতিদূরে একটি ঝোপের মধ্যে অনেকগুলি জোনাকী এক সঙ্গে ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। হস্তীগুলি তাহার নিকটে আসিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া আকাশে শুঁড় উঠাইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ঝোপ নড়িয়া উঠিল, খদ্যোৎপুঞ্জ সচল হইল,—যাঁহাদের দৃষ্টি প্রখর ছিল, তাঁহারা দেখিলেন ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় সাহিত্যাচার্য্যগণকে বিনা বিবাদে পথ ছাড়িয়া দিয়া গভীর বনে প্রবেশ লাভ করিলেন, বরেন্দ্রে এরূপ ঘটনা অসাধারণ বলিয়া পরিচিত নয়। সুতরাং পট্টাবাসে রাত্রিযাপন করিতে হইলে, আগ্নেয়াস্ত্র নিকটে রাখিবারই ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহাতেও সকল সময়ে সম্পূর্ণরূপে উদ্বেগ দূর হয় না।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

খাদ্য ও রন্ধন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশস্ত নিয়ম।

১। সারা জীবজগতে খাদ্যের অভিব্যক্তি দেখিলে বুঝা যায়, খাদ্যের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই জীবের অভিব্যক্তি চলিতেছে। উচ্চশ্রেণীর জীবেরা অবয়বের অল্প আয়তনে অধিক সারাল দ্রব্য খায়। উন্নতিশীল মানুষের মধ্যেও সেইরূপ দেখা যায় এবং সকলেরই সেইরূপই কর্ত্তব্য।

২। খাদ্য যত শুকনা অবস্থায় খাওয়া যায়, হজম ততই সহজে হইয়া থাকে। তবে কখন বেশী জলীয় পদার্থের সহিত খাইলে খাদ্যে হজমের সার রস ভাল করিয়া মিশিতে পারে না।

৩। অনেক শ্রেণীর খাদ্য আছে। মাংস বা ছানা জাতীয়—মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, ছানা। তৈল জাতীয়—তেল, ঘী। শ্বেতসার জাতীয়—ভাত, তরকারী। চিনি জাতীয়—চিনি, গুড়। এ সবগুলিতেই অল্প অনেক

জাতীয় খাদ্য আছে, কিন্তু যেটি দিয়া লক্ষ্য করা হইয়াছে সেইটিই প্রধান উপকরণ।

৪। শরীরে বিভিন্ন জাতীয় খাদ্যগুলির ভিন্ন ভিন্ন কাজ। প্রথম বয়সে অর্থাৎ বাল্যাবস্থায় শরীর দিন দিন বাড়ে বলিয়া মাংস বা ছানা জাতীয় খাদ্য অর্থাৎ যাহারা শরীরসত্তার সাহায্য করে তাহারা এই সময়ে প্রশস্ত। মধ্য বয়সে অর্থাৎ যৌবনে বা যে বয়সে খাটিয়া খাইতে হয়, সে বয়সে তৈল, ঘী জাতীয় খাদ্যই বেশী আবশ্যক, কারণ তাহারা শরীরে শক্তি দেয়। আর বার্দ্ধক্যে সামান্য শ্বেতসার জাতীয় আহারই ভাল। কারণ অল্প আয়তনে তাহারা নিরুপদ্রব।

৫। ছেলে বয়সে অতি আহার তত ক্ষতিকর নহে, অনাহার বা অল্পাহার বড়ই ক্ষতিকর। কারণ তাহাতে শরীরে রীতিমত বৃদ্ধির ব্যাঘাত হয়। বৃদ্ধ বয়সে অতি আহার অত্যন্ত হানিকর, স্বল্পাহারে তত ক্ষতি হয় না।

৬। উদ্ভিজ্জ খাদ্য, যথা ভাত, ডাল, বেশী আঁচে রাঁধা ও প্রাণীজ খাদ্য যথা মাছ মাংস, কম আঁচে রাঁধা ভাল। তবে সকল রাঁধায় মধ্যম আঁচে অনেকক্ষণ ধরিয়া রাঁধা প্রশস্ত। বাষ্পে রান্না জলে সিদ্ধ করা অপেক্ষা অনেক ভাল, সাধারণ সুতার ও সুপাচ্য থাকে।

৭। রাঁধিবার প্রধান উদ্দেশ্য যাতে খাদ্য সুসিদ্ধ, নরম ও সুপাচ্য হয়। সুতার করিবার জন্য তার পরে ব্যবস্থা করা ভাল। খাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই সুতার ও সুগন্ধ করিলে সে গুলি যত বিদ্যমান থাকে অনেক আগে করিলে ততটা থাকে না। ঠিক এই সময়েই তাই সাঁতলাবার ও মসলা দিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

৮। সদ্য রাঁধা ও সদ্য সাঁতলান জাতীয় খাদ্য অতি উপাদেয় ও সহজে হজম হয়। বাসী খাবার ঠাণ্ডা হওয়ার পর আবার গরম করিলে তেমনটি হয় না।

৯। গরম আহার ও সুতার সুগন্ধ আহার সুহজমের জন্য বড়ই ভাল।

১০। আহারের পূর্ব্বে ও পরে খানিকক্ষণ করিয়া বিশ্রাম করিবে। কিন্তু অব্যবহিত পরেই দীর্ঘ নিদ্রা দিও না।

১১। আস্তে আস্তে ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইলে অনেক সহজে খাদ্য হজম হয়। নিয়ত তাড়াতাড়ি খাইলে হজম না হইয়া কতক উৎপাতও করিয়া খাদ্যগুলি আস্ত বাহির হইয়া যায়।

১২। আহারের সময় সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত মনে ও ভাল লোকের সঙ্গে সদালাপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে খাওয়া প্রশস্ত।

১৩। আহারের সময়ে তিন-চারিটি তরকারী ছাড়া আর বেশী খাওয়া বিধেয় নয়।

১৪। দৈনিক আহারের পর দিনের কাজ থাকে বলিয়া, তাড়াতাড়ি হয় বলিয়া, ও ভারী পেটে গুরুতর কাজ করাও ক্ষতিকর বলিয়া সে সময়ে হালকা আহার করিবে। দিনান্তে অবসরের সময় সন্ধ্যার আহারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

১৫। সচরাচর অল্পবিস্তর চারবার আহার করাই ভাল। অল্প অল্প অনেক বারে খাইলে একেবারে গুরু আহার অপেক্ষা অনেক সহজে হজম হয়।

১৬। প্রাতে উঠিয়াই সামান্য কিছু খাওয়া চাই; গরম তরল পদার্থই এই সময়ের পক্ষে উপকারী। পূর্ব্বাহ্ণের আহার যেন তত বেশী গুরুতর না হয়। অপরাহ্ণের আহারে কিছু ফল থাকিলে ভাল হয়, আর সে আহারটিও সামান্য হওয়া চাই। সন্ধ্যার আহার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর হইলে ক্ষতি নাই। কারণ তখন অবসর ও বিশ্রামের সময় বলিয়া সকল শক্তি হজম-কার্য্যেই ব্যয়িত হয়। তবে বেশী রাত করিয়া গুরু আহার ভাল নয়। শুইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে অল্প তরল পদার্থ পান করা ভাল।

১৭। গুরু আহারের সময় বেশী জল বা অন্য তরল পদার্থ পান করিও না। খালি পেটে বা আহারের অনেকক্ষণ পূর্ব্বে ও পরে জলপান করা ভাল। তাহাতে হজমের সাহায্য করে ও পেট ধোবার মত কাজ হয় ও দাস্ত পরিষ্কার থাকে।

১৮। আহার্য্য সামগ্রী ও ভোজনের প্রথা মাঝে মাঝে বদলান চাই। তাতে আহারে স্পৃহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

১৯। সপ্তাহে এক দিন কতকটা উপ-বাসের মত কম খাওয়া ভাল। তাতে অনেক হিত সাধন হয়। যথা আমাদের শরীরের হজমের যন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্রগুলি বিশ্রাম পায়। বাড়ীর মেয়েরা একটু বিশ্রাম পান; ঝি চাকরেরা ও একটু অবসর পায়। সেদিন পূর্ব্ব দিনের রক্ষিত সামান্য আহার করিবে। কেমন করে খাদ্য কিছুদিন রক্ষা করিতে পারা যায়, সে শিক্ষাও হয়। সেটি বড় দরকারী শিক্ষা। সকল কৃতবিদ্য জাতিই সেই শাস্ত্রে পারগ। তাই তাঁহারা এত কাজ করিতে অবসর পান ও এত দেশ-বিদেশে যাইতে ও থাকিতে পারেন।

২০। আবার মাঝে মাঝে পাঁচ জনে একত্র মিলিয়া আমোদ করিয়া বাড়ীতে বা বনভোজনে নিজেরা রাঁধিয়া আহার করিবে, তাতে স্থান পরিবর্ত্তন ও আহার ও চিন্তার পরিবর্ত্তন এবং রান্না শিক্ষাও হয়। অনেক দিন এক ভাবে এক অবস্থায় থাকিলে মানুষের অধোগতি অনিবার্য্য।

২১। প্রতি আনন্দের কার্য্যে বাড়ীর ছেলে মেয়েদের সর্ব্বদা সঙ্গে নিও। এ কথায় যেন কখনও অন্যথা না হয়। কখন তাহাদের সঙ্গে একত্রে আনন্দ উপভোগ করিলে তোমার শরীর মনে যেরূপ উন্নতি হইবে ও তুমি যেরূপ বিমল আনন্দ পাইবে, বিশ্বসংসারে তেমন আর কোথাও পাইবে না।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

সমাজ-বন্ধন।

ছোট জিনিস—যাহা আমাদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে না এবং চক্ষুকে ঝলসিত করিয়া দেয় না—তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। সেই জন্য কোন ছোট কাজ করিতে আমাদের উৎসাহ জন্মে না। বড় কাজ করিতে না পারি সেও ভাল, বড় কাজ করিবার আয়োজন মাত্রেই আমাদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হইয়া যায়

সেও ভাল, তথাপি যাহা ক্ষুদ্র যাহা লোক-চক্ষুর অন্তরালে নীরবে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার প্রতি আস্থা আমাদের নাই। প্রকাণ্ড কল্পনা এবং অননুকরণীয় আদর্শ লইয়া আমরা সন্তুষ্ট, কিন্তু ছোট ছোট বিষয় লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে আমরা প্রস্তুত নহি। আমরা একেবারে এক মহান্ ভারতীয় জাতি গড়িয়া তুলিতে প্রস্তুত, ইংলণ্ডের জনসাধারণকে ভারতসম্বন্ধে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে প্রস্তুত, কিন্তু সমাজের আশ্রয় লইয়া ছোট ছোট কার্য্যের দ্বারা সমাজকে বলবান করিতে এবং নিজেদেরও সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে আমাদের আগ্রহমাত্র নাই! যদি সমাজেরই উন্নতি করিতে হয় ত একেবারে আমূল সংশোধনের দ্বারা প্রচণ্ড বিপ্লবের দ্বারা, নূতন মতবাদের দ্বারা একেবারে আদর্শ স্বদেশীসমাজ গড়িয়া তোলা হউক। ছোট ছোট পল্লী লইয়া ছোট ছোট জনসঙ্ঘ লইয়া ছোট কাজ আরম্ভ করিয়া দেওয়া—তাহাতে কাহারও সহানুভূতি দেখা যায় না।

কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় এ সকল ব্যাপারে ছোট হইতে বড়তে যাওয়াই সমীচিন পন্থা—বড় হইতে ছোটতে আসা নহে।

সকল সভ্যজাতিরই ব্যক্তিগত শক্তিপুঞ্জের কেন্দ্র—সমাজ। সুতরাং সমাজ সুদৃঢ় না হইলে জাতীয় শক্তির বৃদ্ধি হয় না। রাশীকৃত বিক্ষিপ্ত শক্তিপুঞ্জ বৃথা অপব্যয়িত হয়।

আবার সমাজকে দৃঢ় করিবার উপায় সমাজের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির বৃদ্ধি সাধন। সমাজ যদি তাহার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের সুখ-দুঃখের প্রতি উদাসীন হয়, তাহাদের উন্নতি অবনতি যদি সমাজের অতন্দ্রিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ না করে, তাহা হইলে সমাজের প্রতি কাহারও সমবেদনা বা শ্রদ্ধার ভাব আসিতে পারে না। সমাজের প্রতি সমাজস্থ জনসাধারণের যেমন একটা কর্ত্তব্য আছে, সমাজস্থ ব্যক্তিবৃন্দের প্রতি সমাজেরও তেমনি একটা কর্ত্তব্য আছে। যে কোন পক্ষের কর্ত্তব্যচ্যুতিই জাতীয় উন্নতির পথে বিঘ্নকর।

আজ আমরা আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া নিজেদের বিক্ষিপ্ত শক্তিপুঞ্জকে সংহত করিতে গিয়া দেখিতেছি আমাদের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত শক্তিরাশির কোন কেন্দ্র নাই। সমাজ একেবারে শক্তিহীন। এখন সমাজ-শাসন বলিয়া কোন একটা শাসনই বিদ্যমান নাই। সমাজের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইতে কেহই আগ্রহান্বিত নহে। ইহার কারণ কেবল সামাজিকবর্গের ত্রুটি নহে—সমাজেরও ত্রুটি।

সমাজ জনসাধারণের সুখ দুঃখ, উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপে বাঙ্গালা-দেশে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইতেছে পানীয় জলের অভাবে সহস্র সহস্র লোক হাহাকার করিতেছে, সমাজ সে বিষয়ে উদাসীন।

বিবাহের জটিল সমস্যা প্রতিদিন দরিদ্র ভদ্রসন্তানের বুকের উপর চাপিয়া বসিতেছে —কন্যাদায়ের ভীষণ বিভীষিকা দেশের

সর্ব্বত্র আতঙ্ক বিস্তার করিতেছে, সমাজ সে সম্বন্ধে দৃষ্টিহীন।

মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তান লেখাপড়া শিখিয়াও অন্নসংস্থানে অসমর্থ—বিকট মৃত্যু তাহার শিরপ্রান্তে দিবারাত্রি লোলুপনেত্রে চাহিয়া বসিয়া আছে—সে জন্য সমাজের উদ্বেগ নাই।

অনাথ সন্তান, যোত্রহীনা বিধবা আশ্রয়-হীন হইয়া পথের ধুলিতে শয্যা রচনা করি-তেছে—শিক্ষার অভাবে নরসন্তান দিন দিন পশুত্বের সোপানে অবতীর্ণ হইতেছে—কিন্তু সমাজ সে জন্য বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠিত নহে।

এরূপ সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, সমবেদনা কিরূপে সম্ভব?

জাতিকে শক্তিশালী করিতে গেলে সমাজকে সুদৃঢ় করার প্রয়োজন, সমাজকে সুদৃঢ় করিতে হইলে সামাজিকবৃন্দের সুখ-দুঃখের প্রতি সমাজকে অবহিত করা আবশ্যক।

কি উপায়ে এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে? অতিরিক্ত সমারোহের সহিত একটা প্রকাণ্ড কার্য্যারম্ভ করিয়া দেওয়ার প্রতি আমাদের সহানুভূতি নাই। আমাদের মতে সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে ক্ষুদ্র ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া অধিকতর ফলপ্রদ। সমাজের প্রতি ক্ষুদ্র অংশই সমাজের অঙ্গ। সুতরাং এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়াই সমাজ-শরীরে শক্তিসঞ্চারের স্বাভাবিক পন্থা।

সমাজ ব্যক্তিবৃন্দের সমষ্টি মাত্র। সুতরাং সমাজের উপর একটা কাল্পনিক গৌরব ও মহত্বের আরোপ করিয়া আমার বক্তব্যকে কবিত্বপূর্ণ করিয়া তুলিবার ইচ্ছা আমাদের নাই।

সমাজের পক্ষ হইতে কার্য্য অর্থে সমাজের শীর্ষস্থানীয় কতকগুলি লোকের কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন দেশেই কোন সামাজিক কার্য্য সমাজের আপামর প্রত্যেকের মত লইয়া সাধিত হয় না। কতকগুলি শীর্ষস্থানীয় লোক লইয়াই সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

প্রত্যেক গ্রামে বা প্রত্যেক নগরেই কতকগুলি লোক এমন আছেন যাঁহাদের সকলে সম্মান করে এবং যাঁহাদের কথা সকলে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করে। সেই সকল লোকই সেই গ্রাম বা নগরের সমাজের প্রতিনিধি।

সুতরাং এই সকল ব্যক্তি যদি আপন ক্ষুদ্র সমাজস্থ ব্যক্তিবৃন্দের সুখ-দুঃখের প্রতি অবহিত হন,—যদি সেই গ্রামের লোকদের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে তাহার সুস্থতা প্রাপ্তির উপায় করিয়া দেন,—এবং ভবিষ্যতে যেরূপে শারীরিক নিয়ম পালন করিলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা তিরোহিত হইতে পারে তাহা জানাইয়া দেন—সে গ্রামে কাহারও কন্যাদায় উপস্থিত হইলে সে যাহাতে সে দায় হইতে উদ্ধার পাইতে পারে সে জন্য আগ্রহান্বিত হন—সে গ্রামের নিরাশ্রয় বিধবার যদি অন্নসংস্থানের উপায় করিয়া দেন—সে গ্রামে কাহারও জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় না থাকিলে তাহাদের জীবিকার উপায় নির্দ্দিষ্ট করিতে যদি যত্নবান হন—তাহা

হইলে সেখানে সমাজের বন্ধন নিশ্চয়ই সুদৃঢ় হয়।

মানুষ স্বভাবত কৃতজ্ঞ এবং মনুষ্যত্বের পূজাপরায়ণ। মহাপুরুষগণের দ্রুত সংগৃহীত শিষ্যসংখ্যা তাহার প্রমাণ।

সুতরাং যদি কেহ ত্যাগ স্বীকার করিয়া কাহারও উপকার করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি উপকৃত ব্যক্তি কৃতজ্ঞ হইবেই এবং এই কৃতজ্ঞতাই তাঁহাকে তাহার উপর শক্তিদান করিবে। এই অর্জ্জিত শক্তি সমাজকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবে।

তবে ইহার মধ্যে কথা এই যে, যে সকল সামাজিক এইরূপে শক্তি অর্জ্জন করিবেন তাঁহারা অকপটে সে শক্তি সমাজকেই দান করিবেন—নিজের স্বার্থচিন্তা তাহার মধ্যে রাখিবেন না। এই কারণে ধীরে ধীরে সমাজস্থ জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবেন, এবং কোন সামাজিক কল্যাণের কার্য্য কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায়, নিজের পরিশ্রমে ও নিজের ব্যয়ে সম্পন্ন না করিয়া সে জন্য সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন এবং সে কার্য্য যে সকলেরই কার্য্য, ইহা সকলকে বুঝাইয়া দিবেন।

ইহার জন্য সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া পল্লীভাণ্ডার স্থাপিত করাই সদুপায়। সেই ভাণ্ডার হইতে সামাজিক-বৃন্দের অভাবমোচনের জন্য অর্থসাহায্য প্রদত্ত হইবে এবং সাহায্য-প্রদানের পূর্ব্বে যথাসম্ভব সকলের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

এইরূপ কার্য্য আরম্ভ করিলে সহজেই সমাজকে সামাজিকবৃন্দের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অধিকারী করিয়া তোলা যাইতে পারে। কারণ সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে কার্য্যকে প্রত্যক্ষীভূত করিয়া তোলা অল্পায়াসসাধ্য।

এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজে শক্তি সঞ্চারিত হইলে সকলকে মিলাইয়া বৃহৎ সমাজ গঠিত করিয়া তোলা কঠিন হইবে না।

একটা প্রকাণ্ড মহান্ আদর্শ জাতির সম্মুখে থাকা কল্যাণকর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার বোধ হয় ছোট আদর্শের মধ্য দিয়া বৃহৎ আদর্শে পৌঁছানই স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য। জাতীয় উন্নতির এক প্রধান অঙ্গ—জাতীয় শিক্ষার বিস্তার। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে কার্য্য আরম্ভ হইলে লোক-শিক্ষাও অল্প সময়ের মধ্যে সংসাধিত হইবার সম্ভাবনা।

একটা উদাহরণ দিতেছি। আজিকার দিনে ভারতে না হউক বাঙ্গালাদেশের একটি অতি প্রধান সমস্যা—হিন্দুমুসলমানের বিরোধ; বাঙ্গালার লোকসংখ্যার অর্দ্ধেক মুসলমান, অর্দ্ধেক হিন্দু।

সুতরাং বাঙ্গালাদেশে এই বিরোধ বিদূরিত না হইলে বাঙ্গালার উন্নতি অসম্ভব। কংগ্রেসে, সভায়, সংবাদপত্রে এই বিরোধ বিদূরিত করিবার নানা উপায়ের কথা আলোচিত হইতেছে। কিন্তু যাহাদের লইয়া প্রকৃত বিরোধ এই সকল সভাসমিতি তাহাদের স্পর্শ করে না। বিরোধ অধিকাংশ স্থলে উভয় জাতিরই নিম্নশ্রেণী এবং অশিক্ষিতের মধ্যে। শিক্ষার বিস্তারই এই বিরোধ-ভঞ্জনের প্রকৃষ্ট উপায়। যদি প্রতি পল্লী-গ্রামে এইরূপে উভয় সম্প্রদায়ের অগ্রণীগণের

মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয় এবং তাঁহারা নিজ নিজ সমাজে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন তাহা হইলে এই বিরোধ যত অচিরে দুরীভূত হইবে—কংগ্রেসে, সংবাদপত্রে, প্রতিনিধিনিয়োগে তত শীঘ্র হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

বড় কাজের আদর্শ লইয়া আমরা অনেক কালক্ষয় করিয়াছি, ছোট কাজের আরম্ভ করিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হানি কি?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

সূর্য্যমুখী।

বিষবৃক্ষের প্রধান চিত্র সূর্য্যমুখী। হিন্দুপত্নীর এ আদর্শ হিন্দুর নিকট নূতন নহে, তথাপি কবিকল্পনা ও প্রতিভা ব্যতিরেকে আদর্শ এরূপে অবয়বসম্পন্ন, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, এবং চিত্রার্পিত হইত না। মানুষের স্থূল ধারণাকে ব্যষ্টিভাবে, গুণানুভূতিকে সমষ্টি ভাবে, আধারগত ভাবে, ধ্যানের যোগ্য করিয়া, তাহাকে আকার প্রদানেও, কবির ক্ষমতার পরিচয় এবং সে ক্ষমতা যেরূপে এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে তাহাকে অসাধারণ বলিতে হইবে। সাবিত্রী ও সীতা সতীর আদর্শরূপে হিন্দুসমাজে পরিচিত। সাবিত্রী পৌরাণিক, পৌরাণিক দেবদেবীর ন্যায় পূজিতা না হইলেও, হিন্দুরমণীর নিকট বিশেষ সমাদৃতা। সীতা কেবল সমাদৃতা নহেন, জগৎলক্ষ্মীরূপে, ভগবানের অবতার রামের অর্দ্ধাঙ্গভাবে, কেবল হিন্দুরমণীর নহে, হিন্দুমাত্রেরই পূজিতা। সাবিত্রী বা সীতা, কাহাকেও কাল্পনিক চরিত্র বলিয়া হিন্দু বিশ্বাস করে না। সূর্য্যমুখী আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের চিত্র, পৌরাণিকত্বের গৌরববিহীনা মানবী, তাহাও আবার প্রকৃতাস্তিত্বের আখ্যানগতা নহেন। সাবিত্রী সতীত্বের বলে যমের নিকট মৃত পতির জীবন ফিরাইয়া পাইয়াছিলেন, হিন্দুরমণী স্বামীর জীবনে ভাগ্যবতী, বৈধব্য তাহার নিকট ভাগ্যহীনতার শেষাবস্থা, তাই হিন্দুরমণী সাবিত্রীব্রত গ্রহণ করে। রমণীর নিকট সাবিত্রীর যেরূপ প্রভাব, পুরুষের নিকট সেরূপ নহে। সীতা জগৎলক্ষ্মীরূপে স্ত্রীপুরুষ সকলেরই আরাধ্যা। পত্নীত্বের আদর্শরূপেও সীতার আদর্শ কম সমাদরের নহে। সীতার সে সমাদর সাহিত্যজ্ঞের নিকটেই বিশেষভাবে, সকলের নিকট তুল্যরূপে নহে। সাবিত্রী মূলে সাহিত্যের চরিত্ররূপে পরিচিতই নহে। এখন সাবিত্রীর পৌরাণিকত্ব, সীতার দেবতার অবতাররূপিণীত্ব বাদ দিয়া, যদি সাবিত্রী, সীতা, ও সূর্য্যমুখী, তিনকেই কল্পিতচরিত্র ও আদর্শভাবে তুলনা করা যায়, কাহাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতে হইবে, বলা সহজ নহে। সাবিত্রীর সতীত্বের বলে যে মহদদৃষ্ট লাভ হইয়াছিল, তাহাই সকলের নিকট বিদিত; পত্নীত্বের, বিশেষ পতিভক্তি ও পতিসেবার কার্য্য কি তাঁহার জীবনকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল, তাহা আমরা অবগত

নহি, বা আমরা সেরূপ কিছুর সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া সাবিত্রী-চরিত্রের ধ্যান করি না। জগৎলক্ষ্মীরূপে সীতা, চরিত্রসমালোচনার—পন্নীত্বে তাঁহার স্থান কত উচ্চে এরূপঃ তর্ক-মীমাংসার;—অতীত, কেননা জগৎলক্ষ্মী যিনি তিনি সর্ব্ব প্রকারেই আদর্শস্থানীয়া, সাহিত্যের চরিত্ররূপেই কেবল আমরা সেরূপ আলোচনা করিবার অধিকারী। সে ভাবেও সীতা নিতান্ত সাধারণাদর্শ নহেন। স্বামীকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিতা হইয়াও, যে সীতা লক্ষ্মণকে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার বিরহে কাতর স্বামীকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে আগ্রহাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সে সীতার পতিপ্রেম ও পতিপ্রীতি-কামতা যদি চরমোৎকর্ষের দৃষ্টান্ত না হইবে, তবে সেরূপ দৃষ্টান্তের কল্পনা আর কিরূপ হইতে পারে? কিন্তু জনকদুহিতা জানিতেন তাঁহার নির্ব্বাসন পতির স্নেহের অভাব হইতে সংঘটিত হয় নাই, স্বামী রাজধর্ম্ম-প্রতিপালন তৎপর হইয়া,প্রজারঞ্জনানুরোধে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আর বঙ্গের কবির কল্পিতা সতী, তাঁহার পতিপ্রেম ও পতিপ্রাণতার আদর্শ, নিজের ভাগ্যহীনতা জানিয়াও, তাঁহার হৃদয়সর্ব্বস্ব, তাঁহার জীবনের একমাত্রাবলম্ব স্বামীকে অন্যে নিরত দেখিয়াও, ক্ষণমাত্র কালের জন্যও পতিভক্তি ও পতিসেবায় শিথিলমনাঃ হয়েন নাই। প্রত্যুত, সেই স্বামীর সন্তোষের জন্য, আপনার উদ্যোগে, তাঁহার অভীপ্সিত পাত্রীর সহিত সম্মিলিত করিয়া, আত্ম-বলিদানে প্রবৃত্তা হইয়াছেন। এখানেও কি বঙ্কিমচন্দ্র চিরপরিচিত আদর্শ অতিক্রম করিয়া উচ্চে আরোহণ করেন নাই? ভ্রমরের পতিপ্রেমও, তাঁহার আজীবন দুঃখের সহিত সমসময়বর্ত্তী হইয়া, পতির পতিত্ব-লোপের পরেও সমানভাবে বিদ্যমান থাকিয়া, আদর্শ পতিপ্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার বাহ্যিক বিরাগের ভাব, বালিকাস্বভাবসম্ভূত হইলেও, সূর্য্য-মুখীর আদর্শের উচ্চত্বে উঠিতে তাঁহাকে বাধা প্রদান করিয়াছে। সূর্য্যমুখী একদিন স্বামীসমক্ষে, স্বামীনিগ্রহদুঃখকাতর হৃদয়ে, অশ্রুমোচন করিয়া স্বামীর অসন্তোষের কারণ হইয়াছিলেন বলিয়া, দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও, আর স্বামীসমক্ষে অশ্রুপাত করিতেন না, আত্মধারণে অসমর্থা হইলে দূরে গিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া আসিতেন। সর্ব্বথা সকল অবস্থায়, স্বামীসুখ ও স্বামী-সন্তোষের ধ্যানরতা এরূপ রমণীরত্ন সাহিত্য-জগতে আমরা আর কুত্রাপি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমরা ভ্রমরকেও আদর্শ হিন্দুরমণী বলিয়াছি, তাঁহার আদর্শ পতিপ্রেমের কথা ভাবিয়া, কিন্তু আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির সহিত বাক্য ও ব্যবহারের ভেদরাহিত্যভাবে ভ্রমর সূর্য্যমুখীর অনেক নিম্নে, সূর্য্যমুখী স্বামীর তুলনায় আপনি যে কেহ ইহা কখনও মনে করিতেন না, ভ্রমরে আত্মস্বত্ববোধ ছিল বলিয়া তিনি সেরূপ আত্মবিলোপনে সমর্থা হয়েন নাই।

কমলমণি, সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্রনাথ, তিন জনে মিলিয়া, তারাচরণের সহিত কুন্দের বিবাহে উদ্যোগী হইয়া, কিরূপে বিষবীজ রোপণ করিয়াছিলেন, কবি তৎসম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, বলিয়াছেন ভবিষ্যৎসম্বন্ধে

মানুষের চিরান্ধতাবশতই এরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ চিরান্ধতা যে অবাঞ্ছনীয় এ কথা বলিতে পারি না। ভবিষ্যৎ-জ্ঞানের অভাব না থাকিলে, মানুষে ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্য নিরাকরণ জন্য উপায়াবলম্বনে সমর্থ হইত, বা কার্য্যবিশেষ, যাহা সে দুর্ভাগ্যের কারণস্বরূপ, তাহা হইতে বিরত থাকিয়া, তাহা পরিহার করিতে পারিত। কিন্তু নগেন্দ্র বা সূর্য্যমুখীর ব্যক্তিগত দুঃখের চিন্তায় অভিভূত না হইয়া, সমাজের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করিয়া দেখিলে নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর ওরূপ দুঃখের অধীন না হওয়া যে বাঞ্ছনীয় তাহা বলিতে পারি না। দুঃখ ও দুর্ভাগ্যই অনেক সময়ে চরিত্র-মহত্বের ভিত্তিস্বরূপ, উপায়স্বরূপ, হইয়া, চরিত্রোৎকর্ষের বিকাশ সাধন করে, মনুষ্যসমাজ সে উৎকর্ষের দৃষ্টান্তে উন্নতি লাভ করিয়া অধিকতর সুখসৌন্দর্য্যের অধিকারী হয়। সূর্য্যমুখীর পত্নীত্বের মহত্ববিকাশ জন্য তাঁহার দুর্ভাগ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং নগেন্দ্রের সাময়িক চিত্তবিভ্রম, তাঁহার সাময়িক চরিত্র-চ্যুতি, ব্যতীত অন্যরূপে সে সৌন্দর্য্যবিকাশ সম্ভাবিত হইত না। নগেন্দ্রেরও ভার্য্যা-প্রেমের অকৃত্রিমত্ব, এই ঘটনা দ্বারা, প্রকাশ লাভ করিয়াছে। বেগবতী স্রোতস্বতীর স্রোতাভ্যন্তরে প্রতিবন্ধকস্বরূপ দণ্ডায়মান শৈলস্তম্ভ যেমন সে স্রোতবেগের শক্তি প্রমাণ করে, কুন্দপ্রেমরূপ শৈল সেইরূপ নগেন্দ্রের ভার্য্যানুরাগের প্রাবল্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, সে অনুরাগের প্রকৃত প্রবাহ প্রদর্শিত করিয়াছে। মনুষ্যসমাজ ইহাদের ব্যক্তিগত দুঃখ ও দুর্ভাগ্য দ্বারা লাভবান হইয়াছে। অতএব ইঁহাদের জীবনের ঘটনা অন্যরূপ হইবার ইচ্ছার কোন প্রকৃষ্ট কারণ দেখা যায় না। তবে যাঁহাদের জীবন আমাদের এত বিমল সুখের বিধান করিতেছে, যাঁহাদের দৃষ্টান্ত আমাদিগকে উচ্চতর করিয়া তুলিতেছে, তাঁহাদের দুঃখে দুঃখবোধ আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। বোধ হয় এরূপ চিন্তা করিলেই আমাদের সে দুঃখের নিরাকরণ হইবে যে, এই সাময়িক দুঃখ দ্বারা নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীও একভাবে লাভ প্রাপ্ত হইয়াছেন। নগেন্দ্র বুঝিয়াছেন সূর্য্যমুখী তাঁহার কি দরের জিনিস, সূর্য্যমুখী দেখিয়া সুখী হইয়াছেন কুন্দপ্রেমরূপ অনলে দগ্ধ হইয়া তাঁহার স্বামীর ভালবাসা কিরূপ খাঁটি সোণা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। উভয়েই পুনর্ম্মিলনে তাঁহাদের দাম্পত্যসুখের অভিনবত্ব অনুভব করিয়াছেন এবং উভয়েই অতিসুন্দর ভাবে, কবির অপূর্ব্ব কৌশল-ক্রমে, এ কথার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। স্থানান্তরে সে কৌশলের ব্যাখ্যা আমরা করিয়াছি, শয়নগৃহের দৃশ্যে সূর্য্যমুখীর সরলতা-মূলক চরিত্রসৌন্দর্য্য কিরূপ অপূর্ব্ব ভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে তাহা আমরা দেখাইয়াছি, তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

যাহার যেরূপ প্রকৃতি তাহার কথায় ও কার্য্যে সর্ব্বত্র তাহা প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যমুখী-চিত্রে কবি সর্ব্বত্রই গাম্ভীর্য্যের রেখাপাত করিয়াছেন। সর্ব্বস্থলে সকলের সহিত ঘনিষ্ঠতা গাম্ভীর্য্যবিরোধী, বোধ হয় যে গম্ভীর সে স্বভাবতঃ কিছু গর্ব্বিতও হইয়া থাকে। এরূপ গর্ব্বিত ভাব সূর্য্যমুখীরও ছিল, তাই তিনি তাঁহার

গৃহে প্রতিপালিত পৌরনারী-সম্প্রদায়ে বড় ঘনিতেন না। আবার, তিনি থাকিলে সকলের আমোদের বিঘ্ন হইত, সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত, তাঁহার নিকট মন খুলিয়া সকল কথা চলিত না। তিনি অকস্মাৎ পৌরস্ত্রীগণের মধ্যে উপস্থিত হইলে, বাজে কথা একেবারে বন্ধ হইত, অল্পবয়স্কারা সকলেই একটা একটা কাজ লইয়া বসিত। এইরূপে, কৌশলবহুল কবি, তাঁহার প্রতি অন্যের সসম্ভ্রম ব্যবহার দ্বারা, তাঁহার চিত্রে চরিত্র-গাম্ভীর্য্যের রেখা স্পষ্টতর করিয়াছেন। রহস্যেও সূর্য্যমুখীর এই প্রকৃতি প্রতিভাত হইত। সাধারণ রহস্য তিনি জানিতেন না, ব্যঙ্গোক্তি করিতে গেলেও তাহাতে প্রকৃতি-গাম্ভীর্য্যের ছায়া পড়িত। স্বামীর সঙ্গে কমলের রহস্যালাপ স্মরণ করিলে, স্বামীর অনুপস্থিতি কালে স্বামী-সন্দর্শন জন্য কমলের চাঞ্চল্যের সহিত সূর্য্যমুখীর সেরূপ স্থলে ধ্যানগত মনঃক্লেশের তুলনা করিলে, এ কথা বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইবে। নগেন্দ্রনাথ কলিকাতায়, কুন্দকে লইয়া কমলের বাড়ী উপস্থিত হইয়াছেন, কুন্দের খবর সূর্য্যমুখীকেও জানাইয়াছেন। সূর্য্যমুখী প্রত্যুত্তরে কুন্দ-নগেন্দ্র সম্বন্ধে দুই একটি রহস্যোক্তি করিয়া, তারাচরণের সহিত কুন্দের বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন। সে পত্রের আরম্ভ এইরূপ :—"দাসী শ্রীচরণে কি অপরাধ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতায় যদি তোমার এত দিন থাকিতে হইবে, তবে আমি কেনই বা নিকটে গিয়া পদসেবা না করি?" প্রকৃতই তিনি দাসীভাবে স্বামীর চরণসেবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকিতেন। সাময়িক স্বামীবিরহে এই খানে তাঁহারও যে হৃদয়ব্যথা, শ্রীশচন্দ্রের কর্ম্মস্থান হইতে আসিতে বিলম্ব হইলে কমলও হৃদয়ে সেইরূপ অস্থিরতাই অনুভূত করিতেন; কিন্তু কমলের সে হৃদয়ক্লেশ প্রস্ফুরণের প্রণালী ভিন্ন, তাহা তাঁহার নিজ প্রকৃতির উপযোগী। এরূপ স্থলে তিনি খোকা বাবুকে মধ্যস্থ করিয়া কতই না তারল্য প্রকাশ করিয়াছেন। স্থলান্তরে, নগেন্দ্রগৃহে, পৌরস্ত্রীগণের প্রাঙ্গণে, হরিদাসী বৈষ্ণবীর গান শ্রবণ করিয়া, কমলমণি ভ্রুভঙ্গি করিয়া বলিতেছেন, "বৈষ্ণবী দিদি—তোমার মুখে ছাই পড়ুক—আর তুমি মর। আর কি গান জান না?" আবার, "একটা বাবলার ডাল আন ত রে—কাঁটাফোটা কত সুখ মাগীকে দেখিয়ে দিই।" সেই স্থলে, সূর্য্যমুখী মৃদুভাবে হরিদাসীকে বলিলেন, "ও সব গান আমাদের ভাল লাগে না—গৃহস্থবাড়ী ভাল গান গাও।" সূর্য্যমুখী গৃহিণী, গৃহিণীর গাম্ভীর্য্যের সহিত বৈষ্ণবীকে এ উপদেশ প্রদান করিলেন। আর চিরপ্রেমময়ী, চিরপ্রফুল্লহৃদয়া ও চির-রহস্যপ্রিয় কমলের তিরস্কারের মধ্য দিয়া তাঁহার সেই চিরপ্রেমিকতার, সকলের প্রতি সেই সপ্রেম ব্যবহারের, প্রতিবিম্ব দেখা গেলেও, তাহার সহিত তাঁহার প্রকৃতি-গত অথচ সৌন্দর্য্যজড়িত চাপল্য প্রদৃশ্যমান। তরুণী ভ্রমরেও এ চাপল্য ছিল, তাহা কতকাংশে কমলের চাপল্যের সহিত এক-প্রকৃতিক, কিন্তু অতনিত্য এবং সর্ব্বত্রিক নহে, অনেকটা সংযতভাবাপন্ন। সূর্য্যমুখীর এই প্রকৃতিগত গাম্ভীর্য্যের যদি কখনও বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে, তবে সে কুন্দসম্বন্ধে,

কুন্দনন্দিনীর প্রতি তাঁহার পরুষ ব্যবহারে। এ স্থলে তাঁহার এরূপ ভ্রান্তির অতি স্বাভাবিক কারণও ছিল। সে কারণের অতিক্রম, অতিমানুষিক চিত্তশক্তি-প্রকাশক হইলেও, বুঝি বা পতিগতপ্রাণার প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইত। স্বামী কর্তৃক এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া, এই রমণীরত্ন আপনার হৃদয়সৌন্দর্য্যের যে পট বিকাশ করিয়াছেন, সে দৃশ্য আমরা এখানে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না;—সূর্য্যমুখীকে নিভৃতে লইয়া গিয়া নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি হীরাকে বিদায় দিয়াছ?" সূর্য্যমুখী বলিলেন, "দিয়াছি।" অনন্তর হীরা ও কৌশল্যার বৃত্তান্ত সবিশেষ বিবৃত করিলেন। শুনিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, "মরুক্। তুমি কুন্দনন্দিনীকে কি বলিয়াছিলে?"

নগেন্দ্র দেখিলেন, সূর্য্যমুখীর মুখ শুকাইল, সূর্য্যমুখী অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "কি বলিয়াছিলাম?"

নগেন্দ্র। কোন দুর্ব্বাক্য?

সূর্য্যমুখী কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে যাহা বলা উচিত, তাহাই বলিলেন।

বলিলেন, "তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তুমি আমার ইহকাল, তুমি আমার পরকাল। তোমার কাছে কেন আমি লুকাইব? কখনও কোন কথা তোমার কাছে লুকাই নাই, আজ কেন একজন পরের কথা তোমার কাছে লুকাইব? আমি কুন্দকে কুকথা বলিয়াছিলাম। পাছে তুমি রাগ কর বলিয়া তোমার কাছে ভরসা করিয়া বলি নাই। অপরাধ মার্জ্জনা করিও। আমি সকল বলিতেছি।"

তখন সূর্য্যমুখী হরিদাসী বৈষ্ণবীর পরিচয় হইতে কুন্দনন্দিনীর তিরস্কার পর্য্যন্ত অকপটে সকল বিবৃত করিলেন। বলিয়া শেষ কহিলেন, আমি কুন্দনন্দিনীকে তাড়াইয়া আপনার মরমে আপনি মরিয়া আছি, দেশে দেশে তাহার তত্ত্বে লোক পাঠাইয়াছি। যদি সন্ধান পাইতাম, ফিরাইয়া আনিতাম। আমার অপরাধ লইও না।"

নগেন্দ্র তখন বলিলেন, "তোমার বিশেষ অপরাধ নাই, তুমি যেরূপ কুন্দের কলঙ্ক শুনিয়াছিলে, তাহাতে কোন্ ভদ্রলোকের স্ত্রী তাহাকে মিষ্ট কথা বলিবে, কি ঘরে স্থান দিবে? কিন্তু একবার ভাবিলে ভাল হইত যে, কথাটা সত্য কি না?"

সূর্য্য। তখন সে কথা ভাবি নাই। এখন ভাবিতেছি।

ন। ভাবিলে না কেন?

সূর্য্য। আমার মনের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল, বলিতে বলিতে সূর্য্যমুখী—পতিপ্রাণা সাধ্বী নগেন্দ্রের চরণপ্রান্তে ভূতলে উপবেশন করিলেন, এবং নগেন্দ্রের উভয় চরণ দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া নয়নজলে সিক্ত করিলেন। তখন মুখ তুলিয়া বলিলেন, "প্রাণাধিক তুমি। কোন কথা এ পাপ মনের ভিতর থাকিতে তোমার কাছে লুকাইব না। আমার অপরাধ লইবে না?"

নগেন্দ্র বলিলেন, "তোমার বলিতে হইবে না। আমি জানি, তুমি সন্দেহ করিয়াছিলে যে, আমি কুন্দনন্দিনীতে অনুরক্ত।"

সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের যুগলচরণে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আবার সেই শিশিরসিক্ত কমলতুল্য ক্লিষ্ট মুখমণ্ডল উন্নত

করিয়া, সর্ব্বদুঃখাপহারী স্বামিমুখ প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "কি বলিব তোমায়? আমি যে দুঃখ পাইয়াছি তাহা কি তোমায় বলিতে পারি? মরিলে পাছে তোমার দুঃখ বাড়ে এই জন্য মরি নাই। নহিলে যখন জানিয়াছিলাম, অন্য তোমার হৃদয়ভাগিনী, আমি তখন মরিতে চাহিয়াছিলাম। মুখের মরা নহে, যেমন সকলে মরিতে চাহে, তেমন মরা নহে; আমি যথার্থ আন্তরিক অকপটে মরিতে চাহিয়াছিলাম। আমার অপরাধ লইও না।"

নগেন্দ্র অনেকক্ষণ স্থির ভাবে থাকিয়া, শেষ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সূর্য্যমুখি! অপরাধ সকলই আমার। তোমার অপরাধ কিছুই নাই। আমি যথার্থই তোমার নিকট বিশ্বাসহন্তা, যথার্থই আমি তোমাকে ভুলিয়া কুন্দনন্দিনীতে—কি বলিব? আমি যে যন্ত্রণা পাইয়াছি, যে যন্ত্রণা পাইতেছি, তাহা তোমাকে কি বলিব? তুমি মনে করিয়াছ, আমি চিত্তদমনের চেষ্টা করি নাই; এমত ভাবিও না। আমি যত আমাকে তিরস্কার করিয়াছি, তুমি কখনও তত তিরস্কার করিবে না। আমি পাপাত্মা, আমার চিত্ত বশ হইল না।"

সূর্য্যমুখী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, যোড়হাত করিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "যাহা তোমার মনে থাকে, থাক্—আমার কাছে আর বলিও না। তোমার প্রতি কথায় আমার বুকে শেল বিঁধিতেছে। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে—আর শুনিতে চাহি না। এ সকল আমার অশ্রাব্য।"

"না, তা নয়, সূর্য্যমুখি! আরও শুনিতে হইবে। যদি কথা পাড়িলে, তবে মনের কথা ব্যক্ত করিয়া বলি, কেননা, অনেক দিন হইতে বলি বলি করিতেছি। আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। মরিব না, কিন্তু দেশান্তরে যাইব। বাড়ী ঘর সংসারে আর সুখ নাই। তোমাতে আমার আর সুখ নাই, আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। আমি আর কাছে থাকিয়া তোমায় ক্লেশ দিব না। কুন্দনন্দিনীকে সন্ধান করিয়া আমি দেশ-দেশান্তরে ফিরিব। তুমি এ গৃহে গৃহিণী থাক। মনে মনে ভাবিও, তুমি বিধবা—যাহার স্বামী এরূপ পামর, সে বিধবা নয় ত কি? কিন্তু আমি পামর হই আর যাই হই, তোমাকে প্রবঞ্চনা করিব না। আমি অন্যাগতপ্রাণ হইয়াছি, সে কথা তোমাকে স্পষ্ট বলিব; এখন আমি দেশত্যাগ করিয়া চলিলাম। যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুলিতে পারি, তবে আবার আসিব, নচেৎ তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ।"

এই শেলসম কথা শুনিয়া সূর্য্যমুখী কি বলিলেন? কয়েক মুহূর্ত্ত প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিবৎ পৃথিবীপানে চাহিয়া রহিলেন। পরে সেই ভূতলে অধোমুখে শুইয়া পড়িলেন। মাটীতে মুখ লুকাইয়া সূর্য্যমুখী কাঁদিলেন কি? হত্যাকারী ব্যাঘ্র যেরূপ হতজীবের যন্ত্রণা দেখে, নগেন্দ্র সেইরূপ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। মনে মনে বলিতেছিলেন, সেই ত মরিতে হইবে—তার আজ কাল কি? জগদীশ্বরের ইচ্ছা আমি কি করিব? আমি কি মনে করিলে ইহার প্রতিকার করিতে পারি? আমি

মরিতে পারি, কিন্তু তাহা.ত সূর্য্যমুখী বাঁচিবে ?"

* * * *

দণ্ডেক পরে সূর্য্যমুখী উঠিয়া বসিলেন, আবার স্বামীর পায় ধরিয়া বলিলেন, "এক ভিক্ষা।"

ন। কি ?

সূ। আর এক মাস মাত্র গৃহে থাক। ইতিমধ্যে যদি কুন্দনন্দিনীকে না পাওয়া যায়, তবে তুমি দেশত্যাগ করিও। আমি মানা করিব না।

নগেন্দ্র মৌনভাবে বাহির হইয়া গেলেন। মনে মনে আর এক মাস থাকিতে স্বীকার করিলেন। সূর্য্যমুখীও তাহা বুঝিলেন। তিনি গমনশীল নগেন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতি চাহিয়াছিলেন। সূর্য্যমুখী মনে মনে বলিতেছিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব ধন! তোমার পায়ের কাঁটাটি তুলিবার জন্য প্রাণ দিতে পারি। তুমি পাপ সূর্য্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হইবে ? তুমি বড় না আমি বড় ?"—

এরূপ আত্মবিলোপকারী পতিভক্তি প্রকৃত জীবনে কমই দেখিতে পাওয়া যায়। সাহিত্যজগতেও পত্নীত্বের এরূপ আদর্শকল্পনা অধিক আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। অতঃপর সূর্য্যমুখী কুন্দনন্দিনীকে অন্তঃপুরোদ্যানে দেখিতে পাইয়া, "কুন্দ! এসো—দিদি এসো। আর আমি তোমায় কিছু বলিব না।" এই বলিয়া, তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক, অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গেলেন ; লইয়া গিয়া, স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া, বিধবাবিবাহের বৈধত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইলেও, স্বামীর ইচ্ছানুসরণ করিয়া, স্বামীর প্রীত্যর্থে, তাঁহার সহিত নন্দনন্দিনীর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, আত্মবলিদানের পরিসমাপ্তি সম্পাদন করিলেন সূর্য্যমুখী, তাঁহার পতিভক্তির এই আত্মবিলোপকারী প্রকৃতিবশতই, বিধবাবিবাহের বৈধত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। পতির প্রীতিবিধান পত্নীজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া যিনি জানিতেন, যাঁহার পতিপ্রেমের অর্থ পতির প্রতি প্রাণপণ ভালবাসা, পতির সুখসন্তোষের জন্য আত্মবিসর্জ্জন, তিনি যে বিধবাবিবাহ-বিধানকর্ত্তার পাণ্ডিত্যে সন্দিহান হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ? তাঁহার এ সন্দেহ সাধারণ হিন্দুপত্নীর বিধবাবিবাহসম্বন্ধে মত প্রকাশ নহে, ইহা তাঁহার পতিপ্রেমের প্রকৃতি ও গভীরত্বব্যঞ্জক। কবি এই সাধারণ কথাটি সূর্য্যমুখীর মুখে তুলিয়া, তাঁহার পতিপ্রেমের ও পতিভক্তির সেই অনির্ব্বচনীয় নিত্যত্ব ও অবিচলিত ভাব প্রকটিত করিয়া, অল্প বা সাধারণ কথায় গূঢ়ার্থ সূচনায় ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এ নূতন বিবাহের সংবাদ সূর্য্যমুখী কমলমণিকে লিখিয়াছিলেন। কমল অতি ব্যস্ত হইয়া শ্রীশচন্দ্রকে লইয়া গোবিন্দপুরে যাত্রা করিলেন—ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ যে কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়া সূর্য্যমুখীর প্রাণহন্তা হইতে বসিয়াছেন, এ কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া, যদি এখনও বিবাহ সম্পন্ন না হইয়া থাকে, এরূপ কার্য্য হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার আশয়ে। কমল জানিতেন স্বামীই সূর্য্যমুখীর সর্ব্বস্ব, স্বামীই সূর্য্যমুখীর জীবন, সূর্য্যমুখীর পক্ষে সে স্বামীকে অন্যে অর্পণ

করিবার উদ্যোগের অর্থ আত্মবিনাশে সংকল্প। তাই কমল, যে সতীশচন্দ্রের মুখ দেখিলে আর সকল কার্য্য ভুলিয়া যাইতেন, সেই সতীশচন্দ্রকে পশ্চাতে ফেলিয়া, অতি উৎকণ্ঠিত চিত্তে গোবিন্দপুরের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন; প্রবেশ করিয়া সাহসশূন্য হৃদয়ে সূর্য্যমুখীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভয় যদি কেহ বলিয়া ফেলে নগেন্দ্রের সহিত কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দিয়া সূর্য্যমুখী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কমল সত্যই ভাবিয়াছিলেন। সূর্য্যমুখী প্রাণত্যাগের সংকল্পই করিয়াছিলেন, আত্মহত্যার দ্বারা নহে, কারণ আত্মহত্যা সেরূপ ধীর, গম্ভীর, সহিষ্ণু-প্রকৃতির পক্ষে অস্বাভাবিক হইত। সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া, শারীরিক ক্লেশ, অনশনাদি দ্বারা জীবনশেষের অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। বুঝি বা আত্মহত্যা করিয়া, স্বামীর মুখকান্তি দর্শনের, স্বামীর চরণসেবার, আশা হইতে একেবারে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইবার অবস্থার সহিত নিজের হৃদয়কে মিলিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার এরূপে আজীবনদুঃখভোগে আত্মোৎসর্গের মূলে স্ত্রীসুলভ অভিমান থাকিয়া থাকিলে, কবি বোধ হয় ইহাও দেখাইতে চাহেন যে, সে অভিমান তাঁহার পতিসেবার লালসাকে পরাজিত করিতে পারে নাই; অন্য দিকে, সে ভাবের অনুগামী হইয়া গৃহত্যাগ করায়, অন্যকে স্বামী দান করিয়া সে অবস্থা সহ্য করিবার অক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়া পতিময়জীবিতার, পতিসর্ব্বস্ব রমণীর, চরিত্রের সঙ্গতি বা স্বাভাবিকত্ব রক্ষিত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে। আপন স্বামীতে সূর্য্যমুখীর এত [illegible] ছিল বলিয়াই, স্বামীর প্রীত্যর্থে সে স্বার্থত্যাগে তাঁহার এত মহত্ত্ব। কমলমণি সূর্য্যমুখীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া সূর্য্যমুখীকে এক রুদ্ধ গবাক্ষসন্নিধানে অধোবদনে বসিয়া দেখিলেন। পরে সূর্য্যমুখী উঠিয়া নিকটে আসিলে দেখিলেন, "সূর্য্যমুখীর কাঁধের হাড় উঠিয়া পড়িয়াছে, নবদেবদারুতুল্য সূর্য্যমুখীর দেহতরু ধনুকের মত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সূর্য্যমুখীর প্রফুল্ল পদ্মপলাশ চক্ষু কোটরে পড়িয়াছে, সূর্য্যমুখীর পদ্মমুখ দীর্ঘাকৃত হইয়াছে।" ইহা দেখিয়া বুঝিতে বাকি থাকিল না যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তখন সূর্য্যমুখী কমলের কোলে মাথা লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কমলের চক্ষের জলে সূর্য্যমুখীর বক্ষ ও কেশ সিক্ত করিতে লাগিল। পরে উভয়ে কথোপকথনে সমর্থা হইলে, এইরূপ কথোপকথন হইল।—

কমল। এ বিবাহ তোমার যত্নেই হইয়াছে—কেন তুমি আপনার মৃত্যুর উদ্যোগ আপনি করিলে?

সূর্য্যমুখী হাসিয়া বলিলেন, "আমি কে?" —মৃদু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন— বৃষ্টির পর আকাশ প্রান্তে ছিন্নমেঘে যেমন বিদ্যুৎ হয়, সেইরূপ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন "আমি কে? একবার তোমার ভাইকে দেখিয়া আইস—সে মুখভরা আহ্লাদ দেখিয়া আইস;—তখন জানিবে তিনি আজ কত সুখে সুখী। তাঁহার এত সুখ যদি আমি চক্ষে দেখিলাম, তবে কি আমার জীবন সার্থক হইল না? কোন্ সুখের

আশায় তাঁকে অসুখী রাখিব? তাঁহার এক দণ্ডের অসুখ দেখিলে মরিতে ইচ্ছা করে। দেখিলাম, দিবারাত্র তাঁর মর্ম্মান্তিক অসুখ—তিনি সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া দেশত্যাগী হইবার উদ্যোগ করিলেন—তবে আমার সুখ কি হইল? বলিলাম 'প্রভু! তোমার সুখই আমার সুখ—তুমি কুন্দকে বিবাহ কর—আমি সুখী হইব'—তাই বিবাহ করিয়াছেন?"

কমল। আর তুমি সুখী হইয়াছ?

সূর্য্য। আবার আমার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? আমি কে? যদি কখনও স্বামীর পায়ে কাঁকর ফুটিয়াছে দেখিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে যে, আমি ঐখানে বুক পাতিয়া দেই নাই কেন, স্বামী আমার বুকের উপর পা রাখিয়া যাইতেন।

বলিয়া সূর্য্যমুখী ক্ষণকাল নীরবে রহিলেন—তাঁহার চক্ষের জলে বসন ভিজিয়া গেল—পরে সহসা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমল, কোন্ দেশে মেয়ে হলে মেরে ফেলে?"

কমল মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "মেয়ে হলেই কি হয়? যার যেমন কপাল, তার তেমনি ঘটে।"

সূ। আমার কপালের চেয়ে কার কপাল ভাল? কে এমন ভাগ্যবতী? কে এমন স্বামী পেয়েছে? রূপ, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, সে সকলও তুচ্ছ কথা—এত গুণ কার স্বামীর? আমার কপাল, জোর কপাল—তবে কেন এমন হইল?

কমল। এও কপাল!

সূ। তবে এ জ্বালায় মন পোড়ে কেন?

কমল। তুমি স্বামীর আজিকার আহ্লাদপূর্ণ মুখ দেখিয়া সুখী—তথাপি বলিতেছ, এ জ্বালায় মন পোড়ে কেন? দুই কথাই কি সত্য?

সূ। দুই কথাই সত্য। আমি তাঁর সুখে সুখী—কিন্তু আমায় যে তিনি পায়ে ঠেলিলেন, আমায় পায়ে ঠেলিয়াছেন বলিয়াই তাঁর এত আহ্লাদ!—

সূর্য্যমুখী আর বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইল—চক্ষু ভাসিয়া গেল, কিন্তু সূর্য্যমুখীর অসমাপ্ত কথার মর্ম্ম কমলমণি সম্পূর্ণ বুঝিয়াছিলেন। বলিলেন, "তোমায় পায়ে ঠেলেছেন বলে, তোমার অন্তর্দাহ হইতেছে। তবে কেন বল, আমি কে? তোমার অন্তঃকরণের আধখানা আজও আমিতে ভরা; নহিলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াও অনুতাপ করিবে কেন?"

সূ। অনুতাপ করি না। ভালই করিয়াছি, ইহাতে আমার কোন সংশয় নাই। কিন্তু মরণের ত যন্ত্রণা আছেই। আমার মরণই ভাল বলিয়া আপনার হাতে আপনি মরিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া মরণের সময়ে কি তোমার কাছে কাঁদিব না?

সূর্য্যমুখী কাঁদিলেন। কমল তাঁহার মাথা আপন হৃদয়ে আনিয়া হাত দিয়া ধরিয়া রাখিলেন। কথায় সকল কথা ব্যক্ত হইতেছিল না—কিন্তু অন্তরে অন্তরে কথোপকথন হইতেছিল! অন্তরে অন্তরে কমলমণি বুঝিতেছিলেন যে, সূর্য্যমুখী কত দুঃখী। অন্তরে অন্তরে সূর্য্যমুখী বুঝিয়াছিলেন যে, কমলমণি তাঁহার দুঃখ বুঝিতেছেন।—

অতঃপর রোদন সংবরণ করিয়া, সূর্য্যমুখী কমলমণির সহিত অন্যান্য কথোপকথন করিলেন, এবং গভীর রাত্রে স্নেহভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া এবং "বাবা! আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার মামার মত অক্ষয় গুণে গুণবান্ হও, ইহার বাড়া আশীর্ব্বাদ আর আমি জানি না" এই বলিয়া সতীশচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলেন। পরে কমলমণিকে এক পত্র লিখিয়া বিছানায় রাখিয়া গৃহত্যাগ করিয়া দেশত্যাগী হইলেন। সে পত্রের কয়েকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(১)

"যে দিন স্বামীর মুখে শুনিলাম যে, আমাতে আর তাঁর কিছুমাত্র সুখ নাই, তিনি কুন্দনন্দিনীর জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইবেন, অথবা প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই দিনেই মনে মনে সংকল্প করিলাম, যদি কুন্দনন্দিনীকে আবার কখনও পাই, তবে তাহার হাতে সমর্পণ করিয়া তাহাকে সুখী করিব। কুন্দনন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া আপনি গৃহত্যাগ করিয়া যাইব; কেননা, আমার স্বামী কুন্দনন্দিনীর হইলেন, ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না। এখন কুন্দনন্দিনীকে পুনর্ব্বার পাইয়া তাহাকে স্বামী দান করিলাম। আপনিও গৃহত্যাগ করিয়া চলিলাম।"

(২)

"——। আমি টাকা কড়ি সঙ্গে লইলে লইতে পারিতাম, কিন্তু প্রবৃত্তি হইল না। আমার স্বামী, আমি ত্যাগ করিয়া চলিলাম—সোণারূপা সঙ্গে লইয়া যাইব?"

(৩)

"তুমি আমার একটি কাজ করিও, আমার স্বামীর চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইও। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না—চক্ষের জলে অক্ষর দেখিতে পাইলাম না—কাগজ ভিজিয়া নষ্ট হইল। কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার লিখিলাম—আবার ছিঁড়িলাম—আবার ছিঁড়িলাম—কিন্তু আমার বলিবার যে কথা আছে, তাহা কোন পত্রেই বলিতে পারিলাম না। কথা বলিতে পারিলাম না বলিয়া, তাঁহাকে পত্র লেখা হইল না। তুমি যেমন করিয়া ভাল বিবেচনা কর, তেমনি করিয়া আমার এ সংবাদ তাঁহাকে দিও। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিও যে, তাঁহার উপর রাগ করিয়া আমি দেশান্তরে চলিলাম না। তাঁহার উপর আমার রাগ নাই; কখনও তাঁহার উপর রাগ করি নাই, কখনও করিব না। যাঁহাকে মনে হইলে আহ্লাদ হয়, তাঁহার উপর কি রাগ হয়? তাঁহার উপর যে অচলা ভক্তি, তাহাই রহিল, যত দিন না মাটীতে এ মাটী মিশে, তত দিন থাকিবে। কেননা, তাঁহার সহস্র গুণ আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। এত গুণ কাহারও নাই। এত গুণ কাহারও নাই বলিয়াই আমি তাঁহার দাসী। এক দোষে যদি তাঁহার সহস্র গুণ ভুলিতে পারিতাম, তবে আমি তাঁহার দাসী হইবার যোগ্য নহি। তাঁহার নিকট আমি জন্মের মত বিদায় হইলাম। জন্মের মত স্বামীর কাছে বিদায় হইলাম,

ইহাতে জানিতে পারিবে যে, আমি কত দুঃখে সর্ব্বত্যাগিনী হইতেছি।"

(৪)

"তোমার কাছে জন্মের মত বিদায় হইলাম, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার স্বামী পুত্র দীর্ঘজীবী হউক, তুমি চিরসুখী হও। আরও আশীর্ব্বাদ করি যে, যে দিন তুমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেই দিন যেন তোমার আয়ুঃশেষ হয়। আমায় এ আশীর্ব্বাদ কেহ করে নাই।"

উদ্ধৃত প্রথমাংশে সূর্য্যমুখী তাঁহার গৃহত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—সে কারণ তাঁহার স্বামী কুন্দনন্দিনীর হইলেন, তাহা চক্ষে দেখিবার তাঁহার অক্ষমতা, পতিগতপ্রাণা, পতিসর্ব্বস্বা রমণীর প্রকৃতিগত কারণ, তাহার অন্যথাভাব স্বভাববিরোধী। কাহার প্রতি ঈর্ষা বা রাগ তিল পরিমাণেও তাঁহাকে এ গৃহত্যাগকার্য্যে প্রণোদিত করে নাই, কুন্দনন্দিনীর প্রতি তাঁহার কিছুই ঈর্ষা ছিল না, এ কথা তিনি, গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, স্বামী সঙ্গে পুনর্ম্মিলনের পর, নিজের কথা ও কার্য্য দ্বারাই সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি আপনার উদ্যোগে, কমলকে সঙ্গে করিয়া কুন্দকে দেখিতে গেলেন, বলিলেন "সে আমার কাছে কোন দোষ করে নাই—বা তাহার উপর আমার রাগ নাই। সে আমার এখন কনিষ্ঠা ভগিনী।" কুন্দের গৃহে প্রবেশ করিয়া, কুন্দ বিষপান করিয়াছে দেখিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন, বলিলেন, "আমি এত দিনে জানিলাম, আমার কপালে এক দিনেরও সুখ নাই—নতুবা আমি আবার সুখী হইবামাত্রই এমন সর্ব্বনাশ হইবে কেন?" কি সুন্দর কথা! কি সুন্দর ভাব! সূর্য্যমুখী-হৃদয়ের মহত্ত্ব কি সুন্দর প্রকটিত হইয়াছে! স্বামীর প্রতি রাগ করিয়া যে সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করেন নাই, উদ্ধৃত তৃতীয়াংশে তাহা স্পষ্টীকৃত। বরং তাঁহার পরবর্ত্তী কথায় ইহাই প্রকাশ হইয়াছে যে, তাঁহার গৃহত্যাগে তাঁহার স্বামী তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন ভাবিয়া তিনি স্বামীর নিকট আপনাকে অপরাধিনী মনে করিয়াছিলেন। গৃহত্যাগসময়ে অন্য ভাবের প্রাবল্য হেতু এ চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থানাধিকার করিয়া না থাকিলেও, পরে সে চিন্তা তাঁহার মনঃক্লেশের কারণই হইয়াছিল। এই অংশে, সূর্য্যমুখী কত উচ্চাঙ্গের পত্নী ও রমণী, তাঁহার পতিভক্তি সাধারণ রমণীর পতিভক্তি হইতে কত উচ্চে স্থাপিত, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। কবি তাঁহার প্রেমানুরাগের প্রকৃতি ব্যাখ্যানে গুণজ অনুরাগকে স্থায়ী এবং অতি উচ্চ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সূর্য্যমুখীর পতিপ্রেম সেই গুণানুভূতি হইতে উৎপন্ন, এবং স্বামীচরিত্রে যে দুর্ব্বলতা সাধ্বী রমণীর পক্ষে সাংঘাতিক, সূর্য্যমুখীর অদৃষ্টের ফেরে তাঁহার স্বামীতে সেই দুর্ব্বলতার উদ্ভব হওয়াতেও তাঁহাকে স্বামীচরিত্রের মূল্যাবধারণে সমর্থা করিয়া, কবি তাঁহাকে সাধ্বী রমণীগণ মধ্যে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন, উদ্ধৃত দ্বিতীয়াংশের ভাবার্থের সহিত, এই রমণীরত্ন স্থানান্তরে স্বামীর তুলনায় আপনাকে যেরূপ অবহেলার পাত্রী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন,—"তুমি পাপ সূর্য্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হইবে? তুমি

বড় না আমি বড়?"—তাহার মর্ম্ম সংযোগ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার স্বামী তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ স্থানাধিকার করিতেন, স্বামীর তুলনায় তাঁহার নিকট ইহ জগতে আর সকলই কিরূপ মূল্যহীন ছিল। উদ্ধৃত শেষাংশেও তিনি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিতা সাধ্বী রমণীর জীবনের নিরর্থকতা প্রকাশ করিয়াছেন।

সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ, বোধ হয়, বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলীতে বিতণ্ডার বিষয় হইয়াছে। এ গৃহত্যাগের প্রকৃতিনিহিত কারণের উল্লেখ সূর্য্যমুখী নিজেই করিয়াছেন, এবং আমরাও সংক্ষেপে তাহার ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। নগেন্দ্রনাথ ও কমলমণির সহিত সূর্য্যমুখীর কথোপকথন উদ্ধৃত করিয়া পাঠকসমীপে সূর্য্যমুখীর প্রকৃতি বিকাশে আমরা যত্ন পাইয়াছি। কবিও প্রধানতঃ উল্লিখিত বাক্যালাপ দ্বারাই সে প্রকৃতির বিকাশ সাধন সম্পাদিত করিয়াছেন। স্থলান্তরে, কমলকে পত্র লিখিতে সূর্য্যমুখী বলিয়াছেন, "পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী। * * * * * পৃথিবীতে আমার যদি কোন অভিলাষ থাকে, তবে সে স্বামীর স্নেহ; * * * *।" আমরাও, "পতিগতপ্রাণা," "পতিমাত্র-জীবিতা", "পতিসর্ব্বস্বা", ইত্যাকার বিশেষণ দ্বারা, সেই ভাবই প্রতিফলিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। স্বামী সম্বন্ধে এরূপ ভাবাধিকৃত হৃদয়ে, সূর্য্যমুখী তাঁহার একান্ত বাঞ্ছিত পতিপদসেবা অন্যাধিকৃত দেখিয়া, অবিচলিত চিত্তে থাকিতে পারিলে, আমাদের বিবেচনায়, তাহার ভাবের পূর্ণতা প্রমাণিত হইত না, সে ভাবের সার্থকতার, তাহার সম্যক আন্তরিকতার, অভাব অনুমিত হইতে পারিত। কেবলমাত্র প্রাণত্যাগ দ্বারা সূর্য্যমুখী সে সংশয়ের নিরাকরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু আত্মহত্যা তাঁহার গাম্ভীর্য্য-গৌরবের হানিকর হইত, তাঁহার ধীর সহিষ্ণুপ্রকৃতির সহিত অসঙ্গত হইত, তাঁহার পতিপদসেবার লালসারও অশ্রেয়ত্ব প্রতিপাদিত হইত না। মনুষ্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে প্রভূতজ্ঞানসম্পন্ন, সূক্ষ্মদর্শী কবি সুতরাং আত্মহত্যার ব্যবস্থা করেন নাই, তিনি সঙ্গতি রক্ষার জন্য অন্যোপায়াবলম্বন করিয়াছেন। আবার সে উপায়াবলম্বনও তাঁহার কৌশল বুদ্ধি সমুদ্ভূত। সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের অর্থ স্বাধীনভাবাবলম্বন নহে, তাহার অর্থ প্রাণাপচয়ের আয়োজন। এ গৃহত্যাগের মূলে স্ত্রীসুলভ অভিমান ছিল না, এ কথা বলা সহজ নহে; কিন্তু সে অভিমানের অর্থ স্বামীর উপর রাগ নহে, তাহার অর্থ আপনার দুর্ভাগ্যজ্ঞানে আত্মনিগ্রহ, দুঃখভোগের জন্য উদ্যোগ। সুতরাং ইহাতে দোষাবহ কিছু নাই; অথচ গৃহত্যাগ করিয়া সূর্য্যমুখীর প্রমাণ করিবার অবস্থা হইয়াছিল যে, তিনি কোন অবস্থাতেই স্বামীমুখদর্শন ও স্বামীপদসেবা ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার গৃহত্যাগে নগেন্দ্রনাথেরও তাঁহার ভার্য্যাবৎসলতা প্রমাণ করিবার সুবিধা হইয়াছিল, অন্যরূপে নগেন্দ্রের সে ভাব অত উজ্জ্বল বর্ণে প্রকটিত

হইতে পারিত না। এ গৃহত্যাগে সে অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ দৃশ্য, সে সুন্দর সুখপূর্ণ পুনর্ম্মিলনের দৃশ্য, সে ছায়ানামক পরিচ্ছেদের সামগ্রী সংগ্রহ হইয়াছে। সূর্য্যমুখীর পুনরাগমনে কমলের শঙ্খধ্বনিপূর্ব্বক সে আনন্দের নৃত্যে কমলচরিত্রের যে মনোহর বিকাশ সাধিত হইয়াছে, তাহা কি অন্যরূপে সম্ভাবিত হইত? একটী ঘটনা কত সৌন্দর্য্যের মূলস্বরূপ হইয়াছে। কে সে সমস্ত হইতে বঞ্চিত হইতে ইচ্ছা করিবে? কে এ সকল সুন্দর সৃষ্টি চক্ষের উপর দেখিয়াও, সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগে দোষারোপ করিবে?

বিষবৃক্ষ কাব্যে, নগেন্দ্রনাথের সকল সুখের মন্দির, সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহবর্ণনে বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন; এরূপ সুন্দর বর্ণনা কমই দেখিতে পাওয়া যায়। এই শয্যাগৃহে তাঁহার সেই ছায়াদৃশ্যের অবতারণ কি সুন্দর সৃষ্টি! এই দৃশ্যে সূর্য্যমুখীর চরিত্র-বিজ্ঞাপক অনেক কথা আছে। সত্যভামা ও তাঁহার তুলাযন্ত্রের চিত্রের নীচে সূর্য্যমুখী স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! স্বামীর সঙ্গে রূপার তুলা?" উমার কুসুম-সজ্জা দেখিয়া সূর্য্যমুখী একদিন আপন ফুল পরিতে সাধ করিয়াছিলেন। নগেন্দ্র নিজহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়া সূর্য্যমুখীকে কুসুমময়ী সাজাইয়াছিলেন। সূর্য্যমুখী তাহাতে যত সুখী হইয়াছিলেন, কোন্ রমণী রত্নময়ী সাজিয়া তত সুখী হয়? সূর্য্যমুখী একদিন সুভদ্রার সারথ্যের সাধ পুরাইয়া আসিয়া, সুভদ্রার চিত্রকে একটী কিল দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "তুই সর্ব্বনাশীই ত যত আপদের গোড়া।" কেননা সুভদ্রার দৃষ্টান্তানুসরণ করিতে গিয়া হঠাৎ গাড়ী ফটকের বাহিরে উপস্থিত হওয়ায় তিনি বিষম লজ্জার দায়ে পড়িয়াছিলেন। শয্যাগৃহ নির্ম্মিত হইলে, সূর্য্যমুখী স্বহস্তে তাহার গায়ে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—

"১৯১০ সংবৎসরে
ইষ্টদেবতা
স্বামীর স্থাপনা জন্য
এই মন্দির
তাঁহার দাসী সূর্য্যমুখী
কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত হইল।"

নগেন্দ্র, সূর্য্যমুখী পরলোকগতা বিশ্বাসে, এই শয্যাগৃহে গিয়া কত বিলাপ করিতেছেন, শয্যাগৃহে জীবিতা সূর্য্যমুখী দর্শনে আপনাকে ভ্রান্ত উন্মাদগ্রস্ত মনে করিয়া আক্ষেপ করিতেছেন, "শেষে এই কি কপালে ছিল? আমি পাগল হইলাম!" এবং ধরাশায়ী হইয়া বাহু মধ্যে চক্ষু লুকাইয়া কাঁদিতেছেন। সূর্য্যমুখী তাঁহার পদযুগল ধরিলেন, তাঁহার পদযুগলে মুখাবৃত করিয়া তাহা অশ্রুজলে অভিসিক্ত করিলেন; বলিলেন, "উঠ, উঠ! আমার জীবনসর্ব্বস্ব! মাটী ছাড়িয়া উঠিয়া বসো—আমি যে এত দুঃখ সহিয়াছি, আজ আমার সকল দুঃখের শেষ হইল। উঠ, উঠ আমি মরি নাই। আবার তোমার পদসেবা করিতে আসিয়াছি।" কবি বলিতেছেন, "তখন উভয়ে উভয়ের স্কন্ধে মস্তক ন্যস্ত করিয়া কত রোদন করিলেন। কেহ কোন কথা বলিলেন না—

কত রোদন করিলেন। রোদনে কি সুখ!" তাই আমরা বলিয়াছি এ ইন্দ্রজাল বুঝা কঠিন। কুন্দ সূর্য্যমুখীর এই সুখের কারণ হইবার জন্যই বুঝি তাঁহার দুঃখের কারণ হইয়াছিলেন। তবুও নিস্তব্ধ বারিরাশিবক্ষে শান্তির দৃশ্যে কে বাত্যাতাড়ন ইচ্ছা করে, যদিও বাত্যাবসানে সে শান্তি অধিকতর অনুভূত হয়!

কল্পনার আদর্শ-সৃষ্টির সম্যক অভিব্যক্তি মনুষ্যভাষায় অসম্ভাবিত মনে করিলে, তাহার পূর্ণভাব হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবার জন্য আমাদের কবির একটি বিশেষ প্রণালী আছে। যেখানে স্বকীয় রেখাপাত ও বর্ণপ্রয়োগে মনের তৃপ্তি সাধন হয় না, সেখানে তিনি, স্বপ্ন বা মনের ক্ষণিক ভাববিশেষের সাহায্যে, বর্ণিত চিত্রকে অলৌকিকত্ব বা অতিমানুষিকত্বে উন্নয়ন করিয়া, তাহার প্রকৃতি পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করেন। এ প্রণালীর প্রথম অবতারণা সূর্য্য-চিত্রে, ইহার উৎকর্ষসাধন বা পূর্ণবিকাশ চন্দ্রশেখরের চরিত্রমহত্ত্ব বর্ণনে। গিরিগুহায় চৈতন্যবিহীনা শৈবলিনী স্বপ্নে চন্দ্রশেখরের যেরূপ ধ্যান করিতেছিলেন, তাহাতে সেই মহামহিম চরিত্রের প্রকৃতি যেরূপ বিভাসিত হইয়াছে, কবির অসাধারণ চিত্রনৈপুণ্যেও যেন সে চরিত্রের সেরূপ প্রদীপ্তি সাধন হয় নাই। সূর্য্যমুখী-চরিত্রেরও পূর্ণপ্রকৃতি অবধারণ করাইবার জন্যই যেন, কবি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া, বিলুপ্তচৈতন্য নগেন্দ্রনাথ, মুদ্রিত নয়নে, সূর্য্যমুখীকে স্বর্গারূঢ় বিশ্বাসে, এইরূপে তাহার রূপ ধ্যান করিতেছেন। নগেন্দ্রনাথ দেখিতেছেন, "তিনি রত্নসিংহাসনে রাজরাণী হইয়া বসিয়াছেন; চারিদিক হইতে শীতল সুগন্ধময় পবন তাঁহার অলকদাম দোলাইতেছে। চারিদিকে পুষ্পনির্ম্মিত বিহঙ্গগণ উড়িয়া বীণারবে গান করিতেছে। দেখিলেন, তাঁহার পদতলে শত শত কোকনদ ফুটিয়া রহিয়াছে; তাঁহার সিংহাসন-চন্দ্রাতপে শত চন্দ্র জ্বলিতেছে। চারিপার্শ্বে শত শত নক্ষত্র জ্বলিতেছে। দেখিলেন, নগেন্দ্র স্বয়ং এক অন্ধকারপূর্ণ স্থানে পড়িয়া আছেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা; অসুরে তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিতেছে; সূর্য্যমুখী অঙ্গুলীসঙ্কেতে তাহাদিগকে নিষেধ করিতেছেন।" সূর্য্যমুখী রমণীকুলের রাণী, দেবীপ্রকৃতি, পুণ্যাত্মা, পবিত্রতা উজ্জ্বলতা ও কোমলতার আধার—সেই কথাই কবি এ ভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি জীবিতেও যাহা ছিলেন, পরলোকগতা হইয়াও তাহাই আছেন—নিত্য, অপরিবর্ত্তিত, চিরসুখ ও শান্তিপ্রদায়িনী; তাই তিনি অসুরদিগকে বেত্রাঘাত হইতে নিবর্ত্তিত করিতেছেন। আবার কবি, অন্যের মুখে কথা দিয়া অনেক সময়ে অনেকটা এইভাবেই চরিত্র বিকাশ করিয়া থাকেন। সূর্য্যমুখী মরিয়াছেন বিশ্বাসে নগেন্দ্রনাথ বিষয়ের দানপত্রাদি প্রস্তুত করার জন্য গোবিন্দপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। শ্রীশ কমলও সেই স্থানে। কমলমণি শ্রীশচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "এ বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী ত বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাই বলে, দাদাবাবু বৈকুণ্ঠে এসে কি বটপত্রে শোবেন?" প্রকৃতই সূর্য্যমুখী আপনার গুণে সে পুরীকে বৈকুণ্ঠের ন্যায় পবিত্র সুখের স্থান করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাঁহার বিহনে সকলই অন্ধকার ও দুঃখময়তায় পরিণত হইয়াছিল!

শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী।

মানবের জন্মকথা।

মানুষের শ্বদন্ত চর্ব্বণ করিবার পক্ষে উত্তম। কিন্তু ওয়েন বলেন উহার অগ্রভাগ ছুঁচল.* তথায় একটি গোল রকম বিন্দু আছে, তাহার বাহিরের দিক কুব্জ, এবং ভিতরের ভাগ চেপ্‌টা অথবা কিঞ্চিৎ ন্যুব্জ, তাহার নীচে সামান্য একটু উচ্চাংশ আছে ; ইহাতেই উহাকে শ্বদন্ত বলিয়া বেশ বুঝা যায়। মিলানীয়ান্‌-বর্গীয় মানবের শ্বদন্তের ঐ ছুঁচলোভাগ বিলক্ষণ স্পষ্ট, বিশেষতঃ অষ্ট্রেলিয়ানদিগের। কর্ত্তনদন্ত অপেক্ষা শ্বদন্তের শিকড় অধিক পুঁতিয়া থাকে, এবং ঐ শিকড় অধিক শক্ত। তথাপিও শত্রুগণকে অথবা শিকারকে ছিঁড়িবার পক্ষে এই দন্ত মানুষের কোন উপকারে আসে না। সুতরাং ইহার আসল কার্য্যোপযোগিতা বিবেচনা করিলে ইহাকে অকর্ম্মণ্য বলা যায়। মানুষের মাথার খুলি অনেক গুলি যেখানেই সংগৃহীত থাকে, সেখানেই দেখা যায় যে কতিপয় খুলিতে অন্যান্য দন্ত অপেক্ষা শ্বদন্ত বেশি লম্বা, সুতরাং বাহির হইয়া রহিয়াছে,—যেন উচ্চশ্রেণীর বানরের মত, কিন্তু তাহা হইতে একটু কম। হেকেলও ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। ঐরূপ স্থলে অপর দন্তপাটির যথাযোগ্য স্থানে কিছু ফাঁক থাকে। তাহাতেই একপাটির ঐ লম্বা দন্ত অপর পাটিতে থাকিবার স্থান পায়। ওয়াগ্‌নার একটি কাফিরের খুলি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে দন্তপাটির ঐ ফাঁকস্থান অত্যন্ত প্রশস্ত। যখন মনে করি যে বর্ত্তমানকালের খুলি অপেক্ষা প্রাচীন কালের কত কমসংখ্যক খুলি পরীক্ষা করা হইয়াছে, তখন তিনটি খুলির শ্বদন্তও যে অত্যন্ত দীর্ঘ থাকা দেখা যাইতেছে, ইহাই কৌতুহলের কথা। নওলেট্‌ চোহালিতে যে শ্বদন্ত পাওয়া গিয়াছে তাহা ভয়ঙ্কর দীর্ঘ।

উচ্চশ্রেণীর বানরদিগের মধ্যে পুংজাতীয়গণেরই শ্বদন্ত পূর্ণবিবৰ্দ্ধিত। কিন্তু স্ত্রীজাতীয় গরিলার, এবং কতকটা স্ত্রীজাতীয় ওরাং-ওটাঙ্গেরও শ্বদন্ত অন্যান্য দন্ত অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ। সুতরাং স্ত্রীলোকের শ্বদন্ত কখন কখন দীর্ঘ হইয়া থাকে বলিয়া পুরুষের শ্বদন্তের অতিবৃদ্ধিকে বানরবৎ পূর্ব্বপুরুষগণের শ্বদন্তের পুনরাবর্ত্তন বলিয়া বিবেচনা করিবার বিশেষ বাধা দেখা যায় না। যিনি তাঁহার নিজের শ্বদন্তের আকৃতি, এবং অন্য ব্যক্তির শ্বদন্তের কখন কখন অতিবৃদ্ধি দেখিয়া, উহাদিগকে আমাদিগের চিরাতীতকালীয় পূর্ব্বপুরুষগণের ভয়ঙ্কর অস্ত্রস্বরূপ শ্বদন্তের পুনরাবর্ত্তন বিবেচনা করিতে, ঘৃণা বোধ করেন, তিনি সম্ভবতঃ ঐ ঘৃণাবশতঃ দন্তপাটি বিকাশ করিয়াই স্বকীয় প্রাচীন বংশাবলী প্রকাশ করিয়া ফেলিবেন। কারণ এই সকল শ্বদন্ত যদিও তিনি আর অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতে সক্ষম নহেন, এবং ইচ্ছাও করেন না, তথাপি তিনি নিজের অজ্ঞাতসারেও দন্তবিকাশের আবশ্যকীয় পেশি সংকুচিত করিয়া যেন আক্রমণ করিবার ভাবে দন্ত বাহির করিবেন ; কুকুর

* সূচল।

আক্রমণ কালে যে ভাবে বাহির করে, সেই ভাবেই করিবেম!

বানর এবং অন্ত স্তন্যপায়ী জীবের যে সকল পেশি সচরাচর থাকে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি সময় সময় মানুষেও দেখা যায়। অধ্যাপক ভ্লাকোভিক্ চল্লিশটি নরদেহ পরীক্ষা করিয়া উনিশটিতে ইস্কিও পির্ভবিক নামক পেশি পাইয়াছিলেন। ঐ নাম তিনিই দিয়াছেন। অবশিষ্টগুলির মধ্যে তিনটিতে ঐ পেশির স্থলে এক একটি বন্ধনী পাইয়াছিলেন ; এবং বাকি আঠারটিতে উহার কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হন নাই। ত্রিশটি নারীদেহ পরীক্ষায় কেবল দুইটিতে ঐ পেশি উভয় পার্শ্বেই পাইয়াছিলেন, আর তিনটিতে উহার স্থলে এক একটি অব্যবহার্য্য বন্ধনী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং এই পেশি নারী অপেক্ষা নরদেহেই বেশি স্থলে দেখা যায়। মানুষকে কোন নিম্নতর জীব হইতে [illegible] করিলে, এই কথা বোধগম্য হয়। কারণ ঐ পেশি অনেক নিম্নতর জীবদেহে পাওয়া গিয়াছে, এবং উহাদিগের মধ্যে কেবল পুংজাতীয়গণেরই ইহা প্রধানতঃ ক্রিয়ায় সহায়তা করে।

মিঃ উড্ তাঁহার মূল্যবান প্রবন্ধাদিতে মানবীয় পেশির অনেকগুলি পরিবর্ত্তন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ সকল পেশি নিম্নশ্রেণীর জীবের দেহে সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের নিকট-আত্মীয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর বানরগণের দেহে যে সকল পেশি সর্ব্বদাই দেখা যায়, তদনুরূপ পেশি মানবদেহে এত অধিক আছে যে, এ স্থলে তাহাদিগের উল্লেখ করাও দুঃসাধ্য। একটি নরদেহে সাতেরটি পেশি-পরিবর্ত্তন পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই বানর-দেহে সর্ব্বদা দেখা যায়। ঐ নরদেহটি বেশ বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট ছিল, এবং উহার মাথার খুলিও বেশ পূর্ণ গঠিত ছিল। ঐ নরদেহটিতে গলার দুই পার্শ্বেই সবল এবং আসল লেভেটার ক্ল্যাভিকিউলী নামক কণ্ঠাস্থি উত্তোলনকারী মাংসপেশি ছিল; ইহা প্রত্যেক শ্রেণীর বানরেরই থাকে, কিন্তু মানুষের মধ্যে ৬০ জনে এক জনের মাত্র দেখা যায়। উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর বানরগণের পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলির উপর ভাগের দীর্ঘাস্থির * সহিত যে পেশি হাক্সলি ও ফ্লাওয়ার সর্ব্বদাই সংলগ্ন দেখিয়াছেন তাহাও ঐ নরদেহে ছিল। আমি আর দুইটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব। খুলির নিম্নভাগের স্কন্ধাস্থি পরিচালক পেশী মানবেতর সমস্ত স্তন্যপায়ী জীবেরই আছে, বোধ হয় চতুষ্পদের মত চলাফেরা করার সঙ্গে ঐ পেশির সম্বন্ধ আছে। কিন্তু উহা মানবের মধ্যে ৬০ জনে এক জনের থাকে। মিষ্টার ব্র্যাড্লি মানুষের উভয় পদেই প্রপদাস্থি-পরিচালক পেশি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে উহার অস্তিত্ব জানা ছিল না। কিন্তু এই পেশি উচ্চশ্রেণীর বানরের সকলেরই পায়ে থাকে। মানবের হস্ত এবং বাহুর পেশি সকল অনন্যসাধারণ, কিন্তু উহারাও অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল, তদ্ধেতু ইতরজীবগণের হস্ত ও বাহুর পেশির তুল্য আকার প্রাপ্ত হয়। এই ঐক্য কখনও সম্পূর্ণ, কখন ও অসম্পূর্ণ; কিন্তু যখন অসম্পূর্ণ থাকে, তখন মানবের

* পায়ের পাতার অস্থি।

এবং ইতরজীবের ঐ সকল পেশির মাঝামাঝি একটা আকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কোন কোন পরিবর্ত্তন স্ত্রীলোকেরই বেশি দেখা যায়, কোন কোন পরিবর্ত্তন পুরুষেরই বেশি হইয়া থাকে, কিন্তু আমরা ইহার কারণ বুঝিতে অক্ষম। মিঃ উড্ বহু পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করিয়া অবশেষে এই সারগর্ভ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন;—"পেশি সকলের সাধারণ আকৃতি অপেক্ষাকৃত বিশেষ পরিবর্ত্তন হইলে তাহা নির্দ্দিষ্ট প্রণালিতে অথবা নির্দ্দিষ্ট পথেই হইয়া থাকে; ইহার এমন কোন অজ্ঞাত কারণ অবশ্যই আছে যাহা বুঝিতে পারিলে সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক ভাবে গঠনবিদ্যা (Anatomy) বুঝিবার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইতে পারে।

এই অজ্ঞাত কারণই পুনরাবর্ত্তন, অর্থাৎ কোন পূর্ব্বতন জীবদেহের গঠনপ্রণালীর পুনরাবৃত্তি,—এ কথা অতীব সম্ভব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। মানবের সাতটি পেশি অকস্মাৎ বিকৃত হইয়া বানরের পেশির ন্যায় হয়, ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাসযোগ্য! বংশগত সম্বন্ধ না থাকিলে এরূপ হওয়া বিশ্বাস করা যায় না। পক্ষান্তরে, যদি মানব বানরের ন্যায় কোন জন্তু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে বহু সহস্র বৎসর পরেও কোন কোন পেশি কেন পুনরাবির্ভূত হইবে না, তাহার কোনই কারণ বুঝা যায় না। অশ্ব, গর্দ্দভ ও খচ্চরের পদযষ্টিতে এবং স্কন্ধে কখন কখন হঠাৎ কৃষ্ণবর্ণ রেখা, বহুশতাব্দি অথবা সম্ভবতঃ বহু সহস্র বৎসর পরেও, উৎপন্ন হইতে দেখা যায়; মানবেরও তদ্বৎ।

এই সকল পুনরাবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত এবং প্রথম অধ্যায়ের লিখিত অব্যবহার্য্য অঙ্গসকলের দৃষ্টান্ত এরূপভাবে পরস্পরের সহিত সংসৃষ্ট যে প্রথম অধ্যায়েই ইহাদের উল্লেখ করিলেও চলিত। শৃঙ্গযুক্ত মানবীয় জরায়ু অপূর্ণ অবস্থাতেই আছে, অথচ তাহাই অপর কোন কোন স্তন্যপায়ী জীবের জরায়ুর সাধারণ ও পূর্ণাবস্থা। কোন কোন দেহাংশ-যেমন পুরুষের স্তন ও স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই কোকিলচঞ্চু অস্থি, মানবে অব্যবহার্য্য হইলেও সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়। [illegible] অস্থির নিম্ন ভাগে যে ছিদ্রে[illegible] উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও কখন কখন দেখা যায়; সুতরাং তাহা পুনরাবর্ত্তনের উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল পুনরাবর্ত্তিত অঙ্গ, এবং অব্যবহার্য্য অঙ্গ, নিম্নপ্রাণী হইতে মানবের জন্মের কথা অভ্রান্তরূপে বিবৃতকরিতেছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশধর রায়।

মথুরায়।

১

"সত্যি তবে তোমার এই মাসেই বিয়ে হবে?" "হ্যাঁ, ভাই, শ্রাবণমাসেই হবে শুনচি, তোর কবে বিয়ে হবেরে সতিয়া?"

একদিন বর্ষাকালের সন্ধ্যাবেলায় যখন নীল আকাশের কোথাও একটুও মেঘশূন্য ছিল না, যখন কূলে কূলে ভরানদী তুষারের শস্যক্ষেত্রের উপর ফুটন্ত কটাহপূর্ণ দুগ্ধের

মত উথলাইয়া উথলাইয়া পড়িতেছিল, যখন আসন্ন বন্যার হাত হইতে রক্ষা করিবার আশায় চাষারা সশঙ্কিত দৃষ্টি নদীর প্রত্যহ-বর্দ্ধিত জলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে রাশি রাশি ভুট্টা ও মাড়ুয়ার গাছ গরুর গাড়িতে বোঝাই দিতেছিল, সেই সময় বাঘ-তীর তীরে ব'সিয়া মৃত্তিকায় পিতলের কলসী মাজিতে মাজিতে একটি বালিকা তাহার বালক সঙ্গীকে এই প্রশ্ন করিল। রঘুনাথ গাছভাঙ্গা টাট্‌কা ভুট্টা শিকে বিঁধাইয়া চাষাদের তামাক খাইবার আগুণে পোড়াইয়া আনিয়াছিল। মতিয়ার জন্য কিছু কোঁচড়ে রাখিয়া গরম গরম ভুট্টা পোড়া বিনা লবণেই পার করিতে করিতে মতিয়ার নিরুদ্যম মুখের দিকে চাহিয়া সগর্ব্বে বলিল "সব্বাই বলচে আমার যে বউ হবে সে ভাই খুব সুন্দর খুব [illegible]নে, তারা সহুরে কি না!—বিয়ের [illegible] আমাকে কত গয়না দেবে, খুব মজা হবে ভাই, তোর খুব আহ্লাদ হচ্চে না?" মতিয়া মুখ ফিরাইয়া জোরে জোরে কলসী মাজিতে মাজিতে ভগ্নকণ্ঠে কহিল "তোমার বিয়ে হলে আর কি না তুমি আমার কিছু দেবে? পেয়ারা টেয়ারা সব এখার থেকে বউকে দিয়ে দেবে, আমার কেমন করে আহ্লাদ হবে?" রঘুনাথ একটা ভুট্টা শেষ করিয়া দ্বিতীয়টায় মনঃসংযোগ করিতেছিল, সে হাসিয়া উঠিয়া পরিত্যক্ত ভুট্টাটা অভিযোগকারিণীর প্রতি ছুঁড়িয়া মারিল ও সকৌতুকে বলিয়া উঠিল "দূর বউকে বুঝি আমার লজ্জা করবে না? বউএর সঙ্গে বুঝি আমার কথা কইতে আছে? পেয়রা টেয়রা সব ভাই তোকেই দোব, খালি একটা বউ হবে, আর গয়না টয়না হবে, বেশ হবে না!" ঈর্ষাগম্ভীর মুখ প্রফুল্ল করিয়া মতিয়া প্রতিশোধ স্বরূপ এক আঁজলা জল সঙ্গীর গায়ে ছুঁড়িয়া দিল। রঘু কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া বলিল "পোড়ারমুখী, আমার কাপড় ভিজিয়ে দেওয়া হলো, দাঁড়া তো তোকে দেখাচ্চি মজা।"

২

রঘুনাথের বিবাহ হইল সহরে। তাহার শ্বশুর কলিকাতা য়ুনিভারসিটির উপাধিধারী জজকোর্টের একজন উকিল। চালচলনেও অনেকটা তিনি নিজের সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই জন্য কাছাকাছির লোকেরা কেহই তাঁহার কন্যা-গ্রহণে সম্মত হয় নাই। মধ্যে শিবশঙ্কর একবার একটি শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবককে কন্যাদান করিয়া বাঙ্গালী বেহারীর সম্মিলনের পথে ঈষৎ অগ্রসর হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এ মহদুদ্দেশ্য সাধিত হইল না; বরং এই সংবাদে শিবশঙ্করের জ্ঞাতি বন্ধুগণ একেবারে আগুণ হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন এবং তাঁহার বৃদ্ধা পিতামহী অন্নজল ত্যাগ করিয়া শয্যাগত হইলেন। সংসারে অনেক শুভ সংকল্প এমনি করিয়া রোষানলে ভস্মীভূত ও অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া যায়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অবশেষে শিবশঙ্কর দূরগ্রামস্থ জমীদার বিশ্বেশ্বরপ্রসাদের অশিক্ষিত কিশোর পুত্র রঘুনাথের হাতে তাঁহার শিক্ষাপ্রাপ্তা ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যা চন্দনকুমারীকে সমর্পণ করিয়া অবিমৃষ্যকারিতার

ফলভোগস্বরূপ অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। মেয়ে শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়াই দর্পণের সাহায্যে ললাট ও সিঁথি-লিপ্ত সিন্দুর মুছিয়া শ্বশ্রূর শতদিব্য দেওয়া 'শা-বাহু লাঠিয়া ভাঙ্গিয়া, পায়ের তোড়া পাঁইজোর খুলিয়া, রাগিয়া, কাঁদিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, সেই অসভ্য, অশিক্ষিত, অপরিচ্ছন্ন শ্বশুরগৃহের শাসনবন্ধনের মধ্যে ধরা দিতে সে এ জন্মে আর কখনও সেখানে যাইবে না। অভিমানে ঠোঁঠ ফুলাইয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে পিতাকে গিয়া নালিস করিল—"বাবা আমাকে তবে কেন তুমি লেখাপড়া শিখিয়েছিলে?" মাকে বলিল "মাগো তাদের মাটির বাড়ী, দড়ির খাটিয়া, সে ঘরে কি আমি থাকতে পারি! আর একদিন থাকলেই আমি মরে যেতুম, আর কখনও সেখানে যাচ্ছি না।" শিবশঙ্কর দেখিলেন মেয়েকে উপযুক্ত পাত্রে দিতে না পারিয়া, বড় সঙ্কটই করিয়াছেন। বেহাইকে লিখিতে লাগিলেন "রঘুনাথের লেখা পড়া শেখার বিশেষ প্রয়োজন, তাকে আমার কাছে পাঠান।"

প্রথমটা গোপীনাথও একমাত্র পুত্রের বিরহ সহ্য করিয়া তাহার উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া দিতে সম্মত হয় নাই, অবশেষে মূর্খ গোপীনাথ বৈবাহিকের যুক্তি গ্রহণ করিয়া পুত্রকে তাহার শ্বশুরগৃহে পাঠাইতে রাজী হইল। রঘু সংবাদ শুনিয়া যতটা খুসী হইল, তাহার মা ও মাতামহী তেমনিই অসন্তুষ্ট হইলেন, রঘুর মা রাগিয়া বলিলেন "সহরের ডাকিনী-ঘরে এনে এই হলো! যখন দেখেছি বউ ফিরিঙ্গী মেমেদের মতন খোঁপা বাঁধে, বাঙ্গালীদের মতন সাড়ি পরে, খড়কে দিয়ে সিঁন্দুর লাগায়, তখনি জেনেছি ছেলের আমার মঙ্গল নেই! ছেলে আমি ছেড়ে দোব না।" কিন্তু তাঁহাদের আপত্তি টিকিল না, গোপীনাথের কুটিরে একদিন তাহার বৈবাহিকের পদধূলির সঙ্গে সঙ্গে, তাহার পুরবাসিনীদের মরাকান্নার মধ্য দিয়া, রঘু শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল। বৈবাহিকের "অভ্যর্থনার সখের গালি" তাঁহার মস্তকে অজস্র অভিশাপের ধারার মতন পশ্চাৎ হইতে বর্ষিত হইতে লাগিল।

রঘুর উৎসাহ ও আনন্দের প্রথম আবেগ মতিয়ার অশ্রুম্লান করুণ দৃষ্টিতে ঈষৎ প্রতিহত হইয়া আসিল, দ্বারের পিছন হইতে সে মুখ বাড়াইয়া অজস্র ধারার ক্ষীণদৃষ্টি নিঃশব্দে রঘুনাথের মুখে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিল। শ্বশুরের হাত [illegible] রঘু নিকটে আসিয়া দুই হাতে [illegible] আদরের সঙ্গে ধরিয়া সান্ত্বনার স্বরে কহিল "কাঁদিস্ নে মতিয়া, আবার আসবো, আবার আমাদের খেলা হবে, মাছ ধরা টরা সব হবে।"

"না রঘু তুমি যেও না, বউ তোমায় আর আস্‌তে দেবে না, কি হবে রঘু তুমি যেও না।" রঘুনাথ সদম্ভে বলিয়া উঠিল "ই-স্ বউ আমার সঙ্গে পারবে কি না, তুই কেন ভয় করিস্? বউ খেলাটেলা জানে না, খালি বই পড়ে, তার সঙ্গে কিছুতে মিল হবে না, ঠিক চলে আসবো।"

রঘুনাথ দু চার দিনের মধ্যেই বুঝিল, সে সংরের চেয়ে তাহার গ্রাম্য জীবন শতাংশে ছিল ভাল; সেই গাছে গাছে পেয়ারা আম ও জাম পাড়িয়া বেড়ান, জলে পড়িয়া

দু তিন ঘণ্টা নদী উলোটপালট করিয়া সঙ্গীগণের সহিত সাঁতার কাটা, তীরে বসিয়া মাছধরা, ভুট্টাক্ষেত্র হইতে তাজা ভুট্টা ভাঙ্গিয়া সদলবলে আনন্দ ভোজন, পাখীর বাসা হইতে শাবক ও চাষীর ক্ষেত হইতে শশা চুরি, অবাধ স্বাধীনতার সহিত মুক্ত বিচরণ ও সব চেয়ে বাল্যসঙ্গিনী মতিয়ার সহিত খেলা-ধূলা ও বিবাদ-কলহ এ সকলের পরিবর্ত্তে বন্দীর মতন জনমুখরিত নগরীর মধ্যবর্ত্তী বন্দীশালার ন্যায় গৃহে বাস, নিয়মিত পরিমিতাহারান্তে গাড়ি চাপিয়া স্কুলে গমন, প্রাতে সন্ধ্যায় কঠোর কর্ত্তব্য-পরায়ণ শিক্ষকের নিকট পাঠাভ্যাস এবং রাত্রে মিতভাষিণী শিক্ষিতা স্ত্রীর সঙ্গ তাহাকে যেন মর্ম্মের মধ্যে পীড়ন করিতে লাগিল। বনের হরিণকে গৃহে আনিলে সে যেমন কি[illegible] মানিতে চাহে না, গ্রাম্য বা[illegible] চিত্ত তেমনি পরাধীনতার কঠিন [illegible] বদ্ধ থাকিয়া হাঁফাইয়া উঠিতেছিল। রঘু সকলকার আদর স্নেহ ও একান্ত সাবধানতার ভিতরে থাকিয়াও দিন দিন মনের স্ফূর্ত্তি ও শরীরের বল হারাইতে লাগিল, এত যত্ন এত আগ্রহ জামাইয়ের মনকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না দেখিয়া শিবশঙ্কর ও তাঁহার পত্নী নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, প্রতিবেশিনী একজন বঙ্গ-মহিলা শুনিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কহিলেন "'জন জামাই ভাগ্না, তিন নয় আপনা।' তা কি করবে দিদি ও রকম হয়েই থাকে।" চন্দনও স্বামীর অন্যমনস্কতা দেখিয়া অনেক সময় রাগ করিয়া দু'চার কথা শুনাইয়া দিতে ছাড়িত না, মধ্যে মধ্যে নিজেও অভিমান করিয়া কথা বন্ধ করিত, কিন্তু তাহাতেও স্বামীকে অবিচলিত দেখিয়া শেষে নিজেই যাচিয়া আবার কথা কহিত।

অবশেষে এক দিন আর থাকিতে না পারিয়া রঘু শ্বশুরকে মুখ ফুটিয়া বলিল "আমি বাড়ী যাবো।" শিবশঙ্কর আদর করিয়া কহিলেন "কেন বাবা এখানে কি কষ্ট হচ্চে?" রঘু ঘাড় নাড়িল "হুঁ।" শিবশঙ্কর দুঃখিত হইলেন, জিজ্ঞাসা ক'রলেন "কি কষ্ট হয় বলো, আমি যাতে কষ্ট না হয় তাই করে দোব।" রঘু একটুখানি ভাবিয়া মাথা নাড়িল "না আমি বাড়ী যাবো, আমার মা বাবা আর মতিয়ার জন্য বড় মন কেমন করচে, মতিয়া যে আমায় শিগ্‌গির করে যেতে বলেছিল"—রঘুনাথের দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। শিবশঙ্কর একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মতিয়া কে? আমি তো কই মতিয়াকে দেখিনি।" রঘু চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল "আপনি মতিয়াকে দেখেন নি?" পরে একটু ভাবিয়া বলিল "সে একান্যদের একটি মেয়ে,—ছোট্ট, আমার চেয়েও ছোট্ট, আমি তাকে খুব ভালবাসি, সেও আমায় ভালবাসে। চন্দনের মতন কুঁদুলে নয়"—শিবশঙ্কর একটু আশ্চর্যভাবে কহিলেন "কেন চন্দন কি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে, বড় অন্যায় তো! ছেলে মানুষ, আচ্ছা আমি বারণ করে দোব এখন।" রঘু ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিল "ছেলে মানুষ! হ্যাঁ বড্ড তো ছেলে-মানুষ! আমার ওকে ভাল লাগে না, আমি বাড়ী যাবো।" শিবশঙ্কর বিব্রত হইয়া

উঠিলেন, "আচ্ছা তোমার বাবাকে চিঠি লিখি আগে, তিনি বলেন তো পাঠিয়ে দেবো।" শিবশঙ্কর কন্যাকে ডাকিয়া কিছু উপদেশ দিলে সে রাগিয়া গেল, রঘুর পড়িবার ঘরে আসিয়া চোখ মুখ লাল করিয়া বলিল, "আমার নামে বাবার কাছে লাগানো হয়েচে, আমি তোমার কি করেছি?" রঘু চন্দনকে ভয় করিত, থতমত খাইয়া গেল, ভীত ভাবে উত্তর দিল "তুমি তো ঝগড়া করো, তাই বলেছি বৈ তো না'!" "জানি জানি আমার কথায় তোমার গায়ে ফোস্কা পড়ে কি না, মতিয়ার কথা খুব মিষ্টি! বলনা তো তুমি, মতিয়া মতিয়া করো যে অত—" রঘু সরল চিত্তে দ্বিধাহীন ভাবে কহিল "আমি যে তাকে ভালবাসি—" "কি? তুমি তাকে—সেই ছোটলোকের মেয়েটাকে—ভালবাসো আর আমায় একটুও ভালবাসো না; আচ্ছা আচ্ছা দেখা যাবে আমি আর কখখোনো তোমার সঙ্গে কথা কবোনা তো" রঘু ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিল "তুমি শুধু শুধু বড্ড ঝগড়া করতে ভালবাসো। কেন তুমিও তো ছোট লোক, তোমাকে তবে সবাই কেন ভালবাসে? তারি বেলায় বুঝি যত দোষ, তুমি তাকে দুচক্ষে দেখতে পারো না, সে তোমার কি করেচে?" "কি তুমি আমায় ছোট লোক বল্লে? যাচ্ছি দাঁড়াও মার কাছে!" চন্দন কাঁদিয়া কাটিয়া কুরুক্ষেত্র করিল। মার কাছে নালিস করিয়া পিতার কাণে উঠাইয়া তারপর কিছু ক্ষণ পরে আবার নিজেই আসিয়া স্বামীর সহিত যাচিয়া ভাব করিল। রঘু সে দিনকার হাঙ্গামার পর হইতে মতিয়ার নাম চন্দনের সম্মুখে বড় একটা করিত না! কিন্তু তাহার অভাব ভিতরে ভিতরে তাহাকে সর্ব্বদাই পীড়ন করিতেছিল।

৬

তারপর ছয় বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রঘুনাথ এখন আর অসভ্য অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ের বালক নয়। তাহার এলবার্ট টেরি, সিল্কের পাঞ্জাবী ও ভূলুণ্ঠিত উড়ানির বাহার দেখিয়া সেই রূপার পদক ও সোণা মোড়া মোটা বালা পরা হৃষ্টপুষ্ট গ্রাম্য রঘুর কথা কাহারও আর মনেও পড়ে না। তাহার দেহ ও রুচির সহিত বুদ্ধিজ্ঞানও অনেকখানি মার্জ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাড়ির কথা আর তাহার বড় একটা মনেও পড়ে না, পড়িলেও সেখানের উপর আবর্ষাটা কমিয়াই গিয়াছিল। পিতা দুতিন বার লইতে আসিয়া পুত্রের অনিচ্ছা দেখিয়া [illegible] গিয়াছেন, শ্বশুরও জামাতা[illegible] মাটির বাড়ীর ড্যাম্প লাগি[illegible] অসুখ করে সেই ভয়ে যাইতে দিতে সম্মত নহেন। এবার দৈবগতিকে পুরা বর্ষার সময়েই রঘুনাথকে কিন্তু সস্ত্রীক বাড়ী আসিতে হইল—হঠাৎ সাত দিনের জ্বরে রঘুর পিতার মৃত্যু হইয়াছিল।—সঙ্গে কচি ছেলে, তাহার ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে স্পিরিট-ষ্টোভ, হরলিক্স মিল্ক, বিস্কুট প্রভৃতি সঙ্গে থাকা সত্বেও খাদ্যাভাব এবং এই সেঁৎসেঁতে বাড়ী, দড়ির খাটিয়া, শাশুড়ির দিন রাত কান্নাকাটি, আত্মীয়বর্গের হা হুতাশ, তাহার উপর আবার জানোয়ারের মতন অসভ্য লোকগুলার তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া ফেলিবার সকৌতূহল আগ্রহ, এই

সকল বিবিধ কারণে চন্দনকুমারী ভারি জ্বালাতন হইয়াই উঠিল এবং তাহাকে এমন জায়গায় সঙ্গে করিয়া আনা যে রঘুনাথের নিতান্তই অর্ব্বাচীনতা হইয়াছে, তাহা অসন্তোষের সহিত প্রকাশ করিতে ক্রটী করিল না। রঘুর মা এত দিন পরে ছেলেকে পাইয়া দুঃখে অভিমানে কাঁদিয়া ভাসিতে লাগিলেন, কিন্তু বধূর ভয়ে কিছুই বলিতে সাহস করিলেন না। যথাসময়ে শ্রাদ্ধ প্রভৃতি হইয়া গেল, সস্ত্রীক রঘুনাথ ফিরিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। কৃপণ পিতা অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। এবার রঘুনাথ শ্বশুরালয়ের নিকট পৃথক বাড়ী ভাড়া লইবে তাহার বন্দোবস্ত হইয়াছে। শুনিয়া তাহার মা কহিলেন "আমাকেও নিয়ে চ বাবা, এখানে কাকে নিয়ে থাকবো?" রঘু উত্তর করিল "বেশ তো" কিন্তু চন্দন শুনিয়া রাগ করিতে লাগিল বলিল 'তা তুমি আর তোমার মা থেকো, আমার বাপের বাড়ীতেই স্থান হবে; [illegible] রকম দেখে সবাই হাসবে, [illegible] থাকতে পারবো না।" রঘু [illegible] সহিত মাকে জানাইল—সে বাড়িতে ঘর কম তা তিনি গেলে না হয় সে নিজে নীচের ঘরে শয়ন করিয়া তাঁহাকে ঘর ছাড়িয়া দিতে পারে, খোকার জন্য একটা মুসলমান আয়া আনাইবার কথা ছিল তা না হয় তাহাকে আনিবার ব্যবস্থা এখন স্থগিদই করিবার চেষ্টা করিবে।

উথলিত অভিমান রুদ্ধ করিয়া বিধবা মলিন স্বরে কহিলেন—"থাক্, কাজ নেই সে সবে, তোমাদের কষ্ট হবে, আমি এখানেই থাকবো।" মনের মধ্যে একটুখানি লজ্জাবোধ করিলেও রঘু তাঁহাকে একটু সান্ত্বনাও দিতে পারিল না। সীতামারি হইতে ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বদিন বৈকালে চন্দন স্বামীর সহিত নদী তীরে বেড়াইতে গেল। এসব বিষয়েও সে লোক গঞ্জনা গ্রাহ্য করিত না। বলিয়াছি, তখন বর্ষাকাল; পূর্ব্বের মতন এবারও বাঘমতী জলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, দুইধারের শস্যক্ষেত্র সকল ভাসাইয়া দিয়াছে। জল দেখিতে দেখিতেই যেন তর তর করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল—বাঘমতীতে বন্যা আসিয়াছে। মাঠ জনশূন্যপ্রায়, গাছগুলা বৃষ্টিধৌত হইয়া গাঢ় সবুজ হইয়া উঠিয়াছিল, জলের মধ্য হইতে কোথাও ছোট ছোট জনেরা ভুট্টার গাছ মাথা উঁচু করিয়া আছে, কোথাও সারগাছের সাদাফুল জলের উপরে জলতরঙ্গের মতন বাতাসে কাঁপিতেছে। রঘুনাথ চন্দনের হাত ধরিয়া বেড়াইতে একটা পুষ্পিত মহুয়া গাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইল, ফুলে ফুলে গাছটার সবুজ পাতাগুলা প্রায় দেখা যাইতেছিল না, এবং মহুয়ার তীব্র গন্ধে মৌমাছির দল আকুল হইয়া বহু দূর হইতে ছুটিয়া আসিতেছিল। চন্দন মুগ্ধনেত্রে দেখিতে দেখিতে বলিল—"বাঃ, নদীটি বড় সুন্দর তো! প্রবেশেও এমন জায়গা আছে!" রঘু হাসিয়া কহিয়া কহিল—তা আছে বই কি, কোথাও কেবল বন থাকতে পারে না। এই আমার ছোট বেলায় খেলার জায়গা"—বলিতে বলিতে তাহার স্মৃতি মন্দিরের রুদ্ধ কপাট যেন সহসা খুলিয়া গেল।

বিদায়ের সময়ে রোরুদ্যমানা জননীর পার্শ্বে রঘু একখানি পুরাতন পরিচিত মুখ দেখিল! খুকীকে কোলে লইয়া—ও কে? মতিয়া নয়? মতিয়াই ত! রঘুর প্রশ্নে কে বলিল—চিনতে পারচ না? মতিয়ার যে বড় অসুখ, তোমরা যাচ্ছ বলে ও কোন রকমে দেখতে এসেছে!" একটু অপ্রতিভ হইয়া মতিয়ার চক্ষের দিকে চাহিয়া রঘু বলিল,—কেমন আছিস্ রে মতিয়া? তোর কি আজও বিয়ে হয় নি?" মতিয়া কোন উত্তর দিল না, তার ম্লান মুখ, প্রান্তে একটু ক্ষীণ হাসি দেখা দিল—সে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইল "চোখে কি পড়িল বুঝি"—

"ট্রেণ ফেল করবে না কি?"—"না না, এই যে যাই! খুকীকে দেরে মতিয়া।"

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

ষড় দর্শন।*

৩

প্রথমতঃ—প্রমাণদ্বারা আমাদের কি রকম প্রয়োজন সাধিত হয়? এবং তাহার (প্রমাণের) লক্ষণ কি?—তাহা প্রদর্শন করা যাইতেছে।

অদ্বৈতবাদিগণ দ্বিবিধ পদার্থ স্বীকার করেন। সত্য এবং মিথ্যা।

সত্য পদার্থ জ্ঞান স্বরূপ। মিথ্যা পদার্থ সকল কল্পিত এবং জড় নামে পরিচিত। সত্য বা জ্ঞান স্বপ্রকাশ, মিথ্যা বা জড় অপ্রকাশ। জ্ঞান অন্যের সাহায্য ব্যতীতই আলোকের মত প্রকাশিত হয়। জড় (মিথ্যা) পদার্থ স্বয়ং প্রকাশিত হইতে পারে না। উক্ত জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞান সকল সময়ে স্বয়ং প্রকাশিত হয় না, বা অন্যকেও বিশেষ ভাবে প্রকাশ করে না, সে জন্য অদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞানের একটি আবরণ স্বীকার করেন। এই আবরণই তাঁহাদের মতে অবিদ্যা, অজ্ঞান, মায়া প্রভৃতি নামে পরিচিত। এই অজ্ঞান অন্ধকারের মত দ্বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকে। প্রথমতঃ যে স্থানে অবস্থান করে, সে স্থানের প্রকৃত অবস্থা গোপন এবং তৎপরে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কোন সময়ে অন্য রকম পদার্থের উদ্ভাবন (অর্থাৎ উৎপাদন) করিয়া থাকে। উক্ত দ্বিবিধ কার্য্যের উৎপত্তি হয় বলিয়া, এক অজ্ঞানেরই আবরণ ও বিক্ষেপ (অর্থাৎ উৎপাদক) নামক দ্বিবিধ শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। আবরণ-শক্তির সাহায্য ব্যতীত বিক্ষেপ-শক্তি কোন কার্য্য করিতে পারে না। সে জন্য জ্ঞানাবরণ বিদূরিত বা বিনষ্ট হইলে কল্পিত পদার্থের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। আবরণ শক্তি দ্বারা কোন [illegible] হইলে, তখনই সেই বস্তুতে [illegible] (অর্থাৎ অজ্ঞাততা) উৎপন্ন হয়। সেই অজ্ঞাত ভাবের দূরীকরণ বা বিনাশেই প্রমাণের প্রয়োজন। যেমন আমাদের হস্তাদি ক্রিয়া দ্বারা আলোকাবরণ বস্ত্রাদি বিদূরিত বা বিনষ্ট হয়, সেইরূপ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া দ্বারা জ্ঞানালোকের আবরণ রূপ অজ্ঞান বিদূরিত বা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াই, বেদান্ত পরিভাষায় ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র, প্রমা ও প্রমাণের লক্ষণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, অজ্ঞাত ও অবাধিত † বিষয়ে যে জ্ঞান হয়

---

* রাজসাহী রাণী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে পঠিত। ১৩১৪ সালের চৈত্র এবং ১৩১৫ সালের আশ্বিনের সংখ্যায় এই প্রবন্ধের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই অংশে প্রয়োজনের সাধারণ লক্ষণ, প্রয়োজনের বিভাগ, দর্শন শাস্ত্রের রচনা ও অধ্যয়নের প্রয়োজন, দর্শনশাস্ত্র রচনার সময়, দর্শন শাস্ত্রের বিভাগ, ষড়্‌দর্শন-শব্দ ব্যবহারের কারণ, আস্তিক দর্শন ও নাস্তিক দর্শনের ঐকমত্য ও মতভেদ, বেদান্ত দর্শনের প্রাধান্য, বেদান্ত সূত্র রচনার সময়, শঙ্কর ও শাঙ্কর ভাষ্যের সময়, অদ্বৈতবাদের মূলভিত্তি, ন্যায় দর্শন সম্মত বিচার প্রণালী, ব্রহ্মের লক্ষণ, কার্য্যকারণ ভাব সম্বন্ধে মত ভেদ, ব্রহ্ম-বিবরণ ভাব সম্বন্ধে মত ভেদ, ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদ এবং ব্রহ্ম পরিণামবাদ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

† যে স্থানে যে সময়ে যে পদার্থ বর্ত্তমান থাকে সে স্থানে সে সময়ে সে পদার্থকে অবাধিত বলা যায়

তাহার নাম প্রমা, এবং যদ্দ্বারা উক্ত প্রমাজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার নাম প্রমাণ। প্রথমতঃ আমাদের চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন পদার্থের সম্বন্ধ হইলে, তখনই সেই পদার্থ সম্বন্ধে মনের একরকম অবস্থা বা ভাব উৎপন্ন হয়। এই ভাব বা অবস্থা বেদান্তশাস্ত্রে 'বিষয়াকার মনোবৃত্তি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই বিষয়াকার মনোবৃত্তি হইলে, স্বপ্রকাশ জ্ঞানের পরিস্ফোরণ হয়, সেজন্য তাহাকেও জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। বাস্তবিক বেদান্ত মতে নিত্য-জ্ঞানরূপ ব্রহ্মই জ্ঞানশব্দের মুখ্যার্থ। যেমন দশা ও তৈল সংযুক্ত অগ্নিদ্বারা গৃহাদি প্রকাশিত হয়, সেইরূপ, পূর্ব্বোক্ত মনোবৃত্তি সংযুক্ত ব্রহ্মরূপ জ্ঞানদ্বারা, বিষয় সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে।

[illegible]ষয়াকার মনোবৃত্তির উৎপত্তি [illegible]র বিষয়ে জ্ঞাততা উৎপন্ন হয়, এবং [illegible] সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়ের অজ্ঞাতভাব বা জ্ঞানাবরক অজ্ঞানতা বিদূরিত বা বিনষ্ট হইয়া থাকে। তখন পূর্ব্বোক্ত মনোবৃত্তি ও জ্ঞানের মধ্যে কোনরূপ আবরণ থাকে না; সুতরাং তখন জ্ঞানরূপ চৈতন্যদ্বারা জ্ঞেয় বিষয়, পূর্ব্বোক্ত মনোবৃত্তি, এবং প্রমাতা এই তিনই প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই মতে স্মৃতি অর্থাৎ স্মরণ প্রমাজ্ঞান নহে। কারণ অজ্ঞাত বিষয়ে কখনও কোন ব্যক্তিরই স্মৃতি উৎপন্ন হয় না। সুতরাং স্মৃতির কারণ প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। যাঁহারা স্মৃতির কারণকেও প্রমাণ মধ্যে গণনা করেন তাঁহাদের মতে প্রমাণের লক্ষণ এই, যাহা-দ্বারা অবাধিত বিষয় জানা যায় তাহার নাম প্রমাণ। বিশেষ বিবেচনা করিলে স্মরণকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত মনে হয় না। কারণ, পূর্ব্বে যাহা অনুভূত হইয়াছে, তাহাই আমাদের স্মরণের বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্বতন অনুভবের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে; এই অবস্থায় স্মরণের পৃথক প্রামাণ্য স্বীকার নিষ্প্রয়োজন মনে হয়।

বেদান্তসূত্র ও তদীয় ভাষ্য হইতে প্রমাণ সম্বন্ধে কোন বিষয়ই স্পষ্টতঃ জানা যায় না। সূত্র ও ভাষ্য সম্মত প্রমাণ কত প্রকার তাহা বলা বড়ই কঠিন। বেদান্ত পরিভাষা গ্রন্থে প্রমাণের যেরূপ বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে, আমি তদনুসারেই এস্থানে তাহার বর্ণনা করিব।

বেদান্ত পরিভাষায় লিখিত আছে যে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, শাব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি ভেদে প্রমাজ্ঞান ষড়্বিধ। সুতরাং তাহার করণ প্রমাণও ষড়্বিধ, অর্থাৎ ছয় প্রকার।

প্রমাজ্ঞান ও তাহার করণ প্রমাণ ছয় প্রকার হইলেও আমরা আপাততঃ তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রামাণ্য সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান অনুমিতি প্রভৃতিভেদে পাঁচ প্রকার, ইহা বৈদান্তিক ও মীমাংসকগণ স্বীকার করেন। কিন্তু বৈশেষিক ও বৌদ্ধদার্শনিকগণ অনুমিতির অতিরিক্ত কোনও অপ্রত্যক্ষজ্ঞানেরই প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। সাংখ্য দর্শনকার কপিল ও যোগদর্শনকার পতঞ্জলি অনুমিতি ও শাব্দ এই দ্বিবিধ অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকগণ

অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ এই ত্রিবিধ অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এখানে এই সব বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা করিতে হইলে বেদান্ত মত হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িতে হয়, উক্ত দর্শন সকলের স্ব স্ব মতের বিচার সময়ে এই বিষয় সকলের যথাসম্ভব বিস্তৃত বিচার করিতে ইচ্ছা রহিল।

এক্ষণে বেদান্ত সম্মত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রভেদ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

আমাদের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, সকল জ্ঞানেই, তিনটী বিষয় অনুভূত হয়। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান। যিনি জানেন তিনি জ্ঞাতা, যে বস্তুটী জ্ঞান দ্বারা বুঝা যায় তাহা জ্ঞেয়, যাহা দ্বারা জ্ঞেয় বিষয়টী নিয়মিতভাবে বুঝা যায় তাহার নাম জ্ঞান। যে জ্ঞান সময়ে উক্ত তিনটী পদার্থই এক স্থানে উপলব্ধ হয় এবং একটীর অস্তিত্ব থাকিলেই অপরটী থাকিতে পারে এইরূপ মনে হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞান সময়ে উক্ত তিনটীই একস্থানে অবস্থান করে এবং একটীর অস্তিত্ব থাকিলে ঐ অপরটীরই সত্তা অনুভূত হইতে পারে। যথা ক্রমে এই বিষয়টীর বর্ণনা করা যাইতেছে। অদ্বৈত বাদানুসারে জড় পদার্থ সকল, সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মরূপ চৈতন্যে (অর্থাৎ জ্ঞানে) কল্পিত। কল্পিত পদার্থের নিজের অস্তিত্ব নাই, যাহাতে কল্পিত হয়, তাহার অস্তিত্ব দ্বারাই ঐ সকল পদার্থ সৎরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। উক্ত চৈতন্যের অর্থাৎ জ্ঞানের স্বাভাবিক কোন ভেদ নাই। কল্পিত পদার্থ দ্বারা তাহা বিভিন্নরূপে অনুভূত হয়। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই তিনটী ভাবও একমাত্র পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যে (জ্ঞানে) কল্পিত। চৈতন্যের (জ্ঞানের) যে অংশ আমাদের অন্তঃকরণ দ্বারা সীমাবদ্ধ অর্থাৎ যে অংশে আমাদের অন্তঃকরণ কল্পিত, সেই চৈতন্যাংশ জ্ঞাতৃ চৈতন্য। ঘটাদি বিষয় সকল চৈতন্যের যে অংশে কল্পিত তাহার নাম জ্ঞেয় চৈতন্য। অন্তঃকরণের ভাব অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিষয়াকার মনোবৃত্তি যে অংশে কল্পিত তাহার নাম জ্ঞান চৈতন্য। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উক্ত তিনটী চৈতন্যই এক বলিয়া মনে হয়। কারণ প্রত্যক্ষজ্ঞান সময়ে, আমাদের অন্তঃকরণ বা মন, ঘটাদি বিষয় দেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। সুতরাং তখন অন্তঃকরণ পরিচ্ছিন্ন পূর্ব্বোক্ত [illegible] শরীরের মধ্য হইতে ঘটা[illegible] পর্য্যন্ত সমভাবে পরিব্যাপ্ত থাকে। ঘটাদি বিষয় পরিচ্ছিন্ন চৈতন্য, মাত্র বিষয়দেশে অবস্থিত, কিন্তু সে সময়ে জ্ঞাতৃচৈতন্য শরীরের মধ্য দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিষয় দেশ পর্য্যন্ত সমভাবে অবস্থিত থাকায়, বিষয় চৈতন্যটী, জ্ঞাতার একাংশরূপে বর্ত্তমান থাকে। এই অবস্থায় জ্ঞাতৃচৈতন্য বৃহৎ এবং জ্ঞেয় চৈতন্য তাহার অংশস্বরূপ, সুতরাং তাহার অপেক্ষা ক্ষুদ্র। বৃহৎ পদার্থ থাকিলেই, তাহার অংশ স্বরূপ ক্ষুদ্র পদার্থ অবস্থিত থাকে। যেমন দশ হাত দীর্ঘ বস্ত্র অবস্থিত থাকিলে, তাহার অংশরূপে এক হাত দীর্ঘ বস্ত্রের অবস্থিতি স্বতঃসিদ্ধ, সেইরূপ প্রত্যক্ষ সময়ে জ্ঞাতৃচৈতন্য অবস্থিত থাকিলে

জ্ঞেয় চৈতন্যের অবস্থিতিও স্বতঃসিদ্ধ, কাজেই তখন, জ্ঞেয় চৈতন্য জ্ঞাতৃচৈতন্যের অভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। এবং পূর্ব্বোক্ত অন্তঃকরণ বৃত্তি, পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান চৈতন্য ও জ্ঞেয় চৈতন্য হইতে, অভিন্ন ভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। আমাদের অন্তঃকরণ আলোকের মত অতি অল্প সময়ে অধিক দূরে গমন করিতে পারে. সেজন্য বৈদান্তিক-গণ তাহাকে তৈজস পদার্থ মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। যেমন আলোক, গবাক্ষ-রূপ ছিদ্রদ্বারা গৃহমধ্যে পতিত হইয়া গৃহাকার ধারণ করে, সেইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান সময়ে, আমাদের অন্তঃকরণ, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় রূপ ছিদ্রদ্বারা, আংশিক ভাবে নির্গত হইয়া, ঘটাদি বিষয়ে পতিত হয়, এবং বিষয়াকার ধারণ করিয়া থাকে; অন্তঃকরণের [illegible]রিণ[illegible] অবস্থাই, পূর্ব্বোক্ত মনোভাব [illegible] নামে অভিহিত হইয়াছে। এই অন্তঃকরণ বৃত্তি পরিচ্ছন্ন জ্ঞান চৈতন্য, ও জ্ঞেয় বা বিষয় পরিচ্ছিন্ন চৈতন্য,—এই উভয়ই তখন একস্থানে অবস্থান করে। সুতরাং সে সময়ে তাহাদের পরস্পর বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না, বরং জ্ঞান চৈতন্য জ্ঞেয় বা বিষয় চৈতন্যের অভিন্ন রূপেই, পরিস্ফোরিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় ইহা স্থিরীকৃত হইতেছে যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানে জ্ঞাতৃচৈতন্যের অভিন্ন ভাবে জ্ঞেয় বা বিষয় চৈতন্য, এবং জ্ঞেয় বা বিষয় চৈতন্যের অভিন্ন ভাবে জ্ঞান চৈতন্য প্রকাশিত হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞানে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ চৈতন্যেরই এক অভিন্ন স্বীকার করা সঙ্গত। অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানে, উক্ত ত্রিবিধ চৈতন্যের একীভাব পরিলক্ষিত হইতে পারে না। কারণ তখন অন্তঃকরণের সহিত, জ্ঞেয় বস্তুর সাক্ষাৎ ভাবে কোন সম্বন্ধ হয় না, সে সময়ে শরীরের মধ্যেই অন্তঃকরণ অবস্থান করে। এবং শরীর মধ্যস্থিত অন্তঃকরণেই, জ্ঞেয় বিষয়ের ভাব বা জ্ঞেয় বিষয়াকার অবস্থা অর্থাৎ অন্তঃকরণ বৃত্তি উৎপন্ন হয়। সুতরাং অন্তঃকরণ পরিচ্ছিন্ন শরীর মধ্যস্থ জ্ঞাতৃ-চৈতন্য, জ্ঞেয় ঘটাদি বিষয় পরিচ্ছিন্ন বহির্দ্দেশস্থ চৈতন্য হইতে অনেক দূরে অবস্থান করে, এবং অন্তঃকরণ বৃত্তি পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান চৈতন্য শরীর মধ্যেই বর্ত্তমান থাকে, অতএব তাহাও বিষয় চৈতন্যের দূরবর্ত্তী, কাজেই উক্ত ত্রিবিধ চৈতন্য এক স্থানে থাকিতে পারে না। অতএব অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানে উক্ত তিন রকম চৈতন্য অভিন্ন ভাবে অনুভূত হয় না। এই সিদ্ধান্তানুসারে এইরূপ লক্ষণও নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে যে, যে জ্ঞানে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ চৈতন্য একত্র অবস্থিত থাকায় এক বলিয়া প্রকাশিত হয় তাহা প্রত্যক্ষ, এবং যে জ্ঞানে উক্ত ত্রিবিধ চৈতন্য একত্র অবস্থিত হইতে পারে না, তাহার নাম অপ্রত্যক্ষ। জ্ঞেয় পদার্থের সঙ্গে জ্ঞাতার সম্বন্ধ বিশেষের নাম জ্ঞান। অর্থাৎ যে রকম সম্বন্ধ হইলে জ্ঞাতা জ্ঞেয় বস্তুকে গ্রহণ পরিত্যাগ বা উপেক্ষা করিতে পারেন, সেই রকম জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃ সম্বন্ধকে জ্ঞান বলা যায়। সাক্ষাৎ ভাবে (অর্থাৎ অতি নিকট ভাবে), জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার উক্ত সম্বন্ধের নাম প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এবং দূরস্থ জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার উক্ত সম্বন্ধের নাম অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার

সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয় বলিয়া, তাহাকে সাক্ষাৎকার বলা হইয়া থাকে। যাহা বর্ত্তমান ও নিকটবর্ত্তী, তাহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হয়, অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম নাই। অতীত ভবিষ্যৎ ও দূরস্থ পদার্থ সকলও তাহার বিষয় হইয়া থাকে। সেজন্যই এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে "সম্বদ্ধং বর্ত্তমানঞ্চ গৃহ্যতে চক্ষুরাদিনা" ইন্দ্রিয় সংসৃষ্ট নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান পদার্থই চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্ব্ববাদিসিদ্ধ এবং সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের কারণ। সেজন্য প্রমাণ নিরূপণ সময়ে, সকল দার্শনিকই প্রথমে প্রত্যক্ষের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তাহা সকল প্রমাণের অগ্রগণ্য ইহাও বৈদান্তিক ভিন্ন সকল দার্শনিকই বলিয়া থাকেন। কিন্তু বৈদান্তবাদিগণ বেদান্ত বাক্যকেই প্রমাণের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি জ্ঞানদ্বারা বিশুদ্ধ ভাবাপন্ন কোন বস্তুই জানা যায় না, মিশ্রিত বস্তুই তদ্দ্বারা জানা যায়। মিশ্রিত বস্তু সকলই কল্পিত। কল্পিত পদার্থ বিষয়ে, যে জ্ঞান হয়, তাহা কখনও যথার্থ জ্ঞান নহে। বিশেষতঃ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অপরীক্ষিত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কারণ অনেক সময়ে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, দোষযুক্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা হইয়া থাকে। সেজন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান কি না—ইহার পরীক্ষা আবশ্যক।

অন্যান্য প্রমাণদ্বারা প্রত্যক্ষ বিষয় পরীক্ষিত হইলেই তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। এই জন্য নারদ স্মৃতির সাক্ষিপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে—

"তলবদ্দৃশ্যতে ব্যোম খদ্যোতো হব্যবাড়িব।
ন তলং বিদ্যতে ব্যোম্নি ন খদ্যোতো
হুতাশনঃ॥
তস্মাৎ প্রত্যক্ষদৃষ্টেঽপি যুক্তমর্থে পরীক্ষিতুং"

অর্থাৎ আকাশ কড়ায়ের মত, এবং খদ্যোত অগ্নির মত দৃষ্ট হইয়া থাকে কিন্তু বাস্তবিক আকাশ কড়াই নহে বা খদ্যোতও অগ্নি নহে। সে জন্য প্রত্যক্ষগত বিষয়েরও পরীক্ষা কর্ত্তব্য। আমরা আকাশকে নীলবর্ণ এবং চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণকে আপেক্ষিক ক্ষুদ্র রূপে দেখিয়া থাকি। কিন্তু অনুমান ও গণিত প্রধান জ্যোতিঃশাস্ত্রদ্বারা বিপরীতভাবে পরীক্ষিত হওয়ায় তাহাতে কোন বিবেচক ব্যক্তিই বিশ্বাস স্থাপন করেন না। বরং তাহাকে মিথ্যা জ্ঞান বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

ফল কথা, মিশ্রিত ভাবাপন্ন বস্তু সম্বন্ধে আমাদের যে সকল জ্ঞান হয়, তাহাতে অনেক সময়েই প্রামাণ্য সংশয় হইয়া থাকে। কিন্তু বেদান্ত বাক্য দ্বারা ব্রহ্ম বিষয়ে যে জ্ঞান হয়, তাহার বিষয় একমাত্র বিশুদ্ধ ব্রহ্ম। একমাত্র পদার্থ যে জ্ঞানের বিষয় তাহাতে কোনরূপ অপ্রামাণ্যের সম্ভাবনা নাই। মিলিত পদার্থ জ্ঞানেই তাহা সম্ভাবনা [illegible], অদ্বৈতবাদিগণের মতে [illegible] মাত্রই পর-প্রকাশ্য। [illegible] তাহা কখন ও সন্দিগ্ধ, কখন [illegible] বিপর্য্যস্ত, অর্থাৎ বিপরীত ভাবে জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং সেই রকম পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের যে সকল জ্ঞান হয়, তাহাতে সকল সময়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। বেদান্ত প্রতিপাদ্য বিশুদ্ধ ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ জ্ঞান স্বরূপ। ইহাই আমাদের আত্মা। আমার জ্ঞান আছে কি না? এবং আমি আছি কি না? বা আমার আত্মা আছে কি না?—এইরূপ, কিংবা আমার আত্মা নাই এইরূপ নিশ্চয়রূপ বিপরীত জ্ঞান, কোন ব্যক্তিরই কখনও হইতে দেখা যায় না। যুক্তি প্রধান অনুমান প্রভৃতির সাহায্যে জড় পদার্থ সমূহের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে, বেদান্ত বাক্য দ্বারা আত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধ

...ন উৎপন্ন হয়, তাহাতে কোনরূপ অপ্রামাণ্য থাকার সম্ভাবনা নাই। কারণ সংশয় জ্ঞানের বিষয় দুইটী পদার্থ। একটী মাত্র পদার্থকে অবলম্বন করিয়া কখনও তাহা হয় না। অল্লান্ধকারে কোন বৃক্ষ থাকলে তাহাতে এইরূপ সংশয় হয়—যে "ইহা মনুষ্য কি বৃক্ষ"। এ স্থলে মনুষ্য ও বৃক্ষ উভয়ই সংশয়ের বিষয়। যদি কোন কারণে এরূপ জানা যায় যে "ইহা মনুষ্য নহে," তাহা হইলে উক্ত সংশয় দূরীভূত হয়; অধিকন্তু সেই অবস্থায় "ইহা বৃক্ষ" এইরূপ অবধারণই হইয়া থাকে ও তাহার উপর কোনরূপ অপ্রামাণ্য বা অবিশ্বাস থাকে না। সেইরূপ, যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা জড় জগতের মিথ্যাত্ব অসন্দিগ্ধ ভাবে স্থাপিত হইলে বেদান্ত বাক্য দ্বারা আত্মার বিষয়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা বিশ্বাস্য ভাবে সমাদৃত হইতে পারে। ইহা অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত। অদ্বৈত সিদ্ধি গ্রন্থে মধুসূদন সরস্বতী কর্ত্তৃক এই বিষয়টী বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বেদান্তের প্রামাণ্য ও আত্মতত্ব নিরূপণ ... অবস্থার বিস্তৃত বিচার করিতে ... হইবে।

প্রত্যক্ষ নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক ভেদে দুই প্রকার। কোন বস্তুর সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে, তখনই সেই বস্তু সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে এক প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেই জ্ঞান দ্বারা বস্তুটি কি রকম, বা তাহার গুণ ক্রিয়া প্রভৃতি কি—তাহা বিবেচিত হয় না। উক্ত প্রকার জ্ঞানই নির্ব্বিকল্পক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর সম্বন্ধ, নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানগম্য নহে। বস্তু সকল অসংসৃষ্ট ভাবে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান গম্য হইয়া থাকে। সেজন্য নির্ব্বিকল্পক গম্য বস্তু, আমরা শব্দ দ্বারা অন্যকে বুঝাইতে পারি না। পূর্ব্বোক্ত বেদান্ত বাক্য জন্য ব্রহ্মজ্ঞান, নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। কারণ যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ সমূহের মিথ্যাত্ব স্থিরীকৃত হইলে, একমাত্র ব্রহ্ম সত্তারূপে অবশিষ্ট থাকিবে। সুতরাং তখন ব্রহ্ম ভিন্ন কোন পদার্থের সত্তা অনুভূত হইতে পারে না। এই অবস্থায় বেদান্ত বাক্য দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে, তাহার বিষয় সংসৃষ্ট ভাবাপন্ন বস্তু হওয়া অসম্ভব। কারণ পরস্পর বিভিন্ন পদার্থদ্বয়ের জ্ঞান না থাকিলে, সংসৃষ্ট ভাব জ্ঞান হইতে পারে না। অতএব এরূপ স্বীকার করাই সঙ্গত যে, অদ্বিতীয় ও তদসংসৃষ্ট পদার্থ, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বেদান্ত বাক্য জন্য জ্ঞানের বিষয়। উক্ত জ্ঞান নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মাববোধ নামে, বেদান্ত শাস্ত্রে অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে নির্ব্বিকল্পগম্য পদার্থ, শব্দদ্বারা অন্যকে বুঝান যায় না এবং এক্ষণে বলা হইল যে বেদান্ত বাক্য নির্ব্বিকল্প ব্রহ্ম জ্ঞান উৎপাদন করে;—এই দুইটী কথার বিরোধ পরিহারার্থ আমার বক্তব্য এই যে শব্দদ্বারা কোন পদার্থই বিশেষ ভাবে প্রতিপাদিত হইতে পারে না। অন্য পদার্থের নিষেধ প্রদর্শন দ্বারা সাধারণ ভাবেই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। গুড় ও চিনির মাধুর্য্যের তারতম্য কেহই শব্দ দ্বারা বুঝাইতে পারেন না। তাহা দুগ্ধ ও খণ্ড প্রভৃতির মাধুর্য্য হইতে ভিন্ন, ইহা মাত্র শব্দদ্বারা প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। সেইরূপ নির্ব্বিকল্প অদ্বিতীয়, শব্দ দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রতিপাদিত হইতে পারে না। তিনি পরিদৃশ্যমান জড়বর্গ হইতে ভিন্ন, ইহা মাত্র শব্দ দ্বারা প্রতিপাদিত হয়। সে জন্য "যদ্বাচা নভ্যুদিতং" ইত্যাদি বিষয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। মহাবাক্যার্থ নিরূপণে এই বিষয়ের বিস্তৃত বিচার প্রদর্শিত হইবে। ক্রমশ।

শ্রীগুরুচরণ তর্কদর্শন তীর্থ।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত

জ্ঞানে

ত্রয়োদশ বর্ষ]　　　　আশ্বিন, ১৩২০　　　　[ষষ্ঠ সংখ্যা

বঙ্গদর্শন

(নব পর্য্যায়)

মাসিক পত্র

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত

কলিকাতা, ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

মজুমদার লাইব্রেরি হইতে এস্ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বর্ত্তমান সংখ্যার মূল্য ।৵০　　　　অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০

সূচী

বঙ্গদর্শন।

নিমাই-চরিত্র

একবিংশ অধ্যায়

রামানন্দ রায় মিলন

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে গৌর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এবং ফাল্গুন মাসে পুরুষোত্তমে উপনীত হন। ফাল্গুন ও চৈত্র গত হইয়াছে। বৈশাখ মাসে গৌর বন্ধুবান্ধবদিগকে ডাকিয়া কহিলেন "অগ্রজ বিশ্বরূপের সন্ধানে আমি দক্ষিণে যাইব মনস্থ করিয়াছি। তোমাদের অনুমতি হইলে আমি একাকী গমন করিতে চাই। যতদিন আমি নীলাচলে প্রত্যাগত না হই, ততদিন তোমরা এখানে আমার প্রতীক্ষা করিও।" প্রত্যাসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় ভক্তগণ বিষণ্ণ হইলেন। নিত্যানন্দ কহিলেন "একাকী যাওয়া ভাল নহে, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" গৌর উত্তর করিলেন "তুমি ত অনবরত আমাকে নাচাইতেছ। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আমি বৃন্দাবন যাত্রা করিলাম, তুমি আমাকে ভুলাইয়া লইয়া গেলে অদ্বৈতের বাড়ী। নীলাচলে আসিবার পথে তুমি আমার দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। তোমাদিগের স্নেহে আমার কর্ত্তব্য-হানি ঘটিতেছে। জগদানন্দ ত আমাকে বিষয় ভোগ না করাইয়া ছাড়িবে না। যদি কখনও তাহার বাক্যের অন্যথা করি, তিন দিন সে আমার সহিত বাক্যালাপ করে না। আমার সন্ন্যাসদুঃখ মুকুন্দের অসহ্য। দামোদর অনবরত আমার উপর শিক্ষাদণ্ড উদ্যত করিয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁহার লোকাপেক্ষা নাই, কিন্তু আমি ত লোকাপেক্ষা ত্যাগ করিতে পারি না। আমার জন্য তোমাদিগকে দুঃখিত দেখিলে, তোমাদের দুঃখ দ্বিগুণ হইয়া আমাকে পীড়া দেয়। তাই আমার ইচ্ছা, কিছুদিন একাকী ভ্রমণ করিয়া আসি।" অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল, কৃষ্ণদাস নামক এক সরলমতি ব্রাহ্মণ জলপাত্র ও বহির্বাস বহিবার জন্য সঙ্গে যাইবে। চারি দিন পরে গৌর বিদায়গ্রহণ করিলেন। যাত্রাকালে সার্ব্বভৌম কহিলেন "গোদাবরী-তটে বিদ্যানগরে রায় রামানন্দ নামক এক ভক্ত আছেন। শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে এতদিন আমি তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছি। তোমার কৃপায় তাঁহার মহত্ত্ব এখন বুঝিতে পারিয়াছি, তিনি তোমার সঙ্গী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার সহিত অবশ্য অবশ্য সাক্ষাৎ করিও।" অঙ্গীকার করিয়া গৌর যাত্রা করিলেন। রোদন করিতে করিতে তাঁহার ভক্তগণ আলালনাথ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। আলালনাথে দেববিগ্রহের সম্মুখে বহু নৃত্যগীত হইল। দলে দলে লোক গৌরকে দেখিতে আসিয়া ভক্তি লাভ করিল।

আলালনাথ হইতে 'হরি' 'হরি' বলিয়া গৌর যাত্রা করিলেন। মুখে কেবল—

কৃষ্ণ [illegible] কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রক্ষ মাং
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, পাহি মাং॥
রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব, রক্ষ মাং
কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, পাহি মাং॥

তিনি যে গ্রামের ভিতর দিয়া গমন করিলেন, তাঁহার প্রেমমূর্ত্তি দেখিয়া ও প্রেম-সঙ্গীত শুনিয়া তথাকার যাবতীয় লোক হরি-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। এ সমস্ত লোক কর্ত্তৃক হরিনাম গ্রামান্তরে প্রচারিত হইতে লাগিল। দক্ষিণের গ্রামে গ্রামে কীর্ত্তন ধ্বনি উত্থিত হইল। কূর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইয়া গৌর কূর্ম্মমূর্ত্তির সম্মুখে প্রেমবিহ্বল অবস্থায় নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া দলে দলে লোক দেবালয়ে সমাগত হইল। কূর্ম্মনামক এক ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া গেলেন এবং সপরিবারে তাঁহার পাদোদক পান করত পরম যত্নে তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। গৌর তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার কিয়ৎ-কাল পরেই বাসুদেব নামক এক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণ তথায় তাঁহার দর্শনোদ্দেশে সমাগত হইল। গৌর প্রস্থান করিয়াছেন শুনিয়া, ব্রাহ্মণ নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিল। এমন সময়ে অকস্মাৎ গৌর তথায় প্রত্যাগত হইয়া ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার স্পর্শে সেই গলিতকুষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল। নিরাময় ব্রাহ্মণ আনন্দভরে গৌরগুণ গান করিতে লাগিল।

বাসুদেবকে অনুগ্রহ করিয়া গৌর গোদাবরী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গোদাবরী-দর্শনে গৌরের যমুনার কথা মনে হইল; তত্তীরস্থ বনানি দর্শনে বৃন্দাবন স্মৃতিপথে উদিত হইল। গৌর গোদাবরী উত্তীর্ণ হইয়া তাহার তটে উপবেশন করত হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে বিবিধ আড়ম্বরের সহিত চতুর্দ্দোলারূঢ় রামানন্দ রায় স্নানার্থ নিকটস্থ ঘাটে উপস্থিত হইলেন, সন্ন্যাসী দর্শনে রামানন্দ সসম্ভ্রমে আসিয়া প্রণাম করিলেন। গাত্রোত্থান করিয়া গৌর কহিলেন 'তুমিই কি রায় রামানন্দ ?''

রামানন্দ উত্তর করিলেন "হাঁ, আমিই সেই শূদ্রবংশোদ্ভব দাস।" উভয়ের দর্শনে উভয়ের শরীরে স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, কম্প, পুলক, বৈবর্ণ্য, প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণসমূহ আবির্ভূত হইল। উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইলেন। আত্মসংবরণপূর্ব্বক গৌর কহিলেন "সার্ব্বভৌমের নিকট আমি তোমার গুণাবলি সমস্তই শ্রুত হইয়াছি, আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি।" রামানন্দ কহিলেন "আমার সহচর সহস্র ব্রাহ্মণ তোমার দর্শন মাত্রেই— 'কৃষ্ণ' নাম করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়াছে, অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। মানুষে কি এতাদৃশ ক্ষমতা সম্ভবপর ?" গৌর কহিলেন "পরম ভাগবত তুমি, তোমার দর্শনেই তোমার ব্রাহ্মণগণের মন দ্রবীভূত হইয়াছে। আমার মত মায়াবাদী সন্ন্যাসীও তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসমান হইয়াছে।" এমন সময়ে রামানন্দ-সঙ্গী ব্রাহ্মণ-গণ গৌরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণ গ্রহণ

করিয়া গৌর রামানন্দকে কহিলেন "আবার যেন দর্শন পাই।" রামানন্দ কয়েকদিন তথায় থাকিবার জন্ম অনুরোধ করিয়া প্রণামান্তর বিদায় গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যাকালে রামানন্দের জন্ম গৌর উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন, এমন সময়ে রামানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দুইজনে তত্ত্বালাপ আরম্ভ হইল। গৌর কহিলেন "সাধ্য কি, তাহা নির্ণয় কর।"

রামানন্দ—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥

বিষ্ণুপুরাণ—৩৮৮

পরমপুরুষ বিষ্ণু বর্ণাশ্রমাচারসম্পন্ন পুরুষ কর্ত্তৃক আরাধিত হন। বর্ণাশ্রমাচার ভিন্ন তাঁহার প্রীতি সাধনের দ্বিতীয় পন্থা নাই।

গৌর—ইহা বাহ্য; ইহার পরে কি বল।

রামা—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

গীতা—৯।২৭

হে কৌন্তেয়, যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যে তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাকে সমর্পণ কর।

গৌর—ইহা বাহিরের কথা; ইহার পরে কি বল।

রামা—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

ভাগবত—১১।১১।৩২

মৎকর্ত্তৃক যাহা যাহা আদিষ্ট হইয়াছে, তাহার দোষগুণ বিচারপূর্ব্বক তৎসমস্ত পরিত্যাগ করত যে ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন, তিনিই সত্তম।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

গীতা—১৮।৬৬

সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব; শোক করিও না।

গৌর—এ ত বাহ্য; ইহার পরে কি বল।

রামা—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥

গীতা।১৮।৫৪।

"যিনি (জ্ঞানমিশ্র ভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক) ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন, তিনি কিছুতেই শোক করেন না। তিনি সর্ব্বভূতে সমভাবযুক্ত হইয়া, আমার প্রতি পরম ভক্তি লাভ করেন।" জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সাধ্যসার।

গৌর—ইহাও বাহিরে কথা; ইহার পরের কথা বল।

রামা—জ্ঞানশূন্য ভক্তিই সাধ্যসার।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব,
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১০।১৩

জ্ঞানলাভে প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা তোমাকেই কেবল প্রণাম করেন, এবং সাধুমুখনিঃসৃত ভবদীয় কথা শ্রবণ করত কায়মনোবাক্যে সৎপথস্থ হইয়া জীবন যাপন করেন, তুমি ত্রিভুবনদুষ্প্রাপ্য হইলেও তাঁহাদিগের নিকট সুখলভ্য।

গৌর—ইহাও বাহ্য; ইহার পরে কি বল।

রামা—প্রেমভক্তিই সর্ব্বধর্ম্মের সার।

গৌর—ইহাও হয়; কিন্তু ইহার পরে কি বল।

রামা—দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে॥

শ্রীমদ্ভাগবত—৯।৫।১১

যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র পুরুষ নির্ম্মল হয়, তাঁহার দাসগণের আবার কি প্রাপ্য অবশিষ্ট থাকে?

গৌর—ইহাও হয়, কিন্তু ইহারও পরে কি আছে বল।

রামা সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ।

শ্রীমদ্ভাগবত—১০।১২।১১

যিনি এইরূপ ব্রহ্মসুখানুভূতিস্বরূপে সাধুগণের নিকট, পরদেবতারূপে দাস্যরসের ভক্তগণের নিকট এবং নরশিশুরূপে মায়াশ্রিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রকাশিত হন, সেই ভগবান্ কৃষ্ণের সহিত কৃতপুণ্য ব্রজরাখালগণ বিহার করিয়াছিলেন।

গৌর—উত্তম, কিন্তু ইহার পরে কি বল।

রামা—বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।

নেমং বিরিঞ্চির্ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ।

ভাগবত—৯ ১৫

গোপী যশোদা মুক্তিদাতা শ্রীহরির নিকট যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিল, ব্রহ্মা, মহাদেব ও তাঁহার বক্ষস্থিতা লক্ষ্মীও তাহা প্রাপ্ত হন নাই।

গৌর—ইহাও উত্তম, ইহার পর কি আছে বল।

রামা—কান্তভাব সর্ব্বসাধ্যসার।

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্।

রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণ বাহুদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-ব্রজসুন্দরীগণের যে প্রসাদ সমুদিত হইয়াছিল, অন্যের কথা দূরে থাকুক, নিতান্তানুরাগিণী লক্ষ্মী ও নলিনগন্ধবতী স্বর্গকামিনীগণেরও তাহা প্রাপ্য হয় নাই।

কৃষ্ণ প্রাপ্তির বহুবিধ উপায় আছে; তাহার তারতম্যও আছে। কিন্তু যাহার যে ভাব, তাহাই তাহার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তটস্থ হইয়া বিচার করিলে তারতম্য বোধ করা যায়।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—রস পাঁচটী। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি—এই পঞ্চ ভূতের মধ্যে যেমন আকাশের গুণ বায়ুতে, বায়ুর গুণ তেজে, তেজের গুণ জলে ও জলের গুণ ক্ষিতিতে আছে, তেমনি পঞ্চরসের প্রত্যেকের গুণ তাহার পরবর্ত্তী রসের মধ্যে নিহিত আছে। শান্ত, সখ্য ও বাৎসল্য সকলের গুণই মধুর রসে আছে। এই মধুর রসেই পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়।

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাং ভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

ভাগবত—১০।৩২।২২

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—সুন্দরীগণ, তোমাদিগের সহিত আমার প্রেমসংযোগ নিরবদ্য; বহু ব্রহ্মপাত কাল জীবন ধারণ করিয়াও তোমাদিগের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে সক্ষম হইব না। কেননা, তোমরা দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ। তোমাদিগের ঋণ পরিশোধ করিতে আমি সমর্থ নহি। অতএব নিজ নিজ সাধু ব্যবহার দ্বারাই তোমাদিগের কৃত সাধু ব্যবহারের বিনিময় হইল।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—তাঁহাকে যে যে ভাবে ভজনা করে, তিনি তাহাকে সেই ভাবেই ভজনা করিয়া থাকেন। মধুর ভাবে যাহারা তাঁহাকে ভজনা করে, তিনি তাহাদিগকে সেইরূপ ভাবে ভজনা করিতে সক্ষম হয়েন না বলিয়া সেই ভক্তগণের নিকট ঋণী থাকেন।

গৌর—সাধ্যের ইহাই সীমা বটে, তবে ইহারও পরে যাহা আছে কৃপা করিয়া বল।

রামা—ইহার পরের কথা জিজ্ঞাসা করে এমন লোক আছে—তাহা জানিতাম না। মধুর রসের মধ্যে রাধার প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গোপীগণ বলিয়াছিলেন—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ।
ভাগবত—১০।৩০।২৪

রাধিকা নিশ্চয়ই ঈশ্বর ভগবান্ হরির আরাধনা করিয়াছেন; যেহেতু কৃষ্ণ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া প্রসন্ন চিত্তে ইঁহাকেই বিজন প্রদেশে লইয়া গেলেন।

পদ্মপুরাণে আছে—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

রাধিকা যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয়, তাঁহার কুণ্ডও তদ্রূপ। গোপীগণের মধ্যে রাধিকাই কৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা।

গৌর—তোমার মুখে অমৃতনদী বহিতেছে। আচ্ছা, অন্যের অপেক্ষা থাকিলে প্রেমের গাঢ়তা প্রস্ফুরিত হয় না। গোপীগণের ভয়ে কৃষ্ণ রাধিকাকে চুরী করিয়াছিলেন। যদি রাধিকার জন্য গোপীগণকে ত্যাগ করিতেন, তাহা হইলেই রাধিকার জন্য তাঁহার গাঢ় অনুরাগ প্রকাশিত হইত।

রামানন্দ—কৃষ্ণ গোপীগণের রাসনৃত্য ত্যাগ করিয়া রাধার অন্বেষণ করিতে করিতে বিলাপ করত বনে বনে ফিরিয়াছিলেন। শত কোটি গোপীসঙ্গে রাস-বিলাস কালে একমূর্ত্তি রাধাপার্শ্বে সদা-সর্ব্বদা বিরাজ করিয়াছিল। রাধা অভিমান ভরে রাস পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণ তাঁহার অন্বেষণে রাসমণ্ডলী ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং কোথাও তাঁহার উদ্দেশ না পাইয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। শতকোটি গোপীতেও কৃষ্ণের কাম নির্ব্বাপিত হয় নাই,—এক রাধিকাতেই তাঁহার তৃপ্তি। ইহাতেই রাধিকার গুণ অনুমিত হইতে পারে।

গৌর—তোমার নিকট আমার আগমন সার্থক হইয়াছে। এখন কৃষ্ণ-রাধিকার স্বরূপ এবং রস ও প্রেমতত্ত্ব কিছু বল।

রাম—আমি ইহার কিছুই জানি না। তুমি যাহা বলাইতেছ—তাহাই বলিতেছি।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

কৃষ্ণই পরম ঈশ্বর, তিনিই সকলের আদি, তিনি স্বয়ং অনাদি। কৃষ্ণই গোবিন্দ এবং সর্ব্বকারণের কারণ।

প্রফুল্ল কমলানন, পীতাম্বর বনমালী মন্মথেরও মন মুগ্ধ করেন। নানাভাবাশ্রিত ভক্তগণের রসামৃতের তিনিই বিষয়স্বরূপ। তিনি শৃঙ্গার-রসরাজমূর্ত্তিধর, এবং অন্য যাবতীয় অবতারের মনোহারী। তিনি আপন মাধুর্য্যে আপনারই মন হরণ করেন এবং আপনাকে আপনি আলিঙ্গন করিতে চাহেন।

কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনা করিলাম। এখন রাধাতত্ত্ব কিছু বর্ণনা করি। কৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটী প্রধান—চিৎশক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। এই তিন শক্তি অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অন্তরঙ্গা কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি এবং ইহাই সর্ব্বপ্রধান। কৃষ্ণ সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তিও তদনুযায়ী ত্রিবিধ—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ। হ্লাদিনী শক্তি হেতু কৃষ্ণ সদা সুখসাগরে মগ্ন থাকেন। সুখস্বরূপ নিজ সুখ আস্বাদন করেন এবং ভক্তগণকে আস্বাদন করান। হ্লাদিনী শক্তিই ভক্তগণের সুখের কারণ। হ্লাদিনীর সারভূত অংশের নাম প্রেম, অথবা আনন্দচিন্ময় রস। এই প্রেমের সারতম অংশ মহাভাব বলিয়া খ্যাত। এই মহাভাবে কৃষ্ণের বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। শ্রীমতী রাধিকা মহাভাবস্বরূপা এবং একমাত্র তিনিই কৃষ্ণের বাঞ্ছাপূর্ত্তি করিতে সক্ষম।

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা,
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা।
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যা
বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরে রাধিকৈকা ন চান্যা।

কৃষ্ণের প্রেমের জন্মভূমি কে? একা শ্রীমতী রাধিকা। কৃষ্ণের অনুপম-গুণবতী প্রেয়সী কে? একা শ্রীমতী রাধিকা। কেশে কুটিলতা, নেত্রে তরলতা, স্তনে নিষ্ঠুরতা, এক রাধিকারই আছে; একমাত্র রাধিকাই হরির বাসনা পূর্ত্তি করিতে সক্ষম, অন্য কেহ নহে।

নিরন্তর কামক্রীড় বলিয়া কৃষ্ণের নাম "ধীরললিত।" যে পুরুষ বিদগ্ধ (চতুর), নবতরুণ, পরিহাসদক্ষ, নিশ্চিন্ত ও প্রেয়সীবশ, তাহারই নাম ধীরললিত। কৈশোরে কৃষ্ণ রাত্রি-দিন রাধার সহিত কুঞ্জক্রীড়া করিয়াছিলেন।

গৌর—বেশ! আর কি আছে বল।

রামা—আর আমি জানি না। তবে আমার স্বীকৃত একটী গান শোন।

রামানন্দ গাহিলেন—

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি॥
এ সখি সে সব প্রেম কাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দুঁহু কেরি মিলনে মধত পাঁচবাণ॥
অব সেই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি॥

গৌর—সাধ্যবস্তু কি তাহা বুঝিলাম। কিন্তু সাধন বিনা কেহ সাধ্য লাভ করিতে পারে না। এখন এই সাধ্যবস্তুর উপায়স্বরূপ সাধন-তত্ত্ব কিছু বল।

রামানন্দ—তুমি যাহা বলাইতেছ, তাহাই বলিতেছি; শোন। সাধনের কথা অতি নিগূঢ়। সখী ভিন্ন কেহ রাধাকৃষ্ণ-লীলা বুঝিবার অধিকারী নহে। সখী হইতে এই লীলার বিস্তার। সখীভাবে ভিন্ন রাধাকৃষ্ণকুঞ্জ-সেবারূপ সাধ্যবস্তু কেহই পাইতে পারে না।

সখীর স্বভাব বর্ণনা করা কঠিন। কৃষ্ণের সহিত নিজে ক্রীড়া করিতে সখীর মন নাই। সখী চায় কৃষ্ণের সহিত রাধিকার লীলা সংঘটন করিতে। কৃষ্ণপ্রেমরূপ কল্পলতা রাধিকার স্বরূপ; সখীগণ সেই কল্পলতার পল্লব, পুষ্প ও পত্র। কৃষ্ণলীলামৃতে লতা সিঞ্চিত হইলে, পল্লব, পুষ্প ও পত্র অনন্ত সুখের অধিকারী হয়। এদিকে সখীগণ কৃষ্ণসঙ্গসুখ কামনা না করিলেও, রাধিকা যত্ন করিয়া তাহাদের সহিত কৃষ্ণের সঙ্গম সংঘটন করেন। সখীগণ স্বকীয় ইন্দ্রিয়সুখ বাঞ্ছা করেন না—কৃষ্ণের সুখের জন্যই তাঁহাদের কৃষ্ণের সহিত সঙ্গম। যে ভক্ত সেই গোপীভাবামৃতে অভিলাষী, বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন। যে রাগানুগ মার্গ অবলম্বন করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ভজনা করে, সে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। ব্রজলোকের যে ভাবে ভক্ত তাঁহাকে ভজনা করেন—তিনি তদনুরূপ গতি লাভ করিয়া ব্রজধামে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু বিধিমার্গে কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্ভবপর নহে।

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথাভক্তিমতামিহ।

যশোদানন্দন ভগবান্ কৃষ্ণ ধর্ম্মনিষ্ঠ দেহিবৃন্দের সম্বন্ধে যেরূপ সুখলভ্য, আত্মভূত জ্ঞানিবৃন্দের পক্ষে তদ্রূপ নহেন। এই জন্যই ভক্ত গোপীভাব অঙ্গীকার করিয়া রাত্রি-দিন রাধাকৃষ্ণের বিহার চিন্তা করেন। গোপীভাব বর্জ্জন করিয়া কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য চিন্তা করিলে, ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্যশালী বিষ্ণুর ভজন করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রাপ্ত হন নাই।

ইহা শুনিয়া গৌর প্রেমভরে রামানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করিলেন। সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণকথালাপে অতিবাহিত হইল। রামানন্দের অনুরোধে দশ দিন গৌর তথায় অবস্থান করিলেন। প্রতিদিন কৃষ্ণকথা চলিতে লাগিল। একদিন গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন "বিদ্যার মধ্যে সার কি?"

রামানন্দ—কৃষ্ণভক্তি বিনা আর বিদ্যা নাই।

গৌর—জীবের কোন্ কীর্ত্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?

রামানন্দ—কৃষ্ণভক্ত-খ্যাতি।

গৌর—কোন্ সম্পত্তি শ্রেষ্ঠ?

রামানন্দ—রাধাকৃষ্ণপ্রেম।

গৌর—দুঃখমধ্যে গুরুতর কি?

রামানন্দ—কৃষ্ণভক্তি-বিরহ।

গৌর—মুক্তমধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

রামানন্দ—যে কৃষ্ণপ্রেম সাধনা করে।

গৌর—গানমধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্ গান?

রামানন্দ—রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যাহার মর্ম্ম।

গৌর—শ্রেয়োমধ্যে সারতম কি?

রামানন্দ—কৃষ্ণভক্তসঙ্গ।

গৌর—অনুক্ষণ জীব কি স্মরণ করিবে?

রামানন্দ—কৃষ্ণগুণ-লীলা।

গৌর—ধ্যেয়-মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি?

রামানন্দ—রাধাকৃষ্ণ-পাদাম্বুজ।

গৌর—সর্বত্যাগ করিয়া কোথায় বাস করা জীবের উচিত?

রামানন্দ—শ্রীবৃন্দাবনে।

গৌর—উপাস্তের মধ্যে প্রধান কে?

রামানন্দ—যুগল-মূর্ত্তি।

গৌর—মুক্তি ও ভুক্তিকামীর স্থিতি কোথায়?

রামানন্দ—স্থাবর-দেহ ও দেব-দেহ। অরসজ্ঞ জ্ঞানী কাকের মত জ্ঞানরূপ নিম্ব-ফল চোষণ করে। রসজ্ঞ ভক্ত কোকিল-প্রেমরূপ আম্রমুকুল ভক্ষণ করে।

আর এক দিন রামানন্দ কহিলেন "কৃষ্ণ-তত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, তুমি সমস্তই আমার চিত্তে প্রকাশিত করিয়াছ। বাহিরে উপদেশ না দিয়া তুমি ভিতর হইতে এই সমস্ত তত্ত্ব আমার অন্তঃকরণে প্রকাশিত করিয়াছ। কিন্তু একটী আশ্চর্য্য জ্ঞান আমার বিদূরিত হইতেছে না। প্রথমে আমি তোমার সন্ন্যাসি-মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। এখন শ্যামবর্ণ গোপরূপে তোমাকে দেখিতে পাইতেছি। তোমার সম্মুখে যেন এক কাঞ্চনময়ী পঞ্চালিকা রহিয়াছে দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার গৌর কান্তির আভায় তোমার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত। আর দেখিতেছি—তুমি বংশীবাদন শ্যামসুন্দর রূপে ভাবময় চঞ্চল দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছ। ইহার কারণ আমাকে বল।

গৌর কহিলেন—"রাধাকৃষ্ণে প্রগাঢ় প্রেমবশতঃ তুমি এরূপ দেখিতেছ। প্রেমিক স্থাবরজঙ্গম সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতে পান।"

রামানন্দ কহিলেন "আমাকে ছলনা করিতে পারিবে না। তোমার নিজরূপ আমাকে দেখাইতেই হইবে। স্বীয় রস আস্বাদনার্থ তুমি রাধিকার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। আপনি আপনার প্রেম আস্বাদন করিতে করিতে তুমি আনুষঙ্গিক ভাবে ত্রিভুবন প্রেমময় করিয়াছ। আমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই এখানে তুমি আসিয়াছ,—তবে আবার কপটতা কেন?"

তখন রসরাজ ও মহাভাবের মিলিত মূর্ত্তি গৌর রামানন্দকে দেখাইলেন। রামানন্দ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

দশ দিন অতিবাহিত হইল। খনি খুঁড়িতে খুঁড়িতে যেমন তামা, কাঁসা, রূপা, সোণা, রত্ন, চিন্তামণি,—উত্তরোত্তর উত্তমবস্তু লাভ হয়, তেমনি উভয়ের কথোপকথনে ক্রমেই অধিকতর মূল্যবান্ তত্ত্ব-কথা আলোচিত হইতে লাগিল। অবশেষে গৌর বিদায় প্রার্থনা করিলেন। রামানন্দ পরম দুঃখিত চিত্তে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। বিদায় কালে গৌর কহিলেন "তুমি বিষয় ত্যাগ করিয়া নীলাচলে গমন কর। আমি সত্বরই তীর্থ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগত হইব। তখন উভয়ে একত্র অবস্থান করিব।"

(ক্রমশ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

উৎপলা

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

শুষ্ক লতায় মঞ্জরী

প্রথম বয়সে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রতি রাজাধিরাজ অশোকদেবের ব্যবহার বিশেষ উদার ছিল না। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধবাদী সমাজবিপ্লবকারী ক্রমবর্দ্ধমান এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত তখনও জন-সাধারণ মধ্যে তত প্রচলিত হয় নাই; কিন্তু ভিক্ষুমণ্ডলীর বৈরাগ্য, অহিংসা, জীবে দয়া, নিরহঙ্কার, বিপদে নির্ব্বিকার সহিষ্ণুতা, সার্ব্বজনীন প্রীতি লোকসমাজের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। অনেকে এই নবীন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছিল। রাষ্ট্রনীতি-কৌশল-পরিচালিত রাজসভায় ব্রাহ্মণ, শ্রমণ উভয়েই প্রায় তুল্য সমাদর পাইতেন, কিন্তু উপযুক্ত ছিদ্র পাইলে অশোকদেব এই নবীন সম্প্রদায়ের লোককে দণ্ডিত করিতে ত্রুটী করিতেন না।

রাজাধিরাজ অশোক অপরাহ্নে মৃগয়া হইতে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। ভিক্ষু উপগুপ্ত সম্বন্ধে কি বিধান হয়, জানিবার জন্য নগরবাসিগণ উৎকণ্ঠিত ছিলেন। সম্ভবতঃ রাত্রি প্রভাতেই ভিক্ষুর বিচার হইবে।

সেকালেও যে রাজরাজন্যবর্গ সান্ত্রী প্রহরী অথবা পার্শ্বরক্ষক দ্বারা সর্ব্বদা সুরক্ষিত থাকিতেন, তাহা উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন। নন্দবংশের উচ্ছেদসাধনের পর হইতে রাজরাজড়ার রাত্রিবাস-গৃহও অনেক সময় অতি বিশ্বাসী অন্তরঙ্গ ভিন্ন অন্যের অজ্ঞাত থাকিত। কোন্ রাত্রিতে কোন্ রাজ্ঞীর গৃহে, অথবা কোথায় বহুবল্লভ রাজার নিদ্রার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত, তাহা সকলে জানিতে পারিত না। রাজা ও হয় ত পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট গৃহে গমন না করিয়া গৃহস্বামিনীর অভিমান ক্ষুণ্ণ করিতেন এবং অন্য গৃহে অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া অতর্কিত অনুগ্রহে অপরাকে অতি সম্মানিত করিতেন। এইরূপ ক্ষুণ্ণ অভিমান অথবা অতর্কিত সম্মান যে রাজার অনুরাগ-বৈষম্যে সংঘটিত হইত, তাহা নহে। দেশকালপাত্র বিবেচনায় শত্রু-সমাকুল রাজরাজড়ার পক্ষে এইরূপ অজ্ঞাত গৃহবাস সেকালে নিতান্ত বিধেয় বলিয়াই পরিগণিত হইত।

পরিচারিকা লীলা সন্ধ্যার পর হাসিতে হাসিতে আসিয়া রাজ্ঞী কারুবকীকে জানাইল, রাজাধিরাজ দেবী অসন্ধিমিত্রার গৃহে রাত্রিযাপন করিবেন।

"তুই কেমন করিয়া জানিলি?"

"সৌবিক মহাশয় প্রতিহারীদিগকে বলিয়া দিয়াছেন; অন্তঃপুরে অনেকেই তাহা শুনিয়াছে।"

"তাহা শুনিয়া তোর আনন্দ কেন?"

"আমি মালিনীকে ফুল-মালার জন্য সংবাদ

দিয়া আসিলাম। অগুরু, চন্দন, গন্ধচূর্ণ—আর সময় নাই।—সৌবিক মহাশয় আমাকেও কিছু বলিয়াছেন!"

"মর্ হতভাগী! শেষে লোক হাসাবি না কি?"

"আমরা হাসিব, অন্যের কান্না পায়, কাঁদিবে।"

রাজ্ঞী তখন স্মিতমুখে বলিলেন,—

"যাহা যাহা করিতে হয়, কর গিয়া; কাহাকেও কিছু বলিস্ না।"

দেবী কারুবকী প্রমীতসেনকে কারাগার হইতে মুক্তি দিয়াছেন, কিন্তু মৃগয়া হইতে ফিরিয়া রাজাধিরাজ যখন অবস্থা শুনিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন কি উত্তর দিবেন, ভাবিয়া দেবী চিন্তাযুক্ত ছিলেন। ভিক্ষু উপগুপ্তের অপরাধ মার্জ্জনার জন্য রাজাধিরাজকে অনুরোধ করিবেন, মঞ্জুলার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন; কিন্তু রুদ্রপ্রতাপ রাজাধিরাজের কার্য্যে অনধিকারচর্চ্চা যে দুঃসাহসের কর্ম্ম, দেবী তাহা জানিতেন। দেবীর একমাত্র ভরসা, যদি রাজাধিরাজ অন্যের নিকট অবস্থা শুনিবার পূর্ব্বে একবার নিজে তাঁহাকে বলিবার সুযোগ পান, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হইবার অনেকটা সম্ভাবনা। সে সুযোগ কি ঘটিবে? সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে ত নির্জ্জন সাক্ষাৎ নহে। রাজাধিরাজ অন্তঃপুরে পৌঁছিলে সপত্নী, ভোগিনী, আত্মীয়া, পরিচারিকা সকলে মিলিয়া মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা, অভিবাদন করিয়াছিলেন। তখন কোন কথা বলিবার, প্রার্থনা জানাইবার সুযোগ ত ঘটে নাই।

দেবী কারুবকীর শয়নগৃহ সুসজ্জিত; স্নিগ্ধ গন্ধদীপ-মালায় আলোকিত; পুষ্পস্তবক মাল্যে, অগুরু-চন্দনপ্রক্ষেপে, গুগ্‌গুল গন্ধে সুরভিত হইল। নীলা অল্প সময়ের মধ্যে রাজ্ঞীর বেশভূষার শোভন পরিবর্ত্তন এবং তাঁহার কেশকলাপে অপূর্ব্ব শ্রীমতী কবরী রচনা করিতে ভুলিল না। বহু সপত্নীপরিবৃতা বিগতোন্মুখযৌবনা রাজরাণীও অঙ্গপ্রসাধন ব্যাপারে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন না; রাজ্ঞী কারুবকীর ত আজ বিশেষ প্রয়োজনই ছিল। ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল। বাসকসজ্জা রাজ্ঞী উৎকণ্ঠিতা হইলেন, গৃহে এবং অলিন্দে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিচারিকার কথায় বিশ্বাস করিয়া শেষে কি বিপ্রলব্ধার বিষম মনোব্যথা ভোগ করিতে হইবে?

এমন সময় নীলা ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, রাজাধিরাজ আসিতেছেন। রাজ্ঞী সেই অলিন্দেই প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। রাজাধিরাজ উপস্থিত হইলে রাজ্ঞী অগ্রসর হইলেন, হস্তস্থিত শ্বেতপুষ্পমাল্য তাঁহার গলদেশে পরাইয়া দিয়া প্রণাম ও তাঁহার পূজা করিলেন। অশোকদেব হাতে ধরিয়া রাজ্ঞীকে তুলিলেন। ফুলমালা পত্রপল্লবে সজ্জিত সুরভিত গৃহের শোভা এবং রাজ্ঞীর বেশভূষা ও অঙ্গরাগের পারিপাট্য দেখিয়া রাজাধিরাজ স্মিতমুখে বলিলেন,—

"এ গৃহে যে চিরবসন্ত বিরাজ করে!"

"এখানে দেবতার আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাই শুষ্ক লতায়ও মঞ্জরী দেখা যায়।"

দীপরশ্মি প্রকাশিত রাজ্ঞীর প্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া রাজাধিরাজ বলিলেন;—

"শুকলতা ?—শুকলতার সঞ্জীবনী শক্তিতে বৃদ্ধ দেবতার দেহও যে উৎফুল্ল হইয়া উঠে !"

হাসিতে হাসিতে উভয়ে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজাধিরাজ পালঙ্কে উপবেশন করিলে রাজ্ঞী বলিলেন ;—

"সৌবিক আজ রাজ্ঞী অসন্ধিমিত্রার নাম করিয়াছিল।"

"সৌবিক অসন্ধিমিত্রার নাম করিলে যে কাহাকে বুঝায়, তুমি তাহা জান।"

"কিন্তু কয়দিন পরে আজ রাজধানীতে আগমন, আমি এতটা সৌভাগ্যের আশা করিতে সাহস পাই নাই !"

"আত্মশক্তিতে তোমার বিশ্বাস কম।"

"স্ত্রীজাতির আবার আত্মশক্তি !"

"নয় কেন ?"

"তা'র উপর কি নির্ভর করা যায় ?"

"চিত্তের সাহস পৃথিবী জয় করিতে পারে।"

"পৃথিবী জয়ে আমার প্রয়োজন নাই।—দাসীর একটী প্রার্থনা আছে।"

"অশোকের প্রিয়তমা মহিষীর আদেশ প্রচার হউক।"

রাজ্ঞী একটুকু হাসিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মুখের উৎফুল্লতা যেন একটুকু কমিয়া গেল। ক্ষণকাল বিলম্ব করিয়া রাজ্ঞী বলিলেন ;—

"এই মাত্র স্ত্রীজাতির সাহসের কথা বলিতেছিলেন, আমি এক অসম সাহসের কাজ করিয়া ফেলিয়াছি।"

"অসম সাহস আছে বলিয়াই ত রাজ্ঞী চক্রবর্ত্তী দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ অশোকদেবের উপযুক্ত মহিষী। ব্যাপারটা কি ?" রাজাধিরাজ হাসিয়া বলিলেন, "কোন শ্রমণের উপদেশে ভিক্ষুণী হইবার সঙ্কল্প করিয়াছ ?"

"রাজাধিরাজ যেদিন রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইবেন, দাসীও তাঁহার পদানুসরণ করিবে।"

"তাঁহার অনেক বিলম্ব আছে।"

রাজ্ঞী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন, রাজাধিরাজ তাঁহাকে নিজের পার্শ্বে পালঙ্কের উপর বসাইলেন, বলিলেন ;—

"কি অসম সাহসের কাজ করিয়াছ ?—ধর্ম্মপালের কারাবাসের আদেশ দিয়াছ, না কলিঙ্গ-জয়ের জন্য সৈন্য পাঠাইয়াছ ?"

"অতদূর সাহস হয় নাই।"

"তবে কি ?"

রাজ্ঞী ধীরে ধীরে আরম্ভ করিলেন ;—

"মঞ্জুলা আসিয়াছিল—"

"মঞ্জুলা ?—কেমন আছে ? অনেক দিন তাহাকে দেখি নাই।"

"আমার অপরাধ ক্ষমা হইবে ?"

"কি অপরাধ ?"

"মৃগয়া-যাত্রার দিন সচিবপুত্র প্রমীতসেনের কারাবাসের আদেশ হইয়াছিল—"

রাজাধিরাজ হাসিয়া উঠিলেন।

"প্রমীতসেন ত কোন অপরাধের কার্য্য করে নাই।"

"রাজবিধি লঙ্ঘনের অপরাধে সেদিন এক জন ভিক্ষু এবং প্রমীতসেনের কারাবাসের আদেশ হইয়াছিল।"

"সেই কথা ? এখন মনে পড়িতেছে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম, ভিক্ষু আমাকে সম্বোধন করিয়া কি যেন বলিবার সময় লোকের ঠেলাঠেলিতে প্রহরিণীদিগের রজ্জু-

সীমার উপর হেলিয়া পড়ে। একজন প্রহরিণী তাহাকে শূলবিদ্ধ করিতে উদ্যত হয়। প্রমীত-সেন ভিক্ষুকে রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হয়। প্রমীত কোন অপরাধের কার্য্য করে নাই। রাত্রি প্রভাতে তাহার মুক্তির আদেশ দিব।—এখন কোন্ অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে, বল।"

রাজ্ঞী পরিপক্ক ব্যবহারজীবী ছিলেন না. পুনরায় ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন ;—

"মঞ্জুলা আসিয়াছিল—"

"হাঁ, তাই কি ?"

"আমি প্রমীতসেনের মুক্তির জন্য ধর্ম্মপাল মহাশয়কে বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তিনি তাহাকে কারা হইতে মুক্তি দিয়াছেন।—দাসীর অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে।"

"এই অপরাধ ?"

রাজ্ঞী মুখ নত করিয়া রহিলেন।

রাজাধিরাজ তখন সেই প্রবীণা রাজ্ঞীর চিবুক ধরিয়া মুখ উঁচু করিলেন এবং নিজের গলদেশ হইতে পূজা-উপহার পুষ্পমালা খুলিয়া লইয়া তাঁহার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। রাজ্ঞীর মুখ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজাধিরাজের পরাজয়

রাজাধিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কত লোক ত বিচারে অবিচারে দণ্ডিত হয়, কোন দিন ত তুমি কাহারও জন্য অনুরোধ কর নাই। প্রমীতসেনের জন্য তোমার এত ব্যস্ততা কেন ?"

"প্রমীতসেনকে চিনি না, কোন দিন তাহাকে দেখি নাই। তবে সচিবপুত্র যে নগরে একজন ভাল লোক—ধনী, দাতা, দরিদ্রের বন্ধু এবং আপনার বিশ্বাসভাজন, তাহা ত আপনার মুখেই কতদিন শুনিয়াছি।—আমিও এক অনুরোধে পড়িয়াছিলাম।"

রাজাধিরাজের কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল ; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কে তোমাকে অনুরোধ করিল ?"

"মঞ্জুলা।"

"মঞ্জুলা ! তাই বলিতেছিলে, মঞ্জুলা আসিয়াছিল ?"

"হাঁ।"

"সে কেন প্রমীতের জন্য অনুরোধ করিল ? প্রমীত তাহার কে ?"

"কেহই নহে। মঞ্জুলা একদিন মাত্র প্রমীতসেনকে দেখিয়াছিল।"

রাজাধিরাজ জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। রাজ্ঞী তখন সেই দুর্য্যোগময় সন্ধ্যায় নগরোপকণ্ঠে মঞ্জুলার সঙ্গে প্রমীতের সাক্ষাৎ-বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। শুনিয়া রাজাধিরাজ বলিলেন ;—

"মঞ্জুলা ত এখন আর ছোট্ট বালিকা নহে।"

"তাহার বয়স আঠার বৎসর পার হইয়াছে।"

"নগরের পথে দৈব-দুর্য্যোগমধ্যে ক্ষণকালের পরিচয়, তাহার জন্য অনুরোধ !"

"ক্ষণকালের পরিচয়ে আজীবন বন্ধুত্বের সূচনা হইতে পারে।"

"হইতে পারে বটে, এখানেও কি তাহাই হইয়াছে ?"

"অসম্ভব কি ?"

রাজাধিরাজ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শেষে বলিলেন ;—

"মঞ্জুলা বড় হইয়াছে, মাতার কাছে থাকে। শেষে কি সে সেই অভাগিনীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে?"

"অসম্ভব। আমি ত তাহাকে চোখে চোখে রাখিয়াছি। মঞ্জুলার চরিত্র পবিত্র। আর, সে অভাগিনীর স্বভাবও ত অনেক দিন সংশোধন হইয়াছে।"

"সে যাহাই হউক, এ ভাবে আর দিন যাওয়া উচিত নহে। মঞ্জুলার বিবাহের কি হইল?"

"কিছুই হয় নাই। নানা কারণে তাহার উপযুক্ত বর যে সহজে মিলিবার নহে, তাহা রাজাধিরাজের অজ্ঞাত নহে।"

"মঞ্জুলা কেন প্রমীতের জন্য অনুরোধ করিল?"

"আমি যখন কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।"

"বটে? প্রমীতের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইলে কেমন হয়?"

"হইলে ত অতি উত্তম হয়, কিন্তু প্রমীত-সেন যে বিবাহিত, তাহার পত্নী বর্ত্তমান!"

রাজাধিরাজ হাসিয়া বলিলেন;—

"মহারাজা অশোকের ত একের অধিক রাজ্ঞী বর্ত্তমান!"

রাজ্ঞীও হাসিয়া উত্তর দিলেন;—

"রাজা মহারাজার পক্ষে যাহা সম্ভব বা শোভন, অপরের পক্ষেও কি তাই?"

"নয় কেন?—প্রমীতের অতুল সম্পত্তি। সে সম্মত হইবে?"

"কাহার কথা বলিতেছেন?"

"প্রমীতের কথা।"

"প্রমীত আর একদিন মঞ্জুলার গৃহে যাইয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিয়াছে।"

"ও হোঃ! তাহার পর?"

"প্রমীত মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছে।"

"আর মঞ্জুলা?"

"চিত্ত হারাইয়াছে।"

"তবে আর কি চাই?"

"রাজাধিরাজের অনুগ্রহ।"

"ঘটকতাটা কি আমাকেই করিতে হইবে?"

"না; আমিও করিব না। কিন্তু প্রমীত যে মঞ্জুলার অনুরোধে কারামুক্ত হইয়াছে, সে কথা কোনরূপে তাহাকে জানাইতে হইবে।"

"কেন?"

"উভয়ে উভয়ের নিকট ঋণী থাকা ভাল। একপক্ষ ঋণী থাকিলে অপর পক্ষের মনে অভিমান থাকিয়া যায়। সে স্থলে চিত্তের বিনিময় হয় না, ঋণী চিত্তদান করিয়া ঋণ পরিশোধ করে।"

নীরব হাস্যে রাজাধিরাজের মুখ প্রভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন;—

"শুনিয়াছি, পিতামহ ঠাকুরের এক মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার নাম চাণক্য পণ্ডিত। রাজ-নীতি এবং অর্থনীতি-শাস্ত্রে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ ছিল না। কিন্তু বৃদ্ধ পণ্ডিত ঠাকুর আজ জীবিত থাকিলে, চিত্তবিনিময় শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচারে তোমার নিকট হার মানিতেন।"

রাজ্ঞীর মুখ হাসিময় হইল, তিনি বলিলেন;—

"চিত্ত বলিয়া যে একটা কিছু পণ্ডিত ঠাকুরের ছিল, তাহা শুনি নাই; সুতরাং তাহার দানবিনিময় হয় ত তিনি বুঝিতেন না।—অনেক স্ত্রীলোক চিত্তবিনিময় চায় না, অত-দূর উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মনে স্থান পায় না, নিজের চিত্ত দান করিয়াই তাহারা সুখী!"

রাজাধিরাজ হাসিলেন, আদরে রাজ্ঞীর কবরী স্পর্শ করিয়া বলিলেন ;—

"সেরূপ দুর্লভ চিত্তের বিনিময়ে দান করিবার উপযুক্ত কিছু রাজরাজড়ার ভাণ্ডারে নাই !"

লজ্জায় রাজ্ঞীর স্মিত-প্রফুল্ল মুখ নত, আরক্ত হইল।

রাজাধিরাজ বলিলেন ;—

"মঞ্জুলা যদি চিত্ত হারাইয়াই থাকে—প্রমীতকেই দিয়া থাকে, তবে আর তাহার জন্য ব্যস্ততা কেন ?"

"আত্মীয় সুহৃদেরা তাহাতে তৃপ্ত থাকিতে পারেন না। ঘর সংসার করিতে হইবে, আদান প্রদান দুই-ই চাই।—আর পুরুষেরাই কি অত স্বার্থপর ?"

"সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই!—তা মঞ্জুলার অনুরোধেই যে তাহার মুক্তি হইয়াছে, প্রমীতসেন যাহাতে তাহা জানিতে পারে, তাহা করা যাইবে।—প্রমীতসেনকে মুক্ত করিয়াছ, ভিক্ষুর জন্য কোন চেষ্টা কর নাই!—ভিক্ষু কে ?"

"ভিক্ষু পুণ্যাত্মা উপগুপ্ত ঠাকুর।"

"উপগুপ্ত ?"

রাজাধিরাজ রাজ্ঞীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, রাজ্ঞী বলিলেন ;—

"হাঁ ; আমার পিতৃদেবের উপদেষ্টা দেশ-পূজ্য পুণ্যাত্মা উপগুপ্ত ঠাকুর !"

রাজাধিরাজ কোন উত্তর দিলেন না। রাজ্ঞী পালঙ্ক হইতে নামিয়া দুই হাতে রাজাধিরাজের পদধারণ করিয়া কাতর স্বরে বলিলেন ;—

"ভিক্ষুদেবকে মুক্তি দিবার আদেশ হউক !"

অশোকদেব ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শেষে রাজ্ঞীর হাত ধরিয়া পুনরায় তাঁহাকে নিজ পার্শ্বে বসাইলেন, বলিলেন ;—

"এই সকল ভিক্ষু শ্রমণেরা দেশের শত অমঙ্গল ঘটাইতেছে।"

"শ্রমণ ভিক্ষুরা অমঙ্গল ঘটাইতেছে ?"

"হাঁ।"

"ইঁহারা ত অতি নিরীহ !"

"ইহারা চোর দস্যু অথবা দ্যূতকারী ব্যভিচারী নহে, কিন্তু ইহাদের আচারব্যবহার-দৃষ্টান্তে দেশের নিয়ত অমঙ্গল ঘটিতেছে ; লোকে যাগযজ্ঞ, কর্ম্মকাণ্ড, পূজাবলি পরিত্যাগ করিতেছে ; সনাতন ধর্ম্ম ছাড়িতেছে।—ইহাদের শাসন আবশ্যক।"

"রাজাধিরাজের সভায় ত ব্রাহ্মণ শ্রমণের তুল্য সম্মান।"

"সে ত রাজনীতির কূটকৌশল"

"অখণ্ডপ্রতাপ রাজরাজেশ্বরের রাজ্য-শাসনে ন্যায়ের স্থলে কূটকৌশল !"

স্ত্রী-হৃদয়ের মহিমময়ী সরলতায় মুগ্ধ রাজ-চক্রবর্ত্তী বলিলেন ;—

"মন্ত্রণাসভায় এ প্রশ্ন উঠিলে উত্তর দিতে বিলম্ব হইত না। কিন্তু রাজ্ঞী কারুবকীর পবিত্র শয্যায় বসিয়া উত্তর দিতে আমার সাহস হয় না।—আমি পরাজয় স্বীকার করিতেছি !"

স্ফুরদুজ্জ্বল নেত্রে রাজ্ঞী কহিলেন ;—

"তবে আমার প্রার্থনা সিদ্ধ হউক !"

"অবশ্যই হইবে। নীলাকে বলিয়া রাখ, প্রভাতে সৌবিক যেন আমার নিকট উপস্থিত হয়।" (ক্রমশঃ)

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

নক্ষত্র-পূজা

দুর্গোৎসব

শরৎকালে আমরা দশভুজা সিংহবাহিনী মহিষমর্দ্দিনী দেবীর পূজা করি। এই পূজার চলিত নাম শারদীয়া পূজা।

দেবীর বাহন অর্দ্ধনিমীলিত-লোচন মৃগরাজ সিংহ। সিংহপৃষ্ঠে দেবীর দক্ষিণ পদ এবং মহিষাসুর-স্কন্ধে দেবীর বাম পদ। সিংহ মহিষাসুর-শীকারে প্রমত্ত। দেবী দশভুজা এক দক্ষিণ হস্তে সর্পলাঙ্গুল এবং এক বামকরে মহিষাসুরের কেশ-পাশ ধারণ করিয়াছেন। সর্প মহিষাসুরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

দশভুজার দক্ষিণ করপঞ্চকে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ ও শক্তি এবং বাম করপঞ্চকে খেটকপূর্ণ চাপ, পাশ, অঙ্কুশ এবং ঘণ্টা বা পরশু চকমক্ করিতেছে।

দেবী দশভুজার শিরোদেশে স্থিত চালে ভূতেশ ভবানী-পতি রুদ্রদেব চিত্রিত থাকে এবং দেবী দশভুজার পদতলে অমৃতপূর্ণ ঘট স্থাপিত থাকে।

দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে হুতুমবাহিনী লক্ষ্মী দেবী ও মূষিকবাহন গজানন গণপতি দেব এবং নবপত্রিকাশোভিত "কলাবউ" অবস্থিত আছেন। এবং দেবীর বাম পার্শ্বে হংসারূঢ়া বীণাপাণি সরস্বতী দেবী ও শিখি-বাহন শক্তিধর কুমার দেব অধিষ্ঠিত আছেন।

মহামায়ার এই প্রতিমার গূঢ়মর্ম্মভেদে সাত্ত্বিক উপাসকমাত্রের চিত্তে কৌতূহল জন্মিবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

এই আধিভৌতিক প্রতিমার মূল আদর্শ (আধিদৈবিক চিত্র) আমরা উপাসকের চিত্তপটে অঙ্কিত করিতে সযত্ন হইব। এই আধিভৌতিক প্রতিমার আদি আধ্যাত্মিক চিত্র উপাসক স্বয়ং সাধনা-বলে স্বহৃদয়ে প্রতিবিম্বিত করিয়া লইতে যত্নশীল হইবেন। সাধনাক্ষেত্রে উত্তর-সাধকের স্থান নাই।

ইদানীন্তন কালে হিন্দু আপনাকে নক্ষত্র-উপাসক বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ করেন। কিন্তু হিন্দু জানেন যে, বৈদিক ঋষির নক্ষত্র-উপাসনা হইতে তাঁহার পৌত্তলিকতা উদ্ভূত হইয়াছে।

রাশিচক্রে সিংহরাশি সূর্য্যের গৃহ, বাহন, এবং নাক্ষত্রিক প্রতিমা, এবং সিংহরাশির পরেই কন্যারাশি প্রতিষ্ঠিত আছে।

তারা-কন্যা—"জলে নৌকাস্থা শস্য-অগ্নি-ধারিণী স্ত্রী" এবং কন্যারাশিস্থ চিত্রা-নক্ষত্র তারা-কন্যার উত্তমাঙ্গ গঠন করে এবং দশভুজা-মূর্ত্তি ধারণ করে। পঞ্জিকার মলাটে—নক্ষত্রগণের যে মূর্ত্তি চিত্রিত থাকে, তাহাতে চিত্রার দশভুজা-মূর্ত্তি চিত্রিত থাকিত। "গোলোকে সর্ব্বদেবদর্শন" প্রকাশিত হইবার পর হইতে বাংলার পঞ্জিকার পুরঃপৃষ্ঠায় আর নক্ষত্রমূর্ত্তি দেখা যায় না। ভরসা করি, বারাণসী-ধামের পঞ্জিকার পুরঃপৃষ্ঠা হইতে নক্ষত্রমূর্ত্তি অন্তর্হিত হয় নাই।

প্রাচীন কালে যখন উত্তর-সৌরস্থিতি (North Solstice) চিত্রানক্ষত্রে ছিল। তৎকালে তারা-কন্যার শিরোভাগ রাশি-চক্রের শীর্ষস্থানে ছিল এবং দশভূজা তারা-কন্যা তারা-সিংহের পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান ছিলেন।

তারা-কন্যার ঊর্দ্ধে ও উত্তরে ভূতেশ-মণ্ডল (Bootes) (*) অবস্থিত আছে। এই ভূতেশ-মণ্ডল বায়ু-দৈবত স্বাতি নক্ষত্র বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। বায়ু রুদ্র-দেবের অষ্টমূর্ত্তির অন্যতম মূর্ত্তি। এবং তারা-কন্যার পদতলে কাংস্যমণ্ডলে (Creator) স্থিত তারা-কাংস্য অমৃতের ভাণ্ড।

হিন্দু আরও জানেন যে, সুদীর্ঘ কৃষ্ণসর্প (Hydra) কন্যারাশিস্থ হস্ত-নক্ষত্রে সংলগ্ন রহিয়াছে এবং আকাশের দক্ষিণ প্রান্তে তারা-কন্যার এক ধ্রুবকে যামা ধ্রুব-তারার অদূরে মহিষাসুর (Centaur) বিদ্যমান আছে।

এই প্রকাণ্ড আধিদৈবিক তারাচিত্র দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমার অবিকল আদর্শ।

এই আধিদৈবিক তারাচিত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলেই উপাসক তাঁহার উপাস্য দেবীর প্রতিমার মূল তাৎপর্য্য গ্রহণে সক্ষম হইবেন। নতুবা নহে।

হিন্দু সতত মনে ধারণা করিবেন—নক্ষত্র-উপাসক হইলেও তিনি জড়োপাসক নহেন। তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পরম-ব্রহ্মের উপাসক। তবে উপাসকের হিতার্থে তাঁহার পরমব্রহ্মের রূপ কল্পনা হইয়াছে। তাই পরমব্রহ্ম প্রকৃতি-পুরুষ, শ্রী-হরি, হর-গৌরী, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ রূপে—ভারতে উপাসিত। কেবল "বিচার-দিনে" ঈশ্বরের সহিত হিন্দুর সম্পর্ক নহে। ঈশ্বর হিন্দুর আজীবন সখা। সুতরাং তাঁহার রূপ চাই। তাঁহার এক এক মূর্ত্তি এক এক নক্ষত্রে স্থাপিত হইয়াছে। তাই বেদে প্রকাশ যে—দেবগৃহাঃ বৈ নক্ষত্রাণি।

তাই হিন্দু "শিবাধিদৈবতং সূর্য্যং অগ্নি-প্রত্যধিদৈবতম্" দেবের পূজা করেন॥

তাই হিন্দু "সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনারায়ণম্" দেবের পূজা করেন।

এক নক্ষত্রে হরি-হর স্থাপিত। যা শ্রী সা গিরিজা প্রোক্তা। যঃ হরিঃ সঃ হরঃ স্মৃতঃ॥" (বরাহ পুরাণ)

তারা-কন্যা "জগৎ-প্রসবিতা সবিতা"-দেবের নারী-মূর্ত্তি বা পত্নী অর্থাৎ সূর্য্য-প্রভা সূর্য্যা-দেবীর নাক্ষত্রিক প্রতিমা। তাই তারা-কন্যা সূর্য্যের সাঙ্কেতিক চিহ্ন অগ্নি এক হস্তে ধারণ করেন। সূর্য্য-পত্নী তারা কন্যা সূর্য্যাধিষ্ঠিত নারায়ণের পত্নী শ্রী ও লক্ষ্মী। এবং তিনি সূর্য্যাধিষ্ঠিত রুদ্রদেবের পত্নী ভগবতী রুদ্রাণী। ঐ দেখ রুদ্রাণী "কন্যারূপেণ দেবানাম্ অগ্রতঃ দর্শনং দদৌ" (বৃঃ দেঃ সুঃ) এবং ঐ শুন ভগবতীকে—"সূর্য্যমন্ত্রেণ পূজয়েৎ" (ইতি পাদ্মে)।

উপাসক দেখিতেছেন যে—ভগবতী নারায়ণের চক্র, রুদ্রদেবের ত্রিশূল খড়্গ, ইন্দ্রের পরশু (বজ্র), বরুণের পাশ এবং কুমারের শক্তি ধারণ করিয়া আছেন।

তারা-কন্যা চিরকুমারী এবং চির সতী,

(*) গ্রীকভাষাবিদ্‌গণ বলেন যে "Bootes গ্রীক শব্দ নহে"। বোধ হয় ভূতেশ হেলেসপন্ট পার হইয়া Bootes নাম গ্রহণ করিয়াছেন—(লেখক)।

তাই দক্ষসুতা তারা-কন্যা সর্ব্বত্র * "সতী" নাম পাইয়াছেন।

সূর্য্যপ্রভা সূর্য্যা দেবী উদয়গিরিতে জাত বলিয়া "গৌরী" নাম পাইতে পারেন। অথবা সূর্য্যার প্রতিমা হেমবর্ণা। ছায়াপথ সোম-ধারা বেদে হৈমবতী নাম ধারণ করেন। এই দুই কারণে পুরাণে দেবী হিমবান্-দুহিতা হইয়াছেন। অভিধানে দেবীর এক নাম চিত্রা। চিত্রা নামের সার্থকতা উপাসকের বিশেষ বিবেচ্য। দেবীর সাবিত্রী নাম উপাসকের মনে বেদের সূর্য্যা দেবীর ছায়া আনিয়া দেয়। সিংহপৃষ্ঠে তারা-কন্যা সূর্য্যের বর্ণ-মূর্ত্তি এবং "প্রকৃতি-পুরুষের" আদি আদর্শ।

মহিষ ও সর্প অন্ধকারের সহচর বলিয়া তাহারা অন্ধকারের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। মহিষাসুর-মণ্ডল এবং জলসর্প-মণ্ডল (কালীয়) অন্ধকারের নাক্ষত্রিক প্রতিমা। সর্পবেষ্টিত মহিষ অন্ধকারের বর্ণ-মূর্ত্তি। সূর্য্যপ্রভা সূর্য্যা অন্ধকার বিনাশে সতত উদ্যত। আলোক ও অন্ধকারের অবিরাম সংগ্রাম জগতে নিয়ত চলিতেছে। এ সংগ্রামের আদি বা অন্ত নাই। কখন (দিনে) আলোক উচ্চে, কখন (রাত্রে) অন্ধকার উচ্চে। এ সংগ্রামে জয়-পরাজয় নাই। সিংহবাহিনী তারা-কন্যার হস্তে সর্পবেষ্টিত মহিষ-অসুরের মরণ নাই। তাই দেবী "মহিষ-মর্দ্দিনী" নাম ধারণ করেন। দেবী মহিষ-বিনাশিনী নহেন + পাছে দেবী সূর্য্যার এই রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে কোন উপাসকের মনে দ্বিধা জন্মে সেই সংশয় বিমোচনার্থে তারা-সিংহ দেবীর বাহন এবং ভূতেশ দেবীর শিরোদেশে এবং অমৃতভাণ্ড দেবীর পদতলে স্থাপিত হইয়াছে।

এই তারা-চিত্র মহর্ষি কাত্যায়নের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। মহর্ষির উদ্ভাবিত তারামূর্ত্তি কাত্যায়নী নাম ধারণ করে।

"উমা কাত্যায়নী গৌরী"

ইন্দ্রের শচী, আদিত্যের শ্রী ও লক্ষ্মী, রুদ্রের রুদ্রাণী, বরুণের সুদেষ্ণা, যমের ধূমোর্ণা, চন্দ্রের 'চিত্রা', কুমার কামদেবের 'দেবসেনা', সতী সাবিত্রী সকলেই তারাকন্যার মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত আছেন। এই মূর্ত্তির উপাসনায় বিশাল-হৃদয় উপাসকের মনে আনন্দের সীমা থাকে না। তিনি এক আধারে সকল দেবদেবীর উপাসনায় চিত্ত পরিতৃপ্ত করিতে পারেন।

অদূরদর্শী বৈষ্ণবগণ বেশ পড়েন—

(ক) যঃ হরিঃ সঃ হরঃ স্মৃতঃ

(খ) শংকরঃ ভগবান্ গৌরীঃ (বিষ্ণুপুরাণ)

(গ) রুদ্রদেবের প্রার্থনামতে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভার্য্যা পার্ব্বতীকে অর্পণ করেন।

তথাপি তাঁহার ভেদ-জ্ঞান দূর হয় না। তিনি বেদোক্ত রুদ্রদেবকে মোগল বানাইতে চাহেন।

ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী তড়িৎময়ী প্রভাদেবী বেদে কুমারী সূর্য্যা নামে গীত ও অর্চ্চিত হইয়াছেন। সেই সূর্য্যাদেবী আত্মাশক্তির আধিদৈবিক প্রতিমা।

নববর্ষের আদি দিনে রাশিচক্রে সূর্য্যের নব যাত্রা প্রবর্ত্তিত হয়। বাক্যান্তরে জগৎ-প্রসবিতা সবিতাদেবের নারীমূর্ত্তি কুমারী ভগ-

* তু। Semitic Ariad ne (the very chaste one).

+ মহর্ষি বেদব্যাস মহিষাসুর বধের এক অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। প্রদ্যুম্ন কামদেবও কুমার মঙ্গল গ্রহের উদয়ে নিশাকালে মহিষাসুরের বধ কল্পিত হইয়াছে। (বনপর্ব্ব)

বতী সাবিত্রী সতীর নব যাত্রা প্রবর্ত্তিত হয়। ভগবতী সাবিত্রী দেবীর যাত্রা হইতে নববর্ষের প্রথম দিন "ভগবতীযাত্রা" উপাধি ধারণ করে।

খৃঃ পূঃ ১১৮১ সালের ১লা আশ্বিন হইতে আশ্বিন-আদিবর্ষ পরিগণিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ দিনে কৃষ্ণ নবমী তিথি ছিল, তাই কৃষ্ণ নবমী তিথিতে কল্প আরম্ভ করিয়া ভগবতীর পূজা আরম্ভ হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভগবতী সাবিত্রী দেবীর আধি-দৈবিক বা নাক্ষত্রিক প্রতিমা সিংহবাহিনী তারা-কন্যাতে সবিতাদেবের প্রবেশ দিনে নব-বর্ষের অবতারণা উপলক্ষে হিন্দুর এই শারদীয় মহোৎসব হয়। হিন্দু কালক্রমে শারদীয়া পূজার মূলতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছেন। এখন তিনি ভাবেন তিনি নক্ষত্র-উপাসক নহেন। তিনি পুরাণে পড়েন—যোগ ভঙ্গ হেতু মহর্ষি কাত্যায়ন মহিষাসুরকে অভিসম্পাত করেন যে "আদ্যাশক্তি দশভূজামূর্ত্তি হইয়া তাহাকে সংহার করিবেন।"

পারিপার্শ্বিক দেবদেবী

গণপতি

মূষিকবাহন গজানন গণপতি দেব সিদ্ধি-দাতা গণেশ নামে সকল দেবের অগ্রে পূজা লইতেছেন। ইনি কে?

বৃহস্পতি সূক্তে আমরা ঋক্ মন্ত্রে (২।২৩।১) পড়ি—

"গণানাম্ ত্বা গণপতিম্ হবামহে" হে বৃহস্পতি তুমি মরুৎগণের অধিপতি তোমায় আহ্বান করি।

তাই কালিকা-পুরাণে নির্দ্দেশ হইল "গণেশবীজং তম্ ইদম্ গুরোঃ মন্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্" গণেশ দেব ও দেবগুরু বৃহস্পতি উভয়ের বীজমন্ত্র এক।

অর্থাৎ

ইহারা একে অন্যের প্রকৃতি। সুতরাং গণপতি বৃহৎ-পতির প্রতিমা তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ঋক্‌মন্ত্রে পড়ি (২।২৩।১৮) বজ্রধর বৃহস্পতি মেঘ অধোমুখ করেন।

তন্ত্রমতেও "বারিপূর্ণাং মহীং কৃত্বা। পশ্চাৎ সঞ্চরতে গুরুঃ।"

জলবর্ষী দিগ্‌গজের কথা সকলেই জানেন। জলবর্ষী গজ জলদেবতা বৃহস্পতির সাঙ্কেতিক চিহ্ন। বজ্রদংষ্ট্র গজমুণ্ড "এক-দন্ত গজানন" হইল।

মূষিক ভাবী ঝটিকা গণনা করিতে পরম দৈবজ্ঞ। আপতন্ত ঝড়ের পূর্ব্বে জাহাজের নৌ-নিগড় তুলিলে মূষিকদল ঝাঁকে ঝাঁকে ঝম্প দিয়া জাহাজ হইতে সমুদ্র-জলে পড়ে ও কিনারা লয়।

বিলাতী কাণ্ডারী ঠেকিয়া শিখিয়াছেন এই জ্যোতিষীদল চম্পট দিলে জাহাজ ভাসাইতে নাই। তাই মূষিক মরুৎগণের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। মূষিক "গণানাম্ গণ-পতি"র বাহন হইল।

দেবগুরু বৃহস্পতি দেবগণের পিতা।

"দেবানাম্ যঃ পিতরম্"... (ঋ ২।২৬।৩)

তিনি বেদমন্ত্রের জনিতা......জনিতা ব্রাহ্মণঃ অসি (ঋ ২।২৩।২)। গতিকে তিনি সিদ্ধি-দাতা গণেশ। তিনি আর্য্যজাতির আদি উপাস্য বৃহৎ-পতি। তাঁহার পূজা না করিয়া হিন্দু অন্য দেবের পূজা কিরূপে করিবেন। তাই গণপতি বৃহস্পতির পূজা সর্ব্বাগ্রে করিতে

হয়। নতুবা অন্য দেবগণ পূজা লইবেন না। কাহার সাধ্য দেবগণের পিতা বেদমন্ত্রের জনিতা গুরু বৃহস্পতিকে ছাড়িয়া পূজা করে বা পূজা লয়?

মূল-তত্ত্ব জানিলে পৌরাণিক উপন্যাস পড়িতে বড়ই আনন্দ অনুভব হয়। মূলতত্ত্ব জানা না থাকিলে বড়ই বিপদ।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে সুতীক্ষ্ণ তারাদর্শক পদ্মপুরাণকার গণপতির মূল উদ্‌ঘাটনে মহাভ্রমে পতিত হইয়া মূষিকবাহনে কাম-দেবকে চড়াইয়াছেন।

তবে সাহিত্যিক নিষ্ঠাবশে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে "সিদ্ধিপ্রদং কামদং" ধ্যানে মনটা যে বিচলিত না হয় এমন নহে।

বেদমতে বৃহস্পতি গীর্ব্বাণ তাই গণেশের হাতে বাদ্যভাণ্ড। জ্যোতিষমতে বৃহস্পতি গ্রহে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র উভয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

ব্রহ্মাধিদৈবং সূর্য্যান্ত ইন্দ্র প্রত্যধিদৈবতম্। তাই ব্রহ্মার (বিধির) কলম গণপতির হস্তে।

কার্ত্তিকেয়

কুক্কুটশোভিত কুমার শিখিবাহন কার্ত্তিকেয় কে? মহাভারতমতে কুমার স্কন্দদেব অগ্নির পুত্র। অগ্নিদেব কুমারকে চিত্র-শিখণ্ডী এবং শিখণ্ডী (কুক্কুট) উপহার দেন। কুমার দেবসেনার পতি।

মার-গ্রহ (মঙ্গল) সর্ব্বদেশে দেবসেনা-পতি। জ্যোতিষ মতে ভৌম ভূমিনন্দন মার-গ্রহের অধিদেবতা স্কন্দদেব।

"স্কন্দাধিদৈবতং ভৌমং"

কালিকাপুরাণে নির্দেশ আছে যে "কাম-দেবস্য বীজং তু মন্ত্রং ভৌমস্য কীর্ত্তিতম্।" কামদেব ও ভৌমগ্রহ উভয়ে একই বীজমন্ত্রে অর্চ্চিত হইবে। অর্থাৎ ভৌমগ্রহের অধি-দেবতা কামদেব।

ভৌমগ্রহের জ্যোতিষোক্ত অধিদেবতা কুমার স্কন্দদেব এবং কামদেব একই ব্যক্তি।

অথর্ব্ব-বেদোক্ত কামসূক্ত (৯।২) পাঠে আমরা পাই যে কামদেব ত্রিমূর্ত্তিতে মানবের হিত সাধন করেন। সমরদেব, মৃত্যুদেব এবং প্রণয়দেব। "যং তে কাম !শর্ম্ম ত্রিবরূথম্।" কুমার কার্ত্তিকেয় দেবকে আমরা এই ত্রিমূর্ত্তিতে উপাসনা করি।

পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধে এসিয়া য়ুরোপ এবং উত্তর আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকায় শরৎকাল জীবের মরণের সময়। তাই কার্ত্তিক মাসে মৃত্যুদেব কার্ত্তিকেয় উপাসিত হইয়া থাকেন।

কামরিপুপ্রবণ রণদুর্ম্মদ চিত্র-শিখণ্ডী (ময়ূর) কামদেব—কার্ত্তিকেয় দেবের বাহন। কামরিপুপ্রবণ রণদুর্ম্মদ শিখণ্ডী (কুক্কুট) কুমার কাম—কার্ত্তিকেয় দেবের ভূষণ। এবং কামরিপুপ্রবণ ছাগের মুণ্ড কুমার কার্ত্তিকেয় দেবের সপ্তম মুণ্ড। মহাভারত-উক্ত এই "ছাগবক্ত্র সপ্তম মুণ্ড" প্রতিমায় প্রকাশ থাকে না।

কালপুরুষমণ্ডল (Orion) কামদৈবত ভৌমগ্রহের নাক্ষত্রিক প্রতিমা। কৃত্তিকা-নক্ষত্র সন্নিহিত এই তারামণ্ডলে ময়ূর পৃষ্ঠে কুমারদেব আসীন আছেন। এবং তারা-কুক্কুট কুমারের শিরোদেশ সুশোভিত করিতেছে। এই তারা-কুক্কুট চাক্ষুষ দৃষ্টির গোচর নহে। ফীল্‌ড গ্লাস সাহায্যে ইহাকে দেখিতে হয়। চণ্ডীতে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ময়ূর-

কুক্কুটবৃত কুমার-মূর্ত্তিকে নারীবেশ দিয়াছেন। যথা :—ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরে অনঘে। কৌমারীরূপসংস্থে চ নারায়ণি! নামোঽস্তুতে॥

অহি-সর্প অহি-অন্ধকারের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। অহি সর্প ভক্ষণে শিখণ্ডী ময়ূর এবং শিখণ্ডী কুক্কুট উভয়েই লঘুহস্ত। অহি-সর্পনাশী সুন্দরকায় ময়ূর কুক্কুট উভয়ে অহি-অন্ধকারনাশী অপরূপ কুমারদেবের ভূষণ-বাহন হইলেন।

কুমার যে শক্তির আঘাতে মহিষ-অসুর বধ করিয়াছিলেন ঐ শক্তি কুমার-করে বিরাজমান আছে।

এই শক্তি ভৌমগ্রহের হস্তে দিয়া স্কন্দ-পুরাণকার মঙ্গল গ্রহের স্তবে বলিয়াছেন,—
"ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তং চ লোহিতাঙ্গম্ নমাম্যহম্॥"

চিন্তাশীল পাঠক বিচার করিবেন যে, স্তবটী গুহদেবে প্রয়োগ করিলে খাটে কি না।

লক্ষ্মী

বেদমতে—শ্রীঃ চ তে লক্ষ্মীঃ চ পত্নৌ। শ্রী ও লক্ষ্মী আদিত্যদেবের পত্নীদ্বয়।

পদ্মপুরাণে পড়ি—"লক্ষ্মীভ্রাতা শীতরশ্মিঃ" লক্ষ্ম-(কলঙ্ক)-ময়ী লক্ষ্মীদেবীর ভ্রাতা কলঙ্কী চাঁদ। পূর্ণিমা তিথির স্ত্রীগ্রহ রাকাচন্দ্র ভিন্ন শীতরশ্মির ভগিনী আর কে হইবে?

চন্দ্র ওষধিপতি। বেদমতে (ঋ ২।৩২।৫) রাকা ধন ও সহস্র পোষ (সাহায্য) দাত্রী।

যাঃ তে রাকে সুমতয়ঃ ....
যাভিঃ দদাসি...... বসূনি।
তাভিঃ নঃ অদ্য...
সহস্র পোষং সুভগে রণানা॥

সকলেই জানেন যে পূর্ণিমাচন্দ্রে লক্ষ্ম সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। তাই রাকাদেবী লক্ষ্মী নাম গ্রহণ করিয়া ধনধান্যদায়িনী হইয়াছেন। লক্ষ্মী শস্যের অধিপত্নী। হুতুম চন্দ্রের সহচর। সে দিবাভাগে অদৃশ্য থাকে। শস্যভক্ষক মূষিক বিনাশে হুতুম সিদ্ধহস্ত। এই গুণে সে লক্ষ্মীর বাহন হইল।

দ্বাদশ পূর্ণিমার মধ্যে শারদীয় পূর্ণিমা চাঁদের জ্যোৎস্নারূপে অতুলনীয় এবং জগতের অপার আনন্দপ্রদ বলিয়া কৌমুদী (কু+মুদ) আখ্যা পাইয়াছে।

শরৎশস্য আহরণ সমাপ্ত হইলে উল্লাসে ভারতের কৃষককুল কৌমুদীর নিশা আনন্দে জাগরণ করিত। তাই এই পূর্ণিমা কো-জাগরী নাম গ্রহণ করিয়াছে। এই কো-জাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে রাকার উদয় ক্ষণে হিন্দুকৃষকের ঘরে ঘরে কো-জাগরী লক্ষ্মীপূজা হয়। কিন্তু খাজানা, শেষকর ও চৌকিদারী টেক্সের দায়ে কৃষককুল ব্যাকুল হইয়াছে। রাত্রি জাগরণ কে করে?

লক্ষ্মীদেবী অন্ধকার-মহিষ নাশে ভগবতী দুর্গার দক্ষিণ হস্ত। তাই দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান পাইয়াছেন।

সরস্বতী

বীণামণ্ডলের (Lyra) পার্শ্বে আকাশ সরস্বতী সোমধারার (The Milky way) মধ্যে প্রবাহিত আছেন।

ঋক্‌মন্ত্রে (১।৩।১২) পড়ি—বারিধিকে সরস্বতী কিরণে আলোকিত করিতেছেন যথা—

"মহঃ অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা" টীকায় সায়ন বলিলেন "দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহবৎ দেবতা নদীরূপা চ।" আকাশ সরস্বতী বলিতে সাহসে কুলাইল না।

বেদমতে সরস্বতী বাক্‌দেবী। এবং সরস্বতীর কৃপায় বেদমন্ত্র রচিত হয়। সরস্বতী প্রচণ্ড, নক্ষত্রপথগামিনী এবং অন্ধকার-বিনাশিনী। যথা—ঋ ৬।৬১।৭

"ঘোরা হিরণ্যবর্ত্তনীঃ বৃত্রঘ্নী" তাই মহিষাসুর বধে সরস্বতী ভগবতী দুর্গার সহায় হইয়াছেন। তাঁহার ভূষণ তারা-বীণা এবং তাহার বাহন তারা-হংস (Cyghus).

তারাদর্শক।

শিরোরত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠী

বঙ্গদেশের পবিত্র সারস্বতধাম নবদ্বীপের বিদগ্ধজননী অথবা পোড়ামা তলা হইতে একটী সরল রাজপথ পশ্চিমাভিমুখ হইয়া ৺বুড়াশিবের কোঠা, ওলাদেবীর মন্দির ও পাড়ার মার তলা অতিক্রম করিয়া নদীয়া ও বৰ্দ্ধমান জেলার সীমাব্যঞ্জক পলতা বা আদিগঙ্গার খাত পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই পথের বাম পার্শ্বে ওলাদেবী তলার সম্মুখে শিরোরত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠী ছিল। দক্ষিণ-দ্বারী ও উত্তরদ্বারী দুইটী মৃণ্ময়-ভিত্তিবিশিষ্ট চণ্ডীমণ্ডপ। উহার মেঝে, বারান্দা, সিঁড়ি প্রভৃতি পাকা সিমেণ্ট করা। পূর্ব্বদ্বারী সুদীর্ঘ গৃহশ্রেণী, উহাতে প্রায় সাত আটটী ঘর। প্রত্যেক ঘরের অৰ্দ্ধাংশ উচ্চ, উহাতে বিদ্যার্থিগণ শয়ন ও উপবেশন করিতেন এবং অপর নিম্নার্দ্ধে পাকের উনোন ও আহারের স্থান। প্রত্যেক ঘরে একটী করিয়া দরজা ও উহার সমসূত্রপাতে ক্ষুদ্র আকারের একটী করিয়া জানালা। পূর্ব্বদিকে বাগান; উহাতে পেঁপে, কদলী, নিম, বেগুন, মেটে আলু, লঙ্কা, নটেশাক, পেয়ারা, ফজলি আম প্রভৃতির গাছ। উঠোনের চতুর্দ্দিকে দোপাটী, গাঁদা, কৃষ্ণকলি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প-তরু-শ্রেণী। তদ্ভিন্ন চতুষ্পাঠী গৃহ-শ্রেণীর উত্তর ভাগে দক্ষিণদ্বারী চণ্ডীমণ্ডপের পশ্চিম পার্শ্বে সমতলভূমিতে একটী বড় বিল্বতরু ও একটী চম্পক বৃক্ষ শোভা পাইত। চতুষ্পাঠী গৃহশ্রেণীর দক্ষিণাংশে বৃহৎ কূপ বিদ্যমান।

এই চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক স্বর্গীয় কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন মহাশয় নবদ্বীপের বিশ্রুতনামা পণ্ডিতগণের অন্যতম। তিনি নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক ৺হরমোহন চূড়ামণি ও প্রধান স্মার্ত্ত ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়দ্বয়ের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী এবং মহামহোপাধ্যায় ৺ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, ৺প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন, ৺হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, মহামহোপাধ্যায় ৺রাজ-কৃষ্ণ তর্ক পঞ্চানন প্রভৃতি অধ্যাপক মহোদয়-গণের সমসাময়িক। মহামহোপাধ্যায় ৺যদু-নাথ সার্ব্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন ও ৺শ্রীনাথ শিরোমণি প্রভৃতি অধ্যাপক মহোদয়গণ তাঁহার পরবর্ত্তী। শিরোরত্ন মহাশয় রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণের ভঙ্গ-কুলীন-বংশসম্ভূত। তাঁহার বংশোপাধি বন্দ্যো-পাধ্যায়। তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার

ও স্মায়দর্শনে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। শিরোরত্ন মহাশয় পাঠ শেষ করিয়া যদি মিশনরী কলেজে কিছুদিন চাকরি স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে উল্লিখিত অধ্যাপকগণ অপেক্ষা অনেক অধিক প্রখ্যাত ও যশস্বী হইতে পারিতেন সন্দেহ নাই। তিনি ব্রাহ্মণোচিত তেজস্বিতা রক্ষা করিতে গিয়া মিশনরী কলেজের কার্য্য পরিত্যাগ করেন। (*) তাহার পরে, তিনি সুন্দর চতুষ্পাঠী নির্ম্মাণ করিয়া পবিত্র অধ্যাপনা-ব্রতে ব্রতী হন। তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তের দুই পক্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেই ব্রত অক্ষুণ্ণ ছিল। এখনও সেই সারস্বতনিকেতন চতুষ্পাঠীর শেষ চিহ্ন মৃত্তিকা-স্তূপ রহিয়াছে, কিন্তু সেখান হইতে বাগ্‌দেবীর পবিত্র বীণাঝঙ্কার চিরকালের জন্য নীরব হইয়াছে। সে মধুর ঝঙ্কার আর কখনও সেখানে শ্রুত হইবে না।

পূজ্যপাদ গুরুদেব শিরোরত্ন মহাশয়ের প্রথম জীবনে ও মধ্যজীবনে কত শত বিদ্যার্থী তাঁহার উপদেশামৃত পান করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা গণনা করা অসম্ভব এবং আমি তাঁহাদের সকলের নামও অবগত নহি; আমি গুরুদেবের শেষ জীবনের ছাত্র, আমাদের সময়ে যাঁহারা তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতেন তাঁহাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতেছি। আমি একাদশবর্ষ বয়সে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়নের নিমিত্ত এই চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করি, তখন আগমেশ্বরীতলার ৺মথুরানাথ তর্কবাগীশ (মথুর পুরুত) পাঠ শেষ করিয়াছেন, তবে মধ্যে মধ্যে ছাত্রদের পাঠ চাওয়াইতে আসিতেন। বুড়াশিবতলার তারাপ্রসন্ন চূড়ামণি মহাশয় তখনও চতুষ্পাঠীর মেরুদণ্ডস্বরূপ বিদ্যমান ছিলেন। কুমারখালীর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী এবং নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসন্ন গোস্বামী কিছুকাল পরে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করেন। শিবচন্দ্র দাদা কাশী ঘুরিয়া পুনরায় এই চতুষ্পাঠীতে আসিয়াছিলেন। অপর ছয়জন সংসারে প্রবিষ্ট হন। আমি প্রতিদিন স্বহস্তে লিখিয়া ব্যাকরণ পাঠ করিতাম, গুরুদেব আমার হাতের লেখা দেখিয়া আমার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট ছিলেন। আমার সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ কাব্যতীর্থ ভায়ার (*) এবং আমার মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ভট্টিকাব্য ও অমরকোষ অভিধান পাঠ শেষ হইলেই গুরুদেব ব্যাকরণ পড়ান ছাড়িয়া দেন। তিনি ব্যাকরণপাঠার্থী ছাত্রদিগের শুভদিনে ব্যাকরণের একটী পাঠ পড়াইয়াই আমার এবং হরগোবিন্দ ভায়ার হস্তে পড়াইবার জন্য অর্পণ করিতেন। যদিও পাঠার্থীদিগের কতক সংখ্যক আমার হস্তে ও কতক হরগোবিন্দ ভায়ার হস্তে দিতেন। কিন্তু একের অনুপস্থিতিতে অপরকে

(*) তদানীন্তন পণ্ডিতগণের মধ্যে শিরোরত্ন মহাশয়কে সমধিক ব্যুৎপন্ন শুনিয়া মিশনরী কলেজের অধ্যক্ষ তাঁহাকে সংস্কৃত অধ্যাপকের কার্য্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। প্রথমে শিরোরত্ন মহাশয় অস্বীকার করেন, শেষে এইরূপ নিয়ম হয়, শিরোরত্ন মহাশয় মাসিক বেতন গ্রহণ করিবেন না, তবে 'মিশনরী' সাহেব ছয়মাস কিম্বা এক বৎসর অন্তর ইচ্ছা করিলে তাঁহার পুত্রদিগকে কিছু টাকা উপহার দিতে পারেন। শিরোরত্ন মহাশয় ছয়মাসের অধিক কর্ম্ম করেন নাই, তাঁহার পুত্রদিগকে কোন উপহারও গ্রহণ করিতে হয় নাই।

(*) বর্ত্তমান নড়াল ভিক্টোরিয়া কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক।

সকল ছাত্রকেই পড়াইতে হইত। আবার ছাত্রেরা কোন মাসে আমার নিকট কোন মাসে বা চরগোবিন্দ ভায়ার নিকট পড়িতেন। বৈশেষিক ছাত্রদের মধ্যে দুইজন আমাদের অপেক্ষা পাঠে অধিক অগ্রসর ছিলেন। একজন বিদ্যারত্ন আখ্যায় অভিহিত, ইঁহার নাম আমরা কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (ইদানীং স্মৃতিতীর্থ, তারকেশ্বরের মোহান্তের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক)। আমরা যাঁহাদের পাঠ চাওয়াইতাম, যতদূর স্মরণ আছে, নিম্নে তাঁহাদের নাম উদ্ধৃত করিলাম। শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য (ইদানীং স্মৃতিভূষণ, বর্দ্ধমান বিজয় চতুষ্পাঠীর স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক), শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (ইদানীং বিদ্যাভূষণ, নদীয়ার রাজ-পুরোহিত), ৺প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (৺হরমোহন চূড়ামণি মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র), শ্রীযুক্ত সিতি-কণ্ঠ ভট্টাচার্য্য (ইদানীং স্মৃতিভূষণ, ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পৌত্র এবং হরিসভার অধ্যক্ষ), ৺কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য, ৺যোগীন্দ্র-নাথ ভট্টাচার্য্য (নবদ্বীপের বিখ্যাত স্মার্ত্ত ৺শ্রীনাথ শিরোমণি মহাশয়ের সহোদরদ্বয়), ৺দুর্গাদাস আচার্য্য (পরে বিদ্যারত্ন, নদীয়ার রাজার তদানীন্তন পঞ্জিকাকার ৺তারিণীচরণ বিদ্যাবাগীশের পুত্র), শ্রীযুক্ত ব্রজরাজ গোস্বামী ভাগবতরত্ন (চৈতন্য-চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ), ৺মাধবচন্দ্র গোস্বামী ভাগবতভূষণ, ৺গোপাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ গোস্বামী (ইদানীং সন্ন্যাসী), শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা), ৺দীননাথ রায় (দীনু শেয়াল), শ্রীযুক্ত মতিলাল সান্যাল (মতি চোর), ৺বেণী ভট্টাচার্য্য (নদীয়ার রাজার দেওয়ান ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের পুরোহিত যাদু ভট্টাচার্য্যের পুত্র)। এত ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসী শ্রীযুক্ত মোহনলাল গোস্বামী (শান্তিপুরের শ্রীযুক্ত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র, ইদানীং প্রসিদ্ধ কথক), শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ ঘটক (ইদানীং বৃন্দাবননিবাসী পুরাণপাঠক), শ্রীযুক্ত ভবতারণ বিদ্যারত্ন (মুগ্ধবোধের বাঙ্গালা অনুবাদক), শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ শর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা (যশোর-জেলা-নিবাসী), শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল গোস্বামী (লটাখোলা-নিবাসী), শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ মিশ্র (উৎকল রাজ-পুর নিবাসী), ৺আর্ত্তত্রাণ পরায়ণ মিশ্র পাত্রীঙ্কর (গঞ্জাম জেলার অধিবাসী), এতদ্ভিন্ন ত্রৈলিঙ্গ দেশ হইতে অনেক ছাত্র অনেক সময় আসিতেন যাইতেন, তাঁহাদের সকলের নাম উল্লেখ করা অসম্ভব।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রীষ্মকালে প্রাতঃকালে ৭টার সময় ও শীতকালে ৮টার সময় চতু-ষ্পাঠীতে আসিতেন। তাঁহার টীকি ছিল না, প্রশস্ত টাক টীকির স্থান অধিকার করিয়া-ছিল। বর্ণ শ্যাম, শুভ্র উপবীত বক্ষঃস্থলে শোভা পাইত। একখানি সাদাপেড়ে ধুতি পরিতেন। বেশ দামী তালতলার চটি পায়ে দিতেন। তাঁহাকে কখনও জামা গায়ে দিতে দেখি নাই, শীতকালে একখানি পাতলা চাদরের উপর বনাত কিম্বা শাল গায়ে দিতেন। একটু বেঁটে ছিলেন, গুড় গুড় করিয়া যখন রাস্তা দিয়া আসিতেন, তখন চতুষ্পাঠীতে সকলে উচ্চৈস্বরে আবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে পড়িতে আরম্ভ করিত। তিনি আসার সময় একটী কাগজের ঠোঙ্গায় বড় বড় কতকগুলি টীকা ও উৎকৃষ্ট তামাক

লইয়া আসিতেন। ছাত্রবৎসল গুরুদেব জানিতেন, অন্তেবাসিগণ তাঁহার প্রসাদাকাঙ্ক্ষী, সুতরাং ঐ দুই দ্রব্য এরূপ পরিমাণে আনিতেন যে, তাহাদ্বারা সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত সমস্ত দিন রাত্রি চলিত। তিনি আসিয়াই দীনুদাদা বলিয়া সম্বোধন করিবামাত্র দীনুদাদা ঈষৎ হাসিমুখে গিয়া দুই হাত বাড়াইয়া টীকা-তামাক গ্রহণ করিতেন এবং তামাক সাজিয়া টিকা ধরানোর ছলে খুব মকুথম দুই টান দিয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে গিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হুঁকার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিতেন। দীনুদাদার অনুপস্থিতিতে বেণীদাদার হস্তে তাম্রকূট-বিভাগের কার্য্যভার ন্যস্ত হইত। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাক্ষাতে কোন ছাত্র তামাক খাইত না, কিন্তু তিনি যেন কিরূপ অভাবনীয় উপায়ে জানিতেন কে তামাক খায়, কে খায় না। যাহারা তামাক খায় না, তাহাদিগকে তিনি তামাক সাজিতে বলিতেন না। হরগোবিন্দ ভায়ার এবং আমার ও বালাই ছিল না, সুতরাং কখন তিনি আমাদের দু'জনকে তামাক সাজিতে বলিতেন না। পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা কোন দিন বা ১১টা পর্য্যন্ত অধ্যাপনা চলিত। তাহার পর পুষ্প, তুলসী, বিল্বপত্র চয়ন করিয়া গৃহে যাইতেন। একদিন কিংবা দুইদিন অন্তর বাগান হইতে থোড়, মোচা, কলাপাতা, মেটে আলু, কাঁচা কলা, নিমের পাতা, লঙ্কা, কাঁচা পেঁপে, পাকা পেঁপে সংগ্রহ করা হইত। যে দিন ঐ সকল গৃহে যাইত, সে দিন পূর্ব্বেই পরিচারিকা ঝুড়ি লইয়া বসিয়া থাকিত।

চতুষ্পাঠী হইতে বাটী গিয়াই ভট্টাচার্য্য মহাশয় বস্ত্র ও কোশা লইয়া গঙ্গার ঘাটে যাইতেন। সেখানে স্নান, তর্পণ, সন্ধ্যা শেষ করিয়া গৃহে আসিতেন। বাটী হইতে পূজোপকরণ সহ পুনরায় বুড়াশিবের কোঠায় আসিয়া শিবপূজা করিতেন। তাহার পর বাটীতে গিয়া নারায়ণ পূজা করিয়া আহার শেষ করিতে প্রায় তিনটা বাজিয়া যাইত। আধঘণ্টা বিশ্রামের পর, পুনরায় চতুষ্পাঠীতে আসিতেন। বিকালে নিজের চতুষ্পাঠীর ছাত্র পড়াইতেন না, নবদ্বীপের অন্যান্য চতুষ্পাঠী হইতে প্রতিদিন বহু বিদ্যার্থী ন্যায়ের শব্দখণ্ড, অলঙ্কারশাস্ত্র এবং কুসুমাঞ্জলি পড়িবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আসিতেন। যদিও ভট্টাচার্য্য মহাশয় অল্পসংখ্যক ছাত্রকে ন্যায়ের অনুমান-খণ্ড পড়াইতেন, কিন্তু ন্যায়ের শব্দখণ্ডে তাঁহার ন্যায় ব্যুৎপন্ন অধ্যাপক সে সময়ে নবদ্বীপে আর কেহই ছিলেন না। সুতরাং নবদ্বীপের সকল ছাত্রই পাঠ শেষ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার নিকট শব্দখণ্ড ও কুসুমাঞ্জলি (যাহাতে ন্যায়-মতে ঈশ্বর নিরূপণ করা হইয়াছে) পাঠ করিতে আসিতেন। আগন্তুক ছাত্রদের মধ্যে পাকা টোলের লক্ষ্মণ আচারী ও সদানন্দ ব্রহ্মচারী এই দুইজন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। লক্ষ্মণ আচারী গোঁপের জন্য ও সদানন্দ ব্রহ্মচারী ছাতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। লক্ষ্মণ আচারীর গোঁপ নৈমিষারণ্যের সেই বড় হনুমানের গোঁপের মত বেটালো ছিল। সদানন্দ ব্রহ্মচারীর ছাতার আকার অতি বৃহৎ, উহাতে বারোটা ডাল ছিল, শাদা ডবল কাপড় এবং শাদা ঝালর চতুর্দ্দিকে শোভা পাইত। ঐ ছত্রটীর মধ্যে চারি পাঁচটী লোকের স্থান সঙ্কুলান হইতে পারিত, কিন্তু ব্রহ্মচারী মহাশয় একাকীই উহার ছায়া উপ-

ভোগ করিতেন। বর্ণটী গৌর, মাংসল দেহ, মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিকবসন, দাঁত সাদা ধবধবে, হাসিলেই দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িত। মাথেও সদানন্দ, কার্য্যেও সদানন্দ, সকলের সঙ্গেই সর্ব্বদা হাসিমুখে কথা কহিতেন। ব্রহ্মচারী পাকাটোলে লক্ষ্মণ আচারীর ঘরের পাশের ঘরে বাস করিতেন। আচারী কৃষ্ণ-বর্ণ শাস্ত্রোক্ত গোষ্পদপরিমিত দীর্ঘশিখা তাঁহার পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত হইত। পেচকের ন্যায় আরক্ত নয়ন ও অত্যন্ত ক্রোধান্ধ। আচারী কথায় কথায় সরলপ্রকৃতি ব্রহ্মচারীর নামে অভিযোগ করিতেন, আমাদের চতুষ্পাঠীতে উহার বিচার হইত, ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিবাদ মিটাইয়া দিতেন। আবার দুইজনে কোলাকুলি করিয়া হাসিতে হাসিতে টোলে ফিরিয়া যাইতেন। পাকাটোলের আর একটী প্রবীণ বিদ্যার্থী গুরুদেবের নিকট "বাদার্থ" পড়িতে আসিতেন। ইঁহার জন্মভূমি পঞ্জাবের জলন্ধর নগর। ইনি একচক্ষু, ছাত্রমণ্ডলীতে কাণাভট্টের (রঘুনাথ শিরোমণির) দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। পাকাটোলের অধ্যাপক ৺প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের তিরোভাবের পর ইনি কয়েক বৎসর পাকাটোলে অধ্যাপনা করেন। অকৃতদার, এখন হরিদ্বারে বাস করিতেছেন। ইঁহার নাম রামকৃষ্ণ তর্কশাস্ত্রী। পাকাটোলে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের বিদ্যার্থীই বাস করিতেন। আমাদের টোলের সীমানার পরই পাকাটোলের সীমানা, সুতরাং চণ্ডীমণ্ডপের পশ্চাদ্দিকে থাকিয়াও আমরা ঐ টোলের বিদ্যার্থীদের সর্ব্বপ্রকার আচার-ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিতাম। পাকাটোলে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দুইটী পেঠেলী ছিল (নবদ্বীপে ঝীকে পেঠেলী বলে)। ঐ দুই পেঠেলী মহাপ্রভাবা এবং ছাত্রগণের একপ্রকার পরিচালিকা। ইহাদের দু'জনের নামই শশিমুখী। একটী বয়স্থা ও একটী প্রৌঢ়া। বয়স্থা ছোট শশী ও প্রৌঢ়া বড় শশী নামে প্রসিদ্ধা ছিল। ইহারা দু'জনেই সৎস্বভাবা, চতুরা এবং বুদ্ধিমতী, উহারা সহোদরা ভগিনীর ন্যায় ছাত্রদের পরিচর্য্যা করিত। ন্যায়শাস্ত্রের সমস্ত গ্রন্থগুলির নাম জানিত, ছাত্রেরা চণ্ডীমণ্ডপে অধ্যাপকের নিকট পড়িতেছে, এমন সময় কোন গ্রন্থের প্রয়োজন হইলে ছাত্রের গৃহ হইতে তাহা আনিয়া দিত। তৈলঙ্গী, তামিল, মহারাষ্ট্র ছাত্র আসিলে ঐ দেশীয় অন্য ছাত্রের অনুপস্থিতিতে উহারাই তাহাদের ভাষা বুঝিয়া সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া দিত। আমাদের চতুষ্পাঠীর বৃদ্ধা পেঠেলীর সে কৃতিত্ব ছিল না। একবার আমাদের চতুষ্পাঠীতে দক্ষিণভারতের সুদূর প্রদেশ হইতে একটী বিদ্যার্থী ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত আগমন করেন। প্রথমে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত সংস্কৃতভাষায় সকল কথা হইল। গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়াই ছাত্রটী বলিলেন "সখি মাডবি আড়া" পেঠেলী কিছু বুঝিতে না পারিয়া আমাদের ডাকিয়া লইয়া গেল। আমরা বলিলাম "কিং প্রার্থয়তে ভবান্? ইয়ং বরাকী তব উপলব্ধুং শক্নোতি।" তাহার পর, তিনি হাসিয়া বলিলেন—মহ্যম্ অঙ্গারং দেহি।" শেষে পেঠেলী বুঝিতে পারিয়া উনুন ধরাইয়া দিল। পাকাটোলের পেঠেলীরা হইলে ঐ ছাত্রটীর জন্য আমাদিগকে কিছুই বলিতে হইত না। দূরদেশ হইতে যে সকল বিদ্যার্থী নবদ্বীপে আসিতেন, তাহারা প্রায়

প্রকার জ্ঞানযোগী, অনেক সময় তাঁহারা শাস্ত্র-চর্চ্চায় নিমগ্ন হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতেন। একদিন পাকাটোলের ছাত্রেরা হাত মুখ ধুইতে পল্‌তায় (আদি গঙ্গার খাতে) গিয়াছে, দুইজন জিগীষু ছাত্রের পরস্পর সাক্ষাৎ হইয়াছে। দুইজনে দুই নিশিন্দ্যার ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া বাঁধের উপরে দাঁতন করিতে করিতে ন্যায়শাস্ত্রের কোন পূর্ব্বপক্ষ সম্বন্ধে বিতর্ক করিতে বসিয়া গিয়াছেন। এ'দিকে বেলা দশটা বাজে অধ্যাপক 'গৃহগমনোন্মুখ,' বড় শশী (পেঠেলী) খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়া ধমক দিয়া ডাকিয়া লইয়া গেল। আবার অন্য-দিন গঙ্গাস্নান করিয়া একদল পাকাটোলের মৈথিল বিদ্যার্থী টোলে ফিরিতেছেন, ৺ভুবন-মোহন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের টোলের একদল মৈথিল ছাত্র স্নানে যাইতেছে। পোড়ামা-তলায় উভয়দলের যেই সাক্ষাৎ হওয়া অমনি তর্ক আরম্ভ, পূর্ব্বোক্ত দলের পশ্চাৎ একটী মুটে ছিল, তাহার মাথায় একধামা আম ও তাল। ছাত্রগণ তর্ক করিতেছেন, তাঁহাদের মাথা ঘুরিতেছে, টিকী দুলিতেছে, মুটে হাঁ করিয়া সেই দিকে তাকাইয়া আছে। এদিকে পোড়ামাতলার বটের গাছের ডাল হইতে একটী ছোট বানর একটী একটী করিয়া আম ও তাল তুলিয়া লইতেছে, হাতে হাতে আম ও তাল বৃক্ষময় বানর-সম্প্রদায়ের মধ্যে চালান হইতেছে। ছোট শশী গঙ্গাজল লইয়া যখন সেখানে উপস্থিত, তখন শেষ আম্রটী বানর শিশু কর্ত্তৃক অপহৃত হইল। সে চেঁচিয়ে বলিল "তোমরা এখানে ঘটাকাশ, পটাকাশ কচ্চো, এদিকে তোমাদের পিণ্ডী যে বানরে গেলছে।" তখন সকলে ধামার মধ্যে ফলের অত্যন্তাভাব লক্ষ্য করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আবার ছোটশশী পোড়ামা-কোঠায় গঙ্গাজলের কলসী রাখিয়া মুটে সঙ্গে করিয়া আম ও তাল কিনিতে গেল। এইরূপ ঘটনা প্রায়ই হইত।

আমাদের চতুষ্পাঠী বুড়া শিবতলা সরকের দক্ষিণ পার্শ্বে, উহার ঠিক উত্তর পার্শ্বেই স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের টোল। ঐ টোলে বাঙ্গালী ছাত্র ছিল না, অধিকাংশ মৈথিল, দুই একটী উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছাত্র ছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের একটী তরুণবয়স্ক দণ্ডী ঐ টোলে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। তিনি সম্পন্ন লোকের সন্তান, উপনয়নের পর স্বেচ্ছায় দণ্ড ত্যাগ করেন। যেমন সুন্দর সুগঠিত দেহ, তেমনি প্রতিভাবান্। তিনি আমাদের টোলে ভট্টা-চার্য্য মহাশয়ের নিকট বিকালে কুসুমাঞ্জলি পড়িতে আসিতেন। তাঁহার প্রতিমাসেই বাটী হইতে মণি-অর্ডার আসিত, গরদের কাপড় গিরিমাটী দিয়া ছুপাইয়া পরিতেন। দণ্ডীদের অগ্নিস্পর্শ করা নিষেধ, সুতরাং রাম-সীতার বাটীতে মাসিক আট টাকা দিয়া হিন্দুস্থানী পাচকের হস্তে এক বেলা চর্ব্ব্যচুষ্য আহার করিতেন এবং ফলমূল মিষ্টান্ন দুগ্ধে রাত্রের ব্যাপার সমাপ্ত হইত। দণ্ডী প্রাতঃ-কালে মুখ ধুইয়াই সেই সময়ের দোয়া ঈষদুষ্ণ একসের দুগ্ধের মধ্যে এক ছটাক ঘৃত মিশাইয়া পান করিতেন। তাঁহার শরীরে হস্তীর ন্যায় বল ছিল। ঐ দণ্ডীর নাম সোমেশ্বরানন্দ সোমেশ্বরানন্দ গৃহত্যাগী দণ্ডী অথচ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ়মাসে বিকালবেলা আকাশে মেঘ উদিত হইলেই আকাশের দিকে তাকাইয়া

অতি মধুর স্বরে মেঘদূতের নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিতেন।

"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে॥"

আমরা তাঁহার জীবনের রহস্য কিছু বুঝিতে পারিতাম না। তখনও নবদ্বীপে টোলের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় প্রায়ই দল বাঁধিয়া যাইতে হইত, প্রায়ই পথের মধ্যে কি গঙ্গার ঘাটে তর্ক-বিতর্ক হইত। সায়ংকালে গঙ্গাতীরে যাইবার সময়ও ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক হইত।

প্রতিপদ্, চতুর্থীর রাত্রি, অষ্টমী, ত্রয়োদশীর রাত্রি প্রভৃতি অনধ্যায় কালে আমরা বাঙ্গালা হইতে সংস্কৃতানুবাদ ও সংস্কৃত কবিতা রচনার চেষ্টা করিতাম। কোন কোন দিন অন্য টোল হইতেও অধিকবয়স্ক ছাত্রেরা আসিয়া আমাদিগকে উদ্ভট কবিতা শুনাইতেন। আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয় সে সময়ে নবদ্বীপের প্রধান কবি। আমরা তাঁহার রচিত কবিতারও আলোচনা করিতাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অত্যন্ত উদারচরিত ছিলেন, তিনি যেমন দয়ালু তেমনি নির্লোভ, লোকে তাঁহাকে একটু ক্রোধী বলিত, কিন্তু অতটুকু ক্রোধ না থাকিলে লোকে গ্রাহ্য করিবে কেন? তাঁহার যথেষ্ট গাম্ভীর্য্য ছিল, তিনি চতুষ্পাঠীতে পদার্পণ করিলেই সেই ছাত্র-কলরবে মুখরিত চতুষ্পাঠী যেন "নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্" হইত। নবদ্বীপের সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি পাইতেন। এতদ্ভিন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গরিব ছাত্রদিগকে বৃত্তি ব্যতীত মাসিক দুইএক টাকা করিয়া সাহায্য করিতেন। তাঁহার ক্রোধ ছিল বটে, কিন্তু সে ক্রোধ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইত না। আমরা দেখিয়াছি তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হইলেও, তিনবার কাছা ঝাড়িয়া কাছা দিলেই তাঁহার সমস্ত ক্রোধ অন্তর্হিত হইত। একবার ভট্টাচার্য্য মহাশয় পড়াইয়া কেবল বাটী যাইবেন এমন সময় চাউল বোঝাই গরুর গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়া টোলের কঞ্চির বেড়ার কতকাংশ ভাঙ্গিয়া যায়। সংবাদ পাইবা মাত্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়াই গাড়োয়ানের প্রাণ উড়িয়া গেল। সে হতভম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে একবার হাত উঁচু করিয়া মারিতে যান, আবার পিছাইয়া আসেন, এইরূপ বার তিনেক করিয়া তাহার পর ফুলের সাজি বেলতলায় রাখিয়া আবার কি মনে হইল, হাত উঁচু করিয়া গিয়া ফিরিয়া আসিলেন, তাহার পর একবার কাছা ঝাড়িয়া কাছা দিলেন। আবার বকিতে বকিতে কাছা ঝাড়িয়া কাছা দিলেন। তখন ছাত্রেরা চুপে চুপে বলিতে লাগিল, আর একটীবার কাছা ঝারিলেই বেচারা নিস্তার পায়। সত্য সত্যই আর একবার কাছা ঝারিয়া যখন কাছা দিলেন, তখন তাঁহার পুনরায় পূর্ব্ববৎ সৌম্যভাব লক্ষিত হইল, বলিলেন "যা বেটা যা আর কখনও বেড়া ভাঙ্গিস না, সকালে কিছু খেয়েছিস্?" গাড়োয়ান বলিল "ঠাকুর মশাই খাব কি? শেষরেত্তে গাড়ী ছেড়েছি, নদের বাজারে যাব, চাউল বেচব তবে তো পয়সা পাব।" ঐ কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় টেঁক থেকে তিনটা পয়সা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন "যা মুড়ি মুড়কী কিনে খাগে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, তাঁহার পু॰ মথুরার আঃ সার্জ্জন ডাক্তার ছিলেন, তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেন, তাঁহার প্রেরিত অর্থও না কি গ্রহণ করিতেন না। গুরুদেবের উপদেশ ও শাসনগুণে ছাত্রগণের মানসিক ও নৈতিক পবিত্রতার তিলমাত্র হানি নাই। আমরা জীবনের প্রথম অংশ তাঁহার চতুষ্পাঠীতে অতি সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলাম। সকলেই সুস্থ দেহে অতি আনন্দে ছিলাম। ছাত্রগণের মধ্যে পরস্পর হিংসাদ্বেষ তিলমাত্র ছিল না, সকলেই পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন। 'তে হি নো দিবসা গতাঃ।'

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

বৈদিক সাধনার আভাস

এইরূপে ঋষি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে প্রথমে অব্যক্ত সৃষ্টির পরে ভোক্তৃ-ভোগ্যসৃষ্টির স্থূলবিবরণ দিয়া সর্ব্ববিশ্বের অধ্যক্ষ সর্ব্বজ্ঞ এক ঈশ্বরের অঙ্গীকার করিলেন। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, তথাপি প্রলয়কালে তাঁহার যে নির্গুণ অবস্থা যে অবস্থায় গুণময়ী প্রকৃতি অভিন্নরূপে তাঁহাতে অবস্থিতা ও নিষ্ক্রিয়া, সেই অবস্থা হইতে একেবারে গুণময় জগতের সৃষ্টি হইতে পারে না। এই জন্যই সৃষ্টির সর্ব্বপ্রথম স্তরে বিশ্বজননী তাঁহার গুণের লীলা প্রকটিত করিবার জন্য ব্রহ্ম হইতে যেন একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। "যেন" বলিবার কারণ এই যে এই সরিয়া দাঁড়ান যথার্থ সরিয়া দাঁড়ান নহে। দ্বৈতদৃষ্টি অজ্ঞানের দৃষ্টিমাত্র, অনির্ব্বচনীয় অথচ মিথ্যা কর্ম্মসংস্কারের মিথ্যা ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরন্তু দ্বৈতজগতে এই দ্বৈতভাব সম্পূর্ণ সত্য। কর্ম্মসংস্কারবদ্ধ জীবের পক্ষে দ্বৈতভাবের অস্বীকার করিতে যাওয়া আর মাত্রাস্পর্শের অধীন ব্যক্তির পক্ষে অগ্নিকে জগদ্ব্যাপী তেজঃপদার্থমাত্র বলিয়া তাহাতে হস্তপ্রবেশ করান সমান কথা। সৃষ্টিলীলা দ্বৈতলীলা, সুতরাং সৃষ্টির কথা বলিতে গেলে দ্বৈতভাবেরই ব্যাখ্যান করিতে হয়। এই জন্য ঋষি সৃষ্টিস্থিতি অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা বলিয়াও, জগতের অধ্যক্ষের অর্থাৎ ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মের অবতারণা করিয়াছেন। গুণ অবচ্ছেদক, সুতরাং সগুণ ঈশ্বর অবচ্ছিন্ন, শরীরী। সাধারণ জীব যেমন স্থূলদেহে অধিষ্ঠিত, তিনি তেমনি ব্যোমদেহে অধিষ্ঠিত।

৪র্থ ঋকে যে মূলপ্রকৃতিকে অসৎ বলা হইয়াছে, সেই মূলপ্রকৃতি বা অব্যক্তকেই ৭ম ঋকে ব্যোম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। "অব্যক্তং অব্যাকৃতাকাশাদি-নামবাচ্যং" (শঙ্করভাষ্য—কঠ ৩।১১) অর্থাৎ অব্যক্তকে, অব্যাকৃত, আকাশ, প্রভৃতি নামে

অভিহিত করা হয়। পুরুষসূক্তে (ঋ-স ১০।৯০) ইহাকে বিরাট্ বলা হইয়াছে। এই বিরাট্ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডদেহকে আশ্রয় করিয়া পুরুষ, অর্থাৎ পরমাত্মা, সগুণ ঈশ্বররূপে জাত হন (ঋ-স ১০।৯০।৫)। প্রজাপতিসূক্তে আবার (১০।১২১) এই বিরাড্‌দেহাভিমানী পুরুষকে হিরণ্যগর্ভ বলা হইয়াছে। বিরাট্ পুরুষের অণ্ডস্বরূপ কারণ যেরূপ অণ্ডের মধ্যে জীবের উৎপত্তি হয়, তেমনি বিরাটের মধ্যে নিখিল জগতের উৎপত্তি হয়। বিরাট্ হিরণ্ময়, কারণ উহা প্রকাশস্বভাব। অতএব বিরাটে অধিষ্ঠিত পুরুষ হিরণ্যগর্ভ। এই বিরাটে অধিষ্ঠিত পুরুষ বা হিরণ্যগর্ভই জগতের স্রষ্টা এবং তিনিই প্রজাপতি অর্থাৎ জগতের অধ্যক্ষ; মায়াবেষ্টিত হইলেও তিনি মায়ার অধীন নহেন; তিনি সর্বজ্ঞ ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ। প্রজাপতিসূক্তে বৈদিক ঋষি ইঁহার জগৎকর্তৃত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছেন। প্রজাপতি সূক্ত বা ক-সূক্তঃ—

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ
পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ॥ ১ ॥
য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে
প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ॥ ২ ॥
যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা
জগতো বভূব ॥
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ॥ ৩ ॥
যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ॥ ৪ ॥
যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্বঃ
স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ
দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫ ॥
যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং
মনসা রেজমানে।
যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ॥ ৬ ॥
আপো হ যদ্ বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্গর্ভং দধানা
জনয়ন্তীরগ্নিং।
ততো দেবানাং সমবর্ত্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ॥ ৭
যশ্চিদাপো মহিনা পর্যপশ্যদ্দক্ষং দধানা
জনয়ন্তীর্যজ্ঞং।
যো দেবেষ্বধিদেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ॥ ৮ ॥
মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা
দিবং সত্যধর্মা জজান।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ॥ ৯ ॥
প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি
পরি তা বভূব।
যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম
পতয়ো রয়ীণাং ॥ ১০ ॥"
ঋ—স ১০।১২১

ইহার অনুবাদ ও তাৎপর্য্য—

১। অগ্রে হিরণ্যগর্ভ জাত হন। জাত হইয়া তিনি ভৌতিক জগতের এক (অদ্বিতীয়) পতি অর্থাৎ ঈশ্বর হন। তিনি এই পৃথিবী

ও দ্যুলোক ধারণ করেন। কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তাৎপর্য্য—সৃষ্টির প্রারম্ভে অব্যক্তরূপ হিরণ্ময় অণ্ডের গর্ভে দেব প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। বস্তুতঃ পরমাত্মাই হিরণ্যগর্ভরূপে আবির্ভূত হন, সুতরাং হিরণ্যগর্ভের জন্ম হয় এ কথা নিরর্থক। ফলতঃ বিয়দাদি উপাধি সকলের উৎপত্তি হয় বলিয়া তাহারা যাঁহার উপাধি তাঁহাতে এই উৎপত্তির অধ্যাস হইয়াছে।

প্রলয়ান্তে পরব্রহ্মের তপঃ হইতে বিয়দাদি ভূত সকলের সৃষ্টির পূর্ব্বে হিরণ্যগর্ভের আবির্ভাব হয়। এই কথাই কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে। যঃ পূর্ব্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত” (কঠ ২।১।৬)।

কঃ, কিম্ শব্দের পুংলিঙ্গের প্রথমার এক-বচন। নিখিল জগতের ঈশ্বরের স্বরূপ মায়া-বদ্ধ জীবের পক্ষে অনির্দ্দেশ্য বলিয়া তাঁহাকে ঋষি কঃ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ঋকে উক্ত হইল যে হিরণ্যগর্ভ জগতের অদ্বিতীয় পতি বা ঈশ্বর ও ধারক।

২। যিনি আত্মা দান করেন ও বল দান করেন; যাঁহার প্রকৃষ্ট শাসন সকলে ভজনা করে, এমন কি দেবগণও ভজনা করেন; অমৃতত্ব যাঁহার ছায়া ও মৃত্যুও যাঁহার ছায়া সেই ক-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তাৎপর্য্য—এই দেব প্রজাপতি হইতে আত্মা সকল আবির্ভূত হয় যেমন অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ সকল আবির্ভূত হয়। দর্শনশাস্ত্রে এই জন্য ইঁহাকে সূত্রাত্মা বলা হইয়াছেন। ইঁহার শাসন অনুসারে সমগ্র বিশ্ব শাসিত হয়। “একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি” (কঠ—২।২।১২)—এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর নিখিল জগতের শাসক ও সর্ব্বভূতের অন্তঃস্থিত আত্মা; তিনি এক হইয়াও আপনাকে বহু করেন। মৃত্যু ও অমৃতত্ব তাঁহার ছায়া, অর্থাৎ তিনি জীবের কর্ম্মফলদাতা। এই ঋকে উক্ত হইল যে হিরণ্যগর্ভ সূত্রাত্মা নিখিল বিশ্বের শাসক ও কর্ম্মফলদাতা।

৩। যিনি মাহাত্ম্যহেতু প্রাণনক্রিয়াশীল ও নিমেষবিশিষ্ট জগতের এক অদ্বিতীয় রাজা; যিনি দ্বিপদও চতুষ্পদবিশিষ্ট এই প্রাণি-জগতের শাসক সেই কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তাৎপর্য্য—এই ঋকে হিরণ্যগর্ভদেবের শাসকত্ব বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। তিনি নিখিল প্রাণিজগতের রাজা।

৪। এই সকল হিমবান্ (পর্ব্বত) যাঁহার এবং নদীর সহিত সমুদ্র যাঁহার মাহাত্ম্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এবং এই দিক্‌সকল যাঁহার বাহু সেই কঃ—দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তাৎপর্য্য—হিমবান্ পর্ব্বত ও নদী সহিত সমুদ্র দ্বারা সমগ্র জড়জগৎ উপলক্ষিত হইতেছে। ৩য় ঋকে প্রাণিজগতের কথা বলা হইয়াছে। এই ঋকে জড়জগতের কথা হইতেছে। কি প্রাণিজগৎ কি জড়জগৎ সকলেই তাঁহার মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিতেছে, কারণ তিনি তাহাদিগের স্রষ্টা এবং তাহারা তদ্রূপে অবস্থিত। শুধু তাহাই নহে, এমন কি শূন্যরূপী দিক্‌সকল তাঁহার বাহুস্বরূপ। এই ঋকে হিরণ্যগর্ভের বিরাটত্ব উক্ত হইল।

৫। যাঁহার দ্বারা দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ ও

পৃথিবী দৃঢ় হইয়াছে, যাঁহার দ্বারা স্বর্গ (স্বস্থানে, স্থানভ্রষ্ট না হয় এরূপভাবে:) স্তব্ধীকৃত হইয়াছে; যিনি অন্তরীক্ষে রজের অর্থাৎ উদকের নির্মাতা, সেই কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তাৎপর্য্য—হিরণ্যগর্ভ যে শুধু জগৎকে সৃষ্টি, ধারণ ও শাসন করেন তাহা নহে। যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা জগৎ রক্ষিত হয়, তিনি সেই সকল নিয়মেরও বিধান করেন। এই ঋকে হিরণ্যগর্ভকে জগতের রক্ষক বলা হইল।

৬। দীপ্তিশালিনী দ্যাবাপৃথিবী লোকরক্ষার্থ লব্ধস্থৈর্য্য হইয়া যাঁহাকে মনদ্বারা (আমাদের মহত্বের ইনিই কারণ এইরূপ চিন্তা করিয়া) দর্শন করে; যাঁহাকে আধাররূপে প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্য উদিত হন ও আলোক বিস্তার করেন সেই কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তৎপর্য্য—এই ঋকে হিরণ্যগর্ভকে ভূলোক ও দ্যুলোকের উপাস্য ও সূর্য্য প্রভৃতির আধার বলা হইয়াছে।

৭। মহতী, অগ্নির জনয়ন্তী অপ্ সকল যে গর্ভকে ধারণ করিয়া বিশ্ব ব্যাপিয়াছেন সেই গর্ভ হইতে দেবগণের এক প্রাণ আবির্ভূত হয়। কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তাৎপর্য্য—অপ্ শব্দে এখানে অব্যক্ত বা বিরাট বুঝিতে হইবে। দর্শনশাস্ত্রে ইহাকেই কারণ-বারি বলা হইয়াছে। এই অপ্ হইতে অগ্নি প্রভৃতি ভূতসকল উৎপন্ন হয়। ইহা প্রজাপতির শরীর। "বিশ্ব ব্যাপিয়াছেন" এই কথা দ্বারা অপের বিরাটত্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। পুরুষ প্রজাপতিরূপে ইঁহার গর্ভে অর্থাৎ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। প্রজাপতি হইতে দেবগণের এক প্রাণের উৎপত্তি হয়। এক প্রাণ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে জগতে প্রাণপদার্থ এক। বিরাড্‌দেহী প্রজাপতির দেহে এক বিরাট্ প্রাণের আবির্ভাব হইল। এই প্রাণকে অবলম্বন করিয়া দেবগণের উৎপত্তি হইল। কঠোপনিষদে এই কথাই উক্ত হইয়াছে।—

"যা প্রাণেন সংভবতি অদিতির্দেবতাময়ী" (কঠ ২।১।৭) অর্থাৎ যে সর্ব্বদেবাত্মিকা অদিতি বা মূলপ্রকৃতি প্রাণরূপে আবির্ভূতা হন। পুনশ্চ, 'যতশ্চোদেতি সূর্য্যঃ অস্তং যত্র চ গচ্ছতি। তং দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন" (কঠ ২।১।৯), অর্থাৎ যাহা হইতে সূর্য্য উদিত হন ও যাহাতে অস্ত যান সেই প্রাণকে আশ্রয় করিয়া দেবগণ অবস্থিত ইত্যাদি। এই ঋকে হিরণ্যগর্ভের বিরাডধিষ্ঠাতৃত্ব ও তাঁহা হইতে প্রাণের উৎপত্তি ও প্রাণকে আশ্রয় করিয়া দেবগণের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে।

৮। যজ্ঞের জনয়ন্তী, দক্ষের ধারয়িত্রী অপ্ সকলকে যিনি মহিমাদ্বারা সম্যক্ দর্শন করেন, যিনি দেবগণের উপরে এক অদ্বিতীয় দেব, সেই কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তাৎপর্য্য—বেদে জগৎ বা বিকারোৎপন্ন বিশ্ব যজ্ঞরূপে কল্পিত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে পুরুষসূক্ত (১০।৯০) ও সৃষ্টিসূক্ত (১০।১৩০) দ্রষ্টব্য। এই জগদ্রূপী যজ্ঞ অপ্ অর্থাৎ অব্যক্ত মূলপ্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। দক্ষ প্রজাপতি। অপ্ তাঁহার ধারয়িত্রী অর্থাৎ

তাঁহার শরীর। প্রজাপতির শরীরভূত যে অব্যক্ত মূলপ্রকৃতি তাহা হইতে জগতের উৎপত্তি। প্রজাপতি এই শরীরের অভ্যন্তরে থাকিয়া সমস্ত দর্শন করেন। তিনি জগতের দ্রষ্টা, সাক্ষী, সর্ব্বজ্ঞ। তিনি দেবগণেরও ঈশ্বর ও অদ্বিতীয়। এই ঋকে প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব ও হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি ঈশ্বরের সর্ব্বসাক্ষিত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব উক্ত হইয়াছে।

৯। যিনি পৃথিবীর জনয়িতা, সত্যধর্ম্মা যিনি দ্যুলোকের স্রষ্টা, এবং যিনি মহতী উদক সকলের স্রষ্টা, তিনি যেন আমাদিগকে হিংসা না করেন। কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তাৎপর্য্য—এই ঋকে হিরণ্যগর্ভের সর্ব্ব-স্রষ্টৃত্ব ও হিংসকত্ব বা বিনাশকত্ব উক্ত হইয়াছে।

১০। হে প্রজাপতি, তোমা ভিন্ন কেহ বর্ত্তমান সমস্ত বিশ্ব জানে না কিংবা তোমা ভিন্ন কেহ সর্ব্ববিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকে না। আমরা যে সকল কামনা করিয়া তোমাকে হবির্দান করিতেছি, আমাদিগের সেই সকল কামনা পূর্ণ হউক। আমরা যেন ধন সকলের পতি হইতে পারি।

তাৎপর্য্য—এই ঋকে হিরণ্যগর্ভের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্ব ও সর্ব্বাভীষ্টদাতৃত্ব উক্ত হইয়াছে।

সগুণ ঈশ্বরের যতগুলি গুণ থাকা আবশ্যক, ঋষি তাহা এক এক করিয়া প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভে স্থাপন করিলেন। তিনি তাঁহার বিরাট্ দেহে বিশ্বকে ধারণ করেন এবং সর্ব্বঘটে আত্মারূপে প্রকাশিত হন। তিনি জগতের স্রষ্টা, নিয়ন্তা, পালয়িতা ও সংহর্ত্তা। নিখিল বিশ্বের তিনিই একমাত্র উপাস্য। তিনি মায়াশরীরী হইলেও মায়ার অধীন নহেন,—তাঁহার দৃষ্টি অবিতথ, অপ্রতিহত। তিনি সত্যধর্ম্ম ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি ভিন্ন সমস্ত বিশ্ব কেহ জানে না, সুতরাং পূর্ব্বসূক্তে (১০।১২৯।৭) যে জ্ঞাতা অধ্যক্ষের কথা ঋষি বলিয়াছেন এই প্রজাপতিই সেই অধ্যক্ষ। তাঁহা হইতেই প্রাণের উৎপত্তি, যে প্রাণকে অবলম্বন করিয়া দেবগণ অবস্থান করেন। তিনি জীবের কর্ম্মফলদাতা। মৃত্যু ও অমৃত্যু উভয়েই ছায়ারূপে তাঁহার অনুগমন করে—উৎপত্তি ও বিনাশ, বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রভৃতি দ্বন্দ্বের তিনি অতীত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দর্শনশাস্ত্রে ঈশ্বরের যে নির্ণয় আছে তাহা সম্পূর্ণভাবে বেদের অনুগামী। যোগিগণ যে "ক্লেশ-কর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ" (পাতঞ্জল দর্শন ১।২৪) ঈশ্বরের ধ্যান করেন বৈদিক ঋষিও সেই ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন। এই ঈশ্বর বেদান্তের প্রত্যগাত্মা, সূত্রাত্মা, আনন্দময়। প্রকৃতিবিকার সুখ দুঃখ মোহের অতীত এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের নাম আনন্দ। প্রজাপতি ঈশ্বর প্রকৃতির অধীন নহেন, সুতরাং আনন্দময়। "আত্মানন্দময়ঃ" (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৫)।

(ক্রমশ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র লাল মজুমদার।

বাঙ্গালা মাসিকপত্র

বোধ হয় লেখক ও পাঠকের তুলনায় বাঙ্গালা মাসিকপত্র অধিক হইয়াছে। ইহাতে দেশের শুভাশুভ বিচার না করিয়া পাঠকের পক্ষ হইতে দুই চারি কথা লিখিতেছি।

নির্ম্মাতা, বিক্রেতা ও ক্রেতা এই তিনের যোগে যেমন হাট; লেখক, সম্পাদক ও পাঠক এই তিনের সহকারিতায় তেমন মাসিকপত্রের প্রতিষ্ঠা। ক্রেতা দেখিলে বিক্রেতা উপস্থিত হয়, বিক্রেতা নানা স্থানের নির্ম্মাতার উৎপন্ন দ্রব্যাদি একত্র করে। তবে আগে ক্রেতা, পরে অন্য দুই। কদাচিৎ নির্ম্মাতার উদয় আগে হয়, কদাচিৎ নির্ম্মাতা ও বিক্রেতা একযোগে ক্রেতার উৎপত্তি করে।

জ্ঞানদান ও আনন্দদান মাসিকপত্রের উদ্দেশ্য। জ্ঞানের সহিত আনন্দ জড়িত। জ্ঞানার্জ্জনের ফল আনন্দ,—যদি আবশ্যক জ্ঞান পাই, যদি অর্জ্জনে কষ্ট না হয়। সকলের অর্জ্জনের শক্তি এক নহে, সকলের জ্ঞানের প্রয়োজনও এক নহে। সে যখন দু'য়ের নানা ভেদ আছে, তখন মাসিকপত্রেরও নানা ভেদ থাকিতে পারে। যদি বিশেষ জ্ঞান ও সামান্য জ্ঞান নামে জ্ঞানের দুই ভাগ করি, তবে মাসিকপত্রেরও দুই ভাগ করিতে পারি। কেহ ধর্ম্মের, দর্শনের, বিজ্ঞানের, এমন কি বাঙ্গালা ভাষার, দুরূহ তত্ত্ব জানিতে প্রয়াসী; তিনি সেই সেই বিষয়ের বিশেষ মাসিকপত্র পড়িতে ইচ্ছা করিবেন। কেহ অনায়াসে অথবা বিনা আয়াসে নানা বিষয়ের জ্ঞানলাভ ইচ্ছা করেন, তিনি সাধারণ মাসিকপত্রের গ্রাহক হইবেন। এইরূপ, পাঠকভেদে মাসিকপত্রের ভেদ অবশ্য ঘটিবে।

বিলাতে এইরূপ নানাশ্রেণীর মাসিকপত্র আছে। এদেশে দুই চারিটা ছাড়া আর সব এক শ্রেণীর। বোধ হয় পাঠকের অভাবে বিশেষ মাসিকপত্রের অভাব। আরও বোধ হয় লেখকের অভাবে অথবা লেখার দোষে পাঠক হয় না। সমব্যবসায়ীর মধ্যে জ্ঞানের আদান-প্রদান নিমিত্ত ব্যবসায়সম্বন্ধীয় পত্রের জন্ম হয়; ইহার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান প্রদানের গুণে অন্যে সে ব্যবসায়ে আকৃষ্ট হয়। বাণিজ্যের মূলসূত্র একটা এই যে, পণ্য যাহা হউক, যেমন হউক, গ্রাহক আছে। বুদ্ধিমান বণিক গ্রাহক অন্বেষণ করে, পণ্যবিক্রয় দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে।

আমি হাটে বাজারে ব্যাপার করার সহিত মাসিকপত্র-চালনার তুলনা করিতেছি, ইহাতে হয় ত কোন কোন মাসিকপত্রের সম্পাদক রুষ্ট হইবেন। তিনি হয় ত মনে করেন তিনি সাহিত্যসেবা করিতেছেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি কামনা করিয়া ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতেছেন। এক এক মাসিকপত্রের জন্মকালে প্রথমপত্রে এই ভাবের সূচনা থাকে। পড়িলে মনে হয়, দেশের কেবল কল্যাণ-কামনায় সম্পাদক মহাশয় অসম সাহসে দারুণ বোঝা ঘাড়ে লইতেছেন। দুষ্টলোকে বলে সম্পাদক সাজিবার সাধও একটা আছে, সাহিত্যসেবী নামে পরিচিত হইবার বাসনাও অল্প নহে।

অনেক দিনের একটা কথা বলি। এক পণ্ডিত দেখিলেন, সংস্কৃত বিদ্যায় পাণ্ডিত্যে তেমন সমাদর পাওয়া যায় না, কোন মাসিকপত্রের সম্পাদক হইলে তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রচার হইতে পারে। তিনি সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণে চমৎকার বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন। বোধ হয় কেবল বাঙ্গালা সাহিত্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত, দেশেরও হিত হইতে পারিত। কিন্তু জানি না, তাঁহাকে কি কারণে দেশে বিজ্ঞানচর্চ্চার অভাব-রূপ 'ভূতে' পাইয়া বসিল। তিনি বিজ্ঞানের 'বি' জানিতেন না, কিন্তু বিজ্ঞানের সম্পাদক হইলেন। লেখক জোটাইলেন কলেজের পড়ুয়া। ইংরেজী বহির তর্জমা করিয়া কলেজের কয়েকজন ছাত্র প্রবন্ধ যোগাইতে লাগিলেন। আজিকালি কলেজের ছাত্র বাঙ্গালা ভাষা কিছু কিছু শিখিতেছেন। সেকালে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষণীয় ছিল না। দুই এক জনমাত্র সহজ শুদ্ধ ভাষা লিখিতে পারিতেন। অধিকাংশ যাহা লিখিতেন তাহা অপাঠ্য হইত। সম্পাদক মহাশয় সে ভাষা যথাসাধ্য শোধিত করিয়া লইতেন, কিন্তু সব দোষ সারিতে পারিতেন না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকিলে এবং বাঙ্গালা ভাষায় চিন্তা করিবার সুযোগ পাইলে যে সহজ ভাষা বাহির হয়, আঁধারে হাতড়াইলে সে ভাষা আসে না। ইংরেজী পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ যোগাইতে লেখক ও সম্পাদক ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন; এই হেতু ইংরেজী অক্ষরে ছাপা ইংরেজী শব্দের সহিত বাঙ্গালা শব্দের সন্ধি সমাস চালাইতে হইল। যেন সে বিষয়টা জানিবার জন্য দেশের পাঠক উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিলেন, না জানিলে দেশের সর্ব্বনাশ হইত। এমন কিম্ভূত-কিমাকার পত্রেরও গ্রাহক জুটিল, দেশে নূতন উদ্যম বলিয়া বিজ্ঞজন ক্ষমাগুণে পৃষ্ঠপোষক হইলেন। তথাপি পত্রের আয়ু ফুরাইয়া আসিল, লেখক জুটিল না।

এখনও এরূপ কিম্ভূত-কিমাকার পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। এক জনেরও হিত হইলে সম্পাদক মহাশয় তাঁহার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করেন। এ স্থলে তাঁহার দেশহিতৈষণার প্রশংসা করি, কিন্তু পরিশ্রম, সময় ও অর্থের অপব্যয়ে দুঃখও হয়।

বস্তুতঃ বিনা উদ্দেশ্যে কাজ হয় না। জানি না, কোন্ উদ্দেশ্যে কোন্ মাসিকপত্রের জন্ম হইয়াছে। যদি স্পষ্টাস্পষ্টি জানিতে পারি যে অপর সহস্র পণ্যের ন্যায় মাসিকপত্রকেও পণ্য-স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে লেখক ও পাঠকের এবং সে সঙ্গে সম্পাদকের সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায়। নূতন মাসিকপত্রের গৌরচন্দ্রিকায় আসল কথাটা প্রায়ই চাপা থাকে, সাহিত্য-সেবার এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির যথাসাধ্য প্রয়াসী দেখিলে প্রথমে জানিতে ইচ্ছা হয় তুমি কে, তোমার কি যোগ্যতা আছে। কেহ কেহ যোগ্যতা বলিতে চান না, ক্রমে ফল দেখিয়া পরিচয় লইতে বলেন। কেহ কবি ছিলেন, অনর্গল কবিতা রচনা করিতে পারিতেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তৎকালের মাসিকপত্রের সম্পাদক সে কবিতা অগ্রাহ্য করিতেন, প্রকাশের অযোগ্য মনে করিতেন। রোষে ও ক্ষোভে কবি স্বয়ং এক মাসিকপত্র প্রকাশে উদ্‌যোগী হইলেন, সম্পাদক হইয়া মনের সুখে নিজের ও বন্ধুজনের কবিতা একটা দুইটা তিনটা

করিয়া মাসে মাসে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেবল পদ্য ছাপাইলে মাসিকপত্র চলে না, গদ্যও প্রকাশিত হইতে লাগিল। গল্প যখন গদ্যে রচিত হয়, এবং গল্পের দৈর্ঘ্য যখন নির্দ্দিষ্ট নাই, তখন সুকুমার সাহিত্যের সেবা দিন কতক বেশ চলিয়াছিল।

গল্পলিখন-প্রবৃত্তির তাড়নাতেও দুই এক মাসিকপত্রের জন্ম হইয়াছে। যে-সে গল্প যখন মাসিক পত্রের সম্পাদক ছাপাইলেন না, গল্প-লেখক প্রতিজ্ঞা করিলেন স্বয়ং মাসিকপত্র সম্পাদন করিবেন। জনক বন্ধুবর্গ একত্র হইলেন, নূতন মাসিকপত্রের জন্ম হইল। পূর্ব্বে বাঙ্গালী শুধুই বকে বলিয়া একটা দুর্ণাম ছিল; এখন বাঙ্গালী কিন্তু লিখিয়া বকিতে শিখিয়াছে। সব মাসিকপত্র দেখার ভাগ্য হয় নাই; কিন্তু যত দেখিয়াছি, গল্প নাই এমন সাধারণ মাসিক পত্র দেখি নাই। পত্রাঙ্ক অল্প হউক, পত্রের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, গল্প চাই। দেশে এত গল্পও ছিল!

গল্পের মতন গল্প পাইলে পাঠকের অসন্তোষের কারণ থাকিত না; নিজ-ব্যবসায়-কর্ম্মে ক্লান্ত মন গল্প পড়িয়া শ্রান্তি বোধ করিত। কিন্তু যে দেশে কথা ও গল্প, কথা ও কাহিনী, কথা ও উপন্যাস, কথা ও বাক্য, কথা ও বার্ত্তা একার্থবাচী হইয়াছে, সেদেশে মাসিকপত্রের গল্পের প্রকৃতি নিরূপণ করা দুরূহ। গল্প শব্দের বৃথা আড়ম্বরে নহে, কাহিনীর দৈর্ঘ্যেও নহে। অথচ ভাষার শব্দের গুণেও গল্প মনোহারী হইতে পারে। বস্তুতঃ আমরা যেমন মল্লকে তাহার যষ্টি সঞ্চালন করিতে দেখিয়া বিস্মিত হই, লেখককে শব্দ লইয়া লীলা করিতে দেখিলেও বিস্মিত হই। আখ্যায়িকা গল্প নহে, অথচ আখ্যায়িকা থাকিলেও গল্প হইতে পারে। বিসদৃশ ঘটনার সমাবেশও গল্প নহে, কিন্তু তেমন স্থানে সমাবেশই গল্পের প্রাণ হইতে পারে। কিসে গল্প সার্থক হয়, সরস হয়, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু জানি, যুবক-যুবতীর প্রেমাভিনয়, মানাভিমান ঈর্ষাদ্বেষ, অতৃপ্ত বাসনা প্রভৃতি না থাকিলেও চমৎকার গল্প হইতে পারে। এরূপ গল্প বাঙ্গালা ভাষায় রচিতও হইয়াছে। অবশ্য দুর্লভ হইয়া আছে। কারণ কবিত্বকলার ন্যায় গল্পরচনাও কলা-বিশেষ। অল্প কথায় গল্পের নায়ক-নায়িকার মনের একটা ভাব যিনি প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহার আদর হইবেই।

ক্রেতার রুচি অনুসারে বিক্রেয় পণ্য উৎপন্ন হয়। গল্পের বাজারেও যদি এই নিয়ম থাকে তাহা হইলে বাঙ্গালী পাঠকের কলা-জ্ঞান মার্জ্জিত হয় নাই। লব্ধ পণ্য অনুসারেও ক্রেতার রুচি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে! যদি সম্পাদক মহাশয় কলার আদর্শ উচ্চে ধরিয়া রাখেন, তাঁহার পত্রের পাঠকেরও আদর্শ উচ্চ হইতে থাকিবে। আমি যে যাবতীয় মাসিকপত্রের গল্প সবই পড়িয়াছি এমন নহে। কিন্তু নূতন মাসিকপত্র পাইবামাত্র তাহার সূচীপত্রে চোখ বুলাইয়া দেখি, গল্প কবিতার দুই এক ছত্র পড়ি। ছেলে মেয়ে লইয়া কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, বিলাসবিভ্রমে 'চটুল' চাপল্যে দিনপাত হয় না। গল্প পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইয়াছে, মাসিকপত্রে কবিতা পড়িয়া সে পত্র-প্রেরণ নিষেধ করিতে হইয়াছে। কেবল বর্ত্তমান লেখকের নহে, শুনিয়াছি আরও অনেক পাঠকের মনে আশঙ্কা জন্মিয়াছে। গল্প ও

কাব্যের নামে চিত্ত-বিক্ষেপের মদিরায় হাব-ভাব-বিলাসের আলঙ্কারিক বর্ণনায় জীবন-যাত্রায় বিঘ্ন জন্মে।

আরও ভয়ানক হইয়াছে, বিজ্ঞাপন। ঔষধের বিজ্ঞাপনে অশ্লীলতার প্রয়োজন থাকিতে পারে না। কারণ রোগী রোগচিকিৎসা চায়, কুৎসিৎ রোগ লুকাইতে চায়। রোগী ঔষধ-বিক্রেতার নিকট রোগের নিদান বর্ণনা, চিত্রযোগে নিদান ও পরিণাম প্রদর্শন চায় কি? ভয় দেখাইয়া ঔষধবিক্রয় অসাধুতা। যাহা চিকিৎসকের জ্ঞাতব্য, তাহা চিকিৎসাবিষয়ক মাসিকপত্রে, গ্রন্থে, স্বচ্ছন্দে প্রকাশ কর। কেহ নিদান জানিতে চাহিলে, তাহার নিকট বিজ্ঞাপন পাঠাইও। কিন্তু যে জানিতে চায় না, তাহার নিকট নির্লজ্জতার বিজ্ঞাপন প্রেরণ কেন? সুগন্ধি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনেও হত-ভাগ্য নির্লজ্জ বিক্রেতা বর্ণনার চটকে, পয়ারের জোরে, কুৎসিৎ নামকরণে গ্রাহক অন্বেষণ করিতেছে। যাহা বার-নারীর দ্বারেও উপস্থিত করিবার অযোগ্য, তাহা সরকারী ডাকের সাহায্যে ভদ্রপল্লীতে প্রেরণ করিতেছে।

মাসিকপত্রেও বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বুঝি না, বিজ্ঞ সম্পাদক দোষ গুণ বিচার না করিয়া নিজের পত্রে যে-স বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন কেন। যিনি পত্রের পৃষ্ঠা সুন্দর করিতে প্রয়াসী, যিনি প্রবন্ধ-গৌরবে নিজের পত্রের গুরুতাসম্পাদনে মনোযোগী, তিনি কেমন করিয়া পত্রের সঙ্গে কদাকার চিত্র এবং আকাশভেদী অতিশয়োক্তির বিজ্ঞাপনে শোভা কল্পনা করেন! চিত্রকলার নামে কাঠের পুতুলের কর্কশতা শোভা পায় কি? যিনি বিজ্ঞাপন দেন, তিনি কাঠের পুতুলও দেন; কিন্তু দেন বলিয়া নিজের কাগজে ছাপিতে হইবে কি?

পূর্ব্বে মাসিকপত্রে চিত্র থাকিত না। এখন প্রায় সকল পত্রে অন্ততঃ একটা দুইটা থাকে। কোন কোন সম্পাদক 'হাফটোন' চিত্র দিয়া, 'হাফটোন' চিত্রকে অপূর্ব্ব পদার্থ জ্ঞান করাইয়া পাঠক ভুলাইতে চান। কিন্তু এই ভারতবর্ষেও 'হাফটোন' চিত্র দুর্লভ কি? 'হাফটোন' নামের গুণ কিছুই নাই, চিত্রই আসল; তাহাও ব্লকের দোষে ছাপার দোষে শেষে কাঠের পুতুলে দাঁড়াইতে পারে। শিশু কাগজে কালী, লাল নীল রং মাখাইয়া মনে করে সুন্দর 'ছবি' করিয়াছে।

এদেশের চিত্রের রসগ্রহণ করিতে না কি আধ্যাত্মিক-দৃষ্টি আবশ্যক! মানব-স্বভাবের উপরে উঠিয়া ছেলে-ভুলানো হাত-পা-শূন্য কাঠের পুতুলে সৌন্দর্য্য দেখিতে হইবে। ঢাকের নাদে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইতে পারে, তবে কি না যখন-তখন যে-সে মানুষের কর্ণে সেটা হয় না। হয় না সত্য কথা। কেন হয় না, হওয়া উচিত, বলিলে পাঠক না-চার। তাই বলি, যদি রস গ্রহণই না হইল, তবে কষ্ট ও অর্থব্যয় কেন? ইহাতে শিল্পীর দুঃখ হইতে পারে, কিন্তু জগতে দুঃখের কারণ অনেক আছে।

প্রবন্ধ নির্ব্বাচনেও অনেক সম্পাদক গুরু-লঘু জ্ঞানের অভাব দেখান। এই, দর্শনের কূটতত্ত্ব, বিজ্ঞানের বিভীষিকা, পাশেই তরল-মতির চাপলা, পরে 'ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা' (বস্তুতঃ বহু পৃষ্ঠা), সঙ্গে সঙ্গে বিল্বপুষ্করিণীর জলের অপচয়সংবাদ। প্রত্যেক পাঠক যে সব প্রবন্ধ পড়িবেন এমন কথা নাই। পাঠক

বিভিন্ন, প্রবন্ধও বিভিন্ন; তথাপি সাধারণ মাসিকপত্রে যাহাতে নানা বিষয় লিখিত হইয়া থাকে, তাহাতে অধিকাংশ পাঠকের উপযোগী প্রবন্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। লেখকবর্গ একটা কথা স্মরণ রাখিলে ভাল হয়,—পুস্তকে যাহা চলে সাধারণ পাঠকের উপযোগী মাসিক-পত্রে তাহা প্রায়ই চলে না। গোড়া হইতে পড়িয়া গেলে হয় ত যাহা বোধগম্য হইবে, তাহার মাঝখান হইতে কিয়দংশ পৃথক্ করিয়া লইয়া পড়িলে দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে। এমন লিখিতে হইবে, যে, পাঠক সে বিষয় কিছু না জানিলেও তাহা মোটামুটি বুঝিতে পারিবেন, আর যিনি জানেন, তিনিও সে বিষয়টা নূতন ধরণে দেখিতে পাইবেন। বিষয়বিশেষের পত্রে যাহা চলে, নানা বিষয়ের পত্রে তাহা না চলিবার কথা। প্রত্যেক প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইলে ভাল হয়; যদি এক প্রবন্ধে সম্পূর্ণ না হয়, দ্বিতীয় প্রবন্ধ এমন লিখিতে হইবে যেন তাহাই সম্পূর্ণ। অর্থাৎ একটা পড়িবার সময় অপরটাতে কি ছিল তাহা মনে রাখিতে না হয়। মাসিক-পত্রের প্রবন্ধের ইহাই বিশেষত্ব। একটা ভাব, একটা তত্ত্ব, একটা যা-কিছু, তাহা ধরিয়া রাখিতে হয়, ছাড়াইয়া গেলে পাঠকের ধৈর্য্য থাকে না। যদি উপন্যাস, ইতিহাস প্রভৃতি দীর্ঘ বিষয় মাসে মাসে প্রকাশ করিতে হয়, তবে প্রথমে কতদূর কি বলা হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্তসার প্রবন্ধের আগে দেওয়া কর্ত্তব্য।

শুনিয়াছি, কলিকাতায় ভোজনের নিমন্ত্রণে ভোজন না করিলেও চলে, অন্নব্যঞ্জন পরিপূর্ণ পাত্র দৃষ্টি করিয়া আয়োজন উত্তম হইয়াছে বলিলে নিমন্ত্রণরক্ষা হয়, নিমন্ত্রণকর্ত্তাও কৃতার্থ হন। কিন্তু "উচ্চশ্রেণী"র এই সামাজিক ব্যবহার মধ্য ও নিম্নশ্রেণীতে পোষায় না। এই শ্রেণীর লোক ভোজনের নিমন্ত্রণে ভোজন করিতে চায়, দর্শনে কিংবা আঘ্রাণে তৃপ্ত হয় না। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পত্র বহুবিধ প্রবন্ধে পূর্ণ করিয়া পাঠকের সমীপে প্রেরণ করিলেন, শাক হইতে মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত সবই উপস্থিত করিলেন, পাঠক উচ্চশ্রেণীর হইলে উত্তম হইয়াছে বলিয়া গাত্রোত্থান করেন, মধ্য ও নিম্নশ্রেণীর হইলে আসনে বসিয়া রীতিমত ভোজনে প্রবৃত্ত হন। সামাজিক ব্যবহারে অজ্ঞ বলিয়া কখন কখন মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলেন, এটা কাঁচা ওটা আলোনা। যেটায় দন্তস্ফুট না হয়, সেটায় কিন্তু নিজের দন্তের শিথিলতা কিংবা স্থূলতা অনুমান করেন। মানবচরিত্রের এ এক আশ্চর্য্য রহস্য! এই হেতু উৎকট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, কঠিন শঙ্করভাষ্য মাসিকপত্রে সাধারণ পাঠকের নিমিত্ত প্রেরিত হইতেছে। জানি না, সম্পাদক মহাশয় পাঠককে জিজ্ঞাসা করেন কি না,—আর কি চাই, ব্যঞ্জন উত্তম হইয়াছে ত? পাঠক নিমন্ত্রিত বটেন, কিন্তু মূল্য দিয়া ভোজ্য ক্রয় করেন, সম্পাদক মূল্য লইয়া ভোজ্য বিক্রয় করেন। কেহ কিছু দান করেন না, কেহ কিছু দান গ্রহণ করেন না। সুতরাং সম্পাদক ও পাঠকের মধ্যে, বিক্রেতা ও ক্রেতার সহানুভব থাকা স্বাভাবিক বোধ হয়। বিলাতে সাধারণ মাসিকপত্রের সম্পাদক পাঠককে সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করেন, আর কি চাই, কেমন হইয়াছে। জিজ্ঞাসার নানা কৌশল

অবলম্বন করেন, কখনও উন্নতির প্রস্তাব করিয়া অভিমত জানিতে চান, কখনও প্রস্তাব পাইবার নিমিত্ত পুরস্কার ঘোষণা করেন। তিনি বুঝেন, পুরাতন পাঠককে তুষ্ট রাখিলে ব্যবসায় স্থায়ী হয়, পুরাতনের সাহায্যে নূতন পাঠক সংগৃহীত হয়। এদেশে নিঃসম্বলে মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে পারা যায়; সেদেশে মাসিকপত্র চালাইতে মূলধনের প্রয়োজন হয়। সেদিন দেখিতেছিলাম, বিলাতে মাসিকপত্রের এক একটা গল্প,—দুই হাজার শব্দের গল্প—৫০৲ টাকার কমে কিনিতে পাওয়া যায় না। তাহাও প্রসিদ্ধ লেখকের নহে। চলন সই গল্প, যাহাতে প্রশংসা করিবার বড় একটা কিছু থাকে না।

বিলাত ধনীর দেশ, কলা ও বিদ্যার দেশ। সে দেশের সহিত এদেশের তুলনা করা সাজে না। কিন্তু তুলনা হয় না বলিয়াই দেশের গণ্যমান্য পাঠক এদেশের মাসিকপত্রে পরিতোষ পান না। এমন পাঠকও আছেন যিনি ইংরেজী অক্ষরের মহিমায় মুগ্ধ হন, এবং এমন ইংরেজী গল্পও আছে যাহা পড়িতে আমাদের ভাল লাগে না। সে সব বিষয় ছাড়িয়া দিলে বাঙ্গালাতে অনেক ভাল ভাল মাসিকপত্র ও ভাল ভাল চিত্র প্রকাশিত হইতেছে, ইহা বলিতেই হইবে। প্রবন্ধ দেখাইয়া সম্পাদক মহাশয় গৌরব করিতে পারেন। সময়ে সময়ে যে ক্রটি লক্ষিত হয়, তাহা প্রবীণ সম্পাদকের অর্ব্বাচীন সহকারীর দোষে, কিম্বা অব্যবস্থার দোষে বলিয়া মনে হয়। কারণ অনেক মাসিকপত্র অনেককাল চলিতেছে, সম্পাদক মহাশয় সম্পাদকি কাজে পাকিয়াছেন। তবে, যেমন টক আম পাকিলেও টক থাকে, তেমন যিনি গোড়ায় কাঁচা ছিলেন, তাঁহার ভূয়োদর্শনে কাঁচার রং পাকার মতন হয়, অন্য গুণ আসে না। পাঁচফুলে সাজি ভরানো সহজ, কিন্তু ফুল বাছা সহজ নহে।*

---

* বোধ হয়, এখন মাসিকপত্রের শ্রেণী-বিভাগের সময় হইয়াছে। ইংরেজীতে Journal, Review, Magazine, অন্ততঃ তিন শ্রেণীর মাসিক বা সাময়িক পত্র আছে। বাঙ্গালায় এইরূপ জাতিবাচক নামও হয় নাই, সব মাসিকপত্র, কোনটা বা মাসিক-পত্র ও সমালোচন। সাহিত্য-পরিষদের পত্রের নাম সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ইংরেজী Journal শব্দের অনুবাদ করিলে দিনিকা হয়। ইংরেজী Review শব্দের অনুবাদে সমালোচন অপেক্ষা সমীক্ষণী চলিতে পারে। ইংরেজী Magazine শব্দের মূলে আর্বী; সে শব্দ আমাদের পরিচিত খাজনায় আছে। ইহার ধাত্বর্থ সঞ্চয়। বিশেষার্থে সঙ্কলনা বলা চলে। যে নামই হউক, প্রথম প্রথম নূতন ঠেকিবে। জাতি-বাচক নাম থাকিলে পাঠক নিজের আবশ্যক মাসিক-পত্র নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন, সম্পাদকও নামের বাহিরে যাইতে সঙ্কোচ বোধ করিবেন। এখন কোন্ খানা কি, তাহা সমস্ত পত্র না পড়িলে এবং দুই চারি মাসের না পড়িলে বুঝিতে পারা যায় না। গল্প ও লঘু বিষয় না থাকিলে দুই একখানা সমীক্ষণী হইতে পারিত। ধর্ম্ম ও দর্শন বিষয়ক দুই একখানা সমীক্ষণী আছে। অধিকাংশ সঙ্কলনা। পত্রের সম্পাদক, এই নামও কি ভাল হইয়াছে? Secretary—সম্পাদক, Editor—সম্পাদক, Manager—কার্য্যাধ্যক্ষ। এই নামগুলা হইতে বুঝা যায়, ইহাদের কাজ সম্বন্ধে জ্ঞান স্পষ্ট হয় নাই। এদেশের অজ্ঞাত, প্রদেশে Editor সংশোধক নাম পাইয়াছেন। কমিটির Secretary আর আফিসের Manager কাজে প্রায় এক; সুতরাং ইহাদের নাম অধিকর্ম্মী থাকিলে মন্দ হইত না। আরও শব্দ আছে। মাসিকপত্রের ভাষায় দশম সংখ্যা

এখন অন্য দুই একটা বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। বোধ হয় চিত্রের স্থান করিবার উদ্দেশ্যে কোন কোন মাসিকপত্রকে প্রস্থে বড় করিতে হইয়াছে। কিন্তু প্রস্থে বড় হইলে ছয় মাসের কি বার মাসের অঙ্কগুলা একত্র একত্র বাঁধিলে পাটা হইতে পাতাগুলা ঝুলিয়া পড়ে, ফলে ক্রমশঃ আল্গা হইয়া খসিতে থাকে। বোধ হয়, ছাপার সুবিধা দেখিয়াও আকার বৃহৎ হইয়া থাকিবে। কিন্তু অধিকাংশ মাসিকপত্রে দেখিতে পাই চারি পাতে এক ফর্ম্মা হয়। বাঁধিবার সময় ফলে দুই পাতা দুই পাতা করিয়া গাঁথিয়া যাইতে হয়। যদি প্রতি অঙ্কে দশ ফর্ম্মা থাকে, বৎসরে একশত কুড়ি ফর্ম্মা। গাঁথিতে কম সময় লাগে না। বিশেষ দোষ—দুই পাতার জোর কম, সহজে ছিঁড়িয়া যায়। অন্ততঃ চারি পাতা লইয়া গাঁথিতে পারিলে এই দোষ থাকিত না, গাঁথার পরিশ্রমও অল্প হইত। সুবিধা থাকিতে অসুবিধায় পড়া মূর্খতা। মাসিকপত্র ধার-কাটা হইয়া পাঠকের নিকট প্রেরিত হইতেছে। ইহাতে সুবিধা এই, পড়িবার সময় ছুরী খুঁজিতে হয় না; অসুবিধা এই, দফ্তরী নিজের পরিশ্রম বাঁচাইতে গিয়া নির্দ্দয় ভাবে ধার কাটে, পাশে শাদা কাগজ কম রাখে। আরও অসুবিধা, সব অঙ্ক সমান প্রমাণে কাটা হইয়া আসে না। কোন খানার উপরে কিংবা নীচে বেশী কাটা, কোন খানার পাশে বেশী কাটা। ফলে সব অঙ্ক বাঁধিতে গেলে ধার অসমান হয়। ধার কাটিয়া পাঠাইতে হইলে সব অঙ্ক এক প্রমাণে কাটিয়া পাঠান কর্ত্তব্য। যে কাজ একেবারে শেষ করিতে পারা যায়, সে কাজের জন্য পুনঃ পুনঃ সময় ব্যয় করিতে হইলে দীর্ঘ জীবন আবশ্যক হয়।

ব্যবসায়-হিসাবে বাঙ্গালা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের অধ্যক্ষের একটা ত্রুটি আছে। গ্রাহকের প্রশ্নের উত্তর নিমিত্ত তিনি ডাক-টিকিট কিংবা 'রিপ্লাই পোষ্টকার্ড' চাহিয়া থাকেন। ইহার অর্থ এই যে ইনি ব্যবসায়-বুদ্ধি বুঝেন না, গ্রাহককে তুচ্ছ কারণে দূরে রাখিতে চান। ব্যবসায়-রীতি শিখিলে গ্রাহক ও অন্য সাধারণের জিজ্ঞাসা আকাঙ্ক্ষা করিবেন। ইঁহার আলস্যে গ্রাহকের আর এক অসুবিধার উৎপত্তি হইয়াছে। একবার এক মাসিকপত্র যথাসময়ে না পাওয়াতে কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়কে সে পত্র পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। উত্তর আসিল, "আপনার গ্রাহক নং কত জানালে আমরা সহজে বুঝিতে পারি আপনাকে কাগজ পাঠান হইয়াছে কি না।" আমার গ্রাহক নং কত তাহা আমি কেমনে জানিব? কাগজের মোড়কে নং লেখা থাকে বটে, কিন্তু সেটা কি আমাকে মুখস্থ করিয়া রাখিতে হইবে? হিসাবের জন্য অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার খাতায় নম্বর দিতে পারেন, ছাপ মারিতে পারেন, লাল নীল সবুজ কালীর দাগ দিতে পারেন; কিন্তু সে সব আমার জানার প্রয়োজন কি? পঁচিশ খানা কাগজের গ্রাহক হইলে আমার পঁচিশটা নং মুখস্থ করিতে হইবে কি? অধ্যক্ষ মহাশয় আমার নাম

অর্থে দশ সংখ্যক পত্র। এখানে দশম অঙ্ক ঠিক হইত। কেহ কেহ ছবি শব্দটার অর্থধিকার ঘটাইতেছেন। ছবি শোভা দীপ্তি, এবং সাম্যজনও এই অর্থ মানে। বোধ হয় তসবির শব্দের সহিত গোল হইয়া চিত্র অর্থে ছবি হইয়াছে।

ও ধাম—দুইটা নং পাঠাইলেন; নামেও নাম ও সংজ্ঞা বা পদবী পাইলেন। অতএব আমার এই তিন নম্বরেই তাঁহার হিসাব দুরস্ত থাকিতে পারে। ফল কথা তাঁহার আলস্যের ও অজ্ঞতার মূল্য গ্রাহকের নিকট প্রার্থনা করা গর্হিত কাজ। ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্বন্ধ যাহাতে মধুর হয়, তাহা ইউরোপীয় ব্যবসায়ী বুঝেন। উল্লিখিত অধ্যক্ষ মহাশয়ের এক সদাশয়তার প্রশংসা করি। আমি 'রিপ্লাই পোষ্টকার্ড' পাঠাই নাই; তিনি নিজের পোষ্টকার্ডে উত্তর পাঠাইয়াছিলেন। এটা কম উন্নতি নয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

"এষা"

করুণরসের অভিব্যক্তিতে "এষা"খানি, এক প্রাচীন পদকর্ত্তাদিগের বিরহগাথা ছাড়া বাংলার আর সকল কবিতাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমার ধারণা। সচরাচর শোকের কবিতায় 'হা হতোহস্মি'রই বাহুল্য দেখিতে পাই। কিন্তু অক্ষয়কুমার একটীবারও এরূপ হা হতোহস্মি করিয়া আপনার আর্ত্তনাদের ধ্বনি দিয়া তাঁর কবি-কল্পনার দৈন্যকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁর শোক সত্য, তাই সংযত; গভীর কিন্তু একান্ত বস্তুতন্ত্র। এইজন্য যে সকল সত্যকার ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া এ সংসারে লোকের শোক ক্রমে তীব্র ও পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহারই যেন এক একটী অপূর্ব্ব প্রতিকৃতি আঁকিয়া এই কারুণ্যকে এমন অদ্ভুতভাবে তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

শোক যতই কঠোর হউক না কেন, বস্তুতঃ নিতান্ত নির্ম্মম নহে। নির্ম্মম হইলে মানুষ তার আঘাত সহিতে পারিত না। গভীর শোকের শেল সর্ব্বদাই যেন একটু প্রবল অহিফেন-সারসিক্ত হইয়া মানুষের হৃদয়কে বিদ্ধ করে। এই জন্যই তার বেদনা যে কতটা ইহা মানুষ প্রথম বুঝিতেই পারে না। আমাদের শূন্যতা যখন অপরের দৈন্য-রূপে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় তখনই শোকের স্বার্থপর আর্ত্তনাদের মধ্যে কোমল কারুণ্য জাগিয়া উঠে। আর এই ভাবেই অক্ষয়কুমারের 'এষা'তে এই অপূর্ব্ব কারুণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ নিপুণতাটুকু টেনিসনের "ইন্ মেমোরিয়ামে" নাই; কালিদাসের "রতি-বিলাপে" নাই; বেহুলার গানে নাই; রবীন্দ্রনাথের "স্মরণে" নাই; আছে কেবল, কোথাও কোথাও বৈষ্ণবপদকর্ত্তাদিগের দুর-বিরহ-বর্ণনে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে শ্রীবৃন্দাবনের কেবল ব্রজগোপ-গোপিনীগণের নহে, কিন্তু পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, তরুলতা-গুল্মাদিরও যে দীনতা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে শ্রীমতীর দূর-বিরহব্যাধিকে মিলাইয়া দিয়া, বৈষ্ণবকবিকুলগুরুগণ এই নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন। রসের যে একটা আলম্বন ও উদ্দীপন আছে, বৈষ্ণব

রসতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা কখনও বিস্মৃত হন নাই। রসকে তাঁরা কেবল আস্বাদন করিতেন না, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সাধন করিতেন। এই জন্য প্রত্যেক রসের প্রকৃতি ও অভিব্যক্তির নিয়ম তাঁহাদের নিকটে প্রত্যক্ষবৎ হইয়াছিল। জগতের আর কোনও কবিসম্প্রদায় এমন করিয়া প্রত্যেক রসের রূপের ও স্বরূপের সাধনা করিয়া এগুলির সাক্ষাৎকার লাভ করেন নাই। সুতরাং বৈষ্ণবকবিগণের কাব্যে এ নিপুণতা আছে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু এই যুগে, এই দেশে জন্মিয়া অক্ষয়কুমার যে এ নিপুণতাটুকু এমন করিয়া লাভ করিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা।

এইজন্য অক্ষয়কুমারের এই কবিতা-গ্রন্থকে কেবল কাব্য বলিলেই তার যথাযথ বর্ণনা হয় না। কারুণ্যরসের দ্বারা এই কবিতাগুলি গঠিত হইয়াছে বলিয়া, ইহারা রসাত্মক হইয়া প্রকৃত কাব্যত্ব লাভ করিয়াছে। কাব্য হিসাবে এগুলি অতি উৎকৃষ্ট তো হইয়াছেই; কিন্তু মনোবিজ্ঞানের বা Psychologyর অভিব্যক্তিরূপেও এই কবিতাগুলির শ্রেষ্ঠত্ব অল্প নহে। এই বইখানি মানুষের শোকের, বিশেষতঃ পত্নীবিয়োগবিধুর পতির মর্ম্মের স্তরে স্তরে যে বিরহের ব্যথা জাগিয়া উঠে, তার একখানি পরিষ্কার, প্রামাণ্য ধারাবাহিক ইতিহাস রূপেও অনন্যসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে।

পতি-পত্নীর সম্বন্ধটা কেবল দুইটী মাত্র প্রাণকে জড়াইয়া গড়িয়া উঠে না। যতক্ষণ এই সম্বন্ধ কেবল দ্বিপাদ মাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে, ততক্ষণ পতি-পত্নী কেবল রমণ ও রমণী রূপেই পরস্পরকে প্রত্যক্ষ ও সম্ভোগ করেন। ততক্ষণ দাম্পত্য-সম্বন্ধ যতই গভীর হউক না কেন, কখনও প্রকৃতপক্ষে উদার হইতে পারে না। পতি যখন পত্নীর মাতৃত্বকে ও পত্নী যখন পতির পিতৃত্বকে ফুটাইয়া তোলেন, তখনই কেবল অভিনব বাৎসল্যের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া মাধুর্য্যের মোহিনী চিরকল্যাণী হইয়া উঠে। দাম্পত্য-প্রেম তখন ছড়াইয়া পড়ে; দ্বিপাদ-প্রেম ত্রিপাদে পূর্ণ হইয়া উঠে; * মাধুর্য্য তখন স্নেহসারে পরিণত হইয়া, বাৎসল্যকেও আপনার আলম্বন ও উদ্দীপনারূপে গ্রহণ করে। স্নেহসারস্থিত এই দাম্পত্য-প্রেম যখন মৃত্যুর আঘাতে ছিন্ন হইয়া যায়, তখন তার শোক ও স্নেহ আশ্রয়হীন বাৎসল্যের দৈন্য দেখিয়াই প্রকৃতপক্ষে আপনার তীব্রতা অনুভব করিতে থাকে। বাৎসল্যের সঙ্গে মাধুর্য্য তখন একই আঘাতে আহত হইয়া, অপূর্ব্ব ও গভীর কারুণ্যের সৃষ্টি করে। এই অদ্ভুত ও জটিল কারুণ্যের ছবিটী এষাতে যেমন করিয়া ফুটিয়াছে, এমন আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ফলতঃ কবি এই গ্রন্থে কেবল তাঁর নিজের শোকদগ্ধ অন্তরের ছবি আঁকিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁর সমস্ত পরিবার পরিজনের মর্ম্মবেদনাটা তাঁর শোকাহত হৃদয়ের ছিন্নতন্তুগুলিকে জড়াইয়া ধরিয়া যেন এই কবিতাগুলিতে বারম্বার মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। কেবল তাহাই নহে, এই কবিতাগুলি যেন বিশ্বের সার্ব্বজনীন দাম্পত্য-বিরহের সাধারণ শোক-ছবিগুলিকে একে একে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই জন্য এগুলি প্রত্যেক বিরহী জনের মর্ম্মে মর্ম্মে [illegible]

* Faust.

করিয়া, তাহাদের নিজ নিজ বিরহব্যাথাটাকে জাগাইয়া তোলে। এগুলি কবিতা নয়, এক একটী উজ্জ্বল চিত্রের মতন ফুটিয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মৃত্যু-শীর্ষক প্রথম স্তবকের ১ম, ২য় ও ৬ষ্ঠ; অশৌচ-শীর্ষক দ্বিতীয় স্তবকের ১১শ এবং শোক-শীর্ষক তৃতীয় স্তবকের ৬ষ্ঠ ও ১০ম কবিতাগুলির উল্লেখ করিতে পারা যায়। এগুলি কেবল কবিতা নয়; কেবল এক একটী ভাবের উচ্ছ্বাস নয়; কিন্তু যেন এক একটী উজ্জ্বল তৈল-চিত্র। এক একটী জীবন্ত প্রত্যক্ষ দৃশ্যের মতন চক্ষের উপরে ভাসিয়া উঠে। এগুলি এক একটী অপূর্ব্ব কারুণ্য মূর্ত্তি লইয়া আমাদের চিত্তপটে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। এ ছবিগুলির প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রত্যেক বর্ণবৈচিত্র্য, প্রত্যেক অণুপরমাণু আমাদের অতি পুরাতন-পরিচিত বস্তু। চক্ষে যাহা দেখিয়াছি, এ শব্দ-চিত্রে তাহাই প্রত্যক্ষ করিতেছি, প্রাণে যাহা ভুগিয়াছি তাহাই এখানে পুনর্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে—পড়িতে পড়িতে সেই পুরাতন বিস্মৃত ভাবগুলি প্রাণের অন্তস্তলে নড়িয়া চড়িয়া উঠে। বাংলার বৈষ্ণব কবিকুলগুরুদিগের রসচিত্র ছাড়া, আর কোথাও এমন বস্তুতন্ত্র কবিতা বেশি দেখি নাই।

তাহার উপর, কি আশ্চর্য্য নিপুণতা সহকারে কবি এ চিত্রগুলির সমাবেশ করিয়াছেন! কিন্তু এ নিপুণতা কৃত্রিম নহে, কষ্টসাধ্য নহে; নিতান্ত সহজসিদ্ধ। সাজাবার জন্য তিনি এগুলিকে এ ভাবে সাজান নাই। শোকার্ত্ত প্রাণের অভিজ্ঞতাগুলি যেমন একটার পর আর একটা ভাসিয়া আসিয়াছিল, সেই ধারাকে অনুসরণ করিয়াই কবির শোকাহত কল্পনা যেন ভাসিয়া চলিয়াছে, আর যখন যেরূপ বাহিরের আশ্রয় জুটিয়াছে, তখন তাহাকে ধরিয়াই, মাঝে মাঝে ধ্যানস্থ হইবার চেষ্টা করিয়াছে। এই জন্য এই সব চিত্রগুলিই এমন অদ্ভুত স্বাভাবিকতায় ও সারল্যে পূর্ণ হইয়া আছে। মৃত্যু-শীর্ষক প্রথম স্তবকের ১ম ও ২য় কবিতাতে বাৎসল্য ও মাধুর্য্যের একটা অপূর্ব্ব সংগ্রাম শোকভারে সংযত হইয়া, অদ্ভুতভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"বাবা,
মা কেন এত জপে কর আজ,
করে এত ঠাকুর প্রণাম?"

এই কয়টী কথাতেই মুমূর্ষুর চরিত্রটী কেমন ফুটিয়াছে! সতী রোগযাতনার মধ্যেও ইষ্টনাম ছাড়েন নাই; কি জানি বিদায়কালে সে নাম ভুলিয়া যান, তারই জন্য ব্যাকুল হইয়া ঠাকুরের পায়ে বারবার আপনাকে অর্পণ করিতেছেন, মনে মনে বলিতেছেন—দেখো যেন ভুলি না গো! কেবল তাহাই নহে, এই মৃত্যুর ছায়া আসিয়া কি পবিত্র জীবন ও সাধ্বী চরিত্রকে আচ্ছন্ন করিতেছে, তাহাও এই কর-জপা ও প্রণামের ভিতর দিয়া ফুটিয়াছে। যে যেমন লোক সে তেমনি মরে। পরে, অন্যত্র অপর প্রসঙ্গে কবি যে সতীচরিত্রের পূত-চিত্র আঁকিয়াছেন, এই প্রথম কবিতার এই প্রথম চরণ দু'টীতে তাহারই পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়।

জানু পাতি'—কৌষের-বসনা,
স্থির-নেত্রে যুক্তকরে, ঝর ঝর অশ্রুঝরে
তোমা-পানে চাহি' একমনা!
পড়ে কি না পড়ে শ্বাস, সিক্তমুক্ত কেশরাশ
শিথিল-অঞ্চলা, স্মিতাননা।

আবার সন্ধ্যায় হেথা আসি'
দীপ দিয়া, ধূপ দিয়া, প্রণমিয়া, প্রণমিয়া
ফুরাত না আর ভক্তিরাশি !
প্রহর বহিয়া যায় ধ্যান তার না ফুরায়,—

"তবে মা আমার—" ইচ্ছা বিধাতার,
এখনো ত রয়েছে জীবন।
যতক্ষণ শ্বাস— ততক্ষণ আশ,
ভক্তি ভরে ডাক নারায়ণ।
"ডাকি বার বার—" কাঁদিও না আর,
যাও, তার পদধূলি লও।
বাছা, প্রাণ ভরি' আশীর্ব্বাদ করি,—
তারি মত সতীলক্ষ্মী হও !

এমনভাবে যিনি দৈনন্দিন জীবন কাটাইয়াছেন, তিনিই কেবল মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও এত কর-জপ ও এত ঠাকুর-প্রণাম করিতে পারেন। তারপর কেবল মুমূর্ষুর চরিত্রের ছবিই যে এই কবিতাটীতে ফুটিয়াছে, তাহা নহে। এখানে বাৎসল্যে ও মাধুর্য্যে এই দুই প্রবল রসের মধ্যে একটা নীরব নিষ্পন্দ দ্বন্দ্বও বাঁধিয়াছে। আর এই দ্বন্দ্বে বাৎসল্যই জয়লাভ করিতেছে। ইহাও প্রত্যক্ষ করিতেছি। আসন্নমাতৃবিয়োগ-ভয়বিহ্বলা কন্যার মুখ চাহিয়া আসন্নপত্নীবিয়োগ-ভীতিবিধুর পতির আপনার মর্ম্মন্তুদ শোকের সঙ্গে কি যে সংগ্রাম চলিয়াছে, প্রাণ ফাটিয়া যায়, কিন্তু সন্তানের মুখ চাহিয়া সে শোকভয়ঝঞ্ঝাকে যে প্রাণপণে চাপিয়া রাখিতে হইতেছে, এই ক্ষুদ্র কবিতাটীতে তাহাও বিশদভাবে ফুটিয়াছে। কাব্য এবং চিত্র এবং সঙ্গীত ও ভাস্কর্য্যাদি সর্ব্ববিধ ললিতকলারই উৎকর্ষের একটা অতি প্রধান লক্ষণ এই যে, এগুলি বাহিরে কথায় বা সুরে, প্রস্তরে বা চিত্রপটে কোনও রসবিশেষের যতটুকু ফুটাইয়া থাকে, কেবল ইঙ্গিতমাত্রে পাঠক বা শ্রোতা বা দর্শকের মর্ম্মস্থলে, নিগূঢ় আন্তরিক অনুভূতিতে তার শতগুণ বেশী জাগাইয়া তোলে। এষার প্রত্যেক কবিতাতে এই লক্ষণটা খুবই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বা একটী দুটী কথায় একটা বিশাল রস-রাজ্য পাঠকের মানসচক্ষে খুলিয়া দিয়াছেন। এই মৃত্যুশীর্ষক স্তবকের ২য় কবিতাটীতেও

(১) "বাবা,
মা—কেন এত জপে কর আজ,
করে এত ঠাকুর-প্রণাম ?"
কাছে যা, বাছারে, শুনা গে তাহারে
জনমের মত হরি-নাম।
"বড় ভয় করে, তুমি এস ঘরে
এলোমেলো কি বলে কেবল !"
গঙ্গা-মৃত্তিকায় লেপে দাও গায়,
দাও গিয়া মুখে গঙ্গাজল।
"চোখ বড় রাঙ্গা, গলা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা,
দিদিমা ঠাকু'মা বড় কাঁদে !"
করণে বারণ, ঘুমাবে এখন
বাঁধিও না আর মায়া-ফাঁদে।

পত্রবাহী ডাকে,— "চিঠি আছে।"
দেখি পত্র খুলি'—
কর্ম্মস্থল হ'তে আসিয়াছে
শুষ্ক তিক্ত বুলি।
অমরের চিঠি ?— ভাল আছে ?"
মুমূর্ষু জিজ্ঞাসে।
(সংবাদ দেইনি পুত্র কাছে—)
কি ভুল হতাশে !
অশ্রু ভরা কাতর নয়ন
এক দৃষ্টে চায় ;
নাহি শ্বাস, হৃদয়ে কম্পন,
উত্তর আশায়।

হে দেবতা, লই তব নাম
এই মিথ্যা শেষ,—
'ভাল আছে, করেছে প্রণাম,
পড়িতেছে বেশ।'
বক্ষ হ'তে নেমে গেল তার
গভীর নিশ্বাস ;
ম্লান মুখে ফুটিল আবার
ধীর স্থির হাস।
শান্ত—তৃপ্ত, কৃতজ্ঞতা-নীরে
উজ্জ্বল নয়ন ;
শান্ত—তৃপ্ত ধীরে পার্শ্ব ফিরে'
করিল শয়ন—
ফুরাল জীবন !

তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মাতৃস্নেহের কি অপূর্ব্ব ছবিই এখানে কবি কি অসাধারণ নিপুণতা সহকারে ফুট'ইয়া তুলিয়াছেন! সন্তানের মঙ্গল কামনা মা'র সংসারবন্ধনের চরম তন্তুটী হইয়া, এ সংসারে তাঁর প্রাণটাকে বাঁধিয়া রাখে। এ সংসারে মৃত্যু সর্ব্বজয়ী হইয়াও কেবল এই অকৈতব বাৎসল্যের নিকটে পরাজয় মানে—কবি এই ক্ষুদ্র কবিতায় এই বিশ্বজনীন তত্ত্বটীকে ফুটাইয়া দিয়াছেন।

তারপর এই প্রথম স্তবকের ষষ্ঠ কবিতায়

ডুবিয়া—ডুবিয়া জলে জালা না জুড়ায়।
নহে দূর—নহে দূর
ওই মরণের পুর !
আর এক পদক্ষেপে সকলি ফুরায়।
উথলি' উছলি' দুলি' চলে জলরাশ
হৃদয়-শ্মশান খুলে'
ধরণী পড়িয়া কূলে ;
নিকটে এসেছে নেমে বিষন্ন আকাশ।
নাহি তারা, নাহি তরী, জলদ ঘনায় ;
ঘুরে ঢেউ আশে পাশে,
কত কল কল ভাষে,
আপনে পড়িয়া বুকে জড়াইতে চায়।
হৃদয় উদাস অতি, নয়ন উদাস ;
সম্মুখে গভীর বারি
ডাকে দীর্ঘ বাহু নাড়ি',
মনে পড়ে দূর গৃহ—পড়ে দীর্ঘ শ্বাস।
এই ত জগতে সুখ, এই ত জীবন !
সহে না নিমেষ-ভর,
মরণেরি নামান্তর !
দেখি না—দেখি না তবে মরণ কেমন।
নাহি আশা, নাহি তৃষা জীবন যন্ত্রণা ;
মরিয়া জুড়াতে চাই,
মরিতে সাহস নাই !
শিথিল শরীর মন, বিচ্ছিন্ন ভাবনা।

অশৌচ-শীর্ষক দ্বিতীয় স্তবকের একাদশ

সদ্যঃস্নাত জ্যেষ্ঠ পুত্র, মুণ্ডিত-মস্তক,
বসি কুশাসনে ;
গলে উত্তরীয় বাস, পড়ে ঘন দীর্ঘ শ্বাস,
পড়ে মন্ত্র গাঢ়-স্বরে' স্খলিত-বচনে।
কনিষ্ঠে লইয়া কোলে জ্যেষ্ঠা কন্যা বসি',
গলে বস্ত্র, ...
শুনে মন্ত্র এক মনে, মুছে অশ্রু ক্ষণে ক্ষণে,
ক্ষণে ক্ষণে শূন্যপানে দেখিছে চাহিয়া।
গায়ে গায়ে আছে বসি' ক্ষুদ্র কন্যা দু'টি,
মলিন বদনে
কভু ধীরে অশ্রু ঝরে, কভু চায় পরস্পরে,
কভু দু'জনার চক্ষু মুছায় দু'জনে।
চঞ্চল অবোধ শিশু হতেছে চঞ্চল,
চারিদিকে চায় ;
সবাই কাঁদিছে কেন ? ভয়ে সে আড়ষ্ট যেন,
বারেক উঠিতে পেলে ছুটিয়া পলায় !
উজাড়ি সমস্ত গৃহ আনিছেন মাতা,
কিসে স্বর্গ পায় !
কভু কাঁদি উচ্চরোলে, করেন আমারে কোলে,
বলেন কাঁদিয়া কভু,—তীর্থ স্নেহে আয় !
'যে জীবা অনলদগ্ধা' পড়ে পুরোহিত
কণ্ঠ শোকাকুল।

তাহারি তৃপ্তির তরে দিতেছি যতন ভরে
তৈজস, তণ্ডুল, শয্যা, বস্ত্র, ফল, ফুল।
কি অবের তারে আজ? তেমনি হাসিয়া
সে কি লবে আর?
সমস্ত জগৎ দিলে যদি তার দেখা মিলে
সমস্ত জীবন যদি চাহে একবার!
পিতা নাই, মাতা নাই, পতি পুত্র নাই,
অতি অসহায়—
সকল বন্ধন ছিঁড়ে একাকিনী কোথা ফিরে'
অনলে, অনিলে, শূন্যে কোথায়—কোথায়!
কোথায় ক্ষরিছে মধু, কোথা বিশ্বদেব,
কোথা প্রেতপুরী!
আমি আজ ধরাতলে, সভক্তি নয়ন-জলে
মাগিতেছি মুক্তি তার, দুই কর জুড়ি।

এবং তৃতীয় স্তবকের ষষ্ঠ ও দশম কবিতাতে,

অজরে জিজ্ঞাসে দাসী—"কোথা মা তোমার?"
মুখ পানে চেয়ে রয়,
মনে যেন হয়—হয়
"মা—মা—আমা(র) মা"—বলে বার বার।
যেন ক্রমে ক্রমে বোঝে,
আঁখি চারিদিকে খোঁজে,
ক্রমে ফুলে' ওঠে ঠোঁট, আঁখি ছল ছল।
'গিয়াছে মামার বাড়ী?"
সায় দেয় মাথা নাড়ি'
আঁচল ধরিয়া বলে,—চ(ল্)—চ(ল্)—চ(ল্)!
'কোথা যাবে? অন্ধকার—"
মানা নাহি মানে আর,
লুটায়ে—লুটায়ে ভূমে কাঁদে অবিরল।

প্রভাত প্রশান্ত স্থির;
সম্মুখে বিহগ নীড়
বিহগী পড়িয়া তরুমূলে,
খোলা চোখ, কাবাবাঁধা পাখা দু'টা তুলে'।

অজ্ঞ শাবকগুলি,
জিহ্বা মেলি' মুখ তুলি';
নড়ে, চড়ে, চীৎকারে কাতরে—
প্রভাতবায়ুর স্পর্শে, তরুর মর্ম্মরে।
হৃদয় কেমন করে—
শিশুগুলি মনে পড়ে!
আশঙ্কায় ঘরে ছুটে যাই,
চাপিয়া—চাপিয়া বুকে মুখে চুমো খাই।
মরেছে তাহার দেহ,
মরেনি ত প্রেম-স্নেহ—
রেখে যেন গেছে সমুদয়!
সেই ক্ষুদ্র সুখ দুখ আশা তৃষা ভয়।
তারি হৃদি হৃদে ধরি'
তারি গৃহকার্য্য করি;
প্রতি কার্য্যে স্মরি অনুক্ষণ,
মরমে মরমে কাঁদি, মুছি দু'নয়ন।
সদা কাছে কাছে রই
কত হাসি, কত কই,
রাখি চোখে চোখে, কোলে কোলে;
কি করিলে তার কথা, তার শোক ভোলে!
তেমনি পাতিয়া কোল
দিতেছি আদর-দোল—
কত সুরে করি গুণ্ গুণ্!
দিন দিন আমি কত স্নেহে সুনিপুণ!
ভালবাসি বুকে পুরে,
তবু—তারা দূরে দূরে!
প্রাণ ভরে' তেমন না হাসে,
ঘুমায়ে—ঘুমায়ে তারে খোঁজে আশে-পাশে!
বকাবকি যুঝাযুঝি—
আমি যদি কভু রুষি,
এক জোটে সবে ওঠে কাঁদি!
আমি শেষে অপরাধী—জনে জনে সাধি।

যে কারুণ্যছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাও অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী, একই সঙ্গে অতি সুন্দর ও বস্তুতন্ত্র হইয়াছে। বস্তুগুলি আপাততঃ অতি ছোট বলিয়া মনে হইতে না পারে।

দৃশ্যগুলি অতি সাধারণ—যেখানে শোক সেইখানেই এগুলি অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উপকরণ সামান্য হইলেও এই কবিতাকয়টীর উপজীব্য যে কারুণ্য ইহাদের মধ্যে ফুটিয়াছে তাহা অলোকসামান্য। এই সামান্য উপকরণ লইয়া কবি যে এমন গভীর, উজ্জ্বল রসমূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন, ইহাতেই তাঁর কবিকল্পনার অলোকসামান্য কুশলতার পরিচয় দান করিতেছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

"ন চ দৈবাৎ—"

১

দেবেন্দ্রনাথের মাথা ধরিয়াছিল। কথাটা এমন কিছু নয়; রমণীমহলে এবং নারীভাব-সুলভ যুবকদলে এটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তবে, দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে এটা নূতন,—এ পর্য্যন্ত তাহাকে মাথা ব্যথা বা অন্য কোন ব্যথা অনুভব করিতে হয় নাই। তাই একটু ব্যস্ত হইয়াই অপরাহ্ণে সে তাহাদের গৃহ-চিকিৎসক হরেন্দ্র ডাক্তারের শরণাপন্ন হইল।

ডাক্তার সাহেব তখন বাড়ীতে ছিলেন না। দেবেন্দ্র নিজের গাড়ীতেই আসিয়াছিল, তৎক্ষণাৎ তাঁর আফিস বা consulting roomsএর দিকে ছুটিল। ডাক্তার তখন কাগজপত্র গুছাইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিলেন, বলিলেন—"খুব এসে পড়েছেন,—আমি এখনই একটা ডাকে শ্রীরামপুর যাচ্ছিলাম। মাথা ধরেছে? তা ধরবেই ত!—গুরু-ভোজন, মাদক-সেবন, রাত্রিজাগরণ—এ সব ত আপনারা ছাড়বেন না,—কাজেই তার ফল ভোগ করতে হয়!—"

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া দেবেন্দ্র বলিল, —"গতস্য শোচনা নাস্তি।' কিন্তু এখন যে আমি মরি। একটা ওষুধ দিন।"

"নেহাতই ছাড়বেন না ত এই নিন—" বলিয়া ডাক্তার একবার ঘড়ির দিকে চাহিলেন; তরপর তাড়াতাড়ি একটা প্রেসক্রুপ্‌সন লিখিয়া দিয়া রোগীর নাম-তালিকায় তার নামটা টুকিয়া, আফিস বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। দেবেন্দ্রও প্রেসক্রুপ্‌সনটা হাতে করিয়া প্রথম যে ডাক্তারখানা পাইল তাহাতেই ঢুকিয়া পড়িল। সে-টা সেনগুপ্ত কোম্পানীর ডাক্তারখানা। দেবেন্দ্রের নিতান্ত গ্রহের ফের, তাই সে সময় সেখানে ঢুকিল কেন, তাই বলিতেছি।

২

সেনগুপ্ত কোম্পানীর দুইজন অংশীদার—এক রতন সেন, অপর ললিত গুপ্ত। দুইজনে সহতীর্থ। উভয়ে কলেজের শেষ পরীক্ষা দিয়া সমান অংশে এই ডাক্তারখানা খোলে। স্কুলে এবং কলেজে কতকটা 'ডানপিটে' এবং

একটু বেশীমাত্রায় স্ফূর্ত্তিবাজ বলিয়া তাহাদের খ্যাতি ছিল। ব্যবসায়ে বসিয়াও কলেজের সে আমোদ-প্রবণতা তাহাদের বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। প্রমাণ—পূর্ব্বরজনীর অভিনয় দর্শন সম্ভোগ।

থিয়েটারওয়ালাদের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা এবং মিউনিসিপাল-আইন-প্রহসনে যতদিন না যবনিকা পড়িতেছে, ততদিন বঙ্গীয় নাট্যশালার অভিনয়-দর্শকবৃন্দের এ দুর্ভাগ্য ঘুচিবার উপায় নাই। তাই প্রতি রবিবার এবং সোমবার প্রাতঃকালে বিবর্ণমুখ কোঠরগতাক্ষি, সুদীর্ঘ রজনীর ঘর্ম্মসিক্তবেশা থিয়েটার যাত্রীর দলকে, সুদীর্ঘকালের আসামীর ন্যায়, অভিনয়-কারা হইতে একে একে বাহির হইয়া আসিতে দেখি। স্বাস্থ্যের বিনিময়ে অভিনয়-সম্ভোগ এ একমাত্র আমাদের মত হতভাগ্য দেশেই সম্ভবপর। কথাটা নেহাৎ 'ধান ভানিতে শিবের গীত' নয়; আমার এ গল্পের সহিত ইহার একটু বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, এটা একটু বেশী করিয়া বলিতে হইল।

সে দিন প্রাতঃকালে স্নানাদি করিয়া দুই বন্ধু যখন আসিয়া ডাক্তারখানা খুলিল তখন তাহাদের উভয়েরই অবস্থা সমান,—শরীর অবসন্ন, চক্ষু নিদ্রাতুর তার উপর, কম্পাউণ্ডারও সেদিন দিন বুঝিয়া, অসুস্থ বলিয়া রিপোর্ট করিয়া কাজে আসে নাই। কাজেই সে দিনের দোকানের সব ভার রতনের স্কন্ধে পড়িল; ললিত থাকিতে পারিল না,—ভবানীপুরে ডাক্তারখানাসংক্রান্ত একটা জরুরী কাজে কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহাকে ছুটিতে হইল।

একা রতন মুস্কিলে পড়িল। আফিসের ছোঁড়া কালীচরণটাকে ডাকিয়া লইয়া কাজের একটু সুসার করিবার চেষ্টা করিল।—কিন্তু সে একটা অজ্ঞ যব-চূর্ণ; ঔষধ-চূর্ণাদি লইয়া আহার্য্য বিশেষে রূপান্তরিত করিবার উপক্রম করিল; কাজেই বাধ্য হইয়া তাহাকে বিদায় দিয়া রতন নিজেই সব কাজ করিতে লাগিল। বেলা যখন চারিটা, তখনও কাজের ভীড়ে তার জলযোগ করিবার সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই,—এদিকে ঘুমের ঘোরও তখন তাহাকে বেশ চাপিয়া ধরিতেছিল। তারপরও এক-ঘণ্টা কাটিয়া গেল—রতন শিব নেত্রে তন্দ্রাবিষ্টের মত কোন রকমে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। ৫॥ টার সময় আর সে চক্ষু মেলিতে পারিল না,—রক্তমাংসের শরীরে আর কত সয়?—হাত পা ছড়াইয়া অবসন্নভাবে একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িবে—এমন সময় দেবেন্দ্রনাথ তার প্রেস্‌ক্রুপ্‌সনখানা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিল—"ওষুধটা আমি নিয়েই যাব। একটু না হয় বসছি" বলিয়া, একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া, কপালটা টিপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

রতনের তখনকার মনের ভাব সহজেই অনুমেয়। তবু সে প্রেস্‌ক্রুপ্‌সনখানা ধীরে ধীরে উঠাইয়া লইয়া, ল্যাবোরেটারীতে ঢুকিয়া ঘুম-বিজড়িত নেত্রে বহুকষ্টে তাহার পাঠোদ্ধার করিল। ঔষধের রকমারী বেশী ছিল না—এক সোডিয়ম ছাড়া হাতের কাছেও সবগুলা ছিল। সোডিয়মটা দেয়ালে আঁটা লম্বা তক্তার উপর, অন্যান্য ঔষধের বোতলের সঙ্গে বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজানো ছিল; তার এক-পার্শ্বে সিলিসিয়ম (Silicium) এবং অপর পার্শ্বে ষ্ট্রীকৃনিনের (Strychnine) বোতল ছিল।

সে রকম ভাবে পাশাপাশি ঔষধ দু'টা রাখা অবশ্য ঠিক হয় নাই। তবু ষ্ট্রীক্‌নিনের বোতলের গায়ে লাল কালির মোটা অক্ষরে "বিষ" "সাবধান" বলিয়া যে লেখা ছিল তাহা আমরা চাক্ষুষ দেখিয়াছি। রতন দুই-বার হাই তুলিয়া, তিনবার আলস্য ভাঙ্গিয়া, চারিবার চক্ষু রগড়াইয়া অনেকক্ষণ পরে সোডিয়মের বোতলটার আবিষ্কার করিল; তারপর টুলের উপর দাঁড়াইয়া, তাহার দিকে হস্তপ্রসারণ করিল;—নামাইয়া আনিল কিন্তু ষ্ট্রীক্‌নিনের বোতলটা।

দেবেন্দ্র তখন চেয়ারে বসিয়া মাথার যন্ত্রণায় ঝিমাইতেছিল।

বোতলটা নামাইয়া রতন তাহা হইতে ওজন করিয়া ১৫ গ্রেণ ঔষধ বাহির করিল, তারপর বাকী ঔষধগুলার সহিত মিশাইয়া একে একে ছয়টা পুরিয়া করিল, তারপর একটা রঙ্গীণ ছোট কাগজের বাক্সে পুরিয়াগুলি রাখিয়া, ঘুমের ঘোরে ডবল দাম চার্জ্জ করিয়া বলিল।—দেবেন্দ্র তখন যন্ত্রণায় অস্থির, সে তৎক্ষণাৎ দাম চুকাইয়া দিয়া ঔষধ লইয়া, গাড়ীতে গিয়া চড়িয়া বসিল। কোচম্যানকে হাঁকিয়া বলিল—"চলো—বাড়ী।"

৩

ঔষধের দামটা বাক্সে তুলিয়া রতন, বোতল খুলিয়া, আউন্স খানেক কি একটা রঙ্গীণ পানীয় গলাধঃকরণ করিল। ফলে, তাহার হস্তপদের শিথিলভাব কতকটা অপসৃত হইল, এবং তাহার শিব-নেত্র কতকটা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। সুপ্তোত্থিতের ন্যায় তখন সে একবার কক্ষের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—টেবিলের উপর কতকগুলা ছিন্ন কাগজ, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ৮।১০ টা শিশি, আর ঢাকা খোলা একটা বোতল—গায়ে মোটা মোটা লাল অক্ষরে—ও কি ?—"ষ্ট্রীক—!" রতন চক্ষু রগড়াইয়া দুইবার তিন-বার অক্ষরগুলা পড়িল, তারপর দেওয়ালে আঁটা তক্তাটার প্রতি দৃষ্টি ফিরাইল—সোডিয়মের বোতলটা ত নড়চড় হয়নি, তবে!—

সদ্যঃ সর্পদষ্টের ন্যায় রতন একলম্ফে টেবিল টপ্‌কাইয়া ছুটিয়া সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িল। কোথায় তখন রোগী, আর কোথায় সে ঔষধ! বিশাল জনস্রোত বহুক্ষণ উভয়কেই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে!

রতন কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল। একটা গভীর বিপদাশঙ্কায় তাহার হস্তপদ অসাড় হইয়া গেল। ক্ষণপরে কি ভাবিয়া, ফিরিয়া, প্রেস্‌ক্রুপ্‌সনখানা একবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল। নামের স্থানে দেখিল, শুধু—"রায়" লেখা রহিয়াছে। রায়! কোন্ রায়? ডিরেক্টারী খুলিয়া দেখিল—তিন কলম "রায়"! তবে একটা কথা, প্রেস্‌ক্রুপ্‌সনখানা ত হরেন্দ্র ডাক্তারের, তিনি হয় ত তাকে জানিতে পারেন। ডাক্তারখানায় টেলিফোন ছিল—রতন প্রাণপণে হাতল ঘুরাইতে লাগিল।

"কোন্ নম্বর ?"

"বলছি মশাই,—বলছি"—বলিতে বলিতে সে ক্রমাগত নম্বর কেতাবের পাতা উল্টাইতে লাগিল। ডাক্তারের 'ফোন'-নম্বর তার জানা ছিল না। টেলিফোনওয়ালারা ৪।৫ বার প্রশ্ন করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, অবশেষে সে হাঁকিল—"৫১৬"

"ডাক্তার হরেন্দ্র বোস ? আমি ডাক্তার বোসকে চাই, এখনই—"

অপরদিক্ হইতে বামাকণ্ঠে উত্তর হইল—"আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। মুখটা বুঝি যন্ত্রের খুব কাছে নিয়ে এসেছেন ? একটু সরিয়ে নেবেন।"

রতন যন্ত্রটা ঠিক করিয়া ধরিল, বলিল —"ডাক্তার সাহেব বাড়ী আছেন ?"

"তিনি কতক্ষণ হ'ল একটা 'কল' পেয়ে মফঃস্বল গেছেন। কি চান আপনি ?—

রতন হতাশভাবে অর্দ্ধস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল।

"আমি তাঁর স্ত্রী। আমার দ্বারা যদি আপনার কিছু—"

"দোহাই আপনার,'রায়' বলে তাঁর কোন রোগীকে আপনি জানেন ?"

"রায় ! রায় !—তাই ত, শুধু 'রায়' বল্লে কি করে বুঝব ? কত রায় আছে !—"

* * *

তখন দেবেন্দ্রের গাড়ী রাস্তার ভীড় ঠেলিয়া বাড়ীর দিকে মোড় ফিরিতেছিল।

৪

রতনের সমস্ত রক্ত তখন মাথায় উঠিতেছিল। তীব্র কণ্ঠে সে বলিল—"ভাবুন, মনে করে দেখুন—ছোকরা কোন রায়কে আজ আপনার স্বামীর কাছে আসতে দেখেছেন কি না।—আমি তাকে বিষ খাইয়েছি !—'

'বিষ ?—"

"হাঁ—ভুলক্রমে। আমি ডাক্তারখানার লোক, তাকে ভুল ওষুধ দিয়ে ফেলেছি। তার ঠিকানা চাই,—তাকে বাঁচাতে চাই,—তাকে—"

"সর্ব্বনাশ ! কি ভয়ানক কথা !—আপনি এখনি ডাক্তার সাহেবের আফিসে যান—তাঁর খাতাপত্র সেখানেই থাকে—সেখানে গেলে হয়ত সন্ধান পেতে পারেন।"

"তাঁর ঘরের চাবি ?—"

"তাই ত, আমি ত চাবি রাখি না। তবে, দরোয়ানের কাছে হয় ত চাবি থাকতে পারে,—আপনি যান,—আমিও—"

রতনের আর শেষ কথা শোনা হইল না। তিন লাফে সদর রাস্তায় পড়িয়া, ডাক্তারের আফিসের দিকে সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল—টেলিফোনের রিসিভারটা হুকের গায়ে সবেগে দুলিতে লাগিল।

ছুটিতে ছুটিতে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় যখন রতন ডাক্তার বোসের আফিসে আসিয়া পৌছিল, তখন দ্বারবান লছমন সিং, ফটক বন্ধ করিয়া দিয়া আপনার ক্ষুদ্র কুঠারীতে বসিয়া, মৃৎপ্রদীপালোকে, সুর করিয়া করিয়া, ভাবের আতিশয্যে গাঢ়কণ্ঠস্বরে "হো রামা—আ-আ" পড়িতেছিল। সদর দরজার উপর প্রচণ্ড করাঘাতে তাহার ভাবস্রোতে বাধা পড়িল। বিরক্ত হইয়া পুস্তক বন্ধ করিয়া সে উত্তর করিল—"আতে হেঁ।"

সে স্বর রতনের কর্ণে প্রবেশ করিল কি না বলিতে পারি না—কিন্তু সে প্রচণ্ড করাঘাতের বিরাম ঘটিল না। লছমন দরজার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল—"আরে শশুরাণ, ইয়ে ডাকু না কোন্ হ্যায় ! ঠারিয়ে জী. ঠারিয়ে, —আতে হেঁ। আরে কে'মারি তোড়ো মৎ—" বলিতে বলিতে দ্বার খুলিয়া, সম্মুখে সম্পূর্ণ অপরিচিত ধূলিধূসরিত স্বেদসিক্ত এক

মূর্ত্তি দেখিয়াই তাহার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল; ভাবটা তখনই তাহাকে দূর করিয়া দেয়। রতন, তাহা বুঝিয়াই, তাহাকে ঠেলিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বলিল—"হাম্ ডাক্তার সাহেবকো আফিস ঘরকা ভিতর যানে মাঙ্‌তা। আভি উস্‌কা কেওয়ারি খোল দেও।"

"কাহে জী? সাব আভি নেহি হ্যায়।"

"আরে সে ত হামি জানে। একঠো আদমী বিষ খায়া হ্যায়—মরণে বৈঠা হ্যায়, উস্‌কা ঠিকানা হাম মাঙ্‌তা।"

"কিস্‌কো ঠিকানা?"—লছমন আগন্তুকের প্রতি সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল।

* * *

এদিকে দেবেন্দ্র তখন ঔষধ লইয়া বাড়ী ফিরিয়া, আপন শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

* * *

"কিস্‌কো ঠিকানা, জী?"

"আরে, ওই আদমীকো—"

"শুনিয়ে বাবু সাহেব। ডাঙ্‌তার সা'ব বাহির গয়ে হেঁ, আপকো ভি হম নেহি পছনতে হেঁ। তব্ উন্‌কা কামরা হম ক্যায়সে খোল দেঁ?"

"আরে জাহান্নামকে দাও তোমার ক্যায়সে। আরে ভাই তোম্ খুন্ করোগে? তোমকো ভি হামারা সাথ যে লটক্ যানে হোগা।—আরে খোল দেও, খোলো,—খোলো—" রতন উন্মত্তের ন্যায় আফিস কক্ষের দরজায় প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল।—"আরে খোল দেও, মেমসাহেব ভি হামকো বোল্ দিয়া।—"

লছমনের মেজাজ ক্রমশই চড়িয়া উঠিতেছিল। সে বলিল—"উস্‌কা কোন্ ঠিকানা হ্যায়? খালি আপকো জবানীমে হাম কভি ইস্ কামরা খোল্‌নে নেহি শকতে হেঁ। বিশ বরষ হিঁয়া হাম নকরীমে হ্যায়, বিশ—"

সহসা সে রঙ্গমঞ্চে এক মহিলার আবির্ভাব হইল। উভয়ের বচসার কথা বাটীতে প্রবেশ করিতে করিতে কতকটা তাঁর কর্ণগোচর হইয়াছিল।—

"সে কি?—আপনি এখনও ঘর খোলেন নি?—আপনিই ত আমাকে—"

"এই হতভাগাটা—" রতনের সর্ব্বশরীর তখন ক্রোধে উৎকণ্ঠায়, কাঁপিতেছিল,—"এই—"

"লছমন, এখনি ডাক্তার সাহেবের ঘর খুলে দাও।"

লছমন প্রভুপত্নীর সে আদেশ অন্যথা করিতে সাহস করিল না। তবু তালা খুলিতে খুলিতে বলিতে লাগিল—"বিশ বরষ হিঁয়া হাম—"

* *

দেবেন্দ্র তখন জুতাজামা ছাড়িয়া, সেনগুপ্ত কোংর সে সুদৃশ্য পুরিয়ার বাক্সটা খুলিয়া তাহা হইতে সযত্নে একটা পুরিয়া বাহির করিয়া গলাধঃকরণ করিবার অভিপ্রায়ে সুরুই হইতে এক গ্লাস জল গড়াইতেছিল।

* *

তাড়াতাড়িতে দরজা খুলিতে গিয়া, লছমন চাবিটা তালার সহিত বেকায়দায় আটকাইয়া ফেলিল; রতন ক্রোধে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া তার গলা চাপিয়া ধরিল, মিসেস বসু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—এমন সময় হঠাৎ সে রঙ্গমঞ্চে আর এক ব্যক্তির আবির্ভাব

হইল,—ইনি ডাঃ সেন—ডাক্তার বসুর সহকারী বা অ্যাসিষ্টাণ্ট। মিসেস বসু বলিলেন—"দোহাই ডাঃ সেন। আগে দরজাটা খুলুন, সব বলছি পরে।"

অল্প চেষ্টাতেই তালা খুলিল। রোগীদের লিষ্টটা টেবিলের উপরই ছিল, রতন তাড়াতাড়ি পাইয়া দেখিল, সব শেষে পেন্সিলে লেখা একটা নাম—"দেবেন্দ্র রায়, কলুটোলা— নং।"

*　　*

দেবেন্দ্র ততক্ষণে ঔষধের গ্লাসে জল মাপিয়া তাহাতে এক পুরিয়া ঔষধ ঢালিয়াছিল, তারপর আরাম কেদারায় শুইয়া, গ্লাসটা—　*　*　*

৫

মিসেস বসু চীৎকার করিয়া বলিলেন—"বাইরে আমার গাড়ী রয়েছে, আপনারা দু'জনে শীঘ্র গাড়ীখানা ছুটিয়ে নিয়ে যান। আমিও দেখি টেলিফোনে তাঁকে পাই কি না।"

অনেকক্ষণ অনুসন্ধানের পর মিসেস বসু একটা নম্বর পাইলেন—'যদুনাথ রায়—কলুটোলা।'

"দেবেন্দ্র বাবু এ বাড়ীতে থাকেন?"

"আজ্ঞে হাঁ। আপনি কে? কোথা থেকে বলছেন?"

"আমি ডাক্তার হরেন্দ্র বসুর স্ত্রী। দেবেন্দ্র বাবু বাড়ী আছেন ত? এখনই একবার ডেকে দিন, বিশেষ জরুরী।"

মিনিট খানেক পর অপর দিক্ হইতে প্রশ্ন হইল—"আপনি দেবেন্দ্র রায়কে খুঁজছেন? আমিই দেবেন্দ্র। কি চান আপনি?—"

"দোহাই দেবেন্দ্র বাবু, সেটা খাবেন না।"

"আজ্ঞে?—"

"সেটা খাবেন না, খাবেন না— এখনও খান্‌নি ত?"

"কি বলছেন বুঝতে পারছি না। আপনি টেলিফোনের নম্বর উলটাপালটা করে ফেলেন নি ত?"

"সেই পুরিয়াটা—মাথাধরার ঔষধটা খাননি ত এখনো?—"

"কেন, কি হয়েছে? এইমাত্র যে আমি একটা পুরিয়া খেলাম।—ব্যাপার কি?"

কিন্তু দেবেন্দ্র আর তার উত্তর পাইল না। যন্ত্রটাকে কোনমতে হুকে আটকাইয়া ভীতচকিত নেত্রে উদ্বিগ্ন হৃদয়ে মিসেস বসু ততক্ষণ সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

দেবেন্দ্র কতক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শেষে বিরক্ত হইয়া রিসিভারটা তুলিয়া রাখিল। আপন মনে বলিল—'কে এ? পাগল না কি?"

দেবেন্দ্রের বাড়ীর দরজায় গাড়ি লাগিতে না লাগিতে রতন এবং ডাক্তার সেন লাফাইয়া পড়িয়া ঝড়ের মত একেবারে বাড়ির মধ্যে গিয়া পড়িলেন। চাকরটা আকস্মিক কোন দুর্ঘটনার সম্ভাবনায় ছুটিয়া আসিতেছিল—তাহার উপর উভয়ের যুগপৎ প্রশ্ন বর্ষিত হইল—"বাবু বেঁচে আছেন ত?"

হল-ঘরে কিসের একটা গোলমাল শুনিয়া দেবেন্দ্র আপন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিতেই রতন ছুটিয়া যাইয়া তার হাত দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল--"ভগবানকে ধন্যবাদ, আপনি বেঁচে আছেন!—রাখে কৃষ্ণ মারে কে?—"

"কেন,—কি হয়েছে ?"

সহসা কক্ষমধ্যস্থ টেবিলের উপর ঔষধের খালি গ্লাসটার উপর ডাক্তার সেনের দৃষ্টি পড়িল। তিনি সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।—"আপনি ওষুধ খেয়েছেন ?"

"কোন্ ওষুধ ? পুরিয়াটা ? হাঁ খেয়েছি, কেন ? এইমাত্র খেয়ে শুয়ে ছিলাম।"

"হা ভগবান্!"—বলিয়া রতন মাথায় করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িল।—"এত করেও আটকাতে পারলাম না!" তার পর উন্মত্তের ন্যায় কক্ষমধ্যে ছুটাছুটি করিয়া বলিতে লাগিল 'মাষ্টার্ড—পাম্প—জিঙ্ক সালফেট,—কে কোথায় আছ, শীঘ্র আন, শীঘ্র নিয়ে এস।"

দেবেন্দ্র কতকটা দমিয়া গেল।—"মাষ্টার্ড—পাম্প—জিঙ্ক সালফেট!—কেন, কিসের জন্য ?"

রতন পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"না না,—বলুন আপনি সত্যি সেটা খাননি!—বলুন আপনি ভুল বলেছেন।"

"বিলক্ষণ, ভুল হবে কেন?—ব্যাপারটা কি খুলেই বলুন না? দোহাই আপনাদের—"

এমন সময় মিসেস বসু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"ওঃ হো! ষ্ট্রীকনিন—আপনাকে আমি ষ্ট্রীকনিন খাইয়েছি!—" বলিয়া রতন আপন মস্তকে করাঘাত করিতে লাগিল।

অ্যাঁ!—ষ্ট্রীক—নিন!—দেবেন্দ্রের মুখমণ্ডল সহসা পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, তাহার চক্ষু কপালে উঠিল, নিমিষের মধ্যে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া সে কক্ষতলে পড়িয়া গেল। সকলে মিলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া শয্যায় শয়ন করাইয়া চোখে মুখে নাকে জলের ঝাপটা দিতে লাগিল। ডাক্তার সেন উত্তেজিত হইয়া রতনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "আর হাঁ করে ভাবছেন কি?—এখনি ছুটে আপনার ডাক্তারখানায় যান, পাম্প ফাম্প যা পান নিয়ে আসুন,—মুহূর্ত্তের বিলম্বে সব নষ্ট হবে। এখনও উপায় আছে—যান চলে যান।"

রতনের মাথায় তখন রক্ত চন্ চন্ করিতেছিল। নক্ষত্রবেগে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গাড়িতে চড়িয়া বসিয়া সে হাঁকিল—'দশ টাকা—বিশ টাকা—যা চাও বক্‌সিস দেবো, যত জোর আছে চালাও।"

জনসংঘ ভেদ করিয়া, কত লোককে চাপা দিতে দিতে সামলাইয়া গিয়া, মোটরখানা ডিস্পেন্সারীতে আসিয়া পৌছিল। একটা ছোকরা অনেকক্ষণ হইতে রতনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, সে আসিতেই তাহার হাতে একখানা চিঠি দিয়া বলিল—"ললিত বাবু দিয়েছেন,—বলেছেন—খুব জরুরী; এখনই খুলে দেখতে!" "নিপাত যাও!" বলিয়া রতন তাহার হাত হইতে পত্রখানা ছিনাইয়া লইয়া পকেটে পুরিল। তার পর তাড়াতাড়ি ঘর খুলিয়া, মাষ্টার্ড পাম্প প্রভৃতি যা পাইল একটা ব্যাগে পুরিয়া তালা বন্ধ করিয়া গাড়িতে আসিয়া উঠিল। সফারকে বলিল—"ছোটো ছোটো,—এক মুহূর্ত্তের দেরিতে একটা জীবন যাবে, প্রাণপণে চালাও—"

৬

হঠাৎ ললিতের চিঠির কথা রতনের মনে পড়িল। তাড়াতাড়ি খামটা ছিড়িয়া চ'চার ছত্র পড়িতেই, তার সব উত্তেজনা

থামিয়া গেল। আরও দুইবার ভাল করিয়া সে পত্রখানা পড়িল। তার পর অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল—ষ্টুপিড্—ছোঁড়াটা,—রাস্কেল! কি ভোগানটাই না মিছামিছি ভোগালে!

পত্রখানা এই :—

"ভাই রতন,

সোডিয়মের বোতলটা নেড়ো না —সেটা ষ্ট্রীকনিনে ভরা। ষ্ট্রীকনিনটারও বোতলের সবটাতেই সোডিয়ম পোরা আছে। আজ সকালবেলা তন্দ্রার ঝোঁকে ওলটপালট করে ফেলেছি, ভেবেছিলাম পরে লেবেল দুটো বদ্‌লে দেবো, আস্‌বার সময় ভুলে এসেছি; এখানে এসে এই কতক্ষণ মনে হল। এটা হচ্ছে—'বিভ্রমস্তন্দ্রাকালে চূর্ণস্থানবিপর্য্যয়ঃ।' যাই হোক কাল ঠিক করে নেয়া যাবে এখন। এটা একটা গভীর মনস্তত্ত্বের কথা, —পরে এ বিষয়ে আলোচনা হবে।

দিনটা চালালে কেমন?

তোমার

"ললিত।"

*   *

"হতভাগাটা!"—বলিয়া রতন শুধু হাতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্র তখন শয্যায় পড়িয়া গোঙাইতেছিল। ডাক্তার সেন পার্শ্বে বসিয়া তাহার হাতের নাড়ি টিপিয়া ধরিয়া পকেট ঘড়িটার কাঁটার দিকে ঘন ঘন চাহিতেছিলেন। মিসেস বসু তার নাকে মুখে জল দিতেছিলেন। রতনকে শুধু হাতে আসিতে দেখিয়া ডাক্তার সেন ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। রতন হাস্যপ্রদীপ্ত চক্ষে এবং ঈষৎ অপ্রস্তুতের ভাবে বলিল—"আঃ বাঁচা গেছে। সব ভুল! ভগবান্ বাঁচিয়েছেন!"

"কি রকম?"—উভয়ে সোৎকণ্ঠে যুগপৎ প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন।

"এই দেখুন, আমার বন্ধু ও সহকারী ললিত গুপ্তের চিঠি—" বলিয়া সে চিঠিখানা পড়িয়া সকলকে শুনাইল।

"অ্যাঁ?" দেবেন্দ্র এতক্ষণ পরে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। "তবে আমি বিষ খাইনি?"

"আজ্ঞে না।"

"সত্যি?"

"সত্যি বই কি এই চিঠিই তাহার প্রমাণ।"

"তাই ত! তবে আর আমার কোন ভয়ের কারণ নেই?—আপনারা ঠিক বলছেন? আমি ত তাই ভাবছিলাম—" বলিয়া দেবেন্দ্র উঠিয়া বসিল।

মিসেস্ বসু ধীরে ধীরে জলের পাত্রটা ঠেলিয়া রাখিলেন; ডাঃ সেন চশমা মুছিতে মুছিতে আস্তে আস্তে উঠিয়া পড়িলেন; দাস-দাসীরা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। তারপর সকলে একে একে নীরবে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

যাই হউক, দেবেন্দ্রের মাথা-ব্যথাটা কিন্তু ছাড়িয়া গিয়াছিল। *

---

* কোন ইংরাজী গল্প অবলম্বনে।

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার

রাডিয়ার্ড কিপলিং ও রবীন্দ্রনাথ

বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ ডারুইন যখন তাঁহার অভিব্যক্তিবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তখন বলিতে গেলে তিনি প্রাকৃতিক নিয়মের কেবল একটা দিকই বেশী দেখিয়াছিলেন। জীবজগতের বিকাশে, "জীবন-সংগ্রাম" ও "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন"—এই দুইটীই তিনি প্রধান বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। সৃষ্টি-পর্য্যায়ে যে আরও একটী নিয়ম কার্য্য করিতেছে ('জীবন-সংগ্রাম" অপেক্ষা প্রবলতর ভাবেই কার্য্য করিতেছে), তাহার দিকে তিনি তেমন মন দেন নাই।

ডারুইনের এই মতবাদ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। কিন্তু চিন্তারাজ্যে সুফলের সঙ্গে সঙ্গে এমন সকল কুফলও ইহা উৎপন্ন করিয়াছে, যাহা ডারুইন স্বয়ং কল্পনাও হয়ত করেন নাই। তাঁহার শিষ্য ও সতীর্থেরা আরও একটু অগ্রসর হইয়া বজ্রগম্ভীর রবে প্রচার করিলেন যে, সংগ্রামই জীবজগতের একমাত্র নীতি; দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ, প্রবল প্রতিযোগিতা, ইহা ছাড়া সেখানে অন্য কোন নিয়ম খাটিতে পারে না। এই কঠোর যুদ্ধে, যে বলী সেই জয়ী হইবে; —দুর্ব্বল, অযোগ্য এই নিয়মের চক্রে পিষিয়া মরিবে। আধুনিক একজন প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদের কথায়—

"They made modern literature resound with the war-cry of "woe to the vanquished", as if it were the last word of modern biology. They raised the "pitiless" struggle for personal advantages to the height of a biological principle which man must submit to as well, under the menace of otherwise succumbing in a world based upon mutual extermination". (Prince Kropotkin's "Mutual aid").

শীঘ্রই এই নিষ্ঠুর নীতি রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প ও বাণিজ্য—সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এই সংগ্রাম-নীতির রক্ত-রেখাঙ্কিত ভিত্তির উপরেই ইউরোপীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিল। রাষ্ট্র ব্যাপারে এই নীতি Imperialism মূর্ত্তি ধারণ করিল। অক্টোপোসের মত এই ভীষণ Imperialism তাহার সর্ব্বতঃ প্রসারিত বাহুদ্বারা, দুর্ব্বলকে, অসহায়কে, ক্ষুদ্রকে টানিয়া তাহার মরণের জালে ফেলিতে লাগিল। সমাজে ইহা সহানুভূতির বীজ নষ্ট করিয়া প্রতিযোগিতাকে বাড়াইয়া তুলিল। স্বার্থপরতা ও বিলাসিতাকে ডাকিয়া আনিল। সাহিত্যে ইহা অহঙ্কার, আত্মম্ভরিতা ও বর্ণ-বিদ্বেষের বহ্নি জ্বালাইয়া দিল। ইহারই পরোক্ষ ফল স্বরূপ নিহিলিষ্ট ও "প্রগল্‌ভা রমণীদলের" সৃষ্টি হইল। এই যে আজও চক্ষের সম্মুখে বল্কান-সমরে নিষ্ঠুর পৈশাচিক লীলা, নরশোণিতের হোলি-উৎসব দেখিতেছি; এই যে লক্ষ লক্ষ জীবের প্রাণ ও কোটী কোটী দরিদ্রের অর্থ উড়িয়া যাইতেছে;—ইহা সেই জীবন-সংগ্রাম-নীতিমূলক সভ্যতারই পরিণাম!

কিন্তু জীবজগতে সৃষ্টির বিকাশে আরও একটা নিয়ম কার্য্য করিতেছে। তাহার প্রভাব এই সংগ্রাম-নীতি অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে ;—বরং অনেকস্থলে তাহার কার্য্যই প্রবলতর বোধ হয়। তাহাকে বলা যাইতে পারে—সহানুভূতি ও প্রেম ; পরস্পরের সাহায্য ও মৈত্রী। অতি নিম্নতম কীট-পতঙ্গজাতীয় জীব হইতে সভ্যতম মনুষ্য-সমাজ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই সহানুভূতি ও মৈত্রীর ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট, মানুষের ধর্ম্ম ও নীতি সকলই এই নিয়মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থে * প্রিন্স ক্রপটকিন এই তত্ত্বটী অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা প্রধানতঃ এই সহানুভূতি, প্রেম ও মৈত্রীর ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মানুষে মানুষে এই যে বিরোধ এই যে সংগ্রাম তাহা অল্পবিস্তর অপরিত্যাজ্য হইলেও, এই নীতিকে সে যথা-সম্ভব দূরেই রাখিতে পারিয়াছিল। প্রকৃতির মধ্যে সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের যে প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে, তাহা সে অতি পূর্ব্বকালেই অনুভব করিয়াছিল। তাহার শান্ত নির্জ্জন তপোবন হইতে উপনিষদের যে উদাত্ত সঙ্গীত উঠিয়াছিল, তাহাতে এই ত্যাগ ও প্রেমের সুরই ধ্বনিত হইয়াছিল। এই খানেই "হিমাচল পাদমূলে, শৈলজা রোহিণীকূলে" যে 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" ও বিশ্বমৈত্রীর বাণী বিঘোষিত হইয়াছিল, "আজিও অর্দ্ধজগৎ ভক্তিপ্রণত চিত্তে" তাহা শুনিতেছে। এই পরম সাম্যের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।
(গীতা—৬।৩২)

এই মহা মিলন-মন্দিরেই আর্য্য ও অনার্য্য, শক ও হূণ, তাতার ও তুর্কী সকলেই সমভাবে আলিঙ্গিত হইয়াছিল। কেবল এইখানেই রাষ্ট্র-নীতিতে অসির পরিবর্ত্তে প্রেমের ব্যবহার প্রথম দেখা গিয়াছিল ; সম্রাট্ অশোক প্রভুত্বের পরিবর্ত্তে মৈত্রীর দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন। এই ভারতীয় সাহিত্যেই স্বার্থ ও বিলাসিতার পরিবর্ত্তে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আনন্দ কীর্ত্তিত হইয়াছিল। সমাজে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের (পরবর্ত্তীকালের জাতিভেদ নয় !) প্রতিষ্ঠা দ্বারা উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে অধিকার-সাম্যের চেষ্টা করা হইয়াছিল। আজ—কেবল আজ কেন বহুদিন হইতেই—সে আদর্শ মলিন হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু তাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই ;—ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় কেবল প্রকাশের অপেক্ষা করিতেছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার এই যে "সংগ্রামনীতি" :—"যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনে"র আদর্শ, তাহা বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে, ইংলণ্ডের আধুনিক প্রধান কবি রাডিয়ার্ড কিপলিংএ কিপলিং Imperialismএর মুখপাত্র—সর্ব্ব-প্রধান প্রবক্তা বলিলেই হয়। তাঁহার গান ও কবিতায় তিনি মানুষের এই সংগ্রামবৃত্তি—প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছাই জাগাইয়া তুলিয়াছেন। রাষ্ট্রের জিগীষা ও ক্ষমতা-বিস্তারকেই রমণীয় আদর্শে চিত্রিত করিয়াছেন। যে সাম্যের আদর্শ সর্ব্ববিধ সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির মূল-

* P. Kropotkin's "Mutual aid—a factor of Evolution."

সূত্র—তিনি তাহার উত্তরসাধক নহেন; যে আত্মম্ভরিতা ও স্বাজাত্যের অহঙ্কার জাতিকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলে, পরজাতি-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, তাঁহার গানে তাহারই সুর বাজিয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে আজ যে এই ছাড়াছাড়ি ভাব —কৃষ্ণের প্রতি শ্বেতের এই যে ঘৃণা—যাহার প্রভাব অষ্ট্রেলিয়া, কালিফোর্ণিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা সর্ব্বত্রই আমরা দেখিতে পাইতেছি,—কিপলিং তাহার পরিপুষ্টির জন্য কম সাহায্য করেন নাই। তিনিই প্রথমে গাহিয়াছিলেন,—

"The East is East, and West is West
Never the twain shall meet."

তাঁহার এই বাণী যে মানব-সভ্যতার কত অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা হয়ত তিনি জানেন না। তাঁহারই গল্পে কাহিনীতে তিনি ভারত-বর্ষীয়দিগকে এমন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন যে, তাহারা পাশ্চাত্যজাতির চক্ষে অত্যন্ত হীন ও বর্ব্বর বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "Plain Tales from the Hills"-এর উল্লেখ করিতে পারি। বৈজ্ঞানিক তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন, কিন্তু তাহার প্রকৃত বিকাশ হয় সাহিত্যে ও কবিতায়। জন-সাধারণ বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা কবির বাণীতেই বেশী অনুপ্রাণিত হয়। তাই ডারুইন ও হাক্সলি অপেক্ষা, তাঁহাদের গায়ক কিপলিংই আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

অপরপক্ষে ভারতবর্ষের সেই বিস্মৃতপ্রায় সত্যটীর—সহানুভূতির ও প্রেমের—বিশ্ব-মৈত্রীর ও ভালবাসার সেই পুরাতন আদর্শের, বিশেষ বিকাশ হইয়াছে আমাদের রবীন্দ্রনাথে। ভারতমাতার মন্দিরে হোম-ভস্মের মধ্যে যে বহ্নিস্ফুলিঙ্গ লুক্কায়িত ছিল, তিনিই আজ তাহাকে ভাল করিয়া জ্বালাইয়া তুলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী তাঁহার প্রাণে বাজিয়াছে; তাই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে যে সংগ্রামের ও বিরোধের, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ও সংঘর্ষের কোলাহল উঠিতেছে, তাহার দ্বারা আচ্ছন্ন না হইয়া, সেই সকল সংগ্রাম ও সংঘর্ষের মধ্যেই যে প্রেম ও মৈত্রীর মধুর সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে, রবীন্দ্রনাথ আপনার বীণা সেই সুরেই বাঁধিয়াছেন। কিপলিংএর গান শুনিয়াছেন; এইবার রবীন্দ্র-নাথ কি গাহিতেছেন শুনুন—

"হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগরে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে;
হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে
নমি নর দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তাঁরে।

* * * *

রণ-ধারা বাহি, জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে,
ভেদি মরুপথ, গিরিপর্ব্বত যারা এসেছিল সবে,
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তার বিচিত্র সুর।

* * * *

এসহে আর্য্য, এস অনার্য্য হিন্দু মুসলমান,
এস এস আজ তুমি ইংরাজ এস এস খৃষ্টান,
এস ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধর হাত সবাকার,
এস হে পতিত কর অপনীত
সব অপমান ভার।"

কোন্ সাহসে কবি এই গান গাহিতেছেন?

"তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর
নাহি কোন মানা, নাহি কোন ডর,
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ
দেখা যেন সদা পাই!
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।"

যাঁহাকে জানিলে সকলকেই জানা হয়—সকলকেই আপনার বোধ হয়, ভারতীয় সাধনার পুণ্যফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে জানিয়াছেন, তাই এই গান গাহিতে পারিয়াছেন। এ গান শুধু ভারতের গান নহে: এ জগতের গান—বিশ্বমানবের গান।

সংগ্রাম ও সংঘর্ষ প্রয়োজনীয় হইলেও সৃষ্টির একমাত্র নিয়ম নহে। মৈত্রী ও প্রেমই সৃষ্টি-চক্রের উচ্চতর নীতি। প্রবলের জয়, "যোগ্যতমের উদ্বর্তনে" স্বার্থের পরিপুষ্টি হইতে পারে, কিন্তু দুর্ব্বলের প্রতি প্রেম অসহায়ের প্রতি প্রীতিতেই মানবত্বের পরিতৃপ্তি হয়। তাই সংগ্রাম ও সংঘর্ষে—স্বার্থের প্রতিযোগিতাতে মানব-সমাজ কখন তৃপ্ত হইতে পারে না। তাহাতে সুরাপানের উত্তেজনা আনিতে পারে, অস্বাভাবিক উন্মাদনার উৎসাহ জন্মাইতে পারে, কিন্তু হৃদয়ে শান্তি দিতে পারে না। সুরাপানান্তে অবসাদের ন্যায় কালে এমন একটা অবসাদ উপস্থিত হয় যে সেই সব আর ভাল লাগে না। তখন প্রাণ মহত্তর, উন্নততর, পবিত্রতর কিছু চায়। ইউরোপের আজ প্রায় সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। ইউরোপ তাহার সভ্যতার কর্কশ কোলাহল, জীবন-সংগ্রামের ভীষণ সঙ্গীত, বিলাস-লালসার সেই তীব্র হলাহল আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। তাহার অন্তরের অন্তরস্থল প্রেম ও বিশ্বমৈত্রীর, ত্যাগ ও আনন্দের গান শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথ আজ সেই গান লইয়া ইউরোপের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। এই জন্যই বুঝি বিধাতা তাঁহাকে স্বাজাত্যের গণ্ডী ছাড়াইয়া বিশ্বমানবের রাজ্যের মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন; বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্যই রবীন্দ্রনাথকে দিয়া বীণার তার নূতন সুরে বাঁধাইয়াছেন। পরিশ্রান্ত ইউরোপ তাঁহার গান বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছে। যেটী সে চায়, তাঁহার মধ্যে সেইটীরই যেন সে আভাস পাইয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথকে পাইয়া পাশ্চাত্যের এত আনন্দ—রবীন্দ্রনাথের সেখানে এত সম্বর্দ্ধনা।

বিশ্বরাজ্যে কিছুই নষ্ট হয় না—কিছুরই অপব্যয় নাই। একদিন যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার মুখে যে সকল মহাসত্য প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা লুপ্ত প্রায়, বিস্মৃতপ্রায় হইলেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। যে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিধাতা তাহাকে গড়িয়া উঠিতে দিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য সাধন সে করিবেই। মানব-সভ্যতায় তাহার নূতন দান যাহা দিবার আছে, তাহা না দিয়া তাহার ফিরিবার উপায় নাই। সেই নূতন দান—সংগ্রামের স্থানে প্রেম, প্রতিযোগিতার স্থানে সহানুভূতি, ভোগ ও বিলাসের স্থানে ত্যাগ ও বৈরাগ্য, জাতি-সংঘর্ষের স্থানে বিশ্বমৈত্রী। ভারতের রবীন্দ্রনাথ আজ পাশ্চাত্য মানব-সভায় সেই গানই শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতেই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব, ইহাতেই ভারতের গৌরব। আর ইহার জন্য শুধু ভারতবাসী কেন সমগ্র মানব-সমাজের তিনি কৃতজ্ঞতার পাত্র।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

(ভাদ্রের বঙ্গদর্শনের ৩৬৪ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

ব্রাহ্মমত ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত

আযৌবন ব্রাহ্ম-সমাজে থাকিয়া, আজ শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, আমার পূর্ব্বকার তত্ত্বসিদ্ধান্ত ও ধর্ম্ম-সাধনকে ভ্রান্তিবোধে পরিহার করিতেছি, এমন নহে। আমি যদি খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান্ হইতাম, তাহা হইলে, আমার খৃষ্টীয়ানী বা মুসলমানী বিশ্বাসকে পরিত্যাগ না করিয়া, কোনও মতেই বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বা বৈষ্ণবসাধন অবলম্বন করিতে পারিতাম না। কারণ খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান্ ধর্ম্মের সঙ্গে কেবল বৈষ্ণবধর্ম্মের নহে, কিন্তু জগতের অপর সকল ধর্ম্মেরই একটা আত্যন্তিক বিরোধ আছে। বাইবেলের অতিরিক্ত কোনও সত্য শাস্ত্র আছে, কিম্বা খৃষ্টীয়পন্থা ব্যতীত জীবের মুক্তির আর কোনও পন্থা আছে, খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্ম ইহা স্বীকার করে না। মুসলমান্ ধর্ম্মও কোরাণ শরীফ এবং হজরত মোহম্মদকে জগতের এক মাত্র তত্ত্বগ্রন্থ ও আখেরী নবী বা প্রবক্তা বলিয়া মনে করে, এগুলিকে ছাড়িয়া এখন আর কেহ সত্যলাভ বা মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যিশুখৃষ্ট ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরাবতার বা পরমতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিলে, খৃষ্টীয়ানের ধর্ম্মহানি হয়। কোরাণ ও হজরতের সিদ্ধান্তের বা সাধনের বাহিরে কোনও সিদ্ধান্ত বা সাধন অবলম্বন করিলে, মুসলমান্ কাফের হইয়া যান। খৃষ্টীয়ানের চক্ষে বাইবেল ও যিশুখৃষ্ট, মুসলমানের চক্ষে কোরাণ শরীফ এবং হজরত মোহম্মদ—এ জগতে সত্যের এক মাত্র প্রামাণ্য ও মুক্তির অনন্য পন্থা। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের এরূপ কোনও অতিপ্রাকৃত শাস্ত্র বা অতিমানুষ অবতার কি পয়গম্বর নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম মানবের সহজ জ্ঞান-বুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মগণ কোনও ঐশ্বরিক শাস্ত্র মানেন না, কোনও ঐশ্বরিক অবতারে বিশ্বাস করেন না। ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বসিদ্ধান্ত ও ধর্ম্মসাধন সকলই একমাত্র স্বানুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। আর এই স্বানুভূতি সকলের সমান নয়। এই স্বানুভূতি সত্যের একদিক্ মাত্র দেখে, একাংশ মাত্র গ্রহণ করিতে পারে। স্বানুভূতিগ্রাহ্য সত্যের বা সিদ্ধান্তের মধ্যে সর্ব্বদাই অসত্য ও ভ্রান্তি মিশিয়া থাকিবার সম্ভাবনা আছে। এই সম্ভাবনা থাকে বলিয়াই ব্রাহ্মগণ কোনও শাস্ত্র বা গুরুকে একান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আর ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়া, জগতের যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণকে সর্ব্বপ্রকারের প্রামাণ্যমর্য্যাদাচ্যুত করিয়া, ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ, ব্যষ্টিভাবে বা সমষ্টিভাবে আপনাদের স্বাভিমতকে কখনই অভ্রান্ত সত্য ও আখেরী পন্থা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না। ব্রাহ্মগণ আজ সত্যের ও সাধনের যতটুকু জানিতে পারিয়াছেন, তার বাহিরে বা

উপরে আর সত্য বা সাধন নাই, এ কথা বলিলে ব্রাহ্মসমাজের মূল ভিত্তি নষ্ট হইয়া যায়। খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান্ এ কথা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারেন; তাঁদের ধর্ম্ম শুদ্ধ-স্বানুভূতি-প্রতিষ্ঠ নহে। এই জন্য খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান্ ধর্ম্মের সঙ্গে কৃষ্ণতত্ত্বের একটা স্বাভাবিক ও আত্যন্তিক বিরোধ আছে; ব্রহ্মসিদ্ধান্তের বা ব্রাহ্মসাধনের সঙ্গে সেরূপ কোনও বিরোধ নাই। খৃষ্টীয়ান্ খৃষ্টীয়সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ না করিয়া, কদাপি বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন না। মুসলমানও স্বধর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিতে পারেন না। কিন্তু ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের লোকে তাহা পারেন, তাহাতে ব্রাহ্মের ধর্ম্মহানি হয় না। ব্রাহ্ম-সমাজের জনসাধারণে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে আপনাদের দলের বাহির করিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ও বৈষ্ণবসাধন অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া, গোস্বামী মহাশয় আপনি কোনও দিন আপনার সিদ্ধান্ত বা সাধনকে ব্রাহ্মসিদ্ধান্ত ও সাধনের বিরোধী বা বহির্ভূত মনে করেন নাই।

অতএব শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকেই পরমতত্ত্ব মনে করিতেছি বলিয়া আমি যে আজ আমার পূর্ব্বকার সিদ্ধান্ত বা সাধনকে ভুল বলিয়া পরিহার করিতেছি, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে। সেগুলিকে একটু ছাড়াইয়া উঠিতেছি, ইহা মিথ্যা নয়। কিন্তু স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কোনও পুরাতন অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া, আর অসত্য বলিয়া কোনও সাধন সিদ্ধান্তকে বর্জ্জন করা, এক কথা নহে। একদিন শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতাম না। দেশ-প্রচলিত কিম্বদন্তি-প্রতিষ্ঠিত গতানুগতিক বৈষ্ণবধর্ম্মে যে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিতেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি নাই। এই কিম্বদন্তি-প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণ-বস্তুই যে তত্ত্ববস্তু, এখনও ইহা বুঝি নাই। দুনিয়ায় খৃষ্টীয়ান্ অসংখ্য, কিন্তু খৃষ্টতত্ত্বের সন্ধান কয়জনেই বা পাইয়াছে? সেইরূপ এদেশে কৃষ্ণপন্থীও অসংখ্য, কিন্তু ইঁহাদের কয়জনেই বা তত্ত্ববস্তু যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণবস্তু সে কথা বোঝেন বা বুঝিতে চান,—সে জিজ্ঞাসারই উদয় হইয়াছে কৈ? জগতের কোথাও গতানুগতিক পন্থার অনুসরণ করিয়া কেহ তত্ত্ববস্তু লাভ করিতে পারে না। সর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত, মুমুক্ষু সাধকই কেবল তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভে অধিকারী হন। এরূপ সাধক সকল সম্প্রদায়েই—লাখে না মিলয়ে এক। সুতরাং গতানুগতিক বৈষ্ণবসমাজে প্রাকৃতজনে যে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিতেন, এবং আজিও করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকৃত তত্ত্ববস্তুরূপে প্রকাশিত হন নাই ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। এই কিম্বদন্তি-মাত্র-প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা করিয়া আসা, আর শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে বর্জ্জন করাও, এক কথা নহে। যাহাকে জানি নাই, যাহাকে পরখ করিয়া দেখি নাই, দেখিবার প্রেরণা বা অব-সরও পাই নাই, তাহাকে বর্জ্জন করিয়াছিলাম বলিতে পারি না। সুতরাং যে কৃষ্ণতত্ত্বকে বা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তকে অসত্য ও ভ্রান্ত বলিয়া বর্জ্জন করিয়া আসিয়াছিলাম, আজ তাহাকেই আবার সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, এমন বলা যায় না। তবে প্রথম যৌবনে যে ব্রহ্মসিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিয়াছিলাম, ক্রমে ক্রমে তাহাকে ছাড়াইয়া যাইতেছি, এ কথা বলিতে

নাই। কিন্তু সে সিদ্ধান্তের কোনও বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি এমনটা মনে করি না। আমি আজ যাহা বিশ্বাস করিতেছি, ব্রাহ্ম-সমাজের অনেক লোকে তাহা বিশ্বাস করেন না, ইহা জানি। কিন্তু আর দশজনে কোনও মত বা সিদ্ধান্তকে সত্য মনে করে বলিয়া, তাহাদের কথায় আমি কোনও দিনই তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি নাই। লোকমতের মুখা-পেক্ষী হইয়া, প্রচলিত সংস্কারের আনুগত্য স্বীকার করিবার শক্তি বিধাতা আমায় দেন নাই। সে সাধন আমার নাই। এ শক্তি ও এ সাধন থাকিলে, পিতৃদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী হইয়া, প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া, সারাজীবন শোথের শেয়ালার মতন ভাসিয়া বেড়াইতাম না। যৌবনাবধি আপনার স্বাভি-মতের উপরে নির্ভর করিয়াই নিজের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও ধর্ম্মসাধনকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার স্বাভিমত যে সত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তখনকার ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের মতামত ও মতিগতির সঙ্গে তার ঐক্য দেখিয়াই, ব্রাহ্ম-সমাজে আসি; দেবেন্দ্রনাথ বা কেশবচন্দ্র, শিবনাথ বা অপর কাহারো আনুগত্য গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের মুখ চাহিয়া, পিতৃদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী হই নাই। যে স্বানুভূতির স্বাধীনতার খাতিরে পিতার কথা মানি নাই, স্বজনগণের অনুরোধ শুনি নাই, ব্রাহ্মসমাজের নানাদিগ্‌দেশাদাগত সদ্যঃপরিচিত সভ্য-গণের বা আচার্য্যগণের অনুমত বা অনুগত হইয়া চলিবার সুবুদ্ধি সাধন করিয়া, সে স্বানুভূতিকে বিসর্জ্জন দিতে কোনও দিনই পারি নাই। এই জন্য আমার ব্রাহ্মধর্ম্মটা চিরদিনই আমার নিজস্ব বস্তু ছিল, আজিও তাহা আমারই নিজের অন্তরঙ্গ বস্তু হইয়া আছে।

আর ইহাই তো খাঁটি স্বানুভূতির পথ। ব্রাহ্মধর্ম্মে আগম-নিগমের প্রতিষ্ঠা নাই, শাস্ত্র-গুরুর প্রামাণ্য নাই; আছে কেবল এক আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতি। কেবলমাত্র স্বানু-ভূতির উপরে সত্যের প্রামাণ্য বা সাধনের নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, ইহা সত্য। কিন্তু কেবলমাত্র শাস্ত্রের উপরেও এই প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর শুদ্ধ-শাস্ত্রমাত্র-প্রতিষ্ঠিত নিষ্ঠা বালির বাঁধের মতন, অতিশয় দুর্ব্বল; সামান্য সন্দেহের বাত্যামুখে উড়িয়া ঝরিয়া যায়। ইহাতেও প্রকৃত ধর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠে না। হদ্দমুদ্দ এই কোমল শ্রদ্ধাতে লোককে আচারবান্ করিতে পারে মাত্র, কিন্তু সাধক করিতে পারে না। শাস্ত্র যখন তত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশের দ্বারা সার্থক হইয়া, স্বানুভূতির দ্বারা সমর্থিত হয়, তখনই তাহা প্রামাণ্য-মর্য্যাদা লাভ করে। এই জন্যই শাস্ত্র, গুরু ও স্বানুভূতি—এই তিনের একবাক্যতাকেই সত্যের প্রকৃত প্রামাণ্য বলা হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ এ পর্য্যন্ত এই প্রামাণ্যের উপরে আপনার ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ও ধর্ম্মসাধনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। রাজা রাম-মোহন এ চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ প্রকৃতপক্ষে কেবল স্বানুভূতির উপরেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বহুদিন পর্য্যন্ত আমিও কেবলমাত্র স্বানুভূতিকে আশ্রয় করিয়াই চলিয়াছিলাম—এখনও সে আশ্রয় পরিত্যাগ করি নাই। স্বাভিমতের হাত ধরিয়া বিশুদ্ধ সত্যের সন্ধানেই প্রথমে ব্রাহ্ম-

সমাজে আসিয়াছিলাম। কোনও দিনই ব্রাহ্মসমাজের লোকমতকে সেই সত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করি নাই। দেবেন্দ্রনাথের মতকে সংকীর্ণ ও কেশবচন্দ্রের সিদ্ধান্ত ও সাক্ষ্যকে কল্পিত বলিয়া ছাড়িয়া আসিয়া, বিদ্যা-বয়স-সাধন-ও-চরিত্র-গত উৎকর্ষাপকর্ষ-নির্ব্বিশেষে ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ সভ্যের মতামতকে সত্যের প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করাতে, আর কারো ব্রাহ্মধর্ম্ম রক্ষা পাইতে যদি পারে, পারুক; আমার ব্রাহ্মধর্ম্ম রক্ষা পায় বলিয়া বিশ্বাস করি না। প্রথম যৌবনে স্বানুভূতির খাতিরে সনাতন শ্রুতি ও প্রাচীন স্মৃতির প্রামাণ্যকে বর্জ্জন করিয়াছিলাম। আজ শ্রুতি ও স্বানুভূতি উভয়কে ভাসাইয়া দিয়া, পঞ্চাশ ষাট বৎসরের স্মৃতিকে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। যাঁরা এ পথে, এই ভাবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের শুদ্ধতা রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদেরই হাতে রামমোহন-প্রবর্ত্তিত সমাজের অপঘাতমৃত্যু ঘটিতেছে। এ মরণকে যে আলিঙ্গন করিতে চাহে না, সেই যে ব্রাহ্মসিদ্ধান্তকে বর্জ্জন করিতেছে, এরূপ অনুমান সঙ্গত নহে। যেখানে জীবন, সেইখানেই গতি ও বৃদ্ধি। যেখানে বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি, সেইখানেই পরিবর্ত্তন। সুতরাং পরিবর্ত্তনকে ভয় করিলে, মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিতে হয়, অমৃতের পথে চলা যায় না। স্বাভিমতের হাত ধরিয়া, স্বাধীনতার ও সত্যের সন্ধানে, প্রথমযৌবনে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলাম। ক্রমে শুদ্ধ স্বানুভূতির উপরে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয় না দেখিয়া, সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ করিয়া, তাঁরই কৃপায়, ধীরে ধীরে সার্থক শাস্ত্রেরও আশ্রয়লাভ করিতেছি। একদিন ভাবিয়াছিলাম কেবল আমি যাহাকে সত্য ভাবি, তাহাই বুঝি সত্য। এখন দেখিতেছি, আমার স্বাভিমত সত্যের একদিক্ মাত্র প্রকাশিত করে। আমার স্বাভিমতের সত্যাসত্যের কষ্টিপাথর বিশ্বজনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা। এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতারই নামান্তর শাস্ত্র। আর এই শাস্ত্রেরও সত্যাসত্যের কষ্টিপাথর আছে। সে কষ্টিপাথর সাধনাভিজ্ঞতাসম্পন্ন, তত্ত্বদর্শী সদ্‌গুরু। এই তিনের কেহই স্বতন্ত্র ও স্বপর্য্যাপ্ত নহেন। শাস্ত্র গুরুবাক্যকে সপ্রমাণ করে। গুরু শাস্ত্রবাক্যকে সার্থক করেন। আর স্বাভিমত শাস্ত্র ও গুরু উভয়কে সপ্রমাণ করে। গুরু গ্রহণ করিয়া স্বাভিমতকে বর্জ্জন করি নাই, তাহাকে সত্যেতেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। শাস্ত্রকে মর্য্যাদা দিয়া গুরু এবং স্বানুভূতির প্রামাণ্য-মর্য্যাদা নষ্ট করি নাই, বরং দৃঢ় করিয়াছি। যে পথ ধরিয়া প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলাম, সেই পথেই গুরু পাইয়াছি, শাস্ত্র পাইতেছি। কুলগুরু ছাড়িয়া সদ্‌গুরু পাইয়াছি। কুশাস্ত্র ছাড়িয়া সুশাস্ত্র পাইয়াছি। মানস-কল্পনাকে ছাড়িয়া বিশুদ্ধ স্বানুভূতির সন্ধান পাইতেছি। কিম্বদন্তিপ্রতিষ্ঠিত, প্রাণহীন ব্রহ্মোপাসনা ছাড়িয়া, গুরুকৃপায়, অতি অকিঞ্চন এবং অকৃতি হইয়াও, ধীরে ধীরে পরমতত্ত্ব কৃষ্ণতত্ত্বের আভাস পাইতেছি। জীবন মাত্রেই গতিশীল। গতিমাত্রেই পরিবর্ত্তন আনে। বাঁচিয়া থাকিলেই চলিতে হয়। চলিতে গেলেই ঘাটীর পর ঘাটী পার হইয়া যাইতে হয়। নিতান্ত জড়ত্ব প্রাপ্তি না হইলে, জীবনের প্রত্যক্ষ পরিবর্ত্তন-স্রোতের বাহিরে পড়িয়া থাকা সম্ভব হয় না। জীবনে কত

পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আরো কত পরিবর্ত্তন ঘটিবে। জন্মে জন্মে কতভাবে এমনি করিয়া বিবর্ত্তিত হইয়া ফুটিয়া উঠিব। ইহাতে ভয় করি না। ইহাতে লজ্জার বা দুঃখের কথাও কিছুই নাই। তবে যেন খেই হারাইয়া না যাই, কেবল একটুমাত্র চাই।

আর, এক সময়ে নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বের অনুশীলন করিতাম, আজ কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধানে ফিরিতেছি বলিয়া যে খেই হারাইয়াছি এমনও বলা যায় না। কি করিয়া এই নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই, তাহারও একটা ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসের মূলসূত্রটী ধরিয়া বিচার করিলেই, ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে যে এই কৃষ্ণতত্ত্বের কোনও ঐকান্তিক বিরোধ নাই, ইহা বুঝিতে পারা যায়। দেশ-প্রচলিত পূজা-পদ্ধতিতে বহুবিধ সাকার দেবমূর্ত্তির বহুল প্রতিষ্ঠা দেখিয়াই, আমাদের বিচারবুদ্ধি বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। যিনি এই বিশাল বিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, মানুষ আপনার হাতে তাঁহার কোনও প্রতিচ্ছবি গড়িয়া তুলিতে পারে, ইহা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি নাই। এই সাকারোপাসনার বিরুদ্ধেই নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার প্রতিষ্ঠা হয়। তত্ত্ববস্তুর সন্ধানে যাইয়া, ব্রাহ্মসাধারণে নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন নাই; সাকারোপাসনার প্রতিবাদ করিতে যাইয়াই, ইহাকে অবলম্বন করেন। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের মূল নিরাকারবাদ, প্রকৃতপক্ষে নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্ব নহে। দেশপ্রচলিত উপাসনার দেবমূর্ত্তি সকল ঈশ্বর-মূর্ত্তি নহে, কেবল ইষ্ট-মূর্ত্তি মাত্র, এ কথাটা আমরা তখন বুঝি নাই। এখনও অনেকে ইহা জানেন না। ঈশ্বর-তত্ত্ব যে নিরাকার তত্ত্ব, জগতের স্রষ্টা পাতা যিনি, তাঁর যে কোনও হাত পা নাই, হিন্দু এ কথা চিরদিনই জানেন ও বুঝেন। তিনি কখনও ঈশ্বরমূর্ত্তি রচনা করেন নাই। যে মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া হিন্দু পূজা অর্চ্চনাদি করেন, তাহা তাঁর ইষ্ট মূর্ত্তি মাত্র, বিশ্বনিয়ন্তার প্রতিমূর্ত্তি বা প্রতিচ্ছবি নহে। রোমান্ ক্যাথলিক্ খৃষ্টীয়ানের যিশুমূর্ত্তি বাস্তবিকই ঈশ্বরমূর্ত্তিজ্ঞানে পূজিত হন। এইজন্য এই সম্প্রদায়ের খৃষ্টীয়ানেরা নিজেরা মূর্ত্তিপূজা করিয়াও, অপর সম্প্রদায়ের মূর্ত্তিপূজাতে ঈশ্বরের অবমাননা হয় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বিষ্ণুমূর্ত্তির উপাসকেরা ঈশ্বরের অবমাননা করেন, হিন্দু শিবোপাসক কদাপি এরূপ বলেন না। তাঁরা নিজেরাই শিবলিঙ্গের পূজা করেন, কিন্তু তাই বলিয়া যাঁরা অন্য মূর্ত্তির ভজনা করেন, তাঁরা অধর্ম্ম করিতেছেন এমন কখনও ভাবেন না। হিন্দুর উপাসনার বিভিন্ন মূর্ত্তিসকল, ঈশ্বরমূর্ত্তি নহে; ভিন্ন ভিন্ন সাধকের অন্তরে প্রকাশিত, তাঁর বিশিষ্ট সাধনার সিদ্ধমূর্ত্তি মাত্র। এ সকল ইষ্টমূর্ত্তি মূলে ও আদিতে সাধকবিশেষের সমাধির অবস্থায় তাঁহাদের অপরোক্ষানুভূতিতেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে মূর্ত্তি অতিন্দ্রীয়, চিন্ময়, তার বাহিরে কোনও রূপরসাদি থাকে না। সাধক এই অতীন্দ্রিয়প্রত্যক্ষকে, সাধনসৌকর্য্যার্থে, আপনার মানসপটে ধরিয়া রাখিবার জন্য, প্রথমে তার অনুরূপ শব্দাত্মিকা ধ্যানমূর্ত্তি রচনা করেন; এবং ক্রমে তাহাকে আপনার সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সম্ভোগ করিবার জন্য, সাকার দেবমূর্ত্তিরূপে গড়িয়া তোলেন। ইহাই আমাদের দেশের

প্রচলিত মূর্ত্তিপূজার ভিতরকার কথা। ইহারই অর্থ—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা।" এই "রূপ" একজন আর একজনের জন্য গড়িয়া দিতে পারে না। সাধকেরা নিজে আপনাদের সাধনসৌকর্য্যার্থে আপন আপন ইষ্টদেবতার এ সকল মানস-মূর্ত্তি রচনা করেন। এ সকল ঈশ্বরমূর্ত্তি নহে—ইষ্টমূর্ত্তি মাত্র। কিন্তু গতানুগতিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণ করিয়া যাঁরা এই সকল মূর্ত্তির উপাসনা করেন, তাঁরা এ তত্ত্ব জানেন না। আমরাও ইহা জানিতাম না। এই জন্যই এই সকল বাহ্য-পূজার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া, এই সাকারোপাসনার প্রতিকূলে, নিরাকারোপাসনা প্রবর্ত্তিত করি। অর্থাৎ দেশপ্রচলিত সাকা-রোপাসনার বিরুদ্ধে আমরা একটা নিরাকার-বাদেরই প্রতিষ্ঠা করি মাত্র; প্রকৃতপক্ষে কোনও নিরাকারতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করি নাই।

ফলতঃ শঙ্করবেদান্ত-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মতত্ত্বই একমাত্র সত্য নিরাকার তত্ত্ব। সে তত্ত্ব নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ। কেবলমাত্র ব্রহ্মা-ত্মৈকত্বানুভূতির দ্বারা সে নিরাকার তত্ত্বকে ধরিতে পারা যায়। কোষপঞ্চক যতক্ষণ না ভেদ হইয়াছে, ততক্ষণ এই অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। এই জন্য ব্রহ্মের স্বরূপো-পাসনাকেই শঙ্করসিদ্ধান্ত একমাত্র সত্য উপাসনা বলিয়া গ্রহণ করেন। সকল ইন্দ্রিয়-চেষ্টা একান্ত নিরস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, এ উপাসনা সম্ভব হয় না। সমাধির অবস্থা লাভ করিলে পরেই কেবল সাধক স্বরূপো-পাসনার অধিকারী হন। এ অবস্থা অতি দুর্লভ। যতদিন না এ অবস্থালাভ হইয়াছে, ততদিন জীব নিম্ন অধিকারের সাধন ভজন করিবে। নিম্নতম অধিকারীর পক্ষে শঙ্করসিদ্ধান্ত প্রতীকোপাসনার এবং মধ্যম অধিকারীর জন্য সম্পদুপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রতীকোপাসনাকে অধ্যাস-জনিত উপাসনা বলে। 'অন্যত্র দৃষ্ট পরত্রাব-ভাসঃ—'কে অধ্যাস বলে। অন্য দেশে ও অন্যকালে যে বস্তু-বিশেষ প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, যে দেশে ও যে সময়ে সেই বস্তু উপস্থিত নাই, সেখানে ও সেকালে অন্য বস্তুকে তার আরোপ করার নাম অধ্যাস। একদিন বনে সর্প দেখা গিয়াছিল। গৃহপ্রাঙ্গণে যে রজ্জু পড়িয়া আছে, তাহাতে সেই সর্পের জ্ঞান আরোপ করিয়া, এই রজ্জুকে সেই সর্প মনে করার নাম অধ্যাস। অন্তরে কোনও দিন ইষ্টদেবতার আভাস পাওয়া গিয়াছিল। সেই পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুকে যে কাষ্ঠলোষ্ট্রে তাহা বস্তুতঃ নাই, তাহাতে আরোপ করাই এই প্রতীকোপা-সনার লক্ষণ। শঙ্করবেদান্ত মতে দেশ-প্রচলিত মূর্ত্তিপূজা এই প্রতীকোপাসনারই অন্তর্গত। নিম্নতম অধিকারীর পক্ষে ইহাই বিহিত। মধ্যমাধিকারীর পক্ষে বেদান্ত সম্পদুপাসনার বিধান দিয়াছেন। সম্পদুপাসনা সম্পদ-জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। দুই বস্তুর মধ্যে কোনও সামান্য ধর্ম্ম দেখিয়া, ক্ষুদ্রতর ও আয়ত্তাধীন বস্তুর সাহায্যে বৃহত্তর ও অনায়ত্ত বস্তুর যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকেই সম্পদ্‌জ্ঞান কহে। পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মতন গোল —এই ভৌগোলিক জ্ঞানকে সম্পদ্‌জ্ঞান বলা যাইতে পারে। যেমন পৃথিবীর ও কমলালেবুর মধ্যে একটা সামান্য ধর্ম্ম আছে, সেইরূপ সূর্য্যের সঙ্গে ব্রহ্মবস্তুরও একটা সামান্য ধর্ম্ম আছে। সূর্য্য স্বপ্রকাশ—আর কিছুর দ্বারা সূর্য্যকে

দেখা যায় না। আর সূর্য্য জগৎপ্রকাশক—আপনি প্রকাশিত হইতে যাইয়াই জগৎকে প্রকাশিত করেন, জগৎকে প্রকাশিত করিতে যাইয়াই আপনিও প্রকাশিত হয়েন। স্বপ্রকাশত্ব ও জগৎপ্রকাশকত্ব সূর্য্যের ধর্ম্ম। ইহা ব্রহ্মেরও ধর্ম্ম। চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মও স্বপ্রকাশ ও জগৎপ্রকাশক। সুতরাং সূর্য্যের সঙ্গে ব্রহ্মের এই সামান্যধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া, প্রত্যক্ষ সূর্য্য গ্রহের ধ্যানযোগে ব্রহ্মোপাসনা করা সম্পদুপাসনা। মধ্যম অধিকারীর জন্য বেদান্ত এই জাতীয় উপাসনারই বিধান করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাকে স্বরূপ-উপাসনা বলা যায় না। স্বরূপ-উপাসনায় সকল ইন্দ্রিয়-চেষ্টা একান্তভাবে নিরস্ত হইবে। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনায় তাহা হয় না। বাক্য এই উপাসনার বাহন। উপমান ও অনুমান এই উপাসনার প্রাণ। উপমান ও অনুমান সম্পদ্-জ্ঞানেরই আশ্রয়, স্বরূপজ্ঞানের ভিত্তি নহে। ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত উপাসনাকে সম্পদু-পাসনাই বলা যায়। এই উপাসনায় ইষ্ট দেবতার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি রচিত হয় না বটে. কিন্তু বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি সর্ব্বদাই রচিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত নিরাকারতত্ত্ব অবাঙ্মনসোগোচর। সে তত্ত্বকে বাক্যমনের গোচরীভূত করিতে গেলেই আর তার নিরাকারত্ব থাকে না। ব্রাহ্ম-সমাজের বাঙ্ময়ী উপাসনা ও নিরাকার ব্রহ্মেতে মানসধর্ম্ম আরোপ করিয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে অধ্যাসও আছে। এ-ও সত্য-উপাসনা নহে। প্রচলিত তথাকথিত সাকারোপাসনার আশ্রয় ইষ্টদেবতার চক্ষুগ্রাহ্যরূপ; প্রচলিত তথাকথিত নিরাকারোপাসনার উপজীব্য রূপ নহে, কিন্তু রূপক। রূপ আর রূপকে যে পার্থক্য, হিন্দুসমাজের মূর্ত্তিপূজাতে আর ব্রাহ্মসমাজের মামুলী নিরাকার উপাসনায় সেই পার্থক্য মাত্র রহিয়াছে। মূলে দু'এর মধ্যেই অধ্যাস অর্থাৎ যাহা উপস্থিত নাই, তার আরোপ আছে।

প্রকৃত নিরাকারতত্ত্ব আর নির্গুণতত্ত্ব একই কথা। যাহা নিরাকার, তাহাই নির্গুণ. তাহাই নির্ব্বিশেষ। ভেদপ্রতিষ্ঠা করাই, আকারের মুখ্য ধর্ম্ম। আকাশবস্তু ত নিরা-কার। কিন্তু যখনই এই আকাশ ভিন্ন ভিন্ন আধারে আবদ্ধ হইয়া পরিচ্ছিন্ন ভাব ধারণ করে, তখনই তাহা ঘটাকাশ, পটাকাশরূপে সাকার হইয়া পড়ে। এইরূপ ব্রহ্মবস্তু যখনই জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হন, তখনই বিশিষ্ট হইয়া, নিরাকারধর্ম্ম হারাইয়া ফেলেন। ব্রহ্ম যদি আমা হইতে একান্ত ভিন্ন হন, তাহা হইলে. আমার আমিত্বের সীমাই তাহাকে সীমাবদ্ধ ও সাকার করিয়া তোলে। কোনও বিশিষ্ট গুণ আরোপ করিলেও অপর বিরুদ্ধগুণ হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া, সেই সকল বিরুদ্ধগুণের দ্বারাই তিনি পরিচ্ছিন্ন ও সাকার হইয়া পড়েন। এই জন্যই, এ সকল অসঙ্গতি নিরাকৃত করিতে যাইয়া, বেদান্ত ব্রহ্মবস্তুর নিরাকারত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার নির্গুণত্ব, নির্ব্বিশেষত্ব এবং অদ্বৈত-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শঙ্করসিদ্ধান্তের এই অদ্বৈততত্ত্বই একমাত্র সাচ্চা নিরাকার-তত্ত্ব। অপর যাবতীয় নিরাকারবাদ আছে, তাহা সত্য নয়, সত্যাভাস মাত্র।

ব্রাহ্মসমাজের নিরাকারবাদও তাহাই। বিশুদ্ধ নিরাকারতত্ত্বের অনুশীলন করিলে ব্রাহ্মসাধককে পরিণামে শঙ্করবেদান্তের শুদ্ধা-

দ্বৈত সিদ্ধান্তে যাইয়া পৌঁছিতে হয়। আর আপনার সম্প্রদায়ের এই নিরাকারতত্ত্বের অপূর্ণতা ও অসঙ্গতি উপলব্ধি করিয়া, ভক্তি-পন্থার অনুসরণ করিলে, তাঁহাকে পরিণামে বৈষ্ণববেদান্তের অচিন্ত্য ভেদাভেদ সিদ্ধান্তে যাইয়া সকল জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিতেই হইবে। ইহা ছাড়া ব্রাহ্ম সাধকের সম্মুখে আর তৃতীয় গতি নাই। ব্রাহ্মসমাজের মূল সিদ্ধান্ত ও সাধনার সঙ্গে একদিকে শঙ্করসিদ্ধান্তের অন্য দিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের উভয়েরই কোনও ঐকান্তিক বিরোধ বা প্রকৃত অসঙ্গতি নাই। জ্ঞানপ্রধান ব্রাহ্ম সাধককে শঙ্কর-বেদান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। ভাবপ্রধান ও ভক্তিপ্রবণ ব্রাহ্ম সাধককে সেইরূপ বৈষ্ণব-বেদান্তের শরণাপন্ন হইতেই হইবে। আযৌবন যে ব্রাহ্মসিদ্ধান্তের ও ব্রাহ্মসাধনের অনুসরণ করিয়াছি, তাহার সঙ্গে প্রকৃত বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ও সাধনার কোনও ঐকান্তিক বিরোধ আছে বলিয়া বুঝি না। বরং ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া, লোকমতের মুখাপেক্ষী না হইয়া, যে ব্রাহ্মই আপনার সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মসাধন করিবেন, তাঁহাকেই ইহ জনমে না হউক আর জনমে, কৃষ্ণতত্ত্বের সাক্ষাৎকার পাইয়া, কৃষ্ণভজনা করিতেই হইবে, এই বিশ্বাসই দৃঢ় হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে যতটুকু খাঁটি সত্য আছে, তার সঙ্গে শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের কোনও বিরোধ বা অসঙ্গতি নাই ও থাকিতেই পারে না।

ফলতঃ এ জগতে সত্যে সত্যে কোথাও কোনও বিরোধ নাই। কখনও কোনও বিরোধ সম্ভবে না। যাহা আছে তাহাই সত্য, এ সত্যের দুই পথ, এক ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, আর এক অতীন্দ্রিয় অপরোক্ষানুভূতি। এ ছাড়া সত্যলাভের আর তৃতীয় পন্থা নাই। ব্যবহারিক সত্য ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের, আর পারমার্থিক সত্য আত্ম-সাক্ষাৎকারের উপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই দুই জাতীয় সত্যই অপরোক্ষ অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়। আমাদের এই অপরোক্ষ অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাধীনে বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু কদাপি অসত্য হইতে পারে না। অসত্যটা সর্ব্বত্রই কল্পনার সৃষ্টি; যেখানে যে বস্তু বা যে ভাব নাই, কেবল কল্পনাই সেখানে তাহার আরোপ করিয়া অসত্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই কল্পনা আমাদের মনোবৃত্তিকে নিয়তই আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। এই জন্যই আমরা, যাহা দেখি, সর্ব্বদাই তার চাইতে ঢের বেশী ভাবিয়া লই। যতটুকু সত্য বা বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বা আত্মসাক্ষাৎ-কারের বিষয়ীভূত হয়; আমরা সর্ব্বদাই আমাদের এই কল্পনাবলে তাহাকে ছাড়াইয়া গিয়া আপন আপন মনগড়া সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি। আর আমাদের এইরূপ মনগড়া সিদ্ধান্ত সকলই দুনিয়ায় যত গোল বাধাইয়া তোলে।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের "অন্ধের হস্তি-দর্শন ন্যায়"—এই কথাটাকেই অতি সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে। হাতী জন্তুটা কেমন, এই কথাটা জানিবার জন্য অন্ধেরা হাতীর নিকট যাইয়া প্রত্যেকে তার একটা একটা অঙ্গ পরীক্ষা করিয়া আসিল। একজন হাতীর কান ধরিয়া আসিল, আর একজন তার শুঁড়ে হাত বুলাইয়া আসিল, আর একজন তার পায়ে ধরিয়া আসিল। হাতীর

কানটা যে কুলার মতন, শুঁড়টা যে অজগর সাপের মতন, পা' টা যে থামের মতন, ইহা মিথ্যা নয়। কিন্তু কান, শুঁড়, পা তো আর গোটা হাতী নয়। অন্ধেরা সে গোটা হাতীকে তো জানিতেও পারে নাই। তারা তার কেবল একটা একটা অঙ্গের জ্ঞানই লাভ করিয়াছিল; অথচ আপন আপন কল্পনা-বলে সেই অঙ্গকেই অঙ্গী ভাবিয়া লইয়া পরস্পরের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা বাধাইয়া দিল। যতটুকু ইহারা সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু যতটুকু কল্পনা করিয়াছিল, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। ইহারা যদি কেবল আপন আপন প্রত্যক্ষ সত্যটুকুরই প্রতিষ্ঠা করিতে যাইত, কোনও গোলই বাধিত না। হাতীর কানটা কুলার মতন বলিয়া তার শুঁড়টা যে অজগরের মতন বা তার পা'টা যে থামের মতন নয় বা হইতে পারে না, —এমন কোনও কথা নাই। ইহারা যতটুকু নিজেরা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তার মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না। বিরোধ বাধিয়া উঠিল, তাদের কল্পিত মনগড়া হাতীগুলোকে লইয়া। আপন আপন কল্পনাকে সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়াই ইহারা পরস্পরের সঙ্গে এই মারামারিটা বাধাইয়াছিল।

মানুষ ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মসাধন লইয়া এ জগতে যে মারামারি কাটাকাটি করে, তাহাও এই অন্ধের হস্তিদর্শন ন্যায়েরই মতন। ধর্ম্মবস্তু বিরাট্‌, ভূমা অনন্ত। এ বস্তু সার্ব্বভৌমিক, বহুমুখী। বহুভাগ্যবলে মানুষ এই বিরাট্‌ তত্ত্বের কণামাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ কণামাত্র ধর্ম্মকেই সে সম্পূর্ণ ধর্ম্ম বলিয়া অপর সকলের উপরে জাহির করিতে যায়। ইহাতেই যত গোল বাধে। আর বস্তু-বিশেষের অংশ বা অঙ্গ মাত্র প্রত্যক্ষ করিয়া সেই অংশ বা অঙ্গকেই সম্পূর্ণ অংশী বা অঙ্গিরূপে গ্রহণ করা মানস-কল্পনারই ধর্ম্ম। ধর্ম্মজগতে এই সকল মনগড়া সিদ্ধান্ত ও মানস-কল্পনা লইয়াই মানুষ পরস্পরের সঙ্গে এত বাক্‌বিতণ্ডা ও মারামারি কাটাকাটি করিয়া থাকে। ফলতঃ কি ব্যবহারিক জগতে কি পারমার্থিক রাজ্যে কোথাও প্রকৃত সত্যে সত্যে কোনও বিরোধ বা অসঙ্গতি নাই—থাকিতেই পারে না।

অতএব আধুনিক ব্রাহ্মসমাজের সিদ্ধান্তে যতটুকু খাঁটি সত্য আছে, অর্থাৎ এ সিদ্ধান্তের যেটুকু ব্রাহ্মগণের নিজেদের প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ সাধন-অভিজ্ঞতা হইতে জন্মিয়াছে,—বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের খাঁটি সত্যের ও বৈষ্ণব-সাধনার প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ সাধন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার ভেদ থাকা সম্ভব, বিরোধ হওয়া অসাধ্য। কিন্তু ভেদ আর বিরোধ যে একই কথা নয়, এ কথাটাও আমরা সকল সময় মনে করিয়া রাখি না।

ব্রাহ্মসমাজের মতের কতকগুলি ভাবাত্মক আর কতকগুলি অভাবাত্মক। ব্রহ্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধনের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ও নিশ্চিত লক্ষণ আছে; আর কতকগুলি লক্ষণ, অপরাপর ধর্ম্মের সিদ্ধান্তে ও সাধনে যার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নাই ও থাকিতে পারে না;—ব্রাহ্মগণ ইহাই বিশ্বাস করেন। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলিকে ভাবাত্মক বা "হাঁ"-বাচক বলা যাইতে পারে; শেষোক্ত লক্ষণগুলি অভাবাত্মক বা "না"-বাচক। ব্রাহ্ম-সিদ্ধান্তের "হাঁ" বাচক কথাগুলি এই :—

(১) ঈশ্বর আছেন। এই ঈশ্বর বিশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনাদি ও অনন্ত ব্রহ্ম; তিনি অমৃতনিকেতন, শান্তস্বভাব, মঙ্গলসংকল্প, নিষ্কাম, অপাপবিদ্ধ, এবং একমেবাদ্বিতীয়।

(২) এই ঈশ্বর জীবের অন্তরে বাস করেন; তিনি অন্তর্য্যামী পুরুষ এবং জীবের নিত্য-উপাস্য।

(৩) মৃত্যুতে মানুষের দেহই নষ্ট হয়, কিন্তু তার আত্মবস্তু অবিনশ্বর ও অমর।

(৪) এই ঈশ্বরতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব উভয় তত্ত্বই মানবের আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ অর্থাৎ তাহার সহজজ্ঞান বা ইনটুইষণের দ্বারাই মানুষ এ সকল তত্ত্বকে প্রত্যক্ষবৎ জানিতে পারে।

এই গুলিই ব্রাহ্মসমাজের ভাবাত্মক বা হাঁ-বাচক সিদ্ধান্ত। ব্রাহ্মসাধক ও আচার্য্যগণ এগুলিকে আপনাদের আন্তরিক অনুভূতির দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিম্বা যাঁহারা সাধনবলে পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে এ সকল তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সাক্ষ্যকে আপন আপন বুদ্ধি-বিচার সম্মত দেখিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল মত জগতের উন্নত ধর্ম্মমাত্রেই সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। খৃষ্টীয়ান্, মুসলমান্, শাক্ত, বৈষ্ণব, ইহুদী, প্রভৃতি সকল প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ই এ সকল মতে বিশ্বাস করেন। এমন কি এগুলিকে ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট মতও বলা যায় না। এগুলির দ্বারা অপরাপর ধর্ম্মসমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ফলতঃ ব্রাহ্মসমাজের "হাঁ"-বাচক বা ভাবাত্মক কোনও বিশিষ্ট মত নাই। ঈশ্বর-বিশ্বাস খৃষ্টীয়ানের বিশেষত্ব নহে; যিশুখৃষ্টে বিশ্বাসই খৃষ্টীয়ান্‌কে বিশিষ্ট করিয়াছে। ঈশ্বর-বিশ্বাস মুসলমানেরও বিশেষত্ব নহে; হজরত মোহম্মদকে ঈশ্বরের প্রেরিত প্রবক্তারূপে গ্রহণ করিয়াই, মুসলমান্ আপনার ধর্ম্মবিশ্বাসকে বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ এইরূপ কোনও "হাঁ"-বাচক বা ভাবাত্মক সিদ্ধান্ত বা বিশ্বাসকে আশ্রয় করিয়া, জগতের ধর্ম্মসমাজে কোনও প্রকারের বিশিষ্টতা লাভ করেন নাই। অভাবাত্মক প্রত্যয়ে, "না"-বাচক সিদ্ধান্তেই ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মসমাজের "না"-বাচক মত ও বিশ্বাসগুলি এই:—

(১) ঈশ্বরের কোনও অবতার নাই।

(২) কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র ভ্রান্তিশূন্য কিম্বা সত্যের একমাত্র ও অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রামাণ্য নহে।

(৩) কোনও ধর্ম্মোপদেষ্টা বা গুরু ঈশ্বরের শক্তি ও স্বভাবসম্পন্ন এবং ভ্রান্তিশূন্য হইতে পারেন না।

(৪) দেশকালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্ত্তি ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি হইতে পারে না।

(৫) কোনও মানুষকে বা অপর কোন সৃষ্টপদার্থকে, কিম্বা মানবহস্তরচিত কোনও পট বা মূর্ত্তি প্রভৃতিকে ঈশ্বর-জ্ঞানে ভজনা করা কর্ত্তব্য নহে।

এই অভাবাত্মক মতগুলিতেই, বস্তুতঃ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব। এইগুলির দ্বারাই বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের মধ্যে ব্রাহ্মসম্প্রদায় বিশিষ্ট হইয়াছেন। আর অভাবাত্মক সিদ্ধান্ত মাত্রেই দ্বিবিধ ভিত্তির উপরে গড়িয়া উঠিতে পারে; কতকগুলি "না"-বাচক সিদ্ধান্ত মানবজ্ঞানের মূলপ্রকৃতি হইতেই প্রকাশিত হয়। মানবজ্ঞানের এই মূল প্রকৃতিকে ইংরেজিতে necessity of thought বলে। এই neces-

sity of thought হইতে যে সকল অভাবাত্মক সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। যেমন যাহা সান্ত তাহা অনন্ত হইতেই পারে না। যাহা দেশে আবদ্ধ তার দৈর্ঘ্যপ্রস্থাদিধর্ম্ম বা extension থাকিবেই থাকিবে। যাহা কালেতে প্রকাশিত তার পৌর্ব্বাপর্য্য বা succession না থাকিয়াই পারে না। এই "না"-বাচক সিদ্ধান্তগুলি মানব-জ্ঞানের মূল প্রকৃতির বা necessity of thought-এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অপ্রত্যক্ষ তত্ত্ব হইলেও, এ সকলের প্রামাণ্য প্রত্যক্ষবৎই প্রবল। এ ছাড়া আর যত কিছু অভাবাত্মক বা "না"-বাচক সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হয় তৎসমুদায়ই অনুমানের উপরে গড়িয়া উঠে। যাহা প্রত্যক্ষ তাহা হইতে যুক্তিপরম্পরা আশ্রয় করিয়া যাহা প্রত্যক্ষ হয় নাই, তার সম্বন্ধে কোনও সত্য মিথ্যা ধারণা করিয়া লওয়াই অনুমানের কার্য। অনুমান সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষের বাহিরে চলিয়া যায়। অন্ধের হস্তিদর্শন ন্যায় এই অনুমানের প্রভাবই প্রচার করিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের অভাবাত্মক বা "না"-বাচক মতামতগুলি হয় necessity of thoughtএর উপরে প্রতিষ্ঠিত, না হয় কেবল অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। Necessity of thought এর উপরে প্রতিষ্ঠিত, অপ্রত্যক্ষ সিদ্ধান্তও প্রত্যক্ষবৎই প্রবল হয়। এ জাতীয় সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধেরই মতন। এগুলিকে বর্জ্জন করা অসাধ্য।

ব্রাহ্মসমাজের "না"-বাচক সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন্‌গুলি necessity of thought এর উপরে প্রতিষ্ঠিত আর কোন্‌গুলি কেবল অনুমান-প্রতিষ্ঠ; ইহার বিচার করিলেই, শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ব্রাহ্মসিদ্ধান্তের বিরোধী কি না, আর বিরোধী হইলে, কোন্ স্থানে, কি বিষয়ে বাস্তবিক এ বিরোধ বাধে, এ সকল কথা পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

বারান্তরে এই বিচারে প্রবৃত্ত হইবার বাসনা রহিল।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

দুর্ভাগ্যের কাহিনী

(১)

গভীর রাত্রে জীনের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

এইখানে জীন ভ্যালজীনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। জীন ব্রাই গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে; বাল্যে লেখাপড়া কিছুই শিখে নাই, বড় হইয়া সে কাঠুরিয়ার ব্যবসা অবলম্বন করে। স্নেহপ্রবণচিত্ত ব্যক্তির ন্যায় সে কতকটা ভাবুক গোছের ছিল। তবে তাহার মুখভাবে অসাধারণত্ব কিছু প্রকাশ পাইত না। শৈশবেই তাহার পিতামাতার মৃত্যু হয়—মাতা চিকিৎসাবিভ্রাটে সূতিকাগারে মারা যান, পিতা কাঠুরিয়া ছিলেন—বৃক্ষ হইতে পতনে তাঁর মৃত্যু ঘটে। সংসারে থাকিবার মধ্যে তার একমাত্র ভগ্নী ছিল। স্বামীর জীবদ্দশা পর্য্যন্ত সে তাহাকে 'মানুষ' করে;

স্বামীর মৃত্যুর পর কিন্তু সাতটি পুত্র-কন্যা লইয়া সে ভ্রাতার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। ছেলে-মেয়েরা সবাই ছোট বড়টি আট বৎসরের, সর্ব্ব-কনিষ্ঠটি একবৎসরের দুগ্ধপোষ্য শিশু। জীনের বয়স তখন পঁচিশ! কর্ত্তব্যের খাতিরে সে নিরাশ্রয়া বিধবা ভগ্নীর ভার গ্রহণ করিল। এপর্য্যন্ত তাহার বিবাহ হয় নাই,—যৌবনকাল তাহার কঠোর পরিশ্রমে অতি কষ্টে কাটিতে-ছিল, তাহার মধ্যে প্রেমের অবকাশ ছিল না, প্রণয়িনীও তাহার কেহ ছিল না।

সমস্তদিন প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর অবসন্ন-ভাবে গৃহে ফিরিয়া কাহারও সহিত কথা না কহিয়া সে সকলের সহিত একত্রে আহারে বসিত। ভগ্নী প্রায়ই তাহার খাবারের উৎকৃষ্ট-তম অংশ আপন পুত্রকন্যাদের বণ্টন করিয়া দিতেন,—ঝোলের আলু, মাছের মুড়া প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে তাহার থালি হইতে অন্ত-হিত হইত—জীন দেখিয়াও দেখিত না, থালির সহিত মুখ গুঁজিয়া একমনে আহার করিয়া যাইত। কিন্তু তবুও সে বুভুক্ষু শিশুদের ক্ষুধা মিটিত না; খাবারের জন্য সর্ব্বদাই তাহারা চীৎকার করিত!—জীনের বাড়ী হইতে কতকদূরে এক গোয়ালাবাড়ী ছিল—সেইখানে যাইয়া তাহারা জননীর নাম করিয়া দুগ্ধ চাহিয়া লইত, তারপর পথিমধ্যে আসিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া সে দুগ্ধ কতক পান করিত,—কতক ফেলিয়া দিত। ভগ্নী এ কথা জানিলে বিপর্য্যয়-কাণ্ড বাধাইবে ভাবিয়া জীন তাহার অজ্ঞাত-সারে গোয়ালিনীকে সে দুগ্ধের দাম দিয়া দিত, —ছেলেমেয়েরাও জননীর ক্রোধ হইতে অব্যাহতি পাইত। এইরূপে বৎসর দুই চলিল।

কাজ যখন ভাল চলিত তখন সে প্রতিদিন ১৮ সুস করিয়া উপার্জ্জন করিত, অন্য সময় মোটঘাট বহিয়া, কৃষাণদের সহিত মাঠে খাটিয়া কোনরূপে চালাইত। কিন্তু তাহাতে আর কত আসে?—তার সে সামান্য উপার্জ্জনে একা সে নয়জনের ক্ষুন্নিবৃত্তি কি করিয়া করে? দিনে দিনে দুর্দ্দশার চরমসীমায় তাহারা উপ-নীত হইতে লাগিল। তার উপর প্রচণ্ড শীত আসিয়া পড়িল;—কাজ আর মেলে না। ঘটিবাটি যাহা ছিল একে একে বিক্রয় করিয়া কয়দিন চলিল,—শেষে একদিন একেবারে অচল হইয়া পড়িল; তৈজসপত্রও কিছুই নাই, ঘরে একটুকরা খাবার নাই, প্রাতঃকাল হইতে সাতটি শিশু অনাহারে চীৎকার করিতে লাগিল। সমস্তদিন ধরিয়া জীন সে বুভুক্ষুর কাতর আর্ত্তনাদ শুনিল, শেষে সন্ধ্যার সময় উন্মত্তের ন্যায় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল।

রুটিওয়ালা মাবার্ট ইসাবু সমস্তদিনের খরিদ-বিক্রয়ের হিসাবপত্র মিলাইয়া ভিতর হইতে দোকান বন্ধ করিয়া শুইতে যাইবে—এমন সময় হঠাৎ বাহিরের জানালার কাঁচখানা ঝন্-ঝন্ শব্দে ভাঙ্গিয়া গেল; তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দোকানঘরে ঢুকিয়া সে দেখিল ভাঙ্গা কাঁচের মধ্য দিয়া একখানা হাত টেবিলের উপরে সাজানো রুটীর স্তূপ হইতে একখানা রুটি লইয়া অন্তহিত হইতেছে। চোর চোর বলিয়া সে পশ্চাদ্ধাবিত হইল; চোরও ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল, কিন্তু অবশেষে ধরা পড়িল; রুটিখানা আসিতে আসিতে পথে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেও, তাহার হাত হইতে তখনও রক্ত ঝরিতেছিল। সে চোর—জীন ভ্যালজিন!

এ ঘটনা ১৭৯৫ খৃঃ ঘটে। 'বসন্ত'-বাটীতে রাত্রে ডাকাতি করার অভিযোগে অভি-

যুক্ত হইয়া জীন ফায়য়াসোপর্দ্দ হইল। বিচারে, পাঁচ বৎসর ধরিয়া কঠোর পরিশ্রমের সহিত তাহার কারাদণ্ডাজ্ঞা হইল।

নির্ম্মম শাসন-পাশ,—সভ্যতার পরিহাস!—কি যে ভয়ানক ক্ষণ, যখন দণ্ডবিধি আইন বৈতরণীর অতল জলে মানবতরণীখানি ডুবাইয়া দেয়! কি সে শোচনীয় মুহূর্ত্ত, যখন সমাজ, ভাবচিন্তাপূর্ণ মানববিশেষকে চিরদিনের মত আপনার ক্রোড় হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেয়!

১৭৯৬ খৃঃ ২২ শে এপ্রিল তারিখে যেদিন সমগ্র প্যারিসবাসী নেপোলিয়নের মনটেণ্ট নামক যুদ্ধজয়ের সম্বাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল,—সেই দিন বহুসংখ্যক আসামী পরস্পর সংযুক্ত লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া গ্যালি যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইল। জীনও তাহার মধ্যে ছিল। কামার যখন তাহার লৌহ গলাবন্ধটা পশ্চাদিকে প্রেক দিয়া আঁটিতেছিল, তখন হতভাগ্য দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া ফুকারিয়া উঠিল—"ওরে আমি ত চোর নই, আমি যে কাঠুরে জীন রে!"— তারপর কাঁদিতে কাঁদিতে দক্ষিণ হাতখানি তুলিয়া ধীরে ধীরে সাতবার নামাইয়া, যেন সাতটি অসম মস্তক স্পর্শ করিল। লোকে বুঝিল,—সাতটি শিশুর পোষণের জন্তই তার যা কিছু অপরাধ!

বসিয়া বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল। ভবিষ্যতের ভীষণ ছবি তাহার মানস-চক্ষে ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে কাতর করিয়া তুলিতে লাগিল। নিরক্ষর অশিক্ষিত সে, অপরাধের অনুপাতে দণ্ড গুরুতর হইয়াছে বলিয়াই যদি সে ভাবে, তাহা হইলে আমরা তাহাকে দোষ দিতে পারি না।

সাতাইশ দিন গো-যানে শৃঙ্খলের ভার বহন করিয়া অবশেষে জীন তুলঁতে আনীত হইল। সেখানে বন্দীদের লাল কোর্ত্তা পরিয়া সংসারের সহিত তাহার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল, তাহার পরিচয়জ্ঞাপক নাম পর্য্যন্ত রহিল না;—এখন হইতে তার নূতন পরিচয়—নং ২৪৬০১ মাত্র। তাহার ভগ্নী কোথায় রহিল? সে সাতটি শিশুর কি হইল? কে তাহার সন্ধান রাখে? তরুর মূল যখন কুঠারাঘাতে ছিন্ন হয়, তখন তাহার মুষ্টিমেয় পত্রগুলির পরিণাম সন্ধান কে করিয়া থাকে?

সেই পুরাতন কাহিনী!—'ন পিতা ন মাতা ন বন্ধু' ভগবানের সে জীব কয়টি একে একে আপনাপন অদৃষ্ট-তমসায় মাঝে ডুবিয়া গেল। একমাত্র কোলের শিশুটি লইয়া জননী এক দপ্তরীর বাড়ীতে সামান্ত কাজ জুটাইয়া অতিকষ্টে উভয়ের গ্রাসাচ্ছাদন করিতে লাগিল। শেষরাত্রি হইতেই তাহাকে কার্য্যে যোগ দিতে হইত, পুত্র বাহিরে পড়িয়া থাকিত; অধ্যক্ষ বলিতেন—"ছেলে নিয়ে কি কাজ হয় বাছা! তা হলে অন্ত জায়গা দেখ।" তীব্র হিমে বাহিরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শিশু কাঁপিতে থাকিত, তারপর বেলা সাতটার সময় পাঠশালা খুলিলে সেখানে যাইয়া বসিত।—নূতন এক কয়েদীর মুখে জীন একদিন এ সব শুনিল। তাহার প্রিয়ধনগুলিকে অন্তর্হিত করিয়া যে যবনিকা পতিত ছিল, সহসা মুহূর্ত্তের জন্ত তাহা অপসৃত করিয়া তাহাদের ভাগ্যলেখা-চিত্র কে যেন তাহাকে দেখাইয়া দিল। তারপর পুনরায় সব অন্ধকারে আবৃত হইল;—ইহজীবনে জীন আর সে যবনিকার অন্তরাল দেখিতে পায় নাই। কারা-

বাসের চতুর্থ বৎসরের শেষে একদিন তাহার পলায়ন সুযোগ ঘটিল। কয়েদীদের মধ্যে এ বিষয়ে পরস্পর সহানুভূতি খুব বেশী থাকে; অন্য কয়েদীদের সাহায্যে পলাইয়া, জীন দুই দিন দুই রাত্রি ধরিয়া স্বাধীনভাবে বনে বনে ঘুরিল। কিন্তু সে কি স্বাধীনতা!—বন্যপশুর ন্যায় বন হইতে বনান্তরে বিতাড়িত হওয়া; 'পতত্রিপতত্রে বিচলিতপত্রে' নিত্য সশঙ্কিত হইয়া ওঠা; পথিকের পদশব্দে, কুকুরের ডাকে, প্রতি বনে কণ্টকগুল্মে অনুসরণকারীর কথা ভাবিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া ওঠা—ইহাকে যদি স্বাধীনতা বল তবে সে দুইদিনের জন্য সে স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়াছিল। ক্ষুধার্ত্ত, ক্লান্ত, অবসন্নশরীর জীন পরদিন ধৃত হইল,—তখনও তার উদরে বিন্দুপরিমাণ জলও যায় নাই। বিচারে তাহার আরও তিন বৎসর কারাদণ্ড হইল। ষষ্ঠবর্ষের শেষে পুনরায় সে পলাইল,—প্রহরীরা একটা জাহাজের তক্তার তলদেশ হইতে তাহাকে টানিয়া বাহির করিল,—প্রাণপণ শক্তিতে তাহাদের সহিত যুঝিয়াও সে উদ্ধার পাইল না। এবার অপরাধ গুরুতর—পলায়ন ও প্রহরীদের বাধাপ্রদান।—দণ্ডের কাল আরও পাঁচবৎসর বৃদ্ধি পাইল,—তন্মধ্যে ডবল শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় দুই বৎসর। দশ বৎসরের শেষে, পুনরায় পলায়ন চেষ্টার ফলে আরও তিন বৎসর। এই ১৩ বৎসর। আরও একবার সে পলাইয়া ঘণ্টা চারেক পরে ধৃত হয়; সেই চারি ঘণ্টার জন্য পুনরায় তিন বৎসর। একুনে ১৯ বৎসর। ১৮১৫ খৃঃঅব্দে সে কারামুক্তি পায়, ১৭৯৬ খৃঃ একখানি রুটী চুরির অপরাধে সে প্রথম কারাপ্রবেশ করে।

এইখানে বলিয়া রাখি, এ ঘটনা কাল্পনিক নহে,—ইহা বাস্তব; জীবন্ত সত্য। অহরহঃই ইহা ঘটিতেছে। দণ্ডবিধি আইন সম্বন্ধে আলোচনার ফলে গ্রন্থকার আরও একস্থলে আর এক হতভাগ্যের অদৃষ্টে ঠিক ইহারই প্রতিচ্ছায়া দেখিয়াছিলেন। ইংরাজী অপরাধীদিগের সম্বন্ধে আলোচনার ফলে জানা যায় যে ইংলণ্ডে শতকরা আশিটা চুরি খাদ্যাভাবেই ঘটিয়া থাকে।

দারুণ নিরাশায় অশ্রুসিক্ত চক্ষে জীন গ্যালিতে প্রবেশ করিয়াছিল; ১৯ বৎসর পরে যখন সে বাহির হইয়া আসিল, তখন তাহার অন্তঃকরণ—নীরস, কঠোর, দয়ামায়ার লেশমাত্র বর্জ্জিত।

৮

জীনের প্রকৃতি যথার্থ কি ছিল?

দুর্ভাগ্যের বিষয় সমাজ এদিকে চাহিয়া দেখে না, অথচ এ সবই তাহারই কীর্ত্তি।

জীন লেখাপড়া কিছুই শিখে নাই সত্য; কিন্তু তা বলিয়া তাহাকে গণ্ডমূর্খ বলা যায় না;—যে সহজাত বুদ্ধি মানবের সাধারণ সম্পত্তি, তাহা তাহারও ছিল। দুর্দ্দিনের শিক্ষায় তাহা বরং ক্রমশই ফুটিয়া উঠিতেছিল। বেত্রাঘাতে, শৃঙ্খলের বন্ধনে, নির্জ্জন কারাবাসে, প্রখর সূর্য্যোত্তাপে, শাস্তিবহনে, পরিশ্রান্তিতে, কাষ্ঠশয্যায় পড়িয়া থাকিয়া,—সব সময়েই সে আপন অন্তরের প্রতি চাহিত,—আর ভাবিত!

সে যেন বিচারক—আপনার অপরাধের পুনর্ব্বিচার করিতেছে। সে যে দোষী, বিনাপরাধে যে তার শাস্তি হয় নাই—সে কথা সে মানিত। চাহিলে হয়ত রুটীখানা সে পাইতে পারিত; অন্ততঃ অপর কোন কাজকর্ম্মের বা কাহারও দয়ার প্রতীক্ষা সে করিতে

প্যারিত।—অনাহারে মরিবার সময় ত তখনও তাহাদের হয় নাই; বিশেষতঃ, বহুদিন ধরিয়া শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিলেও সহজে মানুষের মৃত্যু হয় না;—সুতরাং সব দিক দেখিয়া তাহার ধৈর্য্যধারণ করা উচিত ছিল,—সকল পক্ষেই তাহা হইলে ভাল হইত; তাহার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সমাজের উপর টেক্কা দিতে যাওয়া ভাল হয় নাই। চুরি করিয়া দুঃখ ঘোচে না; অন্ততঃ, অন্নের অভাব অতিক্রম করিতে গিয়া যেখানে কলঙ্কের পঙ্কিল খাদে পড়িতে হয়, সে পথ অবলম্বন না করাই ভাল;—ইত্যাদি।—মোটের উপর জীন আপনার দোষ প্রমাণ করিল।

তারপর সে ভাবিতে লাগিল—এই দুর্দ্দশার জন্য কি একাই সে দায়ী?—কে সে? একজন মজুর মাত্র; পরিশ্রমে ত সে পরাঙ্মুখ নয়, তবে সে কাজ পায় না কেন? আহার্য্য পায় না কেন?—সেটা কার অপরাধ? তার উপর,—না হয় সে-ই দোষী, কিন্তু অপরাধের অনুপাতে তার দণ্ড কি গুরুতর হয় নাই? বিচারের তুলাদণ্ডে দণ্ডের দিকটাই কি ঝুঁকিয়া পড়ে নাই? এ কঠোর দণ্ড না দিলেও কি তার অপরাধ ক্ষালন হইত না? দণ্ডের অত্যাচার কি তার স্বেচ্ছাচারের মাত্রা অতিক্রম করিয়া যায় নাই? অপরাধীকে বন্যপশুর ন্যায় বাঁধিয়া পিষিয়া, প্রতিহিংসা সাধন করিয়া, দণ্ডের মর্য্যাদা কি খর্ব্ব হয় নাই? তার উপর কয়বার তার পলায়নচেষ্টার জন্য এই যে অবশিষ্ট চতুর্দ্দশবৎসরের কারাদণ্ড—এটা কি দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার নয়? ব্যষ্টির উপর সমষ্টির অন্যায় প্রভুত্ব নয়?—এমন কি তার পাপ যে ১৯ বৎসর ধরিয়া তাহাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়?

সমাজ?—সমাজের কি অধিকার যে, সে একই ঘটনার জন্য একজনকে নির্ম্মমভাবে দলিয়া পিষিয়া মারিবে, অথচ জনবিশেষের অপরাধ দেখিয়াও দেখিতে চাহিবে না?—কি তার অধিকার যে অন্নসংস্থানের কোন উপায় না করিয়া দিয়া, নির্ম্মম শাসনপাশে সে মানুষকে বাঁধিতে আসে? অদৃষ্টের বশে যাহারা দীনদরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা করুণার পাত্র; কিন্তু তাহাদের জন্যই কি যত আইনের কঠোরতা?—জীন অনেক বিচার বিতর্ক করিয়া অবশেষে সমাজকে দোষী সাব্যস্ত করিল, এবং প্রতিহিংসাসাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইল; সে বুঝিল তাহার দণ্ড—অবিচার না হোক্, অত্যাচার বটে। ক্রোধটা অনেক সময়ে 'বোকামি' মাত্র,—দোষী লোকেও ধরা পড়িয়া ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে; তবুও এটা ঠিক যে, অন্যায় বিচারের ভাবটা মনে মনে না থাকিলে কেহ কখন নিজেকে নির্য্যাতিত ভাবে না। জীন ভ্যালজিন আপনাকে নির্য্যাতিত বলিয়াই মনে করিতেছিল।

সমাজ তাহার জন্য কি করিয়াছে?—কিছুই নয়। অন্যান্য হতভাগ্যের ন্যায়, শুধু তার তথা-কথিত ন্যায় বিচারের প্রচণ্ড মূর্ত্তিটাই সে দেখিয়া আসিয়াছে। এ পর্য্যন্ত যথার্থ করুণা লইয়া কেহ তাহার কাছে আসে নাই, যে কেহ কাছে আসিয়াছে সেই তাহাকে আঘাতই করিয়াছে। শৈশবের পর হইতে, এক ভগ্নীর নিকট ব্যতীত কোন যত্ন বা স্নেহ কাহারও নিকট হইতে সে পায় নাই। দুর্দ্দশার পর দুর্দ্দশায়, তাহার মনে অবশেষে এই ধারণা

দাঁড়াইয়াছিল যে জীবনটা সংগ্রামমাত্র, আর সে সংগ্রামে সে-ই নিত্য পরাজিত। ঘৃণাই শেষে তাহার একমাত্র অস্ত্রস্বরূপ হইল; সেই অস্ত্র গ্যালির নির্য্যাতন-শাণযন্ত্রে ক্ষুরধার করিয়া লইয়া কারামুক্তির দিন হইতে সংসারের সহিত যুঝিতে সে কৃতসংকল্প হইল। তুলঁতে কয়েদীদের জন্য বিদ্যালয় ছিল, ইচ্ছা করিলে কোন কয়েদী সেখানে মোটামুটি ধরণে শিক্ষালাভ করিতে পারিত; জ্ঞানবৃদ্ধি দ্বারা তাহার প্রতিহিংসাসাধনের পথ প্রশস্ত হইবে ভাবিয়া, চল্লিশ বর্ষ বয়সে জীন সেই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল। সময়ে সময়ে শিক্ষা ও সভ্যতাই যত পাপের আকর হইয়া দাঁড়ায়।

সমাজের বিচার শেষ করিয়া জীন সমাজ-কর্ত্তা ভগবানের বিচার করিতে বসিল, এবং অবশেষে তাঁহাকেও দোষী সাব্যস্ত করিল।

এইরূপে ১৯ বৎসর কারাবাসের মধ্যে তাহার জীবন আলো-অন্ধকারের বিচিত্র মিশ্রণে কাটিতেছিল।

আসলে তাহাকে পাপস্বভাব বলা যায় না। গ্যালিতে প্রথম প্রবেশ কালে তাহার প্রকৃতি তোমার আমার মতই ছিল। সেখানে, নির্য্যাতনের ফলে, সে যখন সমাজের উপর খড়্গাহস্ত হইল, তখন তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিল; ভগবানের ন্যায় বিচারে যখন সে সন্দিহান হইল, তখনি তাহার মন পাপপঙ্কিল হইল।

কথাটা ভাবিয়া দেখা উচিত।

মানবপ্রকৃতি কি সম্পূর্ণভাবে এতই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে? ভগবানের সৃষ্ট মানুষকে কি মানুষে এত দীন করিতে পারে? আত্মা কি কর্ম্মফলাধীন হইয়া, মন্দ গ্রহের ফেরে, আপনি কলঙ্কিত হইতে পারে? বিশাল মস্তিষ্কের ভারে মেরুদণ্ডের ন্যায়, মানুষের চিত্ত কি স্তূপীকৃত দুঃখযন্ত্রণার ভারে প্রপীড়িত হইয়া বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে? প্রত্যেক মানবের আত্মায়, জীন ভ্যালজীনের আত্মায়, —এমন কি কোন সহজাত অপাপ অনন্তের দিব্য বিভা নাই বা ছিল না, সৎকার্য্যের প্রতিফলিতালোকে যাহা ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে এবং পাপে যাহাকে কখনও সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত করিতে পারে না?

গ্যালির কর্ম্মের অবসরকালে এই সব কথাই তাহার মনে হইত। নীরব ভাবুকতার ছায়াপাত সে সব সময়ে তাহার মুখে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িত।

অবশ্য আমরা যে ভাবে ক্রমপর্য্যায়ে তাহার চিন্তার বিকাশ দেখাইয়াছি, সে ভাবে হয়ত জীন আপনার চিত্তকে দেখে নাই,—সে ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিবার ক্ষমতাও হয়ত তাহার ছিল না। কিন্তু এটা সত্য যে যেখানে সংশোধন অপেক্ষা শাস্তি-প্রদানের আগ্রহই অধিক পরিস্ফুট, সে বিচার মানুষের শ্রেষ্ঠ ভাবগুলিকে একে একে পদ-দলিত করিয়া মানুষকে পশুবৎ করিয়াই তোলে। জীনের উপর্য্যুপরি পলায়ন-চেষ্টাই তাহার প্রমাণ।—সে ব্যর্থ চেষ্টা মূর্খতা বই আর কিছু নয় তাহা ত সে জানিত; তত্রাচ সুযোগ পাইলেই, উন্মুক্ত পিঞ্জর হইতে ব্যাঘ্রের ন্যায়, সে ছুটিয়া পলাইয়াছে.—পরিণাম বা শাস্তির কথা একবারও ভাবিয়া দেখে নাই।—কেন? তাহার সহজাতবুদ্ধি যেন তাহাকে বলিয়া দিত—'পালাও'; তাহার বুদ্ধি-বিচার তাহাকে বলিত—"থাক।" কিন্তু এমন একটা প্রলোভনের কাছে তাহার

সহজাত ভাবেরই জয় হইত, তাহার পশুভাবই প্রবল হইত। তার পর, ধৃত হওয়ার পর নূতন শাস্তির ভার তাহার চিত্তের অন্ধকার গাঢ়তর করিয়াই তুলিত।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। শারীরিক সামর্থ্যে জীনের সমতুল্য লোক গ্যালিতে তখন কেহ ছিল না। কঠোর-শ্রমসাধ্য কার্য্যে একা সে চারিজনের সমতুল্য ছিল; পৃষ্ঠের উপর অনায়াসে সে বিশাল ভার বহন করিতে পারিত। কিন্তু শারীরিক শক্তি অপেক্ষা তাহার কৌশল অনেক বেশী ছিল। সুদীর্ঘকালের জন্য দণ্ডিত অপরাধীরা পলায়নোদ্দেশে প্রায়ই প্রতিদিন, সুযোগমত, নিয়মিত-ভাবে শক্তি ও কৌশলের সাধনা করে। জীন সে বিষয়ে একজন পাকা ওস্তাদ হইয়া উঠিয়াছিল। যে-কোন প্রাচীর উল্লম্ফন করা, ক্ষুদ্রতম কার্ণিশের উপর স্বচ্ছন্দে দণ্ডায়মান থাকা, তাহার পক্ষে কৌতুকমাত্র ছিল। পৃষ্ঠদেশ ও হাঁটু দিয়া, কনুই এবং হস্তের সাহায্যে দেওয়ালের কোণ বাহিয়া অনায়াসে সে ত্রিতল পর্য্যন্ত উঠিয়া যাইত;—এইরূপে কতবার গ্যালির ছাদ পর্য্যন্ত সে উঠিয়াছে।

কথা সে কহিত কম; গ্যালিতে কখনও কেহ তাহাকে হাসিতে দেখে নাই। সে যেন সর্ব্বদাই কি একটা গুরুতর চিন্তার মাঝে মগ্ন হইয়া থাকিত।

তাহার অসম্পূর্ণ প্রকৃতির ভ্রান্ত অনুভব-শক্তির বশে সে বুঝিত কি যেন একটা বিশাল ভার তাহার স্কন্ধে চাপিয়া আছে। জীবনের অস্পষ্ট অন্ধকারে যেদিকে সে চাহিত সেই দিকেই দেখিত,—আইনের বন্ধন, মানবের পক্ষপাতিত্ব, এবং সভ্যতার বিশাল স্তূপ যেন চারিদিক হইতে তাহাকে ঘিরিতেছে। তাহার মধ্যে,—কখনো সম্মুখে, কখনো দূরে, কখনো বহু উর্দ্ধে—এখানে অনুচর সহ কারাধ্যক্ষ, ওখানে তরবারি হস্তে যমদূতসম প্রহরী, দূরে করধৃতদণ্ড প্রধান পুরোহিত, আর উর্দ্ধে আলোকের মাঝে হেমমুকুটধারী নৃপতি—আরও কত কি সে যেন দেখিত। কি এক দুর্জ্ঞেয় গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া তাহারা যেন সব তাহাকে পদদলিত করিয়া চলিয়া যাইত,—তাহাদের সে নির্ব্বেদ নিষ্ঠুরতা এবং চির উপেক্ষার ভারে প্রতিদিন সে ক্লিষ্ট হইয়া উঠিত!—সম্ভাবিত দুর্দ্দশার অতলজলে মগ্ন শাসন-কশাহত হতভাগ্যের শিরেই, মানব-সমাজের যত দুঃসহ বিশাল ভার আসিয়া চাপিয়া বসে; জীনেরও তখন সেই অবস্থা। সে কি ভাবিত?—পেষণযন্ত্র-মধ্যগত যবখণ্ডকে প্রশ্ন কর। তাহার যে চিন্তা, জীনেরও তাই।

এই কায়া ও ছায়া, সত্য ও কুহকের অদ্ভুত মিশ্রণের মধ্যে পড়িয়া মাঝে মাঝে তাহার মনে হইত,—অতীত, বর্ত্তমান সবই বুদ্ধি বা ভ্রান্তি, সবই বুঝি একটা স্বপ্নের ঘোর মাত্র! কাজ করিতে করিতে, থামিয়া, কারা-প্রহরীর প্রতি চাহিয়া সে ভাবিত—কে এ, ছায়ামূর্ত্তি! কিন্তু মুহূর্ত্তে সে ছায়ামূর্ত্তি হইতে তাহার পৃষ্ঠে সজোরে বেত্রাঘাত বর্ষিত হইত; চমকিত হইয়া, জীনের চিত্ত পুনরায় বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিত; জীন আবার কার্য্যে মন দিত।

বহির্জ্জগতের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না—সূর্য্যের কিরণ, বসন্তের প্রভাত, বিচিত্রবর্ণাভ আকাশের ছবি, সবই যেন

তাহা হইতে দূরে দূরে ছিল। শুধু একটা অতি ক্ষীণ আলো চিত্তের অর্দ্ধোন্মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়া আসিয়া, যেন তাহার অন্তর্জীবনে প্রবেশ লাভ করিত মাত্র।

মোট কথা,—ফ্যাবেরোল পল্লীর সে নিরীহ কাঠুরিয়া তুলঁতে আসিয়া ভীষণ কয়েদীতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। গ্যালির শিক্ষার ফলে দুইটি জিনিসে সে খুব অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল ;—প্রথমতঃ, তাহার নির্য্যাতনের প্রতিহিংসাস্বরূপ একটা প্রকৃতিসিদ্ধ তীব্র আকস্মিক উত্তেজনায় ; দ্বিতীয়তঃ, তাহার আপন বিবেক-বিচারানুমোদিত ভ্রান্ত চিন্তাপ্রসূত পূর্ব্বচিন্ত্য কার্য্যানুষ্ঠানে। জ্ঞান, ইচ্ছাশক্তি ও একগুঁয়েমি, এই তিন লইয়া তাহার পূর্ব্বচিন্তা গঠিত হইত ; এবং স্বাভাবিক বিদ্বেষ, আত্মার অন্ধকার, নির্য্যাতনের স্মৃতি ও প্রতিহিংসার ভাব (তাহাতে সাধু অসাধুর বিচার ছিল না)—এই কয়টি ভাবই তাহার কার্য্যের একমাত্র কারণস্বরূপ ছিল। কিন্তু মানবের রচিত আইনকানুনের প্রতি একটা বিজাতীয় বিদ্বেষই তাহার সকল চিন্তার মূলে অহরহঃ জাগিতে থাকিত। এই বিদ্বেষ-ভাব, সময়ে দৈবঘটনায় নিয়ন্ত্রিত না হইলে, কালে, স্বাভাবিক নিয়মের বশে, সমাজের প্রতি, পরে সমগ্র মানব-জাতির প্রতি, তার পর সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের প্রতি, বিস্তৃত হইয়া পড়ে ; মানুষ তখন কেবলি পরের অনিষ্ট সাধন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকে।—ছাড়-পত্রে, জীনকে যে ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল, তাহা নিতান্ত মিথ্যা নয়।

দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে তাহার প্রাণ-ধারা শুষ্ক হইতেছিল। ১৯ বৎসর পরে, বিশুষ্ক হৃদয়ে শুষ্ক নেত্রে জীন পুনরায় সংসারক্ষেত্রে পদার্পণ করিল।

(৮)

অন্ধকার লবণাম্বুরাশি ভেদ করিয়া নক্ষত্র-বেগে পোত ছুটিতেছিল। সহসা এক যাত্রী সমুদ্রগর্ভে পতিত হইল।

একবার উঠিয়া, একবার ডুবিয়া, চীৎকার করিয়া সকলকে সে ডাকিতে লাগিল।—কে সে চীৎকার শুনিবে ? সমুদ্রবক্ষে তখন ঝটিকা উঠিয়াছে ; নাবিকেরা এবং সহযাত্রিবৃন্দ পালের রসারসি লইয়াই ব্যস্ত—তাহার আর্ত্তনাদ তাহাদের কাণে পৌছিল না। উত্তাল তরঙ্গমালার উপর হতভাগ্যের দেহ বিন্দুবৎ ভাসিতে লাগিল।

নিমিষে নিমিষে সে পোত দূর হইতে দূরান্তর্গত হইতেছিল। উহারই মধ্যে সে ত এই কতক্ষণ ছিল ; আর সবারই মত সেও ত উহারই একজন যাত্রী ছিল ; আর সবারই মত সেও ত একদিন উহারই ক্রোড়ে সকলের সহিত একত্রে বসিয়া, সূর্য্যের আলো এবং সমীরণ-সঞ্চার উপভোগ করিয়াছে। কিন্তু এখন ?—মুহূর্ত্তের পদস্খলন, মুহূর্ত্তের ভুল—তাহারই ফলে চিরদিনের মত পতন,—সেইখানেই তার জীবন নাট্যের পরিসমাপ্তি !

চারিদিকে বীচি-বিক্ষোভ, পদতলে তরল বারিরাশির প্রাণসংহারিণী লীলা ; বাত্যাসংক্ষুব্ধ ঊর্ম্মিরাশি আছাড়িয়া আছাড়িয়া তাহার উপর আসিয়া পড়িয়া অন্ধকার সমুদ্রতলের দিকে তাহাকে দূর করিয়া দিতে চাহিতেছে ! তরঙ্গের পর তরঙ্গ, জনসংঘের ন্যায়, তাহার মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতেছে ; এক একবার

তরঙ্গের তাড়নে নিমজ্জিত হইয়া সে দেখিতেছে,—চারিদিক্ হইতে হাঙ্গর কুম্ভীর সরীসৃপ যেন তাহাকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে, সমুদ্রগর্ভস্থ লতাগুল্ম যেন তাহাকে মৃত্যু-আলিঙ্গনে বদ্ধ করিবার জন্য প্রসারিত হস্তে ছুটিয়া আসিতেছে!—ভয়ে শিহরিয়া, চক্ষু মুদিয়া, অভাগা প্রাণপণে জীবনের মায়ায় যুঝিতে লাগিল।

কোথায় সে পোত? দূরে—বহুদূরে—অন্ধকার দিক্‌চক্রবালের সীমারেখায়!—আর স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় না!

দেখিতে দেখিতে তুফান উঠিল। চতুর্দ্দিকে—পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ; উর্দ্ধে—পাটলান্ধকার আকাশের নির্ম্মম ভ্রূকুটি। সর্ব্বত্র যেন উন্মত্ত দানবের প্রচণ্ড তাণ্ডবলীলা!—সে ভীষণ শব্দ, যেন নরকের প্রতিধ্বনিত নির্ঘোষ!—কি সে যন্ত্রণা!—অভাগা উন্মাদগ্রস্ত হইল।

আকাশে বিহঙ্গম আছে, মানবের দুঃখ-যন্ত্রণা দূর করিতে দেবতারাও আছেন।—কই, তাহাকে ত কেহ উদ্ধার করে না! পাখীরা ঝড়ের মুখে উড়িতে উড়িতে গান করিতে লাগিল; নীচে সে অভাগা মৃত্যুর সহিত যুঝিতে লাগিল।—সে অনন্ত সমুদ্র এবং অনন্ত আকাশ—যেন তাহারই কবরের অনুরূপ; একটি তাহার কবর,—অপরটি তাহার আচ্ছাদনী।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া যুঝিতে যুঝিতে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে;—পোতও আর দৃষ্টিগোচর হয় না।—গম্ভীর অন্ধকারে সে একা! ডুবিতে ডুবিতে চারিদিক হইতে প্রেতচ্ছবি তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল—অভাগা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

মানুষ ত তাহাকে ফেলিয়া গিয়াছে। ভগবান্, তুমি কোথায়?

"—কে আছ, রক্ষা কর—রক্ষা কর!—"

দিক্‌চক্রবালে, আকাশে,—কোথাও কিছু নাই, কেহ নাই!

আকাশ, তরঙ্গ, পর্ব্বতশৃঙ্গ—সবই বধির! বাত্যাও অনন্তের আদেশই পালন করিতেছিল।

চারিদিকে—ঘনীভূত অন্ধকার, বাত্যা, নির্জ্জনতা, দানবী-ভ্রুকুটি, উন্মত্ত তরঙ্গের মুহুর্মুহু উত্থান-পতন; পদতলে—তারল্যের রসাতল; অন্তরে—শ্রান্তি, বিভীষিকা! কোথায় আশ্রয়?—আশ্রয় নাই! তীব্র হিমে দেখিতে দেখিতে তাহার হস্তপদ অসাড় হইয়া আসিল; উন্মত্তের ন্যায় আকাশ বাতাস নক্ষত্র তরঙ্গ ঘূর্ণাবর্ত্ত সবই যেন সে অন্তিম আবেগে ধরিতে লাগিল!—হায়,—শূন্য মুষ্টি,—বিফল প্রয়াস!

দারুণ নিরাশাভারপ্রপীড়িত হইয়া তখন সে সব চেষ্টা ত্যাগ করিল।—পরাজিত নির্য্যাতিত হতভাগ্য গভীরতম অন্ধকারের অতল গর্ভে নিমগ্ন হইয়া গেল!

হায় রে গতিশীল সমাজ! মানবের এবং মানবাত্মার অধোগতি চিহ্ন এমনি ভাবে তুমি অঙ্কিত করিয়া যাও! তোমার শাসন-নীতি এমনই ভাবে মানুষকে অতল সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, তার উদ্ধারের শেষ আশাটুকুও এমনি ভাবেই কাড়িয়া লয়,—চির দুর্দ্দশার মাঝে তাকে এমনি ভাবেই দূর করিয়া দেয়! হায়, এ নৈতিক মৃত্যুর হস্ত হইতে কে হতভাগ্য মানবকে উদ্ধার করিবে?

(৯)

সে দিন প্রাতঃকালে কারাধ্যক্ষ যখন আসিয়া তাহাকে জানাইল—"আজ তুমি মুক্ত," তখন জীন প্রথমতঃ সে কথা বিশ্বাসই করিতে পারিল না;—সেটা যেন এমনই অসম্ভব,—এতই অপ্রাকৃত! তারপর, সহসা একটা তীব্র জ্যোতিঃ তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য? মুক্তির কথায় তাহার মনে একটা নব জীবনের ছবি জাগিয়া উঠিত। কিন্তু দু'দিন যাইতে না যাইতেই সে বুঝিল, হরিদ্রাভ ছাড়-পত্র সহ মুক্তি অর্থে কি?

তারপর আরও কথা ছিল। জীন হিসাব করিয়া দেখিয়াছিল, এই ১৯ বৎসরের পারিশ্রমিক হিসাবে কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে তাহার ১৭১ ফ্রাঙ্ক মোট পাওনা হইয়াছিল; অবশ্য রবিবার, ছুটিছাটা, ও অন্যান্য বাবদে তাহা হইতে কিছু বাদ যাইবার কথা,—কিন্তু জীন তাহা বুঝিল না; তাই কর্ত্তৃপক্ষ যখন তাহাকে সর্ব্বশুদ্ধ ১০৯ ফ্রাঙ্ক ১৫ স্যুস দিয়া বিদায় করিলেন, তখন সে সেটা অপহরণের নামান্তর বলিয়াই মনে করিল।

মুক্তির পর দিন, চলিতে চলিতে পথে একটা আঙ্গুরের কারখানায় তার দিন মজুরি জুটিল; সে অসাধারণ পরিশ্রমী,—খুব উৎসাহে কাজ করিতে লাগিল। একটা চৌকিদার সেখান দিয়া যাইতে যাইতে তাহাকে দেখিয়া সন্দিগ্ধভাবে তাহার ছাড়পত্র চাহিল,—কাজেই তখন সে হরিদ্রাভ ছাড়পত্র তাহাকে বাহির করিতে হইল। চৌকীদার চলিয়া গেল, লোকেরা পরস্পর মুখ চা'য়াচায়ি করিতে লাগিল, জীন পুনরায় আপন কাজে মন দিল। সন্ধ্যার সময় সে যখন তাহার প্রাপ্য আনিতে গেল, মেট তাহাকে মাত্র ১৫ স্যুস দিল।

সেখানে দৈনিক মজুরের রোজ ৩০ স্যুস; জীন অপর এক মজুরকে প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছিল। তাই সে বিস্মিত হইয়া বলিল—

"কি রকম?"

"কি রকম আবার কি?—তুই আবার এর বেশী কি চাস্?"

"কেন, ৩০ স্যুস? সবাই যা পেয়ে থাকে।"

মেট ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"সাবধান; ফের যদি কথা বল্‌বি ত পুলিশে দেবো।"

জীন নিরুত্তর হইয়া ফিরিল। ভাবিল—এ-ও দিনে ডাকাতি!

সমাজ—কর্ত্তৃপক্ষ—তাহার উদ্বৃত্ত অর্থের হ্রাস করিয়া 'পাইকারি' ডাকাতি করিয়াছে; মানুষ এখন জনে জনে 'খুচরা' ডাকাতি আরম্ভ করিতেছে। ভাল!

জীন বুঝিল—মুক্তি অর্থেই উদ্ধার নয়; কয়েদী কারাগার ত্যাগ করিয়া আসে বটে, কিন্তু ঘৃণা ও দণ্ডের হাত হইতে কখনো পরিত্রাণ পায় না—ডি-তেও সে কিরূপ ব্যবহার পাইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি।

(১০)

জীনের যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিতেছে! প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া বিছানায় সে শোয় নাই; আজ এ কোমল শয্যায় নিদ্রা হওয়াই যে তাহার পক্ষে বিচিত্র!

চারি ঘণ্টা নিদ্রা তাহার ক্লান্তি অপনোদনের পক্ষে যথেষ্ট—বেশীক্ষণ নিদ্রা যাওয়া

তাহার অভ্যাস ছিল না—তবু একবার চক্ষু মেলিয়া অন্ধকারে সে চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল, তারপর পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিল। কিন্তু দিবাভাগে নানাঘটনা-সংঘাতে যার চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকে, তাহার পক্ষে রাত্রে, দ্বিতীয়বার নিদ্রাদেবীর আবির্ভাব সহজে ঘটে না। জীনেরও তাহাই হইল। ঘুমাইতে না পারিয়া সে ভাবিতে বসিল। সে চিন্তাও নানা ভাব-সংঘাতের অদ্ভুত মিশ্রণ!—অতীতের স্মৃতি, বর্ত্তমানের কথা একত্রে মিলিয়া তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে যেন লুকোচুরি খেলিতে লাগিল: কত অদ্ভুত আকৃতি ধরিয়া, কত সম্ভবকে অসম্ভব, অসম্ভবকে সম্ভবে রূপান্তরিত করিয়া আবার নিমেষে যেন কোন পঙ্কিল স্রোতে মগ্ন হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সব চিন্তা সব ভাবের মধ্যে একটি মাত্র চিন্তা তাহাকে অধিকার করিয়া বসিল। কি তাহা, বলিতেছি—

সেই ছয় থানা রূপার থাল—ম্যাগলোয়ার যে গুলিকে আলমারির উপর তুলিয়া রাখিতেছিল—তাহারা যেন সজীব হইয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে আসিয়া নৃত্য করিতেছিল। যেমন করিয়াই হউক, তাহাদের মূল্য ২০০ ফ্রাঙ্কের কম নয়—উনিশ বৎসর ধরিয়া খাটিয়া সে যাহা পাইয়াছে প্রায় তার ডবল দাম! অবশ্য কর্ত্তৃপক্ষ অবিচার না করিলে সে আরও কিছু বেশী পাইত? তা' যাউক সে কথা।

পূর্ণ এক ঘণ্টা ধরিয়া নানা বিরোধী ভাবের মধ্যে পড়িয়া সে ভাবিতে লাগিল।

ঢং—ঢং—ঢং—। তিনটা!

জীন চকিতে উঠিয়া বসিল, হাত বাড়াইয়া দেখিল বিছানার পাশে তার গাঁঠরিটা ঠিক আছে কি না?—তারপর, জুতা খুলিয়া রাখিয়া, পুনরায় শয্যার উপর বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল।

কি সে ভাবনা?—কেমন করিয়া বলিব? সে ভাবনার কোন সামঞ্জস্য নাই, স্থিরতা নাই; তাহা একবার আসে আবার মিলায়, আবার আসে আবার যায়।—কি যেন তাহার উপর চাপিয়া বসিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে কয়েদী ব্রেভেটের কথা তার মনে পড়িল,—তার ছক্‌কাঠা স্থতার গাটারটা যেন তাহার চক্ষের উপর জাগিতে লাগিল। এই ভাবে হয় ত তার সমস্ত রাত্রি কাটিত, কিন্তু অকস্মাৎ গির্জ্জার ঘ'ড় বাজিয়া উঠিল—ঢং! আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা!—সে শব্দ যেন তাহাকে বলিয়া দিল—"উঠ, ভাবছ কি?"

জীন চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অস্পষ্ট চন্দ্রালোক জানালার খড়খড়ির মধ্য দিয়া কক্ষে আসিয়া পড়িতেছিল। মুহূর্ত্তের জন্য একবার ইতস্ততঃ করিয়া, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সে জানালা খুলিয়া ফেলিল। জানালার গরাদে ছিল না,—নীচেই বাগান; তাহাতে অনতি-উচ্চ প্রাচীরের বেষ্টনী; বাগানের পরই নাতিহ্রস্ব বৃক্ষের সারি—সম্ভবতঃ সেটা একটা রাজপথ। চন্দ্রের অস্পষ্ট আলোকে জীন ভাল করিয়া একবার সব দেখিয়া লইল; তারপর, জানালা বন্ধ করিয়া, স্থির পাদক্ষেপে ফিরিয়া আসিয়া, গাঁঠরি হইতে শিকের মত কি একটা বাহির করিল। তারপর, জুতা জোড়া পকেটে পুরিয়া, থলিটা পৃষ্ঠে বাঁধিয়া লইয়া, চোখের

উপর টুপিটা টানিয়া আনিয়া, সেই জানালার পার্শ্বে লাঠি রাখিয়া, লৌহশিকহস্তে ধীরে ধীরে পার্শ্বের কক্ষের প্রতি অগ্রসর হইল। মিরিয়েল আপন কক্ষ অর্গলাবদ্ধ করেন নাই, দ্বার উন্মুক্তই ছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

রসের রূপ—মাধুর্য্য

(৩)

(ভাদ্রের বঙ্গদর্শনের ৫৩১ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

ফলতঃ সাধারণ লোক প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের মধ্যে যে বিরোধ ও ব্যবধান আছে বলিয়া মনে করে, তাহা সত্য নহে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা ধরিতে পারা যায়, তাহাই প্রাকৃত। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা ধারণা হয় না, তাহাই অপ্রাকৃত। কিন্তু লোকে ইহা বিচার করিয়া দেখে না যে, যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে জানি না ও জানিতে পারি না, তাহাকেও ইন্দ্রিয়ের সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া ধরিতে হয়, তার আর অন্য পথ নাই। ইন্দ্রিয়ের অতীত যে একটা বিশাল জ্ঞানরাজ্য পড়িয়া আছে, ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য হইতেই আমরা তাহা জানিতে পারি, আমাদের অতীন্দ্রিয়-জ্ঞান ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিয়া যায় মাত্র, বর্জ্জন করিয়া জন্মে না, জন্মিতে পারে না। যাহা দেখি ও শুনি তারই মধ্যে যাহা দেখা যায় না ও শোনা যায় না, তাহার সঙ্কেত ও সন্ধান পাওয়া যায়। আর এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানও প্রত্যক্ষ, অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় না। তবে ইন্দ্রিয়ের ভিতরকার অতীন্দ্রিয় সঙ্কেতটী সকলে ধরিতে পারে না। সে জন্য সাধন আবশ্যক। সে সাধনের নাম ভূতশুদ্ধি বা দেহশুদ্ধি। আমাদের ভূতশুদ্ধি নাই বলিয়া, ইন্দ্রিয় সকল কখনও আপনার স্বরূপে অবস্থান করে না। সুতরাং আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষও সত্য হয় না; ইন্দ্রিয়গ্রামের শক্তি-সাধ্য যে কি, ইহাও আমরা জানিতে পারি না। আমরা সত্যভাবে ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন বা বিষয়ের সেবাও করিতে পারি না; অতীন্দ্রিয়েরও প্রত্যক্ষলাভ করি না। আমরা কতকগুলি পৈত্রিক ও বৈজিক সংস্কার লইয়া জন্মিয়া, বহুবিধ সামাজিক সংস্কারের মধ্যে গড়িয়া উঠি। এই সকল সংস্কার আমাদের স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করিয়া দেয়। ইহারা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামকে বহুবিধ কল্পনার দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই জন্য আমরা সত্যভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যে কি ও তাহাদের সাক্ষ্যই বা কি, ইহাও ধরিতে পারি না, আর অতীন্দ্রিয় বস্তু যে কি তাহাও প্রত্যক্ষ করিতে পাই না। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম স্বরূপভ্রষ্ট হইয়া রহে বলিয়া, অতীন্দ্রিয়ে বিশ্বাসও কেবল অনুমানের ও

কল্পনার উপরেই গড়িয়া উঠে। ধাতু-প্রসাদেই অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়কুলের প্রসন্নতা লাভ হইলেই, জীব অতীন্দ্রিয়ের মহিমা জানিতে পারে। আমাদের ধাতু প্রসন্ন নয় বলিয়াই আমরা একটা বিকৃত ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের মধ্যে বাস করিয়া প্রকৃত অতীন্দ্রিয়ানুভূতিলাভে অসমর্থ হই। আর এই জন্যই প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃতের মধ্যে এমন একটা কল্পিত ব্যবধানেরও সৃষ্টি করি।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ইন্দ্রিয় সকলকে ভাল করিয়া জানিলেই তাদের অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে যারা ভাল করিয়া জানিয়াছে, তারাই জানে যে ইহারা কেহই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নহে। কেবল চক্ষু দিয়া মানুষ দেখে না। চক্ষুর পশ্চাতে যতক্ষণ না মন আসিয়া দাঁড়ায়, অর্থাৎ দৃষ্ট বিষয়ে যতক্ষণ না মনঃসংযোগ হয়, ততক্ষণ চক্ষুর গোলকের উপরে সে বিষয়ের প্রতিচ্ছায়া পড়িতে পারে, কিন্তু তাহাতে তার রূপের জ্ঞান জন্মায় না। চক্ষুর পশ্চাতে যেমন মন, মনের পশ্চাতে সেইরূপ বুদ্ধি; বুদ্ধির পশ্চাতে সেইরূপ সাক্ষীস্বরূপ আত্মচৈতন্য যতক্ষণ না আসিয়া দাঁড়ায়, ততক্ষণ চক্ষু দেখে না। এইরূপে মন, বুদ্ধি ও চৈতন্য যুক্ত না হইলে, কাণও শোনে না, ত্বক্‌ও স্পর্শ করে না, নাসিকাও ঘ্রাণ গ্রহণ করে না, রসনাও রসাস্বাদ করে না, কোনও ইন্দ্রিয়ই আপনার বিষয়কে গ্রহণ করিয়া সে বিষয়ের শব্দস্পর্শরূপ-রসাদির জ্ঞান দান করিতে পারে না। ইহা প্রত্যক্ষ করিলেই এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ?
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ?
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি?
ক উ দেবো চক্ষুশ্রোত্র যুনক্তি?

কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া এই যে আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় মন, তাহা আপনার বিষয়েতে পতিত হয়? কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া শরীরের মধ্যে যে প্রধান প্রাণবায়ু তাহা আপনার বিষয়ে যুক্ত থাকে? কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া এই সকল বাক্য অভিব্যক্ত হয়? সেই দেবতা কে? যিনি চক্ষু এবং কর্ণকে আপন আপন বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিতেছেন?

সর্ব্বপ্রকার সংস্কারবর্জ্জিত হইয়া, সহজ ও শুদ্ধভাবে আপনার ইন্দ্রিয় সকলের অনুসরণ ও অনুশীলন করিতে করিতেই এরা যে স্বতন্ত্র ও স্বপর্য্যাপ্ত নহে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। আর তখনই আমরা যিনি "চক্ষুষশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং তৎ" ও "প্রাণস্য প্রাণং" তাঁহাকে এই সকল চক্ষুরাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ইহাদের মধ্যেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। সুতরাং ইন্দ্রিয়কে ছাড়িয়া নহে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের ভিতরেই অতীন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকারলাভ করিতে হয়—ছাড়াইয়া বটে, কিন্তু ছাড়িয়া নহে। অতিক্রম করিয়া বটে, কিন্তু বর্জ্জন করিয়া নহে।

মনের মধ্যেই চিন্তামণি বিরাজ করিতেছেন। মনকে ছাড়িয়া নহে, কিন্তু মনকে ধরিয়াই সে চিন্তামণিকে পাইতে হয়। ইন্দ্রিয়-গ্রামের বা হৃষীকসমাজের মাঝখানেই হৃষীকেশ বাস করেন। তিনি ইন্দ্রিয়কুলের অধীশ্বর, রাজা। রাজাকে তাঁর স্বরাজ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, পররাষ্ট্রে নহে। চিন্তামণিকে চিন্তা হইতে, হৃষীকেশকে হৃষীকসমাজ হইতে

পৃথক্ করা যায় না। করিলে, তাহা কৃষ্ণত্ব, শুক্লত্ব প্রভৃতির ন্যায় একটা ভাববাচ্য শব্দ মাত্রে পরিণত হয়, তার বস্তুত্ব আর থাকে না। ইংরেজিতে ইহাকে abstraction বলে। এই সকল abstraction এর উপরেই আমাদের যাবতীয় মানসকল্পনা গড়িয়া উঠে। এগুলি সত্য নহে, সত্যাভাস মাত্র। চিন্তামণি আমাদের জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে, নিত্যকাল আমাদের প্রত্যেক চিন্তাকে ধরিয়া, জড়াইয়া, ওতপ্রোতভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছেন। হৃষীকেশ আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের প্রতি চেষ্টার সঙ্গে তাহাদের আশ্রয় ও প্রেরয়িতা হইয়া নিয়ত বিরাজ করিতেছেন। আর মন প্রাকৃত বস্তু; কিন্তু সেই মনবিহারী মনোময় চিন্তামণি যিনি, তিনি অপ্রাকৃত। চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় সকলও প্রাকৃত; কিন্তু এই সকল ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় ও অধীশ্বর হইয়া যিনি আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-চেষ্টাকে সম্ভব ও সফল করিতেছেন, সেই হৃষীকেশ অপ্রাকৃত। মন প্রাকৃত হইলেও এই মনকে ছাড়িয়া অপ্রাকৃত বস্তু যে চিন্তামণি তিনি তিলার্দ্ধকাল তিষ্ঠিতে পারেন না। নিমেষের জন্যও অপ্রাকৃত বস্তু যে হৃষীকেশ তিনি কদাপি এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রামকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না। প্রাকৃতের ভিতরেই অপ্রাকৃতের; অপ্রাকৃতের আশ্রয়েই প্রাকৃতের প্রতিষ্ঠা; এ দুইকে পৃথক্ করা যায় না। প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত ছায়াতপের ন্যায় পরস্পরের সঙ্গে নিত্যযুক্ত হইয়া আছে।

অতএব শৃঙ্গাররসকে প্রাকৃত আর মাধুর্য্যকে অপ্রাকৃত বলিলে উভয়ের মধ্যে কোনও আত্যন্তিক ব্যবধান বা স্বাভাবিক বিরোধের প্রতিষ্ঠা হয় না। চিন্তামণি যেমন মনের মধ্যে, মনকে ধরিয়া ও জড়াইয়া, ওতপ্রোতভাবে তাহার সঙ্গে মিশিয়া ও তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছেন, সেইরূপ শৃঙ্গাররস বা আদিরসের মধ্যেই, আমাদের কামপ্রবৃত্তিকে ধরিয়া ও জড়াইয়া, তাহারই সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া ও তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াই মাধুর্য্যরসও ফুটিয়া উঠে। ফলতঃ কেবল প্রজনন-ক্রিয়ামাত্রকে শৃঙ্গারপদবাচ্য করিলে, তাহাকে মাধুর্য্য বলা যায় না। কিন্তু যখনই এই প্রজনন-ক্রিয়ার মধ্যে আনন্দ জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করে, তখনই তাহা রসপর্য্যায়ভুক্ত হইয়া, প্রকৃতপক্ষে অপ্রাকৃতত্ব লাভ করিতে থাকে। শৃঙ্গার ও মাধুর্য্য দুইটী ভিন্ন বস্তু নহে। একই অভিজ্ঞতার বা একই সত্যের দুইটা দিক্ মাত্র। ছায়াকে ছাড়িয়া যেমন আতপ থাকে না ও থাকিতেই পারে না, আর আতপের আশ্রয় ব্যতীত যেমন ছায়ার প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠা অসাধ্য, সেইরূপ শৃঙ্গার বা আদিরসকে বর্জ্জন করিয়া মাধুর্য্যরস জন্মিতে ও থাকিতে পারে না; আর মাধুর্য্যের আশ্রয় ব্যতীত শৃঙ্গার বা আদিরসেরও জন্ম বা স্থিতি আদৌ সম্ভব হয় না।

শৃঙ্গার রস আমাদের দেহকে আশ্রয় করিয়াই জন্মে, সত্য; কিন্তু আবার জন্মিয়াই এই রস যে সেই শরীরকেই আপনার যথাযোগ্য স্ফূর্ত্তির অন্তরায় বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে আরম্ভ করে, ইহাও সত্য। শরীরও এ রসসঞ্চারে আপনাকে সার্থক ভাবিয়া, তাহাকে আপনার মধ্যে রাখিতে চাহে। এই জন্য উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়াযায়। এই সংগ্রাম হইতেই স্বেদ-কম্পাদি মাধুর্য্য-চিহ্ন প্রকাশিত হইয়া থাকে।

আসঙ্গলিপ্সা এই রসের একটা অতি প্রধান লক্ষণ। স্বল্প-বিস্তর সকল স্থায়ী রসেতেই আপনার উপজীব্য যে বস্তু তার সঙ্গ আকাঙ্ক্ষা করে। দাস প্রভুর নিকটে নিত্যকাল থাকিতে চাহে। সখা সখার সঙ্গে গলাগলি করিয়া চিরদিন কাটাইতে চাহে। পিতামাতাও আপনার বাৎসল্যকে তৃপ্ত করিবার জন্য সর্ব্বদা সন্তানের মুখ দেখিবার ও তাহাকে কোলে লইয়া, বুকে করিয়া রাখিবার জন্য লালায়িত হন। এ সকলই সত্য। কিন্তু দাস্যে বা সখ্যে বা বাৎসল্যে যে আসঙ্গলিপ্সা দেখা যায়, মাধুর্য্যের আসঙ্গলিপ্সার সঙ্গে তার কোনও তুলনাই হয় না। এমন কি এই দুই আসক্তি যে একজাতীয় ইহাও মনে করা কঠিন হইয়া পড়ে। আপনার দেহ-মন-প্রাণ সমুদায় প্রিয়জনের দেহ-মন-প্রাণের মধ্যে একেবারে মিশাইয়া, একেবারে তাঁহাকে আত্মসাৎ ও তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিবার বাসনা এ রসে নিরতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। তার দেহটাকে এই দেহের অণুতে অণুতে টানিয়া আনিতে চাহে। এই দেহটাকে তার দেহের অণুতে অণুতে মিশাইয়া দিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। এই যে প্রবল পিয়াসা, ইহাই শৃঙ্গারের আসঙ্গলিপ্সা। এই অদ্ভুত আসঙ্গলিপ্সা আর কোনও রসেতে নাই। আর এই লিপ্সা যত বলবতী হয়, ততই এ স্থূল শরীরটাকে রসস্ফূর্ত্তির অন্তরায় বলিয়া বোধ হয়। তখন বাস্তবিকই মনে হয় এ অস্থিমাংসময় দেহ যদি গলিয়া জল হইয়া যায়, তবে সেই জলে প্রিয়-অঙ্গের অভিষেক করিয়া প্রণয়িজন আপনার দেহকে সার্থক ও জীবন সফল করিতে পারিত।

অগুরু চন্দন হতাম, তুয়া অঙ্গে মাখাইতাম
ঘামিয়া পড়িতাম তুয়া পায় হে!

এ কেবল একটা কথার কথা নহে। ইহাতে কেবল কবিকল্পনাসুলভ অতিশয়োক্তিই আছে বলিয়া মনে করা ঠিক নয়। ইহা মাধুর্য্যের সার্ব্বজনীন আকাঙ্ক্ষা ও অভিজ্ঞতা। এ রস শরীরটাকে ধরিয়া, শরীরটাকে নিঙাড়িয়া শরীরের শরীরত্বকে নষ্ট করিয়া, শরীরকেই আপনার ইন্দ্রজাল-প্রভাবে আত্মময় ও আত্মাকেই আবার যুগপৎ শরীরময় করিয়া তবে আপনার পরিণতি পাইবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে, কিন্তু পায় না। কারণ এ রস আনন্দস্বরূপ। যিনিরস স্বরূপ, শ্রুতি যাহাকে রসোহ বৈ সঃ বলিয়াছেন, এ রস তাঁহারই রসধারাকে আশ্রয় করিয়া, তাঁহারই নিখিল রসমূর্ত্তিকে পাইবার জন্য ফুটিয়া উঠে। এই জন্যই সাধক কবিকুল-চূড়ামণি চণ্ডীদাস এই শৃঙ্গার-রসের এমন মর্য্যাদা প্রচার করিয়াছেন:—

শৃঙ্গার বুঝিবে কে?
সব রসসার শৃঙ্গার এ।
শৃঙ্গার রসের মরম বুঝে।
মরম বুঝিয়া শৃঙ্গারে মজে॥
সকল রসের শৃঙ্গার সেরা।
রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা॥
কিশোর কিশোরী দুইটী জন।
শৃঙ্গার রসের মূরতি হন॥
চণ্ডীদাসে কহে না বুঝে কেহ।
যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ॥

প্রাকৃত শৃঙ্গাররসের মধ্যেই অপ্রাকৃত মাধুর্য্য জন্মে সত্য; কিন্তু এই শৃঙ্গার-রস-সম্ভোগের অধিকারীও জগতে সকলে হয় না।

উল্লাস এ রসের প্রাণ ; সম্ভোগে যেখানে স্বাভাবিক অবসাদ আনিয়া দেয়, সে ক্ষেত্রে এই শৃঙ্গাররস ফুটিতে পায় না। নির্ব্বীর্য্য লোকের কামক্রীড়াতে শৃঙ্গাররস জন্মিতে পারে না। প্রকৃত শৃঙ্গাররস যেখানে ফুটিয়া উঠে, সেখানে সম্ভোগে অবসাদ আসা তো দূরের কথা, কেবল উল্লাসই আরো উত্তরোত্তর বাড়িয়া যায়। এই জন্যই প্রকৃত মাধুর্য্যে সম্ভোগের পরে "রসোদ্গার" বর্ণিত হয়। এ রসোদ্গার অপূর্ব্ব বস্তু। ইহাতে প্রেমের জ্বলন্ত পিয়াসা ও অনন্ত অতৃপ্তি বর্ণে বর্ণে স্ফুরিয়া উঠে।

সখি! কি পুছসি অনুভব মোয়,
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে,
তিলে তিলে নূতন হোয়।

জনম অবধি হম, রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল :
লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥

ইহা প্রেমিকের কথা, কামুকের নহে। আর কাম ও প্রেম এক হইয়াও এক নহে।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলে কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

এই প্রেমই মাধুর্য্যের সার। ইহা কাম হইয়াও কাম নহে ; শারীর হইয়াও অশরীরী ; প্রাকৃত হইয়াও অপ্রাকৃত। এ রস রূপের মধ্যেই নিয়ত অরূপের শোভা ফুটায় ; অরূপের মধ্যেই নিয়ত রূপ জাগাইয়া তোলে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

রামাবতী

(৫)

সেকালের বাঙ্গালীর পক্ষে বাহুবলের প্রয়োজন ছিল। বাহুবলে আত্মরক্ষা করিতে হইত,—আত্মরক্ষার জন্য বাহুবলেই আত্ম-প্রাধান্য সংস্থাপিত করিতে হইত। কারণ, বাঙ্গালাদেশের উপর অনেকেই লোলুপ-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন,—অবসর পাইবামাত্র অনেকেই বাঙ্গালাদেশের উপর আপতিত হইতেন।

রাজেন্দ্র চোড় এইরূপে একবার বঙ্গভূমির কিয়দংশ লুণ্ঠন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে সাহসী হইয়া, তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিবার জন্য অনেকে অনেক চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং সেকালের বাঙ্গালীকে আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়াই বাহু-বলের অনুশীলন করিতে হইত। জনসমাজে তাহার প্রশংসা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল ;—কাব্যে ও কথোপকথনে তাহার জয়ধ্বনি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। জনসাধারণের ন্যায় রাজকুমারগণকেও বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়া লোকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইত।

তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের তিন পুত্রের

মধ্যে রামপাল সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি পিতার শাসনকালেই বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়া, সমগ্র অরাতিচক্রকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিলেন। ইহা তৎকালে সর্ব্বজন-পরিচিত ছিল বলিয়া ইহার কথা মদনপাল দেবের [মনহলি গ্রামে আবিষ্কৃত] তাম্র-শাসনে উল্লিখিত হইয়াছিল। যথা,—

"শান্ত্যেব চিরং জগন্তি
জনকে যঃ শৈশবে বিস্ফুরৎ।
তেজোভিঃ পরচক্র-চেতসি
চমৎকারং চকার স্থিরম্॥"

সে যুগে বাহুবলের প্রয়োজন ছিল, প্রতিষ্ঠা ছিল, প্রাধান্য ছিল। সেই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া, বালক বীর রামপাল যে বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়া, লোকসমাজে "সর্ব্বসম্মত" হইয়াছিলেন, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারিত। এরূপ অনুমান ঐতিহাসিক বিচারপ্রণালীতে অবলম্বিত হইবার অযোগ্য বলিয়া কথিত হইতে পারিত না। কিন্তু রামপাল যে সত্য সত্যই এরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, গৌড়-কবি সন্ধ্যাকরনন্দী [রামচরিতম্ কাব্যে] স্পষ্টাক্ষরে তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের পুত্রত্রয়ের মধ্যে বয়ঃক্রমে সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও, গুণগৌরবে রামপাল যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহার পরিচয় প্রদানের জন্য সন্ধ্যাকর লিখিয়া গিয়াছেন,—

"জ্যেষ্ঠেস্বেবু বিরেজে রামঃ।"

এখানে "জ্যেষ্ঠ" বলিতে যে বয়োজ্যেষ্ঠ বুঝিতে হইবে না, তাহা বুঝাইবার জন্য রাম-চরিতম্ কাব্যের টীকাকার স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন,—

"প্রশস্যতমঃ।"

রামপাল শ্রেষ্ঠ বলিয়াই "সর্ব্বসম্মত" হইয়াছিলেন। পালসাম্রাজ্যের অভ্যুদয়-কাহিনী স্মরণ করিলে বুঝিতে পারা যায়—প্রকৃতি-পুঞ্জের নির্ব্বাচনক্রমেই পালবংশীয় প্রথম নরপাল গোপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, সে সাম্রাজ্যে প্রজাপুঞ্জের অনুরাগ-বিরাগের মূল্য ছিল। তাহাদের বাহুবল ছিল; প্রয়োজন উপস্থিত হইলে একত্র মিলিত হইয়া রাজশক্তিকে সুসংযত করিবার সামর্থ্য ছিল; রাজার পক্ষে প্রজা-পুঞ্জের ইচ্ছাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহা-দিগকে লোকপ্রিয় হইতে হইত। লোকপ্রিয় হইবার জন্য যত্ন করিতে হইত। যাঁহারা তাহাতে কৃতকার্য্য হইতেন, তাঁহাদের নাম ঘরে ঘরে, নগরে নগরে, পথে ঘাটে ভক্তিভরে গীত হইত। তাহাই তাঁহাদের সিংহাসনকে অটল করিয়া রাখিত,—শাসনকে শক্তিদান করিত,—সমৃদ্ধিকে স্ফীত করিয়া তুলিত।

রামপাল সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও, "সর্ব্বসম্মত" হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হৃদয়ে নানা আশঙ্কা ঘনীভূত হইতেছিল। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়াই সে সিংহাসন লাভ করিতে সমর্থ হইবেন কি না, তদ্বিষয়েও সংশয় আন্দোলিত হইয়া উঠিতেছিল। অন্ততঃ রামচরিতম্ কাব্যে এইরূপ অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কোনও কালেই খলের অভাব ঘটে না। সেকালেও খলের অসদ্ভাব ছিল না। তাহারা মহীপাল দেবকে বুঝাইয়া দিয়াছিল,—

রামপাল যখন "সর্ব্বসম্মত," তখন পিতার দেহাবসানের পর, তিনিই রাজ্যলাভ করিবেন। তৃতীয় বিগ্রহপাল দেব দেহত্যাগ করিবামাত্র দ্বিতীয় মহীপাল দেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই, এই আশঙ্কার মূলোচ্ছেদ করিবার অভিপ্রায়ে শূরপাল ও রামপাল সহোদরদ্বয়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। রামচরিতম্ কাব্যে এই আখ্যায়িকা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাকে কবি-কল্পনা বলিবার উপায় নাই। কারণ, সমসাময়িক কবির পক্ষে এতদ্বিষয়ে অমূলক কাল্পনিক কাহিনীর অবতারণা করিবার সাহস ও সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। সুতরাং রামচরিতম্ কাব্যের এই আখ্যায়িকার উপর নির্ভর করিয়া বুঝিতে পারা যায়,—দ্বিতীয় মহীপাল দেবের কর্ম্মদোষে গৃহকলহে তাঁহার শাসন-শক্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। কেবল তাহাই নয়,—তাঁহার এই ভ্রাতৃদ্রোহ তাঁহার বিরুদ্ধে লোকচিত্ত প্রধূমিত করিয়া তুলিয়াছিল।

যিনি ভ্রাতৃদ্বয়কে কারারুদ্ধ করিয়া সিংহাসন অটল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার [অনীতিকারম্ভরত] নীতিবিগর্হিত অশিষ্ট আচরণে সিংহাসন টলিয়া উঠিল। পাল-সাম্রাজ্যের পক্ষে তাহার ফল বড় শোচনীয় হইল,—বাঙ্গালার ইতিহাসের পক্ষেও হয় ত তাহারই ফল অধঃপতনের প্রবল বেগ প্রবর্দ্ধিত করিয়া দিল। দেশে বিপ্লব উপস্থিত হইল।

এই সময়ে পালসাম্রাজ্যের রাজধানী যেখানেই থাকুক না কেন, তাহা যে বরেন্দ্র-মণ্ডলের অন্তর্গত ছিল, সন্ধ্যাকর তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বরেন্দ্র-ভূমি বহুসংখ্যক কৃষিক্ষেত্রে ও আবাসগৃহে অলঙ্কৃত ছিল বলিয়া সন্ধ্যাকর তাহাকে "সীতাবাসালঙ্কৃতা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাল-নরপালগণের জন্মভূমি ছিল বলিয়া সন্ধ্যাকর তাহাকে "জনকভূ" বলিয়া উল্লিখিত করিয়াছেন। সেই জনকভূ বরেন্দ্রী [কান্তা] কমনীয়া ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহীপাল দেবের নীতিবিগর্হিত আচরণে সেই জনকভূমি হইতে পালরাজগণের শাসন-ক্ষমতা উৎখাত হইয়া গেল। দ্বিতীয় মহীপাল দেব নিহত হইলেন। বিপ্লবের নায়ক কৈবর্ত্ত-নায়ক দিব্য বা দিব্বোক উচ্চরাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাসনদণ্ড তাঁহারই করতলগত হইল। এই বিপ্লব-কাহিনী কালক্রমে রূপান্তরিত হইয়া ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালীর স্মৃতিপট হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর কাব্যকথা তাহাকে আবার বাঙ্গালীর নিকট পরিচিত করিয়া দিতেছে, এই বিপ্লবকাহিনী বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। ইহা এখন "কৈবর্ত্তবিপ্লব" নামে কথিত হইতেছে। ইহার বিবরণ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবার যোগ্য।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

রাও বাহাদুর সর্দ্দার সংসারচন্দ্র

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুর্ভিক্ষকমিশনের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মন্ত্রিবর কান্তিচন্দ্রকে ভারতের নানাস্থানে কমিশনের বৈঠকে যোগদান করিতে হইয়াছিল। এই কার্য্যের জন্য নাগপুরে অবস্থান কালে ১৯০১ সালের ১৯ই জানুয়ারী তিনি স্বর্গারোহণ করেন। যে কর্ম্মক্ষেত্রে এই সুযোগ্য বঙ্গসন্তান বহুবর্ষ ধরিয়া অসাধারণ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন—সেখানে তাঁহার অভাব সম্যক্ অনুভূত হইতে লাগিল। এই বৎসর এপ্রেল মাসে মহারাজ সংসারচন্দ্রকে মন্ত্রি-সভার বৈদেশিক বিভাগের অন্যতম সদস্যপদে মনোনীত করিলেন। কৌন্সিলের বৈদেশিক বিভাগের (Foreign Department) কার্য্য বিশেষভাবে ভারত-গভর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের সহিত সংসৃষ্ট এবং রাজ্যের সাধারণ ব্যবস্থার ভারও এই বিভাগের উপর অর্পিত। কাজেই প্রথম হইতেই রাজ্যশাসন-কার্য্যের প্রধান ভার সংসারচন্দ্রের উপর পড়িল।

সংসারচন্দ্র যখন কর্ম্মভার গ্রহণ করেন, তখন জয়পুররাজ্যের বড় দুঃসময় চলিতেছিল। উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়ায় ভীষণ দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রজাবৃন্দ তখনও সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। প্রজাবৎসল মহারাজ মুক্তহস্তে প্রজাদিগকে সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতেছিলেন। ইহার উপর আবার রাজ্যে মহামারী প্লেগ দেখা দিয়াছে। গঙ্গোত্রী হইতে ফিরিয়া অবধি সংসারচন্দ্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। এই সকল নানা কারণে সংসারচন্দ্রকে প্রথম বৎসরে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সংসারচন্দ্র কিন্তু অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া রাজ্যে ও রাজকার্য্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া লইলেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বজনপ্রিয়া প্রাতঃস্মরণীয়া ভারতসাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। ভারত সম্রাট্ সপ্তম এডবার্ডের সিংহাসনারোহণ-উৎসবে যোগদান করিবার জন্য ১৯০২ সালে জয়পুরাধিপতি ইংলণ্ডে যাইবার নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইলেন। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু-নরপতির বিলাত-গমন এক অভিনব ঘটনা—শুধু জয়পুরের কেন সমগ্র ভারতের ইতিহাসে ইহা নূতন। হিন্দুর চির-ক্ষুণ্ণ পথে চালিত জয়পুররাজ্যের জনসাধারণ এ প্রস্তাবের বিপক্ষে, কেবলমাত্র সংসারচন্দ্রই একা এ বিষয়ে মহারাজের সহায়। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে একত্র করিয়া যে যে কারণে বর্ত্তমানকালে সমুদ্রগমন নিষিদ্ধ, সে সমুদায় নিরাকরণ করিলে এ যাত্রার কোন শাস্ত্রসঙ্গত বাধা আছে কি না জানিতে চাহিলেন। তারপর, বহু আলোচনার পর পণ্ডিত-বর্গের মত গ্রহণ করিয়া সংসারচন্দ্র মহারাজের বিলাত-গমনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। নব নির্ম্মিত একটি সমগ্র জাহাজ ভাড়া লওয়া হইল—

কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত রহিল যে কোন কর্ম্মচারীই শাস্ত্র-নিষিদ্ধ মাংসাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না। তারপর অর্ণবপোত-শুদ্ধি এবং সমুদ্র-পূজার ব্যবস্থা হইল। সঙ্গের সমগ্র লোকের ছয়মাসের আহার্য্য দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইল। মহারাজ স্বয়ং গঙ্গাজল ব্যতীত অন্য জল পান করেন না- তাঁহার জন্য পানীয় গঙ্গাজল যথারীতি হরিদ্বার হইতে লওয়ার ব্যবস্থা হইল। মহারাজের ইষ্টদেবতা গোপালজী সঙ্গে থাকিবেন, তাঁহার নিয়মিত পূজাদির দ্রব্য হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য দাঁতনকাটিটি পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যই পরিত্যক্ত হইল না। এই সময়ে সংসারচন্দ্রকে দৈনিক ১৮।২০ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত ব্যবস্থা স্বয়ং দেখিয়া শুনিয়া করা তাঁহার অভ্যাস। এ সকলের মধ্যেও রাজ্যের নিয়মমত সমস্ত কার্য্যই তাঁহাকে করিতে হইত—কোনও কর্ত্তব্যই তাঁহার দৃষ্টিপথের বাহিরে যায় নাই। রাজ্যশাসনের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া তিনি নিজে মহারাজের সহিত বিলাত গমন করিলেন। এই কার্য্যে সংসারচন্দ্র একক সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জয়পুর এবং মহারাজ মাধোসিংহের নাম জগতের নিকট সুপরিচিত করিয়াছিলেন। পরমহিন্দু জয়পুরাধিপের বিলাতগমন ইংলণ্ডে হিন্দুনরপতিগণের কি প্রকার সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা এখন ইতিহাসের সামগ্রী। হিন্দুর সমুদ্রযাত্রার নিষিদ্ধতার মূলে যে কোন শাস্ত্রসঙ্গত বাধা নাই তাহাও মহারাজের এই বিলাতযাত্রা হিন্দুর নিকট প্রমাণ করিয়াছে। পক্ষান্তরে ইহা জগতের কাছে হিন্দুর স্বধর্ম্মনিষ্ঠা প্রমাণ করিয়াছে। ইংলণ্ডে ভারত-সম্রাটের নিকট হিন্দুর প্রতিনিধিরূপে বিশেষ ভাবে সম্মানিত হইয়া মহারাজ সমগ্র হিন্দুস্থানের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।

মহারাজের বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর বৎসরই (১৯০৩) সপ্তম এডবার্ডের সিংহাসনারোহণ উপলক্ষে ভারতের পুরাতন রাজধানী দিল্লীতে লর্ড কর্জ্জন দরবার করিলেন। এই দরবারের পর রাজভ্রাতা ডিউক অফ্ কনট জয়পুরে শুভাগমন করেন। জয়পুরাধিপতিকে G. C. V. O. উপাধি প্রদান করিবার জন্য ভারত-সম্রাটের বিশেষ আদেশই তাঁহার জয়পুর আগমনের কারণ।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের বর্ত্তমান সম্রাট্—তৎকালে যুবরাজ (Prince of Wales)—পঞ্চম জর্জ্জ জয়পুরে আগমন করেন। যুবরাজের অভ্যর্থনায় সংসারচন্দ্র যে প্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন—তাহাতে তাঁহার রাজকার্য্যে দূরদর্শিতা কর্ম্মনিষ্ঠা এবং রাজভক্তির সবিশেষ পরিচয় পাইয়া স্বয়ং যুবরাজ এবং ভারতগভর্ণমেণ্ট বারংবার তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

সংসারচন্দ্রের মন্ত্রিত্ব-কালের কয়েকটি প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিয়া এক্ষণে আমরা তাঁহার শাসনপ্রণালীর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

ছোটবড় সকল কাজেই একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মের প্রবর্ত্তন করা সংসারচন্দ্রের চরিত্রের একটা বিশেষ গুণ ছিল—এ কথা আমরা বার বার দেখাইয়াছি; শিক্ষকতারই হউক আর মন্ত্রিত্বের কার্য্যই হউক—তিনি কখনও কোন কাজ এলোমেলো রকমের করিতে পারিতেন

না। তাই এত কার্য্যবাহুল্যের মধ্যেও তিনি সকল দিক্ দেখিবার সময় ও অবসর পাইতেন। মন্ত্রিত্ব প্রাপ্তির পর তিনি নিয়ম করেন যে সপ্তাহে তিনদিন তিনি সাধারণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবেন। তন্মধ্যে একদিন রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দ্দারদিগের সহিত তাঁহাদের বৈষয়িক বিষয়ে ও অন্যান্য আলোচনা করিতেন। এক দিন রাজ্যের নানাবিভাগের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের যাঁহার যে বিষয়ে জিজ্ঞাস্য বা পরামর্শ ও উপদেশ লওয়ার থাকিত, তাঁহারা দেখা করিয়া মীমাংসা করিয়া লইতেন। তৃতীয় দিনে প্রজাসাধারণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন—সে দিন ছোট-বড়, দীন-দরিদ্র সকলেরই অবারিত দ্বার; সকলেই তাহাদের অভাব অভিযোগ লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। তিনি অবহিতভাবে সকলের কথা শুনিতেন এবং সর্ব্ববিধ অত্যাচারের প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতেন। প্রজা-সাধারণের সহিত ব্যবহারে তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব এবং প্রজার প্রতি সহানুভূতি সবিশেষ প্রকাশ পাইত—দরিদ্র বা সহায়হীন বলিয়া কোন অত্যাচারিত বা দুঃস্থ তাঁহার কাছে বিমুখ হয় নাই। কেহ অন্যায় বা মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিলে তিনি ধীরভাবে তাহাকে তাহার ভুল বুঝাইয়া দিতেন—কখনও বিরক্তি বা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতেন না। তাই বিফলমনোরথ হইলে প্রত্যর্থী কেহ অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিত না।

রাজকর্ম্মচারিগণ যখন যে বিষয় লইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতেন—তিনি তৎ-ক্ষণাৎ তাহার সৎ মীমাংসা করিয়া দিতেন—সে সময় তাঁহার দূরদর্শিতা এবং রাজ্যের সর্ব্ব প্রকার কার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইত এবং রাজকার্য্য-পরি-চালনে বিশেষ শৃঙ্খলা ও সুবিধা হইত।

সুপণ্ডিত, উদারচেতা বিজ্ঞ লর্ড মর্লির মন্ত্রিত্বকালে ভারতবাসী যে সকল সুবিধা ও ক্ষমতা পাইবার জন্য উৎসুক—সংসারচন্দ্র জয়পুররাজ্যে সেই উদারনীতির প্রবর্ত্তনা করিয়া তাঁহার উচ্চ আদর্শের এবং দূরদর্শিতার সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। রাজ্যের শাসনবিভাগে যখনই কর্ম্মচারী পরি-বর্ত্তন বা নিয়োগের আবশ্যক হইত, তখনই তিনি স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিকে, বিশেষতঃ যাঁহারা জয়পুর কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সেই সকল কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। তাহার ফলে আজ স্থানীয় বহু-সংখ্যক শিক্ষিত-যুবক রাজকার্য্যের নানা বিভাগে প্রধান প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে বহুসংখ্যক যুবক সেটেল্-মেণ্ট, পুলিশ এবং কৃষিকার্য্যে বিশেষ ভাবে শিক্ষালাভ করিয়া রাজকার্য্যে ও রাজ্যের উন্নতিকল্পে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে প্রত্যক্ষ ভাবে রাজ্যের উন্নতি এবং পরোক্ষ ভাবে শিক্ষালাভের জন্য জনসাধারণের আগ্রহ জন্মিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তবে এই উদারনীতির উপস্থিত ফল সম্বন্ধে এত অল্প সময়ের মধ্যে কোন কথা বলা যায় না। কেননা জয়পুরের শিক্ষার অবস্থা দেখিলে মনে হয় সংসারচন্দ্র "fifty years ahead of his times" ছিলেন। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে তিনি যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, জয়পুরের ভবিষ্যবংশীয়েরা তাহার ফলে লাভবান্ হইবে এবং এমন দিন আসিবে

যখন সংসারচন্দ্রের এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল হইবে।

সংসারচন্দ্র জীবনের প্রথম অংশ শিক্ষা-বিভাগে কাটাইয়াছিলেন। মন্ত্রিত্বকালে তিনি শিক্ষাবিস্তারের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ন্যূনাধিক দুই শতাব্দী পূর্ব্বে সুবিখ্যাত মহারাজ সবাই জয়সিংহ যে জ্যোতিষ-যন্ত্রালয় নির্ম্মাণ করিয়া জগতের কাছে হিন্দুজ্যোতিষ-শাস্ত্রের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন—আজও যাহা পৃথিবীর পণ্ডিতমণ্ডলীর বিস্ময়ের বিষয়—সেই যন্ত্রালয়সমূহ এতদিন অব্যবহারে ও অপব্যবহারে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া পড়িতেছিল। সংসারচন্দ্র জয়পুর, দিল্লী, কাশী প্রভৃতি স্থানের সেই সকল 'যন্ত্রমন্দিরের" সংস্কারের জন্য বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়তা গ্রহণ ও অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া শুধু জয়পুর-রাজের কেন হিন্দুর এক প্রধান পুরাকীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছেন।

সংসারচন্দ্রের চেষ্টাতেই জয়পুর "মহারাজ কলেজের" বিজ্ঞান-বিভাগের সমধিক উন্নতি সাধিত হয় এবং আজ উপযুক্ত অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞান-বিভাগে উপযুক্ত যন্ত্রাদির সাহায্যে D. S. C. (ডি, এস্, সি) পর্য্যন্ত অধ্যাপনা হইতেছে; তিনি এইখানেই ক্ষান্ত ছিলেন না। মহারাজের এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল্ এল্ ডি (L. L. D.) উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে যে সভা হয়, তিনি সেই সভার প্রতি বৎসর দশটি ছাত্রকে নানাপ্রকার কার্য্যকরী শিক্ষা দিবার জন্য বৎসরে দশ হাজার টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করাইয়াছিলেন। এই সকল ছাত্র বিদেশে গিয়া যাহাতে পূর্ত্ত, ব্যবহার-শাস্ত্র এবং বিবিধ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভ করিয়া জয়পুররাজ্যের উন্নতিকল্পে প্রস্তুত হইতে পারে, তিনি তাহার বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন।

জয়পুররাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ সর্দ্দারদিগের সহিত সংসারচন্দ্র নানাপ্রকারে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। বর্ত্তমান সর্দ্দারগণের মধ্যে অনেকেই সংসারচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন এবং অধিকাংশের বংশের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল—তাই তিনি তাঁহাদের পুত্র বা তৎবংশীয়দিগের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহারই উপদেশে ও যত্নে এখন অনেকেই আজমীর মেয়ো কলেজে (Mayo College) শিক্ষালাভ করিতেছেন। সংসারচন্দ্র সর্দ্দারপুত্রগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। নাবালক সর্দ্দারগণের বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মন্ত্রিসভার তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া তিনি এই সকল "ঠিকানা"-পরিচালনের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার একান্ত যত্নে যে কত নাবালকের সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত হইয়াছে এবং কত ঋণভারগ্রস্ত "ঠিকানা" এই 'মুন্‌সরিমীর" কালে ঋণমুক্ত হইয়া উন্নতিলাভ করিয়াছে—তাহার বিস্তারিত আলোচনার স্থান ইহা নহে।

রাজকার্য্য এবং বিচারাদি যাহাতে সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হয়, সেজন্য সংসারচন্দ্র মন্ত্রিসভার কার্য্যপ্রণালীর বিবিধ পরিবর্ত্তন ও সংস্কার করেন। মন্ত্রিসভার চারিটি বিভাগ; প্রথম,—বৈদেশিক বিভাগ (Foreign Department), এই বিভাগের উপর রাজ্যের

আভ্যন্তরীণ শাসন এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য রাজ্যের সহিত রাজনৈতিক পত্র ব্যবহারের ভার ন্যস্ত। দ্বিতীয়,—রাজস্ব। তৃতীয়,—দেওয়ানী আপিল এবং চতুর্থ,—ফৌজদারী আপিল বিভাগ। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে সদস্যগণ প্রতিদিন প্রথমে নিজ নিজ বিভাগের কার্য্য শেষ করিয়া শেষে একত্র হইয়া "সমবেত মন্ত্রিসভার" নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতেন। এই শেষোক্ত সভার নাম—"ইজ্‌লাস্ জুম্‌লা মেম্বারান্"—ইঁহাদের কার্য্য কতকটা হাইকোর্টের Full Bench-এর মত—ইহাতে বড় বড় মোকদ্দমার আপিল এবং রাজ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার আলোচনা হয়। পূর্ব্ব নিয়মে সদস্যগণ প্রথমে নিজ নিজ "সিগা" বা বিভাগের কার্য্য করিয়া—শেষে—"ইজ্‌লাসের" গুরুতর কার্য্য আরম্ভ করিতেন। তাহার ফলে এই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কার্য্যে সর্ব্বদা নানা গোলযোগ, অব্যবস্থা এবং ত্রুটি লক্ষিত হইত। ইহাতে রাজ্যের এবং প্রজার—উভয় পক্ষেরই বিবিধ অসুবিধা ঘটিত। সংসারচন্দ্র এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য 'সিগার' এবং ইজ্‌লাসের কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দিন নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। এই সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তনে কার্য্যের যে শৃঙ্খলা ও সুবিধা হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

পূর্ব্বে মন্ত্রিসভায় উকিলদিগের বিশেষ কোন সম্মানই ছিল না। সংসারচন্দ্রের আমলে তিনি ইজ্‌লাসের কার্য্যে রাজ্যের এবং প্রজার পক্ষ সমর্থনের জন্য আইনজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তির সাহায্য পাওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া ব্যবহারাজীবদিগের যথাযোগ্য মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। পূর্ব্বে যেখানে অল্পশিক্ষিত মুক্তিগণ আদালতে নিজ নিজ মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করিত—আজ সেখানে এল্, এল্ বি পাশ করা আইনজ্ঞ উকিল মন্ত্রিসভায় ওকালতি করিতেছেন।

বর্ত্তমান কালে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং দেশের আর্থিক উন্নতি সাধনের প্রধান উপায়—রেলওয়ে। রাজপুতানার মত প্রায়শ দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশের পক্ষে রেলওয়ের মত দুর্ভিক্ষ নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায় আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বে যে সকল স্থানে আবশ্যক মত শস্যাদি প্রেরণের কোন উপায় ছিল না—রেললাইন সে সকল স্থান সর্ব্বপ্রকারে সুগম করিয়া দিয়াছে। ইহা রাজা-প্রজা সকলেরই লাভের কারণ। সংসারচন্দ্রের মন্ত্রিত্ব কালে "জয়পুর—সবাই মাধোপুর ষ্টেট রেলওয়ে" খোলা হয় এবং তাঁহারই পরামর্শে মহারাজ নবনির্ম্মিত "নগদা—মথুরা" রেলওয়ের যে ৮৫ মাইল জয়পুর রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে, তাহার নির্ম্মাণ খরচ দেওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। এই দুই রেলওয়ে লাইন রাজ্যের বাণিজ্য ও রাজস্ব বৃদ্ধির কারণ হইয়াছে। সংসারচন্দ্রই প্রস্তাবিত "জয়পুর—শিখাবতী" রেললাইনের সূত্রপাত করিয়া যান—কিন্তু নানা কারণে তাঁহার জীবিত কালের মধ্যে কাজ আরম্ভ হইতে পারে নাই—কেবল সর্ভে ও এষ্টিমেট হইয়াছিল মাত্র। এই লাইন সম্পূর্ণ হইলে—জয়পুর রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম প্রদেশ সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি লাভ করিবে।

সংসারচন্দ্র জয়পুরের ডাকবিভাগের

কার্য্যপ্রণালীর আমূল সংশোধন করিয়া ইহাকে এক প্রকার নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন। তিনিই জয়পুররাজ্যের ডাক টিকেট প্রথমতঃ প্রচলন করেন। পূর্ব্বে চিঠী প্রভৃতি ডাকঘরে দিবার সময় মাশুল আদায় করা হইত অথবা চিঠী বা পার্শেল প্রভৃতি বেয়ারিং হইয়া মাশুল আদায় হইত। সংসারচন্দ্র ইংরাজী ডাকবিভাগে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া এবং ডাকের নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া এই বিভাগের সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি করেন। ডাকের সুব্যবস্থা হওয়ায় প্রজারা রাজ্যের ডাক-বিভাগের উপর অধিকতর আস্থাবান্ হওয়ায় রাজ্যে ডাকঘরের এবং পত্র-পার্শেলের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইল। তিনি রাজ্যমধ্যে ডাক-বিভাগের উন্নতি সাধন করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না—তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া লর্ড মিণ্টোর দরবারে জয়পুরের সহিত গভর্ণমেণ্টের Postal Convention-এর প্রতিশ্রুতি আনাইয়াছিলেন, কিন্তু করাল কাল তাঁহাকে ইহা সম্পূর্ণ করিতে দিল না।

রাজকার্য্যের প্রতি বিভাগেই সংসারচন্দ্র ক্ষুদ্রবৃহৎ নানা প্রকার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। সাধারণ পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে আমরা তাহার সবিস্তার বর্ণনা হইতে বিরত থাকিলাম। তিনি নিজের অসাধারণ চরিত্রবলে সমগ্র রাজকর্ম্মচারী ও রাজস্বের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা অনন্যসুলভ। যে দেশে উৎকোচ গ্রহণ কখনই অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইত না—সেখানে তিনি সদ্বংশজাত শিক্ষিত কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া, দোষীকে দণ্ড দিয়া এবং উপদেশ ও আদর্শের দ্বারা দেশীয় রাজ্যের এ কলঙ্ক মোচনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, সর্দ্দার ও সাধারণ প্রজার কোন ভেদ ছিল না; তিনি অত্যাচারিতের বন্ধু এবং দরিদ্রের সহায় ছিলেন। তিনি জ্ঞানতঃ কখন ন্যায় ও সত্যের পথ হইতে রেখামাত্রও ভ্রষ্ট হ'ন নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষমাত্রেরই ভ্রম হইতে পারে—সংসারচন্দ্রও মানুষ—তিনিও অভ্রান্ত ছিলেন না; কিন্তু তাঁহার পরম শত্রুও কখন তাঁহার ন্যায়পরতা ও সততা সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র করিতে পারে নাই।

সংসারচন্দ্র মহারাজ মাধো সিংহের একান্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন এবং তিনি সর্ব্বদা বলিতেন যে আমার দ্বারা যদি রাজকার্য্যের কোন সুবিধা বা উন্নতি হইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ আমার নিজের ক্ষমতা নহে—মহারাজার গুণে। বাস্তবিক তাঁহার প্রতি মহারাজের এত গভীর বিশ্বাস ও নির্ভরতা ছিল যে তিনি সংসারচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত সর্ব্বপ্রকার সংস্কার বিশেষ ভাবে সমর্থন করিতেন এবং যাহাতে সে সকল নিয়ম কার্য্যে পরিণত হয়, সে বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিতেন। কেহ কেহ বলেন যে মন্ত্রী সংসারচন্দ্র দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন এবং রাজ্যশাসনে অনেক সময় দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছেন। যে দেশে ন্যায়-অন্যায়-নির্ব্বিচারে স্বার্থসিদ্ধিই রাজনীতির মূল মন্ত্র, যেখানে পরপীড়নেই ক্ষমতার সার্থকতা এবং বাহ্যাড়ম্বরেই পদগৌরবের প্রকাশ, সেখানে ধর্ম্মভীরু ন্যায়নিষ্ঠ এবং স্বভাবতঃ ভদ্র ও বিনয়ী সংসারচন্দ্র যে শাসনকর্ত্তার সে আদর্শে পৌছিতে পারেন নাই, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। সেখানকার তুলাদণ্ডের পরিমাণে

ভদ্রতা ও বিনয়—দুর্ব্বলতা, ন্যায়পরতা—দুর্ব্বলতা, ধর্ম্মজ্ঞান—বিষয়বুদ্ধির অভাবের পরিচায়ক। সৌভাগ্যের বিষয় সংসারচন্দ্র সে আদর্শকে কখনও সম্মান করিতে পারেন নাই। তিনি শান্ত, সংযত, আড়ম্বর-শূন্য হইয়া নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বার্থকে ধর্ম্মের ন্যায়ের আসনে বসান নাই। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং প্রভুপরায়ণতা তাঁহার জীবনের সর্ব্বকর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্ম্মকে বজায় রাখিয়া যাঁহারা রাজ্যশাসনকার্য্যে ব্রতী হয়েন, তাঁহাদের পক্ষে এ পথ যে কত কঠিন এবং বিপদ্‌সঙ্কুল, তাহা বিস্তারিত ভাবে বলা সম্ভব নহে। সংসারচন্দ্র ধর্ম্মের এবং ন্যায়ের সহস্র সংযমের মধ্যে যাহা করিয়া গিয়াছেন—তাহা তাঁহার মত যাঁহারা ধর্ম্মকে একমাত্র মানদণ্ড এবং ভয় করিবার বস্তু বলিয়া জানেন—যাঁহারা ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কিছুতেই ভীত হ'ন না—তাঁহাদের পক্ষেই সম্ভব।

রাজপুত এবং রাজপুতানার বিশেষতঃ জয়পুরের ইতিহাস, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে সংসারচন্দ্রের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল—তাহা মহারাজ এবং মন্ত্রিসভার সদস্যমণ্ডলীর নিকট রাজ্যের নানা জটিল বিষয়ের মীমাংসার পক্ষে অমূল্য ছিল। তাঁহার চরিত্রের প্রভাবেই জয়পুর রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ দুর্দ্ধর্ষ রাজপুত-সর্দ্দারগণ সসম্মানে এই ন্যায়নিষ্ঠ বাঙ্গালীর নিকট অবনত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ভারত গভর্ণমেণ্ট এবং পর পর অনেক রেসিডেণ্ট এবং রাজপুতানাস্থিত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ সংসারচন্দ্রকে একান্ত বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহরা একবাক্যে তাঁহার রাজভক্তি, কর্ম্মনিষ্ঠা এবং উদার শাসনপ্রণালীর সুখ্যাতি করিয়াছেন।

মহারাজ এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট কেহই সাধুপ্রকৃতি প্রভুপরায়ণ সংসারচন্দ্রের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই। অভিষেক-দরবারে মহারাজের সহিত বিলাত-প্রবাস কালে সম্রাট্‌ সপ্তম এডবার্ড তাঁহাকে "করোনেশন মেডেল" এবং তাহার পর বৎসর দিল্লী-দরবারে ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান সম্রাট্‌ পঞ্চম জর্জ (তৎকালে যুবরাজ) জয়পুরে আসিয়া সংসারচন্দ্রকে M. V. O. (Member of the Royal Victorian Order) খেতাবে ভূষিত করিয়াছিলেন এবং এই বৎসরেই জয়পুরাধিপতি তাঁহাকে রাজ্যের "তাজিমী" বা প্রধান সর্দ্দারশ্রেণীভুক্ত করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। দুই বৎসর পরে, (১৯০৭) মহারাজ প্রকাশ্য দরবারে সংসারচন্দ্রকে "প্রধান মন্ত্রী" পদে বরণ করিয়া তাঁহার কৃতকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ জায়গির প্রদান করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে নববর্ষারম্ভে ভারত গবর্ণমেণ্টর সংসারচন্দ্রকে C. I. E. উপাধি প্রদান করেন। সেই বৎসর মার্চ্চ মাসে ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি, মৃত্যুশয্যায় শায়িত এই প্রবীণ, প্রভুভক্ত রাজকর্ম্মচারীকে তাঁহার গৃহে আসিয়া উক্ত উপাধি পদক প্রদান করিয়া যোগ্যতা ও কর্ম্মনিষ্ঠার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করেন।

(ক্রমশঃ)

[illegible] নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, মেটকাফ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত

বন্দনাদি সার্ব্বভৌম তৎক্ষণাৎ সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। গৌর প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

সার্ব্বভৌম একদিন নিম্নলিখিত বন্দনা-শ্লোক দুইটি জগদানন্দ দ্বারা গৌরসমীপে প্রেরণ করিলেন।

বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ১

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুম্ কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥২

মুকুন্দদত্ত গৌরের নিকট পত্রী পৌঁছিবার পূর্ব্বে ভিত্তি-গাত্রে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই শ্লোক দুইটি আজিও ভক্তের মুখে মুখে উচ্চারিত হইতেছে। গৌর শ্লোক দুইটি পাইয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। (ক্রমশ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

নক্ষত্র-পূজা

অতি প্রাচীনকালে অসভ্য অবস্থায় কি আর্য্য কি তুর্ক কি য়িহুদি কি চীনেম্যান মানবমাত্রেই নক্ষত্র * পূজা করিত। ইহা সহজেই উপলব্ধি হয়।

নিশার ঘোর অন্ধকারে ভয়াকুল, হিংস্র জন্তুর গর্জ্জনে কম্পবান বনবাসী আদিপুরুষগণের ভয়ত্রাতা পিতা সূর্য্য ভিন্ন আর কে ছিল? শীতে কাতর বনবাসীর দেহে তাপ-সঞ্চার করিতে "প্রাচীন নক্ষত্র" ব্যতীত কে সক্ষম ছিল? চন্দ্র ও তারাগণের বিমল জ্যোতি মানবের শ্রান্তচিত্ত দিনান্তে যেমন স্নিগ্ধ করিতে পারে, তেমন স্নিগ্ধকর মোহিনীশক্তি আর কাহারও নাই। "সবিতা সত্যধর্ম্মা" উদিত হইলেই বনবাসীর ভয় দূর হইত, দেহে তাপের সঞ্চার হইত। বনবাসী আহার-সংগ্রহে সাহসী হইতেন। দৈনিক পর্য্যটন অন্তে নৈশ নভোমণ্ডলের সুবিমল জ্যোৎস্নায় বনবাসী শ্রান্ত চিত্ত, ক্লান্ত দেহ সুস্নিগ্ধ করিতেন।

কাজেই তিনি কৃতজ্ঞতার বশে ভক্তির চক্ষে নক্ষত্র দর্শন করিতেন। ক্রমে নক্ষত্র তাহার ভয়হর্ত্তা পিতা ও শান্তিদাত্রী মাতা হইলেন।

প্রাণ ও রয়ি আদি বনবাসীর পিতা মাতা হইলেন। সবিতা জগতের প্রাণ, চন্দ্রমা জগতের রয়ি। উভয়ে কৃতজ্ঞ বনবাসীর চিত্ত-পুত্তলিকা হইলেন। সবিতা ঈগল পক্ষী, শকুনি, রক্তবর্ণ চক্রবাক, হংসাদির ন্যায় বিমানে উড্ডীন হয় বলিয়া গরুত্মান্, শকুনি, লোহিত পক্ষী ও হংস উপাধি পাইলেন। সবিতা প্রকাণ্ড মহিষের বীরদর্পে বরাহের অটলবিক্রমে অগাধ পারাবার-বারি হইতে উত্থিত হয়। সবিতা ঘনঘটা-গর্জ্জন সহ সিংহের লম্ফে লম্ফে উদয়-গিরি আরোহণ করে। সিংহের চক্ষুর মত সবিতা মুহূর্ত্তের জন্যও মুদিত হয় না। তাই

* চন্দ্রসূর্য্যাদি নক্ষত্র।

সবিতা 'মহিষ' 'বরাহ' 'সিংহ' ও 'হরি' নাম উপহার পাইলেন।

শুক্ল ও কৃষ্ণ—চন্দ্রের এই দুই পক্ষ। আবার চন্দ্র মিনিটে ৪০ মাইল চলে। বনবাসী চন্দ্রকে দ্বিজরাজ খেতাব দিলেন। বনবাসী দেখিলেন শুভ্র শশকের ন্যায়, শুভ্র বিড়ালের ন্যায় লক্ষ্মময় চন্দ্রমা বিমানে বিচরণ করেন। চন্দ্রমা 'শশ', বিড়াল, ও লক্ষ্মী নাম উপহার পাইলেন।

সবিতা ও চন্দ্রমার উদয়ে ভক্তিরসে ডুবিয়া আনন্দে মগ্ন আদিমানব মূর্ত্তিমান্ 'বাউরা আদ্‌মী'র তানে বাউলের সুরে গীত ধরিলেন—

ভেবে মরি কি সম্বন্ধ
তোমার সনে
তুমি হবে কেউ আমার
আপনা হতে আপনার
আপনা হতে নইলে
মন কি টানে
তোমার পানে—
আপনা হতে নইলে
প্রাণ কি টানে
ওহে জনক কি জননী
ভাই কি ভগিনী
প্রণয়িনী স্ত্রী কি
পুত্র কন্যে
এ নয় তোমাতে সম্ভব
এ কি অসম্ভব
সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবিনে।"

আদি বাউলের সংজ্ঞালাভ হইল, বাউল বিস্মিত লজ্জিত হইয়া চিন্তামগ্ন হইলেন এবং তিনি দিন দিন ভাবিতে লাগিলেন। অগ্নিময় হইলেও সবিতা জড়বস্তু, জ্যোৎস্নাময় হইলেও "লক্ষ্মীভ্রাতা শীতরশ্মিঃ" জড়বস্তু। বনবাসী বাউলের মনে ক্রমে জ্ঞানের সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন জড়বস্তু ত আমার ভক্তি গ্রহণ করিতে পারে না, আমার দেবতা "সবিতৃ-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী" চিন্ময় বিষ্ণু, কাজেই সিদ্ধান্ত হইল "দেবগৃহাঃ বৈ নক্ষত্রাণি"। বনবাসী বাউলের নক্ষত্র-পূজা বহাল রহিল এবং তিনি সত্যের পথে অগ্রসর হইয়া 'সবিতা সত্য-ধর্ম্মার' উপাসনায় ব্রতী হইলেন।

সুমেরুস্থিত বনবাসী দেখিলেন ছয়মাস কাল জলময় পাতালে অলক্ষিত বাসের অব-সানে সবিতা রুদ্রমূর্ত্তি ধারণে তারাবৃষের ককুদ-আরোহণে রৌদ্রবিতরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

রুদ্রদেবের বাহন বৃষরাশি হইল। ককুৎস্থ সূর্য্য নারায়ণের বাহন মহান্ উক্ষা হইল। তাই সূর্য্যবংশীয় শ্রীরামচন্দ্রকে "কাকুৎস্থং করুণাময়ং" বলিয়া প্রণাম করিতে হয়।

তিনি দেখিলেন—আদিম কালের আদিত্য-পথ (ছায়া-পথ) ভেদ করিয়া উদিত সূর্য্য নারায়ণ নিশার অন্ধকার বিনাশ করিলেন। ছায়া-পথ স্ফটিক স্তম্ভ আকৃতি। ইতিহে নারায়ণ নৃসিংহ আদিত্য-পথ স্ফটিকস্তম্ভ এবং নিশা হিরণ্যকশিপু (নক্ষত্র যাহার বস্ত্র) নাম ধারণ করিলেন।

বনবাসী কার্ত্তিকী পূর্ণিমার রাত্রিতে দেখিলেন—অমৃতস্রাবী চান্দ্র বিড়ালের পৃষ্ঠে ষট্‌কৃত্তিকা নক্ষত্র "শিশূনাম্ পালয়িত্রী" ষষ্ঠী (ষট্‌মাতৃকা) রূপে আসীন আছেন। বিড়াল ষষ্ঠীর বাহন হইল। প্রাতঃসূর্য্য ব্রহ্মা নামে সৌর হংসে আসীন থাকেন। হংস

ব্রহ্মার বাহন হইল। মধ্যাহ্নসূর্য্য জগৎব্যাপী বিষ্ণু। সূর্য্য-নারায়ণ মধ্যাহ্নে সৌর গরুড়ের পৃষ্ঠে আসীন থাকেন। গরুড় নারায়ণের বাহন হইল। সায়াহ্ন-সূর্য্য তেজ সঙ্কোচ করিয়া "যম" নাম গ্রহণ করেন।

সুমেরুস্থ বনবাসী দেখিলেন; 'যম' দেব ছয় মাসের পর তারা বৃশ্চিকের কবলে পতিত হইলে অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইতে থাকেন, কালান্তক বৃশ্চিক সর্প—'যম' 'মহাকাল' রুদ্রদেবের অঙ্গভূষণ হইল। এবং সৌর মহিষ 'যম' দেবের বাহন হইল। এই রূপে সৌর হংস পৃষ্ঠে ব্রহ্মা প্রতিষ্ঠিত, সৌর গরুড় পৃষ্ঠে বিষ্ণু প্রতিষ্ঠিত, সৌর মহিষ পৃষ্ঠে রুদ্র যম প্রতিষ্ঠিত হইলেন। একে তিন, তিনে এক। এই হিন্দুর ত্রিমূর্ত্তি—সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণে ভূষিত এবং সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা। পাশ্চাত্যের ত্রিনীতি—ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র এবং ঈশ্বর পবিত্রভূত (যম) এই হইল ত্রিনীতি (Trinity)। কাজের বেলা মিল নেই। ময়না পড়ে বেশ কিন্তু বুঝে না। মহাকাল রুদ্রদেব নারীবেশে মহাকালী হইলেন। জংঘায় বৃশ্চিক ভূষণ হইলেন। এবার মূর্ত্তিমান্ রুদ্রদেব বাহন। পদ-দলনে মৃত্যুঞ্জয় মরিবার নহে। "কালীর চেলা" (গ্রীক-চেলাই) হিন্দুর অবধ্য। সন্ন্যাসীর চেলা কি বস্তু!

বনবাসী জানিতেন যে বৃশ্চিক সর্পের কবলে পড়িলে সূর্য্যের তেজ অপহৃত হয়। তিনি এক দিন দেখেন দিনে দুপুরে অন্ধকার উপস্থিত, সূর্য্য অদৃশ্য। তিনি তখনই স্থির করিলেন বৃশ্চিক সর্প অলক্ষিত ভাবে আসিয়া সূর্য্য গ্রাস করিয়াছে। বৃশ্চিক সর্প লুক্কায়িত (রহসি-স্থিত) বলিয়া "রাহু" নাম পাইল, আবার গ্রহণকালে সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় ছটা (Corona) বাহির হয়। বনবাসী মনে করিলেন বিমানস্থ কোন ভানুর ছটা হইবে। জ্যোতির্ম্ময় ভানু সূর্য্যের তেজ হরণ করিল। যথা—সূর্য্যের উদয়ে গগনের তারা অদৃশ্যভাবে থাকে। তাই অমর সিংহ বলেন—"তমস্তু রাহুঃ 'স্বর্ভানুঃ'।" চিন্তাশীল পাঠক বুঝিবেন —পদার্থ তিনটী পৃথক্, কিন্তু তাহাদের ব্যবসা এক। তাই অভিধানে তুল্যমূল্য হইয়াছে। একটী শব্দ অপর শব্দদ্বয়ের প্রতি-শব্দ হইতে পারে না। তমঃ = স্বর্ভানু? বনবাসীর হৃদয় নিশার সহচর হুতুমের স্বরে কম্পিত হইত। ফলিত জ্যোতিষের আশীর্ব্বাদে হিন্দুর হৃদয় ফের বনবাসে গিয়াছে। টিকটিকীর ডাকে রক্ষা নেই। তা ত হুতুম। তার নাম শুনিলেই "অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়ে থাকিয়ে।" এ সব অপূর্ব্ব মনুষ্যত্বের পরিচয়। কিন্তু হিন্দু মনে করেন না যে মূষিক ভক্ষণের গুণে ঐ হুতুম মা লক্ষ্মীর বাহন হইয়াছে। গৃহে আসিলে তাহাকে অভ্যর্থনা করা হিন্দুর হিতজনক। মূষিক ঝড় গুণা-পড়া করিতে বেশ দৈবজ্ঞ। ভাবী ঝড়ের পূর্ব্বে জাহাজের নৌ-নিগড় তুলিলে মূষিক-দল জাহাজ হইতে লাফাইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্রের জলে পড়ে এবং সাঁতার দিয়া কিনারা লয়। জাহাজের বিলাতী কাণ্ডারী ঠেকে শিখিয়াছেন যে, মূষিক চম্পট দিলে জাহাজ ভাসাইতে নাই। সেই মূষিক মনোজব বৃহস্পতির বাহন। বেদে "ত্বং গণানাং গণ-পতিঃ" বলায় দেবগুরু বৃহস্পতি গণেশ নামে সকলের আগে পূজা লইতেছেন। আবার

দিক্‌হস্তিগণ পৃথিবীতে জল ঢালে। আবার "বারিপূর্ণাং মহীং কৃত্বা পশ্চাৎ সঞ্চরতে গুরুঃ।" সঙ্কেত-তত্ত্বে হাতী বৃহস্পতির প্রতিকৃতি। তাই বলে "গণেশং পেটডগরং হাতীশুড়ং" নমোঽস্তু তে।

পুরাণের আকাশগঙ্গা বেদের (আকাশ) সরস্বতী ছিলেন, কারণ উভয়েই ছায়াপথে অধিষ্ঠিত।

ছায়াপথ-তলে মকর রাশি অধিষ্ঠিত আছে এবং তাহার উত্তরে তারাহংস ও পার্শ্বে বীণা-মণ্ডল (Lyra) অবস্থিত আছে। তাই আকাশ-গঙ্গাকে ধ্যান করি :—

'সিতমকরনিষণ্ণাং"

আর সরস্বতীকে নমস্কার করি—"বীণারঞ্জিত পুস্তক-হস্তে।" তারা-হংস আকাশ-গঙ্গার দূত। ভীষ্মদেবের নিকটে সংবাদ লইতে গিয়াছিলেন। আবার তারাহংস সরস্বতীর বাহন।

দেবরাজ ইন্দ্র "বৃহৎ রথে" আরোহণ করেন।

"যত্র রথস্য বৃহতঃ বিধানম্" (ঋক্) সর্প নহুষরাজ শচীলাভের দুরাশায় ব্রহ্মর্ষিগণ-বাহিত "শিবিকা" আরোহণ করিলেন। এই "বৃহৎ রথ" বা "শিবিকা" সপ্তর্ষিগণ গঠন করেন। বেবিলন নগরে এই বৃহৎ রথ "মার্গিড্ডা" নাম পাইয়াছিল। তর্জ্জামা-রাজ য়ুরোপে সপ্তর্ষি-মণ্ডল Long Chariot নাম পাইয়াছে। কেহই মার্গিড্ডা বা Long Chariot কাহার সে খবর রাখেন না। ইন্দ্রের বৃহৎরথ বা শিবিকা সামান্য বস্তু নহে। দু'দিনের জন্য স্বর্গ-সিংহাসনে বসিয়া, ইন্দ্রের বৃহৎরথে নহুষরাজ উঠিলেন। অগস্ত্যের শাপে পরমব্যোম হইতে নহুষ 'পপাত ধরণী-তলে"। তবে মণিপুরের রাজবংশ অদ্যাপি এই স্বর্গরাজকে নিত্য দুধকলা দিয়া পূজা করিতেছেন। এবং চীনসম্রাট এই সর্প-রাজকে রাজপতাকায় উড়াইতেছেন।

ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঋষিরেখা কন্যা রাশিতে ছিল। তখন তারা কন্যা রাশি-চক্রের শীর্ষ স্থান অধিকার করিত। সিংহ রাশি কন্যার তলদেশে ছিল। প্রকাণ্ড জল-সর্প (Hydra) তারা কন্যার কর (হস্তা-নক্ষত্র) শোভিত করে।

সিংহবাহিনী তারা কন্যা রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ও সৌম্যমূর্ত্তি এই উভয় মূর্ত্তিতে পূজিত। তারা সর্প একের করে এবং অন্যের স্কন্ধে বিরাজিত। পাঠক বুঝিয়া লইবেন। তারা কন্যার মাথার উপর ভূতেশ মণ্ডলে (Bootes) রুদ্রদেব বসিয়া আছেন।

বনবাসী দেখিতেন যে সর্প ও ব্যাঘ্র জীবের বিনাশক। তাই তিনি মহাকাল রুদ্রদেবের দেহ "ব্যাঘ্রকৃত্তিবসানং" এবং সর্পশোভিত করিলেন। তারা ব্যাঘ্র (Lupus) বৃশ্চিক সর্পের তলে বসিয়া আছে। "সেই বুড় বলদ আছে পুঁজি" বুড় বলদ ছাড়িবে না। কাজেই ব্যাঘ্র বাহন হইতে পারিল না। ব্যাঘ্রচর্ম্ম বসন হইল। সুমেরুস্থিত বনবাসী দেখিলেন যে ছয়মাস স্থায়ী নিশার অবসানে রৌদ্রহীন বাল-সূর্য্য বলির (Orion the Giant) শিরোদেশে উদিত হইতেছেন। ঘটনাটী দুই হাজার বর্ষের পূর্ব্বেকার। বাল-সূর্য্য উঠিয়াও উঠে না। আপন খেয়ালে বসিয়া থাকিল। বনবাসী Parallaxএর অধ্যায় ত পড়েন নাই, কাজেই অবাক্ হইলেন। তিনি দেখিলেন

বলির দ্বারে (Equinox) হরি বন্ধ হইলেন। ক্রমে হরি-সূর্য্য বলির মস্তকোপরে উঠিয়া সৌম্য ধ্রুব হইতে যাম্য ধ্রুব পর্য্যন্ত কিরণ বিস্তার করিয়া বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। বনবাসী "নমস্তে বামন!" বলিয়া সাষ্টাঙ্গে বাল-সূর্য্যকে প্রণিপাত করিলেন। বলি বামনের বাহন হইলেন এবং "বলির দ্বারে বামন বদ্ধ" প্রবাদ রটিল।

ভক্তিশূন্য সফোক্লিস্ দেখিলেন অন্ধ বলি বামন স্কন্ধে লইয়া পথ দেখিতে পাইলেন। গ্রীসদেশ হইতে ইয়ুরোপে "Dwarf on the Giant" প্রবাদ ভাসিল। বনবাসী দেখিলেন যে কালপুরুষ-মণ্ডলে (Orion) সুন্দর ময়ূর-পৃষ্ঠে স্কন্দদেব বসিয়া আছেন। স্কন্দদেবের শিরোদেশে তারা কুক্কুট অবস্থিত রহিয়াছে। ময়ূর ও কুক্কুট উভয়েই রণদুর্ম্মদ, উভয়েই পরম রূপবান্। স্কন্দদেব চীন হইতে পেরু পর্য্যন্ত রণবীর কুমার খ্যাতি পাইলেন। যোদ্ধৃ-তারা (Bellatrix) তাহার সাক্ষী। গ্রীসদেশে কুমার Kanda-on [=the Prince] খ্যাতি পাইলেন। Scandinavia তাহার রাজ্য হইল। আবার নারীবেশে কুমারী ময়ূর-পৃষ্ঠে উঠিতে রাজি কি না সন্দেহ। তাই পড়ি—

"ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থে চ নারায়ণি! নমোঽস্তুতে॥"
(চণ্ডী)

গ্রীসদেশে কুমার (Orion) "Cock's fort উপাধিমাত্র পাইয়াছিলেন। ময়ূর বুঝি গ্রীসদেশে নাই ?

তারাস্তবক মধুচক্র (Bee-hive) মান্দ্রাজে পুষ্যা নক্ষত্র। পুষ্যরথে হরি উঠিলেই বর্ষা আরম্ভ হইত এবং নববর্ষের আগমন হইত। রথযাত্রার দিনে হরির বাহন পুষ্য রথ, গরুড় নহে। অয়নাংশের গতির ফলে উত্তর-অয়নান্ত বিন্দু (Summer Solstice) কর্কট-রাশিস্থ পুষ্য-নক্ষত্র ছাড়িয়া মিথুনরাশিস্থ আর্দ্রা নক্ষত্রে আসিয়াছে। রথযাত্রার দিনে গোল বাধিল। সুচতুর মন্ত্রজীবী ঠকিবার নহে। "আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্য-সংযুতা", বচনের বলে হরির রথ আরোহণ চলিত হইল। "মধু অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" বচনের নজীরে মিথুন-রাশিস্থ হরি রথে উঠিলেন এবং রাশিচক্র পরিভ্রমণ উল্‌টা রথে দেখাই-লেন। দুঃখ এইমাত্র যে দক্ষিণ-অয়নগামী হরির রথ দক্ষিণে যাইবে। উত্তর অয়ন-গামী হরির রথ উত্তর-অভিমুখে চলিবে। মূল অভিনয় কেহ দেখেও না—বুঝেও না। যিনি উপদেশ দিবেন তিনি দক্ষিণা গাঁটে বাঁধিয়া প্রস্থান করেন। হাটুরেরা যে দিকে রাস্তা পায় সেই দিকে রথ টানে আর রথে গোল বাধায়। হরির কি বিড়ম্বনা দেখ।

বর্ষারম্ভে রুদ্র সূর্য্য মহান্ শ্বা নক্ষত্রে (Dog Star) উপনীত হইয়া থাকেন। তখন য়ুরোপে "কুক্কুর দিন" (Dog days) উপস্থিত হয়। ভারতে রুদ্রদেব বলদ ছাড়িয়া কুকুরের পৃষ্ঠে চড়েন। তাহার নাম হইল "শ্বাশ্ব"। সেকালে হরি-সূর্য্য পুষ্যানক্ষত্রে উঠিলে তৎপরদিন তিনি তারা-জলসর্পের (Hydra) পৃষ্ঠে ভর করিতেন। হরির শয়ন আরম্ভ হইত। জলসর্প কর্কট হইতে বৃশ্চিক পর্য্যন্ত লম্ববান রহিয়াছে। তারা চিত্র দেখ, সত্য কি মিথ্যা।

জলসর্প অনন্তসর্প নাম ধারণ করিয়া সূর্য্য-হরিকে বৃশ্চিক রাশিতে লইয়া হাজির করিলেন। অগ্রহায়ণ মাসে উত্থান একাদশীর

দিনে হরির দক্ষিণ অয়নজাত নিদ্রার অবসান হইল। সম্মুখে গরুড় (Aquila) উপস্থিত। অনন্ত সর্পকে বিদায় দিয়া হরি-তারা গরুড়-পৃষ্ঠে উঠিলেন। সমুদ্র-শয্যা পরিত্যক্ত হইল। য়ুরোপের কুকুর দিন ভারতের অম্বুবাচি (বর্ষাবক্তা)। অম্বুবাচি হইতে আরম্ভ করিয়া উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত হরি সূর্য্যের নিদ্রাকালে সূর্য্য-অগ্নিকে সচেতন করিতে নাই। তাই সূর্য্য-পক্ক অন্ন ও ফল-মূল আহারে মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ দক্ষিণ অয়ন অতিবাহিত করেন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মাছের ঝোল ব্যবস্থা। তবে হিন্দু বিধবা অম্বুবাচি পালনে ও চাতুর্মাস্য ব্রত ধারণে দক্ষিণ অয়ন যাপন করেন বলিয়া বাঙ্গালায় হিন্দুয়ানী চলিতেছে।

কামাগ্নি ছাগে প্রবল। তাই অগ্নিব্রহ্মের বাহন ছাগ এবং ব্রহ্মমণ্ডলের (Auriga) প্রধান তারার নাম অজ (Capilla)। অজ (গ্রীক Aiz) ইত্যাদি। য়ুরোপ বলেন অজ তারা এখানে কেন? রুদ্রদেব পবন-মূর্ত্তিতে ভূতেশমণ্ডলস্থ স্বাতি (সু-অতি) নক্ষত্রে অধিষ্ঠিত।

"রোহিত" তারায় স্বাতি নক্ষত্র গঠিত হইয়াছে। বেদমতে রোহিত (মৃগবিশেষ), মরুৎগণের 'পৃষতী" রথ বহন করে। * রোহিত (Areturus) মৃগ পবনের বাহন হইল। তাই দেখি মনোজব হরিণ মনোজব পবনের বাহন হইয়াছে। পবন দেব রক্তবর্ণ, রোহিত তারাও রক্ত বর্ণ।

তাই বলি

রূপে গুণে তুল্য যেই।
দেবের বাহন ভূষণ সেই॥
যস্য দেবস্য যদ্রূপং
তথা ভূষণ বাহনম্।

এ বচন কাণা করিব?

তারাদর্শক।

উৎপলা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অভ্যাগতের পূজা

পথে চলিতে চলিতে সঙ্গীয় ভৃত্যটিকে প্রমীত জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"তোমাকে কি আর কোন দিন দেখিয়াছি?"

"আর এক দিন দেখিয়াছিলেন।"

"তোমার নাম বাহুক?"

"হাঁ। একদিন সন্ধ্যা বেলায় ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আমরা বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম, আপনি রক্ষা করিয়াছিলেন।"

"তোমার কর্ত্রী কেমন আছেন? সেদিন নিরাপদে ঘরে পৌছিয়াছিলেন?"

---

*······পৃষতীরথে
পার্ষ্ণিঃ বহতি রোহিতঃ।
(ঋক্)

"আমাদের আর কোন বিপদ হয় নাই। কর্ত্রী ভালই আছেন।"

"তোমরা সেদিন কোথা হইতে আসিতেছিলে?"

"ঠাকুরাণী কোন প্রয়োজনে পাটলী গ্রামে গিয়াছিলেন।"

প্রমীত দেখিলেন বাহুক অধিক কথা কহিতে চায় না। তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহার কর্ত্রীর কোন পরিচয় পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তৎসম্বন্ধে তাহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাও তিনি সঙ্গত মনে করিলেন না। বাহুক নীরবে পথ দেখাইয়া চলিল।

নগরের যে অংশ দিয়া প্রমীত যাইতেছিলেন, তাহাতে অপেক্ষাকৃত ধনী লোকেরই বাস। পথের উভয়পার্শ্বে সুশোভন অট্টালিকার সারি। মধ্যে মধ্যে ফলের বাগান, ফুলের বাগান। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। গৃহে গৃহে গৃহ-বিগ্রহের আরতি, সান্ধ্যস্তুতি আরম্ভ হইল। শঙ্খ-ঘণ্টা-নিনাদে পল্লী মুখরিত হইল। ধূপ-ধূনা-গুগ্‌গুল-গন্ধে সন্ধ্যার সুখদ মৃদুবায়ু সুরভিত হইয়া উঠিল। রাজপথে আলো ছিল না, কিন্তু উভয় পার্শ্বের পুরীপ্রবেশ-পথে এবং মুক্তবাতায়ন-পথে গৃহমধ্যস্থ দীপরশ্মি রাজপথে পড়িয়াছিল, সুতরাং পথ নিতান্ত অন্ধকারময় ছিল না।

বসন্তকাল; শীত নাই, গ্রীষ্মের আতিশয্যও হয় নাই। রাজ-পথে লোকচলাচলের অভাব নাই। পুষ্পমাল্যধারী, চন্দনচর্চ্চিত-দেহ সৌখীন যুবক, ব্যস্তসমস্ত ব্যবসায়ী, ভিক্ষার্থী খঞ্জ অন্ধ আতুর, দ্যূতকারী, সভিক, নট, বৈণিক, বৈণবিক, চঞ্চলা নগর-শোভিনী, চকিতনেত্রা অভিসারিকা, ভারিক, মালিক, বার্ত্তাবহ—রাজপথে অনেক লোক যাতায়াত করিতেছিল। অনেকে প্রমীত-সেনকে দেখিয়া নমস্কার অভিবাদন করিল, কিন্তু প্রমীত দ্রুতপদে চলিলেন। পরিচিত কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়, তাহাই তাঁহার ইচ্ছা। পথের এক পার্শ্বে একটুকু জনতা হইয়াছিল। একজন মালী নানাবিধ সুগন্ধি ফুল, ফুলের মালা, মুকুট, বলয়, কুণ্ডল ইত্যাদি বিক্রয় করিতেছিল। কয়েক জন লোক তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ইচ্ছানুরূপ দ্রব্য নির্ব্বাচন করিতেছিল। প্রমীতসেন পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু সোমদত্ত সেখানে ছিলেন, তিনি প্রমীত এবং তৎসহচর বাহুককে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। প্রমীত জানিতে পারিলেন না। কিন্তু সোমদত্ত মালা-ক্রয় পরিত্যাগ করিয়া অলক্ষ্যে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

বাহুক অবশেষে প্রমীতসেনের অপরিচিত এক পল্লীতে একটী বৃহৎ বাটীর নিকট উপস্থিত হইল। দ্বারবান দ্বার খুলিয়া দিল। প্রহরীরা নমস্কার-অভিবাদন করিল। আলোকিত প্রবেশ-পথ অতিক্রম করিয়াই ফুলের উদ্যান, অদূরেই উচ্চ দ্বিতল গৃহ, গৃহের কক্ষে কক্ষে দীপালোক। প্রমীত সিঁড়ির নিকট পৌঁছিতেই দুই তিন জন পরিচারিকা প্রণাম করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া গেল। প্রথম কক্ষেই একটী প্রৌঢ়বয়স্কা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি প্রমীতসেনকে অভিবাদন করিলেন, প্রমীতসেনও প্রৌঢ়াকে নমস্কার করিলেন। প্রৌঢ়া বলিলেন;—

"আমাদের আজ কত সৌভাগ্য! আপনি আমাদের গৃহে পদার্পণ করিয়া আমা-

দিগকে চরিতার্থ করিলেন। আমার কন্যাকে ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আপনি আমাদিগকে চির-অনুগৃহীত করিয়াছেন। আমার কন্যা আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন। চঞ্চলা, ইঁহাকে লইয়া যা।"

চঞ্চলা প্রমীতসেনকে লইয়া এক সুসজ্জিত দীর্ঘ-বারান্দা দিয়া চলিল। বাম পার্শ্বে কক্ষের পর কক্ষ, দক্ষিণ পার্শ্বে মর্ম্মরে আচ্ছাদিত প্রশস্ত অঙ্গন, তাহার অপর তিন দিকে দ্বিতল পর্য্যন্ত সারি সারি আলোকিত কক্ষ। এই 'উপকৃতা' কে, কি নাম, কাহার কন্যা, কাহার স্ত্রী?—প্রমীত কিছুই জানেন না। কিন্তু সেই পুরীর বিশালত্ব এবং সজ্জিত মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার দেখিয়া তাঁহার প্রতীতি হইল, 'উপকৃতা' যিনিই হউন, তিনি প্রভূত-সম্পত্তিশালিনী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই দুর্দ্দিন অন্ধকারে অস্পষ্ট-আলোকদৃষ্টা, বাক্‌চতুরা, আলুলায়িতকুন্তলা অপূর্ব্বসুন্দরী তরুণীর মূর্ত্তি বারবার তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইতে লাগিল। আজ তাঁহারই গৃহে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে। প্রমীতসেনের চিত্ত কৌতূহলে উদ্বেলিত হইতে লাগিল।

চঞ্চলা পরিশেষে একটী কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রমীতসেনকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল :—

"আমার কর্ত্রী এই কক্ষে আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

প্রমীত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মহাসুগন্ধি তৈলপূর্ণ প্রদীপে প্রদীপে সমগ্র কক্ষ আলোকিত। একটী সুন্দরী যুবতী মৃদুপদে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অতি বিনীত নমস্কার করিল। সমীপস্থা অপরিচিতা সুন্দরী যুবতীর প্রতি স্বচ্ছন্দ দৃষ্টিক্ষেপ অসম্ভব। নিমেষমাত্র প্রথম দৃষ্টিতে প্রমীত যাহা দেখিলেন তাহাতেই তিনি অতি বিস্মিত হইলেন, ক্ষণকাল নীরব স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ইনি সেই নগর-প্রবেশ-পথের আকুল-কুন্তলা 'উপকৃতা'ই বটেন! কিন্তু আরও কোথায় যেন ইঁহাকে দেখিয়াছি! কিন্তু তখন আর ভাবিবার সময় নাই, তাঁহাকেই প্রথমে কথা কহিতে হইল।

"আপনি আমাকে পত্র পাঠাইয়াছিলেন?"

মস্তক নত করিয়া রমণী অতি মৃদুস্বরে বলিলেন ;—

"অধিনীই এই দুঃসাহসের কাজ করিয়াছে"

রমণীর বিনীত নির্দ্দেশে কক্ষ মধ্যে অনতি-উচ্চ বিস্তৃত পালঙ্কে সুশোভন আসনে প্রমীত উপবেশন করিলেন। আসনের চারিপার্শ্বে, কক্ষের নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রিপদার উপর থালে থালে সুগন্ধি ফুল, ফুলদানে ফুলের স্তবক। শ্বেতরক্তনীলপীত নানাবর্ণের মূল্যবান প্রস্তরে গ্রথিত চিত্রিতবৎ অতি সুন্দর ফুল-ফল-তরুলতার ছবিতে কক্ষের দেয়াল ও মেঝে সুশোভিত। একপার্শে অতিপুরু সুখ-স্পর্শ কম্বলাসন, তাহার উপর ধৌত পট্টবস্ত্রের আচ্ছাদন। কক্ষের সমস্ত তৈজসপত্র মূল্যবান এবং সুদৃশ্য। গৃহের বৈভব-শ্রী দেখিয়া প্রমীত অতি বিস্মিত হইলেন।

রমণী নিকটেই দেয়ালের পার্শে দাঁড়াইয়া বলিলেন :—

"আমার প্রার্থনা, আমাকে 'আপনি' বলিবেন না।"

"আমাকে 'আপনি' বলিতেছেন, আমি কেন বলিব না ?"

"আমি তদুপযুক্ত লোক নহি। আপনি আমার কোন পরিচয় পান নাই। আমি—"

"আপনাকে কি কাল বসন্তোৎসবে দেখিয়াছি ?"

"অসম্ভব নহে ; উৎসবে আমি গীত গাহিয়াছিলাম।"

ইনিই সেই মঞ্জুলা ! বেশভূষার সে উৎসবোচিত পারিপাট্য নাই, মণি-মাণিক্য-খচিত সে অলঙ্কার-সমাবেশ নাই। কিন্তু গৌরদেহের কি অপূর্ব্ব লাবণ্য-ছটা ! শ্বেতকুসুম-মাল্যবিজড়িত দীর্ঘ কেশরাশির কি তরঙ্গায়িত লীলা ! বিদ্যুদ্গর্ভ স্থির আরক্ত চক্ষুর কি বিনম্র মধুর দৃষ্টি ! প্রমীতসেন আর সময় পাইলেন না, বলিলেন ;—

"আপনি—আপনার—"

"আমি অতি সামান্য স্ত্রীলোক।"

"আপনার—"

মঞ্জুলা অতি বিনীত স্বরে বলিল ;—

"আমাকে 'আপনি' বলিলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব।"

"আমার বন্ধু অসঙ্গ সেন মহাশয় আপনার পরিচয়—"

"আমার প্রার্থনা !"

"তাহাই হউক।—তোমার পরিচয়, গুণ-কাহিনী আমাকে বলিয়াছেন। আপনি প্রসিদ্ধ বিদুষী এবং গুণবতী। আমার দুর্ভাগ্য, আমি ইতিপূর্ব্বে কোন দিন আপনার—তোমার গৃহে আসিয়া তোমার সঙ্গে আলাপ করিবার সুখের অধিকারী হই নাই। সে দিন মানুষের অবশ্যকর্ত্তব্য অতি সামান্য কাজ-করিয়া যদি তোমার কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়া থাকি, তবে আমি বড়ই ভাগ্যবান।"

"সে দিন আপনি উপস্থিত না হইলে আমার যে কি দুর্দ্দশা হইত, তাহা মনে করিতে ভয় হয়, আপনি চিরকালের জন্য আমাকে ঋণী করিয়াছেন। সে দিন আমি নিজ পরিচয় দিতে সাহস পাই নাই, আমার সে অপরাধ অবশ্যই ক্ষমা করিবেন।"

"অপরিচিত পথিকের নিকট আত্মপ্রকাশ না করিলে কি কোন রমণীর অপরাধ হয় ?"

"আমাকে হৃদয়হীন অকৃতজ্ঞ মনে করিবেন না। এতদিন আমি কোন সুযোগ পাই নাই। তাহার পর রাজাধিরাজের মৃগয়া-যাত্রার দিন ভিক্ষু উপগুপ্তের কৃত অপরাধের জন্য নগরপাল আপনাকেও বন্দী করিয়া লইয়া যায়। সমস্ত নগরবাসী আপনার বিপদে অতি দুঃখিত হইয়াছিল। আপনার সুকৃতি বলে আপনি রক্ষা পাইয়াছেন।"

"আমি যে কেমন করিয়া কাহার অনু-রোধে অব্যাহতি পাইয়াছি, তাহা এখনো জানিতে পারি নাই। ধর্ম্মপাল মহাশয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয়, তিনি আমাকে সর্ব্বদা অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক অনুনয়ে, অনেকের অনুরোধেও প্রথম দিন তিনি আমাকে মুক্তি দেন নাই। তৃতীয় দিন কেন যে হঠাৎ আমার মুক্তিলাভ হইল, আমি তাহা এখনো জানিতে পারি নাই।"

"আপনি নিরপরাধী, ধর্ম্মপাল মহাশয় তাহা বুঝিতে পারিয়াই বোধ হয় শেষে আপনাকে মুক্তি দিয়াছেন। আপনার মুক্তিতে আমরা কত আনন্দিত হইয়াছি !—অন্য কোন উপায় না দেখিয়া শেষে আজ অতি সাহসে

পত্র পাঠাইয়াছিলাম। আমার সে ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন।”

“ধৃষ্টতা!—তোমার মত গুণবতীর সদয় অনুগ্রহ। আমারও এক প্রার্থনা আছে। এতদিন পর্য্যন্ত আমি যে পরমসুখে বঞ্চিত ছিলাম, আজ হইতে যেন তাহার অধিকারী হইতে পারি। তোমার গৃহে অনেক জ্ঞানী এবং সুধী লোকের সমাগম হইয়া থাকে। আমার মত অকিঞ্চিৎকর লোককেও তুমি তোমার গৃহে সময় সময় আসিবার অনুমতি দিয়া আমাকে আনন্দিত করিবে?”

“আপনি আমার পরিচয় পাইয়াছেন, আমার সকল কথা শুনিয়াছেন?”

“শুনিয়াছি।”

“কেহ কেহ এখানে আসিয়া থাকেন, আপনিও কি ভবিষ্যতে আসিবেন?”

“আসিবার অনুমতি পাইলে পরম সুখী হইব।”

“এ গৃহের দ্বার আপনার নিকট সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিবে, যখন আপনার ইচ্ছা হইবে, আসিলে আমি নিজেকে অতি সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিব।”

প্রমীত হাসিয়া বলিলেন;—

“দেখিতেছি, সে দিনের সেই ঝড়বৃষ্টি-দুর্য্যোগেই আমার এই সৌভাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল।”

“সৌভাগ্য ত আমার!”

“উৎসবে তোমাকে দেখিয়া তুমিই যে সেই দুর্য্যোগ-রাত্রির বিপন্ন রমণী, তাহা বুঝিতে পারি নাই।”

মঞ্জুলার মুখও স্মিত প্রভাসিত হইয়া উঠিল। চিত্রা এবং চঞ্চলা কক্ষের একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল। মঞ্জুলার ইঙ্গিতে চঞ্চলা পাশের ঘর হইতে একখানি থালা লইয়া আসিল। থালাখানি ফুল, ফুলের মালা, অগুরু-চন্দন এবং গন্ধচূর্ণে পরিপূর্ণ। মঞ্জুলা সেই থালা প্রমীতের পদপ্রান্তে রাখিয়া যুক্ত করে বলিল:—

“আমার এই সামান্য পূজা গ্রহণ করুন।”

প্রমীতসেন তরুণীর বাক্‌পটুতায় বিস্মিত হইলেন। বলিলেন — “আপনি—তুমি এই অকিঞ্চিতের সম্মান শতগুণে বৃদ্ধি করিতেছ।”

প্রমীতসেন সেই থালা হইতে চন্দন গ্রহণ করিলেন এবং একটী সুরভি মালা লইয়া তাহা মস্তক বেষ্টন করিয়া পরিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইল, রাত্রি হইল। প্রমীতের গৃহে ফিরিবার সময় হইয়াছে। মঞ্জুলার ইঙ্গিতে চঞ্চলা আর একখানি থালা আনিল। থালার উপর সূক্ষ্ম ধৌত বস্ত্রের আচ্ছাদন, তাহার উপর অতি সুগন্ধি ফুল ফুলের মালা ও চন্দন প্রক্ষেপ। চঞ্চলার হাত হইতে সেই থালা লইয়া মঞ্জুলা বলিল;—

“সে রাত্রিতে আপনার গায়ের যে ওড়নি আমাকে দিয়া আমার লজ্জা রক্ষা করিয়াছিলেন, এই সেই খানি।”

আবরণ উন্মুক্ত করিয়া পুষ্পচন্দনসুরভি সেই ওড়নিসহ থালাখানি মঞ্জুলা প্রমীতের সম্মুখে স্থাপন করিল।

“একদিন ব্যবহার করিয়া আমি এই মহার্ঘ ওড়নির অবমাননা করিয়াছি, আপনি সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন। বাহক আজ ইহা আপনার গৃহে দিয়া আসিবে।”

“এই সামান্য বস্ত্র আপনার—তোমার

গাত্রস্পর্শ করিয়া পবিত্র হইয়াছে, আমি আর এ ওড়নি ব্যবহার করিবার অধিকারী নই। এখানি আপনার গৃহেই থাকুক।"

"আমার গৃহে থাকিবে অনুমতি করিতেছেন!—আমার গৃহে ইহা চিরদিন পূজিত হইবে।"

মঞ্জুলা তখন অতিনমিত মস্তকে প্রমীতকে নমস্কার করিল। তখন প্রমীত উঠিলেন। অপরকক্ষে মঞ্জুলার মাতাকে নমস্কার অভিবাদন করিয়া প্রমীতসেন বিদায় হইলেন। বাহক আলো জ্বালিয়া তাঁহার পথপ্রদর্শক হইয়া সঙ্গে চলিল।

প্রমীতসেন চলিয়া গেলে মঞ্জুলা পুনরায় সেই দ্বিতল কক্ষে প্রবেশ করিল। গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া গ্রহচন্দ্রতারকাখচিত নীলাকাশের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি যেন কেমন উন্মনা, মুখ যেন কেমন উচ্ছ্বসিত। মঞ্জুলা তারপর গৃহস্থ উজ্জ্বল দীপের নিকট দাঁড়াইয়া মুকুরে নিজের মুখচ্ছবি অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। মুকুর রাখিয়া দিয়া পুষ্পদামে শ্লথ জড়িত সেই দীর্ঘ কৃষ্ণকুঞ্চিত কুন্তলরাশি অংসের উপর দিয়া বক্ষের দিকে আনিয়া হস্তদ্বারা যেন তাহার মসৃণ কোমলত্ব পরীক্ষা করিয়া দেখিল। কেশরাশি পৃষ্ঠে সরাইয়া দিয়া আপনার অঙ্গুলিদাম, প্রকোষ্ঠ, বাহু, অংস—সর্ব্বাঙ্গ ভাল করিয়া দেখিল। শেষে নিঃসহ শরীরে শয্যায় শুইয়া পড়িল। মনে মনে ভাবিল, "অত কথা বলিয়াছি, তিনি আমাকে মুখরা মনে করিবেন!"

চঞ্চলা নীরবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, বিস্মিতনেত্রে জিজ্ঞাসা করিল,—

"শুইয়া পড়িয়াছ! কেন, তোমার কোন অসুখ হইয়াছে?"

মঞ্জুলা চমকিত হইল, বলিল,—

"না, কিছুই হয় নাই!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রক্ষা-কবচ

এই স্থানে আমরা পূর্ব্ব কথা কিছু বলিব। পাঠক মঞ্জুলা অথবা অলোকার বিশেষ পরিচয় এতক কিছুই পান নাই।

অলোকা এক ধনাঢ্য ভদ্র পরিবারের কন্যা। প্রথম বয়সেই তিনি বিধবা হন। তাঁহার চরিত্রও মন্দ হইয়া যায়। শ্বশুরকুল পরিত্যাগ করিয়া অলোকা তৎকাল-প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত ধনী রাজকুটুম্ব বিশাখদত্তের গৃহে আসিয়া বাস করেন। এইখানেই তাঁহার কন্যা মঞ্জুলার জন্ম হয়। বিশাখদত্ত বিপত্নীক ছিলেন, মঞ্জুলাকে তিনি কন্যানির্ব্বিশেষে লালন পালন করেন। বিশাখদত্তের মৃত্যু হইলে অলোকা ও মঞ্জুলা অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হন। কিন্তু তাঁহাদের অভিভাবক কেহ ছিল না। বিশাখদত্তের পিতৃব্য-পুত্রী রাজ্ঞী কারুবকী বালিকাকে কাছে আনিয়া তাহার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হন এবং প্রচ্ছন্ন রক্তসম্বন্ধে স্নেহার্দ্র হইয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। মঞ্জুলা জনকের গৃহে মাতার নিকটেই রহিল, কিন্তু মহারাজ্ঞীর স্নেহ এবং অনুগ্রহের পাত্রী বলিয়া সংসারে তাহার কোন অভাব রহিল না। উপযুক্ত গুরুর নিকট বালিকা লেখাপড়া, নৃত্যগীত এবং নানাবিধ ললিতকলায় সুশিক্ষিতা হইতে

লাগিল। রাজ্ঞী সময় সময় মঞ্জুলাকে অন্তঃপুরে ডাকাইয়া লইয়া তাহার শিক্ষা এবং ব্যবহারের পরীক্ষা করিতেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অলোকার চরিত্রও সংশোধিত হইয়াছিল। সেকালে আর একালে অনেক প্রভেদ। একালের রূপজীবিনীরা সমাজে যেরূপ হীন, সেকালে সর্ব্বথা সেরূপ ছিল না। সেকালের কোন কোন নগরশোভিনী উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া অটুট মানসম্ভ্রমের সহিত দিন কাটাইতে পারিত। শিক্ষিতা এবং ধনসম্পন্না হইলে সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়েও তাহার মর্য্যাদা স্বীকৃত হইত। তাহার আমন্ত্রণে সমাজের অগ্রণীরাও তাহার গৃহে যাইতে সঙ্কুচিত হইতেন না। এরূপ নগরশোভিনীরা গীতবাদ্য, নানাবিধ সুকুমার কলাবিদ্যা এবং বাক্‌চাতুর্যে ধনী মানী শিক্ষিত সমাজের চিত্ত বিনোদন করিত। অনেক সময় ইহাদের পুত্রকন্যা ভদ্রসমাজে বিবাহিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে সমাজভুক্ত হইত। অলোকাও কালে সমাজে এইরূপ মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন।

যৌবনোদ্গমে মঞ্জুলা অসামান্য রূপবতী হইয়া উঠিল। তাহার পাণিগ্রহণার্থীর অভাব ছিল না। তাহার শিক্ষা, চরিত্র, ব্যবহার, রূপলাবণ্য, ধনসম্পত্তি অনেকের চিত্ত প্রলুব্ধ করিয়াছিল। কিন্তু অভিভাবিকা রাজ্ঞী তাহার বিবাহে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, তাঁহার বিবেচনায় স্নেহ-পালিতা, রূপসী, ধনশালিনী মঞ্জুলার অনুরূপ বর মিলিয়া উঠিল না।

প্রমীতসেন বন্ধু অসঙ্গের মুখে অলোকা এবং মঞ্জুলার অনেক কথা শুনিয়াছিলেন।

সে দিন বাড়ীতে পৌঁছিতে প্রমীতসেনের অনেক রাত্রি হইল। এদিকে উৎপলা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কি আশঙ্কা, কেন আশঙ্কা, উৎপলা তাহা বিচার করেন নাই, তথাপি উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। রাত্রিকালে একা একা নগরপথে চলা যদিও সকল সময় নিরাপদ নহে, তথাপি চোর-দস্যু প্রভৃতি দ্বারা যে স্বামীর কোন বিপদ ঘটিতে পারে, উৎপলার সে বিশ্বাস ছিল না। নগরে তিনি সুপরিচিত, বিশেষতঃ তিনি অপরিমিত শারীরিক বলশালী; হঠাৎ কেহ তাঁহাকে আক্রমণ করিবার সাহস পাইবে না। সঙ্গে প্রলোভনের বস্তু কিছুই নাই, সুতরাং চোর-দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনাও কম। পথ-ঘাটও তাঁহার অপরিচিত নহে। কোন বিপদের সম্ভাবনা হইলে, সঙ্গী প্রহরী অথবা বাহক কি অশ্ব সংগ্রহ তাঁহার পক্ষে অতি সহজ। তবে এই জ্যোৎস্নাময়ী বাসন্তী রজনীতে অপরিচিতা সুন্দরী যুবতীর আমন্ত্রণ, একাকী গমন, স্বচ্ছন্দ আলাপের অবসর—মনে করিতে উৎপলার মুখ লজ্জা-অভিমানে রক্তিমাভ হইল। না; সেরূপ কোন আশঙ্কা আসিতেই পারে না। স্বামীর প্রতি উৎপলার ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস অসীম এবং অচল। কিন্তু মহার্ঘ মণিরত্ন অরক্ষিত অবস্থায় পথে ঘাটে ছড়াইয়া চোরদস্যুকে প্রলোভিত করা কি উচিত? অথবা প্রাণপ্রিয় আত্মীয় অন্তরঙ্গ ব্যক্তিকে অপরিচিতা সুন্দরী যুবতীর—ডাকিনী কি মায়াবিনীর!—আহ্বানে একক পাঠাইয়া গভীর বিশ্বাস এবং অচলা শ্রদ্ধার পরিচয় দিতে যাওয়াই কি সঙ্গত?—কি আশঙ্কা, কেনই বা আশঙ্কা, উৎপলা তাহার

বিচার করেন নাই, তথাপি তিনি বিষম উদ্বিগ্না হইলেন। এত বিলম্ব কেন?

বাড়ীতে পৌঁছিতে সে রাত্রিতে প্রমীত-সেনের অনেক বিলম্ব হইল। প্রমীত অন্তঃপুরে পৌঁছিলে উৎপলা অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"কিগো, ঘর বাড়ী ভুলিয়া গিয়াছিলে না কি?"

"তাই ত! ঘর বাড়ী ভুলিয়া, কোন্ পথে, কোথায়, কাহার কাছে আসিয়া পৌঁছিলাম?"

"বটে?"—স্বামীর হাত ধরিয়া উৎপলা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

"'উপকৃতা'র সঙ্গে দেখা হইল?"

"হইয়াছে।"

"কেমন লোক?"

"অপূর্ব্ব সুন্দরী।"

"তাহা ত অনেক দিন হইতেই জানি। কি নাম, কাহার কন্যা, কাহার স্ত্রী?"

"শুনিবে?"

উৎপলা বিস্মিত নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"উপকৃতা—মঞ্জুলা!"

মঞ্জুলা! উৎপলা চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার চক্ষু বিস্ময়-বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

"মঞ্জুলা!—কেমন করিয়া জানিলে?"

"দেখিয়াই চিনিলাম। বৃষ্টি-দুর্য্যোগের দিন ইঁহাকেই দেখি, গতকল্য উৎসবে ইঁহাকেই দেখিয়াছি। ইনিই সেখানে গীত গাহিয়াছিলেন।"

উৎপলা ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন;—

"তুমি কি জানিতে যে, মঞ্জুলাই 'উপকৃতা'?"

"আগে আর কেমন করিয়া জানিব?—মঞ্জুলাকে উৎসবে দেখিয়াছি, মঞ্জুলাই যে সে দিনের সেই উপকৃতা, তাহা ত আজ এই মাত্র জানিয়া আসিলাম।"

"মঞ্জুলা কে, কাহার কন্যা—তাহা শুনিয়াছ?"

"শুনিয়াছি।"

"কাহার নিকট শুনিলে?"

"অনঙ্গের নিকট শুনিয়াছি।"

"কি শুনিয়াছ?"

প্রমীত তখন অনঙ্গের নিকট শ্রুত মঞ্জুলার পরিচয়-সূচক অনেক কথা উৎপলাকে বলিলেন। শুনিয়া উৎপলার বিস্ময় বৃদ্ধি পাইল।

প্রমীত নিজ মস্তকে জড়ান সেই ফুলের মালা খুলিয়া তাহার লহর বিস্তার করিয়া অতি আদরে উৎপলার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। মহাসুরভি ফুলের মালা, কৌশলময় তাহার গাঁথনি। স্বামীর প্রণয়োপহারে উৎপলার চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। উৎপলা জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"কোথায় পাইলে?"

"মঞ্জুলার পূজোপহার।"

উৎপলার শরীর শিহরিয়া উঠিল। নগর-শোভিনীর ছদ্ম প্রেমোপহার! অথবা মন্ত্রসিদ্ধ গুপ্ত মোহনাস্ত্র? কিন্তু তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে সন্দেহ স্থান পাইল না। উৎপলা হাসিয়া বলিলেন;—

"অমন সুন্দরী, অমন মিষ্ট গায়িকার পূজায় ত চিত্ত হারাইয়া এস নাই?"

"এ চিত্ত হারাইবার ভয় নাই।—দিবা রাত্রি সুরক্ষিত!"

"এমন নিত্যজাগ্রত রক্ষাকবচ তোমার কি আছে?"

"তোমার পবিত্র মুখ।"

প্রমীত স্ত্রীর হর্ষ-প্রফুল্ল মুখ চুম্বন করিলেন।

"—তোমার স্ফুরদুজ্জ্বল চক্ষু!"

প্রমীত স্ত্রীর সত্তনিমীলিত মৃদু কম্পিত চক্ষু চুম্বিত করিলেন।

"—এ হৃদয়ে স্থির প্রতিষ্ঠিত প্রেমোজ্জ্বল তোমার মধুর মূর্ত্তি!"

উৎপলা উচ্ছ্বসিত গাত্রে স্বামীর বাহু বেষ্টন হইতে ছুটিয়া পলাইয়া কক্ষদ্বারের নিকট গিয়া বলিলেন;—

"মাধবী, মাধবী, আজ কি আমাদের আহারাদি হইবে না?"

সেদিন গভীর রাত্রিতে কি যেন স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে প্রমীত হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন;—

"অপূর্ব্ব সুন্দরী!"

পার্শ্বে শয়ানা উৎপলা সে শব্দে অৰ্দ্ধ-জাগরিত হইয়া নিদ্রাবিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"কি বলিতেছ?"

প্রমীত নিদ্রিত!

উৎপলাও পুনরায় সুষুপ্তি লাভ করিলেন।

(ক্রমশ।

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

বৈদিক সাধনার আভাস

ইহার অনুবাদ ও তাৎপর্য্য

১। তৎকালে অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না; রজঃ অর্থাৎ পাতালাদি পৃথিব্যন্ত লোক সকল ছিল না, ব্যোমোপরি বিস্তৃত যাহা (অর্থাৎ দ্যুলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত) তাহাও ছিল না। কি আবরণ করিবে? কোথায়? কাহার সুখদুঃখহেতু? গহন, গভীর অম্ভই কি ছিল?

তাৎপর্য্য:—তৎকালে অর্থাৎ প্রলয়কালে অসৎ ছিল না, কারণ জগতের মূলকারণ ছিল। প্রলয়কালে জগতের মূলকারণ না থাকিলে, পরে জগতের উৎপত্তি সম্ভবে না। সৎও ছিল না, কারণ সদ্রূপে অর্থাৎ পৃথক্‌সত্তাভাবে জগতের অস্তিত্ব ছিল না। এইরূপে জগতের সত্তা ও অসত্তা উভয়ই অঙ্গীকৃত হইল। সৎ ও অসৎ, ভাব ও অভাব, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব, ইহারা বিপরীত পদার্থ, ভেদমূলক। ইহাদের একত্র অবস্থান পর্য্যন্ত সম্ভবে, যেমন—যেখানে একের সত্তা, সেখানে অন্যের অসত্তা। কিন্তু ইহাদের একত্ব কিরূপে সম্ভবে? একই পদার্থের নির্ব্যূঢ় সত্তা ও অসত্তা কিরূপে হইতে পারে? প্রলয়কালে হইতে পারে; কারণ, সদসদাত্মক ভেদ তখন ছিল না; ভেদ না থাকায় সত্তা বা অসত্তা বলিয়া কিছু ছিল না। "অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না" বলিবার

ইহাই তাৎপর্য্য। সৎ ছিল না এই কথায় আশঙ্কা হইতে পারে যে, পারমার্থিকসত্তা ব্রহ্মও ছিল না। দ্বিতীয় ঋকের "আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং," এই বাক্যদ্বারা এই আশঙ্কা নিরাকৃত হইতেছে। মায়ার পরিশেষ অর্থাৎ লয় হেতু তাহারই অনস্তিত্ব "সৎ ছিল না" এই বাক্যদ্বারা সূচিত হইয়াছে। বলিতে পার যে, ব্যবহারদশাতেও পরমার্থতঃ মায়ার অস্তিত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্তা নাই, সুতরাং "তৎকালে" এই বিশেষণ অনর্থক হইয়া পড়ে। কিন্তু ব্যবহারদশায় পৃথিব্যাদি ব্যবহারিক সৎ পদার্থের অস্তিত্ব আছে। অতএব "সৎ ছিল না" এই নিষেধ পৃথিব্যাদির বর্ত্তমানকালে প্রযুক্ত হইতে পারে না। সেই জন্য ঋষি পুনরায় বলিয়াছেন যে, পৃথিব্যাদি চতুর্দ্দশ ভুবনও ছিল না। অর্থাৎ ব্যবহার দশায় মায়ার পারমার্থিকসত্তা না থাকিলেও, পৃথিব্যাদিরূপে ব্যবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু তৎকালে প্রলয়কালে, মায়ার পারমার্থিকসত্তা ব্যবহারিক সত্তা উভয় সত্তাই ছিল না। ভাল, ব্রহ্মাণ্ড না থাকিলেও ব্রহ্মাণ্ডের আবরক আকাশাদি কি ছিল? না। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডকে আবরণ করিয়া থাকে (বিষ্ণুপুরাণ, ১,২,৫৪-৫৫ দ্রষ্টব্য)। ঋষি প্রশ্নচ্ছলে এই সকল আবরকেরও অস্তিত্ব নিষেধ করিতেছেন। কি আবরণ করিবে? আবার্য্য পদার্থ থাকিলে, তবেই ত তাহার আবরক থাকিতে পারে? যেখানে আবার্য্য ব্রহ্মাণ্ডই নাই, সেখানে আবরক বিয়দাদি থাকিবে কিসের জন্য? আবার, কোথায় আবরণ করিবে? কোন্ প্রদেশে অবস্থান করিয়া আবরক আবরণ করিবে? প্রলয়কালে আধারভূত একরূপ কোন দেশও ছিল না। আবার, কাহার সুখদুঃখ হেতু আবরণ করিবে? জীবগণের উপভোগার্থই সৃষ্টি। সৃষ্টি থাকিলেই ব্রহ্মাণ্ডের আবরক থাকে। সৃষ্টি না থাকিলে ভোক্তা জীবসকল লয় প্রাপ্ত হয়; সুতরাং কোন পদার্থের কেহ ভোক্তা থাকে না। এইরূপে আবরণের প্রয়োজনীয়তা লোপ পাইলে, আবরক থাকে না। সংক্ষেপতঃ, ঋষি বলিলেন যে, প্রলয়কালে ভোগ্যপ্রপঞ্চ ও ভোক্তৃপ্রপঞ্চ—উভয়ই ছিল না। পুনশ্চ, আবরণসহ ব্রহ্মাণ্ডের অনস্তিত্ব সিদ্ধ হইলে, অম্ভ অর্থাৎ জলেরও অনস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। তথাপি ঋষি পুনরায় প্রশ্ন করিতেছেন, অম্ভই কি ছিল? ইহার কারণ কি? যে প্রলয়ের কথা বলা হইতেছে, ইহা ছাড়া অপর আর একরূপ প্রলয় আছে। প্রতি কল্পান্তে ব্রহ্মা নিদ্রিত হইয়া, এক কল্প পর্য্যন্ত নিদ্রিত থাকেন। ব্রহ্মার এই নিদ্রাকালে ভূ, ভুব, স্ব এই তিনলোক দগ্ধ হইয়া একার্ণব হইয়া যায়। (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭।১।৫।১; বিষ্ণুপুরাণ ১।৩।২০-২৩ দ্রষ্টব্য।) এই প্রলয়কে নিষিদ্ধ করিবার জন্যই উক্ত প্রশ্ন। বর্ত্তমান সূত্রে ঋষি নির্দ্দিষ্ট প্রলয় এরূপ আংশিক একার্ণবী প্রলয় নহে। ইহাতে জলের অস্তিত্ব নাই।

২। সেই সময়ে মৃত্যু ছিল না, অমৃত অর্থাৎ অমরণও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রজ্ঞান ছিল না। স্বধার অর্থাৎ মায়ার সহিত এক সেই (ব্রহ্মতত্ত্ব) অবাতপ্রাণিত ছিল; তাহা হইতে অন্য পরকালীন কিছুই ছিল না।

তাৎপর্য্য :—প্রলয়কালে সমগ্র বিশ্ব বিনষ্ট হইয়াছিল বলিয়া যে তাহার বিনাশক মৃত্যু ছিল, তাহা নহে; আর মৃত্যু ছিল না বলিয়া যে অমরণ ছিল, তাহাও নহে। অর্থাৎ সেই ভেদরহিত অবস্থায় মৃত্যু ও অমৃত্যু—ভেদমূলক এই দুই বস্তুই ছিল না। সর্বজীবের পরিপক্ক কর্ম্মসকলের যখন ভোগ হইয়া যায়, তখন ভোগের অভাবে জগতের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সেই সময়ে পরমেশ্বরের মনে জগৎ-সংহারের ইচ্ছা হয়। অনন্তর তিনিই মৃত্যুরূপে জগৎ সংহার করেন। অতএব প্রলয়কালে মৃত্যুরই বা স্থান কোথায় এবং তদভাবভূত- অমৃত্যুরই বা স্থান কোথায়? জীবের ভোগের জন্যই মৃত্যু ও অমরণরূপ পরিবর্ত্তনের লীলা। ভোগ ফুরাইলে এই লীলাও ফুরায়। তখন রাত্রিও থাকে না, দিনও থাকে না, অর্থাৎ, অহোরাত্র, মাস, দিন, সংবৎসর প্রভৃতির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কাল থাকে না। কালের কোলে জীব ক্রীড়া করে। কালে সে সুখী হয়, কালে দুঃখী হয়, কালে জন্মে, কালে মরে। এইরূপে জীবের সুখদুঃখহেতু কালের প্রয়োজন ও অস্তিত্ব। পুনশ্চ, সূর্য্য ও চন্দ্রের উদয়ই কালের হেতু। প্রলয়ে এই সকল হেতুর অভাবে কালের অভাব হয়। প্রশ্ন হইতে পারে—যদি কাল ছিল না, তাহা হইলে "তৎকালে সৎ ছিল না" এই কাল নির্দ্দেশ কিরূপে হইল? ইহার উত্তর এই যে, উপচারহেতু অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান বা মায়াহেতু এই কালের নির্দ্দেশ; মানুষ যখন কোন বিষয়ের নিষেধ করে, তখন কাল সেই নিষেধের অবচ্ছেদক হইলেও মায়া ঐ অবচ্ছেদের হেতু। মায়ার অধীন জীব মায়ারহিত অবস্থার যথাযথ নির্দ্দেশ করিতে পারে না, এবং জৈব ভাষাও মায়াজনিত কালকে বাদ দিয়া ঐ অবস্থা প্রকাশ করিতে পারে না। এইজন্য অবচ্ছেদকত্ব-রহিত অকাল-অবস্থাকেও কালবাচক শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে হয়। এইরূপে প্রলয়কালে আবরণসহ ব্রহ্মাণ্ড, মৃত্যু, অমৃত্যু ও কাল অর্থাৎ ভেদমূলক ও ভেদরূপী সমস্ত পদার্থই নিষিদ্ধ হইল। তাহা হইলে তৎকালে কি ছিল? ইহার উত্তরে ঋষি বলিতেছেন—সেই সকল বেদান্তপ্রসিদ্ধ এক ব্রহ্মতত্ত্ব ছিল। জীবের নিকট প্রাণই অস্তিত্বের নিদর্শন এবং প্রাণ বায়ুমূলক। ব্রহ্ম কি এইরূপ বায়ুমূলক প্রাণদ্বারা প্রাণিত ছিলেন? ইহার উত্তরে ঋষি বলিতেছেন—ব্রহ্মের অস্তিত্ব বায়ুর উপর নির্ভর করে না, তাঁহার প্রাণ অবাত অর্থাৎ বায়ুর অপেক্ষারহিত। যদি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বই ছিল, তবে জগৎকারণ সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা মায়া কোথায় গেল? (স্বধা = মায়া। স্বস্মিন্ ধীয়তে ধ্রিয়তে আশ্রিত্য বর্ত্ততে ইতি স্বধা। নিজেতে ধারণ বা আশ্রয় করিয়া যে থাকে সেই স্বধা বা মায়া বা প্রকৃতি।) মায়া সেই ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত এক হইয়া অবিভক্তরূপে ছিল। ঋষির এই বাক্য দ্বারা মায়া বা প্রকৃতির সদ্রূপত্ব অর্থাৎ পারমার্থিক নির্ব্যূঢ়সত্তা প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। বলিতে পার, মায়া যদি ব্রহ্মের সহিত এক হইয়াছিল, তাহা হইলে ব্রহ্মসত্তাকে অবাতপ্রাণিত বলিলে কিরূপে, এবং ব্রহ্মসত্তায় যখন মায়াসত্তা ছিল, তখন "সৎ ছিল না" এ কথাই বা বলিলে কিরূপে? এরূপ আশঙ্কা অমূলক; কারণ, ব্রহ্ম ও মায়াকে ভিন্নরূপে দর্শন-হেতুই

উভয়ের ঐক্যাবস্থান হয়, একরূপে দর্শন করিলে সাযুজ্যের বিভিন্ন সত্তা থাকে না এবং ব্রহ্মেরই সত্তা প্রতিপাদিত হয়।

৩। তমঃ ছিল, এই সর্ব্ব (জগৎ) অগ্রে, অর্থাৎ সৃষ্টির প্রাক্‌কালে প্রলয়াবস্থায়, তমঃ দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া অনির্দ্দেশ্যরূপে লীন হইয়াছিল। তুচ্ছ তমঃ দ্বারা যাহা সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদিত ও তাহার সহিত একীভূত ছিল, তাহা তপের মাহাত্ম্য দ্বারা উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য্য :—যদি প্রলয়কালে জগৎ না ছিল, তাহা হইলে পরে তাহা আসিল কিরূপে? কারক না থাকিলে ক্রিয়া হয় না, সুতরাং জায়মান জগতের জন্মক্রিয়ার কারক অবশ্যই ছিল। পুনশ্চ, কারক কারণের রূপান্তর মাত্র। অতএব জগৎসৃষ্টির প্রাক্‌কালে জগতের কারক বা কারণ থাকা অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য ঋষি বলিতেছেন যে, সৃষ্টির প্রাক্ কালে তমঃ ছিল এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ ঐ তমঃদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া অপ্রকেত বা অনির্দ্দেশ্য বা অনির্বাচ্যরূপে তাহাতে লীন হইয়া ছিল। তমঃ অর্থে ভাবরূপ, অর্থাৎ সংস্কাররূপ, অজ্ঞান, আত্মতত্ত্বের আবরক অপর মায়া বা অবিদ্যা। ইহাই জগতের মূল কারণ, ইহার দ্বারাই জগৎ গঠিত এবং ইহাই জগৎ। প্রলয়কালে জগৎ নামরূপের দ্বারা বিস্পষ্ট ছিল না। পরন্তু তৎকারণ যে অজ্ঞান, তাহাতে তদ্রূপে লীন হইয়া ছিল। কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝা আবশ্যক। দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে প্রলয় কালে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব ছিল, মায়া সেই ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত অভিন্নরূপে ছিল, এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ ছিল না। এতদ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, মায়া ও ব্রহ্মে ভেদ উৎপন্ন হইলে, পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্ট হয়। মায়া ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তি। এই শক্তি যখন নিষ্ক্রিয় থাকে তখন সৃষ্টি থাকে না। শক্তি ও শক্তিমান্ পরমার্থতঃ এক হইলেও, শক্তি যখন ক্রিয়াশীল হয়, তখন উহাদের মধ্যে ব্যবহারতঃ ভেদ জন্মে। এইরূপে মায়া বা সৃষ্টিশক্তি বা প্রকৃতি যখন ক্রিয়াশীল হয়, তখন ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া উহা ব্যবহারতঃ প্রতীয়মান হয়। শক্তি যখন নিষ্ক্রিয় থাকে, তখন শক্তিমান্ হইতে তাহার ব্যবহারিক ভেদও থাকে না, কিন্তু সক্রিয় হইলে শক্তিমানের দেহে ব্যবহারিক ভেদ উৎপন্ন করে। এইরূপে শক্তিমানের দেহে যে সকল ভেদমূলক ভাব জন্মে, তাহা শক্তিমান্ হইতে পরমার্থতঃ ভিন্ন না হইলেও, ব্যবহারতঃ ভিন্ন বোধ হয়; যেমন—সমুদ্র ও বীচি। এইরূপে ভেদমূলক পদার্থের দুইটি সত্তা থাকে—একটি পারমার্থিক, অপরটি ব্যবহারিক। পারমার্থিক সত্তার উপাদান সেই শক্তিমান্, আর ব্যবহারিক সত্তার উপাদান শক্তি। পরিদৃশ্যমান জগতের পারমার্থিক সত্তার উপাদান ব্রহ্ম ও ব্যবহারিক সত্তার উপাদান মায়া বা প্রকৃতি। নামরূপাত্মক ভেদ উৎপন্ন করিয়া মায়া বা প্রকৃতি জগৎকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া দেখায়। পঞ্চভূতাত্মক জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে। কিন্তু ব্রহ্মপদার্থে এই যে পঞ্চভূতরূপ ভেদাত্মক উপলব্ধি ইহার উপাদান মায়া বা প্রকৃতি। এই ভেদাত্মক উপলব্ধি আবার প্রকৃতপক্ষে রূপের উপলব্ধি ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং রূপ আবরণ মাত্র। অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপী এক

ব্রহ্মসত্ত্বই রূপ-রূপ আবরণ দ্বারা আবৃত হইয়া জগদ্রূপে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং মায়াই আবরণরূপে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ভূত ব্যবহারিক জগতের উপাদান। এইজন্য ঋষি বলিয়াছেন যে, প্রলয়কালে তমঃ অর্থাৎ আবরণতত্ত্ব ছিল এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ তাহাতে লীন হইয়া ছিল। পুনশ্চ, ব্রহ্মকে জগদ্রূপে দেখা, সৎপদার্থকে অসৎ বলিয়া ধারণা করা, অবিদ্যা বা অজ্ঞানজন্য হয়। সুতরাং এই অবিদ্যাই জগতের মূলকারণ ও উপরোক্ত আবরণতত্ত্ব। মায়াশক্তি ক্রিয়াশীল হইয়া তাহার ভাবরূপ অবিদ্যাংশ দ্বারা ব্রহ্মপদার্থের আবরক হয় ও জগদ্রূপ প্রকাশিত করে। মায়া বা প্রকৃতির এই যে অবিদ্যারূপ, ইহাকে অপরা মায়া বা অপরা প্রকৃতি বলে। মায়া বা প্রকৃতির অন্য রূপের নাম পরা মায়া বা পরা প্রকৃতি। ইহা বিদ্যা বা জ্ঞান। ইহার দ্বারা জীবের জগদ্রূপ ভ্রমের নাশ হয়, অবিদ্যা দগ্ধ হয় ও তৎফলে জগৎ ব্রহ্মরূপে প্রতীয়মান হয়। অবিদ্যা যেমন তমঃ বা আবরণতত্ত্ব, বিদ্যা তেমনি সত্ত্ব বা প্রকাশতত্ত্ব। এই বিদ্যা ও অবিদ্যার লীলাই জগৎ-লীলা। পরস্পর বিবদমান হইয়া এই দুই তত্ত্ব লীলা করে। অবিদ্যা বিদ্যাকে পরাভূত করিলে ব্রহ্ম জগদ্রূপে প্রতীয়মান হয় ও বিদ্যা অবিদ্যাকে পরাভূত করিলে, জগৎ ব্রহ্মরূপে প্রতীয়মান হয়। ব্রহ্মকে জগদ্রূপে উপলব্ধির নাম বন্ধন ও জগৎকে ব্রহ্মরূপে উপলব্ধির নাম মুক্তি। এইরূপে সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে তমঃ বা অবিদ্যা বা আবরণতত্ত্ব জগতের ব্যবহারিক উপাদান ও জীবের বন্ধনস্বরূপ। ঋষি ইহাকে তুচ্ছ বলিয়াছেন; কারণ, ইহা ভ্রম উৎপাদন করে। যাহা ভ্রম উৎপাদন করে, তাহা কখনও মহৎ হইতে পারে না; কারণ, ভ্রমের নাশ অবশ্যম্ভাবী। অবিদ্যার তুলনায় বিদ্যা মহৎ; কারণ, পরিণামে বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার পরাভব অনিবার্য্য। কিন্তু অবিদ্যা তুচ্ছ হইলেও উহা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রলয়কালে ব্রহ্মাণ্ড এইরূপে তমঃ দ্বারা আবরিত হইয়া তাহার সহিত একীভূত অবস্থায় থাকে। এ কথা অগ্রেই বুঝাইয়াছি। অতঃপর ঋষি বলিতেছেন যে, এই কারণের সহিত একীভূত জগৎ-কার্য্য সৃষ্টিকালে তপের মাহাত্ম্য দ্বারা উৎপন্ন হয়। মায়াশক্তি ক্রিয়াশীল হইলে, জগৎ সৃষ্ট হয়। তমোরূপ কারণাকারে পরিণত, তমঃ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আবৃত জগৎ সত্ত্ব দ্বারা প্রকাশিত হইলে, তবে কার্য্যরূপে আবির্ভূত হয়। সত্ত্বের কার্য্য প্রকাশ করা—তমকে দগ্ধ করা; এইজন্য ঋষি ইহাকে 'তপঃ' আখ্যা দিয়াছেন। জ্বলনার্থক তপ্ ধাতুর উত্তর অস্ প্রত্যয় করিয়া তপস্ শব্দ হইয়াছে। যাহার দ্বারা অবিদ্যা বা তমঃ দগ্ধ হয়, তাহাই তপঃ। ভৌতিক অন্ধকার নাশ করে বলিয়া সূর্য্যের নাম তপন। মানসিক অন্ধকার বা অজ্ঞান নাশ করে বলিয়া সত্ত্বপ্রধান মানসিক ক্রিয়া বা পর্য্যালোচনার নাম তপঃ। তপঃ জ্ঞানময় (মুণ্ডকোপনিষৎ—১।১।৯), প্রকাশ-ধর্ম্মী সত্ত্বই জ্ঞান। অতএব তপঃ দ্বারা এখানে ক্রিয়াশীল সত্ত্বই উপলক্ষিত হইতেছে, যাহা আবরিত জগৎকে প্রকাশ করে। অতএব সত্ত্বকে এখানে 'তপঃ' আখ্যা দিবার উদ্দেশ্য এই যে, সৃষ্টিকার্য্য অর্থাৎ পর্য্যা-

লোচনারূপ ক্রিয়াশীল সত্ত্ব দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই কথাই মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে; যথা,—"তপসা চীয়তে ব্রহ্ম" (১।১।৮) অর্থাৎ ব্রহ্ম তপঃ দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা সৃষ্টিসমুন্মুখ হন। তুচ্ছ তমের তুলনায় ঋষি সক্রিয় সত্ত্ব বা তপকে মহৎ বলিয়াছেন। এই মহত্ত্ব-হেতু দর্শনশাস্ত্রে সত্ত্বপ্রধান বুদ্ধিতত্ত্বকে মহৎ নামে অভিহিত করা হয়।

৪। যেহেতু মনের সম্বন্ধী রেত, অর্থাৎ ভাবী প্রপঞ্চের বীজ, প্রথমে ছিল, সেই হেতু অগ্রে, অর্থাৎ বিকারজাত সৃষ্টির প্রাগবস্থায়, (পরমেশ্বরের মনে) কাম, অর্থাৎ সিসৃক্ষা, সঞ্জাত হইয়াছিল। সতের, অর্থাৎ পরিদৃশ্য-মান জগতের, বন্ধুকে অর্থাৎ হেতুভূত কর্ম্ম-সকলকে, কবিগণ, অর্থাৎ ক্রান্তদর্শন অতীতা-নাগতবর্ত্তমানাভিজ্ঞ যোগিগণ, হৃদয়ে বুদ্ধি-দ্বারা বিচার করিয়া অসতে, অর্থাৎ সদ্বি-লক্ষণ অব্যাকৃত কারণে, নিষ্কর্ষণ করিয়া, অর্থাৎ পৃথগ্‌রূপে, জানেন।

তাৎপর্য্যঃ—বুঝিলাম—তপ অর্থাৎ স্রষ্টব্য-পর্য্যালোচনা-রূপ সক্রিয় সত্ত্বদ্বারা জগৎ সৃষ্ট হয়, কিন্তু সত্ত্ব জগৎসৃষ্ট্যর্থে কি জন্য সক্রিয় হয়? প্রলয়কালীন নিষ্ক্রিয় সত্ত্বকে সৃষ্টির প্রারম্ভে কে সক্রিয় করে? এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষি বলিতেছেন,—সৃষ্টির প্রারম্ভে কাম সঞ্জাত হইয়াছিল। কাম অর্থে প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি রজোগুণের ক্রিয়া। এইরূপে মায়াশক্তিতে তমোগুণ ও সত্ত্বগুণ ভিন্ন রজোগুণ অঙ্গীকৃত হইল। ফলতঃ দ্বিতীয় ঋকে ঋষি প্রলয়কালে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন মায়াশক্তির অঙ্গীকার করিলেন; তৃতীয় ঋকে পরিদৃশ্যমান জগতের কারণভূত আবরণতত্ত্ব তমোগুণের ও তমঃপরিপন্থী, প্রকাশধর্ম্মী, সৃষ্টিমুক্তির হেতুভূত সত্ত্বগুণের অঙ্গীকার করিলেন; এবং চতুর্থ ঋকে এই দুই গুণের প্রবর্ত্তক রজোগুণের অঙ্গীকার করিলেন। ইহাই দর্শনশাস্ত্রের প্রকৃতিতত্ত্ব। অতঃপর পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে—কাম সঞ্জাত হইল কেন? প্রলয়কালে রজো-গুণ সুপ্ত ছিল, তমোগুণদ্বারা গূঢ় জগৎ তদ্রূপে লীন হইয়াছিল, সৃষ্টির প্রাক্‌কালে রজোগুণ কেন জাগরিত হইল, কে তাহাকে জাগ্রত করিয়া সত্ত্বকে ক্রিয়াশীল করিতে প্রবৃত্ত করিল? এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষি বলিতেছেন—প্রলয়ের পূর্ব্বকালীন সৃষ্টিবীজ প্রথমে প্রলয়কালেও ছিল বলিয়া প্রলয়ান্তে উহা রজোগুণকে জাগ্রত করে। দ্বিতীয় ঋকের তাৎপর্য্যে বলিয়াছি, সর্ব্বজীবের পরি-পক্ক কর্ম্মসকল যখন ভোগ হইয়া যায়, তখন ভোগের অভাবে জগতের প্রয়োজনীয়তা থাকে না বলিয়া প্রলয় হয়। আলোচ্য ঋকে উক্ত হইতেছে যে, প্রলয়কালে জগতের বীজ থাকে। এই বীজ জীবের সঞ্চিত অপরিপক্ক কর্ম্ম। এই অপরিপক্ক কর্ম্ম পরিপক্ক হইলে, তাহার ভোগার্থ জগতের প্রয়োজন হয়, সুতরাং প্রলয়ান্তে সৃষ্টি হয়। অতঃপর প্রশ্ন হইতেছে—এই বীজ কাহার এবং কোথায় অবস্থান করে? উত্তরে ঋষি বলিতেছেন, ইহা মনের, এবং মনে অবস্থান করে। প্রলয়-কালে মানস সংস্কাররূপে পরিণত এই বীজ বাসনা-শেষহেতু মায়ায় বিলীন সর্ব্বজীবান্তঃ-করণে অবস্থান করে। তৎকালে জীবের ভোগ না থাকায় কাম বা বাসনা থাকে না, সুতরাং কর্ম্মসংস্কার সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয় থাকে; কর্ম্ম-সংস্কার নিষ্ক্রিয় থাকায়, মনের করণীয় কিছু

থাকে না, সুতরাং মন পরকালীন সৃষ্টির বীজস্বরূপ কর্ম্মসংস্কারসকলকে সংগ্রহ করিয়া মায়ায় লীন হয়। পরে যখন কর্ম্ম পরিপক্ক হওয়ায় সংস্কার জাগরিত হয়, মনে তখন বাসনা বা কামের উদ্রেক হয়—অর্থাৎ রজোগুণের ক্রিয়া হয়। অতঃপর রজোগুণ সক্রিয় হইয়া সত্বকে ক্রিয়াশীল করে। সত্ব ক্রিয়াশীল হইয়া স্রষ্টব্যপর্য্যালোচনাদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করে। এইরূপে আত্মার গুণাধারত্ব প্রত্যাখ্যাত ও নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রমাণিত হইল। জীবের সঞ্চিত কর্ম্ম পরিপক্ক হইলে, ব্রহ্ম-তত্ত্বের মায়াশক্তি তাঁহারই বিধানানুসারে স্পন্দিত বা ক্রিয়াশীল হয়, প্রবুদ্ধ কর্ম্মসংস্কার সকল মনস্তত্বকে ক্ষোভিত করিয়া বাসনা বা কামের উদ্রেক করে এবং কাম উদ্রিক্ত হইলে অর্থাৎ ভোগের প্রয়োজন হইলে ভোগ্য জগৎ সৃষ্ট হয়। এই যে সৃষ্টির প্রক্রিয়া ইহার বিধাতা সেই সকলবেদান্তবেদ্য ব্রহ্মতত্ব পর-মাত্মা যিনি এক অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপ। পরমেশ্বর-রূপে শুদ্ধ, বুদ্ধ, চৈতন্যময় পরমাত্মা জীবের কর্ম্মফল প্রদান করেন এবং তদ্ধেতু জগৎ সৃষ্টি করেন। সাধারণ দেহী যেমন ইচ্ছামত নিজের দেহগত শক্তিসকলকে চালনা করে, সেইরূপ পরমেশ্বর মায়াকে পরিচালন করিয়া জীবের ভুক্তি-মুক্তি বিধান করেন। জগৎ কর্ম্মানুসারে মায়ার অধীন সুতরাং সৃষ্টিকার্য্যে অক্ষম। মায়া পরমে-শ্বরের অধীন, সুতরাং পরমেশ্বর সৃষ্টি-কার্য্যে অক্ষম। প্রলয়ান্তে যখন সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তখন এই সর্ব্বসাক্ষী চৈতন্যময় পরমাত্মা নিজেকে স্রষ্টারূপে কল্পনা করিয়া, মায়াকে আত্মদেহে প্রবুদ্ধ করিয়া, ভোগ্য-প্রপঞ্চ ও ভোক্তৃগণকে সৃষ্টি করেন। পরমেশ্বর দেহে পরমেশ্বরের অধীনে এই যে মায়ার প্রবোধন, ইহাকেই বলে পরমেশ্বরের সিসৃক্ষা। সাধারণ বদ্ধজীবের ইচ্ছা যেমন তাহার নিজের কর্ম্মানুগত, পরমেশ্বরের এই ইচ্ছা তেমন তাঁহার নিজের কর্ম্মানুগত নহে; কারণ, তাঁহার কর্ম্মবন্ধন নাই। পরন্তু এই ইচ্ছা নিখিল জীবের কর্ম্মানুগত; নিখিল জীবের কর্ম্ম তাঁহার বিধানানুসারে ক্রিয়াশীল হইয়া মায়াশক্তিতে মনস্তত্বে যে ক্ষোভ উৎপন্ন করে, তাহাই তাঁহার ইচ্ছা। নিখিল জীবের মনের সমষ্টিই তাঁহার মন এবং নিখিল জীবের মনে যে সকল কামের উদয় হয়, তাহার সমষ্টিই তাঁহার কাম। প্রভেদ এই যে, জীব মনের ও কামের অধীন, তিনি মনের ও কামের ঈশ্বর। জীব স্বীয় কর্ম্মদ্বারা সৃষ্টি করিলেও তাহার স্বরূপ অবগত নহে; পরমেশ্বর জীবের কর্ম্মানুসারে সৃষ্টি করেন এবং একমাত্র তিনিই ইহার স্বরূপ অবগত আছেন। সূক্তের শেষ ঋকে ঋষি এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

সৃষ্টিব্যাপারে কার্য্যকারণের সম্বন্ধ বিচার করিয়া ঋষি দেখাইলেন যে কর্ম্মই সৃষ্টির মূল কারণ। অতঃপর প্রশ্ন হইতে পারে, কর্ম্মের মূল কি? ইহার উত্তরে ঋষি বলিতেছেন, কর্ম্মের মূল অনির্দ্দেশ্য, অনির্ব্বচনীয়, বুদ্ধির—তথা বিচারের—অনধিগম্য। কিন্তু এই জগৎ-কারণের কারণান্তর বুদ্ধির অগোচর হওয়ার দরুণ যে উহা শশবিষাণবৎ অসত্য, তাহা নহে। কর্ম্মের জগৎকারণত্ব অর্থাৎ কর্ম্ম যে সৃষ্টির বীজরূপে মায়াতে অবস্থান করে, ইহা শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। এই শ্রুতিপ্রমাণ যথেষ্ট হইলেও ঋষি তাত্ত্বিক

প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছেন, পাছে কোন নাস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি শ্রুতিপ্রমাণকে অগ্রাহ্য করিয়া কর্ম্মের জগৎকারণত্বে অবিশ্বাসী হয়। যথা,—ত্রিকালদর্শী যোগিগণ ইন্দ্রিয়গ্রাম নিগ্রহপূর্ব্বক অন্তর্দৃষ্টি সম্যক্ জাগরিত করিয়া হৃদয়ক্ষেত্রে অব্যাকৃত কারণে, অর্থাৎ মূলপ্রকৃতিতে, প্রকৃতির বিকৃতিস্বরূপ দৃশ্যমান জগতের হেতুভূত কর্ম্মসকলকে বিশুদ্ধ সত্ত্ববুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া পৃথগ্‌ভাবে দর্শন করিয়া তাহাদিগের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেন। উপনিষদে এই মূলপ্রকৃতিকে অব্যক্ত বলা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য অব্যক্তের লক্ষণ করিয়াছেন, "সর্ব্বস্য জগতো বীজভূতং অব্যাকৃতনামরূপং সতত্ত্বং সর্ব্বকার্য্যকারণশক্তিসমাহাররূপং অব্যক্তং" (কঠ ৩।১১ ভাষ্য), অর্থাৎ সমস্ত জগতের বীজভূত সমস্ততত্ত্বময় অনভিব্যক্ত নামরূপাত্মক সর্ব্বকার্য্যকারণশক্তির সমষ্টিস্বরূপ পদার্থ অব্যক্ত। ঔপনিষদিক এই অব্যক্ত শব্দটি আকৃতিতে ও অর্থে ঋকের অসৎ শব্দেরই অনুরূপ। সৎ শব্দে নামরূপাত্মক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌতিক পদার্থ বুঝায়, সুতরাং অসৎ শব্দে অব্যাকৃত মূলপ্রকৃতি বুঝায়। সত্তা ও ব্যক্ততা সমানার্থবাচক, সুতরাং অসৎ ও অব্যক্তও একার্থবাচক।

৫। এই সকলের, অর্থাৎ সৃষ্টির অবিদ্যাকামকর্ম্মরূপ হেতুসকলের, রশ্মি কি (প্রথমে) তির্য্যগ্‌ভাবে, অর্থাৎ মধ্যে, বিস্তৃত হইয়াছিল, অথবা অধোদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল, অথবা উপরে বিস্তৃত হইয়াছিল? রেতোধাসকল, অর্থাৎ বীজভূত কর্ম্মের বিধাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা জীব সকল, হইয়াছিল এবং মহৎ সকল, বিয়দাদি ভোগ্যসকল হইয়াছিল। স্বধা, অর্থাৎ ভোগ্যপ্রপঞ্চ, নিকৃষ্ট এবং প্রযতিতা, অর্থাৎ ভোক্তা, উৎকৃষ্ট, অর্থাৎ ভোগ্যপ্রপঞ্চ ভোক্তৃপ্রপঞ্চের পরে সৃষ্ট হইয়াছিল।

তাৎপর্য্য:—"অসৎ ছিল না" এতদ্দ্বারা প্রলয়কালে অবিদ্যার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে; "অগ্রে কাম সঞ্জাত হইয়াছিল," এতদ্দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে কামের উদ্ভব উক্ত হইয়াছে; এবং 'মনের সম্বন্ধি রেত প্রথমে ছিল", এতদ্দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। বিয়দাদি ভূত সকল এই অবিদ্যাকামকর্ম্মরূপ হেতুসকল হইতে সৃষ্টিকালে উদ্ভূত হয়। অতঃপর প্রশ্ন হইতেছে ইহারা কিরূপ পর্য্যায়ে, কত সময়ে, কোন্ দেশের পর কোন্ দেশ অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত হয়? ইহার উত্তরে ঋষি প্রশ্নচ্ছলে বলিতেছেন—বিয়দাদি ভূতসকল সূর্য্যরশ্মির ন্যায় অতি শীঘ্র নিমিষের মধ্যে একেবারে সর্ব্বজগৎ ব্যাপ্ত করিয়া উৎপন্ন হয়। গুণানুসারে ভূতসকল পর পর পর্য্যায়ক্রমে উদ্ভূত হয়; যথা,—আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি। কিন্তু এই ক্রমানুযায়ী উৎপত্তি বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পন্ন হওয়ায়, প্রথমে কোন্ ভূত কোন্ দেশে উৎপন্ন হইল, তাহার নির্দ্দেশ হয় না। এইরূপে অতিশীঘ্র সর্ব্বদিকে ভূতসৃষ্টি নিষ্পন্ন হয়। এখন দেখা যাউক, এ পর্য্যন্ত সৃষ্টিকার্য্য কতদূর অগ্রসর হইল। প্রলয়কালে মূলপ্রকৃতি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন অবস্থায় ছিল। অতঃপর সৃষ্টির প্রাক্‌কালে "তপের মাহাত্ম্যদ্বারা জগৎ উৎপন্ন হয়" এই

বাক্যদ্বারা প্রকৃতির ব্রহ্ম হইতে দ্বৈতভাবে সত্ত্বরজস্তমের ক্রিয়াশীল অসাম্য অবস্থার উৎপত্তি সূচিত হইয়াছে। তৎকালে মূল প্রকৃতি ব্রহ্মস্বরূপত্ব ছাড়িয়া জগতের আদিকারণ অসৎ বা অব্যক্তরূপে আবির্ভূতা হন। এইরূপে অব্যক্তের আবির্ভাব নির্দ্দেশ করিয়া ঋষি ব্যক্ত বিয়দাদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। অতঃপর ঋষি বলিতেছেন—ভোক্তা জীবসকল ও ভোগ্য বিয়দাদি সৃষ্ট হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে ভোগ্যের অগ্রে ভোক্তার সৃজন হইয়াছিল। সূক্ষ্মদেহাবচ্ছিন্ন আত্মাই কর্ম্মের বিধাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা জীব। এই সূক্ষ্মদেহ মহত্তত্ত্ব হইতে সূক্ষ্ম পঞ্চভূত পর্য্যন্ত তত্ত্বদ্বারা গঠিত। অতএব সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের সৃষ্টি হইতে পারে না; এবং জীবের সৃষ্টি না হইলে ভোগ্য স্থূল পঞ্চভূতের অপ্রয়োজন বিধায় সৃষ্টি হইতে পারে না। আলোচ্য ঋকে ঋষি সৃষ্টির এই পর্য্যায়ের উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,—অগ্রে সূক্ষ্মভূতের সৃষ্টি, তৎপরে জীবের সৃষ্টি, তৎপরে স্থূল প্রপঞ্চের সৃষ্টি। সূক্ষ্মভূতসকলকে ঋষি রশ্মি বলিয়া তাহাদের সূক্ষ্মত্ব সূচিত করিয়াছেন এবং স্থূলভূতসকলকে মহৎ বলিয়া তাহাদের স্থূলত্ব সূচিত করিয়াছেন। স্বধা প্রকৃতির নাম। প্রকৃতি জীবের ভোগ্যরূপে আবির্ভূত হন বলিয়া স্বধা শব্দে ভোগ্য প্রপঞ্চ বুঝায়।

৬। এই পরিদৃশ্যমান বহুপ্রকারের সৃষ্টি কি উপাদানকারণ হইতে ও কি নিমিত্তকারণ হইতে জাত, তাহা কে যথাযথভাবে জানে এবং এখানে, অর্থাৎ এই জগতে, কেই বা তাহা প্রকৃষ্টরূপে বলিতে পারে? দেবগণ এই জগতের বিবিধ সৃষ্টির পশ্চাজ্জাত। অতএব যাহা হইতে জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে তাহা কে জানে?

তাৎপর্য্য:—উপরে ঋষি ভোক্তৃভোগ্যরূপে নিখিল সৃষ্টির ক্রম সংক্ষেপে দেখাইলেন। অতঃপর ঋষি প্রশ্নচ্ছলে বলিতেছেন যে, এই বিশাল ও বিচিত্র জগতের সৃষ্টির কার্য্যকারণসম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে কেহই জানে না ও জানিতে পারে না। ভূত-ভৌতিক-ভোক্তৃ-ভোগ্যাদিরূপে এই বহুপ্রকার সৃষ্টির উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ যে কি, তাহা কেহই বলিতে পারে না। এমন কি, দেবতারাও এই কার্য্যকারণসম্বন্ধবিষয়ে অনভিজ্ঞ; কারণ, তাঁহারা সৃষ্টির আদিতে ছিলেন না; পরন্তু ভূতসৃষ্টির পরে উৎপন্ন হইয়াছেন। বেদসংহিতায় দেবগণকে দ্যাবাপৃথিবীর অর্থাৎ দ্যুলোক ও পৃথিবীর সন্তান বলা হইয়াছে। ["যে স্থ জাতা অদিতেরদ্ভ্যস্পরি যে পৃথিব্যাস্তে ম ইহ শ্রুতা হবং।" (১০-৬৩-২)। অর্থাৎ যে সকল দেবতা দ্যুলোকে অপ্‌সকল অর্থাৎ অন্তরীক্ষ হইতে জন্মিয়াছেন, এবং যাঁহারা পৃথিবী হইতে জন্মিয়াছেন, তাঁহারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন।] সুতরাং দ্যাবাপৃথিবীর যাঁহারা সন্তান, তাঁহারা দ্যাবাপৃথিবীর—তথা সমগ্র বিচিত্র সৃষ্টির—বিস্তারিত কারণ কিরূপে যথাযথভাবে অবগত হইবেন? আর দেবগণই যদি অবগত না হইলেন তাহা হইলে আর কোন্ ব্যক্তি অবগত হইতে পারে? কেহই পারে না।

৭। যাঁহা হইতে এই বিচিত্র সৃষ্টি জন্মিয়াছে, তিনিই যদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন অথবা যদি না করিয়া থাকেন। যিনি ইহার

অধ্যক্ষ পরম ব্যোমে অধিষ্ঠিত তিনিই যদি জানেন অথবা যদি না জানেন।

পূর্ব্ব প্রশ্নের অনুবর্ত্তন করিয়া ঋষি বলিতেছেন,—সৃষ্টির কারণ জীব যে কিছুতেই যথাযথভাবে জানিতে পারে না, তাহার হেতু এই যে, যে পরমাত্মা হইতে জগৎ জন্মিয়াছে অর্থাৎ যে পরমাত্মা জগতের উপাদানকারণ, এবং যে পরমাত্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, অর্থাৎ যে পরমাত্মা জগতের নিমিত্তকারণ, সেই পরমাত্মাকে কেহই জানিতে পারে না। তবে একজন আছেন, যিনি এই জগতের কারণ পরমাত্মা বিষয়ে অবগত আছেন। ঈশ্বর যিনি এই জগতের অধ্যক্ষ, ও ব্যোমে অধিষ্ঠিত তিনিই এই বিশিষ্ট জ্ঞাতা। তিনি ভিন্ন জগৎকারণের জ্ঞাতা আর কেহই নাই। এই ঋকে ঋষি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণের একত্ব নির্দেশ করিয়াছেন। (ক্রমশ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার।

রাও বাহাদুর সর্দ্দার সংসারচন্দ্র

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আজকালকার দিনে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ বেতনভোগীর কর্ত্তব্য কর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অফিসের কাজের সঙ্গে হৃদয়ের কোন যোগ নাই। বরঞ্চ পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে আমরা বুঝিয়াছি যে, কার্য্যের মধ্যে হৃদয়কে আনিলে কাজের ব্যাঘাত হয় মাত্র। পূর্ব্বে আমাদের দেশে কাজের সম্বন্ধ প্রেমভক্তির দ্বারা মধুর ও সজীব হইয়া উঠিত; আজ আমরা তাহা হারাইয়া ঠকিয়াছি কি জিতিয়াছি, সে বিচারের দিন এখনও আসে নাই। তবে এখন আমরা মানুষকে ভুলিয়া প্রণালীকে, প্রীতিকে ছাড়িয়া বিধিকে গ্রহণ করিয়াছি, তাই চাকরীর দীনতার কলঙ্কই আমাদের ভূষণ হইয়াছে।

সংসারচন্দ্র যখন নবীন মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন, তখন দিনকাল অন্যরূপ ছিল। তিনি একাধারে মহারাজের শিক্ষক, সঙ্গী, বন্ধু এবং রক্ষক হইলেন। তিনি প্রত্যূষে মহারাজের নিকট উপস্থিত হইতেন এবং সমস্ত দিন তাঁহার সকল কর্ম্মে সহায়তা করিতেন। প্রথম কয়েক বৎসর আহারাদিও একত্রে হইত, তার পর রাত্রে আহারাদির পর মহারাজ শয়ন করিলে, সংসারচন্দ্র গৃহে ফিরিতেন। সুদীর্ঘ বিশ বৎসর কাল সংসারচন্দ্র মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করিয়াছিলেন। তিনি যে কেমন করিয়া এই রাজপুত যুবককে তখনকার কুসংস্কার এবং প্রলোভন হইতে দূরে রাখিয়া হিন্দুর পুরাতন ধর্ম্ম, আচার, প্রথা ও কীর্ত্তি বজায় রাখিয়াও তাঁহাকে বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন, কেমন করিয়া নিজের চরিত্রবলে ধীরে ধীরে এই নবীন নরপতির চরিত্র গঠন করিয়া এই সুবৃহৎ রাজ্যের প্রজাপালন, সুবিচার এবং উন্নতির জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন—তাহা এখন কেবলমাত্র মহারাজের কার্য্যকলাপ আলোচনার দ্বারাই বুঝিতে

পারা সম্ভব। জয়পুরের মত বিশিষ্ট দেশীয় রাজ্যের অধিপতির প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ যে কত কঠিন, কত দায়িত্বপূর্ণ এবং কতটা জটিল, তাহা যাঁহারা দেশীয় রাজ্যের সংস্রবে না আসিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে বুঝা কঠিন। যিনি বিশেষভাবে রাজার চরিত্র, মনের গতি এবং কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সে রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব নহে। নিজেকে সম্পূর্ণ অন্তরালে রাখিয়া যিনি রাজা ও রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া রাজাকে নিয়মিত করিতে পারেন, যিনি নিজের স্বার্থকে রাজ্যের স্বার্থে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত করিতে পারেন, যিনি লোকচরিত্রজ্ঞ, দূরদর্শী এবং ধৈর্য্য ও কৌশলের সহিত প্রভুর হিতসাধনপ্রয়াসী, তিনিই আদর্শ প্রাইভেট্ সেক্রেটারী। সংসারচন্দ্র বিশ বৎসর ধরিয়া বিবিধ স্বার্থসংঘাতের মধ্য দিয়া আপনা ভুলিয়া ছায়ার ন্যায় মহারাজের সেবা করিয়াছিলেন, এই বিশ বৎসরে মহারাজ যে সকল রাজকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন—তার সঙ্গে সংসারচন্দ্রের যোগ লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে—তিনি এমনি করিয়াই আত্মগোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিদিনের জলবায়ু যেমন করিয়া মনুষ্যশরীরকে গঠন করে, তেমনি করিয়া তিনি নিজ চরিত্রের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই জন্য এ সময়ে আমরা রাজকার্য্যে প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাকে দেখিতে পাই না। মানবজীবনে বিশ বৎসরকাল সামান্য বলিতে পারা যায় না। সংসারচন্দ্র যৌবনের উত্তম এবং সংসাহস লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই বিশ বৎসর তাঁহার জীবনের তপস্যার কাল, যাহার ফলে তিনি ভবিষ্যতে রাজা প্রজা সকলের হিতসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। রাজপুতানা এবং রাজপুতগণের ইতিবৃত্তের সহিত, তাঁহাদের আচারব্যবহার, তাঁহাদের প্রকৃতি এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে যে সকল প্রথা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সে সকলের সহিত সংসারচন্দ্রের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও অভিজ্ঞতা তাঁহার মন্ত্রিত্বকালে লোককে আশ্চর্য্য করিত, তাহাও তাঁহার জীবনের এই সাধনার সময়ে উপার্জ্জিত। তিনি শুধু শিক্ষা দেন নাই, নিজেকে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারী গিরিধারী দাসের সংস্রবে এবং উপদেশে মহারাজ মাধোসিংহ হিন্দুধর্ম্মে পরম আস্থাবান্। মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা এবং তীর্থভ্রমণ, মহারাজ হিন্দুর জীবনের এক প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। সংসারচন্দ্র এই সকল ধর্ম্মকার্য্যে প্রধান সহায়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ গঙ্গোত্রী ও গোমুখী তীর্থ দর্শন করিতে মনস্থ করিয়া সংসারচন্দ্রকে উক্ত তীর্থে যাইবার রাস্তা প্রভৃতি দেখিবার জন্য প্রেরণ করেন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সংসারচন্দ্র যে কষ্ট ভুগে প্রথম গঙ্গোত্রী গমন করেন—তাহার বিস্তারিত বিবরণ তাঁহার নিজ লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। মুসৌরী হইতে ঘোড়া, ঝাঁপি এবং কুলী সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা গঙ্গোত্রী যাত্রা করেন। পথে স্থানে স্থানে কোথাও বা ধর্ম্মশালায়, কোথাও বা পাহাড়িয়াদিগের কুটীরে এবং অধিকাংশ সময়ে অনাবৃত স্থানে কাটাইতে হইত। সংসারচন্দ্র যখন যে বিষয়ের ভার লইতেন, তাহা সর্ব্বপ্রকারে সুসম্পন্ন করিতে ঐকান্তিক যত্ন করিতেন,

সে বিষয়ের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। গঙ্গোত্রীর পথে যেখানে যেখানে থাকিবার সুবিধা এবং পথে কি কি প্রয়োজন হইতে পারে, আহার্য্যদ্রব্যের মূল্যাদি, কুলী-ভাড়া, পথের বিবরণ, গ্রাম, নদী, পাহাড় প্রভৃতির নাম—সমস্তই তাঁহার দিনলিপিতে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যাত্রীর কোন জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিন মাস পরে তিনি জয়পুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। যে বলিষ্ঠ দৃঢ় শরীর নানাপ্রকার পরিশ্রম করিয়াও অটুট ছিল, এই গঙ্গোত্রী যাত্রায় তাহাতে রোগ প্রবেশ করিল। সঙ্গের লোকেরা তাঁহার কষ্টসহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য এবং নির্ভীকতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইত; মহারাজের কাজে তাঁহাকে যে শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা তিনি কদাচ মুখে আনিতেন না। কর্ত্তব্যকর্ম্মে আত্মত্যাগ তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, নিজের কোন সুবিধা অসুবিধা তিনি কখন গণনা করেন নাই। কি রাজ্যের হিতকর কার্য্যে, কি ধর্ম্মকর্ম্মে, কি আনন্দ-উৎসবে বা শিকারে, সংসারচন্দ্র সর্ব্ববিষয়ে বিশ বৎসরকাল মহারাজের সাহচর্য্যে কাটাইয়াছিলেন; কিন্তু কখনও নিজের কর্ত্তব্যপথ হইতে ক্ষণমাত্র বিচলিত হ'ন নাই, মহারাজের হিতচিন্তা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য তিনি মনে স্থান দেন নাই। তাই মহারাজের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ শুধু কর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। একদিকে শ্রদ্ধা, নির্ভরতা ও হৃদয়ের আকর্ষণ এবং অন্য দিকে স্নেহ, প্রীতি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা—এই মণিকাঞ্চন-সংযোগে এ সম্বন্ধ পরম আত্মীয়তায় পরিণত হইয়াছিল। তাই উত্তরকালে অম্বরাধিপতির মহিষী মহারাণী যাদোনজী সংসারচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীকে মাতৃ-সম্বন্ধে সম্মানিত করিয়া "রাখী" বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।

মহারাজ সবাই মাধোসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করার তিন মাস পরে সংসারচন্দ্র প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হ'ন এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে মন্ত্রিপদে বৃত হয়েন। তাঁহার জীবনী বুঝিতে হইলে, এই বিশ বৎসরের জয়পুররাজ্যের একটা মোটামুটি বিবরণ জানা আবশ্যক। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, ইহা সুবিখ্যাত সচিবপ্রবর স্বর্গীয় রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, মহাশয়ের মন্ত্রিত্বকাল। অতএব তাঁহার সম্বন্ধে কিছু না বলিলে এ জীবনবৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়।

রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র প্রথমে জয়পুর স্কুলের প্রধানশিক্ষকপদে নিযুক্ত হইয়া আসেন; পরে যখন উক্ত স্কুল 'মহারাজ-কলেজে' পরিণত হইল—তখন তিনি তাহার অধ্যক্ষ হয়েন।

গবর্ণমেণ্টের সহিত যখন সম্বরহ্রদের স্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব চলিতেছিল, সেই সময় ইঁহার বুদ্ধিমত্তা ও নির্ভীকতা স্বর্গীয় মহারাজ রামসিংহের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাহার পর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে যখন মহারাজ রামসিংহ বরোদাধিপতি মহারাজ সয়াজী গায়কোয়াড়ের মোকদ্দমায় অন্যতম বিচারকের পদে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বৃত হ'ন, তখন তাঁহার রায় প্রকাশকালে তাঁহার তদানীন্তন প্রাইভেট সেক্রেটারীকৃত অনুবাদ মহারাজের

মনোমত না হওয়ায়, তিনি কান্তিবাবুকে অনুবাদ করিতে আদেশ করেন। এই সময়েই মহারাজ তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অসাধারণ দক্ষতার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হ'ন। তাহার ফলে জয়পুরে ফিরিয়া তিনি কান্তিবাবুকে কৌন্সিলের অন্যতম সদস্যের পদে নিযুক্ত করেন।

মহারাজ রামসিংহের স্বর্গারোহণের এবং বর্ত্তমান মহারাজের সিংহাসন প্রাপ্তির পরেও কিছুকাল কান্তিবাবু মন্ত্রিসভার সাধারণ সদস্যের পদেই নিযুক্ত থাকেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে যখন মহারাজ দ্বাবিংশবর্ষে পদার্পণ করেন এবং রাজত্বের পূর্ণ শাসনভার প্রাপ্ত হ'ন, তাহার পর হইতেই কান্তিবাবু ক্রমে ক্রমে প্রধানমন্ত্রিপদে উন্নীত হ'ন এবং ১৯০১ সালের ১৪ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত অসাধারণ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। বর্ত্তমান মহারাজের রাজত্বকালের বিবরণের মধ্যে এই সুদক্ষ মন্ত্রীর কৃতকার্য্যের ইতিবৃত্ত পাওয়া যাইবে বিবেচনায়, পৃথক্‌ভাবে দেওয়া বাহুল্য মনে করি। রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র যখন মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করেন, তখন শাসনপ্রণালীর মধ্যে যে প্রকার বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম, অবিচার এবং স্বার্থ-প্রণোদিত চক্রান্ত বর্ত্তমান ছিল, তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে রাজ্যমধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়ম স্থাপন করিয়া যে সকল প্রজাহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং দেশীয় রাজ্য সকলের মধ্যে জয়পুরকে যে প্রকারে উন্নতির পথে অগ্রণী করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র নিজের প্রতিভা ও দক্ষতায় যেমন রাজ্যের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, জয়পুরাধিপতি এবং গভর্ণমেণ্টও তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ তাঁহাকে রাজ্যের প্রধান শ্রেণীর তাজিমী সর্দ্দার মধ্যে গণ্য করিয়া জায়গীর প্রদান করেন এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাও বাহাদুর উপাধি দান করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি সি, আই, ই, উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। মহারাজ এই প্রতিভাশালী কর্ম্মিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে "বিদ্যাগুরু" পদে বরণ করিয়া যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সিংহাসনপ্রাপ্তির পর মহারাজ মাধোসিংহের কিষণগড় ও রাংধাড়া এই দুই রাজ্যের রাজকুমারীর সহিত শুভপরিণয় সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর ১৮৮১ সালে মহারাজ বোম্বাই, কলিকাতা, গয়া প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া আসেন। এই বৎসর আগষ্ট মাসে জয়পুরে ইকনমিক্ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মিউজিয়ম্ (Economic and Industrial Museum) নাম দিয়া এক শিল্পশালা স্থাপিত হয়। ইহারই অনুবৃত্তি ও পোষকতায় ১৮৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে জয়পুর-শিল্পপ্রদর্শনী খোলা হইল। দেশীয় রাজ্যে ইহা এক অভিনব অনুষ্ঠান। "রাজ্যমধ্যে এবং রাজ্য-সীমান্ত প্রদেশে কোন্ কোন্ দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং কি কি শিল্প প্রচলিত আছে, তাহা জানা এবং তৎসমুদয় একত্র করিয়া শিল্পী-দিগকে উৎসাহ দিয়া স্থানীয় শিল্পের উন্নতি বিধান এবং জনসাধারণের শিক্ষাই এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য।" কান্তিচন্দ্র ও সংসারচন্দ্র উভয়েই জয়পুর মিউজিয়ম্ সমিতির সভ্য ছিলেন

এবং ইঁহাদের বহু পরিশ্রমের ফলে এই শিল্প-সমিতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই শিল্পপ্রদর্শনীর দ্রব্যাদি পরে (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে) নবনির্ম্মিত এলবার্ট হলে রক্ষিত হয়।

স্বর্গীয় মহারাজ রামসিংহ রাজ্যের ও প্রজার হিতকল্পে যে সকল সদনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী মহারাজ মাধোসিংহ সে সকল সযত্নে রক্ষা এবং তৎসমুদয়ের উন্নতিবিধান করিয়াছেন। শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে জয়পুর বর্ত্তমানে রাজপুতানার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জয়পুর কলেজে এফ্‌ এ শ্রেণী খোলা হয়; তারপর ১৮৮৮ সালে ইহাতে বি এ এবং ১৮৯৬ সাল হইতে এম্‌ এ, বি, এস্‌ সি, এম্‌ এস্‌ সি পর্য্যন্ত অধ্যাপনা হইতেছে। সংস্কৃত কলেজেরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এক্ষণে বহু ছাত্র এই কলেজ হইতে কাশী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। কলেজের সংস্রবে আরবিক ও পারসিক ভাষা শিক্ষার জন্য পৃথক্ বিভাগ আছে। এতদ্ব্যতীত জয়পুরে শিল্প-বিদ্যালয় এবং রাজ্যের নানা স্থানে প্রাথমিক ও বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

রাজপুতানার ন্যায় প্রদেশে কেবল মাত্র বৃষ্টির জলই কৃষকের ভরসা। অনাবৃষ্টি বা অল্পবৃষ্টি হইলে প্রজার দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। প্রজাপালক মহারাজ জয়পুরের এই দুঃখ নিবারণের জন্য প্রায় অর্দ্ধকোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া রাজ্যের নানা স্থানে সুবৃহৎ বাঁধ বাঁধিয়া তাহা হইতে জলপ্রণালী কাটাইয়া দিয়া কৃষিকার্য্যের সুবিধা এবং দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় করিয়া দিয়াছেন। ১৮৯৮ সালে জয়পুর রাজ্যে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়; সে সময় মহারাজ, প্রজারক্ষার্থ অকাতরে রাজকোষ খুলিয়া দিয়াছিলেন। রাজ্যের নানাস্থানে বুভুক্ষু প্রজার জন্য অন্নসত্র খোলা হইয়াছিল। সে সময় মন্ত্রিবর কান্তিচন্দ্র হইতে নিম্নতম কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই কেবলমাত্র ক্ষুধার্ত্তের আহার দান এবং পীড়িতের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন— রাজ্যের অন্য সমস্ত কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া প্রজাবৎসল মহারাজ এই দুর্দ্দিনে তাঁর পুত্রোপম প্রজাগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। নিজের উৎসাহ অন্যের মনে সঞ্চারিত করা কান্তিচন্দ্রের এক প্রধান শক্তি ছিল—তাই সকলের ঐকান্তিক চেষ্টায় এই দুর্ভিক্ষ-নিবারণ-ব্যবস্থা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহার ফলে গভর্ণমেণ্ট ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কান্তিবাবুকে "দুর্ভিক্ষ কমিশনের" সদস্য নিযুক্ত করেন। নিজ রাজ্যে দুর্ভিক্ষে প্রজার অবস্থা দেখিয়াই করুণহৃদয় মহারাজ সমগ্র ভারতের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য এক ধনভাণ্ডার স্থাপনের উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্টের হস্তে প্রথমে ষোল লক্ষ টাকা দান করেন এবং ক্রমে ক্রমে আরও ১০।১২ লক্ষ টাকা এই ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

মোগলসম্রাটদিগের সময় হইতে কি ভারতে কি বিদেশে জয়পুরের রাজগণ বরাবর সম্রাট্‌দিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। মহারাজ ভগবান দাস, মহারাজ মানসিংহ ও জয়সিংহের কীর্ত্তি ইতিহাস জলন্ত অক্ষরে প্রচার করিতেছে।

মহারাজ রামসিংহও সিপাহী-বিদ্রোহ দমনে গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজভক্ত মহারাজও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের অনুসরণে নিজরাজ্যে Imperial Service Transport Corps স্থাপন করিয়াছিলেন। এই Transport Corps ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে টিরা প্রভৃতি অভিযানে ভারত-গভর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়া ইহার কার্য্য-কারিতার পরিচয় দিয়াছে।

সংসারচন্দ্রের মন্ত্রিত্বকাল সম্যক্ বুঝিতে হইলে বর্ত্তমান মহারাজের ও তদীয় রাজত্ব-কালের একটা ধারাবাহিক বিবরণ জানা দরকার, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই উদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের অবতারণা। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১০ সন পর্য্যন্তের ইতিহাস মন্ত্রিবর কান্তিচন্দ্রের সহিত জড়িত। তাই সংসারচন্দ্রের মন্ত্রিত্ব-প্রাপ্তি পর্য্যন্তের একটা মোটামুটি বিবরণ এ পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করা হইল মাত্র; বিস্তারিত ইতিহাস দেওয়া এ স্থানে সম্ভবপর নহে।

(ক্রমশঃ)

"এষা"

(২)

জীবন-মরণের সমস্যা মানব-সমাজে নূতন নয়। চিরদিনই মানুষ মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া দিশাহারা হইয়াছে। জীবনের প্রহেলিকাও ভেদ করিতে পারে নাই, মৃত্যুর মর্ম্মও উদ্‌ঘাটন করিতে পারে নাই। বর্ব্বর সাধনার শৈশব-কল্পনা এ পারের ছবিগুলিকে পরপারে ফুটাইয়া তুলিয়া একটা পরলোক রচনা করিয়া লইত, এবং সে লোকের যাত্রীদের সঙ্গে তাহাদের নিত্যব্যবহার্য্য অস্ত্র শস্ত্রাদি, ক্রমে গোমেষাদি এবং পরে তাহাদের দাসদাসী, এমন কি জীবন সঙ্গিনীদিগকেও পাঠাইয়া দিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইত। আমরা আর এ সকল করি না বটে, কিন্তু এখনও অনেকেই যে একটা কল্পিত পর-লোকের সৃষ্টি করিয়া, শোকে সান্ত্বনা অন্বেষণ করে, ইহা অস্বীকার করিতে পারি না। তাহারা একটা স্থূল, সাকার পরজগৎ কল্পনা করিত; আমরা একটা সূক্ষ্ম, নিরা-কার পরলোক গড়িয়া সেখানে সর্ব্ববিধ আনন্দের ও ঐশ্বর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি—বেশ কম এই মাত্র। ফলতঃ পরলোকতত্ত্বটা পূর্ব্বে যেমন, আজিও সেইরূপই অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে।

কিন্তু সমস্যাটা অত্যন্ত পুরাতন হইলেও, যুগে যুগে মৃত্যু মানুষকে নূতন নূতন ভাবে ব্যাকুলিত করিয়া তুলিয়াছে। বর্ব্বর সাধনার অঙ্গ অপূর্ণতা যাহাই থাকুক না কেন, বর্ব্বর সমাজের শ্রদ্ধা অত্যন্ত কোমল, ও কল্পনা অত্যন্ত প্রবল ছিল। বিধাতাপুরুষ যেন এই শ্রদ্ধা ও কল্পনার দ্বারাই বর্ব্বর সমাজের অজ্ঞতা ও অক্ষমতার ক্ষতিটা পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা যাহাকে জড়

বলিয়া এখন উপেক্ষা করিয়া থাকি, তাহা তারই *ভিতরে চৈতন্যের অধ্যাস করিয়া,* বিশ্বসংসারকে সচেতন করিয়া রাখিত। জড়ে ও জীবে তখন এমন একটা মাখামাখি ছিল, এমন একটা আলাপ-আত্মীয়তার আদান-প্রদানের ভাব ছিল, যাহা এখন আমরা কেবল কবি-কল্পনার মায়িক সৃষ্টিতেই দেখিতে পাই, দৈনন্দিন জীবনে অনুভব করিতে পারি না। আমরা আর প্রাচীন দেবতাদের দ্বারা নৈসর্গিক বিবর্ত্তনের ব্যাখ্যা করিতে পারি না। আমাদের জড়বিজ্ঞান ও শক্তিবাদ পুরাতন দেবতাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে। আমরা এখন বিশ্ববিবর্ত্তনের অন্তরালে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির লীলা প্রত্যক্ষ করি না, কিন্তু এক ভীষণ ও বিরাট শক্তি-পুঞ্জের লক্ষ্যহীন সংঘর্ষ এবং সংগ্রামই প্রতিষ্ঠিত করি। আর প্রাচীন দেবতাদের নিরসনের সঙ্গে সঙ্গে, আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের পরলোক-বিষয়িণী কোমল শ্রদ্ধাটুকুও হারাইয়াছি। তাঁহারা মৃতদিগের জন্য সুশোভন চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, দেবলোক, পিতৃলোক, ব্রহ্মলোকাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এ সকলে বিশ্বাস করিয়া তাঁহারা শোকে অশেষ সান্ত্বনালাভ করিতেন। আমাদের সে বিশ্বাস নাই। সুতরাং মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া আমরা আজ যত অধীর হইয়া পড়ি, মৃত্যু আমাদিগকে যতটা নিঃস্ব করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া যায়, প্রাচীনেরা সেরূপ হইতেন না, কাল তাঁহাদিগকে এতটা কার্পণ্যোপহত করিতে পারিত না। প্রাচীনেরা যেমন পরলোক কল্পনা করিতেন, আমরা যে তাহা একেবারেই করি না, এমনও নয়। কিন্তু তাঁহাদের সে কল্পনার সঙ্গে *তাঁহাদের সমসাময়িক সাধনার একটা ঘনিষ্ঠ* যোগ ও সঙ্গতি ছিল, আমাদের পরলোক-কল্পনার মধ্যে সে যোগ ও সঙ্গতি থাকে না। এই জন্য অনেক সময় আমাদের শোক লঘু ও সান্ত্বনা অলীক হইয়া পড়ে।

আমাদের দেশের প্রাচীনেরা মৃতদিগের জন্য আপন আপন কর্ম্মোচিত লোক নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সাধু-অসাধু, ভক্ত-অভক্ত নির্ব্বিশেষে সকলেই যে ব্রহ্মলোক বা বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইত, এমন অদ্ভুত কল্পনা তাঁহারা করিতেন না। এইজন্য, তাঁহাদের পর-লোক-রচনা কল্পিত হইলেও, সেই কল্পনার অন্তরালেও একটা সত্য ও সংযম বিদ্যমান ছিল। শ্রদ্ধা যেখানে—সংযম সেখানে আপনা হইতেই আইসে। আর ইহলোকের বস্তুর ধারণা যেখানে সহজ ও সরল অথচ দৃঢ় থাকে, সেখানে পরলোকের কল্পনাও নিতান্ত সত্য-ভ্রষ্ট হয় না। আমাদের দৃষ্টের ধৃতি যেমন দুর্ব্বল, অদৃষ্টের কল্পনাও সেইরূপ অলীক হইয়া পড়ে। আধুনিক কবিদিগের পরলোক-চিত্রে এইজন্য অনেক সময় বস্তুতন্ত্রতার লেশমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমরা জীবিতকে তেমন সমগ্র প্রাণ দিয়া আঁকড়াইয়া ধরি না বলিয়াই, তাহাদের প্রজ্বলিত-চিতালোকে দাঁড়াইয়া, গলা ছাড়িয়া গান করিতে পারি—

যাও রে অনন্তধামে মোহমায়া পাসরি.
দুঃখ আঁধার যথা কিছুই নাহি।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে
কেবলি আনন্দস্রোত চলিছে প্রবাহি।
যাও রে অনন্তধামে, অমৃত নিকেতনে,
অমরগণ লইবে তোমা উদার প্রাণে।

দেব-ঋষি, রাজ-ঋষি, ব্রহ্ম-ঋষি যে লোকে,
ধ্যানভরে গান করে একতানে।
যাও রে অনন্তধামে, জ্যোতির্ম্ময় আলয়ে,
শুভ্র সেই চির-বিমল পুণ্য-কিরণে।
যায় যথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান্,
যাও বৎস যাও সেই দেব-সদনে॥

অক্ষয়বাবুর শোকগাথাতে কোথাও এইরূপ কোনও অলীক কল্পনার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। অক্ষয়কুমার তত্ত্বদর্শী সিদ্ধপুরুষ নহেন। আমাদের প্রাচীন ঋষিবাক্যে যে তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, অক্ষয়কুমার এ পর্য্যন্ত তার সাক্ষাৎকার লাভ করেন নাই। করিলে, কবিতাগুলি তিনি লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু সে তত্ত্ব কয়জনার ভাগ্যেই বা প্রকাশিত হইয়া থাকে? সে তত্ত্বের উপদেষ্টা অতিশয় দুর্ল্লভ; উপযুক্ত অধিকারী শ্রোতাও অতিশয় দুর্ল্লভ। "দেবৈরত্রাপি পুনঃ বিচিকিৎসিতা পুরা"—অতি প্রাচীনকাল হইতে দেবতারাও এ সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। "ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ"—এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব মনুষ্যদিগের পক্ষে সুবিজ্ঞেয় নহে। অক্ষয়কুমার এই দেবদুর্ল্লভ তত্ত্ব আয়ত্ত করেন নাই, এ কথা বলিলে এই তত্ত্বেরই কেবল মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, অক্ষয়কুমারের কবি-প্রতিভার বা মনীষার কোনও অবমাননা করা হয় না। অক্ষয়কুমার, ইদানীন্তন কালে সভ্যজগতে যে শিক্ষাদীক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাই লাভ করিয়াছেন। তিনি একালেরই কবি ও মনীষী। এ কালটা যুক্তিপ্রধান, অতিশয় প্রত্যক্ষবাদী। এ কালের শিক্ষা ও সাধনার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ,—ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের উপরেই বিশেষভাবে এ যুগের শ্রেষ্ঠতম সাধনা আপনাকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। সুতরাং তর্কের দ্বারা যে তত্ত্ব লাভ করা যায় না, অক্ষয়কুমার সে তত্ত্ব লাভ করেন নাই বলিয়া, কোনও নিন্দার কথাও হয় না। তবে অক্ষয়কুমার এই অতর্কপ্রতিষ্ঠ তত্ত্বের সাক্ষাৎকার না পাইয়াও যে ইহার কল্পিত উপদেশ দিতে যান নাই, ইহাই তাঁহার বিশেষ প্রশংসার কথা। এই জন্যই এই গ্রন্থে কোনও অলীক কল্পনার বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই গ্রন্থে এক দিকে যেমন কোনও গভীর তত্ত্বদর্শিতার প্রমাণ-পরিচয় নাই, অন্য দিকে সেইরূপ কোনও প্রকারের লঘুচিত্ততারও নামগন্ধ নাই। লঘুচিত্ত লোকেই কেবল মায়িক কল্পনার গোলাপী নেশা করিয়া, নানাবিধ জল্পনার সাহায্যে, আপনার গভীর শোকে সান্ত্বনা অন্বেষণ ও লাভ করিয়া থাকে। ফলতঃ লঘুচিত্তের উপরে, শোকের দাগ কখনও গভীরভাবে পড়ে না। তাহার প্রেম যেমন হাল্কা, শোকও সেইরূপই হাল্কা হইয়া থাকে। রোজা যেমন তিলার্দ্ধমাত্র একটা মন্ত্রার্দ্ধ পাঠ করিয়া, অপস্মার-রোগীর কল্পিত রোগযন্ত্রণার উপশম করিতে পারে; লঘুচিত্তের শোকবেদনাও সেইরূপ একবার চক্ষু বুঝিয়া, নষ্ট করিতে পারা যায়। লঘুচিত্ত বিরহীর শোক কদাপি সর্ব্বগ্রাসী হয় না। সে শোকে মর্ম্মের অন্তস্তলকে আলোড়িত করিয়া তোলে না। তাহাদের হাল্কা প্রেমের হাল্কা বিচ্ছেদে, হাল্কা শোকই জাগিয়া উঠে। আর সে শোকের আঘাতে জীবন-মৃত্যুর গভীর ও জটিল সমস্যাকে জাগাইয়া তুলিতে পারে না। অক্ষয়কুমারের প্রেম

প্রগাঢ়, বিচ্ছেদ দুর্বিবষহ, শোক সর্বগ্রাসী; *তাই এই শোকের আঘাতে তাঁহার পুরাভ্যস্ত* জগৎটা চুরমার হইয়া গিয়া, সমগ্র বিশ্ব সমস্যাকে নূতন ও বিকট আকারে, তাঁহার চক্ষের উপরে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কোনও রস যতক্ষণ না গাঢ় হইয়া উঠে, ততক্ষণ তাহার নিজস্ব রূপটা সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে না। অক্ষয়কুমারের শোক অতিশয় গভীর; তাঁহার বিরহ-আগুনে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইয়া এ শোক যেন নিরেট হইয়া উঠিয়াছে। আর এইজন্যই তাঁহার এই শোকগাথাতে সে গভীর শোকের বিচিত্র রূপগুলি এরূপ বিশদভাবে ফুটিয়াছে। যেখানেই কোনও বিশেষ রস, কোনও ক্ষেত্রবিশেষে, তাহার আপনার নিজস্ব রূপগুলিকে ফুটাইয়া তোলে, সেখানেই তাহা আপনার বিশিষ্ট আধারের সঙ্কীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করিয়া, সার্ব্বজনীন ও বিশ্বজনীন হইয়া উঠে। একের রস তখন সকলের রস, একের ভয় ও ভাবনা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সন্দেহ ও শ্রদ্ধা,—তখন বিশ্বের ভয় ও ভাবনা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সন্দেহ ও শ্রদ্ধা হইয়া পড়ে। দর্পণে লোকে যেমন আপন আপন মুখ দেখিয়া থাকে, সেইরূপ এই প্রস্ফুট ও উজ্জ্বল রস-চিত্রের মধ্যে বিশ্বজন আপন আপন অন্তরের অদৃষ্টপূর্ব্ব রসের রূপের ও স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, বিস্মিত, পুলকিত, মুগ্ধ ও তৃপ্ত হইয়া উঠে। এই লক্ষণাক্রান্ত রস-পটই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এইরূপ কাব্যসৃষ্টিই রসবিচারে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হয়। শোকচিত্রের মধ্যে, এই গুণেই, অক্ষয়কুমারের 'এষা'খানি অসাধারণ উৎকর্ষ *লাভ করিয়াছে।*

'এষার' প্রথম ও প্রধান গুণ—ইহার অসাধারণ বস্তুতন্ত্রতা। কবি আপনার জীবনের বাহিরের ও ভিতরের অতি ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত অভিজ্ঞতার উপরে এই কবিতাগুলি গড়িয়া তুলিয়াছেন। যে যেমন দেখে, সে তেমনি আঁকে। চিত্রের অস্পষ্টতা চিত্রকরের দৃষ্টির অক্ষমতাই প্রমাণ করে। 'এষার' চিত্রগুলিতে কোথাও এরূপ অস্পষ্টতা দেখিতে পাই না। ইহার মধ্যে কোথাও কিছুই দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য নাই। অক্ষয়কুমার সুকুমার গোধূলিলগ্নে তাঁহার কবিতাসুন্দরীর অবগুণ্ঠনখানি ঈষদপসৃত করিয়া, সেই আলো-আঁধারের ইন্দ্রজাল-প্রভাবের মধ্যে, তাহার অপ্রাকৃত মাধুর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন না। তিনি কাব্যই সৃষ্টি করেন, সুললিত শব্দ যোজনা করিয়া, ইন্দ্রসভার অনিন্দ্য সঙ্গীতের ঝঙ্কার তুলিয়া, কবিতার নামে কেবল মোহিনী হেঁয়ালি রচনা করেন না। এই বিষয়ে অক্ষয়কুমার আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের আদর্শের অনুকরণ করেন নাই, প্রাচীন কবিকুলশিরোমণিদিগেরই পদাঙ্কানুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম কি ভারতচন্দ্র, ইঁহাদের কেহই কাব্যের ছল করিয়া হেঁয়ালি গড়েন নাই। সুনিপুণ সঙ্গীতজ্ঞের মতন, কেবল শব্দহীন রাগরাগিণীর আলাপও করেন নাই। হেঁয়ালি জিনিষটা হেয় নহে; উৎকৃষ্ট, সুনিপুণ হেঁয়ালি সাহিত্যভাণ্ডারের রত্নবিশেষ সন্দেহ নাই। রাগিণীর অনর্থক আলাপও নিষ্ফল হয়

না। কিন্তু সে সকল কবিতা নহে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি সার্থক অথচ সহজবোধ্য, সুললিত অথচ গভীরভাবদ্যোতক শব্দ যোজনা করিয়া গভীর রসের ছবি সকল রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কবিতাগুলি পড়িলেই বোঝা যায়, তাহাতে অস্পষ্ট বা দুর্ব্বোধ্য কিছুই নাই। আর বৈষ্ণব-কবিগণের রসানুভূতি সত্য ও গভীর ছিল বলিয়া, তাঁহাদের এই সকল অনুপম রসচিত্রও এমন অদ্ভুতভাবে এতটা উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমন সকল আন্তরিক রসানুভূতি আছে, সত্য, যাহাকে কোনও ভাষায় ভাল করিয়া প্রকাশ করা যায় না। সে সকলকে কেবল ঠারে-ঠোরে ব্যক্ত করিতে হয়। বৈষ্ণব-কবিগণ এ সকল গভীরতম রসের রূপও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু তাহা কেমন সরল ও সুষ্ঠু, কেমন সুন্দর অথচ রসিকজনের নিকটে কেমন সহজবোধ্য হইয়া আছে! শরীরের যেমন একটা যৌবন আছে, প্রাণেরও সেইরূপ একটা যৌবন আছে। এই প্রাণের যৌবন অতিশয় অন্তরঙ্গ বস্তু; ভাষার এমন শক্তি নাই যে, সে যৌবনের চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে পারে। অথচ চণ্ডীদাস এক কথায় কেমন সুন্দর ও সহজ ভাবে সে বস্তুটাকে প্রকাশ করিয়াছেন :—

"তব্ যৌবন যব্ সুপুরুখ সঙ্গ।"

অথবা অতৃপ্ত, জ্বলন্ত রূপ-লালসার এমন চিত্রই বা আর কোথায় দেখিতে পাই ?—

কি পেখলু ব্রজরাজকুলনন্দন
রূপে হরল পরাণ।
নিরমিয়া রসনিধি, আমারে না দিল বিধি
প্রতি অঙ্গে অধিক নয়ান।

অথবা অন্যত্র শ্যামরূপ-দর্শন-মুগ্ধা শ্রীরাধিকা পাগল-পারা হইয়া ইচ্ছা করিতেছেন—এ ভুবনমোহনরূপ—

এমতি করিয়া যদি, বিধাতা গড়িত গো
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাই।

এইরূপে বাংলার বৈষ্ণব কবিগণ গভীরতম রসানুভূতিকে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যাহা কথায় বলা যায় না—যে গভীর অভিজ্ঞতার প্রকাশে "বুদ্ধি-বচন হারে"—তাহাকেও সহজভাবেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, কোথাও কুহেলিকার সৃষ্টি করিয়া আপনাদের রসচিত্রগুলিকে দুর্ব্বোধ্য করিয়া রাখেন নাই। তাঁহাদের অন্তরের অনুভূতিগুলি অতিশয় গভীর ও সুস্পষ্ট ছিল বলিয়া, সে সকল অনুভূতি যতই গভীর ও অবাঙ্‌মনসগোচর হউক না কেন, তাহার অভিব্যক্তি কখনই অস্পষ্ট বা কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে নাই।

অক্ষয় বাবুর কবিতায় বৈষ্ণবকবিদিগের গভীর রসানুভূতি আছে, এমন কথা বলি না। বৈষ্ণবকবিগণ যে গভীর, নিদারুণ বিরহের চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুরূপ কোনও কিছু জগতের আর কোনও সাহিত্যে আছে বলিয়া শুনি নাই। সুরার সঙ্গে যেমন জলের তুলনা হয় না, বৈষ্ণব কবিগণের বিরহ-চিত্রের সঙ্গে অক্ষয়বাবুর এই শোকগাথারও সেইরূপ কোনই তুলনা হয় না। অক্ষয়কুমারের বিরহ কেবল বিরহ; ইহার মধ্যে নিগূঢ়তম মিলনের অনুপম আনন্দটুকু লুকাইয়া নাই। বিরহের দশ-দশার সন্ধান অক্ষয়কুমার এখনও পান নাই; তাহার তন্ময়ভাব এখনও আস্বাদন করেন নাই। অক্ষয়কুমারের কাব্যে বৈষ্ণব-কবিতার

নিগূঢ় রসানুভূতি ফুটিয়াছে, তাই এমন কথা বলি না। এ'কালে সে বস্তু ফুটিতে পারে না। আবার যদি সে সহজ সাধনা ও সহজ প্রেম কখন জাগিয়া উঠে, তবে হয় ত কখনও পুনরায় বাংলা-সাহিত্যে বৈষ্ণবকবিকুল-গুরুদিগের শূন্য আসন কোনও ভাগ্যবান্ সাধক-কবি-শিরোমণির দ্বারা পূর্ণ হইতেও বা পারে। কিন্তু বৈষ্ণবকবিদিগের রসানুভূতি ও সাধনসম্পদ্ লাভ না করিয়াও, আপনার অধিকারে, অক্ষয়কুমারের কাব্য-সৃষ্টি, সত্যে ও সারল্যে, প্রাচীন কবিকুল-গুরুদিগের কাব্য-সৃষ্টি অপেক্ষা বড় বেশী হীন হইয়া আছে বলিয়া মনে হয় না। বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের নিজেদের সময়ের ও নিজেদের সমাজের বিশিষ্ট সাধনার নিগূঢ়তম ও সার্ব্বজনীন তত্ত্ব এবং ভাবগুলিকে আপনাদের কবিতাতে গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। অক্ষয়কুমারও তাঁর কাব্যে আমাদের সমসাময়িক বিশিষ্ট সাধনার নিগূঢ় ও সার্ব্বজনীন সমস্যা ও ভাবগুলিকে অতি বিশদ করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাই তাঁর কাব্যসৃষ্টির বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মৃত্যুকে যে চক্ষে দেখিতেন, আমরা ঠিক সে চক্ষে দেখিতে পারি না। একদিকে তাঁদের অন্তরে পরলোক-সম্বন্ধিনী একটা কোমল শ্রদ্ধা ছিল, অন্যদিকে একান্তভাবে বিষয়ভোগে লিপ্ত হইয়াও, তাঁহাদের চরিত্রের ভিতরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডের যম-নিয়মাদির সাধনে, একটা অদ্ভুত যৌগশক্তি প্রায়ই লুকাইয়া থাকিত। এইজন্য অনেক সময় তাঁহারা নিতান্ত নির্ভীকভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পারিতেন, প্রিয়জনকেও ধীর-স্থির-চিত্তে মৃত্যুর হস্তে অর্পণ করিতেন। আমরা হিন্দুর গঙ্গাযাত্রা-অনুষ্ঠানটাকে, একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম রীতি বলিয়া মনে করিয়া থাকি। শবদাহ-প্রথাটাকেও যে সর্ব্বদা ভাল মনে করি, এমনও বলা যায় না। কিন্তু মুমূর্ষু প্রিয়জনকে যারা গঙ্গাতীরস্থ করিয়া, গঙ্গাস্রোতে আকণ্ঠ ডুবাইয়া, সেই স্রোত-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জীবনপ্রবাহকে নিঃশেষ মিশাইয়া দিতে পারিত; আর যারা মৃত প্রিয়জনের দেহে স্বহস্তে অগ্নিসংযোগ করিয়া, ভস্মসাৎ হইতে দেখিতে পারে, তারা মৃত্যুটাকে কত যে অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়,—এ কথাটা তলাইয়াও দেখি না। শোক করিও না—এ উপদেশ সকল ধর্ম্মেই আছে। শোকে ভগবানের মঙ্গলবিধানের মুখ চাহিয়া, তাহাতেই আত্মসমর্পণ করিয়া, সান্ত্বনালাভ করিবে—এ কথাও সকল উন্নত ধর্ম্মেই বলে। The Lord gave, the Lord hath taken away, Blessed be the name of the Lord!—খৃষ্টীয়ান-সাধনা এইভাবেই শোকার্ত্তের সান্ত্বনা দান করে। কিন্তু হিন্দু কেবল ভগবানের মঙ্গলবিধানের দিকে চাহিয়াই, বৃথা শোক করিবে না, এ কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। মৃতব্যক্তির কল্যাণের মুখ চাহিয়া,—যাকে এতই ভাল-বাস, তার সুখশান্তির জন্য শোক হইতে বিরত হও,—কেবল হিন্দুই এ কথা বলেন। ইহ-লোকে তোমাদের অশ্রুজল ও আর্ত্তনাদ যেমন তাহাকে তোমাদের কাছে টানিয়া আনিত, মৃত্যুর পরেও সেইরূপ, সেই মায়ামমতার

বন্ধনই তাঁর প্রেতাত্মাকে এই নিরীন্দ্রিয় অবস্থায় এই ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য জগতে টানিয়া রাখে। এ উপদেশ আর কোনও ধর্ম্মে শুনি নাই। এই সকল কারণে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মৃত্যুকে যে ভাবে দেখিতেন, তাঁদের সে শ্রদ্ধা হারাইয়া ও যে সকল আচার-ব্যবহার ও রাজনীতির ভিতর দিয়া তাঁদের ইহজীবনটা গড়িয়া উঠিত, সেই সকল আচার-ব্যবহার ও রাজনীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া,—আর সে ভাবে আমরা মৃত্যুকে দেখিতে পারি না। তাঁদের শ্রদ্ধা কোমল ছিল, সহজ ছিল, গতানুগতিককে আশ্রয় করিয়াই সে শ্রদ্ধা বাঁচিয়া থাকিত। তাঁরা বিনা বিচারে, বিনা যুক্তিতর্ক করিয়াই, প্রচলিত মতামতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া জীবন-যাপন করিতেন। আমরা তাঁদের সে কোমল শ্রদ্ধা হারাইয়াছি; অথচ শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা প্রচলিত বিশ্বাসকে সংশোধিত ও সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া, শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধারও অধিকারী হই নাই। আমাদের চিত্ত সংশয়প্রবণ। আমাদের অধ্যাত্মবুদ্ধি অত্যন্ত ক্ষীণ। তত্ত্বদৃষ্টি নাই বলিলেও চলে। অন্যদিকে আমরা যে কেবলই প্রত্যক্ষবাদী ও নিতান্তই জড়বুদ্ধি এবং ইহসর্ব্বস্ব, এমনও নহে। ইন্দ্রিয়ভোগেও আমরা একান্ত তৃপ্ত নহি। শুদ্ধ পশুবৃত্তিতেও আমাদের মন উঠে না। কেবল ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগেতে হৃদয়ের যে নিষ্মমতা ও কাঠিন্য জন্মে, আমাদের তাহাও জন্মে না। এ আসুরী সম্পদও আমরা লাভ করি না। কলাবিদ্যার অনুশীলনে, ললিতকলার উৎকর্ষ-সাধনে, আমাদের মধ্যে একান্ত ইন্দ্রিয়সুখ-লালসার ভিতরেও একটা অতীন্দ্রিয়ানুভূতি অল্পে অল্পে জাগিয়া উঠিয়াছে। আধুনিক সামাজিক জীবনের ঔদার্য্যে ও বিশ্বপ্রেমের প্রেরণায়, আমাদের হৃদয় একটা অভূতপূর্ব্ব কোমলতা লাভ করিয়াছে। জীবনের পরিসর-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের সুখদুঃখানুভূতির শক্তিটাও বাড়িয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে জীবন-মৃত্যুর সমস্যাটা আমাদের নিকটে নিতান্তই জটিল হইয়া পড়িয়াছে। আমাদিগের কলারস-সংস্পৃষ্ট বিষয়প্রবণ কোমল চিত্তকে মৃত্যু যেরূপভাবে অভিভূত করে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের চিত্তকে সেরূপ অভিভূত করিতে পারিত না। প্রাচীনেরা আবার আমাদের অপেক্ষা অশেষগুণে সমধিক শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন। বীর্য্যবান্ লোকের কষ্টসহিষ্ণুতা, হীনবীর্য্য বা নির্ব্বীর্য্য লোকের অপেক্ষা অশেষগুণে বেশী। কষ্টসহিষ্ণুতা তিতিক্ষার একটা মুখ্য অঙ্গ ও উপাদান; আর মৃত্যুর আঘাতও তিতিক্ষু লোককে একেবারে বিচলিত বা বিভ্রান্ত করিয়া তুলিতে পারে না। আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের এই সকল অনায়াস-লব্ধ সাধনসম্পদ্‌ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া, জীবন-মৃত্যুর সমস্যাটা আমাদের নিকটে এক নূতন ভাবে, নূতন অর্থে, নূতন শক্তিতে উপস্থিত হইতেছে। আমরা সহজে পরলোকে বিশ্বাস করিতে পারি না, আবার বিশ্বাস না করিয়াও থাকিতে পারি না। আমাদের বুদ্ধি একপ্রকারের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু আমাদের প্রাণ সে সিদ্ধান্তকে ধরিয়া সান্ত্বনা পায় না বলিয়া, তাহার বিরোধী বিশ্বাসকেও আলিঙ্গন করিতে ব্যগ্র হয়। এই দু'টানায় পড়িয়া, আমরা কখনও একদিকে,

কখনও বা অন্যদিকে ঝুঁকিয়া পড়ি। ইহাই আধুনিক সাধনার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা। বর্ত্তমান যুগের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মন্তুদ ট্রেজেডি (tragedy)। অক্ষয়বাবু তাঁর 'এষা'তে এই ট্রেজেডিটাকেই অতি সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

আধুনিক সাহিত্যে লর্ড টেনিসন্ তাঁর 'ইন্ মেমোরিয়ামে'ও (In Memorium) এই আধুনিক ট্রেজেডির চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। এই আধুনিক সাধনার এই বিশ্বসমস্যাটাকে আশ্রয় করিয়াই, টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়াম্'—বিশ্বসাহিত্যে এতটা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। অক্ষয়কুমারের 'এষা'খানি ও টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়াম' একই শ্রেণীর কাব্যসৃষ্টি। অক্ষয়কুমার টেনিসন্ জানেন, ভাল করিয়াই পড়িয়াছেন তাঁর কবিকল্পনায় কোনও কোনও রস, এমন কি তার অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত, এই আধুনিক ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী কবি একেবারে আত্মসাৎ করিয়াছেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। এইজন্য 'এষা'তে কোথাও কোথাও 'ইন্ মেমোরিয়ামে'র ছায়া পড়িয়াছে, এমনও বা মনে হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও 'এষা'খানি অক্ষয়কুমারের, টেনিসনের নহে। ইহার পংক্তিতে পংক্তিতে বাঙালী কবির প্রাণের ছাপ, হিন্দু কবির যুগযুগান্তবাহী বিচিত্র জাতীয় সাধনার সহিমোহর অঙ্কিত হইয়া আছে। আমরা ইংরেজি শিখিয়া টেনিসন না কি বহুবার পড়িয়াছি। টেনিসনের কতকগুলি কথা আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে প্রবাদবাক্যের মতন প্রচলিত হইয়াছে। ইংরেজি পড়িতে ও লিখিতে, শুনিতে ও বলিতে, এই সকল ভাব ও ভাষা আমাদের চিন্তার সঙ্গে একেবারে জড়াইয়া গিয়াছে তাই টেনিসনের সঙ্গে সামান্য বাঙালী কবির নাম করিতে আমাদের শঙ্কা হয়। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে, 'এষা'তে টেনিসনের অনুকরণের চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয় না। টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়ামে'র এখন যেটা সর্ব্বপ্রথম কবিতা, তাহাই বস্তুতঃ তার শেষ কবিতা। ইহার সঙ্গে 'এষা'র শেষ কবিতাটীর তুলনা করিয়া দেখিলেই, অক্ষয়কুমার টেনিসনের নিকটে কতটা ঋণী, আর কতটাই বা এ কবিতাগুলি তাঁর কবিপ্রতিভার মৌলিক-সৃষ্টি, ইহা পরিষ্কাররূপে ধরিতে পারা যায়। টেনিসনের প্রথম কবিতাটী এই :—

Strong Son of God, immortal Love,
Whom we, that have not seen thy face,
By faith, and faith alone, embrace,
Believing where we cannot prove ;

Thine are these orbs of light and shade ;
Thou madest Life in man and brute ;
Thou madest Death ; and lo, thy foot
Is on the skull which thou hast made.

Thou wilt not leave us in the dust :
Thou madest man, he knows not why,
He thinks he was not made to die ;
And thou hast made him : thou art just.

Thou seemest human and divine,
Thou highest, holiest manhood, thou ;
Our wills are ours we know not how ;
Our wills are ours, to make them thine.

Our little systems have their day ;
They have their day and cease to be :
They are but broken lights of thee,
And thou O Lord, art more than they.

We have but faith : we cannot know ;
For knowledge is of things we see ;
And yet we trust it comes from thee,
A beam in darkness : let it grow.

Let knowledge grow from more to more,
But more of reverence in us dwell ;
That mind and soul, according well,
May make one music as before

But vaster. We are fools and slight :
We mock thee when we do not fear :
But help thy foolish ones to bear ;
Help thy vain worlds to bear thy light.

Forgive what seem'd my sin in me ;
What seem'd my worth since I began ;
For merit lives from man to man,
And not from man, O Lord, to thee.

Forgive my grief for one removed,
Thy creature, whom I found so fair.
I trust he lives in thee and there
I find him worthier to be loved.

Forgive these wild and wandering cries,
Confusions of a wasted youth ;
Forgive them where they fail in truth,
And in thy wisdom make me wise.

অক্ষয়কুমারের 'এষা'র শেষ কবিতাটী এই :—

হা প্রিয়া—শ্মশান-দগ্ধা, হও পরকাশ !
ত্যজিয়াছ মর্ত্তভূমি,
তবু আছ—আছ তুমি !
তুমি নাই—কোথা নাই, হয় না বিশ্বাস।
এত রূপ গুণ ভক্তি,
এত প্রীতি অনুরক্তি—
সৃজনে যে পূর্ণতার নাহিক বিনাশ !
নয়—এ মরণ নয়, দু'দিন বিরহ !
আলোকে সু-বর্ণ ফুটে,
আঁধারে সুগন্ধ ছুটে ;
মিলনে নিঃশঙ্ক প্রেম—যত্ন অনাগ্রহ।
বিরহে ব্যাকুল প্রাণ—
সেই জপ তপঃ ধ্যান,
সেই বিনা নাহি আন, সে-ই অহরহ।
প্রতি কর্ম্মে—প্রতি ধর্ম্মে—উঠেছিলে সতী,
উচ্চ হ'তে উচ্চস্তরে !
নিম্ন হ'তে নিম্নস্তরে
নামিতেছিলাম আমি অতি দ্রুতগতি।
ক্রমে বাড়ে ব্যবধান,
তাই হ'লে অন্তর্দ্ধান—
তোমারে স্মরিয়া যাহে হই শুদ্ধমতি !
হে দেব, মঙ্গলময়, মঙ্গল-নিদান !
তোমারে হেরিনি, প্রভু,
বিশ্বাস করি হে তবু,—
সর্ব্বজীবে সর্ব্বকালে দাও পদে স্থান।

তোমারি এ বিশ্ব-সৃষ্টি,
আলো—অন্ধকার—বৃষ্টি,
জন্ম-মৃত্যু রোগ-শোক তোমারি প্রদান !
ভাঙ্গিতে গড়নি প্রেম, ওহে প্রেমময় !
মরণে নহি ত ভিন্ন,
প্রেম-সূত্র নহে ছিন্ন—
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বেঁধে দেছ সম্বন্ধ অক্ষয় !
শোকে ধূ ধূ হৃদি-মরু
আছে তার কল্পতরু !
নেত্র-নীরে ইন্দ্রধনু হইবে উদয় !
তুমি নিত্য সত্য শুদ্ধ তোমারি ধরণী ;
তোমারি ত ক্ষুদ্রকণা
আমরা এ প্রতিজনা,
শোকে দুঃখে ভ্রমে কেন পরমাদ গণি ?
ব্যাপি' সর্ব্ব কাল-স্থান
তব প্রভা দীপ্যমান,
ব্যোমে ব্যোমে কম্পমান তব কণ্ঠধ্বনি !
দুরন্ত বাসনাবর্ত্তে সতত ঘূর্ণন,
নিরন্তর আত্মপূজা,
তোমারে যায় না বুঝা—
সৌভাগ্যে বিস্মৃতি বাঙ্গ, দুর্ভাগ্যে দূষণ।
মলিন চঞ্চল মনে
যদি প্রভা পড়ে ক্ষণে,
বুঝিতে দেয় না—তুমি কত যে আপন !
অনাদি অনন্ত তুমি অসীম অপার।
আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধরি'
কত ভাঙ্গি—কত গড়ি,
করি কত সত্য-মিথ্যা নিত্য আবিষ্কার !
নিজ সুখ দুঃখ দিয়া,
তোমারে গড়িয়া নিয়া,
বসি তব ভালমন্দ করিতে বিচার !

মজিয়া আপন জ্ঞানে আপনা বাখানি।
রোগে শোকে ভাবি ডরে
জন্মি নাই মৃত্যু তরে—
যদিও এ জন্ম-মৃত্যু কেন নাহি জানি!
জানি—মনঃ প্রাণ দেহ
নহে আপনার কেহ—
তোমারে তোমারি দান দিতে অভিমানী!
দাও প্রেম—আরো প্রেম, চির-প্রেমময়!
আরো জ্ঞান, আরো ভক্তি,
আরো আত্মজয়-শক্তি—
তোমার ইচ্ছায় কর মোর ইচ্ছা লয়!
জীবন-মরণ-পানে
ব'হে যাক্ সুরে গানে,
হোক্ প্রেমামৃত-পানে অমর হৃদয়!
ক্ষম' এ ক্রন্দন-গীতি—শোক-অবসাদ!
সে ছিল তোমারি ছায়া—
তোমারি প্রেমের মায়া!
তার স্মৃতি আনে আজ তোমারি আস্বাদ!
এখনো সে যুক্তকরে
মাগিছে আমার তরে—
তোমার করুণা-স্নেহ শুভ-আশীর্ব্বাদ।

এই দুইটী কবিতাই একরূপ একই বিষয়ে, একই উপলক্ষে রচিত। দুইটীতেই মানব-প্রাণের একটা গভীর প্রার্থনা, মানবমনের একটা গভীর সমস্যা, মানবহৃদয়ের কতকগুলি গভীর ও জটিল রসকে অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। টেনিসনের কবিতাটী পূর্ব্বে রচিত, অক্ষয়বাবুরটী পরের লেখা। অক্ষয়বাবুর কবিতার দু'একটি স্থানে মনে হয় যেন টেনিসনের একটু ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে।

হে দেব, মঙ্গলময়, মঙ্গল-নিদান!
তোমারে হেরিনি, প্রভু,
বিশ্বাস করি হে তবু—
সর্ব্বজীবে, সর্ব্বকালে দাও পদে স্থান।

তোমারি এ বিশ্বসৃষ্টি,
আলো—অন্ধকার—দৃষ্টি,
জন্ম-মৃত্যু রোগ-শোক তোমারি প্রদান।

এখানে কেহ বা এমন মনেও করিতে পারেন যে, টেনিসনের—

Strong son of God, immortal love,
Whom we, that have not seen thy face,
By faith, and faith alone, embrace,
Believing where we cannot prove;
Thine are these orbs of light and shade:
Thou madest life in man and brute;
Thou madest Death: and lo, thy foot
Is on the skull which thou hast made.

এই কবিতাংশের একটু ছায়া পড়িয়াছে। আবার—

তোমারি ত ক্ষুদ্রকণা
আমরা এ প্রতি জনা—

এখানে টেনিসনের

They are but broken lights of thee,

এই উক্তির গন্ধ পাওয়া যায়। আর—

দাও প্রেম—আরো প্রেম, চিরপ্রেমময়!
আরো জ্ঞান, আরো ভক্তি,
আরো আত্মজয়-শক্তি—
তোমার ইচ্ছায় কর মোর ইচ্ছা লয়!
জীবন-মরণ-পানে
বহে যাক্ সুরে গানে,
হোক্ প্রেমামৃত-পানে অমর হৃদয়!

এখানে টেনিসনের—

Let knowledge grow from more to more,
But more of reverence in us dwell;
That mind and soul, according well
May make one music as before
But vaster.

এই পঙক্তির একটু-আভাষ যেন পাওয়া যায়। এবং সর্ব্বশেষে—

Forgive my grief for one removed,
Thy creature, whom I found so fair.
I trust he lives in thee, and there
I find him worthier to be loved.

এই ভাবটা যেন অক্ষয় বাবুর—

ক্ষম' এ ক্রন্দনগীতি—শোক-অবসাদ !
সে ছিল তোমারি ছায়া—
তোমারি প্রেমের মায়া !

এই পদগুলিতে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই সকল ভাবের আংশিক ঐক্য, দু'এক স্থলে, এমন কি, কোনও কোনও শব্দের অনুবাদ সত্বেও, কিছুতেই অক্ষয়কুমারের এই কবিতাটীকে টেনিসনের অনুকরণ বলা যায় না। অক্ষয়কুমার হিন্দুর ভাষায়, হিন্দুর ভাবে, হিন্দুর তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া, তাঁর এই কবিতাটী লিখিয়াছেন। টেনিসন সেইরূপ খৃষ্টীয়ানী ভাষায়, খৃষ্টীয়ানী ভাবে, খৃষ্টীয়ানী তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া তাঁর কবিতা গড়িয়াছেন। টেনিসনের কবিতাটী যতই সুন্দর ও সুমিষ্ট হউক না কেন, অক্ষয়কুমারের কবিতার তুলনায় অত্যন্ত লঘু—হাল্‌কা।

দুরন্ত বাসনাবর্ত্তে সতত ঘূর্ণন,
নিরন্তর আত্মপূজা,
তোমারে যায় না বুঝা—
সৌভাগ্যে বিস্মৃতি ব্যঙ্গ, দুর্ভাগ্যে দূষণ।
মলিন চঞ্চল মনে
যদি প্রভা পড়ে ক্ষণে,
বুঝিতে দেয় না—তুমি কত যে আপন !
অনাদি অনন্ত তুমি অসীম অপার !
আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধরি'
কত ভাঙ্গি—কত গড়ি,
করি কত সত্যমিথ্যা নিত্য-আবিষ্কার।
নিজ সুখ দুঃখ দিয়া,
তোমারে গড়িয়া নিয়া,
বসি তব ভালমন্দ করিতে বিচার !

অক্ষয়কুমারের এই পদ দুইটীর সঙ্গে টেনিসনের—

Forgive these wild and wandering cries,
Confusions of a wasted youth;

Forgive them, where they fail in truth,
And in thy wisdom make me wise.

এই পদের কোনই তুলনা হয় না। আর—

তার স্মৃতি সনে আজ তোমারি আস্বাদ!

টেনিসন কোথাও এই গভীর যোগের সন্ধান পান নাই। ইহার কাছে

I find him worthier to be loved—

নিতান্তই ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে হয়। আর এই দুইখানি কাব্যের শেষের এই দুই আত্মনিবেদনে যে বৈষম্য, যে পার্থক্য, যে উৎকর্ষাপকর্ষ লক্ষিত হয়, "এষা" এবং "In Memorium"তেও প্রায় আদ্যোপান্তই তাহা লক্ষ্য করিতে পারা যায়। অক্ষয়কুমারের কবিপ্রতিভা সর্ব্ব বিষয়ে টেনিসনের কবিপ্রতিভার সমকক্ষ, এত বড় কথাটা বলিতে চাহি না। সে বিচারেও আজ প্রবৃত্ত হই নাই। কিন্তু একটু ধীরভাবে সর্ব্ব প্রকারের পূর্ব্বসংস্কার ও পক্ষপাতিত্ব-শূন্য হইয়া বিচার করিলে, বাংলা ভাষার এই সামান্য "এষা"খানি ইংরেজি "In Memorium" অপেক্ষা মূল বিষয়ের আলোচনায় ও মূল রসের অভিব্যক্তিতে যে কোনও অংশে হীন নহে, বরং অনেক বিষয়েই গভীরতর ও শ্রেষ্ঠতর, এ কথা কতকটা নিঃসঙ্কোচেই বলিতে পারি। কথাটা প্রতিপন্ন করিতে হইলে যেমন টেনিসনের ও অক্ষয়কুমারের কাব্যের শেষ কবিতাটি পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করিলাম, সেইরূপই প্রত্যেক কবিতাটীর তুলনায় সমালোচনা করিতে হয়। সে বিচার বিস্তর সময়সাপেক্ষ। কোনও দিন সে চেষ্টা করিতেও বা পারি। In Memorium বহু বহু বার পড়িয়াছি; তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছি; শোকার্ত্ত হৃদয়ে, মৃত্যুর অন্ধকারে বসিয়া দিবানিশি পড়িয়াছি। কিন্তু তাহাতে জীবন-মৃত্যুর সমস্যাটীকে যে এষার মতন এমন তন্ন তন্ন করিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছে, এমনটা কখনও অনুভব করি নাই। টেনিসনের ইন্ মেমোরিয়ামে অতি সুন্দর, অতি প্রাণোন্মাদক, অতি মধুর কথা অনেক আছে। কিন্তু ভাবের ঐক্য, রসের সঙ্গতি, রচনার ঘননিবিষ্টতা বড় বেশী নাই। কবি বহুদিন ধরিয়া ঐ কাব্যখানি লিখিয়াছিলেন। বিবিধ বিষয়কর্ম্মের বিক্ষেপের মাঝখানে, এক একবার ছুটিয়া গিয়া এক একটী অংশ রচনা করিয়াছেন। যোগস্থ হইয়া, একৈকরসানুভূতিতে বিভোর হইয়া, লেখেন নাই। সুতরাং তাঁহার এই কাব্যে অনেক অবান্তর কথা আছে। একটা রসের অভিব্যক্তি, স্তরে স্তরে একটা ভাব মানুষের মনে কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠে, শোকার্ত্তের চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা কিরূপ, আর বিরহরসটারই বা প্রকৃতি কি, ইহা একেবারেই ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে অক্ষয়কুমারের "এষা" টেনিসনের "In Memorium অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। "In Memoriumএর বুনুনী আলগা, 'এষা'র বুনুনী ঠাসা। তারপর শোক-

গাথার মূল লক্ষ্যই করুণরসের অভিব্যক্তি। টেনিসনের কাব্যে সে গভীর কারুণ্য কোথায়? অক্ষয়কুমারের এই কাব্যখানির প্রতিছত্রে নিদারুণ, মর্ম্মস্পর্শী কারুণ্য-অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

দুর্ভাগ্যের কাহিনী

(উপন্যাস)

(৬)

প্রচণ্ড ধাক্কায় দরজা 'হাট' হইয়া খুলিয়া গেল —দরজার সম্মুখে ভীষণ দর্শন এক মনুষ্যমূর্ত্তি! পাঠক, এ মূর্ত্তির সহিত পূর্ব্বেই আমাদের পরিচয় হইয়াছে।

জীন কক্ষমধ্যে দু' এক পদ অগ্রসর হইয়াই থামিয়া গেল। তাহার পৃষ্ঠের থলি, হস্তের গাইটযুক্ত যষ্টি, এবং তীব্র কঠোর দৃষ্টি—প্রেত-ছবির ন্যায়ই ভীষণ। ম্যাগ্‌লোয়ারের চীৎকার করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত লোপ পাইল; সে শুধু ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ব্যাপ্টিস্তাইন প্রথমতঃ তাহাকে দেখিয়া ভয়ে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছিলেন, তার পর ভ্রাতার দিকে দৃষ্টি পড়িতে, পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইলেন। মিরিয়েল শান্ত-দৃষ্টিতে আগন্তুকের প্রতি চাহিয়া ছিলেন।

জীন, মিরিয়েলকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই উচ্চকণ্ঠে ঝড়ের মত বলিয়া চলিল—

"শুনুন আমার নাম জীন ভ্যাল্‌জিন। আমি একজন দাগী আসামী, ১৯ বৎসর গ্যালিতে কাটিয়েছি। চার দিন আগে তুলঁ থেকে কারামুক্তি পেয়ে পঁয়তারলিয়ায়ের দিকে বরাবর হাঁটা পথে চ'লে আস্‌ছি। আজও আঠারো ক্রোশ পথ হেঁটেছি। সন্ধ্যার সময় এ সহরে এসে পৌঁছেছি—এ পর্য্যন্ত যে হোটেলে বা বাড়ীতে গিয়েছি সবাই আমার হ'ল্‌দে ছাড়পত্র দেখে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে। জেলখানায় গেলাম—তারাও ঠাঁই দিলে না। মাঠে গেলাম—আকাশ জুড়ে মেঘ উঠ্‌ল, তারা নিভে গেল, ভাব্‌লাম—বৃষ্টি হয় ত কোথায় দাঁড়াব! ভগবান্ নেই, বৃষ্টি থামাবেই বা কে? কাজেই ফিরে এসে বাগানের সাম্‌নে পাথরের বেঞ্চে শুয়ে ছিলাম;—এক বৃদ্ধা এই বাড়ী দেখিয়ে দিলে। এটা কি রকম বাড়ী? সরাইখানা কি? ভয় নেই, আমার পয়সা আছে। উনিশ বছর ধ'রে কয়েদ খেটে আমি ১০৯ ফ্র্যাঙ্ক ১৫ স্যুস জমিয়েছি। ক্ষুধায় আর চল্‌তে পারিনে। আপনাদের এখানে জায়গা হবে?"

"ম্যাগ্‌লোয়ার, আর একখানা থালা আন।"

লোকটা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া মিরিয়েলের কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"করেন কি?—শুনুন, শুনুন—বুঝেছেন আমি কে?—আমি কি? আমি গ্যালির কয়েদী, সবে মাত্র ছাড়া পেয়েছি। এই দেখুন—"

বলিয়া সে কোর্ত্তার জেব হইতে একখানা ছাড়পত্র বাহির করিয়া বলিল—"এই দেখুন, এতে কি লিখ্‌ছে।—'জীন ভ্যাল্‌জীন, সাং—, ১৯ বৎসর ধরিয়া গ্যালির কয়েদী। পাঁচ বৎসর ডাকাতির জন্য, এবং চারিবার পলায়ন-চেষ্টার অপরাধে বাকী চৌদ্দ বৎসর। লোকটার প্রকৃতি বড় ভয়ঙ্কর।' এ দেখেও আপনারা আমাকে খেতে দেবেন?—শোবার জায়গা দেবেন? এটা কি একটা সরাই?—আপনাদের ঘোঁড়শাল আছে ত?"

"ম্যাগ্‌লোয়ার, কোণের ঘরের বিছানায় একটা ফরসা চাদর পেতে দিয়ো।"—তার পর আগন্তুকের দিকে ফিরিয়া মিরিয়েল বলিলেন—"আসুন মশায়, এই আগুনের দিক্‌টায় এগিয়ে এসে বসুন। খাবার হ'ল বলে; খেতে খেতে আপনার বিছানাও হ'য়ে যাবে এখন।"

লোকটা যেন ধাঁধাঁর মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল—কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। এ ব্যবহার তাহার পক্ষে অপ্রত্যাশিত, অপূর্ব্ব! তাহার ভীষণ-কঠোর সে মুখের উপর একে একে বিস্ময়, সন্দেহ এবং আনন্দের রেখা ফুটিয়া উঠিল! সে ছবি—নানাভাবসংঘাতের সে অপূর্ব্ব মিশ্রণ—বাস্তবিকই দেখিবার জিনিষ! লোকটা উন্মাদের ন্যায় অসংবদ্ধ ভাষায় বলিতে লাগিল—"সত্যি? মিথ্যা নয়? 'দূর হ, কুকুর' ব'লে আর সবারই মত আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না? আমি জান্‌তাম—আমাকে দূর ক'রে দেবেন, তাই আগে থেকেই পরিচয়টা দিয়েছিলাম। আমায় খেতে দেবেন?—গদি-চাদর-ওয়ালা বিছানায় শুতে দেবেন?—বিছানা! হায়, উনিশ বছর ধ'রে বিছানায় আর শুইনি। আপনার নাম? আপনি যা চান, তাই দেবো। আপনি খুব ভাল লোক। আপনারই এ সরাই বুঝি?"

"আমি একজন ধর্ম্মযাজক। এই বাড়ীতে বাস ক'রে থাকি।"

"ধর্ম্মযাজক!—ওঃ, তা হ'লে আর আমাকে টাকাকড়ি কিছু দিতে হবে না, কেমন? আপনি ঐ বড় গির্জ্জাটার পাদরী বুঝি? কি বোকা! এতক্ষণ আপনার টুপির দিকে চাই-ই নি—" বলিয়া, যষ্টি ও থলিটা সে মেঝের উপর নামাইয়া রাখিল। "আপনার খুব দয়া! কই আমাকে ত ঘৃণা কর্‌লেন না—তা হ'লে আমার কাছ থেকে আপনি টাকা চান না, কেমন?"

"না, টাকা আপনি রেখে দিন্। কতদিনে আপনি টাকা ক'টি উপার্জ্জন করেছেন?"

"উনিশ বছরে"

"উনিশ বছরে!" মিরিয়েল দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

জীন বলিতে লাগিল—"আমার সে টাকা সবই জমা আছে। পথে আস্‌তে আস্‌তে মজুরী খেটে কিছু পেয়েছিলাম, তাতেই এ চার দিনের খরচ চ'লে গেছে। আপনি এক-জন পাদরী না?—তবে একটা কথা বলি শুনুন—আমাদের জেলখানায় একদিন সর্দ্দার পাদরী উপদেশ দিতে এসেছিলেন। আমরা যত কয়েদী তিন দিকে সারবন্দী হ'য়ে দাঁড়ালাম; পাছে আমরা কেউ কিছু করি ব'লে আমাদের ঠিক সাম্‌নে গোলন্দাজেরা গোলাভরা কামান নিয়ে পল্‌তে জালিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আর সুমুখের সেই ফাঁকা দিক্‌টার অনেক দূরে দাঁড়িয়ে সেই সর্দ্দার পাদরী বক্তৃতা কর্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর সে বক্তৃতা শুন্‌তে পাওয়া

ত দূরের কথা, ভাল ক'রে তাঁকে দেখ্‌তেই পাচ্ছিলাম না। খালি তাঁর মাথার উপর কি একটা সোণার জিনিষ চক্‌মক্ করছিল, তাই দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। এই হ'ল সর্দ্দার পাদরী, আর এই তাঁর ধর্ম্মের উপদেশ!"

দরজাটা খোলা ছিল; মিরিয়েল নিজেই যাইয়া বন্ধ করিয়া দিয়া আসিলেন।—বলিলেন —"রাত্রিটা বড় কন্‌কনে। আপনার বড় ঠাণ্ডা লেগেছে বোধ হয়।—ম্যাগ্‌লোয়ার্ এঁর খাবারের জায়গাটা আগুনের দিকে ক'রে দিয়ো।"

যতবার মিরিয়েল তাহাকে 'আপনি' 'মহাশয়' বলিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন, ততবারই আগন্তুকের মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। কয়েদী, বিশেষতঃ গ্যালির আসামীর পক্ষে সে সম্মানলাভ, মরুভূমে তৃষ্ণায় কণ্ঠাগত প্রাণ জীবের পক্ষে সুশীতল বারিপূর্ণ পাত্রের ন্যায়ই লোভনীয়। হীনতা সম্মানের জন্য এমনই লালায়িত হয়!

মিরিয়েল অকস্মাৎ বাতিদানের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"তাই ত, আলোটা বড় মিট্‌মিট্ করছে যে!"

ম্যাগ্‌লোয়ার্ তাহার অর্থ বুঝিল। মিরিয়েলের শয়নকক্ষের আলমারী হইতে রৌপ্যনির্ম্মিত দুইটি বাতিদান আনিয়া, জ্বালাইয়া, টেবিলের উপর সাজাইয়া দিল।

জীন উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিল। বলিল—"এত দয়া আপনার! আমায় ঘৃণা না ক'রে গৃহে ঠাঁই দিলেন; আমি কে, তা জেনে শুনেও আমার জন্য এত সম্মান দেখাচ্ছেন!"

মিরিয়েল পার্শ্বেই বসিয়াছিলেন; মৃদুভাবে তাহার করস্পর্শ করিয়া বলিলেন—"আপনি কে, সে কথায় আমার প্রয়োজন নেই। এ গৃহ আমার নয়—ভগবানের। এখানে অতিথির নাম কেউ জান্‌তে চায় না, তার কোন দুঃখ আছে কি না, সেইটুকুতেই তার প্রয়োজন। আপনি দুঃস্থ, ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, এখানে আপনার অবারিত দ্বার। না, ধন্যবাদ দেবেন না; আমি যে আপনাকে আমার বাড়ীতে আশ্রয় দিচ্ছি—এ কথা ভাব্‌বেন না। এ বাড়ীতে আমার যা অধিকার—আপনারও তাই,—বরঞ্চ বেশী। আপনার নাম আমি জান্‌তে চাই না,—আপনি বলবার আগেই তা জেনেছি।"

লোকটা বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে মিরিয়েলের প্রতি চাহিয়া বলিল-—"সে কি?—কিসে জান্‌লেন?" গাঢ়স্বরে ধীরে ধীরে মিরিয়েল উত্তর করিলেন—"কেন, আপনি যে আমার ভাই।"

লোকটা স্তম্ভিত হইয়া গেল। বলিল—"আপনি মানুষ নন, দেবতা। কি বল্‌ব—ভাষা জানি না। আর আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই—সব ভুলে গেছি।"

"আপনি কি জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়েছেন?"

"দুঃখ কষ্ট! উঃ, সে কথা আর কেন বলেন? সেই লালকোর্ত্তা, লোহার শিকল আর গোলা, কাঠের তক্তার শয্যা, অসহ্য গ্রীষ্ম, তীব্র শীত, কারণে অকারণে কশাঘাত আর নির্য্যাতন, কথায় কথায় অন্ধকারময় নির্জ্জন কারাগারে নির্ব্বাসন, রোগশয্যায় প'ড়েও শৃঙ্খলের হাত হ'তে নিস্তার নেই—উঃ, কুকুরেরাও এর চেয়ে সুখে থাকে!

উনিশ বছর এইভাবে কেটেছে। এখন আমার বয়স ছ'চল্লিশ। এতদিনে ছাড়া পেয়েছি, তবু এখনও তার জের চল্‌ছে এই হল্‌দে ছাড়পত্রই তার প্রমাণ।"

"সত্য ব'ট, আপনি অসহ্য দুঃখযন্ত্রণা সহ্য ক'রেছেন কিন্তু এটা স্থির জান্‌বেন—স্বর্গে একজন মাত্র যথার্থ অনুতাপীর অশ্রুতে যে আনন্দোচ্ছ্বাস জাগে শতজন সাধুপুরুষের আগমনেও তা জাগে না। সে দুঃখের কারা থেকে যদি মানবের প্রতি শুধু ঘৃণা ও বিদ্বেষ নিয়ে বাহির হ'য়ে এসে থাকেন—তবে আপনি করুণার পাত্র; আর যদি সে দুর্দ্দিনের শিক্ষা থেকে মহানুভাবকতা, চিত্তের প্রশান্তি এবং সাধু সংকল্প লাভ ক'রে থাকেন—তা হ'লে আপনি আমাদের মত সাধারণ যে কোন লোকের চেয়ে অনেক বড়।"

ম্যাগ্‌লোয়ার্ ইতিমধ্যে খাবার লইয়া আসিয়াছিল,—নিতান্ত সাদাসিদা রকমের আহার্য্য; তবে ম্যাগ্‌লোয়ার, কি বুঝিয়া, আপনা হইতে এক পাত্র ভাল পানীয়ও আনিয়াছিল।

"ব'সে পড়ুন, আর কি?"—বলিয়া মিরিয়েল নিজেই আহার্য্য বণ্টন করিতে আরম্ভ করিলেন। আগন্তুক গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। সহসা মিরিয়েল বলিয়া উঠিলেন—"তাই ত, টেবিলটা খালি খালি লাগ্‌ছে কেন?" আসল কথা, অতিথি অভ্যাগত আসিলে, রূপার ছয়খানা থালাই টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখার তাঁর নিয়ম ছিল। ম্যাগ্‌লোয়ার্ তিন জনের উপযোগী তিনখানি মাত্র থালা বাহির করিয়াছিল।—মিরিয়েলের 'বড়মানুষি'র মধ্যে এইটুকুই ছিল। এই যে কৃত্রিম বড়মানুষির ভাব, ইহাতে এমন একটা শিশুসুলভ সরলতা মিশ্রিত ছিল, যাহা তাঁহার সাংসারিক দারিদ্র্যকে মহিমামণ্ডিত করিয়াই তুলিত! আজ সে লোকও নাই, সে মহত্ত্ব-গৌরবও আর দৃষ্টিপথে বড় পড়ে না।

ম্যাগলোয়ার বাকী তিনখানা রূপার থালা আনিয়া টেবিলের উপর সাজাইয়া দিল। লোকটা তখন কোন দিকে না চাহিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া খাইয়া যাইতেছিল। আহারাদির পর সে বলিল—"মহাশয়, আমার পক্ষে এ খাবার আশার অতিরিক্ত। কিন্তু তবু সত্য কথা বলিতে কি—সে গাড়োয়ানগুলাও আপনার চেয়ে ভাল খায়।"

অন্য কেহ হইলে হয়ত এ কথায় ক্ষুণ্ণ হইত, কিন্তু মিরিয়েল সহজভাবে উত্তর করিলেন "তা হবে, হয় ত আমাদের চাইতে তাদের বেশী পরিশ্রম করতে হয়।"

"তা নয়। তারা আপনার মত এত গরীব নয়। আমি যা ভাব্‌ছিলাম আপনি বুঝি তাও নন। ভগবান্ যদি ন্যায়বিচারক হন, তবে একদিন আপনি ক্যুরে হবেন।"

"ভগবান্ খুবই ন্যায়বান্।" বলিয়া একটু থামিয়া মিরিয়েল জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, তা হলে পঁয়তারলিয়ারেই যাবেন?"

"হাঁ, আর কোথায় যাব? কাল প্রত্যুষেই রওনা হ'তে হবে। অনেকটা পথ। এ অঞ্চলে রাত্রিটা ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় কাটলেও দিনমানটা বেশহ গরম থাকে দেখ্‌ছি।"

"তা, পঁয়তারলিয়ার বেশ জায়গা। কাজেরও সেখানে অভাব নেই। কাগজের কল, তেলের কল, চামড়ার কারবার, ঘড়ির কারখানা, ইস্পাতের তামার কারখানা, আরও

অসংখ্য ছোট বড় কারবার সেখানে আছে। আমাদের জানাশুনা লোকও সেখানে আছেন। তবে দুধের কারবারটাই সেখানে খুব বড়—কত শত মণ দুধ ছানা দই ক্ষীর সেখান থেকে প্রতিদিন বিদেশে চালান হয়।" বলিয়া মিরিয়েল বিস্তারিতভাবে তাহার আলোচনা করিতে লাগিলেন। সে যেন অপর দশজনের মতই সাধারণ একজন মানুষ—তার জীবনের কোনখানটাই যেন কলঙ্কমণ্ডিত নয়! বক্তৃতার এমন একটা সুন্দর সুযোগ, পাপীর প্রতি সাধুর উপদেশ-চেষ্টা, নির্ম্মমভাবে ছুরিকা চালাইয়া পাপের ক্লেদপরিপূর্ণ শোষণ-নালী উন্মুক্ত করিয়া পাপের প্রতি পাপীর যাহাতে যথার্থ ঘৃণা জন্মে, তাহার প্রয়াস—এ সমস্তই উপেক্ষা করিয়া বরং তিনি তাহার অতীত জীবনটাকে বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবাইতেই চাহিতে-ছিলেন। যথার্থ করুণা এইখানেই নয় কি? অতীতের ভারে যে প্রতিনিয়তই প্রপীড়িত হইতেছে—তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও সে কথা ভোলানই কি যথার্থ করুণা নহে?—এই যে মহাপ্রাণতা, যাহা সকল বক্তৃতা উপদেশ দূরে রাখিয়া, হতভাগ্যের জীবনের ক্ষত স্থানে হস্তস্পর্শ করিয়া তাহার যন্ত্রণা আর বৃদ্ধি করিতে চায় না;—এই যে সঙ্কোচের ভাব,—ইহাতে কি যথার্থ দেবত্বের ছায়াপাত নাই?

আহারান্তে উপাসনাদির পর মিরিয়েল বলিলেন—"চলুন মশায়, আপনার ঘর দেখিয়ে দিয়ে আসি।"

একতালায় সবশেষের কক্ষটি অতিথির জন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল। মিরিয়েলের শয়নকক্ষের মধ্য দিয়াই তাহার একমাত্র প্রবেশ-পথ। অতিথির সঙ্গে মিরিয়েল যখন আপন কক্ষ দিয়া যান, তখন ম্যাগ্লোয়ার্ তাঁহার শয্যা-শিয়রস্থ দেওয়াল-আলমারিতে রূপার পাত্র-গুলা তুলিয়া রাখিতেছিল; শয়নের পূর্ব্বে এটা তাহার প্রতিদিনের কাজ ছিল।

শয্যা প্রস্তুত ছিল। মিরিয়েল বলিলেন—"তা হ'লে আপনি এখন শু'ন। সুনিদ্রা হোক্! কাল সকালে রওনা হবার আগে একবাটি গরম দুধ খেয়ে তবে যাবেন।"

"সে আপনার অনুগ্রহ।"—বলিয়া সহসা লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইল। সতর্ক করিবার জন্য, না ভয় দেখাইবার জন্য, না তাহার সহজাত-বুদ্ধির বশবর্ত্তিতায়—কে জানে কিসের জন্য; সে সহসা উত্তেজিতস্বরে বলিয়া উঠিল—"সে কি মশায়? আপনার এত কাছে আমাকে শুতে দিচ্ছেন? আপনি পাগল না কি? আমি যে একজন খুনী নই, আপনাকে কে বল্লে?"

মিরিয়েল ধীরস্বরে উত্তর করিলেন—"সে ভাবনা ভগবানের—আমার নয়।" বলিয়া বৃদ্ধ আগন্তুকের দিকে ধীরে ধীরে আপন দক্ষিণ হস্তখানি উত্তোলন করিয়া নীরবে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তার পর নিঃশব্দে সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

তখনও তাঁহার শয়নের সময় হয় নাই। বাগানে আসিয়া তিনি পায়চারি করিতে লাগিলেন এবং ভগবানের যে রহস্যময় অপূর্ব্ব লীলাবৈচিত্র্য গভীর রজনীতে ভাবময় মানব-চক্ষে ফুটিয়া ওঠে, তাহারই ধ্যানধারণায় নিমগ্ন হইয়া রহিলেন।

এদিকে, লোকটা এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া-ছিল যে জামাজুতা না ছাড়িয়াই—ফুঁ দিয়া

বাতিটা নিভাইয়া দিয়া, একেবারে বিছানায় গিয়া পড়িল এবং মুহূর্ত্তপরেই গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইল।

মিরিয়েল অনেকক্ষণ পর ফিরিয়া আসিলেন। ক্ষণপরেই সে ক্ষুদ্র বাড়ীটি গভীর সুষুপ্তির ক্রোড়ে মগ্ন হইয়া গেল।

(ক্রমশ)

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

সুখ-স্মৃতি

১

চির-সাথী বীণাখানি ছিল মোর করে!
প্রভাতে গাহিত পাখী,
ফুলে ছেয়ে যেত শাখী,
জাগিত হৃদয় মোর কি পুলক ভরে।
আকাশ-বাতাস-ভরা—
কি যেন আকুল-করা—
হরষ-প্লাবন আসি' পড়িত অন্তরে—
আজি মনে পড়ে।

২

গগনে প্রখর রবি,
শ্যামল প্রান্তর-ছবি,
অলস মধ্যাহ্ন-বেলা—পতঙ্গ-গুঞ্জন;
নিবিড় প্রচ্ছায় বট,
জনহীন নদীতট,
বদ্ধ-তরী দুলে স্রোতে—ব্যর্থ আকিঞ্চন—
টুটিতে বন্ধন।

৩

পাখী উড়ে নীলাকাশে,
কৃষ্ণ বিন্দু যেন ভাসে,—
আঁখি দুটি তারি পানে—সে যেন আপন!
স্নেহ তপ্ত সুনিবিড়
কোথা' তার আছে নীড়,
ক্ষুদ্র সুখ দুখ তার—গৃহীর মতন
কলহ-মিলন!

৪

ফুটিত সন্ধ্যায় তারা,
শুভ্র জ্যোৎস্নারধারা
ঢালিত আকাশে চাঁদ—হাসি' সুধাহাসি;
বসিতাম বীণা নিয়া,
তৃপ্তিরূপা কাছে প্রিয়া,
ভাবিতাম—প্রিয়ার সে ফুল্লরূপরাশি—
কত ভালবাসি!

৫

বীণায় কাঁপিত সুর,
প্রেমস্বপ্নে পরিপূর—
চাহিতাম প্রিয়ামুখ—সুষমার সার!
এই স্বর্গ—এই সুখ,
জানি না কোথায় দুখ,
কোন শূন্য কোন দৈন্য নাহি প্রাণে আর—
এত সুখ কার!

৬

হেরি' নিদ্রালস-ভরে—
আঁখি-পাতা ঢুলে পড়ে
প্রিয়ার আমার—বীণা রাখিতাম পাশে!
ঘুমঘোরে বাহু তার
বাঁধিত গলায় হার!
হায়! সে সুখের নিশি যদি ফিরে আসে—
এ বিরহ নাশে!

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

পাথরের সন্দেশ

ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত ভূভাগে প্রস্তর কত কথাই বলিতেছে, কত সংবাদই দিতেছে, অতীতের কত গৌরবকাহিনী বিবৃত করিতেছে। যে ইতিহাস মানুষ লিপিবদ্ধ করে নাই, অথবা লিপিবদ্ধ করিলেও জলবায়ুর দৌরাত্ম্যে তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, পাষাণ সে ইতিহাসও বক্ষে ধারণ করিয়া যুগযুগান্তের পর মানুষের ঘরে আসিয়া হাজির হইতেছে। সহস্র সহস্র বৎসর মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত থাকিয়া আত্মরক্ষা করতঃ যে কাহিনী সে এত দিন গোপন করিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিতেছে, কত কুসংস্কারের মস্তকে কুঠারাঘাত করিতেছে। কি উড়িষ্যায়, কি দাক্ষিণাত্যে, কি পাঞ্জাবে, সর্ব্বত্রই পাষাণ-স্থপতি ও ভাস্করগণের অতুলনীয় কীর্ত্তি সকল ঘোষণা করিতেছে। খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, পুরী, ভুবনেশ্বর বা কণার্ক, ইলোর, এলিফ্যান্টা, অজন্তা বা পাণ্ডবগুম্ফা, দিল্লী, আগ্রা বা কুতব—যেখানে যাওয়া যাক্, সকলেই নীরবে জাতীয় গৌরব ঘোষণা করিতেছে। এই সকল দেখিয়া কেবল মাত্র বাঙ্গালীই একটা আক্ষেপ লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে—তাহার দেখাইবার কিছু নাই। হৃদয়ের এই সন্তাপ নিবারণের জন্য তাহার একমাত্র ব্যজনী ছিল এই যে, এই প্রস্তরবিহীন প্রদেশে তখনও ভাস্কর-শিল্পের স্থান নাই। যাহাও বা ছিল, তাহাও আর হাওয়ায় প্রতিকূলতায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। একবার একজন বাঙ্গালী ডেপুটীর মুখে শুনিয়াছিলাম, তিনি প্রমাণ পাইয়াছেন যে, উড়িষ্যার অনেক কীর্ত্তি বাঙ্গালী শিল্পীর রচিত। যে বাঙ্গালী নিজের দেশে কিছুই করিতে পারে নাই, সে বাহিরে যাইয়া কৃতিত্ব দেখাইতেছে, ইহার পক্ষে যুক্তি এই যে, দেশে প্রস্তরের অভাব। দেশে শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা নাই বলিয়া বিদেশ হইতে ব্যাখ্যাকার আসিয়াছিল বলিয়া যে জাতির প্রবাদ, তাহারা কি বিদেশ হইতে প্রস্তর আনিয়া আপনাদের কীর্ত্তি স্বদেশেই চিরস্থায়ী করিতে পারিত না? এই সন্দেহ মনে জাগিলেও, খোস্ খবরের ঝুটাও ভাল বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া গিয়াছিল। সময়ে সময়ে শিল্পচাতুর্য্যের দুই একটী নিদর্শন যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিদেশ হইতে আনীত বলিয়াই বিশেষজ্ঞগণ নির্দ্ধারিত করিতেছিলেন, এমন সময়ে এমন একটা ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহাতে বাঙ্গালীকে আর মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হইবে না। মৃত্তিকার নিম্ন হইতে এমন বৃহদাকার প্রস্তর-খণ্ড সকল পাওয়া গিয়াছে যাহা তক্ষণ-কার্য্যের উপযোগী করিয়া স্থাপন করা হইয়াছে, কোনও দৈব-দুর্বিপাকে কার্য্যশেষ হয় নাই। ইহাতে অনুমান হয় যে, প্রস্তর বিদেশ হইতে আনীত হইলেও, শিল্পী দেশীয়। বিষয়টী এখন আর কেবল মাত্র অনুমানের অন্তর্ভুক্ত নহে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি বাঙ্গালী জাতির এই বিষয়ক কৃতিত্ব প্রত্যক্ষীভূত করাইয়া সমগ্র জাতির অশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। আরও গৌরবের বিষয় এই যে, এই সমিতি সম্পূর্ণরূপেই বাঙ্গালীর

কীর্ত্তি—ইহার জন্মদাতা বাঙ্গালী, ইহার পরিচালক বাঙ্গালী।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি নানা দিকে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে তোলপাড় কাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালীর ইতিহাস যে লক্ষ্মণসেনের পলায়নের ইতিহাস নয়, কিন্তু যে সময়ে উত্তর ভারত বিদেশীর আক্রমণে বিধ্বস্ত, সেই সময়ে বাঙ্গালীই সগর্ব্বে সাম্রাজ্য-স্থাপনের জন্য মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান—এই ইতিহাস সেই গৌরবজনক ইতিহাস, বাঙ্গালী কোনও কালেই যে ষষ্ঠাংশ দিয়াই আপনার রাষ্ট্রবিষয়ক কর্ত্তব্য শেষ করে না, কিন্তু সেই অন্ধকার-যুগেও অরাজকতার সময়ে স্বনির্ব্বাচিত রাজা লইয়া অগ্রসর হইয়াছিল এবং য়ুরোপ যে সময়ে ধর্ম্ম লইয়া কাটাকাটি করিতেছিল, বাঙ্গালী সেই সময়ে ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা দিয়া রাষ্ট্র চালাইতেছিল—আমরা সেই ইতিহাস শুনিতে পাইতেছি। অন্যদিকে সমিতি যে সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তাহার প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহা দ্বারা ভারতের ধর্ম্মবিকাশের অনেক অন্ধকারাচ্ছন্ন কোঠা আলোকিত হইবে। কি করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম তান্ত্রিক ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস তন্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। কিন্তু সে কথা বলিবার সময় এখনও আসে নাই। আজ কেবলমাত্র তক্ষণ ও ভাস্কর-শিল্প-বিষয়ক সংগ্রহের কথাই বলিব—এবং তাহাও অতি সংক্ষেপে। বিশেষ বিবরণ, বাঙ্গালী পাঠক ১৩১৯ সালের কার্ত্তিক মাসের 'সাহিত্যে' প্রাপ্ত হইবেন।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি রাজসাহীতে যে সংগ্রহাগার স্থাপন করিয়াছেন, তাহা দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। কৌতূহলবশতঃ দেখিতে গিয়াছিলাম, হৃদয়ের চিরদিনের পোষিত আকাঙ্ক্ষা মিটিবে—এ ধারণাই তখন ছিল না। কত দুর্ল্লভ গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে, কত শিলালিপি, কত প্রস্তর-মূর্ত্তি! ধাতু ও দারুনির্ম্মিত সংগ্রহও আছে। কিন্তু প্রস্তরমূর্ত্তিগুলি দেখিয়া যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, তাহা বর্ণনাতীত। এরূপ সুন্দর সুঠাম মূর্ত্তি আর কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যবদ্বীপে কতকগুলি মূর্ত্তি পাইয়া পণ্ডিতগণ মহাসমস্যায় পড়িয়াছিলেন—এগুলির আদর্শ কোথা হইতে আসিল? কিন্তু ভরসা হয়, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সে সমস্যার মীমাংসার জন্য যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছেন। সূর্য্যমূর্ত্তি, অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তিতে বাঙ্গালার সামাজিক জীবনের কত কথা যে খোদিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা চক্ষুষ্মান্ খুঁজিয়া বাহির করিবেন। আমি মাত্র একটী মূর্ত্তির কথা বলিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মূর্ত্তিটী বিষ্ণুর বাহন গরুড়। ইহা যে বাঙ্গালীর হস্তরচিত, তাহার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ ঐ মূর্ত্তিটীর মধ্যেই রহিয়াছে। বিষ্ণু যেন স্বীয় বাহনের উপর ইচ্ছা করিয়াই একটু চাপ দিয়া বসিয়াছেন, গরুড় সে চাপ অগ্রাহ্য করিয়া উড়িবার উপক্রম করিতেছে, ইহাই মূর্ত্তিটীর বাহ্যদৃশ্য। কিন্তু শিল্পীর সমস্ত শিল্প-চাতুর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে গরুড়ের মুখে। শিল্পী আপনার প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া তন্ময়ভাবে একটী মহান্ আধ্যাত্মিক ভাবকে মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন। ভগবান্ সর্ব্বদাই ভক্তকে

পরীক্ষায় ফেলিয়া অনল-দগ্ধ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল করিয়া তোলেন।—
"যে করে আমার আশ, করি তার সর্ব্বনাশ;
তবু যদি না ছাড়ে পাশ, হই তার দাসের দাস।"
ইহা ভক্তি-শাস্ত্রের কথা। ভক্ত সর্ব্বদাই আনন্দ-হৃদয়ে ভগবানের সকল ভার বহনে প্রস্তুত। মৃত্যুতেও তিনি আনন্দ-চিত্ত। ভগবান্, তুমি যত ভারই চাপাও না কেন, তোমার প্রসাদে আমি সকল ভারই অতিক্রম করিতে সমর্থ—গরুড়মূর্ত্তি যেন দিব্যকণ্ঠে এই কথা বলিতেছে। প্রস্তরখানিতে বিশ্বাসের দৃঢ়তা, নির্ভরের আনন্দ এবং সর্ব্বোপরি ভগবদ্ভক্তের সদানন্দ হাসিমুখ যেন মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়াছে। ভক্তিকে এমন প্রকট মূর্ত্তি দিবার ক্ষমতা বাঙ্গালী ভিন্ন জগতে আর কাহারও নাই। মূর্ত্তিখানিতে বাঙ্গালিত্ব যেন দেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। সমিতির তোষাখানায় আমি যতক্ষণ ছিলাম, অধিকাংশ সময় এই রত্নটির নিকটেই ক্ষেপণ করিয়াছি, ঘুরিয়া ফিরিয়া ইহারই নিকটে আসিয়াছি এবং এই আবিষ্কারের জন্য অনুসন্ধান-সমিতির যিনি মেরুদণ্ড, তাঁহাকে মনে মনে শতবার ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছি। মনে মনে এইজন্য যে, ধন্যবাদ লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হওয়া এক কঠিন কার্য্য। তিনি আদর্শ-কর্ম্মী। অন্যে যে স্থানে একগুণ কার্য্য করিয়া দশ গুণ প্রশংসার জন্য লালায়িত, তিনি সে স্থানে আত্মগোপন করিবার জন্যই ব্যস্ত। অথচ অকাতরে তিনি এই কার্য্যের জন্য সময়, স্বাস্থ্য ও অর্থ ব্যয় করিতেছেন। তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিয়া স্থানান্তরে দুই কথা লিখিয়াছিলাম, প্রুফ্ দেখিবার সময় তিনি স্বহস্তে তাহা কাটিয়া দিলেন। বঙ্গের জমিদারগণ ঘরে বাহিরে অনেকেরই চক্ষুঃ শূল কিন্তু তাঁহারা যদি কুমার শরৎকুমারের অনুকরণে দেশের মঙ্গলে আপনাদিগকে নিয়োজিত করেন, তবে জনসাধারণের শুভাকাঙ্ক্ষার উপর তাঁহাদিগের আসন প্রতিষ্ঠিত হইবে। সুতরাং সে শূল তাঁহাদিগের গাত্রও স্পর্শ করিবে না, কেবলমাত্র প্রতিপক্ষেরই চক্ষের বেদনা জন্মাইবে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

স্বর্গীয় জগদীশনাথ রায়

যখন জগদীশবাবু বালেশ্বর জেলায় পুলিশের অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন সেই সময়ের পুলিশের ইন্‌স্পেক্‌টার জেনারেল্ কর্ণেল্ পিউ সাহেব উক্ত জেলার পুলিশের কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য তথায় যান; গিয়া জগদীশ বাবুকে বলিলেন—"আমি আপনার পুলিশের কর্ম্ম দেখিতে চাহি না; আমি জানি, উহা উত্তম; বীমস্ সাহেবও আমাকে ঐরূপ বলিয়াছেন। আমি আপনার মিলিটারী সম্বন্ধীয় কার্য্য দেখিতে চাহি।" জগদীশবাবু উত্তর

করিলেন—"আপনি ঐ কর্ম্ম দেখিবেন বলিয়া আমি প্রায় তিন শত কনষ্টবল রিজার্ভে আনিয়া রাখিয়াছি; তাহাদের অস্ত্র লইয়া সজ্জিত হইয়া এখনই আনাইতেছি।" কনষ্টবলেরা লাইনের মাঠে সমবেত হইলে, পিউ সাহেব স্বয়ং স্থানে স্থানে নিশান গাড়িলেন এবং বলিলেন—এইটী জঙ্গল, এইটী নদী, এইখানে শত্রুরা আছে; আপনি স্বয়ং হুকুম দিয়া আপনার ফৌজকে লইয়া যান, যাইবার সময় সমস্ত ম্যানুয়েল ও প্ল্যাটুন একসারসাইজ্ দেখাইয়া যা'ন।" জগদীশবাবু তাহাই করিলেন এবং এমন সুচারুরূপে ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন যে, পিউ সাহেব ছুটিয়া আসিয়া হস্তমর্দ্দন করিয়া উঁহাকে জয়যুক্ত ঘোষণা করিলেন; বলিলেন— "দেখুন, আপনি বাঙ্গালী, এই কর্ম্মে আপনার দোষ আমি নিশ্চয় পাইব ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু দেখিতেছি যে, আমার পল্টনে কর্ম্মচারীদের অপেক্ষা আপনি ভাল কাজ করিয়াছেন, আমি গবর্ণমেণ্টে আপনার সম্বন্ধে স্পেসিয়াল্ রিপোর্ট করিব। আশ্চর্য্যের কথা, আপনি শিখিলেন কেমন করিয়া? বিউগল ধ্বনি করিবার সময় ভুল করিয়াছিল; তাহাও আপনি জানিতে পারিয়া ভুল ধরিয়া তাহার দুই টাকা জরিমানা করিয়াছেন। ধন্য আপনার অধ্যবসায়!" বালেশ্বরে থাকিবার সময় স্যার্ রিচার্ড টেম্পল্ ইঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিবার জন্য বড়লাটকে লেখেন। জগদীশ বাবু এ সংবাদ পাইয়া, তখনই ছোটলাটকে লিখিলেন এবং রায় বাহাদুর লিষ্ট হইতে আপনার নাম কাটাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। টেম্পল্ সাহেব বড় বিরক্ত হইলেন; কিন্তু উঁহার অনুরোধও উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

বালেশ্বরে একজন পঞ্জাবী ব্রাহ্মণ জগদীশবাবুর আর্দ্দালী ছিল; এ লোকটি সাড় হাত লম্বা এবং গৌরবর্ণ, ভাল লোক বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী পুলিশ সাহেবেরাও ইহাকে আর্দ্দালীর পদে রাখিয়াছিলেন; এই লোকটার চরিত্রে কোন দোষ ছিল না; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একটা উড়িয়া যুবতীকে দেখিয়া তাহার প্রেমাসক্তি হইল। গভীর রাত্রে পুলিশ সাহেবের বাটী ত্যাগ করিয়া সে বুড়াবলং নদীর ধারে সেই স্ত্রীলোকটার ঘরে যায় এবং প্রাতঃকাল না হইতে হইতেই স্বস্থানে ফিরিয়া আসে। এই স্ত্রীলোকটা অপর একটা ধনী ব্যবসায়ী মাইতি কায়স্থকে আপনার নিকট আসিতে দিত। কনষ্টবল এ কথা জানিতে পারিয়া ইহাকে বলে—'দেখ, তোমার জন্য আমি জাত্ দিয়াছি এবং তোমার প্রেমে আমি পাগল, তুমি আর কাহাকে আসিতে দিও না।" স্ত্রীলোকটা সে কথা শুনিবে কেন? মাইতি যথেষ্ট পয়সা দিত, সুতরাং সে তাহাকে আসিতে নিবারণ করিত না। একদিন রাত্রে কনষ্টবল যেমন উহার ঘরে যাইতেছে, সেই সময়ে মাইতিও ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। যেমন তাহাকে দেখা, অমনি কোমর হইতে তলোয়ার খুলিয়া আর্দ্দালি এক কোপে তাহাকে কাটিয়া, নদীর জলে কাপড়, তলোয়ার ধৌত করিয়া, পুলিশ সাহেবের বাটী আসিয়া শয়ন করিল। প্রাতঃকালে যখন জেল ও ট্রেজরীর গার্ড এবং লাইনের সুবাদার রিপোর্ট করিতে আসে, তখন কনষ্টবলও সেলাম করিয়া (স্যালুট) দাঁড়াইয়াছিল। সকলে লাইনে গ্রাউণ্ড্ৰাফ্ট ঝোঁক দিয়া ফিরিতে লাগিল, কনষ্টবল মাঠে

মাঠে চলিল। ইত্যবসরে সিনিয়ার টাউন্ ইন্‌স্পেক্টার সারদাপ্রসাদ বসু আসিয়া রিপোর্ট করিলেন—"সহরে একটা খুন হইয়াছে।" জগদীশ বাবু উত্তর করিলেন—"তদারক করগে।" সারদাবাবু অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়া চলিয়া গেলেন; লাইনে পৌঁছিয়া, কনষ্টবল, হেড্ কনষ্টবল প্রভৃতি অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগকে সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন – "কাপড়-ওয়ালা মাইতি কায়স্থটি যে খুন হইয়াছে, তাহাকে কি তোমরা কেহ চেন? যদি জান, তবে বলিতে পার, বুড়াবলং নদী তীরে সে অত রাত্রে কেন গিয়াছিল।" জনৈক কনষ্টবল বলিল—"হুজুর, ওখানে একটা বেশ্যা আছে, তাহারই নিকট রাত্রে ঐ মাইতি যাইত।" সারদাবাবু বলিলেন—'সে বেশ্যাটার কাছে আর কেহ যাইত, তাহা কি জান?" কেহ সঠিক বলিতে পারিল না। একজন বলিল—"পুলিশ সাহেবের আর্দ্দালী শোভন সিংহকে ঐ স্ত্রীলোকটার বাটীতে যাইতে দেখিয়াছি।" তখন সারদা বাবু বলিলেন—"শোভন সিংহের চরিত্র খুব উত্তম, সে ২।৩ টা গুড্ কন্‌ডাক্‌ট্ ষ্ট্রাইপ্ পাইয়াছে, সকল পুলিশ সাহেবদের সে প্রিয়; অমন লোক বেশ্যাবাড়ী কেন যাইত? যাহাই হউক, তাহাকে ডাকাইয়া এ বিষয়ের কিছু জানে কি না, জিজ্ঞাসা করিলে ক্ষতি কি, একজন কনষ্টবল গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আন।" কনষ্টবলটি ডাকিতে চলিল এবং লাইনের মাঠের উপর দিয়া চলিল, পুলিশ সাহেবের বাটী এবং লাইনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, এক বৃক্ষের তলায়, শোভন সিংহকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিতে পাইল; কাছে গিয়া তার মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইল, মুখখানায় যেন চিনের সিন্দুর মাখাইয়া দিয়াছে; আরক্তিম মুখ এবং চক্ষু দু'টিও ঘোর লাল হইয়াছে এবং ঘুরিতেছে। তবুও সাহসে ভর করিয়া কনষ্টবল বলিল—"শোভন সিংহ, তোম্‌কো সারদা বাবু বোলাওতা হ্যায়; নদী-কিনারে ক্যা খুন হুয়া, উস্কা বাত্ তোম্‌কো কেয়া পুছেগা।" যেমন ঐ কথা শুনা, শোভন সিংহ অমনি তলোয়ার খাপ হইতে খুলিল এবং বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিল—"যাও, তোমারা ইন্‌স্পেক্টার শালাকো কহো মেয়্ নেহি জায়েঙ্গা, মেয়্ খুন্ কিয়া, মেয়্ ফাঁসি জায়েঙ্গা।" কনষ্টবল আর দ্বিরুক্তি না করিয়া লাইন অভিমুখে ছুটিল এবং সমস্ত সংবাদ জানাইল। সারদা বাবু, সাহেব রিজার্ভ ইন্‌স্পেক্টার, সাহেব হেড কনষ্টবল, পঞ্জাবী সুবেদার এবং নানাদেশীয়, নানাজাতীয় কনষ্টবলগণ ছুটিল। কনষ্টবলদের ভিতর উড়িয়া, হিন্দুস্থানী, গুর্খা, পাঠান, আফগান প্রভৃতি সকল জাতীয় লোকই ছিল; লাঠী, শোটা, তলোয়ার, বন্দুক, বেওনেট্ লইয়া সকলে ছুটিল। গাছ-তলার নিকট পৌঁছিলে শোভনসিংহ বলিল—"দেখো, হামারা নগিচ্ কই মৎ আও, আনেসে যেয়সা উস্কা কাটা, তেয়সা তোম্ লোককো বি কাটেগা, হাম বোল্‌তা হ্যায়্ মেয় খুন্ কিয়া, মেয়্ ফাঁসি যায়েঙ্গা।" কেহই অগ্রসর হইতে সক্ষম হইল না, ছররা দিয়া বন্দুক ভরিয়া রাখা হইল। শেষে সাব্যস্ত হইল—পুলিশ-সাহেবকে খবর দাও। জগদীশবাবু সংবাদ পাইয়া, যে বেশে ছিলেন, সেই বেশেই চলিলেন। তাঁর পরিধানে ছিল একটা ফ্লিন-পাঁও ইজের, একজোড়া মোজা ও চটি জুতা, একটা জামা, তার উপর একটা আলখাল্লা

মতন। দ্রুতপদে তিনি চলিলেন এবং শীঘ্র গাছতলার নিকট পৌঁছিলেন। তাঁর পৌঁছিবার পূর্ব্বে সকলে বলিতেছিল "যদি পুলিশসাহেবের উপর চড়াও করে, তবে আমরা ছর্‌রা-গাদা বন্দুক উহার গায়ে মারিব।" জগদীশবাবু কাহাকে কিছু না বলিয়া কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, একেবারে খুনে শোভন-সিংহের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন "তলোয়ার ফেঁকো,আবি তলোয়ার ফেঁকো।" এই হুকুম দিবার সময় তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল; শোভনসিংহ তাঁহার মুখের দিকে দুই একবার তাকাইয়া তলোয়ার ফেলিয়া দিয়া স্যালুট করিয়া দাঁড়াইল। তখন জগদীশবাবু হুকুম দিলেন—"ইহার হাতে হাতকড়ি দাও।" কেহ অগ্রসর হয় না; তখন তাহার জামার আস্তিন ধরিয়া বলিলেন "লাগাও হাতকড়ি।" সুবেদার দৌড়িয়া গিয়া হাতকড়ি লাগাইয়া দিলেন। তখন জগদীশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—" তাম এ খুন কিয়া?" "হাঁ হুজুর" উত্তর আসিল। তখন "লে যাও" বলিয়া জগদীশবাবু দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। সকলে চিত্রপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল এবং একবাক্যে বলিতে লাগিল—"কি সাহস, কি বীরত্ব।" কতকগুলি লোক যারা পূর্ব্বে পল্‌টনে কাজ করিত এবং যুদ্ধ বিগ্রহ দেখিয়াছে, তাহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"এ রকম বিক্রম আমরা যুদ্ধে কিম্বা অপর কোন কার্য্যে দেখি নাই।"

বালেশ্বরে চাঁদবালী বন্দর খুলিবার জন্য জগদীশবাবু বিস্তৃত করিয়া রিপোর্ট করেন। তাঁহারই রিপোর্ট পাইয়া গবর্ণমেণ্ট ঐ বন্দর খুলিলেন। বালেশ্বরে সমুদ্রের কিনারে নিমকের পোক্তান এখনও হয়। সমুদ্রকিনারা জঙ্গলপূর্ণ, নানা হিংস্রক জন্তুতে পরিপূর্ণ, সুতরাং চোরাই পোক্তানি খুব চলে, গবর্ণমেণ্টের ইহাতে বহু ক্ষতি হয়। চৌকি পাহারা করিবার জন্য ছয়মাসের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োজিত হয়। তাহাদের ঠিকা চাকরি, সুতরাং অতিরিক্ত রোজগারের আশায় তাহারা পোক্তানকারীদের সহায়তা করে; সরকারের নিয়মিত লোক্‌সান হয়। কাপ্তেন্ চেম্বার্স নামক জনৈক ডিপুটি ইন্‌স্পেক্‌টার জেনারেল চুরি বন্ধ করিবার জন্য জঙ্গলের ভিতর হস্তিপৃষ্ঠে পুলিশ বসিয়া পাহারা দিবার ব্যবস্থা করেন; ব্যয়াধিক্য হয় বলিয়া তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। জগদীশবাবু এক সুকৌশল করিয়া চুরি বন্ধ করেন, নিমকের অস্থায়ী পুলিশকে তিনি স্থায়ী পুলিশের কর্ম্ম করিতে দিলেন এবং স্থায়ী পুলিশকে নিমক মহলে কার্য্য করিতে পাঠাইলেন, স্থায়ী দলকে বলিলেন—"দেখ, তোমাদের চিরদিনের রুটি, লোভে পড়িয়া তাহা হারাইও না, এক ছটাক অতিরিক্ত লবণ যেন পোক্তান না হয়। ভাল কাজ করিলে আমি তোমাদের শীঘ্র পদোন্নতি করিয়া দিব।" অস্থায়ী পুলিশকে বলিলেন,—"তোমাদের ছয় মাসের জন্য ঠিকা কর্ম্ম। যদি স্থায়ী পুলিশে আসিতে চাও, চোরাই লবণ ধরিতে চেষ্টা কর; এক ছটাক ধরিলেও তোমাদের মঙ্গল হইবে।" এই রকম উভয় পুলিশদিগকে উত্তেজিত করায় অতিরিক্ত আইনবিরুদ্ধ পোক্তান একেবারে বন্ধ হইল। অতিরিক্ত পোক্তানিটা কি, তাহা বুঝাইয়া বলি। ব্যবসায়ীরা কেহ ত্রিশ হাজার মণ, কেহ পঞ্চাশ হাজার মণ লবণ প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে সরকারকে

মাশুল প্রদান করেন। লবণ প্রস্তুত করিতে গেলে, সমুদ্রের জল চাই; সুতরাং সকল দোকানই (লবণ তৈয়ার করা) সমুদ্রের কিনারে হয়। এখন এ সব স্থান জঙ্গলপূর্ণ, হিংস্রকজন্তুর আবাসভূমি; ঐ সামান্য অতিরিক্ত পুলিশদল ব্যতীত পাহারা দিবার অপর কেহ নাই, এই দলকে টাকায় বশীভূত করিয়া ত্রিশ হাজার মণ করিব বলিয়া পঞ্চাশ হাজার মণ 'তৈয়ার' করিয়া লইলে, কে আমার প্রতিরোধ করিবে? সরকারকে বিশ হাজার মণ তৈয়ার করিবার জন্য মাশুল ফাঁকি দিলাম, অনেক টাকার সুবিধা হইয়া গেল।

জগদীশবাবুর বাঙ্গালা নামের উপর কি যত্ন ছিল এবং কেমন করিয়া তিনি পুলিশদলের উপর ডিসিপ্লিন্ (discipline) রক্ষা করিতেন, তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি—নীলগিরি জঙ্গলের ভিতর, গড়জাত এলাকার একটা পুলিশ ষ্টেশনে ঘর নির্ম্মাণ হইতেছিল, জগদীশবাবু ঐ ঘরটী দেখিতে যান। ঘরটীর দরজা জানালা তখন কিছুই বন্ধ নাই, চতুর্দ্দিক্ খোলা ছিল। জগদীশবাবুকে এ ঘরে রাত্রে বাস করিতে হয়। সামান্য একটা খাটিয়ায়, তিনি শয্যা করিয়া শয়ন করিলেন। রাত্রি যখন গভীর হইল, চতুর্দ্দিকে, ব্যাঘ্র, ভল্লুক এবং অপরাপর জন্তুর ভীষণ শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। জগদীশ বাবুর নারায়ণ বলিয়া একটা বাঙ্গালী খান্সামা, ভীষণ শব্দ শুনিয়া ভয়ে সেই প্রভুর খাটিয়ার নিম্নে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রহরী বলিয়া উঠিল— "দেখো, বাঙ্গালিকা কাম্, পুলিস সাহেব নিদ্ যাতা হায়, এ বাঙ্গালি উন্‌কো খাটিয়াকা তলেমে যাকে ঘুসা।" এ কথাগুলি, জগদীশ বাবুর কর্ণে গেল, তখন তিনি সহসা উঠিয়া, সে অন্ধকারে একাকী ষ্টেশন-ঘরের চারি পার্শ্বে অকুতোভয়ে বেড়াইয়া আসিলেন এত নিকটে জন্তুগুলা চিৎকার করিতেছিল যে, প্রদক্ষিণের সময় কোন না কোন একটা জন্তু তাঁহার সম্মুখে আসিতে পারিত, কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এ অকারণ বিপদ আহ্বান করা কেন? তিনি বাঙ্গালী, পাহারাওয়ালা বাঙ্গালী শব্দ ব্যবহার করিয়াছে, সুতরাং বাঙ্গালী নামের গৌরব-রক্ষার্থে এবং তাঁহার অধীনস্থ ফোর্সের (force) ঠিক চাল বজায় রাখিবার জন্য, তিনি বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া, নিজ মহত্ত্বের পরিচয় দিলেন।

বালেশ্বরে একটী দৈব ঘটনার কথা উল্লেখ করি, মেজিষ্ট্রেট-কলেক্টার নরম্যান্ সাহেবের বাটীতে একদিন নিমন্ত্রিত হইয়া জগদীশ বাবু যান। যাইবার সময় কাথবরটান হার্পারের বাড়ীর তৈয়ারি একজোড়া জুতা (shoes) পরিতেছিলেন, সহসা তাহা খুলিয়া ফেলিয়া মর্টিন কোম্পানীর প্রস্তুত একজোড়া ব্যাল্‌মোরাল বুট (Balmoral boot) পরিলেন। পরিবার সময় তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন—"দেখ, রাত্রে আসিব, 'সু'র পরিবর্ত্তে একজোড়া বুট পরা ভাল।" স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন, আনিতে গাড়ি যাইবে না?" তিনি বলিলেন—"দিবসে দু'টা ঘোড়া অধিক খাটিয়াছে, রাত্রে জুতিবার আবশ্যক নাই, বরং সর্দ্দার বেহারাটা একটা লণ্ঠন লইয়া যেন যায়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিও।" রাত্রি দুইটার সময় যখন মজলিস ভাঙ্গিয়াছে, তখন জগদীশ বাবু বেহারার তত্ত্ব লইলেন। সে ব্যাটা সুখে স্বচ্ছন্দে সাহেবের বেহারার ঘরে

নাসিকার রব করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল; সাহেবের চাকরদের ভিতর কেহই তাহার থাকিবার স্থানের কথা অবগত ছিল না, কোন সন্ধান না পাইয়া জগদীশবাবু পদব্রজে চলিয়া গেলেন। একটা খ্রীষ্টানপাড়ার ভিতর দিয়া যেমন যাইতেছেন, পথ জুড়িয়া একটী গোখুরা সর্প শয়ন করিয়াছিল, জগদীশ বাবু তাহার মধ্যস্থলে যেমন পা দিয়াছেন, অমনি সে বিষধরটা তাঁর পায়ে ৩।৪ ছোবল মারিল; কামড়গুলা বুটের উপর পড়িল, তাঁহার কিছু হইল না, বাঁচিয়া গেলেন, জুতা জোড়াটি পরা থাকিলে, কি অনর্থই ঘটিত, কে যেন তাঁহাকে জুতা ছাড়িয়া বুট পরিতে বলিল, ভগবান এই প্রকারে তাঁহার ভক্তদের বাঁচাইয়া থাকেন। রাত্রে বাটী পৌছিয়া জগদীশ বাবু আর্দ্দালীকে লণ্ঠন আনিতে হুকুম দেন। লণ্ঠন আসিলে, তাহার আলোকে দেখিলেন বুটের উপর তখনও বিষ রহিয়াছে, সর্পটা ছুটিয়া আসিয়া পাছে কাম্‌ড়ায়, এই আশঙ্কায় জগদীশবাবু তাহার মাথা পদদলিত করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, কনষ্টবলদের সেই সর্পটাকে তুলিয়া আনিতে আজ্ঞা দিলেন, তাহারা সেটাকে আনিলে, দেখিলেন—তখনও সে গর্জ্জন করিতেছে, এক 'বাঁও' অপেক্ষাও লম্বা, কনষ্টবলরা তখন সেটাকে লগুড়াঘাতে সংহার করিয়া অগ্নির দ্বারা পোড়াইয়া ফেলিল।

(ক্রমশ)

রসের রূপ—মাধুর্য্য

(২)

রস দুই জাতীয়;—এক স্থায়ী, অপর অস্থায়ী। রসতত্ত্ববিদেরা হাস্যাদ্ভুতাদিকে অস্থায়ী বা আগন্তুক, আর দাস্যাদিকেই স্থায়ী রস বলিয়া থাকেন। হাস্যাদি আগন্তুক রস ইতর জন্তুরাও আস্বাদন করিয়া থাকে। দাস্যাদি স্থায়ী রস কেবল মানুষেই আস্বাদন করিতে পারে। আর স্থায়ী এবং অস্থায়ী—এই উভয়বিধ রসের মধ্যে মাধুর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা জটিল। মাধুর্য্যে দাস্যাদির গুণ ... এই মাধুর্য্যকে আশ্রয় করিয়া হাস্যাদি আগন্তুক রস সকলও অতি অদ্ভুতভাবে ফুটিয়া উঠে। সচরাচর হাস্যাদি আগন্তুক রসের পরস্পরের মধ্যে একটা স্থিতি-বিরোধ জাগিয়া রহে। যে আধারে যে সময়ে ইহার কোনও একটা রস ফুটিয়া উঠে, সেই সময়ে সেই আধারে অপর কোনও আগন্তুক রস ফুটিবার স্থান ও অবসর পায় না। রুদ্ররসের আবির্ভাবে হাস্যের তিরোভাব অনিবার্য্য। ক্রোধের সঙ্গে কারুণ্যের সমাবেশ ও সমন্বয় অসম্ভব ও

অসাধ্য। কিন্তু মাধুর্য্যেতে সর্ব্বদাই এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। মাধুর্য্যরস-নিমগ্ন ক্ষেত্রে একই সঙ্গে ক্রোধ ও কারুণ্য, ভয় ও অভয়, কোমল ও রুদ্র প্রভৃতি বিপরীতভাব সকল জাগিয়া উঠিয়া পরস্পরের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম বাধাইয়া দেয়। এই কারণে মাধুর্য্য এত জটিলতা প্রাপ্ত হয়। আর এইজন্যই মাধুর্য্যের রূপ বা মূর্ত্তিও এক-দিকে যেমন নিরতিশয় মনোহর, অন্যদিকে সেইরূপ অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠে।

রসের যাবতীয় রূপই জীবদেহে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু দাস্য-সখ্যাদি স্থায়ী রসের মধ্যে মাধুর্য্য রস যেমন করিয়া মানুষের দেহকে অধিকার ও অভিভূত করে, এমন আর কোনও রসে করিতে পারে না। অন্যদিকে অপর কোনও রসে মানুষের শরীরকে অধি-কার ও অভিভূত করিয়াই, আবার পলে পলে তাহাকে একান্তভাবে অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য এতটা প্রলয়ঙ্কর সংগ্রামও উপস্থিত করে না। এ রস মানুষের এই দেহে, তার ইন্দ্রিয়গ্রামকে অবলম্বন করিয়াই উৎপন্ন হয়, সত্য; কিন্তু আবার এই দেহের দেহত্ব অর্থাৎ তার জড়ত্বকে এবং এই সকল ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়ত্ব অর্থাৎ তাহাদের আপনার বিশিষ্ট বিষয় ভোগ করিবার যে প্রবল লোভ আছে, সেই লোভকে নষ্ট না করিয়া, এ রস কিছুতেই আপনার চরম চরিতার্থতাও লাভ করিতে পারে না। এই রস সত্যসত্যই "দগ্ধেন্ধন-মিবানলম্"—দগ্ধদারুনিঃসৃত অনলের ন্যায়। কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করিয়াই প্রাচীনকালে আগুন জ্বালাইতে হইত। কিন্তু যে কাষ্ঠ-খণ্ডের ঘর্ষণে এই অগ্নির প্রথম উৎপত্তি হইত, সেই অগ্নি আপনার প্রথম আশ্রয় সেই কাষ্ঠফলককে বা অরণীকে নিঃশেষ দগ্ধ করিয়াই ক্রমে আপনার পূর্ণতম ও উজ্জ্বলতম রূপ এবং স্বরূপকে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করিত। মাধুর্য্যরসেরও এই ধর্ম্ম। মাধুর্য্যও মানুষের দেহকে আশ্রয় করিয়া, তার ইন্দ্রিয়-গ্রামের মন্থন হইতেই প্রথমে উৎপন্ন হয়। কিন্তু ক্রমে সেই দেহের জড়ধর্ম্মের ও তার ইন্দ্রিয়কুলের স্বাভাবিক বিষয়লিপ্সার একান্ত নিরসন না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহাতে এই অপূর্ব্ব রসের স্বকীয় রূপ ও স্বরূপ পূর্ণমাত্রায় উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে না।

রসমাত্রেই প্রবৃত্তিমূলক। প্রবৃত্তির পথই রসের পথ। নিবৃত্তিমার্গে এ বস্তু মিলে না। আর মানুষের যাবতীয় প্রবৃত্তির মধ্যে কাম-প্রবৃত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। জীব এ জগতে দুইটা প্রবৃত্তির তাড়নায় এত ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। এক তার ক্ষুৎপ্রবৃত্তি, আর অপর—এই কামপ্রবৃত্তি। জীবের ক্ষুধার প্রেরণা অতিশয় বলবতী। তার কামের সন্ধুক্ষণ এই ক্ষুধার তাড়না অপেক্ষা কোনও অংশে দুর্ব্বল নহে। ফলতঃ মূলে একই প্রয়োজন হইতে জীবের ক্ষুৎপ্রবৃত্তি ও কামপ্রবৃত্তি,—এ দু'য়েরই উৎপত্তি হইয়াছে। জীবস্থিতিরক্ষাই সেই মূল প্রয়োজন। জীব আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিবে, এইজন্য ভগবান্ তাহাকে এই বল-বতী ক্ষুধা দিয়াছেন। সে আপনার বংশরক্ষা করিবে, এইজন্য তাহাকে এই দুর্দ্দান্ত কাম-প্রবৃত্তি দিয়াছেন। জীবস্থিতিভঙ্গনিবারণই জীবের ক্ষুধার তাড়না ও কামের সন্ধুক্ষণের মূল প্রয়োজন। দুইটাই জীবের আদিপ্রবৃত্তি। কিন্তু ক্ষুধাটা কদাপি রসপদবাচ্য হয় না।

ক্ষুধাটা একান্তই একটা শারীর ক্রিয়া। অন্নময় কোষেই তার উৎপত্তি, অন্নময় কোষেই তার বিলয়। ক্ষুধা আপনি জীবকে কোনও আনন্দ দান করে না। ক্ষুধার তৃপ্তিতে একটু আরাম ও আনন্দ লাভ হয় বটে; কিন্তু অতৃপ্ত ক্ষুধায় কেবল যন্ত্রণাই আছে, কোনও আনন্দ নাই। এই বিষয়ে কামের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। কামের সঞ্চারেই আনন্দ জাগিয়া উঠে। ক্ষুধার বৃদ্ধির সঙ্গে জীবের বেদনাই কেবল বাড়িয়া যায়; সে যাতনার ভিতরে কোনও সুখ, কোনও উল্লাস, কোনও আনন্দ কথনও থাকে না। কিন্তু কাম যত বাড়ে, তার পিপাসা যত প্রবল হয়, সে পিপাসার যাতনা যত গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠে, ততই সে ক্লেশের সঙ্গে সঙ্গেই, আবার অক্লান্ত উৎসাহ, অনুপম উল্লাস এবং পরমানন্দও জাগিয়া উঠে। এ অদ্ভুত প্রবৃত্তিকে বিধাতা বিষামৃতে একত্র করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন। এই কামপ্রবৃত্তির সঙ্গে মাধুর্য্য রসের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এইজন্যই "কামগায়ত্রী" মাধুর্য্য সাধনের বীজমন্ত্র। কিন্তু পঙ্ক আর পঙ্কজ যেমন এক বস্তু নয়, সেইরূপ কাম আর মাধুর্য্যও ঠিক একই বস্তু নহে। দু'য়েতে স্বর্গনরক প্রভেদ রহিয়াছে। হীন ও হেয় পঙ্কেই যেমন পঙ্কজের জন্ম হয়; সেইরূপ লোকে সচরাচর যাহাকে হীন ও হেয় কামপ্রবৃত্তি বলে, তাহা হইতে মাধুর্য্যেরও উৎপত্তি হয়। কয়লা হইতে হীরক জন্মে, তাই বলিয়া কয়লা আর হীরক এক হয় না। সেইরূপ কাম হইতে জন্মে বলিয়া, কাম আর প্রেমও এক হয় না। ফলতঃ সচরাচর, বিশেষতঃ আজিকালিকার কাম-প্রধান সভ্যতা ও সাধনা কামকে যেরূপ হীন এবং হেয় মনে করে, তাহাও ঠিক সঙ্গত নহে। প্রজননই কামের কর্ম্ম। এইজন্য কামের অভিমানী দেবতা কন্দর্পও শ্রীভগবানেরই বিভূতিমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। "প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ"—প্রজননের জন্য আমিই কন্দর্প। সৃষ্টিলীলায় এই কন্দর্প বা কামই শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ সহায়। এই কামদেবতা বা কন্দর্পই বিশ্বের বিশাল প্রাণস্রোতকে পুষ্ট করিয়া, জীবস্থিতি রক্ষা করিতেছেন। ভগবদ্বিভূতি বলিয়া কন্দর্পও নমস্য। কামও হীন বা হেয় নহে। প্রজনন-ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে, ইউজেনিকের (Eugenics) প্রতিষ্ঠার কল্পে, আধুনিক সভ্যতা এবং সাধনাতেও কামের মর্য্যাদা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। প্রজননসম্পর্কবর্জ্জিত হইয়া, কাম যখন কেবলমাত্র ভোগপরম হইয়া উঠে, তখনই তাহা হেয় ও হীন হইয়া পড়ে। জীবস্থিতি-রক্ষার জন্য যে প্রবৃত্তির সৃষ্টি, স্বধর্মভ্রষ্ট হইয়া, তখন সেই প্রবৃত্তিই জীবস্থিতিভঙ্গের সহায় হইয়া উঠে। আর ভোগপরম লোকে পবিত্র কামপ্রবৃত্তিকে তার স্বধর্মভ্রষ্ট করিয়া তার বর্ত্তমান অধোগতি ঘটাইয়াছে। কিন্তু প্রাচীনেরা প্রজননের জন্যই কামের সেবা করিতেন। তাঁহাদের কাম ভোগপরম ছিল না; এইজন্যই সেকালে লোকে কামের নাম করিতে একটুও সঙ্কুচিত হইতেন না। তাঁরা "কামায় কামপতয়ে"—বলিয়া সর্ব্বলোক-সমক্ষে, নিতান্ত নিঃসঙ্কোচে কন্যা সম্প্রদান করিতেন। আর কামের মর্য্যাদা তাঁরা জানিতেন বলিয়াই, সকল রসের সেরা,

সর্ব্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক-সম্পদ-সম্পন্ন যে মাধুর্য্য-রস, তাহাকেও শৃঙ্গার বা আদিরসের সঙ্গে একপর্য্যায়ভুক্ত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

ফলতঃ শৃঙ্গার আর মাধুর্য্য একই বস্তু। সাহিত্যে যাহাকে শৃঙ্গার-রস বা আদিরস বলে, রসতত্ত্বে তাহাকেই মাধুর্য্য বলিয়াছেন। সাহিত্যের রস আর ভক্তির রস একান্ত বিভিন্ন জাতীয় বস্তু নহে। ভক্তির সঙ্গে রসতত্ত্বের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ভক্তি শ্রীভগবান্‌কে নিখিলরসামৃত-মূর্ত্তিরূপেই ভজনা করে। আর শ্রীভগবানেতে যে সকল রস নিত্য ফুটিয়া থাকিয়া, তাঁর এই নিখিল রসামৃতমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেই সকল রসই সাহিত্যেরও উপজীব্য। মানবের যাবতীয় রস-পিয়াসা ও রসসৃষ্টি সেই ভগবল্লীলারসকে আশ্রয় করিয়া, তারই উদ্দেশে অবিরাম ছুটিতেছে। সত্য বটে যে শ্রীভগবানের রসমূর্ত্তি অতীন্দ্রিয়, অপ্রাকৃত ; আর সাহিত্যের সাধারণ রসস্ফূর্ত্তি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এবং প্রাকৃত। কিন্তু প্রাকৃত আর অপ্রাকৃত গুণবাচক শব্দমাত্র, বস্তুবাচক শব্দ নহে। ইহারা বস্তুর গুণমাত্রই প্রকাশ করে, সে বস্তুর বস্তুত্বকে নির্দ্দেশ করে না। ইহাতে বস্তুর গুণেরই বৈষম্য বুঝায় ; কিন্তু কোনও মৌলিক পার্থক্য বুঝায় না। রস-বস্তু এক, দুই বা বহু নহে। যাহাকে প্রাকৃত বলি, তাহাও সেই রস, যাহাকে অপ্রাকৃত বলি তাহাও সেই একই রস। আকারের বৈষম্য, প্রকাশের ইতর-বিশেষ, গুণের তারতম্য আছে, কিন্তু বস্তু এক। কেবলমাত্র গুণভেদে প্রাকৃতাপ্রাকৃতের বিভিন্নতা প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রাকৃত রস রাজসিক বা তামসিক, তাহা মলিন। প্রাকৃত দেহের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-দিগকে আশ্রয় করিয়া, প্রাকৃত বিষয়ের সাক্ষাৎকারে ও প্রেরণায় যে রস উৎপন্ন হয়, তাহাকে আমরা প্রাকৃত রস বলিয়া থাকি। কিন্তু এই প্রাকৃত রসই যখন আবার নির্ম্মল হইয়া সাত্ত্বিকাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাই অপ্রাকৃত পদবাচ্য হইয়া থাকে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

রামাবতী

(৪)

পাল-সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেও আত্মরক্ষার জন্য বিপুল উদ্যমের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। রামাবতী-নির্ম্মাণ তাহার প্রমাণ-রূপে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। রামাবতী নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে রাজধানী কোন্ স্থানে বর্ত্তমান ছিল, তাহার পরিচয় অদ্যাপি উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। সে রাজধানী পরিত্যক্ত ও নূতন স্থানে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল কেন, তাহার কিছু কিছু পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

রামাবতী-নির্ম্মাতা রামপালদেবের পিতা তৃতীয় বিগ্রহপাল ইতিহাস-পাঠকের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার একখানি তাম্রশাসন বরেন্দ্রমণ্ডলের অন্তর্গত দিনাজপুর জেলার আমগাছী গ্রামে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে এক কৃষক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। তাহা এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত হইবার পর, তাহার পাঠোদ্ধারের জন্য নানা চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সুপণ্ডিত কোল্‌ব্রুক্‌ তাহার সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধৃত করিতে অশক্ত হইয়া, একটি আংশিক বিবরণমাত্র প্রকাশিত করিয়া গিয়াছিলেন। অধ্যাপক হর্‌নালি একবার সম্পূর্ণ পাঠের উদ্ধার-চেষ্টায় পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পদ্যাংশের সম্পূর্ণ পাঠ অধ্যাপক কিলহর্ণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। গদ্যাংশের পাঠ এখনও বিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

এই তাম্রশাসনে তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের যে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, তাহার দীর্ঘকাল পরে ক্রমে ক্রমে আরও অনেক পরিচয়-বিজ্ঞাপক প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৈদ্যদেবের কমৌলি গ্রামে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে, মদনপালদেবের মনহলী গ্রামে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে, এবং গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দি-বিরচিত রামচরিতম্ কাব্যে তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের নাম ও কীর্ত্তিকলাপ উল্লিখিত থাকা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেব প্রথম মহীপালদেবের পৌত্র এবং নয়পালদেবের পুত্র। তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের পরিচয় সকল তাম্রশাসনেই একরূপ,—তাহাতে কোনরূপ ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ নাই। তাঁহার নিজের তাম্রশাসনে এবং তাঁহার পৌত্র মদনপালদেবের তাম্রশাসনে আছে,—তিনি "শত্রুকুল-কালরুদ্র" ছিলেন। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে আছে—তিনি "সর্ব্বাকারর্দ্ধি-সংসিদ্ধ" ছিলেন। এরূপ সাধারণ ভাবের পরিচয়ে ইতিহাসের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।

রামচরিতম্‌-কাব্য এই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিয়া, একটি ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রদান করিয়াছে। তাহার সহিত তাম্রশাসনোক্ত প্রশংসা বাক্যের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের সত্য সত্যই "শত্রুকুল" ছিল। তাঁহার শত্রু প্রবলপরাক্রমশালী ছিলেন। অবশেষে সেই শত্রু তৃতীয় বিগ্রহপালের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া, "কপাল-সন্ধি" সংস্থাপিত করিয়া, আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম কর্ণ,—তিনি দাহলাধিপতি ছিলেন। রামচরিতম্‌-কাব্যের (১৯) শ্লোকটি এই,—

সহসা-বিতরণ-জিতকর্ণঃ ক্ষৌণীং
যৌবনশ্রিয়োদূহে।
অশ্রান্ত-দানবারাতি-শয়ো যোঽভূদ্‌ বাহুচরঃ॥

এক অর্থে এই শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্রের জনক দশরথের কথা উল্লিখিত হইয়াছে; অন্য অর্থে এই শ্লোকেই আবার রামপালদেবের জনক তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। দশরথ-পক্ষে যে ভাবে পাঠ করিতে হইবে, শ্লোকটি সেইভাবে উপরে লিখিত হইয়াছে। তৃতীয় বিগ্রহপাল-পক্ষে যে ভাবে পাঠ করিতে হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

সহসাবিত-রণজিত-কর্ণঃ ক্ষৌণীং
যৌবনশ্রিয়োদূহে।
অশ্রান্ত-দানবারা-তিশয়ো যোঽভূদ্বৃষানুচরঃ॥

রামচরিতম্-কাব্যের টীকায় উভয়পক্ষের অর্থ উদ্ঘাটিত হইয়াছে ; এবং তৃতীয় বিগ্রহ-পাল-পক্ষের অর্থোদ্ঘাটন-সময়ে টীকাকার বলিয়া দিয়াছেন,—দাহলাধিপতি কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করিয়া, তৃতীয় বিগ্রহ-পালদেব রণপরাজিত কর্ণকে উন্মূলিত না করিয়া, তাঁহাকে "রক্ষিত" করিয়াছিলেন। মূলের সহিত মিলাইয়া দেখিবার জন্য টীকাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা,—

[দশরথ-পক্ষে]

"সহসেত্যাদি। যো দশরথো যৌবনশ্রিয়া তরুণিমসংপত্ত্যা সহ ক্ষৌণীং মুদূহে। সহসা বিতরণেন অবলম্বিত-দানেন জিতঃ কর্ণঃ কানীনো যেন। অশ্রান্ত অপ্রাপ্তশ্রমো দান-বারাতীনাং দেবানাং শয়ঃ করো যস্মাৎ। অতএব হি অসুর-পরাজয়-সিদ্ধৈঃ বিবুধৈঃ করেণ প্রহরণ-গ্রহণ-শ্রমোঽপি নাসাদিতঃ। তথাহি বৃষানুচরঃ শচীসহচরানুচরোঽভূৎ।"

[বিগ্রহপাল-পক্ষে]

"অন্যত্র। যো বিগ্রহপালো যৌবনশ্রিয়া কর্ণস্য রাজ্ঞঃ সুতয়া সহ ক্ষৌণীমুদূঢ়বান্। সহসা বলেন অবিতো রক্ষিতো রণজিতঃ সংগ্রামজিতঃ কর্ণো দাহলাধিপতি র্যেন। রণজিত এব পরন্তু রক্ষিতো, ন উন্মূলিতঃ। কপালসন্ধি-ঘটনাৎ। দানবারো দান-সমুচ্চয়ো ভূমি-কাঞ্চন-কন্তি-তুরগাদিভির্নানাপ্রকারং দানং তস্য অতিশয়ঃ প্রাচুর্য্যং স চ অশ্রান্তোঽ-বিচ্ছিন্নো যস্য অত এব বৃষানুচরো ধর্ম্মানুগতঃ।"

টীকাকার এইরূপে সমসাময়িক ঐতি-হাসিক ঘটনার সন্ধান প্রদান না করিলে, মূল শ্লোক হইতে সম্যক্ অর্থ সহসা প্রতিভাত হইত না। শ্লেষের অনুরোধে কবি ইচ্ছামত শব্দ চয়ন করিতে পারেন নাই ;—যেরূপ শব্দ চয়ন করিলে, উভয়পক্ষের অর্থ প্রকাশিত হইতে পারে, সেইরূপ শব্দ চয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সকল শ্লিষ্ট কাব্যের অবস্থাই এইরূপ। তজ্জন্য সমসাময়িক ব্যক্তিগণের নিকট যে অর্থ অনায়াসলভ্য থাকে, উত্তর কালে টীকার অভাবে তাহা লুপ্ত হইবার আশঙ্কা থাকিয়া যায়। রামচরিতম্-কাব্যের যে অংশের টীকা পাওয়া যায় নাই, সেই অংশের শ্লোকাবলীর অর্থবোধে নানা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। কর্ণপরাজয়-কাহিনী রামচরিতের ভূমিকায় এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ; যথা,—

"Within a short time of the accession of Vigrahapala, he came in conflict with Karna, who was very severely beaten. His kingdom lay at the mercy of Vigrahapala. But Vigrahapala spared both the king and his kingdom. Karna entered into a treaty with him, acknowledging his supremacy ; and Karna's daughter Yauvanasri was married to Vigrahapala."

এই বিবাহোৎসব বিজয়োৎসব। কাব্যের

উপাদানরূপে গৃহীত হইলে, ইহা একখানি সরস কাব্যের আখ্যানবস্তুকে রসসিক্ত করিতে পারে। বাঙ্গালীর ইতিহাসের এই আখ্যানবস্তু এখনও সেরূপ মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। বেলাবো-লিপি আবিষ্কৃত হইবার পর, আরও একটু অধিক সমাচার প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে,—কর্ণের বীরশ্রীনাম্নী কন্যার সহিত বিক্রমপুরাধিপতি জাতবর্ম্মার বিবাহ হইয়াছিল। এইরূপে দাহলাধিপতি সকল বঙ্গভূমির সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। অতঃপর তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের শাসনকালে আর কোনও ঘটনা সংঘটিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেব কতকাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইতে পারে নাই। তাঁহার আমগাছী-লিপিতে তদীয় বিজয়রাজ্যের দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ সংবৎসরে ভূমিদানের কথা উল্লিখিত থাকায়, কেহ কেহ তাঁহার শাসনকালকে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র মনে করিয়া কালগণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার অনুকূল প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই; বরং কিছু কিঞ্চিৎ প্রতিকূল প্রমাণই দেখিতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তিন পুত্র,—জ্যেষ্ঠ দ্বিতীয় মহীপাল, মধ্যম শূরপাল ও কনিষ্ঠ রামপাল। রামপাল-পুত্র মদনপালদেবের মনহালি-লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—রামপাল তাঁহার জনকের "দীর্ঘ শাসন-সময়ে" শৈশব হইতেই বাহুবিক্রমের পরিচয় প্রদানে শত্রুরাজ্যকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের এই পুত্রত্রয় যৌবনশ্রীর গর্ভোৎপন্ন ছিলেন বলিয়া পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। বরং প্রসঙ্গাধীন বর্ণনায় মনে হইতে পারে,—তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের সহিত দাহলাধিপতি কর্ণের সংগ্রাম-সংঘর্ষ-সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রও বাহুবল প্রকাশিত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তৃতীয় বিগ্রহপালদেব যে [চিরং] দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন, এই স্পষ্ট প্রমাণের বিরুদ্ধে, তাঁহার শাসনকালকে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র বলিয়া কালগণনা না করাই যুক্তিযুক্ত।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের শাসনকাল গৌরবমণ্ডিত বলিয়াই উল্লিখিত হইবার যোগ্য। তাঁহার বাহুবল অল্প ছিল না। তাঁহার বাহুবলে দাহলাধিপতিও পরাভূত হইয়া, কন্যাদানে সন্ধি সংস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের শাসন-সময়েই আর একটা অচিন্তিতপূর্ব্ব বিপ্লবের বীজ ধীরে ধীরে লোকলোচনের অগোচরে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছিল। সে বিপ্লব এখন ইতিহাসে "কৈবর্ত্ত-বিপ্লব" নামে কথিত হইতেছে। তাহার কথাই রামচরিতম্-কাব্যের প্রধান কথা,—তাহার কথাই রামাবতী নির্ম্মাণের প্রধান কথা। সুতরাং তাহার আলোচনা অপরিহার্য্য। (ক্রমশ)

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

নারী

পূর্ণ-প্রস্ফুটিত শ্বেত-শতদল-সম
মাধুরী বিকাশি'
প্রথম যে দিন, নারি, মানবের গৃহে
দেখা দিলে আসি'—
নিশীথ-সমুদ্র পারে—সহসা যেমন
রবির উদয়—
সে দিন জাগিল বিশ্বে কি মহাপুলক,
অসীম বিস্ময়!

অনন্ত-বিস্তৃত এই গ্রহ-তারান্বিত
নিখিল ভুবনে,
কে জানিত এত শোভা—রহস্য অপার—
আছিল গোপনে!
হে নারি, তোমার দিব্য মুরতির মাঝে
লভিয়া উপমা—
সে দিন সার্থক হ'ল জগতের যত
বিচিত্র সুষমা!

উষার অরুণ রাগ বিম্বিত—তোমার
তরুণ অধরে,
নিবিড় কজ্জল-মেঘ—তরঙ্গিত ওই
কৃষ্ণ কেশস্তরে!
স্বচ্ছ স্নিগ্ধ আকাশের নীলিমা তোমার
প্রশান্ত নয়নে,
মুগ্ধ পূর্ণিমার শশী হেরে প্রতিরূপ
তোমার আননে!
সেই হ'তে, নারি, তোমা' কত ছন্দে গীতে
বন্দিয়াছে কবি,
কল্পনার শত বর্ণে চিত্রকর তব
আঁকিয়াছে ছবি।
শিল্পীর সাধনা নিত্য গড়িতে তোমার
অনিন্দ্য প্রতিমা,
কবিতা-সঙ্গীত-শিল্পে বিভাসিত, নারি,
তোমার মহিমা।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

সমালোচনা

উজানি—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রণীত। রাঢ়ের ক্ষুদ্র পল্লী উজানিতে বসিয়া কবি পল্লীজীবনের প্রাত্যহিক ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের রেখা-চিত্র আঁকিয়াছেন। সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে কবির উৎসর্গ-পত্র হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। —"মা, মহাকবি কবিকঙ্কণ তোমার উজানির গুণগৌরবগাথা, তোমার খুল্লনা, ধনপতি, শ্রীমন্তের অপূর্ব্ব কাহিনী—অমর সঙ্গীত তোমায় শুনাইয়াছেন। আজ তোমার ক্ষুদ্র কবি তোমার ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের কথা তোমায় শুনাইবে।" আমাদের মনে হয়, কবির এই উৎসর্গ-পত্রই সমস্ত গ্রন্থখানির key-note. বাস্তবিক, বাংলার এই ছায়াশীতল, শান্তি-সৌন্দর্য্যপূর্ণ গ্রামের ও গ্রামবাসীর যে চিত্র কবি আমাদের আজ শুনাইয়াছেন, তাহা আধুনিক কৃত্রিমতাপূর্ণ কবিতার দিনে একান্ত দুর্ল্লভ। পল্লীগ্রামবাসী আমরা, এ কবিতাগুলি

পড়িতে পড়িতে, মনে হয় আমরা যে দিন হারাইয়াছি—তাহা আবার যেন ফিরিয়া পাই—আবার সেই বাল্যকালের স্নেহময়ী পল্লীমাতার মুখখানি যেন আমাদের চোখের সাম্নে আসিয়া দাঁড়ায় চক্ষু জলে ভরিয়া আসে। স্বর্গীয় ঔপন্যাসিক শ্রীশচন্দ্রের পরে—আমাদের খাঁটি বাংলার নিখুঁত চিত্র বঙ্গভাষায় আর কেহ আঁকিয়াছেন কি না, জানি না। আজ 'উজানি'র কবি—সেই বাংলার রেখা-চিত্র লইয়া উপস্থিত—ইহাতে রংয়ের বাহুল্য, বৃহৎ উদ্দেশ্যের জটিলতা নাই বটে; কিন্তু তিনি যে সামান্য রেখাপাতে খাঁটি বাংলার এবং খাঁটি বাঙ্গালীর প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের চিত্র আঁকিয়াছেন—তাহা আমাদের হৃদয়ে এমন একটা স্থান স্পর্শ করিয়াছে, যাহা বহুদিনের হারান পুরাতন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও প্রিয়জনের জন্য গোপনে রক্ষিত ছিল। 'উজানি' পড়িতে পড়িতে আমাদের মনে হইতেছিল—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বম্
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥"

দধীচি (নাটক)—শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায় বি, এল, বি প্রণীত। মূল্য (কাগজের মলাট) ১৲ টাকা। দেবাসুর-যুদ্ধে দেবগণের কল্যাণার্থ মহর্ষি দধীচির আত্মদানের ঘটনা লইয়া এই নাটক রচিত। গ্রন্থকার নিবেদনে বলিয়াছেন—"ভক্তি ভিন্ন দেবজয় সম্ভব নয়; ভক্তি-বলে ভক্ত ভগবান্‌কেও ভয় করে না। বৃত্র যে কেবল পশুবলেই স্বর্গ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি না; তাই ধর্ম্মের, ভক্তির ভিত্তির উপরে বৃত্র-চরিত্র স্থাপন করিয়াছি।" গ্রন্থের উপপাদ্য বিষয়—অধর্ম্মাশ্রিত অহঙ্কৃত দেবগণের পতন ও দুর্দ্দশা এবং ধর্ম্মাশ্রয়ে পুনরায় তাঁহাদের উত্থান; বৃত্র 'মাত্র উপলক্ষ বিশ্বের বিধানে।' দেবাসুর-যুদ্ধের নামে যে বিভীষিকার চিত্র, ভীমকান্তি কঠোর দানবরাজের যে ছবি, স্বতঃই আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে—এখানে তাহার কিছুই দেখিলাম না। তাণ্ডবলীলারত রুদ্রের পশ্চাতে শিবের শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি, বজ্রপীড়িত শুরুগম্ভীর বরষার বর্ষণের পর ধরিত্রীর শান্তশ্রী—সে ছবি তেমন ভাল ফুটে নাই। তেজোহীন, নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত বৃত্র যেন অনাসক্ত মুমুক্ষু যোগীর ন্যায়। কোথাও তাহার চরিত্রের একটা স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া ওঠে নাই। বৃত্র ভক্ত বটে, কিন্তু ভক্তির তেজ তাহাতে নাই, তেজের গৌরবও নাই। বৃত্র-চরিত্রে সামান্য মানবের মত এতটা পরাধীনতার ভাব—এতটা আত্মশক্তির অভাব আমরা দেখিতে চাই না। আত্মশক্তির বিকাশের সহিত যে ধর্ম্মের ও ভক্তির সমন্বয়, তাহাই যথার্থ স্পৃহণীয়। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে নিষ্ক্রিয়তা—অনাসক্তির কথা অনেক শুনিয়াছি,—সকল চরিত্রকেই এক তুলিকায় আঁকিলে চলিবে না। নাটকটি মুখ্যতঃ ভক্তিমূলক। শচী, দধীচি, বৃত্র, জয়া, শান্তি—সবই এক ছাঁচে ঢালা;—ইন্দ্রের চরিত্র চলিত কিংবদন্তীর (tradition) অনুরূপই হইয়াছে। তবে, ভক্তি-মূলক নাটক হিসাবে ইহা ভাল হইয়াছে। ইহাতে ভাব আছে, ভাষা স্বচ্ছন্দগামী, লিপিচাতুর্য্যও আছে, ছাপা কাগজও পরিষ্কার।

প্রিন্টার—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী, মেট্‌কাফ প্রেস, ৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ত্রয়োদশ বর্ষ]   কার্ত্তিক, ১৩২০   [৭ম সংখ্যা

(নব পর্য্যায়)

মাসিক পত্র

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত

কলিকাতা, ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

মজুমদার লাইব্রেরি হইতে এস্ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বর্ত্তমান সংখ্যার মূল্য ।/০   অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩।৵০

১৩শ বর্ষ] বঙ্গদর্শন [কার্ত্তিক, ১৩২০

সূচী

কভার ও বিজ্ঞাপন—মেট্‌কাফ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত এবং ১ হইতে ৯ ফর্ম্মা—মেট্‌কাফ প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন

নিমাই-চরিত্র

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বিদ্যানগর ত্যাগ করিয়া—গৌর দক্ষিণাভিমুখ হইয়া চলিলেন। দাক্ষিণাত্যে কর্ম্মী, জ্ঞানী, বৌদ্ধ, রামানুজ, শ্রীবৈষ্ণব, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বহুবিধ সম্প্রদায়াবলম্বী লোক ছিল। গৌর সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লোককেই স্বীয়-মতাবলম্বী করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রথমে গৌতমী গঙ্গায় স্নান করিয়া গৌর মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে মহেশ দর্শন করিলেন। তথা হইতে আহোবলমনগরে নৃসিংহমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সিদ্ধিবটে গমন করতঃ সীতাপতি-মূর্ত্তিকে নমস্কার করিলেন। সিদ্ধিবটে এক রামোপাসক ব্রাহ্মণ গৌরের আতিথ্য সৎকার করেন। ব্রাহ্মণ একমাত্র রামনাম ভিন্ন অন্য কোনও নাম গ্রহণ করিতেন না। সিদ্ধিবট হইতে গৌর স্কন্দক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং তথায় স্কন্দ দর্শন করিয়া ত্রিমঠে গমন করতঃ ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। ত্রিমঠ হইতে গৌর সিদ্ধিবটে প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত রামোপাসক ব্রাহ্মণের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ গৌরকে প্রণাম করিয়া কহিলেন "তোমাকে দর্শন করা অবধি কৃষ্ণনাম আমার রসনায় বসিয়া গিয়াছে। আমি রামনাম ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়াছি।" সিদ্ধিবট হইতে গৌর বৃদ্ধকাশী গমন করিয়া শিবদর্শন করিলেন এবং বৃদ্ধ-কাশীর সন্নিহিত একগ্রামে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া তার্কিক, মীমাংসক, মায়াবাদী, স্মার্ত্ত, পৌরাণিক প্রভৃতি বহুবিধ পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া এক বৌদ্ধাচার্য্য গৌরের সহিত তর্ক করিবার উদ্দেশ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তর্কে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। তখন বহু বৌদ্ধ মিলিয়া গৌরকে অপদস্থ করিবার জন্য এক ষড়যন্ত্র করিল। তাহারা এক পাত্রে অপবিত্র অন্ন স্থাপন করিয়া বিষ্ণুপ্রসাদ বলিয়া তাহা গৌরকে দিতে আনিল। কিন্তু অকস্মাৎ এক মহাকায় পক্ষী অন্তরীক্ষ হইতে আপতিত হইয়া সেই অন্নসহ পাত্র লইয়া আকাশমার্গে পুনরুত্থিত হইল। অনতিবিলম্বেই সমস্ত অন্ন বৌদ্ধগণের শিরে এবং সেই ধাতুপাত্র বৌদ্ধাচার্য্যের মস্তকে পতিত হইল। আচার্য্য মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। মূর্চ্ছা

ভক্তে স্বীয় অপচার হৃদয়ঙ্গম করিয়া আচার্য্য সশিষ্যে গৌরের শরণ গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার নিকট কৃষ্ণনাম লইয়া কৃতার্থ হইলেন।

ত্রিপদী ত্রিমল্লে যাইয়া গৌর চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিলেন এবং বেঙ্কটগিরি হইয়া ত্রিপদীনগরে যাইয়া রামসীতাকে নমস্কার করিলেন। অতঃপর পানা নরসিংহ দর্শন পূর্ব্বক শিবকাঞ্চী, ত্রিমল্ল, ত্রিকালহস্তী, পক্ষতীর্থ, বৃদ্ধকেরল, পীতাম্বর, শিয়ারী ভৈরবী, প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া কাবেরী গমনপূর্ব্বক বহুসংখ্যক শৈবকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। দেবস্থান, কুম্ভকর্ণ শিবক্ষেত্র, পাপনাশন ভ্রমণ করিয়া শ্রীরঙ্গ-ক্ষেত্রে গমন করতঃ গৌর রঙ্গনাথের সম্মুখে বহুক্ষণ নৃত্যগীত করিলেন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গৌর বেঙ্কট ভট্টনামক এক শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে চারিমাস অবস্থিতি করিলেন। বহুসংখ্যক লোক তথায় তাঁহার নিকট কৃষ্ণ-নাম গ্রহণ করিল। তথায় এক ব্রাহ্মণ দেবালয়ে বসিয়া প্রত্যহ গীতা পাঠ করিতেন। তাঁহার অশুদ্ধ উচ্চারিত গীতাপাঠ শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে উপহাস করিত। কিন্তু ব্রাহ্মণের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। গৌর দেখিলেন গীতাপাঠের সময় ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন, তাঁহার শরীরে অশ্রু, স্বেদ, কম্প প্রভৃতি সাত্বিক সমস্ত লক্ষণ আবির্ভূত হইত, এক দিন গৌর ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গীতার কি অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপনি এত আনন্দলাভ করেন?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন "আমি মূর্খ; শব্দার্থ আমি কিছুই জানি না। শুদ্ধ অশুদ্ধ কিছুই বুঝি না। কিন্তু যতক্ষণ গীতা পাঠ করি, দেখিতে পাই শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে সারথিবেশে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন। তাই আমার এত আনন্দ।" "তোমারই গীতাপাঠ সার্থক।" বলিয়া গৌর ব্রাহ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। গৌর যতদিন রঙ্গক্ষেত্রে ছিলেন ব্রাহ্মণ তদবধি তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই।

বেঙ্কট ভট্ট লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক ছিলেন। গৌর একদিন হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"ভট্ট, তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ত পতিব্রতার শিরোমণি; কিন্তু তিনি গোপবালক কৃষ্ণের সঙ্গম লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন কেন বলিতে পার?" ভট্ট কহিলেন—"কৃষ্ণ ও নারায়ণ ত একই, সুতরাং লক্ষ্মীর কৃষ্ণসঙ্গম-কামনায় কোনও দোষ হইতে পারে না।"

গৌর বলিলেন—"শাস্ত্রে আছে, লক্ষ্মী কৃষ্ণের সহিত রাসকেলি করিতে অধিকার পান নাই। কিন্তু শ্রুতিগণ তপস্যা করিয়া সে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহার কারণ কি?"

ভট্ট কহিলেন—"এ সমস্ত আমার বুদ্ধির অগম্য। তুমি দয়া করিয়া বুঝাইয়া দাও।"

গৌর কহিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাধুর্য্যে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন। ব্রজবাসিগণ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিত না। কেহ তাঁহাকে পুত্রজ্ঞানে উদূখলে বাঁধিয়াছে; কেহ সখাজ্ঞানে তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছে, ব্রজবাসী তাঁহাকে ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া জানিত, তাঁহার ঐশ্বর্য্যজ্ঞান তাহা-দিগের ছিল না। এই ব্রজবাসীর ভাবে যে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করে, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন

প্রাপ্ত হয়। শ্রুতিগণ গোপীদেহ গ্রহণ করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভজনা করিয়াছিলেন, তাই কৃষ্ণসঙ্গে রাসলীলার অধিকারী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ গোপ, তাঁহার প্রেয়সীও গোপী। দেবী অথবা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ স্বীকার করেন না। শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী-দেহে রাসবিলাস কামনা করিয়াছিলেন; তাই সফলকামা হইতে পারেন নাই। ভট্ট সন্দেহ করিও না—কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্; শ্রীনারায়ণ তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।

ভাগবত ১।৩।২৮

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন।
গোপীকার মন হরিতে নারে নারায়ণ॥

ভট্টের বিশ্বাস ছিল—নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্, এবং শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গৌরের বচনে তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ হইল। তাহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া গৌর কহিলেন "ভট্ট, দুঃখিত হইও না। শাস্ত্রের যাহা সিদ্ধান্ত তাহাই তোমাকে বলিলাম। কৃষ্ণ-নারায়ণে ভেদ নাই। গোপী ও লক্ষ্মী অভিন্ন। ঈশ্বরত্বে ভেদ স্বীকার করিলে অপরাধ হয়। একই বিগ্রহ নানারূপ ধারণ করেন।"

"তোমার কৃপায় ঈশ্বর-তত্ত্ব বুঝিলাম" বলিয়া ভট্ট গৌরের চরণে প্রণত হইলেন।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গৌর ঋষভ-পর্ব্বত পর্য্যন্ত গমন করিলেন। তথায় পরম ভাগবত পরমানন্দ পুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তথা হইতে শ্রীশৈল ও কামকোষ্ঠী হইয়া দক্ষিণ মথুরায় গমন করিলেন। এই শেষোক্ত স্থলে গৌর এক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইলেন। কিন্তু মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলেও ব্রাহ্মণ রন্ধনের কোনও আয়োজন করিলেন না। গৌর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রাহ্মণ কহিলেন—"প্রভু, আমি অরণ্যবাসী, সম্প্রতি অরণ্যে ভক্ষ্য দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। লক্ষ্মণ ফলমূল আহরণার্থ গমন করিয়াছেন; তিনি ফিরিয়া আসিলে সীতা রন্ধনের আয়োজন করিবেন।" রামোপসক ব্রাহ্মণের রামৈকচিত্ততা দেখিয়া গৌর প্রীত হইলেন। ব্রাহ্মণ অবশেষে রন্ধন করিয়া গৌরকে ভোজন করাইলেন, কিন্তু নিজে কিছুই গ্রহণ করিলেন না। গৌর পুনরায় কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রাহ্মণ কহিলেন—"রাক্ষস রাবণ জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতাদেবীর অঙ্গস্পর্শ করিয়াছে, এই দুঃখে আমার শরীর জ্বলিয়া যাইতেছে। আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া জীবন ত্যাগ করিব।" তাহাকে প্রবোধ দিয়া গৌর কহিলেন—"রাবণের সাধ্য কি লক্ষ্মীস্বরূপিণী ঈশ্বরপ্রেয়সী চিদানন্দমূর্ত্তি সীতাকে স্পর্শ করে? তাঁহাকে দেখিবার শক্তিই তাহার নাই, স্পর্শ ত দূরের কথা। রাবণ আসিবার পূর্ব্বেই সীতা অন্তর্হিত হইয়াছিলেন; রাবণ মায়া-সীতাকে হরণ করিয়াছিল। বেদপুরাণের ইহাই অভিমত। বিশ্বাস কর এবং দুর্ভাবনা ত্যাগ করিয়া ভোজন কর।" ব্রাহ্মণ ভোজন করিলেন। গৌর তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া দুর্ব্বেশন গমন করিলেন ও তথা হইতে মহেন্দ্র শৈলে পরশুরাম দর্শন করিয়া সেতুবন্ধে আসিয়া ধনুতীর্থে স্নান করিলেন। তদনন্তর রামেশ্বর-তীর্থে গমন করতঃ তথায় কয়েক দিন বিশ্রাম

করিলেন। রামেশ্বরে এক ব্রাহ্মণ-সভায় কূর্ম্মপুরাণ পাঠ শুনিতে গিয়া গৌর পতিব্রতার উপাখ্যান মধ্যে রাবণ-কর্ত্তৃক মায়াসীতা-হরণ বৃত্তান্ত শুনিয়া নিজের পূর্ব্বকৃত ব্যাখ্যার পোষক প্রমাণ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সেই পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দক্ষিণ মথুরায় গমন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত রামোপাসককে দান করিলেন। বিপ্র পরম সন্তুষ্ট হইয়া গৌরের নানা-স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। তথা হইতে গৌর পাণ্ড্যদেশান্তর্গত তাম্রপর্ণী গমন করিলেন। তৎপরে তিনি যে সমস্ত স্থানে গমন করিলেন তাহার নাম—নয়ত্রিপদী, চিয়ড়তালা, তিলকাঞ্চী, গজেন্দ্রমোক্ষণ, পানাগড়ি, কামতাপুর, শ্রীবৈকুণ্ঠ, মলয়পর্ব্বত, কন্যাকুমারী এবং আমলকীতলা। শেষোক্ত স্থান হইতে গৌর মল্লারদেশে গমন করিলেন। তথায় ভট্টমারী নামে এক ধর্ম্মসম্প্রদায় ছিল। গৌরের সঙ্গে কৃষ্ণদাস নামে যে ব্রাহ্মণ ছিল, ভট্টমারিগণ স্ত্রী ও ধনের লোভ দেখাইয়া, তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া গেল। গৌর ভট্টমারিগণের নিকট যাইয়া কৃষ্ণদাসকে প্রত্যর্পণ করিতে কহিলেন। প্রত্যর্পণ করা দূরের কথা—ভট্টমারিগণ তাঁহাকে অস্ত্রশস্ত্র-সহ আক্রমণ করিল। কিন্তু তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র হাত হইতে পড়িয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। ভট্টমারিগণ ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। গৌর কৃষ্ণদাসকে কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক লইয়া প্রস্থান করিলেন এবং সেই দিনই পয়স্বিনী নদীর তীরস্থ এক গ্রামে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইস্থানে আদিদেব কেশব-মন্দিরে তাঁহার নৃত্য-কীর্ত্তন দেখিয়া বহুলোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। এইখানে "ব্রহ্মসংহিতা" নামক এক ভক্তিপূর্ণ গ্রন্থ পাইয়া গৌর অতি যত্নের সহিত তাহা লেখাইয়া লইলেন। অনন্তর অনন্ত পদ্মনাভ, শ্রীজনার্দ্দন, পয়োষ্ণী, শৃঙ্গগিরি ভ্রমণ করিয়া গৌর উদিপী আসিয়া উড়ুপকৃষ্ণ দর্শন করিলেন। মধ্বাচার্য্য এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতা এবং তদীয় শিষ্য তত্ত্ববাদিগণ এই মূর্ত্তির সেবক। সেই নৃত্যপর গোপালমূর্ত্তি দেখিয়া গৌর প্রেমোন্মত্ত হইয়া বিস্তর নৃত্য-গীত করিলেন। তত্ত্ববাদিগণ মায়াবাদী সন্ন্যাসী মনে করিয়া, প্রথমে তাঁহার সহিত আলাপ করেন নাই। অবশেষে তাঁহার প্রেমাবেশ দেখিয়া পরম যত্নে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা গৌরের সহিত সাধ্যসাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে আলাপ করিয়া মুগ্ধ হইলেন। তথা হইতে গৌর অনন্ততীর্থ, ত্রিতকূপ, বিশালা, পঞ্চাপ্সরা, গোকর্ণ দ্বৈপায়নী, সূর্পারক, কোলাপুর ও পাণ্ডুপুর গমন করিয়া তত্রত্য দেবমূর্ত্তি সমুদয় দর্শন করিলেন। পাণ্ডুপুরে মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া গৌর পরম প্রীত হইলেন। গৌর যখন তাঁহাকে প্রেমাবেশে প্রণাম করিলেন, তখন শ্রীরঙ্গপুরী কহিলেন "শ্রীপাদ, নিশ্চয় আমার গুরুর সহিত তোমার সম্বন্ধ আছে, অন্যত্র এরূপ প্রেম দুর্লভ।" গৌর ঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধের কথা ব্যক্ত করিলেন। মাধবপুরীর সহিত শ্রীরঙ্গপুরী একবার নবদ্বীপে গমন করিয়া জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। গৌরের জন্মস্থানের পরিচয় পাইয়া তিনি প্রসঙ্গক্রমে শচীদেবীর প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনের প্রশংসাবাদ করিয়া কহিলেন—

"তাঁহার এক পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণান্তর শ্রীশঙ্করারণ্য নাম পরিগ্রহ করিয়া পাণ্ডুপুরে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" শুনিয়া গৌর কহিলেন, "পূর্ব্বাশ্রমে শঙ্করারণ্য আমার ভ্রাতা ছিলেন।" শ্রীরঙ্গপুরী তথা হইতে দ্বারকায় গমন করিলেন—গৌর পাণ্ডুপুরে কিছু দিন অবস্থান করিয়া পুনরায় বহির্গত হইলেন—এবং কৃষ্ণ-বেণা নদীতীরে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তথায় "কৃষ্ণকর্ণামৃত" নামক সুন্দর গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া লইলেন। মাহিষ্মতী, ধনুতীর্থ, ঋষ্যমুখ, পম্পাসরোবর, পঞ্চবটী, নাসিত্র্যম্বক, ব্রহ্মগিরি, কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে গৌর বিস্তানগরে প্রত্যাগত হইয়া রামানন্দের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলেন। গৌর রামানন্দকে ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থদ্বয় প্রদান করিলেন। রামানন্দ কহিলেন "তোমার নিদেশমত আমি রাজাকে লিখিয়াছিলাম। রাজা আমাকে নীলাচলে যাইতে আদেশ দিয়াছেন। আমি যাইবার আয়োজন করিতেছি। তুমি আগমন কর, দিন দশ মধ্যে আমি নীলাচলে উপস্থিত হইব।" গৌর অচিরে নীলাচলে প্রত্যাগত হইয়া উৎকণ্ঠিত ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

নীলাচলে প্রত্যাগমন,উৎকলীয় ভক্তগণের সহিত মিলন, গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচলে আগমন,রথযাত্রা মহোৎসব

গৌর দাক্ষিণাত্যভ্রমণে বহির্গত হইলে সার্ব্বভৌম রাজা প্রতাপরুদ্রকে বলিয়া জগন্নাথমন্দিরের সন্নিধানে একটী গৃহ গৌরের বাসের জন্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। গৃহটী কাশীমিশ্রের। গৌর অবস্থান করিবেন শুনিয়া কাশীমিশ্র সানন্দে গৃহ দান করিয়াছিলেন। গৌর প্রত্যাগত হইয়া সেই গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

নীলাচলের বহু ভক্ত উৎকণ্ঠিতভাবে গৌরের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সার্ব্বভৌম একে একে সকলের সহিত গৌরের পরিচয় করাইয়া দিলেন। জগন্নাথের সেবক জনার্দ্দন, জগন্নাথের স্বর্ণবেত্রধারী কৃষ্ণদাস, লেখক শিখি মাইতি, তাহার ভ্রাতা মুরারি, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, সিংহেশ্বর মুরারি, প্রহররাজ মহাপাত্র, পরমানন্দ মহাপাত্র প্রভৃতি সকলেই আসিয়া একে একে গৌরের চরণে প্রণত হইলেন। রামানন্দ রায়ের পিতা ভবানন্দ চারি পুত্র সহ আসিয়া গৌরকে প্রণাম করিলেন এবং পুত্র বাণীনাথ পট্টনায়ককে তাঁহার সেবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর গৌর কৃষ্ণদাসকে আহ্বান করিয়া তাহার ভট্টমারি-গণের সহিত প্রস্থান ও উদ্ধারবৃত্তান্ত বর্ণনা পূর্ব্বক কহিলেন "এখন তোমাকে আমি বিদায় দিতেছি। যথা ইচ্ছা তথায় যাইতে পার।" অনুতপ্ত হইয়া কৃষ্ণদাস রোদন করিতে লাগিল। তখন নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ গৌরের প্রত্যাগমন সংবাদ প্রদান করিবার জন্য গৌরের অনুমতি লইয়া তাহাকে নবদ্বীপে প্রেরণ করিলেন।

যথাকালে কৃষ্ণদাস নবদ্বীপে পৌছিয়া শচীমাতা ও অন্যান্য সকলকে গৌরের নীলাচল প্রত্যাগমনসংবাদ প্রদান করিল। ভক্তগণ নীলাচলে গমনের আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইলেন। পরমানন্দ পুরী তখন নবদ্বীপে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে পুরুষোত্তমে আসিয়া গৌড়ীয় ভক্তগণের

আগমনবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। গৌর স্বীয় ভবনের একটী ঘর পরমানন্দের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

পুরুষোত্তম আচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে গৌরের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। গৌরের সন্ন্যাসগ্রহণের পরে তিনিও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ কালে তিনি স্বরূপ দামোদর নাম গ্রহণ করেন। গৌর তীর্থ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগত হইলে স্বরূপ প্রেমবিহ্বল অবস্থায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌর পরম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া, আপনার সহিত বাস করিবার অনুমতি দিলেন। স্বরূপ অনতিকালমধ্যেই গৌরের প্রধান সেবক রূপে পরিগণিত হইলেন। কেহ কোনও সঙ্গীত অথবা কবিতা রচনা করিয়া গৌরকে দেখাইতে আসিলে স্বরূপ তাহা পরীক্ষা করিয়া দিতেন। তাঁহার অভিমত হইলে তবে তাহা গৌরসকাশে পঠিত ও গীত হইতে পারিত।

কতিপয় দিবসান্তে গোবিন্দ নামক শূদ্রবংশীয় এক ব্যক্তি গৌরের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল "আমি ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য ছিলাম। পুরী মৃত্যুকালে আমাকে তোমার সেবা করিবার আদেশ দিয়া গিয়াছেন, আমাকে গ্রহণ কর।" গুরুর সেবকের সেবা গ্রহণ করিতে গৌর প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন; পরিশেষে গুরুর আদেশ পালনার্থ গোবিন্দকে সেবকরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

একদিন মুকুন্দ দত্ত আসিয়া সংবাদ দিল ব্রহ্মানন্দ ভারতী নামক একজন বিশিষ্ট ভক্ত গৌরের সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। গৌর অনতিবিলম্বে ভারতীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিয়া দেখিলেন, ভারতী মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া আছেন। বৈষ্ণবের চর্ম্মাম্বর দেখিয়া গৌর বিরক্ত হইলেন এবং মুকুন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ভারতী গোসাঞি কোথায়?" মুকুন্দ ভারতীকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিলেন। গৌর কহিলেন "তোমার কথা অসম্ভব! ভারতী কেন চর্ম্ম পরিধান করিবেন?" ভারতীর অনুতাপ উদ্রিক্ত হইল এবং তিনি চর্ম্মাম্বর বর্জ্জন করিয়া বহির্ব্বাস গ্রহণ করিলেন। তদবধি ব্রহ্মানন্দ ভারতী গৌরের সহিত একত্রাবস্থান করিতে লাগিলেন।

দুইশত ভক্ত নবদ্বীপ হইতে গৌরের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের আগমনের সংবাদ পাইয়া গৌর স্বরূপ দামোদর ও গোবিন্দকে তাঁহাদিগকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনিতে প্রেরণ করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর বিদ্যানিধি, গদাধর পণ্ডিত, আচার্য্যরত্ন, পুরন্দর আচার্য্য, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, শঙ্কর পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, নারায়ণ পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, হরি ভট্ট, শ্রীনৃসিংহানন্দ, বাসুদেব দত্ত, শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, রাঘব পণ্ডিত, শ্রীমান্ পণ্ডিত, শ্রীকান্ত, শ্রীধর, বল্লভ সেন, পুরুষোত্তম সঞ্জয়, কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ খান, রামানন্দ বসু, মুকুন্দ দাস, নরহরি, রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব, সুলোচন প্রভৃতি ভক্তগণ পুরুষোত্তমে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথের মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। স্বরূপ ও গোবিন্দ যাইয়া প্রথমে অদ্বৈতাচার্য্যের

গলদেশে মাল্য দান করিলেন। পুরীরাজ প্রতাপরুদ্র ভক্তগণের দর্শনলালসায় রাজ-প্রাসাদের উপরিভাগে দণ্ডায়মান ছিলেন—গোপীনাথ আচার্য্য একে একে সকলের পরিচয় দিতে লাগিলেন। গৌর নিজগণ সহ বহির্গত হইয়া পথি মধ্যে ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন, এবং প্রথমে অদ্বৈতাচার্য্যকে গাঢ় আলিঙ্গন দান করিয়া একে একে সকলকেই আলিঙ্গন করিলেন। অবশেষে সকলকে লইয়া স্বীয় আবাসে উপনীত হইলেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলে গৌর কিছু ক্ষণ সকলেরই সহিত নানাবিধ ভাবালাপ করিলেন। অনন্তর দক্ষিণ দেশ হইতে আনীত "ব্রহ্ম-সংহিতা" ও "কৃষ্ণকর্ণামৃত" গ্রন্থদ্বয় বাসুদেব ঘোষকে প্রদান করিয়া কহিলেন "তোমার জন্যই আমি গ্রন্থ দুই খানি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি।" সকলের সহিত কুশল প্রশ্ন শেষ হইলে গৌর হরিদাসকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। দূর হইতে গৌরকে দেখিয়া হরিদাস কৃতার্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গৃহে প্রবেশ করেন নাই, গৃহসমীপে রাজপথে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। গৌরের আদেশে কয়েক জন ভক্ত তাঁহাকে লইতে আসিলেন। কিন্তু হরিদাস কহিলেন—"আমি পাপিষ্ঠ যবন, আমার মন্দিরের নিকট যাইবার অধিকার নাই।" গৌর এই কথা শুনিয়া তাঁহার গৃহসন্নিহিত উদ্যানস্থ একটী ঘর কাশীমিশ্রের নিকট হইতে হরিদাসের জন্য চাহিয়া লইলেন এবং স্বয়ং হরিদাসের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে প্রেমা-লিঙ্গন দান করতঃ সেই গৃহে আনিয়া স্থাপিত করিলেন। এখানে প্রত্যহ হরিদাসের জন্য গৌর খাদ্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত নৃত্যগীত-কীর্ত্তনে কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। এ দিকে রথযাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে গৌর সার্ব্বভৌম, কাশীমিশ্র ও উড়িষ্যাপাত্রকে ডাকাইয়া তাঁহাদের নিকট স্বয়ং গুণ্ডিচামন্দির * মার্জ্জনা করিবার অনুমতি চাহিলেন। সার্ব্বভৌমাদি গৌরের ইচ্ছায় সম্মতি দান করিয়া মন্দিরমার্জ্জনার্থ পর্য্যাপ্ত কলসী ও সম্মার্জ্জনীর আয়োজন করিয়া দিলেন। প্রচুর উল্লাসে ভক্তগণের সহিত গৌর গুণ্ডিচামন্দির মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া দিলেন এবং মার্জ্জন শেষ হইলে সকলের সহিত ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে জলকেলি করিলেন।

রথযাত্রার দিন সমাগত হইল। প্রাতঃ স্নানান্তে ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া গৌর জগন্নাথের বিজয়োৎসব দর্শন করিলেন। বলিষ্ঠ দয়িতগণ জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামকে মন্দিরবহির্ভাগে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের কটিদেশে পট্টডোরী বন্ধন করিল এবং সেই পট্টডোরী সহযোগে তাঁহাদিগকে বহন করিয়া লইয়া সুসজ্জিত রথে স্থাপন করিল। অমনি চতুর্দ্দিকে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে "জয় জগন্নাথ, জয় মহাপ্রভু" ধ্বনিত হইল। স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র সপারিষদ স্বর্ণমার্জ্জনী হস্তে রথাগ্রে পথ পরিষ্কার করিয়া

---

* রথযাত্রার সময় যে মন্দিরে জগন্নাথমূর্ত্তি স্থাপিত হয়, তাহার নাম গুণ্ডিচামন্দির। শ্রীমন্দির হইতে ইহা প্রায় এক মাইল দূরে—ইন্দ্রদ্যুম্নদীর্ঘিকাতীরে অবস্থিত।

তদুপরি চন্দন-জল সেচন করিলেন, গৌড়ীয়গণ রথাকর্ষণ করিতে লাগিল। রথ গুণ্ডিচাভিমুখে অগ্রসর হইল। স্বীয় ভক্তগণকে চারিদলে বিভক্ত করিয়া গৌর চারিটী কীর্ত্তনসম্প্রদায় গঠন করিলেন। ইহারা রথের অগ্রে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিল। এতদ্ব্যতীত আরও তিন সম্প্রদায় রথের দুই পার্শ্বে ও পশ্চাতে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। গৌর সাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ নৃত্য করিয়া শ্রীবাস, রামাই, স্বরূপ প্রভৃতি দশজন প্রধান গায়ককে লইয়া গৌর স্বয়ং কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে যুক্ত করে জগন্নাথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গৌর ভক্তিব্যাকুল কণ্ঠে স্তব পাঠ করিলেন।

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"
"জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ।
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ॥"
"জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো।
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥"
"জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো।
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।"
"স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন।
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥"
"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো
ন শূদ্রো।
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্ন বনস্থো যতি র্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস দাসানুদাসঃ॥"

স্তব পাঠ শেষ হইলে গৌর হুঙ্কার পূর্ব্বক উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য গৌরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতে লাগিলেন। হরিদাস কেবল "হরিবোল" "হরিবোল" বলিতে লাগিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র পলকহীন দৃষ্টিতে নৃত্য দর্শন করিতেছিলেন। গৌরকে প্রথম দর্শনাবধিই তাঁহার মন শ্রীগৌরের প্রতি নিরতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছিল, অধুনা ভক্তসহ গৌরের নৃত্য দর্শন করিয়া তিনি প্রেমে বিভোর হইয়া পড়িলেন। বয়স্য হরিচন্দনের স্কন্ধদেশে হস্ত ন্যস্ত করিয়া তিনি নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহাতে পশ্চাৎস্থিত শ্রীবাস পণ্ডিতের নৃত্যদর্শনের ব্যাঘাত হইতেছিল। শ্রীবাস হরিচন্দনের গাত্রস্পর্শ করিয়া তাহাকে সরিয়া যাইতে কহিলেন—কিন্তু গৌরের নৃত্য দেখিতে দেখিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হওয়ায় শ্রীবাসের কথা হরিচন্দনের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল না। শ্রীবাস নৃত্যদর্শনের বিঘ্ন দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া হরিচন্দনকে চপেটাঘাত করিলেন। তখন হরিচন্দন প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীবাসের অসমসাহসিকতায় প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু প্রতাপরুদ্র তাহাকে নিষেধ করিলেন।

দর্শক সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গৌরের অমানুষিক ভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন। দামোদর গাহিয়া উঠিলেন—

"সেই ত পরাণনাথে পাইনু,
যার লাগি মদন দাহনে ঝুরি গেনু॥"

গৌরের তদানীন্তন মানসিক অবস্থার সহিত গান মিলিল। গৌর বিরহাকুল হইয়া রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। জগন্নাথের বিরাট রথ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। গৌর নাচিতে নাচিতে পড়িতে লাগিলেন—

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি
বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতী-
সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র
সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসী-
তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥"
"আহুশ্চ তে নলিননাভপদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈ হৃদি বিচিন্ত্যমাগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥"
"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥",

রেবাতটে বেতসী-তরুতলে শ্রীকৃষ্ণসহ বিহারের জন্য রাধাভাবাবিষ্ট গৌরের চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বিরহবিধুর হইয়া তিনি ভূমিতলে উপবেশন করতঃ তর্জ্জনী দ্বারা মৃত্তিকায় লিখিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরেই দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য করিতে করিতে রাজা প্রতাপরুদ্রের সম্মুখে গিয়া পতিত হইলেন।

গৌর যখন দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন—তখন অবধিই প্রতাপরুদ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। কিন্তু গৌর সন্ন্যাসী, তিনি রাজদর্শন করিবেন না বলিয়া সার্ব্বভৌম তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। গৌর নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলে, একদিন সার্ব্বভৌম তাঁহাকে রাজার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিরক্ত হইয়া গৌর বলিয়াছিলেন পুনরায় তাঁহাকে কেহ রাজদর্শনের কথা বলিলে তিনি নীলাচল ত্যাগ করিয়া যাইবেন। রামানন্দ রায় পুরীতে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার নিকট নানারূপ বিলাপ করিয়া গৌরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তখন রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম গৌরের প্রতি রাজার প্রগাঢ় ভক্তি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন "ভক্তাধীন গৌর কখনও ভক্তের আকুল ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিবেন না। রথযাত্রার দিন যখন তিনি রথাগ্রে নৃত্য করিবেন, তখন দীনবেশে তাঁহার চরণ ধারণ করিলে, তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে আলিঙ্গন দান করিবেন।" আজ নৃত্য করিতে করিতে গৌর যখন প্রতাপরুদ্রের সম্মুখে পতিত হইলেন, তখন রাজা সসম্ভ্রমে তাঁহাকে ধারণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্পর্শমাত্র বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া গৌর "হায় হায়" করিয়া উঠিলেন। দেখিয়া রাজা ভীত হইয়া পড়িলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহাকে অভয় দিয়া কহিলেন "আপনার ভক্তি প্রভুর অবিদিত নাই, তিনি আপনার প্রতি প্রসন্নই আছেন। তবে ভক্তগণের শিক্ষাবিধানার্থ তিনি রাজসংস্পর্শে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। অবসর পাইলেই আমি আপনার কথা পুনরায় প্রভুকে বলিব। তখন যাইয়া আপনি প্রভুর সহিত মিলিত হইবেন।"

রাজসংস্পর্শ জন্য ক্ষণিক ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া গৌর রথের পশ্চাতে গমন করিলেন এবং মাথা দিয়া রথ ঠেলিতে লাগিলেন। তাঁহার স্পর্শমাত্র রথ দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল এবং অচিরে বলগণ্ডি নামক স্থানে গিয়া উপনীত হইল। তথায় লোকের অত্যধিক জনতা হওয়ায় নিকটস্থ এক উদ্যানে

আবেশ করিয়া গৌর বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

গৌর বিশ্রাম করিতেছেন—এমন সময় রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমের উপদেশে রাজবেশ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণববেশে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন—এবং যাবতীয় ভক্তগণের অনুমতি লইয়া গৌরসমীপে গমন করতঃ তাঁহার পদমূলে পতিত হইলেন। গৌর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছিলেন—রাজা তাঁহার পাদ সংবাহন করিতে লাগিলেন এবং রাসলীলার শ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। শুনিয়া গৌর প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং "বোল" "বোল" বলিয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। রাজা পড়িলেন—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

হে প্রিয়, তোমার কথামৃত সন্তপ্তজনের জীবন, ব্রহ্মজ্ঞদিগের ভোগ্য শ্রবণমঙ্গল, শান্তিপ্রদ এবং পাপনাশক। যাঁহারা উহা পান করাইতে পারেন—তাঁহারাই প্রকৃত দাতা।

শুনিয়া গৌর দণ্ডায়মান হইয়া প্রেমভরে রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন। এবং "তুমি আমাকে অমূল্য রত্ন দান করিয়াছ, তোমাকে দিতে পারি আমার এমন কিছুই নাই, তাই আলিঙ্গন দান করিলাম।" বলিয়া রাজার পঠিত শ্লোকটী বারংবার পাঠ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত। ক্ষণকাল পরে জ্ঞান লাভ করিয়া গৌর কহিলেন "আমার পরম বান্ধবকে তুমি কোথা হইতে আনিয়া আমাকে কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইতেছ?" রাজা কহিলেন "আমি তোমার দাসানুদাস, আমাকে তোমার ভৃত্য করিয়া লও।" গৌর প্রীত হইয়া রাজাকে স্বীয় ঐশ্বর্য্য দর্শন করাইলেন এবং অন্যত্র প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। রাজা কৃতার্থ হইয়া প্রস্থান করিলেন।

মধ্যাহ্নভোজনান্তে গৌর দরিদ্রদিগকে অন্নব্যঞ্জন মিষ্টান্নাদি বিতরণ করিয়া রথ টানিতে গমন করিলেন। রথ অচল ভাবে দাঁড়াইয়াছিল—গৌড়ীয়গণ রথ নাড়াইতে অপারগ হওয়ায় রাজাদেশে রথ টানিবার জন্য হস্তী যোজিত হইয়াছিল। হস্তিগণ অঙ্কুশাঘাতে বিচলিত হইয়া উন্মত্তভাবে রথ আকর্ষণ করিতে লাগিল—কিন্তু রথ নড়িল না। তখন সমস্ত হস্তী খুলিয়া দিয়া গৌর নিজে মাথা দিয়া রথ ঠেলিতে লাগিলেন—রথ দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল এবং কোটি কণ্ঠের হরিধ্বনির মধ্যে অচিরে গুণ্ডিচা-মন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হইল। তখন জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামমূর্ত্তি রথ হইতে নামাইয়া মন্দিরস্থ সিংহাসনে স্থাপন করা হইল।

জগন্নাথ নীলাচলের অধীশ্বর। তিনি বৎসরান্তে একবার বনবিহারার্থ রথে চড়িয়া গুণ্ডিচামন্দিরে আগমন করেন। ইহাই রথোৎসব। জগন্নাথ নয় দিন গুণ্ডিচায় অবস্থান করেন। গৌর ভক্তগণসহ নয় দিন তথায় নৃত্যগীতে অতিবাহিত করিলেন। জগন্নাথের বনবিহার দেখিয়া তিনি বৃন্দাবন ভাবে আবিষ্ট হইলেন এবং গুণ্ডিচামন্দির-সম্মুখস্থ উদ্যান ও ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবরে ভক্তগণ সহ নয় দিন যাবত বৃন্দাবনলীলা অভিনয়

করিলেন। একদিন অদ্বৈতাচার্য্যকে সরোবরের জলে শয়ান করিয়া তিনি শেষশায়ী বিষ্ণুর ন্যায় তদুপরি শুইয়া থাকিলেন। আচার্য্য তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আচার্য্যের বক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া গৌর দেখিতে পাইলেন সার্ব্বভৌম ও রামানন্দে জলযুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। উভয়ে অবিরাম উভয়ের গাত্রে জল নিক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহাদের চপলতা লক্ষ্য করিয়া গোপীনাথ আচার্য্যকে গৌর কহিলেন "সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ উভয়েই পরম পণ্ডিত। উঁহারা বালকের মত চপলতা করিতেছেন, তুমি নিষেধ করিতেছ না কেন?" তখন—

গোপীনাথ কহে তোমার কৃপা মহাসিন্ধু,
উছলিত কর যবে তার এক বিন্দু।
মেরু মন্দার পর্ব্বত ডুবায় যথা তথা,
দুই এক গণ্ড শৈল ইহার কি কথা!
শুষ্ক তর্ক খলি খাইতে জন্ম গেল যার
তারে কৃপামৃত পিয়াও, এ কৃপা তোমার।

পঞ্চমী তিথিতে হোরাপঞ্চমী মহোৎসব। রাজা প্রতাপরুদ্র মহাসমারোহে উৎসবের আয়োজন করিলেন। জগন্নাথ তখন সুন্দরাচলে গুণ্ডিচামন্দিরে, কিন্তু লক্ষ্মীদেবী নীলাচলের শ্রীমন্দিরে। নীলাচলে লক্ষ্মীর সম্মুখে হোরাপঞ্চমী অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। কাশীমিশ্র গৌরকে উৎসব দেখিবার জন্য নীলাচলে লইয়া আসিলেন। নানা আড়ম্বরের সহিত লক্ষ্মী-বিগ্রহ মন্দিরবহির্ভাগে আনীত হইলেন। তাঁহার সেবকগণ জগন্নাথের সেবকগণকে বাঁধিয়া আনিয়া তাঁহার চরণে নিক্ষেপ করিল। সুন্দরাচলে পুষ্পোদ্যান বহারের জন্য সেবকগণ জগন্নাথকে লইয়া গিয়াছিল এই অপরাধে বিরহকাতরা লক্ষ্মীর আদেশে তাহারা বন্ধন প্রাপ্ত হইল। লক্ষ্মীভয়াভিভূত ভৃত্যগণ যুক্তকরে নিবেদন করিল,—"আজি আমরা জগন্নাথকে আনিয়া দিব।" তখন লক্ষ্মী শান্ত হইয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন। গৌর স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সুন্দরাচলে লক্ষ্মীকে জগন্নাথ সঙ্গে লয়েন না কেন, বল দেখি?" স্বরূপ কহিলেন "সুন্দরাচলে বৃন্দাবনলীলা করাই জগন্নাথের অভিপ্রায়। বৃন্দাবন-লীলায় লক্ষ্মীর অধিকার নাই, তাহাতে গোপী-গণের অধিকার। তাই লক্ষ্মী সঙ্গে যাইতে পান না।" গৌর কহিলেন "বৃন্দাবনলীলা ত তাঁর ভ্রাতা বলদেব ও ভগিনী সুভদ্রার সম্মুখে প্রকট হইতে পারে না—তবে লক্ষ্মীর রাগ কেন?" স্বরূপ কহিলেন "প্রেমময়ী লক্ষ্মী স্বামীর ঔদাস্যেই বিচলিত হইয়া উঠেন।"

আটদিন পরে জগন্নাথ গুণ্ডিচা হইতে শ্রীমন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে গৌর ভক্তগণ সহ আসিলেন। পথিমধ্যে রথের পট্টডোরী ছিঁড়িয়া গেল। তখন কুলীনগ্রামবাসী রামানন্দ সত্যরাজ খাঁকে (বসু) গৌর প্রতিবৎসর ঠাকুরের পট্টডোরী সরবরাহ করিবার ভার দিলেন। তদবধি প্রতিবৎসর রামানন্দ জগন্নাথের জন্য পট্টডোরী লইয়া রথযাত্রার সময় নীলাচলে আসিতেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

৺দ্বিজেন্দ্রলাল *

আজ আমরা বঙ্গের প্রথিতযশা লেখক, স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্মৃতির তর্পণের জন্য মিলিত হইয়াছি। এতদিন যাঁহার অনুপম রচনাবলী বঙ্গীয় পাঠকবর্গের চিত্ত মোহিত করিয়া রাখিয়াছিল, যাঁহার নব নব গ্রন্থের আবির্ভাব দর্শনার্থ সাগ্রহে সকলে প্রতীক্ষা করিতেন, সেই দ্বিজেন্দ্রলাল আর নাই। যাঁহার মানস-উৎস হইতে তীব্র ব্যঙ্গ ও শ্লেষের সলিল অবিরাম উৎক্ষিপ্ত হইত, যাঁহার মানস গিরি হইতে সরস কৌতুক সরিৎ প্রবাহিত হইয়া পাঠকের মনঃক্ষেত্র সুখ-শস্যে উর্ব্বরা করিত, যাঁহার মনোবীণা হইতে প্রহসন ও নাটকে, জাতীয় জীবনের উদ্বোধনকল্পে, কখনও মৃদু কখনও বা গম্ভীর সঙ্গীতঝঙ্কার উত্থিত হইত, সে দ্বিজেন্দ্রলাল আর নাই। বিদেশী সঙ্গীতের সুর ও ভাব যিনি নিজ অসাধারণ শক্তিতে বাঙ্গালা ভাষার সুকোমল আবরণে ঢাকিয়া বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রসাধনকল্পে যিনি সাগরের মত বিরাট্ বিচিত্র ভঙ্গিমাময় নাটকাবলীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের সমালোচনায় যাঁহার গদ্যের বিচিত্র ভঙ্গী ও রসগ্রাহিতা প্রকাশিত, কবিতারচনায় বিশেষত্ব যাঁহাকে বঙ্গীয় কবিমন্দিরে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট স্থান দান করিয়াছে, সেই দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনী আজ নিশ্চল। বীণাপাণির শ্রেষ্ঠ সেবক-মণ্ডলীর মধ্যে একজন প্রধান ভক্তের জীবন আজি অবসান। পূজার সম্ভার লইয়া, অসমাপ্ত কর্ম্ম ফেলিয়া তিনি আজ 'পরপারে' উপস্থিত। তাঁহার প্রতিভার নিদর্শন অতুলনীয় গ্রন্থাবলীর কিছু পরিচয় ও তাঁহার সাহিত্য-সাধনার চিত্র আজ মদীয় অক্ষম তুলিকায় অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইব।

১২৭০ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কৃষ্ণনগরের রাজা সতীশচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার নাম কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র নিজে সাহিত্য-চর্চ্চার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার রচিত কৃষ্ণনগরের রাজপরিবারের বিবরণ পাঠে আমরা তৎকালীন বাঙ্গালাসমাজের কল্পনা করিতে পারি। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র 'আত্মচরিত' নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল পিতার নিকট হইতে সাহিত্যের প্রতি অসীম অনুরাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। রাজসরকারে দেওয়ানী করিয়া সাহিত্য-সাধনা করা বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র দেওয়ানের সদা ব্যস্ত জীবন যাপন করিতে করিতেও যে গ্রন্থ রচনা

---

* দিল্লী "বঙ্গসাহিত্যসভা" কর্ত্তৃক ৺দ্বিজেন্দ্রলালের শোকসভায় পঠিত।

করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ঐকান্তিক সাহিত্যানুরাগের পরিচয় প্রদান করিতেছে। দ্বিজেন্দ্রলালও পিতার ন্যায় রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া অবসরক্রমে গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে সাহিত্য-সেবক সাহিত্যসাধনায় রত হইয়া নিজ রচিত গ্রন্থাদির আয়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত খুব অল্প। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, নবীনচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যের অবসরে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালও ঐ পথের পথিক।

সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত দ্বিজেন্দ্রলাল আর একটি গুণ পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—সেটি তাঁহার গীতপ্রিয়তা। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র অতি সুন্দর গান গাহিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত বহু গীত দেওয়ানজীর গান নামে প্রসিদ্ধ ও জনসাধারণ কর্ত্তৃক গীত হইয়া থাকে। দীনবন্ধু মিত্র নিজ 'সুরধুনী কাব্যে' বিভিন্ন নদীর মুখে, বিভিন্ন দেশ ও সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বর্ণনা করিয়াছেন। এই সুরধুনী কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলালের পিতার বিষয়ে দীনবন্ধু বলিতেছেন;—

কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় অমাত্য-প্রধান।
সুন্দর, সুশীল, শান্ত, বদান্য বিদ্বান॥
সুললিত স্বরে গীত কিবা গান তিনি।
ইচ্ছা হয় শুনি হয়ে উজানবাহিনী॥

জলাঙ্গী নদীর মুখে উক্ত বাণী প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা হইতেই কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের সঙ্গীতপটুতা অনুমিত হইবে। দ্বিজেন্দ্রলালও পিতার নিকট হইতে এই শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম খ্যাতি—হাসির গানে। যাঁহারা দ্বিজেন্দ্রলালের মুখে "আমরা ইরাণ দেশের কাজী" প্রভৃতি সঙ্গীত শুনিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার সঙ্গীত নৈপুণ্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। হাসির গানে বিবিধ সুর ও ভঙ্গী, নাটকের গানেও অপরূপ মাধুর্য্য দ্বিজেন্দ্রলালের বাল্যকাল হইতে একাগ্রচিত্তে সঙ্গীতশিক্ষার ফল। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেন, তখন বিদেশীয় সঙ্গীতবিদ্যার বিশেষভাবে চর্চ্চা করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক সঙ্গীতানুরাগ এইরূপে শিক্ষা ও সাধনায় কমনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষ্ণনগর কলেজে বিদ্যাভ্যাস করেন। বাল্যকালেই তিনি বায়রণের ম্যান্‌ফ্রেড, চাইল্ডি হ্যারল্ড, মেঘদূত ও উত্তর চরিতের অধিকাংশ মুখস্থ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে তিনি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন। এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তিনি সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত হন। এই বৃত্তির সাহায্যে তিনি কৃষিবিদ্যা-শিক্ষার্থ বিলাত যাত্রা করেন। সেখানকার বিখ্যাত সাইরেনসেষ্টার কলেজে তাঁহার কৃষিবিষয়ক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। কিন্তু কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিয়া তিনি যখন বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার কৃষিচর্চ্চা আর হইল না। বঙ্গের লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণর সার চার্লস্ ইলিয়ট্ দ্বিজেন্দ্রলালকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করেন। জনৈক সাহিত্যসেবী তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন "সাইরেনসেষ্টারে শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়া শেষে দ্বিজেন্দ্রলালকে 'কলা মুলা চুরি'র বিচার করিতে হইল। দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষিকার্য্যসম্বন্ধীয় একখানি ইংরাজী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার নাম Crops of Bengal. তাঁহার কৃষিশিক্ষার একমাত্র ফল এই পুস্তকখানি।

বিলাত যাইবার পূর্ব্বেই দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ হয়। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'আর্য্যগাথা।' ইহা কতকগুলি গীতের সমষ্টি। ইহা বিলাতযাত্রার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। ১২ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭ বৎসর বয়স পর্যান্ত তিনি যে সকল গান লেখেন তাহাই ইহাতে ছিল। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি 'আর্য্যগাথা'র দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত করেন।

আমরা দ্বিজেন্দ্রলালকে বাঙ্গালা ভাষার কবি বলিয়াই জানি। কিন্তু তিনি ইংরাজীতেও কবিতা ও হাসির গান রচনা করিয়াছিলেন। Lyrics of Ind নামক ইংরাজী পুস্তক তাঁহার ইংরাজী ভাষায় কবিতা লিখিবার শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। Light of Asia প্রণেতা সার্ এড্‌উইন্ আর্ণল্ডকে তিনি এই পুস্তক উৎসর্গ করেন। আর্ণল্ড এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের ইংরাজী হাসির গান ইংরাজমহলে গীত হইত। তাহাদের সুর-ভাষা প্রভৃতি ইংরাজী ধরণের। ইংলণ্ডে থাকিয়া তিনি ইংরাজী সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি নিজেও ইংরাজী গানের একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। কাজেই তাঁহার রচিত সঙ্গীত যে ইংরাজ-সমাজে আদৃত হইবে ইহা আর বিচিত্র কি?

দ্বিজেন্দ্রলাল ত বিলাত হইতে ফিরিলেন। সমাজে এ দিকে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। তিনি বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। সমুদ্রযাত্রায় তাঁহার জাতি গিয়াছে বলিয়া হিন্দুসমাজ তাঁহাকে পৃথক করিবার উদ্যোগ করিল। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই ক্রোধে রচনা করিলেন—'একঘরে'। এই 'একঘরে' পুস্তিকায় হিন্দুসমাজের উপর অতি তীব্র আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই প্রথম দ্বিজেন্দ্রলালের শ্লেষ ও ব্যঙ্গপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হইল। হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের উপর 'একঘরে' পুস্তকখানিতে বিদ্রূপের বাণ বর্ষিত হইল। এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল সম্প্রদায়বিশেষের ভণ্ডামি প্রচার করিয়াছিলেন। 'কল্কি অবতার' নামক প্রহসনে এইরূপ ভণ্ডামির উপর কশাঘাত হইয়াছে। 'শ্রীহরি গোস্বামী' নামক কবিতায় পণ্ডিতমণ্ডলীর শাস্ত্রবিরুদ্ধ খাদ্যভক্ষণ বর্ণিত—

"একদা শ্রীহরি প্যাণ্ট্‌টা কোট্‌টা পরি'
খাচ্ছিলেন ত টেবিলেতে কাট্‌লেট্ রোষ্ট ক্যারি;
চতুর্দ্দিকে বিদ্যারত্ন, শাস্ত্রী, শিরোমণি,
ন্যায়রত্ন, স্মৃতিরত্ন, হিন্দুধর্ম্মধ্বনি।"
এই অতি গম্ভীর সভা; সবাই ধ্যানে মগ্ন;
ছুরি এবং ফর্কে, ধারাল সব তর্কে
কঠিন এবং কোমল প্রশ্ন কচ্ছেন বসে ভগ্ন;
সবার হৃদয় ভক্তিপূর্ণ সবার বাক্য স্তব্ধ,
ঠুনুক ঠিনিক টঙাস্ ভিন্ন নাইক কোনই শব্দ;
কেবল টিকি নেড়ে, 'মধুর বাহা বেড়ে'
একবার বল্লেন চূড়ামণি পুনঃ সবাই স্তব্ধ।
হোল একটু ভুল ভাবী তর্কের মূল
সে 'মধুর'টা হরির নাম কি পক্ষীমাংসের ঝোল
শ্রোতৃবর্গ মধ্যে কিঞ্চিৎ রয়ে গেল গোল।"

সমাজে থাকিয়া গোপনে নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করিলে জাত যায় না কিন্তু বিলাতে অখাদ্য ভক্ষণ করিয়াছে বলিয়া বিলাত-প্রত্যাগতকে একঘরে করা হয়। তাই উপরে উদ্ধৃত অখাদ্যভোজী পণ্ডিতমণ্ডলীর চিত্র দ্বিজেন্দ্রলাল অঙ্কিত করিলেন। তাঁহার Reformed

Hindoos নামক হাসির গানেও এইরূপ ভণ্ডদের কশাঘাত করা হইয়াছে—

"It must be understood
যে একটু heterodox আমাদের food
কারণ, চলে মাঝে এ'টা ও'টা সে'টা
যখন we choose;
কিন্তু সমাজে তা স্বীকার করি if you think
তা হ'লে you are an awful goose."

বিলাত-প্রত্যাগতকে হিন্দুসমাজ গ্রহণ করে না, ইহাতে দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। হিন্দুসমাজ কর্ম্মবীরগণকে একে একে আচারগত বৈষম্যের জন্য সমাজ-চ্যুত করিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এই কথাই দ্বিজেন্দ্রলাল 'নুরজাহান' নাটকে (৩র্থ অঙ্ক, ৫ম দৃশ্যে) প্রকটিত করিয়াছেন—"যখন মনে হয় যে—ধর্ম্মভীরু, কর্ম্মবীর ব্যক্তিকে গুটিকতক আচারগত বৈষম্যের জন্য আপনার ব'লে জাতির মধ্যে আলিঙ্গন ক'রে নিতে পারি না, তখন বুঝি—কেন আমাদের অধঃপতন হয়েছে। যেখানে জীবন, সেখানে সে বাহিরের জিনিষ টেনে নিজের ক'রে নেয়, আর যেখানে মরণ, সেখানে সে শতধা হ'য়ে নিজেই গ'লে খ'সে পড়ে।"

কবির জীবন কাব্যের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করে। মানসিক অবস্থানুযায়ী বিবিধ গ্রন্থাদিতে বিভিন্ন ভাবের ছাপ পড়ে। সমাজবহির্ভূত হইবার আশঙ্কা যখন বিদ্যমান, তখন 'একঘরে' রচিত হয়। আবার প্রফুল্ল যৌবনের সুখের তরঙ্গে ভাসিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল 'হাসির গান' রচনা করেন। যখন তাঁহার গার্হস্থ্যজীবন সুখময়, প্রচুর অর্থাগম হইতেছে, অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য লইয়া তখন দ্বিজেন্দ্রলাল হাসি-মুখে 'হাসির গান' লিখিয়াছিলেন। এই 'হাসির গান' বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন জিনিষ। বিদেশীয় সাহিত্যে Comic Songsএর অভাব নাই, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে হাসির গানের বিশেষ অভাব ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল সে অভাব পূর্ণ করেন। বঙ্গভাষায় তিনিই প্রথম এই শ্রেণীর গীত রচনা করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে লিখিয়াছেন যে, ইংরাজী Ingoldsley Legendsএর অনুকরণে তিনি 'আষাঢ়ে' লিখিয়াছিলেন, এই গানগুলির অধিকাংশের সুর ইংরাজী। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল এমনি সুকৌশলে সেই সুরগুলি বাঙ্গালা গানে মিলাইয়াছেন যে, আমাদের কর্ণে তাহা শ্রুতিকটু বলিয়া আদৌ মনে হয় না। কতক-গুলি গান একাধিক ব্যক্তি দ্বারা গেয়। ইংরাজীর Chorusএর মত মধ্যে মধ্যে সমবেতকণ্ঠে কতকগুলি পংক্তিগান দ্বিজেন্দ্র-লাল অতি সুন্দরভাবে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

কবি দুইপ্রকারে হাসিতে পারেন। এক প্রকার হাসি তীব্র ব্যঙ্গশ্লেষের আবরণে ঢাকা, লেখক যে সকল দোষ দেখাইতেছেন, সে সকল হইতে তিনি নিজে যেন মুক্ত। নিজে উচ্চগিরিশিখরে বসিয়া নিম্নে সমতলভূমিতে বিচরণকারী মানবদের যেন তুচ্ছ করিতেছেন, ইহাতে সহৃদয়তা নাই, আছে কেবল নির্ম্মম কশাঘাত। ভল্‌টেয়ার এইরূপ হাসিয়া-ছিলেন। সুইফ্‌ট্‌ও এইরূপ হাসিয়া-ছিলেন।

আর একপ্রকার হাসি আছে, যাহাতে লেখক নিজেকেও হাসির পাত্র বলিয়া মনে করেন। অপরের দোষ দেখাইতেছেন বটে,

কিন্তু নিজেও যে সে দলের মধ্যে আছেন, তাহা গোপন করিবার কোনও চেষ্টা নাই। এই হাসি সমবেদনা ও সহানুভূতিপূর্ণ। দ্বিজেন্দ্রলাল এই শেষোক্ত হাসি হাসিয়াছেন। Reformed Hindoos গানে হিন্দুসমাজস্থ ভণ্ডদের বিদ্রূপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু "বিলাতফের্ত্তা" নামক গানে নিজের দলের প্রতি উপহাস করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

"আমরা বিলাতফের্ত্তা ক' ভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই,
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।"

দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে যে বিলাতফের্ত্তার দলে এককালে বেশ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন, এ কথা স্মরণ রাখিলে, উপরোক্ত পংক্তিগুলির সার্থকতা বুঝা যাইবে।

সামাজিক দোষ দূর করিতে অনেক প্রকার ব্যবস্থা হইয়াছে। তীব্র আক্রমণ, সভা-সমিতিতে বক্তৃতা, সংবাদপত্রে লেখা প্রভৃতি তুমুল আন্দোলন হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে যে ফল না হইয়াছে, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে তাহা হইয়াছে। হুজুকপ্রিয় ব্যক্তিগণ "নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো" গানে উপহাসিত হইয়াছেন, ভণ্ড স্বদেশহিতৈষী 'নন্দলালের' চিত্রে অনেক কপটাচারীর গাত্রদাহ হইয়াছে। ধর্ম্মে বিশ্বাসহীন ব্যক্তি অনবরত ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিতেছে। তাহার প্রতি ব্যঙ্গাত্মক বাক্য—

"ছেড়ে দিলাম পথটা বদ্‌লে গেল মতটা
অমন অবস্থায় প'ড়্‌লে সবারই মত বদলায়।"

কতকগুলি গানের মধ্যে করুণ রসের অন্তঃসলিলা বহিতেছে। বাহিরে শুনিয়া হাসি বটে, কিন্তু মনের মধ্যে গভীর শোকপ্রকাশ প্রচ্ছন্নভাবে বহিতে থাকে।

কবি "ইরাণ দেশের কাজী"তে বলিয়াছেন—

"ইমাম সবাই সত্যপ্রিয়, পার্শী মিথ্যাবাদী,
পার্শী ইমামে বিবাদ বাধলে,
পার্শীই অপরাধী।
পার্শী ঠেকিলে ইমাম গায়,
মাথাটি বাঁচান হইবে দায়,
পার্শীর শির কাটিয়া লইলে,
হইতে হইবে রাজী।"

এই ইরাণ দেশের কাজীদের নূতন আইন। খুস্‌রোজ উৎসবে স্বার্থসাধকের চিত্র আছে—

"আজি এই শুভ রাতি জাল্‌বো বাতি,
ঘরে ঘরে ভক্তিভাবে
নইলে যে চাকরি যাবে,
নইলে যে চাকরি যাবে;
আমাদের ভক্তি যা এ,
সে যে গো পেটের দায়ে;
নিয়ে আয় চেরাক বাতি,
নিয়ে আয় দিয়েসলাই;
সাধে কি বাবা বলি,
গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।"

এই সকল হাসির গানের সাহায্যে ভণ্ডামিকে সাধারণের চক্ষে হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া উচ্চ আদর্শের পথে চালিত করা দ্বিজেন্দ্রলালের শক্তিতেই সম্ভব। তাই হাসির গানে আমরা শুধু হাসি না, নিজেদের সমাজের দোষ দেখিয়া ও নিজেদের কপটতার চিত্র দেখিয়া, অন্তরে অন্তরে কাঁদিয়াও থাকি। হাসির গানে যে সংশোধন হয়, শত গালিতেও তাহা অসম্ভব।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই সময় "সাধনা", "সাহিত্য" "প্রদীপ" "ভারতী" প্রভৃতি পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করেন। "অদল বদল" "হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা" সাহিত্যে প্রকাশিত হয়। "কেরাণী" কবিতা সাধনায় প্রথম মুদ্রিত হয়। এই কবিতাগুলি ছন্দের বিষয়ে এক নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছে। অক্ষর হিসাবে ইহার ছন্দ নির্ণীত হয় না। মাত্রা হিসাবে ও উচ্চারণ হিসাবে ইহার ছন্দ দেখিতে হইবে। ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "এ কবিতাগুলির ভাষা অতীব অসংযত ও ছন্দোবন্ধ অতীব শিথিল; ইহাকে সমিল গদ্য নামেই অভিহিত করা সঙ্গত। কিন্তু যেরূপ বিষয়, সেইরূপ ভাষা হওয়া বিধেয় মনে করি। হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিতে মেঘনাদবধের দুন্দুভি-নিনাদের ভাষা ব্যবহার করিলে চলিবে কেন?" বাস্তবিক কৌতুকজনক কাহিনী এইরূপ তরল ভাষায় বঙ্গসাহিত্যে প্রথম দ্বিজেন্দ্রলালই প্রকাশ করিয়াছেন। সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে দ্বিজেন্দ্রলাল দুইটি বাঙ্গলা কবিতা লিখিয়াছেন। অনুষ্টুপ্‌ ছন্দে রচিত "কলিযজ্ঞ" এইরূপে আরম্ভ হইয়াছে—

ব্যারিষ্টার উকীলাদি মহাযজ্ঞ সমাধিলা।
ভারতে ভারি অদ্ভুত আশ্চর্য্য মহতী সভা॥
আসিলা সে মহাযজ্ঞে মহারাষ্ট্রীয় পশ্চিমে।
মান্দ্রাজী উড়িয়া শিক বঙ্গালী চ দলে দলে॥
কাহারো পরণে কুর্ত্তি,
কাহারো উড়্‌নী উড়ে।
কাহারো বা ঝুলে চাপকান্‌,
কাহারো সাহেবী ধরা।
কাহারো সম্মুখে টেড়ী
কাহারো পিছনে টিকী।
কাহারো উপরে ঝুটি—কা কস্য
পরিবেদনা॥"

'কর্ণ-বিমর্দ্দন-কাহিনী' নামক কবিতা পজ্ঝটিকাছন্দে লিখিত—

জানো না কি কদাচন মূঢ়
কর্ণ-বিমর্দ্দন-মর্ম্ম কি গূঢ়?
কর্ণ দিবার কি কারণ অন্য,
যদি না তা আকর্ষণ জন্য?

এই সকল কবিতায় বাঙ্গালীর ঘরের কথা, ঘরের ছবি বেশ স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। সারাদিন পরিশ্রমের পর অনেক বাঙ্গালীই ঘরে গিয়া নিম্নলিখিত দৃশ্য দেখিয়া থাকেন।

"খেটে খেটে খেটে
আপিস ছেড়ে এলাম যদি আপনারই 'ষ্টেটে'।
কোণেতে জড়ান দেখি তক্তপোষের পাটি,
ফরাসের সতরঞ্চে এক কোমর মাটি;
পুত্ররত্ন গিয়ে হুঁকোগাছটি নিয়ে
ভেঙ্গে সেটি, কালি মেখে, কল্কে ফেলে দিয়ে,
ঘুন্‌সি পরে তাকিয়াতে কচ্ছেন বসে নৃত্য;—
ঘুমোচ্চেন তাঁর পার্শ্বে প্রিয় রামকান্ত ভৃত্য।"

এইরূপ অনেক ছবি দ্বিজেন্দ্রলাল নিখুঁতভাবে আঁকিয়াছেন। ভাষা সরল, তাহার অবিরাম প্রবাহ। রহস্যের আলোকে এক একবার দীপ্ত হইয়া উঠে। বাঙ্গালীর ঘর, সুখ, দুঃখ, দোষ, গুণ হাসির মধ্য দিয়া উঁকি দিতেছে এ সকল কবিতার সহিত কল্পনামূলক কবিতার পরিমাণ হইতে পারে না। শেলি বা কীট্‌সের কবিতার মাপকাঠিতে এ সকল কবিতার পরিমাণ হইতে পারে না। ইহার জন্য স্বতন্ত্র মানদণ্ড আবশ্যক।

বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যের অবস্থা কি? ইউরোপে দেখিতে পাই,—গল্প, উপন্যাস, রঙ্গ-রহস্য প্রভৃতিরই বেশী আদর। আমাদের দেশেও ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। ইহার কারণ, বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে অতি অল্প লোকেই গভীর গবেষণা-পূর্ণ রচনা পাঠ করিতে সমর্থ। ইউরোপে জনসাধারণ সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করে। কৃষক সমস্ত দিন হলচালনায়, মজুর কারখানায় কেরাণী আফিসে, বণিক্ এক্‌স্‌চেঞ্জে, উকীল আদালতে, সকলেই অর্থোপার্জ্জনের জন্য সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতেছে। বিংশ শতাব্দীর মূল লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে—অর্থোপার্জ্জন। সারাদিন পরিশ্রমের পর অবসর যাপন করিবার জন্য যাহারা পুস্তক পাঠ করে, তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য চিত্ত-বিনোদন। দার্শনিক জটিল তত্ত্বের মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিতে চায় না, প্রত্নতত্ত্বের গোলকধাঁধায় তাহারা দিশাহারা হইতে চায় না। তাহারা চায়—দুই একটা গল্প বা উপন্যাস, একটু রসিকতা বা হাসির গান। আমাদের দেশেও সে অবস্থা আসিয়াছে। প্রতি বৎসর গল্প ও উপন্যাস যত প্রকাশিত হয়, অন্য কোন শ্রেণীর গ্রন্থ সংখ্যায় তত অধিক নয়। মাসিক-পত্রের পাঠকেরা আগে গল্প ও উপন্যাসের অনুসন্ধান করেন। যতদিন না সামাজিক জীবনের পরিবর্ত্তন হইবে, ততদিন অন্য কিছু আশা করাও সম্ভবপর নহে।

আরও একটা কারণ—গভীর-পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাবলীর মর্ম্মগ্রহণ করা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে অসম্ভব। একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে গেলে, প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিতে গেলে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইতে হয়। মনকে সেই সকল পথে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য অভ্যাস আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্র একবার এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "লোকে গল্প বা উপন্যাস পাঠ করে, কিন্তু অন্যান্য-বিষয়ক রচনা তাহাদের ভাল লাগে না। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহারা উপযুক্ত শিক্ষা পায় নাই ও কোনও গভীর বিষয় ভাবিতে অভ্যস্ত হয় নাই। জনকতক শিক্ষিত ব্যক্তি অবশ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাবলী আগ্রহের সহিত পাঠ করেন, কিন্তু সাধারণ পাঠকসংখ্যার তুলনায় তাঁহাদের সংখ্যা অঙ্গুলীপর্ব্বে গণনা করা যাইতে পারে বলিলেও চলে।"

দেখা গেল, বর্ত্তমান সমাজের অবস্থায় সাধারণ পাঠক কি চায়? দ্বিজেন্দ্রলাল এই শ্রেণীর পাঠকদের উপযুক্ত জিনিষই দিয়াছিলেন। তাঁহার হাসির গান, তাঁহার কৌতুকজনক কবিতা ও তাঁহার প্রহসন সকলেই সাগ্রহে পাঠ করিয়াছেন। মজ্‌লিসে তাঁহার হাসির গান গীত হইয়াছে, নাট্যশালায় তাঁহার প্রহসন অভিনীত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণের রুচিকর পদার্থ দিয়াছেন বলিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল যে সাহিত্য-সেবকের উচ্চ লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা নয়। তাঁহার বরাবর চেষ্টা ছিল—কবিতায় গানে প্রহসনে, হাস্য ও ব্যঙ্গের মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া। রোগীকে চিনি-মাখান কুইনাইনের বড়ি খাওয়ানর মত রুগ্ন সমাজকে তিনি হাসি মুড়িয়া তিক্ত শিক্ষা-বড়ি খাওয়াইয়াছেন।

এই হাসির গান শুনিতে শুনিতে সহসা দ্বিজেন্দ্রলালের "মন্দ্র" যখন ধ্বনিত হইয়া

উঠে, তখন আমরা স্তব্ধ হইয়া যাই। দৈনিক চা-পান সরপুরিয়া, রসগোল্লার গান হইতে যখন বায়রণের উদ্দেশে দ্বিজেন্দ্রলালের উচ্ছ্বাস পড়ি, তখন মনে করি, এ কি সেই কবি? যে কবি বায়রণকে বলেন,—

"উঠনি জ্যোৎস্নার মত তুমি;
উঠেছিলে তীব্র বিদ্যুতের ছটা
প্রাবৃট্ আকাশে; চতুর্দ্দিকে তব,
ঘোর কুৎসা-কৃষ্ণ ঘনঘটা
তোমারে ঘেরিয়াছিল;
তুমি চালাইয়াছিলে তব রশ্মিরথ
তাহার উপর দিয়া, করিয়া
চকিত স্তব্ধ বিস্মিত জগৎ।
তুমি গাহ নাই গীত,
বসন্তের পিক-সম ললিত উচ্ছ্বাসে
কুঞ্জবনে; গেয়েছিলে তুমি কবি,
পাপিয়ার মত নীলাকাশে,
প্রবল মধুর স্বনে।
তোমার সঙ্গীত একাকী ইংলণ্ড নহে,
আয়র্লণ্ড, স্কট্‌লণ্ড, ফরাস,
জর্ম্মণী, রোম, বিমুগ্ধ বিস্ময়ে
শুনেছিল তাহা; আর যে
যেখানে ছিল, করি তব কাব্য পাঠ
তোমারে মানিয়াছিল,
একবাক্যে সবে, কাব্যজগতে সম্রাট্।"

সেই কবিই কি হাসির গান-রচয়িতা? যে কবি তাজমহলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবোন্মত্ত, যাঁহার কণ্ঠে এই বাণী—

"সুন্দর অতুল হর্ম্ম্য! হে প্রস্তরীভূত
প্রেমাশ্রু! হে বিয়োগের পাষাণ-প্রতিমা!
মর্ম্মরে রচিত দীর্ঘনিঃশ্বাস! আপ্লুত
অনন্ত আক্ষেপে, শুভ্র হে মৌন-মহিমা!
এত শুভ্র, এত সৌম্য, এত স্তব্ধ স্থির,
এত নিষ্কলঙ্ক, এত করুণা সুন্দর
তুমি হে কবর! আজি তুমি সম্রাজ্ঞীর
স্মৃতি সঞ্জীবিত কর এ বিশ্ব ভিতর,
কিন্তু যবে ধূলি-লীন হইবে তুমিও,
কে রাখিবে তব স্মৃতি? হে সমাধি!
চিরস্মরণীয়।"

তিনিই কি "আষাঢ়ে" লিখিয়াছেন? "হিমালয়", "নবদ্বীপ" "সমুদ্রের প্রতি" প্রভৃতি কবিতায় কবি এক বস্তুকে বহু দিক্ হইতে দেখিয়াছেন। এই সকল কবিতার মধ্যেও আমাদের দেশের উচ্চ আদর্শের কথা জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। দিল্লীর ও আগ্রার মোগল-বিলাসের পার্শ্বে আর্য্যদের জীবনের চরিত্র বড় সুন্দর। কবি বলিতেছেন,—

"বিলাসের চরম করিয়া গেছে ভবে
মোগল। গুলাব স্নান মর্ম্মর-আগারে;
উজ্জ্বল বসন, পূর্ণ আতর সৌরভে
পোলাও কালিয়া খাদ্য; মখমল ঝাড়ে
মণ্ডিত ভূষিত কক্ষ। ময়ূর আসন;
উদ্যান, নির্ঝর, প্রভাতে সন্ধ্যায় দূরে
মধুর ন'বৎ বাদ্য; নূপুর-নিক্কণ,
সারঙ্গ, বিভ্রম নৃত্য, নিত্য অন্তঃপুরে,
মরণেরও জন্য চাই সুপ্রশস্ত কক্ষ,
মরণের পর স্বর্গ, তাও সেই রূপসীর বক্ষ।
আর আর্য্যজাতি? ঠিক্ তার বিপরীত
রূপ—প্রকৃতির শোভা; রস—পৃথিবীর;
স্পর্শ—স্নিগ্ধ বায়ু; শব্দ—নিকুঞ্জ-সঙ্গীত;
গন্ধ—যা বহিয়া আনে উদ্যান-সমীর।
পুণ্য-নদীজলে স্নান—অঙ্গে শুভ্রবাস;
আহার—তণ্ডুল ঘৃত; শয্যা—ব্যাঘ্রচর্ম্ম;
আবাস—কুটীর-কক্ষ; চরম বিলাস

জীবনের—তীর্থযাত্রা ; বিবাহও—ধর্ম্ম ;
এ সংসার—মায়া ; মৃত্যু—মোক্ষ, দুঃখহীন,
শ্মশানে নদীর তটে ; স্বর্গ—হওয়া
পরব্রহ্মে লীন।

এইরূপ কবিতা ও হাসির গানে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন বঙ্গসাহিত্যে নূতন সুর আনিতেছিলেন, তখন তাঁহার গার্হস্থ্যজীবন সুখময়। তিনি প্রসিদ্ধ ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কন্যা সুরবালা দেবীকে বিবাহ করেন। পত্নীর নামেই তাঁহার গৃহের নামকরণ হইয়াছিল—সুরধাম। কিন্তু প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রলালের পত্নী স্বর্গারোহণ করেন। একটি পুত্র ও একটি কন্যা লইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল এই দুর্ব্বহ শোকভার বহন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাসির গান ফুরাইয়া গেল। গভীর শোকের ধারায় তাঁহার চিত্ত ধৌত হইয়া নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাঁহার প্রতিভা এবার নূতন দিকে ধাবিত হইল। সেই চেষ্টার ফল তাঁহার সর্ব্বজন-প্রশংসিত নাটকাবলী।

বাঙ্গলার রঙ্গালয় দীনবন্ধু ও মাইকেলের নাটক ও প্রহসন লইয়া জন্মগ্রহণ করে। পরে রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল ও গিরিশচন্দ্র ইহাকে বহু নাট্যে সাহায্য করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের অতুলনীয় প্রতিভা পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক নাটকে চরিত্র-চিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মতত্ত্বের অপরূপ ব্যাখ্যায় বাজালীর চক্ষে নূতন আদর্শ ধরিয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের নাটকাবলীতে যে বিশ্বপ্রেম ও উদারতার আদর্শ অবতারণা করিয়াছেন, গিরিশচন্দ্রও বহু পূর্ব্বে তাহা নিজ নাটকে প্রকটিত করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকাবলীর তুলনায় সমালোচনার অবসর ইহা নহে ; তবে ইহা নিশ্চয়, গিরিশচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিলে, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাম বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রসাধকগণের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে।

বঙ্গীয় রঙ্গালয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথমে প্রহসন-রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার "বিরহ" "ত্র্যহস্পর্শ" "প্রায়শ্চিত্ত" বা "বহুৎ আচ্ছা" রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভিনীত হইয়াছে। রামায়ণের অহল্যা-চরিত্র লইয়া তিনি "পাষাণী" নামক একখানি নাটক রচনা করেন। এই নাটকে ঋষি গৌতম আদর্শ ব্রাহ্মণরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কতিপয় ঐতিহাসিক নাটকের ভিত্তি রাজস্থান। তাঁহার "তারাবাই", "দুর্গাদাস", "রাণা প্রতাপ," "মেবার-পতন" রাজস্থানের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। মোগল-সাম্রাজ্যের একাংশের চিত্র "নুরজাহান" ও "সাজাহান" নাটকে প্রকটিত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল মেবার-পতনের ভূমিকায় নিজেই নিজের নাটকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন,—"পাষাণীতে আমি আদর্শ ব্রাহ্মণ-চরিত্র, রাণা প্রতাপসিংহে আদর্শ ক্ষত্রিয়-চরিত্র, দুর্গাদাসে আদর্শ পুরুষ-চরিত্র এবং সীতাতে আদর্শ নারীচরিত্র লইয়া বসিয়াছিলাম।" এইরূপ আদর্শ চরিত্র চিত্র করিবার পর দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "তোমার গৌতম, প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস সব দেবতা ; দেখিতেছি তুমি কল্পনার সুবর্ণরাজ্যে উড়িতেছ ; একবার বাস্তব জগতে নামো দেখি ; মনুষ্য-চরিত্র

দেখাও, যাহা দেখাইয়া সেক্সপীয়র অমর হইয়াছেন।" [নুরজাহান—ভূমিকা] বন্ধুর এই উপদেশ দ্বিজেন্দ্রলাল পালন করিয়াছিলেন। মেবার-পতনের ভূমিকায় তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে "তারাবাই ও নুরজাহান ইত্যাদিতে আমি বাস্তব মনুষ্যচরিত্র চিত্রিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম।" মেবার-পতন নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল একটি উদ্দেশ্য লইয়া বসিয়াছিলেন। একটি মহানীতি নাটকখানির মধ্যে প্রচার করা হইয়াছে। "সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য প্রেম, জাতীয় প্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের মূর্ত্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই কীর্ত্তিত হইয়াছে যে বিশ্বপ্রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী।" [মেবারপতন ভূমিকা] দ্বিজেন্দ্রলাল "চন্দ্রগুপ্ত নামক নাটকে সংস্কৃত মুদ্রারাক্ষস নাটক হইতে বহু ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি সামাজিক নাটক লিখিতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন। "পরপারে" নামক সামাজিক নাটকে বর্ত্তমান সমাজের নীতির বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। 'ভীষ্ম' নামক একখানি পৌরাণিক নাটক ও 'সিংহলবিজয়' নামক একখানি নাটক লিখিয়া তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সকল নাটকের রচনা ও অভিনয়ে বাঙ্গলা নাটকের প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকারের হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের নিজের কথাতে প্রকাশ যে, তিনি বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চসমূহে প্রহসনের স্বাভাবিকতা ও সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছিলেন, নাটকের স্বাভাবিকতা ও আখ্যান-বস্তু গঠনে নৈপুণ্য দেখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রহসনে কুরুচি ও নাটকে কাব্যশক্তির অভাব তিনি বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। নাটকে কাব্যসৌন্দর্য্য বিকাশ করিতে তাই তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এই কাব্যসৌন্দর্য্যের দুই একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে। জাহাঙ্গীর নুরজাহানকে স্মরণ করিয়া বলিতেছেন "সেদিন গবাক্ষপথে দেখ্‌লাম—কি সে মূর্ত্তি! যেন তুষারের উপর উষার উদয়; যেন স্তব্ধ নিশীথে ইমনের প্রথম ঝঙ্কার; যেন মনুষ্যের প্রথম যৌবনে প্রেমের প্রভাত! সে একটা নিঃসঙ্গ সুখের মত নয়, একটা মধুর রাগিণীর মত নয়, একটা প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত নয়। সে যেন একটা আনন্দের উত্থান, একটা সৌন্দর্য্যের তরঙ্গকল্লোল, একটা মহিমার সমারোহ। সে যেন ভারতের নয়, ইরাণের নয়, আরবের নয়; ভূত, ভবিষ্যৎ কি বর্ত্তমানের নয়, স্বর্গের নয়, মর্ত্ত্যের নয়! সে যেন সব দেশের, সব কালের; স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের উভয়েরই দেখবার জন্য উভয়ের মধ্যে সংরক্ষিত একটা পৃথক্ সৃষ্টি। যেন দেবতার প্রেরণা, কবির সফল স্বপ্ন, ব্রহ্মাণ্ডের বিস্ময়! কি সে মূর্ত্তি!" [নুরজাহান, ১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য] আমাদের মনে পড়ে সাজাহানের জাহানারার প্রতি অনুরোধ "কি জাহানারা! তবু নিস্তব্ধ! চেয়ে দেখ্ এই সন্ধ্যাকালে ঐ যমুনার দিকে, দেখ্: সে কি স্বচ্ছ! চেয়ে দেখ্ ঐ আকাশের দিকে, দেখ্ সে কি গাঢ়! চেয়ে দেখ্ ঐ কুঞ্জবনের দিকে—দেখ্ সে কি সুন্দর! আর চেয়ে দেখ—ঐ প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রু, ঐ অনন্ত আক্ষেপে আপ্লুত বিয়োগের অমরকাহিনী ঐ স্থির মৌন নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মন্দির, ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ্—সে কি করুণ—

তাদের দিকে চেয়ে ঔরংজীবকে ক্ষমা কর্।” [সাজাহান শেষ দৃশ্য] মনে পড়ে রাণা প্রতাপে ইরার সন্ধ্যা-আবাহন “কি গরিমাময় দৃশ্য! সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে! সমস্ত আকাশে আর কেউ নাই, একা সূর্য্য! চার প্রহর কাল আকাশের মরুভূমি বিচরণ করে এখন অগ্নিময় বর্ণে বিশ্বজগৎ প্লাবিত করে' অস্ত যাচ্ছে। যেমন গরিমায় উঠেছিল তেমনি গরিমায় নেমে যাচ্ছে। ঐ অস্ত গেল। আকাশের পীতাভা ক্রমে ধূসরে পরিণত হচ্ছে! আর যেন দেবারতির জন্য সন্ধ্যা সেই অস্তগামী সূর্য্যের দিকে শূন্য প্রেক্ষণে চাহিতে চাহিতে ধীরপদবিক্ষেপে বিশ্বমন্দিরে প্রবেশ কচ্ছে। কম্র সন্ধ্যা! প্রিয়সখি! কি চিন্তা তোমার ও হৃদয়ে? কি গভীর নৈরাশ্য তোমার অন্তরে? কেন এত মলিন? এত নীরব এত কাতর?” [প্রথম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য] দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের ভাষা এইরূপ কবিত্বময়। তিনি কদাচিৎ সমাস-বহুল ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ছোট ছোট কথাগুলিতে তিনি যেরূপ নিপুণতার সহিত মানবের সমস্ত ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। ভাষার এই তেজ বঙ্গসাহিত্যে এক বিবেকানন্দ ব্যতীত আর কেহই প্রকাশ করিতে পারেন নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের এই ভাষার উপর অসীম অধিকার তাঁহার বৈচিত্র্য।” হাসির গানে ও হাসির কবিতায় তিনি যদৃচ্ছাক্রমে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন। কত অপরূপ মিল করিয়াছেন, কিন্তু কোনও খানে ভাষার জন্য ভাবকে আড়ষ্ট হইতে হয় নাই। তাঁহার নাটকগুলিতেও অনাড়ম্বর ওজস্বিনী ভাষার প্রবাহ। রাজপুতসৈন্যগণের যুদ্ধোৎসাহবাণী, সাজাহানের উন্মত্ত প্রলাপ, নুরজাহানের কুটিল বাক্য, সব এই ভাষার বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রকটিত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল উপমার উপর উপমা পুঞ্জীভূত করেন—“তিনি এ জাতির মধ্যে এসেছিলেন—একটা দৈবশক্তির মত, একটা আকাশের বজ্রসম্পাত, একটা পৃথিবীর ভূমিকম্প, একটা সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস [মেবার-পতন, ১ম অঙ্ক ৩য় দৃশ্য] “ঝটিকাবিক্ষুব্ধ নৈশ সমুদ্রের উপর প্রভাতসূর্য্যের মত, ঘনকৃষ্ণমেঘান্তরিত স্থির নীল আকাশের মত, দুঃখের উপর করুণার মত—এ কি মূর্ত্তি! একটা সৌন্দর্য্য! একটা গরিমা! একটা বিস্ময়! [মেবার-পতন—১ম অঙ্ক ৭ম দৃশ্য]

দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনার শক্তি তাঁহার “কালিদাস ও ভবভূতি” নামক প্রবন্ধে প্রকটিত। এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি ধারাবাহিকরূপে ‘সাহিত্যে’ প্রকাশিত হয়। তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সকলে সর্ব্বাংশে সায় না দিলেও, তিনি যে নিপুণ আলোচনা করিয়াছেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। জীবনের শেষভাগে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি কর্ম্ম হইতে দীর্ঘ অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি সাহিত্য-সাধনায় রত ছিলেন। ‘ভারতবর্ষ’ নামক মাসিক-পত্রের সম্পাদনভার তিনি গ্রহণ করেন। তাঁহাকে বহু পরিশ্রমও করিতে হইয়াছিল! মৃত্যুর দিন লিখিতে লিখিতে সহসা ক্লান্ত। তাহার পরই তাঁহার সংজ্ঞালোপ হয়। রোগযন্ত্রণা সহ্য না করিয়া সাহিত্যালোচনা করিতে করিতে দ্বিজেন্দ্রলাল অমরধামে গমন করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য ও নাটকের বিস্তৃত সমালোচনার সময় এখনও আসে নাই। আমাদের এই অবসরও অল্প। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার বিবিধ ভঙ্গীর কিছু কিছু উদাহরণ দিয়াছি। কিন্তু দুই চারিটি তরঙ্গ দেখিয়া যেরূপ সমুদ্রের কল্পনা করা অসম্ভব, সেইরূপ এই উদাহরণ হইতে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার সম্যক্ ধারণা করা দুরূহ। আমরা দেখিব—দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গলা ভাষাকে, বাঙ্গলা দেশকে, বাঙ্গালীকে কি দিয়া গিয়াছেন? বাঙ্গলা ভাষাকে দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গান দিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বেও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বঙ্গভাষায় হাস্যরস অবতারণা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির বিশেষ প্রভেদ পরিলক্ষিত হইবে। আগেকার হাসি ব্যক্তিগত আক্রমণপূর্ণ, কখনও বা কুরুচিমূলক। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান ব্যক্তিগত আক্রমণবর্জ্জিত, শুভ্র সংযত হাস্যরসে অভিষিক্ত। হাসির কবিতার মাত্রা ছন্দ ও কৌতুককর কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গলাভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। আর দিয়াছেন—নাটকগুলি। বিবিধ বিচিত্র চরিত্র অঙ্কনে ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙ্গলা নাট্যসাহিত্যের সৌন্দর্য্যবিধান দ্বিজেন্দ্রলালের কার্য্য। সেই নাটকের জ্বলন্ত ওজস্বিনী ভাষা বাঙ্গলা গদ্যের সুপ্ত নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ করিয়াছে। বাঙ্গলাভাষায় তেজ আনিয়াছে। আরও দিয়াছেন—সঙ্গীতগুলি। "আমার দেশ" প্রভৃতি সঙ্গীত শত শত কণ্ঠে গীত হইয়াছে। যতদিন বাঙ্গলাভাষার অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন এ সঙ্গীত-ঝঙ্কার নীরব হইবে না।

বাঙ্গলাভাষাকে ত পূর্ব্বোক্ত সম্পদ্‌শালিনী করিয়াছেন। বাঙ্গলা সমাজের তিনি কি করিয়াছেন? বাঙ্গলার সমাজের দোষ স্পষ্টাক্ষরে বর্ণনা করিয়াছেন। কখনও তীব্র তিরস্কার, কখনও মৃদু বাণী দ্বারা সমাজের ভণ্ডামি প্রকটিত করিয়াছেন। হাসির গানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, এই সমাজের দোষ প্রদর্শন, প্রহসনগুলিতেও এই সামাজিক দোষের ব্যঙ্গচিত্র, নাটকে গম্ভীর উপদেশবাণী সমাজকে যথার্থপথে চলিতে বলিতেছে।

আর বাঙ্গালীকে দ্বিজেন্দ্রলাল দিয়া গিয়াছেন—এক মহান্ আদর্শ। যে আদর্শ টেনিসন্ স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, সেই চির-শান্তিময় বিশ্বপ্রেমের আদর্শ। যেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ নাই, মানবজাতি একত্র ভ্রাতৃভাবে মিলিত, মনুষ্যত্বের যেখানে চরম বিকাশ, সেই মহিমাময় ভবিষ্যতের চিত্র দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। মেঘমন্দ্রে বলিয়াছেন "আপনাকে ছেড়ে, ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালবাস্‌তে শিখ্‌তে হবে। জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের মধ্য দিয়া নয়—জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়া।" [মেবারপতন ৫ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য]।

কবিবর! মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া সাহিত্য-সাধনা করিয়া আজ তুমি চিরশান্তিলাভ করিয়াছ। সত্য ও সাহসে অদ্বিতীয়, জন্মভূমিবৎসল নির্ম্মলচরিত্র, উদারহৃদয় তুমি বঙ্গসাহিত্য-মন্দিরে শ্রেষ্ঠ পূজকদিগের অন্যতম। তোমার ভাষায় তোমাকে বলি—

"তোমার কবিত্বরাজ্য সমুদ্রের মত।

তুমি কভু উপহাস

করিয়াছ ; কভু ব্যঙ্গ ; কভু ঘৃণা ;
কেলিয়াছ বিষাদ নিশ্বাস
কভু ; কভু অনুতাপ ; গম্ভীর গর্জ্জন
কভু ; কভু তিরস্কার ;
আগ্নেয়গিরির মত দ্রবীভূত জ্বালা
কভু করেছ উদ্গার,
কভু প্রকৃতির উপাসনা, যোড়করে,
ক্ষুদ্র বালকের প্রায়
"আপন" দেশের জন্য
জ্বলিয়াছ কভু তীব্র মর্ম্মবেদনায়।"
[বাইরণের উদ্দেশে]।

বাঙ্গলার দুর্ভাগ্য, বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য, তাই আজ তোমার অসমাপ্ত কর্ম্ম স্মরণ করিয়া অশ্রু মোচন করিতেছি। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে তোমার নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত—বাঙ্গালীর স্মৃতি-কিরণকে তোমার নাম সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিবে। কালিদাসের নরদেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তিনি মরেন নাই, ভবভূতি, ভারবি, শ্রীহর্ষ, তাঁহারাও অমর। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের মত তুমিও বাঙ্গালীর কাছে অমর। তোমার প্রভাব, তোমার আশ্বাসবাণী, তোমার উচ্চ আদর্শ, নাটকে, কবিতায়, সঙ্গীতে চিরদিন বাঙ্গালীকে মহান্ পথে পরিচালিত করিবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

উৎপলা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্দেহের নিরসন—তথাপি সন্দেহ।

এক দিন ধর্ম্মপাল অর্জ্জুনদেবের সহিত অসঙ্গসেনের দেখা। অসঙ্গ তাঁহাকে নমস্কার অভিবাদন করিয়া বিদায় হইতেছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মপাল মহাশয় তাঁহাকে নিজের গৃহে বিশ্রামকক্ষে লইয়া গেলেন। সেখানে উভয়ে অনেক কথা হইল। অর্জ্জুনদেব কহিলেন ;—

"অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই।"

"রাজাধিরাজের মৃগয়াযাত্রার দিন হইতে আমরা কতক দিন নানা বিপদে নিতান্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম।"

"ভিক্ষু উপগুপ্ত এবং প্রমীতসেনের কারাবাসের কথা বলিতেছ ?"

"হাঁ, আমরা মহা আশঙ্কায় পড়িয়াছিলাম। শুধু কয়েক দিন কারাবাসের ভয় নহে। বৌদ্ধ শ্রমণ ভিক্ষুদের প্রতি যে কঠোর শাসন, তাহাতে ভিক্ষু উপগুপ্ত এবং তাঁহার অপরাধের সহকারী প্রমীতসেনের জীবন সম্বন্ধেই আমরা মহা ভীত হইয়াছিলাম। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আর আপনার অনুগ্রহে সে বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছি।"

"প্রমীতসেন ভাল আছেন ? এক কথা, মঞ্জুলা—গায়িকা মঞ্জুলার সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে ?"

অসঙ্গ বিস্মিত হইলেন, ধর্ম্মপাল মহাশয় এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?—বলিলেন ;—

"হাঁ, আছে। মধ্যে মধ্যে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া থাকে।"

"প্রমীতও তাহাকে চিনেন ?"

"প্রমীত যে তাহাকে চিনেন, অথবা তাহার গৃহে কোন দিন গিয়াছেন, তাহা আমি শুনি নাই।"

"সেখানে ত অনেকেই যাইয়া থাকে ?"

"তাহা সত্য, কিন্তু প্রমীত ত কোন দিন যায় নাই।"

"মঞ্জুলা বিদুষী, মঞ্জুলা রূপসী, মধুর-গায়িকা; তাহার গীত শুনিবার জন্য কি প্রমীত কোন দিন যাইয়া থাকেন না ?"

"না; তবে সেদিন বসন্তোৎসবে প্রমীত মঞ্জুলাকে দেখিয়াছেন।"

"সেই কি প্রথম দেখা ?"

অসঙ্গ আরও বিস্মিত হইলেন, বলিলেন;—

"আমি যতদূর জানি, সেই প্রথম দেখা।"

ধর্ম্মপাল কিছুকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন,—

"সেদিন তোমাদের অত অনুরোধেও আমি প্রমীতকে ছাড়িয়া দি নাই, কিন্তু শেষে তৃতীয় দিনে হঠাৎ তাহাকে নিষ্কৃতি দিয়াছি। কেন দিয়াছি, জান ?"

"না। আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম। মহারাজাধিরাজ রাজধানীতে ছিলেন না, তিনি ফিরিয়া আসিয়া বিচার করিবেন, ইতিমধ্যে প্রমীত মুক্তি পাইলেন।"

"অবশ্যই ইহার মধ্যে একটা গূঢ় রহস্য আছে।"

"নিশ্চয়ই আছে।"

"প্রমীতের নিষ্কৃতির জন্য মঞ্জুলা অনুরোধ করিয়াছিল।"

"মঞ্জুলা! আপনি মঞ্জুলার অনুরোধে প্রমীতসেনকে বিনা বিচারে ছাড়িয়া দিয়াছেন!"

"পাগল তুমি!—মঞ্জুলা মহারাজ্ঞী দেবী কারুবকীকে ধরিয়াছিল. দেবীর আদেশে আমি প্রমীতকে ছাড়িয়া দিয়াছি।"

ক্ষণকালের জন্য পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ধর্ম্মপাল তখন বলিলেন,—

"তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, প্রমীতের সঙ্গে কি মঞ্জুলার পরিচয় আছে ? প্রমীত মঞ্জুলার কে ?"

'আমি ত জানি কেহ নহে, কোন দিন আলাপ-পরিচয়, দেখা-সাক্ষাৎও নাই।"

"এমন গুরু অপরাধে রাজবিচার-প্রতীক্ষার কারারুদ্ধ সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির নিষ্কৃতির জন্য মহারাজ্ঞী দেবীকে অনুরোধ! তুমি জান, প্রমীতের পিতার সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ও বন্ধুতা ছিল, প্রমীত আমার স্নেহের পাত্র; এত সহজে প্রমীত মুক্তি পাওয়াতে আমি আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু ইহার মধ্যে একটা বৃহৎ রহস্য আছে। তুমি প্রমীতের অন্তরঙ্গ বন্ধু, তুমি সহজে এ রহস্য উদ্ধার করিতে পারিবে।"

ধর্ম্মপালকে নমস্কার করিয়া অসঙ্গ বিদায় হইলেন। কুমুদনিবাস অভিমুখে যাইতে যাইতে অসঙ্গ অনেক ভাবিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পরেই ত বসন্তোৎসবে প্রমীত মঞ্জুলাকে প্রথম দেখিয়াছেন, তাহার পূর্ব্বেই ত

মঞ্জুলা দেবী কারুবকীকে অনুরোধ করিয়াছিল! আর, বসন্তোৎসবের দিনও ত তাহাদের মধ্যে কোন আলাপ পরিচয় হয় নাই। সেই গায়িকাই যে মঞ্জুলা, প্রমীত তাহা অসঙ্গের নিকটই জানিয়াছিলেন! কতদিন ত অসঙ্গ প্রমীতকে মঞ্জুলার কথা বলিয়াছেন, মঞ্জুলার গৃহে যাইবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছেন, প্রমীত সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তবে কেন এই অপরিচিতের জন্ত মঞ্জুলার অতটা আগ্রহ? প্রমীত কি মঞ্জুলাকে পূর্ব্বেই জানিতেন, পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের মধ্যে পরিচয় ছিল, প্রমীত সে পরিচয় গোপন করিয়া চলিয়াছেন?—না। তবে ব্যাপারটা কি?

প্রমীত যেন কোথায় যাইতেছিলেন, অসঙ্গকে দেখিয়া বলিলেন;—

"সে কি! আজ ক'দিন তোমাকে দেখিতে পাই নাই কেন?"

"নগরে ছিলাম না। তুমি কোথায় যাইতেছ? বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে কি?"

"না।"

"যাইয়া কাজ নাই, বিশেষ কথা আছে, ঘরে চল।"

উভয় বন্ধু তখন প্রমীতের এক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রমীত জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"কি কথা?"

উভয়ে শয্যায় বসিলে অসঙ্গ বলিলেন;—

"কি সুকৃতিবলে, কাহার অনুরোধে সেদিন কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়াছিলে, জানিতে পারিয়াছ কি?"

"না। কেমন করিয়া জানিব?"

"আমি জানিতে পারিয়াছি।"

"তুমি জানিতে পারিয়াছ! কেমন করিয়া জানিলে? কি জানিলে?"

"ধর্ম্মপাল মহাশয় স্বয়ং আমাকে বলিয়াছেন।"

"কবে?"

"এই এখনই বলিলেন, তাঁহার নিকট হইতে এই আসিতেছি।"

প্রমীতের মুখ কৌতূহলময়, কিন্তু অসঙ্গ কেমন যেন স্থিরগম্ভীর!

"মঞ্জুলা—বিদুষী, রূপসী, কলকণ্ঠী মঞ্জুলা তোমার জন্ত অনুরোধ করিয়াছিল!"

"মঞ্জুলা!"

"হাঁ, মঞ্জুলা। মঞ্জুলা মহারাজ্ঞী কারুবকীকে ধরিয়াছিল, তাঁহার আদেশে ধর্ম্মপাল তোমাকে মুক্তি দিয়াছিলেন।"

বিস্মিত প্রমীত জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

"এ নগরে শত সহস্র লোকের বাস, মঞ্জুলা কেন তোমার জন্ত এত ব্যস্ত? সে কেন রাজ্ঞীকে ধরিল?—মঞ্জুলাকে কি তুমি চিনিতে, তাহার সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল?"

"কোন দিন ত দেখা সাক্ষাৎ আলাপ নাই!" প্রমীতের মুখ যেন হঠাৎ হর্ষবিকশিত হইয়া উঠিল।—"ও হোঃ। এখন বুঝিতে পারিতেছি, মঞ্জুলা কেন আমার জন্ত এত করিয়াছে!"

"কেন করিল?—সে তোমার কে? আমার কাছে কিছু গোপন করিয়াছ?"

অসঙ্গের কথার স্বর কিঞ্চিৎ শ্লেষযুক্ত, কথার ভঙ্গিতে যেন আহত সৌহার্দ্দের ঈষৎ

ঝঙ্কার, কেমন যেন ক্ষুণ্ণ অভিমানের আভাস! প্রমীত হাসিয়া বলিলেন ;—

"আমার কেহই নহে। তোমার কাছে কিছুই গোপন করি নাই, কিন্তু একটা বিষয় গোপন রহিয়া গিয়াছে।"

"বটে?"

"আগে শুন।"

তখন প্রমীত সেই দুর্য্যোগময় রাত্রিতে নগরোপকণ্ঠে সেই বিপন্না রমণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং উদ্ধারবৃত্তান্ত সমস্ত অসঙ্গকে বলিলেন। ঘটনা শুনিয়া অসঙ্গ চমৎকৃত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে সে রমণী?"

"শুন, তাহার কোন পরিচয় সেদিন পাই নাই। তাহার পর রাজার মৃগয়া-যাত্রার পর আমার কারাবাস। তথা হইতে মুক্তির পর সেদিন বসন্তোৎসবে, তুমি জান, সেই গায়িকাকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। তুমি আমার বিস্ময় এবং কৌতূহল দেখিয়া পরিহাসও করিয়াছিলে। রাত্রিকালে অস্পষ্ট আলোকে দৃষ্ট সেই বিপন্নার সঙ্গে গায়িকার যেন কেমন একটুকু সাদৃশ্যের আভাস পাই। কিন্তু গায়িকা যে নগরপ্রসিদ্ধা মঞ্জুলা, তাহা তোমার মুখে শুনি। তাহার পর সেই বিপন্নার এক আমন্ত্রণপত্র পাইয়া একদিন তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ জন্য তাহার গৃহে যাই, সেদিন সকল সন্দেহ দূর হয়। বিপন্নাই যে মঞ্জুলা সেই দিন তাহা জানিতে পারি। আজ দুই দিন হইল, তোমার সঙ্গে দেখা নাই, তোমাকে এ সকল কিছুই জানাইতে পারি নাই।"

জটিল ঘটনার এই অকপট বিবৃতিতে অসঙ্গের আশঙ্কা, সন্দেহ চলিয়া গেল। স্মিতমুখে অসঙ্গ বলিলেন,—

"আমার কাছে তোমার কথা মঞ্জুলা অনেক দিন শুনিয়াছে, কিন্তু তুমিই যে প্রমীতসেন, মঞ্জুলা তাহা সে রাত্রিতে কেমন করিয়া জানিল?"

"সেদিন ঝড়-বৃষ্টির পরে তাহাকে গৃহে পাঠাইবার সময় মঞ্জুলা মিনতি করিয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমি আমার পরিচয় তাহাকে দিয়াছিলাম। কিন্তু মঞ্জুলা নিজ-পরিচয় আমাকে দেয় নাই, আমিও বিপদগ্রস্তা অপরিচিতা সম্ভ্রান্তমহিলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাই নাই। আমি তাহাকে তাহার নিজ-গৃহে পৌঁছাইয়া দিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু মঞ্জুলা তাহাতে স্বীকার হয় নাই; সৌভাগ্য থাকিলে সময়ে একদিন পরিচিত হইয়া জীবন সার্থক করিবে, এরূপ বলিয়াছিল।"

"মঞ্জুলা তাহার পর কবে নিজগৃহে তোমাকে আহ্বান করিয়াছিল?"

"বসন্তোৎসবের পর দিন।"

"সে ত তোমার কারাবাসের পরে। দেখিতেছি তার পূর্ব্বেই তোমার মুক্তির জন্য মঞ্জুলা রাজ্ঞীকে ধরিয়াছিল?"

"হাঁ, সেই দুর্য্যোগময় রাত্রিতে তাহার যে সামান্য কিঞ্চিৎ উপকার করিয়াছিলাম, তাহাই স্মরণ করিয়া মঞ্জুলা অযাচিতভাবে আমার এই মহদুপকার করিয়াছে!"

তখন দুই বন্ধু মঞ্জুলার চারিত্র্য ম হাত্ম্যে মুগ্ধ হইলেন, অসঙ্গ বলিলেন ;—

"ধর্ম্মপাল মহাশয়ের সন্দেহ, ইহার মধ্যে একটা বৃহৎ রহস্য আছে। তোমাদের মধ্যে

জানাশুনা, আলাপ-পরিচয়, আরও কিছু”—অসঙ্গ হাসিয়া বলিলেন,—“অবশ্যই কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে; সামান্য কারণে মঞ্জুলা মহারাজ্ঞীকে অনুরোধ করিবার সাহস পাইত না।”

“এখন তোমার সন্দেহ দূর হইল? নিগূঢ় সম্বন্ধ কিছুই নাই। দূর হইতে এক দিন দেখা, নিকটে যাইয়া এক দিন সাক্ষাৎ, তাহাও আমার মুক্তিলাভের পরে। তুমি বস, আমি উৎপলাকে এই সংবাদ দিয়া আসি।”

“আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে, আমি বিলম্ব করিতে পারিব না। পাটলীগ্রামে যাইতেছিলাম, ধর্ম্মপাল মহাশয়ের নিকট সংবাদ শুনিয়া তোমাকে জানাইতে এবং গূঢ় রহস্য ভেদজন্য আসিয়াছি। আমার ভাগিনেয় অরুণ অত্যন্ত অসুস্থ, এখনি আমাকে সেখানে যাইতে হইবে।”

“আমি সঙ্গে আসিব?”

“আজ আবশ্যক নাই; পীড়া যদি বাড়ে, তোমাকে সংবাদ দিব।”

অসঙ্গ উঠিলেন, প্রমীতও উঠিলেন। যাত্রাকালে অসঙ্গ বলিলেন;—

“মঞ্জুলা অতি গুণবতী।”

“তোমার মুখে তাহা বহুদিন শুনিয়াছি।”

“মঞ্জুলা রাজ্ঞী কারুবকীর স্নেহ পালিতা কন্যা, মহাধনশালিনী।”

“তাহার গৃহ, গৃহের সাজ-সজ্জা রাজরাণীর উপযুক্ত।”

“মঞ্জুলা অপূর্ব্বরূপসী।”

“দুর্লভ রূপ! নিজচক্ষে দেখিয়াছি।”

“মঞ্জুলা হৃদয়শালিনী, উপকারীর প্রত্যুপকার করিতে জানে।”

“আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে, আমাকে চিরঋণী করিয়াছে।”

“দেখিও—ধনমান, রূপযৌবন, বাক্‌-চাতুর্য্য, ললিত-কলা আর কোমল কৃতজ্ঞ হৃদয়—ইহাদের অজেয় রক্তমাংসগঠিত মানুষ সংসারে বড় দুর্লভ।”

প্রমীত হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন;—

“তুমি পাগল!—আমার কিসের অভাব?”

রক্ষা-কবচের স্নিগ্ধপবিত্রপ্রভাবে ত প্রমীতের চিত্ত নিত্য সুরক্ষিত! কিসের ভয়?

অসঙ্গ চলিয়া গেলেন, অন্তঃপুরে স্ত্রীর কক্ষে দ্রুত প্রবেশ করিয়া প্রমীত ব্যস্ত-সমস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

“কৈ গো, কোথায়?”

গৃহকোণে উৎপলা যেন কি করিতে-ছিলেন, অগ্রসর হইয়া বলিলেন;—

“এই ত এখানে,—এত ব্যস্ত কেন?”

“শুনিয়াছ, কাহার অনুরোধে, কেমন করিয়া আমি কারামুক্ত হইয়াছিলাম?”

“না, তুমিই ত তাহা কিছুই জানিতে পার নাই, আমি আর কেমন করিয়া জানিব?”

“আমি জানিতে পারিয়াছি।”

স্মিতসকৌতুকমুখে উৎপলা আরও অগ্রসর হইয়া স্বামীর সম্মুখে অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

“কি জানিলে? কে তোমাকে বাঁচাইল?”

“মঞ্জুলা!”

“মঞ্জুলা?”

উৎপলার গা শিহরিয়া উঠিল. তাঁহার হৃদয়ে যেন সহসা নিমেষস্থায়ী শূচীবেধ-যন্ত্রণা অনুভূত হইল। সেই "চির-উপকৃতা" রূপসী যুবতী মঞ্জুলা!

"হা, মঞ্জুলা। মঞ্জুলা আমার কারামুক্তির জন্য মহারাজ্ঞী কারুবকীকে ধরিয়াছিল, দেবীর আদেশে আমি নিষ্কৃতি পাইয়াছি।"

"তুমি ব'স। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সব কথা বল। মঞ্জুলা কেন এত করিল?"

প্রমীত পালঙ্কে বসিলেন, হাত ধরিয়া উৎপলাকেও বসাইলেন। তখন অসঙ্গের নিকট শ্রুত সকল কথা স্ত্রীর কাছে বিবৃত করিলেন। উৎপলা বলিলেন ;—

"তুমি সেদিন তাহার গৃহে যাইবার পূর্ব্বে—বসন্তোৎসবের পূর্ব্বেই তবে মঞ্জুলা মহারাজ্ঞীকে ধরিয়াছিল। তখন ত তোমার সঙ্গে তাহার আলাপ-পরিচয় সাক্ষাৎও হয় নাই।"

"সেই বৃষ্টি-দুর্য্যোগময় রাত্রিতে মঞ্জুলা আমার পরিচয় পাইয়াছিল।"

"সেদিন তুমি যে তাহার সামান্য উপকার করিয়াছিলে, তাই মনে করিয়াই কি মঞ্জুলা তোমার এই মহদুপকার—তোমার মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছে?"

"হা, নিশ্চয়ই তাই।"

"তারপর সে দিন তাহার আমন্ত্রণে তুমি তাহার গৃহে গিয়াছিলে, সে দিনও কি তাহার কথাবার্ত্তা আলাপপ্রসঙ্গে সে যে তোমার জন্য এত করিয়াছে তাহা কিছুই বুঝিতে পার নাই?"

"কিছুই না। মঞ্জুলা যে আমার এই মহাপ্রত্যুপকার করিয়াছে, আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি, তাহা আমরা কোন মতে জানিতে না পারি, তাহাই তাহার ইচ্ছা।"

উৎপলার চিত্ত বিগলিত হইল। অমূলক সন্দেহ অনুদার ঈর্ষার ম্লান-ছায়া তাহার অন্তর হইতে বিদূরিত হইল। এমন গুপ্ত পরমোপকারিণী রমণীকে সন্দেহ? স্নেহ, প্রীতি, কৃতজ্ঞতা, অকৃত্রিম, সৌহার্দ্দ্যে উৎ-পলার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আবেগময় হৃদয়ে উৎপলা বলিলেন ;—

"আমি মঞ্জুলার সঙ্গে দেখা করিব।"

"আমি তোমার অনুমতির প্রতীক্ষা করিতেছি, আমি এখনি যাইব।"

"অনুমতি? এখন হিতকারিণী পরম সুহৃদের কাছে যাইবে, তাহার জন্য আমার অনুমতি? আমরা যে চিরদিনের জন্য মঞ্জুলার নিকট বিক্রীত। যখন তোমার ইচ্ছা, তখনই যাইবে। তবে, আজ এখন আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

"তুমি আজ না-ই গেলে, কখনো যাও নাই। পরে আর এক দিন যাইও, আজ আমি যাই।"

"যাও, আমার কথা বলিও। আমি যে চিরকাল তাহার নিকট বাধাঁ রহিলাম, তাহা বলিও। একটুকু বিলম্ব কর, আমি মঞ্জুলার জন্য কি পাঠাইব? কিছু ফুলমালা পাঠাইব, কে লইয়া যাইবে? তোমার সঙ্গে কে যাইবে?"

"বাদল যাইবে, আরও যেন কেহ যায়, তুমি সব ঠিকঠাক কর।"

উৎপলা মাধবীকে ডাকিয়া তাড়াতাড়ি

শুভ্রসুগন্ধি সুশোভন পুষ্প, পুষ্পগুচ্ছ এবং মাল্য সংগ্রহ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চন্দ্র ও বামন

রাজধানীতে সোমদত্ত একজন বিখ্যাত পরিচিত লোক। পিতা প্রচুর ধনসম্পত্তি-শালী ছিলেন, কিন্তু সোমদত্ত প্রথম বয়স হইতেই বড় উচ্ছলপ্রকৃতি। পিতার মৃত্যুর পর সেই ধনের অধিকারী হইয়া নানাপ্রকার অযথাব্যয়ে সোমদত্ত তাহা প্রায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছিল। তথাপি ব্যয়ের শমতা নাই। বড় হাত ছোট করা সহজ নহে। দাসদাসী, আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিল না। আমোদপ্রমোদ, নৃত্যগীত, পান-প্রসঙ্গে ব্যয়ের মাত্রা বরং বৃদ্ধি পাইতেছিল। লোকে মনে করিত, অগাধ সম্পত্তি, অক্ষয় ভাণ্ডার। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার প্রকৃত অবস্থা জানিতেন, তাঁহারা ভাবিতেন, আর কয় দিন? দ্যূতগৃহে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে লোকে দেখিয়াছে, গ্রামে সভিকের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা থাকায় লোকে সন্দেহ করিতে লাগিল।

বেলা অপরাহ্ণে সোমদত্ত মঞ্জুলার গৃহে আসিয়াছিল। বাহকগণ ভারে ভারে ফল-ফুল মাল্যসম্ভার আনিয়াছে। মাতা অলোকার সঙ্গে সোমদত্তের কথা হইতেছিল। চঞ্চলা আসিয়া জানাইয়াছে, মঞ্জুলার অসুখ, দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই। অলোকা বলিলেন,—

"আজ কতদিন যাবৎ মঞ্জুর শরীর যেন কেমন হইয়াছে। একটী দিনও ভাল যাইতেছে না।"

"কত দিন তাহাকে দেখি নাই। কি হইয়াছে?—আর একবার সংবাদ দিবেন?"

অলোকা আর একবার পরিচারিকাকে পাঠাইলেন। সে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, ভারি অসুখ। পরিচারিকা চলিয়া গেল। কিছু কাল নীরব থাকিয়া সোমদত্ত বলিলেন,—

"আমার সৌভাগ্যোদয় কবে হইবে!"

"আমার মনের ভাব আপনি জানেন।"

"তাহা ত জানি, কিন্তু মঞ্জুর মনের ভাব আজও বুঝিতে পারিলাম না। সে দিন কেয়ূর ফিরাইয়া দিয়াছিল, বন্ধুবান্ধবের সাদর উপহার গ্রহণে কি দোষ?"

"দোষ কিছুই নহে। মঞ্জুর দুই তিন প্রস্থ কেয়ূর আছে, কেন আপনি অর্থব্যয় করিয়া অত মণি মুক্তা খচিত মূল্যবান উপহার পাঠাইলেন?"

"যথাসর্ব্বস্ব দিয়াও যেখানে তৃপ্তির সম্ভাবনা নাই, সামান্য মূল্যের কেয়ূর সেখানে উল্লেখযোগ্যও নহে।"

"মঞ্জুলার বালিকা-বুদ্ধি আজও যায় নাই। ধনসম্পদ, মানসম্ভ্রম, যশগৌরবে আপনার মত আর কোথায় মিলিবে? আপনি ব্যস্ত হইবেন না।"

"অনেক দিনের আশা!"

শুধু আমার হাত হইলে এতদিন আপনার আশা এবং আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইত না। কিন্তু রাজ্ঞী কারুবকী মঞ্জুর অভি-ভাবিকা।"

সোমদত্তের মনে পড়িল, প্রমীতের কারা-মুক্তির পূর্ব্বদিন ত মঞ্জুলা রাজ্ঞীর নিকট গিয়াছিল। মঞ্জুলা কি প্রমীতের জন্য রাজ্ঞীকে অনুরোধ করিয়াছিল? মঞ্জুলা ত প্রমীতকে চিনে না! তখন আর এক দিনের কথা সোমদত্তের মনে পড়িল; সে দিন সন্ধ্যা

সময়ে প্রমীতসেন এই দিকেই আসিতেছিলেন মঞ্জুলার ভৃত্য বাহুক তাঁহার সঙ্গে ছিল! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"শুনিতে পাই, রাজ্ঞী কারুবকীর পিতা ভিক্ষু উপগুপ্তের শিষ্য ছিলেন ?"

"আমিও তাহা শুনিয়াছি, কিন্তু বৌদ্ধমত অবলম্বনের পূর্ব্বেই তাঁহার অভাব হয়। রাজ্ঞী কারুবকী কিন্তু ভিক্ষুকে পিতৃগুরু বলিয়া চিরদিন শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন।"

"তাই বুঝি রাজাধিরাজের মৃগয়াযাত্রার দিন অতিগুরু অপরাধ করিয়াও শেষে রাজ্ঞীর অনুরোধে ভিক্ষু নিষ্কৃতি লাভ করেন ?

"অতি সম্ভব।"

"প্রমীতসেনও অপরাধী ছিলেন ; তাঁহার মুক্তি কেমন করিয়া হইল, কিছু শুনিয়াছেন কি ?"

প্রকৃত অপরাধী ভিক্ষুই যখন মুক্তি পাইলেন, তখন তাঁহার সহকারী বলিয়া ধৃত প্রমীতসেন আর কেমন করিয়া দণ্ডিত হইবেন ?"

"ভিক্ষুর মুক্তির পূর্ব্বেই ত প্রমীতসেন নিষ্কৃতি পাইয়াছে।"

"হাঁ, তাঁহার অতি সৌভাগ্য !"

সোমদত্ত আর কথা বাড়াইলেন না। তাঁহার মনের সন্দেহ মিটিল না ; কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞাসা করা তিনি সমীচিন বোধ করিলেন না। বলিলেন ;—

"অমন বিপদ হইতে অত সহজে রক্ষা পাওয়া অতি সৌভাগ্যের ফল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার মুক্তিতে সমস্ত রাজধানী আনন্দিত।—মঞ্জুর সঙ্গে আজ আর দেখা হইল না, আপনি আমার কথা তাহাকে বলিবেন। আপনি ভরসা দিয়াছেন, তাই আশায় বুক বাঁধিয়া আছি।"

"আমি ত সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি।"

বিনীত নমস্কার করিয়া সোমদত্ত তখন বিদায় হইলেন।

কন্যা বয়স্থা হইয়াছে, মাতা অনেক দিন হইতে তাহার বিবাহের চেষ্টা করিতেছেন। মঞ্জুর রূপগুণ-ধন-মুগ্ধ প্রার্থীর অভাব ছিল না। কিন্তু তাহার সম্যক্ উপযুক্ত বর সংঘটন পক্ষে যে সকল অন্তরায় ছিল, অলোকা তাহা জানিতেন। বিশেষতঃ রাজ্ঞী কারুবকীর অভিমত না হইলে, অনুমতি না পাইলে মাতা কিছুই করিতে পারেন না।

মঞ্জুলার অসামান্য রূপগুণবিদ্যা-গৌরবের কথা শুনিয়া অনেক সম্ভ্রান্ত প্রবীণ লোক তাহার গৃহে সময় সময় আসিয়া আপ্যায়িত হইয়া যাইতেন। কৌতূহল-পরবশ হইয়া সোমদত্তও একদিন মঞ্জুলার পরিচিত এক জনের সঙ্গে আসিয়াছিলেন ; আসিয়া, দেখিয়া শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। সেই হইতে তিনি মধ্যে মধ্যে আসিতে লাগিলেন। শেষে একদিন নিজের মনের ভাব প্রকারান্তরে মাতা অলোকাকে জানাইলেন। সোমদত্তের প্রস্তাবে মাতার মন বিচলিত হইল। এমন লোকের সঙ্গে কন্যার বিবাহ প্রস্তাবে মাতা অমত করিতে পারিলেন না। সোমদত্ত বিপত্নীক। সমাজে, নগরে সোমদত্ত সুপরিচিত, মানসম্ভ্রমে সোমদত্ত প্রার্থনীয়। কিন্তু মঞ্জুলা বয়স্থা হইয়াছে। অবস্থা, শিক্ষা এবং সংসর্গগুণে আশৈশব স্বাধীনচিত্তা কন্যার অভিমত অথবা মনের গতি না জানা পর্য্যন্ত মাতা আর অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না॥

কন্যার মন জানিতে পারিলেই রাজ্ঞীর নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন।

এদিকে সোমদত্তের মনে আশার সঞ্চার হইল। আশা ক্রমে ঔৎসুক্যে পরিণত হইল। রূপগুণে মঞ্জুলা আকাঙ্ক্ষনীয়া, কিন্তু সোমদত্তের পক্ষে তদপেক্ষাও গুরুতর আর এক হেতু ছিল। সোমদত্তের অবস্থা ভাল নহে, বরং তাহা ক্রমে অতিমন্দই হইয়া আসিতেছিল, অর্থাভাবে সমাজে মানমর্য্যাদা প্রভৃতি রক্ষা তাঁহার পক্ষে ক্রমে কঠিন হইতেছিল। মঞ্জুলার বিপুল সম্পত্তি; মঞ্জুলা হস্তগত হইলে, সেই অর্থাভাব দূর হয়। সোমদত্ত ক্রমে অতি ব্যগ্র, উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

সোমদত্ত চলিয়া গেলে অলোকা অনেক ভাবিলেন; কেয়ূর গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করার পর হইতে তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল; শেষে বয়স্থা কন্যার অভিমত প্রতীক্ষায় বিলম্ব করাই তিনি সঙ্গত মনে করিলেন। কন্যাকে তিনি কিছু ভয় করিয়াই চলিতেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ক্ষুণ্ণ গৌরব

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে মঞ্জুলা নিজের কক্ষে শয্যায় বসিয়া বীণার স্বরলয়ে গীত গাহিতেছিল;—

ক্যায়সে কহো শ্যাম ভিখারী।
তোঁহারি দরশ বিনু, নিঠুর কাহ্নাইয়া,
আঁখিসে লোর ঝরে সো পেয়ারী।
বরিখয়ে সুধা গগনে চন্দ্রমা,
বিখে জ্বরে অঙ্গ গোপনারী।
দহতি অঙ্গ মল্লিকা মালতী,
তুঁহু পরদেশে চিত চোরি!

মঞ্জুলার সুন্দর সুগোল গৌর মুখমণ্ডলে শারীরিক কোন প্রকার অসুখের কোন লক্ষণ প্রকাশ নাই। বিদ্যুৎগর্ভ নবীন মেঘবৎ নিবিড়কৃষ্ণ তারকাযুক্ত তাহার আয়ত চক্ষু, দীর্ঘ সূক্ষ্ম ঘোরকৃষ্ণ কোমল পক্ষ্মশ্রেণী আর চিত্রলিখিতবৎ মিলনোন্মুখ বঙ্কিম ভ্রূযুগের মৃদু আকুঞ্চন এবং স্পন্দনে গীতকথার গুপ্ত ভাব এবং বীণার স্বরসঙ্গতির অভিব্যক্তি হইতেছিল। সাজসজ্জা অলঙ্কার সমাবেশের কোন আড়ম্বর নাই, তথাপি তাহার স্ফুরদুজ্জ্বলশ্রী ক্ষীণ দেহ বসন্তে নবকুসুমিতা মাধবীলতার মনোহর স্বাভাবিক লাবণ্যময়।

মঞ্জুলা গাহিল;—

বরিখয়ে সুধা গগনে চন্দ্রমা,
বিখে জ্বরে অঙ্গ গোপনারী।
দহতি অঙ্গ মল্লিকা মালতী,
তুঁহু পরদেশে চিত চোরি!

চঞ্চলা বলিল;—

"চাঁদের কিরণে শরীর জ্বালা করে, মল্লিকা মালতী অঙ্গ দগ্ধ করে, তুমি তাহা কেমন করিয়া জানিলে?"

"জানিব আবার কি? লোকে চিরকাল ওরূপ বলিয়া আসিতেছে; তুই শুনিস্ নাই?"

"অমন অনাসৃষ্টি কথা আমরা শুনি নাই।"

"তুই শুনিস্ নাই বলিয়াই কি তা মিছা হইবে?"

"প্রতিদিনই ত চাঁদের কিরণে কত হাঁটি, বসিয়া থাকি, কাজকর্ম্ম করি; মল্লিকা মালতী যুঁই জাতি তুলিয়া কত মালা গাঁথি; কোনদিনও শরীর জ্বালা করে না!"

"তোর ত পাথরের শরীর, তার আর জ্বালা-যন্ত্রণা কি ?—শোন্ ;"—

তুঁহু পরদেশে চিত চোরি !

চঞ্চলা হাসিয়া উঠিল, বলিল ; —

"ওহো ! এখন বুঝিলাম, কেন জ্বালা !"

"তুই কি ও ভাবের জ্বালা কখনো সহিয়াছিস্ ?"

"আমার ত পাথরের শরীর। তবে শুনিয়াছি, আমার এক বড় ভগ্নী ছিল, তার ননদ না কি ঐরূপ জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছিল।"

"কি হইয়াছিল রে ?"

"তার স্বামী না কি বিদেশে চলিয়া যায়, আর ফিরিয়া আসে না। ঘরে আর কেহ ছিল না, অনাহারে জ্বলিয়া পুড়িয়া শেষে সে না কি মরিয়া যায়।"

"দূর অভাগী ! অনাহারে মরা হইল এক, আর আশাভঙ্গে—প্রিয়জনের অদর্শনে—জ্বলিয়া মরা হইল আর এক কথা।"

"তা হ'লে এই যে সোমদত্ত মহাশয় কত আশা করিয়া কতদিন এখানে আসেন, আজও আসিয়াছিলেন, তিনিও জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবেন ?"

"কে কোথায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, আমি তাহা কেমন করিয়া জানিব ? আর তাহাতে আমার কি ?"

"সোমদত্ত মহাশয়ের কথা তুমি জান। আমি যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি, ঠাকুরাণীর যেন সেই ইচ্ছা !"

মঞ্জুলার হাসিমুখ গম্ভীর হইল। ক্রোড় হইতে বীণা সরাইয়া রাখিয়া মঞ্জুলা বলিল ;—

"তুইও কি সেই দিকে ?"

চঞ্চলা একটুকু অপ্রতিভ হইল। সোমদত্তের সঙ্গে একদিন তাহার কিছু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে ত কোন পক্ষ অবলম্বন করে নাই। শুধু গৃহস্থের মন বুঝিবার জন্য আজ এ ঢিল মারিয়াছে। চঞ্চলা অভিমান-ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিল ;—

"আমি ! কেন তোমার এ সন্দেহ হইল ? আমার কোন দিক্-বিদিক নাই ; তোমার যে দিক্, আমারও সেই দিক্।"

মঞ্জুলার মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। মঞ্জুলা বলিল ;—

"শোন্, চাঁদের কিরণে যে গা জ্বলে, তাহা আমি জানি না ; আমার গা ত কোন দিন জ্বলে নাই। সে কথা যাক্। তুই না এক দিন বলিয়াছিলি, দ্যূতগৃহ হইতে সোমদত্ত মহাশয়কে বাহির হইতে দেখিয়াছিস্ ?"

"একদিন দেখিয়াছিলাম বটে।"

"মা'র মনের ভাব আমি কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। আমার মনের ভাব কিছু বুঝিতে পারিয়াছিস্ ?"

"আজ বুঝিলাম।"

"তবে আর সে কথায় কাজ নাই। সন্ধ্যা হইল, চিত্রাকে আলো জ্বালিতে বল্।"

চঞ্চলা উঠিয়া দাঁড়াইল। মঞ্জুলা বীণা তুলিয়া লইয়া পুনরায় মৃদুমৃদু ঝঙ্কার দিতে লাগিল। এমন সময় চিত্রা কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল ;—

"প্রমীতসেন মহাশয় আসিয়াছেন।"

মঞ্জুলা তাড়াতাড়ি বীণা রাখিয়া দিল।

"কোথায় তিনি ?"

"ঠাকুরাণীর ঘরে।"

"তুই আলো জ্বাল। চঞ্চলা, চল আমরা বারান্দায় যাই।"

বিস্রস্ত কেশে, বিপর্য্যস্ত বেশেই মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার আয়তচক্ষে অতর্কিতে চলৎবিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল, অধরে স্মিতরেখা দেখা দিল, অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। চতুরা চঞ্চলা সকলই লক্ষ্য করিল। সে মনে মনে ভাবিল, বটে? এখন হইতে চাঁদের কিরণে গা জ্বালা করিবে!

দাসী পরিচারিকারা আলো জ্বালিতে লাগিল। চঞ্চলা দ্রুতহস্তে মঞ্জুলার কেশপাশ এবং বেশভূষার একটুকু শৃঙ্খলা করিল। একখানি ঈষদলক্তকরক্ত ওড়নি আনিয়া তাহার অঙ্গে পরাইয়া দিল।

বারান্দায় ছোট ছোট বেত্রাসন, পালঙ্ক, তাহাতে পুরু শয্যা। নিম্নে কত লতা—মুক্তা, মাধবী, লবঙ্গ—দক্ষ মালীর যত্নকৌশলে ক্রমে বৰ্দ্ধিত হইয়া বারান্দার স্তম্ভগুলি ঘিরিয়া ঘিরিয়া উপরে ছাদ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। লতায় কত ফুল! অস্তোন্মুখ রক্তরবি-কিরণে পশ্চিমাকাশ তখন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে সে অপূর্ব্ব শোভা পরিলক্ষিত হয়। সেখানে পৌঁছিয়া মঞ্জুলা বলিল;—

"মালী নিত্যকার ফুলমালা দিয়াছে?"

"হাঁ, এখানে আনিব কি?"

"এখন না, সময় হইলে আনিবি। চঞ্চলা, এখানে থাক্; চিত্রা, তাঁহাকেএখানে লইয়া আয়।"

প্রমীতসেন বারান্দায় পৌঁছিলে মঞ্জুলা সলজ্জ মৃদুপদে অগ্রসর হইয়া তাঁহার সম্বৰ্দ্ধনা করিল। স্মিতমুখে বলিল;—

"কি সৌভাগ্য আমার! এ সামান্য স্ত্রীলোককে আপনি বিস্মৃত হন নাই!"

"বিস্মৃত হইব? আপনি—তুমি এ অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তিকে চিরজীবনের জন্য ঋণী করিয়াছ। আগে জানিতে পারি নাই, জানিতে পারিলে কোন্ দিন আসিয়া এমন হিতকারিণীকে ধন্যবাদ—ধন্যবাদে কি কখনো চিত্তের তৃপ্তি হইতে পারে?—"

"কি জানিতে পারিয়াছেন?—আপনি বসুন।" প্রমীতসেন একখানি আসনে বসিলেন, বলিলেন,—

"জানিতে পারিয়াছি—তোমার অনুগ্রহে কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়াছি, তোমার অনুগ্রহে আমার মান, সম্ভ্রম, জীবন রক্ষা পাইয়াছে। সেদিন তোমারগৃহে আসিয়া অতুল আনন্দ ভোগ করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার নিকট যে আমি এত ঋণী, তাহা ত জানিতাম না।"

"আপনার কারামুক্তিতে আমাদের যে কত আনন্দ হইয়াছে, তাহা আপনাকে কেমন করিয়া জানাইব?"

"আমার এমন মহোপকার তুমি করিয়াছ; কিন্তু সে কথা অপ্রকাশ রাখিয়াছ! আজ আমি সকলই শুনিয়াছি।"

প্রমীত তখন অসঙ্গের নিকট শ্রুত নিজের কারামুক্তির ইতিবৃত্ত মঞ্জুলাকে জানাইলেন। কিন্তু ধর্ম্মপালের নাম প্রকাশ করিলেন না, অসঙ্গ তাহা নিষেধ করিয়াছিলেন। মঞ্জুলা বলিল;—

"আমি সেদিন দেবীকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলাম। কথায় কথায় নিরপরাধে আপনার কারাবন্ধের কথা তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম মাত্র। দেবী দয়াময়ী, তিনি আপনার নির্দ্দোষিতা বুঝিতে পারিয়া আপনার

মুক্তির জন্য ধর্ম্মপাল মহাশয়কে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। দেবীর দয়ায় আপনার মুক্তি হইয়াছে। আমি কিছুই করি নাই।"

"তুমি কিছুই কর নাই?—তোমার অনুরোধেই যে রাজ্ঞীর চিত্ত আর্দ্র হইয়াছিল, তাহা আমি শুনিয়াছি।"

"এই সামান্য কার্য্যের পুনরুল্লেখ করিয়া আমাকে আর লজ্জিত না করেন, আমার এই প্রার্থনা।"

"কার্য্য সামান্য নহে, আমার জীবনরক্ষা। আমরা যে তোমার কাছে চিরদিনের জন্য বাঁধা রহিলাম, তাহা তোমাকে জানাইবার জন্য আমার স্ত্রী আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। পরম সুহৃদের নিকট পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি আমার সঙ্গেই আসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। রাত্রি হইবে বলিয়া আজ তাঁহাকে বিরত করিয়াছি।"

"তিনি আমার এখানে আসিবেন?—সে কি! আমার সহস্র মিনতি"—মঞ্জুলা নতজানু হইয়া ভূমিতে প্রণাম করিল।—"আমার সহস্র প্রণাম তাঁহাকে জানাইবেন। তিনি আমার এখানে আসিবেন! তাঁহার অনুমতি পাইলে আমি তাঁহার গৃহে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইব।"

"তুমি যাইবে?"

"রাজাধিরাজের জন্মদিনের উৎসব আসিতেছে। দেবীর আদেশ, আমাকে দেবীর নিকট উপস্থিত থাকিতে হইবে। আপনি অনুমতি করুন, তাহার পরে শীঘ্র একদিন কুমুদনিবাসে যাইয়া জীবন সার্থক করিব।"

"তুমি যাইবে! গেলে আমার স্ত্রীর আনন্দের অবধি থাকিবে না। তিনি কিছু ফুল ও মাল্য উপহার পাঠাইয়াছেন, অনুমতি পাইলে ভৃত্যেরা এখানে উপস্থিত করিবে।"

"মঞ্জুলার ইঙ্গিতে চিত্রা বারান্দার অপর পার্শ্ব হইতে ফুলমাল্যের ভার সেখানে লইয়া আসিল। মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল। চিত্রার হাত হইতে সেই পুষ্পভার গ্রহণ করিয়া তাহাতে নিজ মস্তক স্পর্শ করিল।

"এখানে আঁধার হইয়া আসিল, আপনি ভিতরে চলুন।"

প্রমীত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গন্ধদীপাবলীতে কক্ষ আলোকিত হইয়াছে। প্রমীত উপবেশন করিলে মঞ্জুলা সেই পুষ্পভারের আচ্ছাদন খুলিয়া একটী সুরভি মাল্য বাহির করিল, অতিযত্নে তাহা নিজ কণ্ঠে পরিল; তখন নতমস্তকে পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া বলিল ;—

"আজ আমার দেহ পবিত্র হইল।"

স্নিগ্ধদীপরশ্মিপাতে ওড়নির অলক্তকরাগ মঞ্জুলার হর্ষপ্রফুল্ল গৌরমুখ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল।

উৎপলা পরমসুন্দরী। বয়স্যসম্প্রদায়ে প্রমীতসেনের গৌরব—অমন সুন্দরী স্ত্রী আর কাহারও নাই। প্রেমিকের চক্ষে ত কত কুরূপাও সুন্দরী, কিন্তু উৎপলা স্বভাব-সুন্দরী। প্রমীতের বিশ্বাস এবং অহঙ্কার অমন রূপবতী রমণী আর কোথায়ও নাই। কিন্তু প্রমীতের সে বিশ্বাস, সে গর্ব্ব আজ বা ক্ষুণ্ণ হইল! নগরোপকণ্ঠে অস্পষ্ট আলোকে দৃষ্টা আকুল-কুন্তলা অপরিচিতা মঞ্জুলা পরম-রূপসী, বসন্তোৎসবে মণিমুক্তালঙ্কারে মণ্ডিতা গায়িকা মঞ্জুলা আরও সুন্দরী, নিজগৃহে

প্রথমসম্ভাষণে আমন্ত্রণকারিণী উপকৃতা মঞ্জুলা তদপেক্ষাও সুন্দরী, আর আজ সম্পূর্ণ নিরাভরণা শুধু উৎপলার উপহারমাল্যধারিণী পরমহিতকারিণী মঞ্জুলার রূপ প্রমীতের চক্ষে অতুলনীয় বলিয়া প্রতিভাত হইল।

কি রূপ! মুগ্ধ প্রমীত নিস্পন্দ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। মঞ্জুলার মধুর উক্তির উত্তর দিতে ভুলিয়া গেলেন। মঞ্জুলার আরক্ত মুখ নত, রক্তাভ হইয়া উঠিল।

চঞ্চলা অপর কক্ষ হইতে ফুলমাল্যচন্দন-গন্ধচূর্ণ-পরিপূর্ণ একখানি থালা লইয়া আসিল। কম্পিত হস্তে সেই থালা প্রমীতের সম্মুখে স্থাপন করিয়া মঞ্জুলা বলিল;—

"আমার এই সামান্য পূজা—"

তখন প্রমীতের চমক ভাঙ্গিল, তাঁহার মুখও আরক্ত হইয়া উঠিল।

"পূজা! তোমার নিকট যে আমরা চির-বিক্রীত!"

প্রমীত থালা হইতে একটি মালা তুলিয়া গলায় পরিলেন, চন্দনগন্ধচূর্ণ গাত্রে প্রক্ষেপ করিলেন; বলিলেন;—

"রাজাধিরাজের জন্মোৎসবে আমারও উপস্থিত হইতে হইবে। রাত্রি হইয়াছে, আমি বিদায় প্রার্থনা করি। আমার স্ত্রী তোমার প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠায় দিন কাটাইবেন।

"আমি শীঘ্রই তাঁহাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইব।"

মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রণত হইয়া বিদায়সূচক অভিবন্দনা জানাইল। তারপর চঞ্চলা, চিত্রা এবং অন্যান্য পরিচারিকাসহ বহির্দ্বার পর্য্যন্ত প্রমীতের অনুগমন করিল।

পথে চলিতে চলিতে বার বার প্রমীতের মনে হইল, কেন আজ এই আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। মঞ্জুলা কি মনে করিবে? মঞ্জুলা পরমরূপবতী? ভাল, তাহাতে আমার কি?

মানুষের চিত্ত যখন প্রথম বিচলিত হয়, কারণ জানিতে পারিলেও তাহা সহজে স্বীকার করিতে চাহে না।

রক্ষাকবচ, জাগ্রত হও! আপাতমধুর অমোঘ বিষের গুপ্ত প্রভাব প্রথমে কে বুঝিতে পারে?

(ক্রমশ)

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

বৈদিক সাধনার আভাস

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অব্যক্তশরীর আনন্দময় ঈশ্বর হইতে ব্যক্ত জগতের সৃষ্টি। প্রজাপতিদেহরূপিণী অব্যাকৃতপ্রকৃতি হইতে নিখিল প্রকৃতি-বিকারের উৎপত্তি। প্রকৃতির এই বিকৃতিকে সাধারণভাবে জড়-সৃষ্টি বলা হইয়া থাকে। পরন্তু একান্ত জড় বা চৈতন্যবিহীন কোন পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভবে না। ব্যাখ্যার সৌকর্য্যার্থই শাস্ত্রব্যাখ্যাতৃগণ জড় ও চৈতন্যের

বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন। মূলতঃ প্রকৃতিকে জড় বা অচেতন বলা আর চৈতন্যকে অচেতন বলা সমান কথা। পূর্ব্বোদ্ধৃত সৃষ্টিসূক্তে বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন যে প্রলয়-কালে স্বধা বা প্রকৃতি এক অভিন্নভাবে ব্রহ্মে লীন থাকে। সুতরাং প্রকৃতি জড় হইলে ব্রহ্মও জড় হইয়া পড়েন। বস্তুতঃ এক অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থই লৌকিক চেতন ও অচেতন পদার্থরূপে লোক-চক্ষে প্রতীয়মান হন। কর্ম্মসংস্কারবশে অজ্ঞান জীব যখন তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হয়, তখনই সে তাঁহাকে কোথাও চেতন ও কোথাও অচেতনরূপে দেখে। জীবের কর্ম্মসংস্কারদ্বারা প্রণোদিত হইয়া সর্ব্বশক্তিমানের সৃষ্টিশক্তি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের বিকাশ করিয়া বিশ্বময় ভেদ উৎপন্ন করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞানচক্ষু সম্যক্ উন্মীলিত না হয়, ততক্ষণ জীব এইরূপে বিশ্বময় ভেদ দর্শন করে, বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মপদার্থকে দর্শন করে না। জ্ঞানসূক্তে (ঋঃ সঃ ১০।৭১) ঋষি এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন :—

"উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ ত্বঃ শৃণ্বন্ শৃণোত্যেনাং।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥" ১০।৭১।৪

"একজন বাক্‌কে দেখিয়াও দেখে না, একজন তাঁহাকে শুনিয়াও শুনে না ; আবার একজনের নিকট তিনি তাঁহার নিজেকে প্রকাশ করেন যেমন সঙ্গমাভিলাষিণী শোভন-বসনা কামিনী ভর্ত্তৃসকাশে নিজেকে প্রকাশ করে।" অর্থাৎ, অজ্ঞান ব্যক্তি বেদার্থের পর্য্যালোচনা করিলেও অথবা বেদবাক্য শ্রবণ করিলেও তাহার ফললাভে সমর্থ হয় না, পরন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির নিকটে বেদার্থ স্বতঃই প্রতিভাত হয়।

ভৌতিক প্রপঞ্চের মোহ কাটাইয়া, অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া, বহির্মুখী ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকলকে নিরোধ করিয়া যে জীব শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানজ্যোতিতে প্রবেশ করিতে পারে, তাহারই নিকট বেদার্থ সম্যক্ প্রতি-ভাত হয়। তাই উক্ত জ্ঞানসূক্তে ঋষি আবার বলিতেছেন :—

"ইমে যে নার্বাঙ্ন পরশ্চরন্তি ন
ব্রাহ্মণাসো ন সুতেকরাসঃ।
ন এতে বাচমভিপদ্য পাপয়া সিরীস্তংত্রং
তন্বতে অপ্রজজ্ঞয়ঃ॥" ১০।৭১।৯

"এই সকল ব্যক্তি যাহারা অধোবর্ত্তী এই পৃথিবীতে বিদ্বান ব্রাহ্মণগণের সহিত আচরণ না করে ও যাহারা পরবর্ত্তী স্বর্গলোকস্থ দেবগণের সহিত আচরণ না করে সেই সকল ব্রাহ্মণ বেদার্থ জানিতে সমর্থ হয় না, মাত্র সোমের অভিষব যাহারা করে তাহারাও জানিতে সমর্থ হয় না। অজ্ঞানী এই সকল ব্যক্তি বাক্যমাত্র প্রাপ্ত হইয়াও পাপকারিণী বাকের সহিত মিলিত হইয়া কেবল হল-চালকরূপে ভূমিকর্ষণ করিতে থাকে।"

কেবল ব্রাহ্মণ অর্থাৎ মন্ত্রবিৎ যাজ্ঞিক হইলেই বেদার্থ জানা যায় না, কেবল সোম অভিষুত করিলেই বেদার্থ জানা যায় না। বেদের বাক্যমাত্র অধিগত করিলে সেই বাক্য-গত পশুহননাদি পাপদ্বারাই কেবল বিদ্ধ হইতে হয়। বেদার্থ জানিতে হইলে বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া যথার্থ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণের সাহচর্য্য করিতে হয় এবং এমন কি ইহলোকের

অতীত দেবলোকের সহিত যথার্থ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়।

এই যে বেদার্থ-জ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ তত্ত্ব-জ্ঞান ইহা যে একেবারে সম্যক্‌রূপে সকলের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয় তাহা নহে ; বহু আয়াসে, বহু তপস্যার ফলে এই জ্ঞানকে শনৈঃ শনৈঃ লাভ করিতে হয়। সত্ত্বগুণের আশ্রয়ে চিত্ত যত উত্তরোত্তর নির্ম্মল হইতে থাকে, জ্ঞানের আলোক ততই তাহার ভিতরে ফুটিতে থাকে। এইরূপে যাঁহাদের চিত্ত নির্ম্মল ও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইতে থাকে তাঁহারাই যথার্থ চক্ষুষ্মান্ হয়েন। তাঁহারাই বাক্যের যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন, সুতরাং তাঁহারাই যথার্থ কর্ণবান্ হয়েন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব পদার্থে সমদর্শী হয়েন, অদ্বৈত জ্ঞান ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের আয়ত্ত হয়। বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর তত্ত্ব সকল তাঁহারা তখন অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিতে থাকেন। স্বল্প আয়ত্ত হইলেও এই জ্ঞান মানুষকে অতুলনীয় করে। যিনি কিঞ্চিন্মাত্রও এই জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, তিনি সংসারের পঙ্ক হইতে উদ্ধারলাভ করিয়াছেন। এই কথাই ঋষি জ্ঞানসূক্তে পুনরায় বলিতেছেন :—

অক্ষণ্বংতঃ কর্ণবংতঃ সখায়ো
মনোজবেষ্বসমা বভূবুঃ।
আদঘ্নাস উপকক্ষাস উ ত্বে হ্রদা ইব
স্নাত্বা উ ত্বে দদৃশ্রে ॥ (১০।৭১।৭)

"চক্ষুষ্মান্ কর্ণবান্ সমজ্ঞানিগণ মনদ্বারা গন্তব্য বিষয় সকলে অতুলনীয় হন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হ্রদে মুখ পর্য্যন্ত নিমজ্জমান হন, কেহ কেহ কক্ষ পর্য্যন্ত নিমজ্জমান হন, কেহ কেহ সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হইয়া স্নান করেন দেখা যায় (অর্থাৎ, কেহ কেহ মধ্যমজ্ঞানী, কেহ কেহ স্বল্পজ্ঞানী, কেহ কেহ মহাজ্ঞানী হন)।"

দেখা যাইতেছে যে, ঋষি বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, প্রথম অজ্ঞানী ও দ্বিতীয় জ্ঞানী। যাহারা অজ্ঞানী তাহারা ষড়ঙ্গবেদ সহস্র অধ্যয়ন, শ্রবণ ও আলোচনা করিলেও তাহাদের পরিশ্রম নিষ্ফল হয়, এমন কি তাহারা যে সকল সোমযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে তদ্দ্বারা পুণ্য-লোক লাভ করে না। যাহারা যথার্থ জ্ঞান দ্বারা দেবগণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে না পারে ও ব্রহ্মবিদ্‌গণের সহবাসে চিত্ত মার্জ্জিত করিতে না পারে তাহাদের সমস্ত কর্ম্ম বিফল হয়। পক্ষান্তরে যাহারা যথার্থ জ্ঞানসহকারে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহারা উহা দ্বারা সুফল প্রাপ্ত হয়। সূক্তান্তরে উক্ত হইয়াছে,—

অবনো বৃজিনা শিশীহ্যৃচা বনেমানৃচঃ।
নাব্রহ্মা যজ্ঞ ঋধগ্‌জোষতি ত্বে ॥
ঊর্ধ্বা যত্তে ত্রেতিনী ভূত্যজ্ঞস্য ধূর্ষু সদ্মান্।
সজূর্নাবং স্বযশসং সচায়োঃ ॥
১৭-১০৫-৮, ৯

"হে ইন্দ্র, আমাদিগের বর্জনীয় (পাপ) সকল বিনাশ কর। আমরা ঋক্ দ্বারা, অর্থাৎ স্তুতি দ্বারা, অঋক্‌দিগকে, অর্থাৎ অস্তুতিক-দিগকে, হিংসা করিব। অব্রহ্মা, অর্থাৎ ব্রহ্মবিরহিত বা উৎকৃষ্ট স্তুতিবিরহিত, ঋধক্, অর্থাৎ সস্তুতিক যজ্ঞ হইতে পৃথক্, যজ্ঞ তোমাকে প্রীত করে না।

হে ইন্দ্র, কর্ম্মিদিগের মধ্যে যজ্ঞগৃহে যখন তোমার ত্রেতিনী, অর্থাৎ অগ্নিত্রয়বিশিষ্ট

ক্রিয়া, উর্দ্ধে উঠে তখন তুমি প্রীত হইয়া আয়ুর, অর্থাৎ যজমান মনুষ্যের, সহিত তরণীতে আরোহণ কর।"

অশ্বক্, অব্রহ্মা, ঋধক্ এই সকল শব্দ দ্বারা দেবতাজ্ঞান-বিবর্জ্জিত কেবলকর্ম্মের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সম্পূর্ণ অজ্ঞ পরমার্থ-জ্ঞানবিহীন ব্যক্তি কর্ম্মদ্বারা উৎকৃষ্ট লোক লাভ করে না, ইন্দ্র প্রীত হইয়া তাহাদিগকে স্বরথে আরোহণ করাইয়া লইয়া যান না। পক্ষান্তরে যাহারা সধ্বক্, অর্থাৎ দেবতাজ্ঞানের সহিত কর্ম্ম করে, তাহাদিগকে তিনি প্রীত হইয়া সুগতি প্রদান করেন।

যজ্ঞের দ্বারা উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে হইলে যে, সাধককে পার্থিবসম্বন্ধ ছেদন করিয়া দেবলোকে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের অতীত অতীন্দ্রিয় বস্তুর উপলব্ধি করিতে হয়, বহির্জগৎ ত্যাগ করিয়া অন্তর্জগতে প্রবেশ করিতে হয়, তাহা বৈদিক ঋষি বশিষ্ঠ ভরদ্বাজের দৃষ্টান্ত দ্বারা সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। যথা,—

প্রথশ্চ যস্য সপ্রথশ্চ নামানুষ্টুভস্য
হবিষো হবির্যৎ।
ধাতুর্দ্যুতানাৎ সবিতুশ্চ বিষ্ণো রথান্তরমা
জভারা বশিষ্ঠঃ॥ ১

অবিংদন্তে অতিহিতং যদাসীদ্যজ্ঞস্য
ধাম পরমং গুহা যৎ।
ধাতুর্দ্যুতানাৎ সবিতুশ্চ বিষ্ণোর্ভরদ্বাজো
বৃহদাচক্রে অগ্নেঃ॥ ২

তেঽবিংদন্মনসা দীধ্যানা যজুঃ ষ্কন্নং
প্রথমং দেবযানং।
ধাতুর্দ্যুতানাৎ সবিতুশ্চ বিষ্ণোরা সূর্যাদভরন্
ঘর্মমেতে॥ ৩॥ ১০।১৮১

"প্রথ নামক (পুত্র) যাহার ও সপ্রথ নামক (পুত্র) যাহার তাহাদের মধ্যে বশিষ্ঠ অনুষ্টুপ্ ছন্দযুক্ত হবির, অর্থাৎ ঘর্ম্মের, যে হবি তৎসম্পাদক রথন্তর (সামবিশেষ) ধাতা, দ্যোতমান সবিতা ও বিষ্ণুর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১।

যাহা তিরোহিত ছিল, যজ্ঞের যে পরম ধাম, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ধারক, গুহায় নিহিত ছিল তাহা তাঁহারা (ধাতা প্রভৃতি) লাভ করিয়াছিলেন। ধাতা, দ্যোতমান সবিতা ও বিষ্ণুর নিকট হইতে ও অগ্নির নিকট হইতে ভরদ্বাজ সেই বৃহৎ (সামবিশেষ) সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ২।

তাঁহারা দীপ্যমান হইয়া মন দ্বারা সেচনীয় প্রথম (অর্থাৎ মুখ্য), দেবযান (অর্থাৎ যদ্দ্বারা দেবগণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়), যজুঃ (অর্থাৎ যাগসাধন) ঘর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল (ঋত্বিক্) ধাতা, দ্যোতমান সবিতা ও বিষ্ণুর নিকট হইতে ও সূর্য্যের নিকট হইতে সেই ঘর্ম্ম সংগ্রহ করিয়াছেন। ৩।"

বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি জ্ঞানী বৈদিক ঋষিগণ ধাতা, সবিতা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের নিকট হইতে রথন্তর, বৃহৎ প্রভৃতি সাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল সাম যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, অর্থাৎ ইহাদের দ্বারাই যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করা যায়, দেবযান পথের অধিকারী হওয়া যায়। ইহাদের তত্ত্ব অতি গূঢ়, সাধারণের নিকট এই তত্ত্ব অজ্ঞেয়, তিরোহিত, লুক্কায়িত। দেবগণের নিকটেই এই তত্ত্ব ব্যক্ত হয়, এবং যে সকল মহাপুরুষ দেবগণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত

হন। দেবগণ দীপ্যমান হইয়া মন দ্বারা এই তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে প্রকারে বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করিলে দেবলোকের অধিকারী হওয়া যায় তাহা জানিয়াছিলেন; অর্থাৎ, তাঁহারা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত মনের দ্বারা সাধনা করিয়া, রথন্তর, বৃহৎ প্রভৃতি সাম দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নৃচক্ষসো অনিমিষংতো অর্হণা বৃহদ্দেবাসো
অমৃতত্বমানশুঃ।
জোতীরথা অহিমায়া অনাগসো দিবো
বর্ষ্মাণং বসতে স্বস্তয়ে॥ ১০।৬৩।৪

"মনুষ্যদিগের দ্রষ্টা, নিনিমেষ অর্থাৎ সর্ব্বদা জাগরূক, দেবগণ যোগ্যতা দ্বারা মহৎ অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। দীপ্যমান রথযুক্ত অহন্তব্যপ্রজ্ঞ, পাপরহিত দেবগণ দ্যুলোকের উৰ্দ্ধস্থানে লোকহিতার্থ বাস করেন।"

রথন্তর সাম ঋগ্বেদের ৭ মণ্ডলের ৩২ সূক্তের ২২ ও ২৩ ঋক্ ও বৃহৎ সাম উহার ৬ মণ্ডলের ৪৭ সূক্তের ১ ও ২ ঋক্। রথন্তর সাম অগ্নিষ্টোম যাগের স্তোত্র ও বৃহৎ সাম জ্যোতিষ্টোম যাগের স্তোত্র। ঋগ্বেদের গেয় অংশ সামবেদ। উক্ত ১০।১৮১ সূক্তে সামকে ঋকের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ছান্দগ্যোপনিষদে যে উক্ত হইয়াছে, "বাচ ঋগ্‌রসঃ, ঋচঃ সাম রসঃ, সাম্ন উদ্গীথো রসঃ" (ছা-উ ১।১।২) (বাক্যের সার ঋক্ বেদ, ঋকের সার সামবেদ, সামবেদের সার উদ্গীথ অর্থাৎ ওঙ্কার) তাহা সম্পূর্ণ বেদের অনুগামী। সে যাহা হউক রথন্তর ও বৃহৎ সামে কর্ম্মীর ঈশ্বরজ্ঞান ও সর্ব্বকর্ম্মে ঈশ্বরে নির্ভরতা স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। রথন্তর সাম—

"অভি ত্বা শূর নোনুমোহদুগ্ধা ইব ধেনবঃ।
ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিংদ্র তস্থুষঃ॥
ন ত্বাবাঁ অন্যো দিব্যো ন পার্থিবো ন জাতো
ন জনিষ্যতে।
অশ্বায়ংতো মঘবন্নিংদ্র বাজিনো গব্যংতস্ত্বা
হবামহে॥" (৭।৩২।২২,২৩)

"হে শূর ইন্দ্র, এই জঙ্গমের ঈশ্বর ও স্থাবরের ঈশ্বর সর্ব্বদৃক্ তোমাকে আমরা অদুগ্ধা ধেনুর ন্যায় নিরন্তর ইচ্ছা করিতেছি (অর্থাৎ অদুগ্ধা ধেনু যেমন দুগ্ধদানার্থ বৎসকে ইচ্ছা করে আমরা তেমনি হবির্দানার্থ তোমাকে ইচ্ছা করিতেছি)।

দ্যুলোকে বা পৃথিবীতে তোমার ন্যায় কেহ জন্মে নাই, জন্মিবেও না। অশ্ব-ইচ্ছাকারী, হবি-ইচ্ছাকারী ও গাভী ইচ্ছাকারী তোমাকে আমরা আহ্বান করিতেছি।"

বৃহৎ সাম—

ত্বামিদ্ধি হবামহে সাতা বাজস্য কারবঃ।
ত্বাং বৃত্রেষ্বিংদ্র সৎপতিং নরস্ত্বাং
কাষ্ঠাস্ববর্তঃ॥
স ত্বং নশ্চিত্র বজ্রহস্ত ধৃষ্ণুয়া মহঃ স্তবানো
অদ্রিবঃ।
গামশ্বং রথ্যমিংদ্র সং কির সত্রা বাজং
ন জিগ্যুষে॥
(৬।৪৬।১,২)

"হে ইন্দ্র, স্তোতা আমরা অন্ন দিবার জন্য তোমাকেই আহ্বান করিতেছি। লোকে সৎব্যক্তির পালক তোমাকে বৃত্রগণ, অর্থাৎ আবরক শত্রুগণ, দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আহ্বান

করে, তোমাকে অশ্বপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধকাম হইয়াও আহ্বান করে।

হে সুন্দর, বজ্রবাহু, বজ্রবন্ ইন্দ্র, শক্রধর্ষক মহান্ তুমি আমাদিগের দ্বারা স্তুত হইয়া গাভি, অশ্ব সম্যক্ প্রদান কর যেমন স্বামী পুরুষকে বহু অন্ন প্রদান করিয়া থাক।"

এই দুই সামে ঋষির দেবতাজ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়াছে, স্থাবর জঙ্গম নিখিল জগতের ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস সূচিত হইয়াছে। বৎসকামী গাভীর ন্যায় ব্যাকুল হইয়া ঋষি ঈশ্বরকে হবিঃসম্প্রদান করিতে ব্যগ্র। ঈশ্বরের মহিমা তাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। হবিঃ অশ্ব, গাভী প্রভৃতি সমস্ত কাম্য পদার্থই যে তাঁহার তাহার ধারণা হইয়াছে। অনন্য-নির্ভর হইয়া ঋষি তাঁহাকেই আহ্বান করিতেছেন, প্রার্থয়িতব্য পদার্থ তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

এইরূপ দেবতাজ্ঞানের সহিত যজ্ঞ করিলেই দেবযান পথের অধিকারী হওয়া যায়—এই কথাই পূর্ব্বোদ্ধৃত ১০।৮১ সূক্তে উক্ত হইয়াছে। জ্ঞান ও অজ্ঞান ভেদে বৈদিক কর্ম্মের ভিন্ন ফল হয়, জ্ঞানীর দ্বারা নিষ্পন্ন যাগাদি শ্রেষ্ঠলোকপ্রাপ্তির হেতু হয় ও অজ্ঞানীর দ্বারা নিষ্পন্ন যাগাদি নিকৃষ্ট-লোক-প্রাপ্তির হেতু হয়, বেদের এই সিদ্ধান্ত ও উপদেশ উপনিষদাদি শাস্ত্রে গৃহীত ও বিশদী-কৃত হইয়াছে। যথা, মুণ্ডকোপনিষৎ—

ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং
লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে,
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা॥

মুণ্ডক ১।২।১০, ১১।

"অত্যন্ত মূঢ়গণ ইষ্ট (অর্থাৎ যাগাদি শ্রৌত কর্ম্ম) ও পূর্ত্ত (অর্থাৎ বাপীকূপতড়াগাদি স্মার্ত্ত কর্ম্ম) কর্ম্মকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করে, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন শ্রেয়ঃ আছে বলিয়া জানে না। তাহারা কর্ম্মলব্ধ ভোগায়তন স্বর্গপৃষ্ঠে ভোগসম্পন্ন করিয়া পুনরায় এই লোক অথবা এতদপেক্ষাও নিকৃষ্ট লোকে প্রবেশ করে।

পক্ষান্তরে, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অরণ্যে বাস করিয়া যে সকল শান্ত (অর্থাৎ, জিতেন্দ্রিয়) ব্যক্তি (বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমী) ও বিদ্বান্ (অর্থাৎ, জ্ঞানসম্পন্ন) যে সকল ব্যক্তি (গৃহস্থ) তপঃ (অর্থাৎ স্বাশ্রমবিহিত কর্ম্ম) ও শ্রদ্ধার (অর্থাৎ, হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়া বিদ্যার) সেবা করেন, তাঁহারা বিরজস্ক (অর্থাৎ, পাপ-পুণ্যর হত) হইয়া সূর্য্যদ্বার দিয়া (অর্থাৎ সূর্য্যোপলক্ষিত উত্তরায়ণ পথে) যেখানে সেই অব্যয়াত্মা (অর্থাৎ, অব্যয় স্বভাব) অমৃত পুরুষ (অর্থাৎ, প্রথমজ হিরণ্যগর্ভ) বাস করেন সেখানে গমন করেন।"

এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই বলিয়াছি যে, অবিদ্যাবশেই জীব বিশ্বময় ভেদ দর্শন করে। পরন্তু জ্ঞানচক্ষু যে পরিমাণে উন্মীলিত হইতে থাকে ভেদজ্ঞানও সেই পরিমাণে বিদূরিত হইয়া যায়। জ্ঞানের ক্রমিক বিকাশ অনুসারে জীব উত্তরোত্তর অবিদ্যার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে থাকে। পূর্ব্বোদ্ধৃত ১০।৭১।৭ ঋকে

জ্ঞানের এই ক্রমিক বিকাশের কথা বলা হইয়াছে। মাত্র বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে জীব যে জ্ঞান লাভ করে তাহা বস্তুতঃ অজ্ঞান, জ্ঞান-পদবাচ্য নহে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ইহাদের দ্বারা যে জ্ঞান অর্জিত হয় তাহা সত্যের জ্ঞান নহে, মিথ্যার জ্ঞান—জগতের চৈতন্যাংশের জ্ঞান নহে, জড়াংশের জ্ঞান—সূক্ষ্ম তত্ত্বের জ্ঞান নহে, স্থূল বিকৃতির জ্ঞান—আত্মার জ্ঞান নহে, অনাত্মার জ্ঞান—মৌলিক পদার্থের জ্ঞান নহে, তাহার উপাধি নামরূপের জ্ঞান। এই জ্ঞান দ্বারা জীব সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে না। ইহা দ্বারা সংসারে উন্নত হইতে পারে, কিন্তু ইহা জীবকে সংসারের বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না; কারণ, এ জ্ঞান যে সংসারেরই জ্ঞান, সংসারবহির্ভূত বিষয়ের সহিত ইহার যে পরিচয় নাই, প্রপঞ্চ ভিন্ন ইহা যে কিছু জানে না। এই মিথ্যাজ্ঞান সহকারে মনুষ্য যে সকল সৎকর্ম্ম করে তদ্দ্বারা তাহার ঊর্দ্ধগতি হয় না। পূর্ব্বোদ্ধৃত ১০। ১০৫।৮ ঋকে ও মুণ্ডকোপনিষদের ১।২।১০ সূত্রে বৈদিক ও ঔপনিষদিক ঋষি এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। অন্নময় কোষের সাধককে পুনঃ পুনঃ স্থূলদেহ ধারণ করিয়া জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হয়। অতঃপর যথার্থ জ্ঞানের কথা, যে জ্ঞান উদিত হইতে থাকিলে জীবের চক্ষে জগতে মহা বিপ্লব ঘটিয়া যায়, ক্ষিত্যপ্-তেজোমরুদ্ব্যোম আর তাহার নিকটে ভোগ্য-বস্তুমাত্র বলিয়া প্রতিভাত হয় না, জড়ের পশ্চাতে চৈতন্য আসিয়া দাঁড়ায়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বিষয়ে অতীন্দ্রিয়ের আবির্ভাব অনুভূত হয়, বিশ্বজননী প্রকৃতিদেবী ত্রিগুণের সূত্র দ্বারা যে বস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া আপনাকে আবৃত করিয়াছিলেন তাহা দূরে নিক্ষেপকরতঃ নগ্নবেশে সাধকের সমক্ষে আবির্ভূতা হন, সাধক প্রপঞ্চ ভুলিয়া প্রপঞ্চাতীত শুদ্ধ-শুভ্র পরম পুরুষকে দর্শন করে। বিশ্বময় ভেদের মধ্যে সাধক তখন অভেদ দেখিতে থাকে। জ্ঞানের জ্যোতি যতই বিকশিত হইতে থাকে ততই সাধকের চক্ষে তমোময় জড় আর দৃষ্ট হয় না, সত্ত্বপ্রধান দেবগণের অস্তিত্ব ও স্বরূপের উপলব্ধি হইতে থাকে। বেদের উদ্দেশ্য এই সকল দেবতাকে জ্ঞান সহকারে পূজা করা, কর্ম্মকে অধোমুখী হইতে না দিয়া ঊর্দ্ধমুখী করা, জীবকে স্থূল জগতের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া ক্রমমুক্তির পথে স্থাপন করা। বেদে দেবগণের যে সকল স্তুতি প্রভৃতি আছে দেবতাজ্ঞান প্রস্ফুটিত না হইলে তাহাদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না, সুতরাং বেদের বাক্যার্থ জানিয়া কর্ম্ম করিলেই যে জীবের সদ্গতি হয় তাহা নহে। পূর্ব্বোদ্ধৃত জ্ঞানসূক্তে বৈদিক ঋষি এ কথা সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। পরন্তু দেবতাজ্ঞান সহকারে বেদের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কর্ম্ম করিলে সাধকের দেবলোক প্রাপ্তি হয়। এ কথাও ঋষি উক্ত জ্ঞানসূক্তে, ১০।১৮১ সূক্তে ও ১০।১০৫।৯ ঋকে নিঃসংশয়িতরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সাধকের হৃদয়ে দেবতা জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইলে আর তাঁহাকে নরজগতে ফিরিয়া আসিতে হয় না, অমরত্বলাভ করিয়া তিনি দেবলোকে স্থান প্রাপ্ত হন। অন্নময় স্থূলদেহ হইতে মুক্ত হইয়া তিনি প্রাণময় সূক্ষ্ম-দেহে বিরাজ করেন। জ্ঞানের আলোক সাধকের হৃদয় উদ্ভাসিত করিতে আরম্ভ করিলে সাধক প্রথমেই স্থূলবিষয়ের অসারত্ব

উপলব্ধি করিয়া তাহাতে বিগতস্পৃহ হয়েন, সুতরাং প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগাবসানে তাঁহার স্থূলদেহের পতন হইলে তিনি আর স্থূলদেহ পরিগ্রহ করেন না। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১০।৫৬ সূক্তের ব্যাখ্যায় এ কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু বাহ্য স্থূলবিষয়ে বীতরাগ হইলেই যে সাধক পূর্ণজ্ঞানী হইলেন তাহা নহে, স্থূলদেহের নাশ হইয়া সূক্ষ্মদেহে অবস্থান করিলেই যে জীব পরমপদ লাভ করিল তাহাও নহে। বাহ্য স্থূলবিষয়ই অবিদ্যার একমাত্র সৃষ্টি নহে, যাহাতে জীবকে বন্ধন করে। স্থূলপ্রপঞ্চের বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেও জীব মন ও বুদ্ধি দ্বারা বদ্ধ থাকে। এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাহাকে মন ও বুদ্ধিক্ষেত্রে সাধনা করিতে হয়। দর্শনশাস্ত্রে এই দুই ক্ষেত্রকে মনোময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষ বলে। উত্তরোত্তর জ্ঞানের বৃদ্ধি হইলে জীব বিজ্ঞানময় কোষের সাধনায় পক্ক হয়। অবিদ্যার যত নাশ হইতে থাকে, তত সে স্বর্গসুখে বীতস্পৃহ হয়, আত্মোপলব্ধি ততই তাহার বৃদ্ধি হইতে থাকে, হিরণ্যগর্ভের জ্ঞান ততই তাহার অন্তরে প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, এক ঈশ্বর যে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন এই উপলব্ধি তাহার অন্তরে জাগরিত হয়, অব্যাকৃত প্রকৃতির বিকারেই যে তাহার সূক্ষ্মদেহের সৃষ্টি সে তাহা যথার্থ অনুভব করে। বিজ্ঞানময় কোষের সাধনা সম্পূর্ণ হইলে সে বিশ্বময় সূত্রাত্মা প্রজাপতি ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই দেখে না, ভগবানের বিরাট মূর্ত্তিতে সে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, সে তাহার নিজের খণ্ড চৈতন্যকে ভগবানের পূর্ণ-চৈতন্যে মিলাইয়া দেয়, সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা সে যে স্বর্গভোগ করিতেছিল তাহাতে তাহার আন্তরিক বিরাগ জন্মে। এই বৈরাগ্যের ফলে তাহার আর সূক্ষ্ম শরীরের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সে তখন সূক্ষ্ম দেহ হইতে মুক্ত হইয়া কারণদেহ মাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক প্রজা-পতিত্ব লাভ করে। সে তখন যথার্থ সোঽহং হইয়া যায়। ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়া সে তখন বিশ্বভুবন শাসন, পালন, সৃজন ও ধারণ করে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ১০।৫৬ সূক্তে বৈদিক সাধনার ক্রমোন্নতির যে নির্দ্দেশ আছে, এই ঈশ্বরত্ব লাভ সেই উন্নতির চরম সীমা। জ্ঞান-সহকারে সাধনা করিলে বেদ জীবকে এই পরমপদে পৌছাইয়া দেয়।

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্দেবা
অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত
ইমে সমাসতে॥ ১-১৬৪-৩৯

"ঋগাদি বেদের প্রতিপাদ্য অক্ষর পুরুষ পরম ব্যোমে অধিষ্ঠিত, যাঁহাতে বিশ্বদেবগণ বাস করেন। যে ইহা না জানে ঋগাদি বেদ তাহার কি করিবে? যাহারা ইহা জানে তাহারা স্বরূপে অবস্থান করে।" (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার।

জীন ভ্যালজিন কবাটের গায়ে কাণ দিয়া শুনিতে লাগিল। নিস্তব্ধ সে কক্ষ।

তখন মার্জ্জারের সাবধানে ধীরে ধীরে, সে দ্বার ঠেলিল, দ্বার ঈষন্মুক্ত হইল।

সাহসে ভর করিয়া সে আবার ঠেলিল; কবাট আরও একটু সরিয়া গেল। কিন্তু প্রবেশপথে বিঘ্ন ছিল,—পার্শ্বেই একখানা চেয়ার; দ্বার আরও কতকটা উন্মুক্ত না করিলে চলে না।

এবার অপেক্ষাকৃত জোরে সে কবাট ঠেলিল। অকস্মাৎ মরিচাধরা কব্জা হইতে একটা তীব্র কর্কশ ধ্বনি উঠিল। শিহরিয়া সচকিতে জীন দুই পদ পিছাইয়া আসিল,—তাহার শিরোদেশ হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে ধ্বনি, মৃত্যুর পরপারে অন্তিম-বিচার-দিনের তূর্য্যধ্বনিবৎ স্পষ্ট নির্ঘোষে তাহার কর্ণে নিনাদিত হইয়া উঠিল।

আকস্মিক বিভীষিকায় তাহার প্রথমতঃ মনে হইল যেন সে কব্জা জীবন্ত হইয়া উঠিয়া লোলজিহ্ব সারমেয়ের ন্যায় সকলকে সতর্ক করিবার জন্য প্রাণপণে চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে!

তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত, অন্তরাত্মা কম্পিত হইয়া উঠিল; কপালের শিরা যেন হাতুড়ির মত ঘা দিতে লাগিল; নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যেন গুহান্তর্গত ঝটিকার ন্যায় বহিতে লাগিল। তাহার মনে হইতেছিল, যেন সে শব্দ ভূমিকম্পের ন্যায় সমগ্র বাড়ীখানাকে টলাইয়া দিয়াছে;—কবাটখানা চীৎকার করিয়া সকলকে জাগাইয়া দিয়াছে;—ওই বুঝি বৃদ্ধ ওঠে!—এখনি ত প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসিবে,—কয় মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত সহর জাগিয়া উঠিবে, পুলিশ হাতকড়ি লইয়া আসিবে!—আর বুঝি তাহার উদ্ধার নাই!

নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় জীন দাঁড়াইয়া রহিল। এক দুই—তিন,—কয় মুহূর্ত্ত গভীর উৎকণ্ঠায় কাটিয়া গেল। তখন কক্ষের মধ্যে সে একবার উকি দিয়া দেখিল,—কই কিছুই ত নড়ে না! কতক্ষণ সে উৎকার্ণ হইয়া রহিল,—কই কোন শব্দই ত নাই! তাহা হইলে কেহ উঠে নাই? জীন নিঃশ্বাস ফেলিল।

প্রথম ধাক্কা ত কাটিল, কিন্তু তাহার মনের চাঞ্চল্য সম্পূর্ণরূপে গেল না। তত্রাচ সে ফিরিল না। যত শীঘ্র কার্য্যোদ্ধার হয় তাহাই তাহার লক্ষ্য। স্থির পদে সে কক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

কক্ষের মধ্যে যেন গভীর শান্তি পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইতস্ততঃ রক্ষিত কাগজপত্র ও পুস্তকাদি অতিক্রম করিয়া অতি সন্তর্পণে সে অগ্রসর হইল। কক্ষের অপর প্রান্ত

হইতে মিরিয়েলের ধীর সম নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ আসিতেছিল।

সহসা জীন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সে কি, সে যে একেবারে মিরিয়েলের শয্যার উপর আসিয়া পড়িয়াছে!

মানুষের অনুষ্ঠিত প্রায় কার্য্যের উপর প্রকৃতিদেবী সময়ে সময়ে এমন সহজ-সুন্দর-ভাবে আপনার ছায়াপাত করেন যে, মানুষ সেসব সময়ে আপন কার্য্যের পর্য্যালোচনা না করিয়া থাকিতে পারে না, কিছুতেই সে ভাবুকতার স্পর্শ অতিক্রম করিতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে যে মেঘ আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল, অকস্মাৎ যেন স্বেচ্ছায় তাহা এখন সরিয়া গেল,—উন্মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়া চন্দ্ররশ্মি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত ধর্ম্মযাজকের মুখমণ্ডল সহসা উদ্ভাসিত করিয়া দিল। মিরিয়েল প্রশান্তভাবে নিদ্রা যাইতেছিলেন;—নিদ্রালস শির উপাধানে ন্যস্ত, ধর্ম্মযাজকীয় অঙ্গুরীয়যুক্ত দক্ষিণ হস্তখানি শয্যাতলে লুণ্ঠিত, তৃপ্তি, আশা এবং আনন্দে সে আনন প্রদীপ্ত; মুখের সে অমিয় হাসি যেন কোন্ প্রতিফলিত দিব্যালোকসম্পাত; ললাটে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ। সাধুর আত্মা যেন অমরের ঐশ্বর্য্য-মহিমার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ছিল। সে অমরতা, সে স্বর্গ তাঁহার আপন অন্তরেই ছিল; অন্তরের স্বচ্ছতার মধ্য দিয়াই তাহার স্বরূপ সে আননে ফুটিয়া উঠিত।

নির্ব্বাক নিশ্চল সন্ত্রস্ত জীন লৌহ-শিক হস্তে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিল। সেই চন্দ্রালোকে সুষুপ্ত ধরণী, তন্দ্রাতুর প্রকৃতি, নির্জ্জনপ্রায় গৃহ, নিশীথ রাত্রি, স্তব্ধ সে মুহূর্ত্ত,—সবই যেন কি এক গাম্ভীর্য্যে মাধুর্য্যে বৃদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া জাগিতেছিল।—সেই নিদ্রাবদ্ধ চক্ষুদ্বয়, শ্বেত অলকগুচ্ছ, বিশ্বাসনির্ভরতাপূর্ণ আনন, জরাজীর্ণ বৃদ্ধ দেহে নিদ্রিত শিশুচ্ছবি—সে যেন কি এক অপূর্ব্ব দৈবী লীলা! এমনটি ত জীন ইহার পূর্ব্বে আর কোথাও দেখে নাই! তাহার ন্যায় পিশাচের এত নিকটে, এমন অরক্ষিত ভাবে অথচ পূর্ণ বিশ্বাসে নিরুদ্বেগে নিদ্রামগ্ন মধুর সে মূর্ত্তি তাহার অন্তরতম অন্তরের এমন একটা স্থান স্পর্শ করিল যে, তুলনার সমালোচনায় সে না শিহরিয়া থাকিতে পারিল না। এক দিকে সুষুপ্তিমগ্ন আত্মস্থ সাধু, অপর দিকে পাপানুষ্ঠানী জীবের অন্তরের তীব্র চাঞ্চল্য;—নৈতিক জগতে ইহা অপেক্ষা দর্শনীয় মহত্তর কিছু আছে বলিয়া ত আমি জানি না।

জগতে এমন কোন দার্শনিক নাই যিনি জীনের সে সময়ের অন্তর-ভাবের যথার্থ বিশ্লেষণ করিতে পারেন। অতি প্রচণ্ড ভাবের সহিত শান্ততম মাধুর্য্যরসের মিশ্রণ যদি অনুভব করিতে পার, তবেই তাহার আভাষ কতকটা পাইতে পার। জীনের সে মুখভাব একটা স্তব্ধ বিস্ময়ের ছবি, তাহাতে কোন একটা ভাবের নিশ্চয়তা ছিল না। সে দেখিতে লাগিল,—মন্ত্রমুগ্ধবৎ মিরিয়েলের সে অপূর্ব্ব ছবির প্রতি চাহিয়া রহিল,—এই পর্য্যন্ত! কি সে ভাবিতেছিল,—কে বলিবে? তাহার মুখভাবে কিসের চাঞ্চল্য পরিস্ফুট হইতেছিল,—কে জানিবে?

বৃদ্ধের মুখ হইতে সে আর চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। ত্রিশঙ্কুর মত, স্বর্গের ও রসা-

জলের—পুণ্যের ও পাপের—সন্ধিস্থলে সে হতবুদ্ধি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিতে বা তাঁহার চরণে লুটাইতে,—দু'য়ের জন্য সমভাবেই বুঝি সে প্রস্তুত ছিল।

দেয়ালের গাত্রে একটা পিত্তলক্রুশ অস্পষ্টনক্ষত্রালোকে দীপ্তি পাইতেছিল;—প্রসারিত দুই হস্তে যেন সে তাহাদের একের শিরে আশীর্ব্বাদ, এবং অপরের শিরে ক্ষমা বর্ষণ করিতেছিল!

সহসা জীন সে দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া, শয্যা অতিক্রম করিয়া, একেবারে আলমারির কাছে গিয়া পড়িল; লৌহশিকলের প্রয়োজন হইল না, চাবিটা আলমারির গায়েই ছিল;—চকিতে বাসনের ঝুড়িটা তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইয়া, লাঠিটা তুলিয়া লইয়া, জানালা খুলিয়া একেবারে বাগানের উপর আসিয়া পড়িল; তার পর বাসনগুলা থলিতে পুরিয়া, ঝুড়িটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, প্রাচীর অতিক্রম করিয়া রাস্তায় পড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সে ছুটিয়া পলাইল।

(১২)

পরদিন প্রত্যূষে মিরিয়েল বাগানে পায়চারি করিতেছিলেন, এমন সময় বৃদ্ধা ম্যাগলোয়ার আসিয়া সোৎকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কর্ত্তা মশায়, রূপোর বাসনের ঝুড়িটা কোথায় জানেন?"

"জানি।"

"কি আরা, আমিও জানি; শুধু জানার কথা বলছিনে; বলছিলাম কি, ঝুড়টা যে—"

অল্পক্ষণ পূর্ব্বে একটা ফুলগাছের নীচে মিরিয়েল ঝুড়িটা দেখিয়াছিলেন। সেটাকে কুড়াইয়া আনিয়া ম্যাগলোয়ারের হাতে দিয়া বলিলেন—"এই যে তোমার ঝুড়ি।"

"ও দেখেছি আমি। ঝুড়ি ত খালি বাসন কই?"

"ওঃ, তাই বল। বাসনের খোঁজ করছ? বাসন কোথায় আছে তা ত বাছা আমি জানি নে।"

"সর্ব্বনাশ! তবে ত যা ভাবছিলাম তাই। সেই মিন্সেটাই—" বলিয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া অতিথির ঘরটা দেখিতে সে ছুটিয়া গেল; মিরিয়েল করুণার্দ্র চক্ষে লতিকাটির প্রতি চাহিয়া রহিলেন—ঝুড়ির চাপে সেটা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

"কই সে ত নেই কর্ত্তামশাই!—" ম্যাগলোয়ার চীৎকার করিয়া উঠিল।—"সে-ই তবে নিশ্চয় চুরি করে পালিয়েছে।"

অকস্মাৎ প্রাচীর-গাত্রে তাহার দৃষ্টি পড়িল।—"ওই দেখুন, কর্ত্তামশায়!—বালি চূণ খসে পড়েছে, ওইখান দিয়ে পাঁচিল টপকে পালিয়েছে। ওমা কি সর্ব্বনেশে মিন্সে গো!—ডাকাত!—ডাকাত!—"

মিরিয়েল কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তামগ্ন থাকিয়া, আপন গভীর দৃষ্টি ম্যাগলোয়ারের চক্ষুর উপর নিবদ্ধ করিয়া ধীরস্বরে বলিলেন—

"সে বাসনগুলো কি আমাদের বলতে পার?"

ম্যাগলোয়ার উত্তর দিল না, শুধু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"দেখ ম্যাগলোয়ার,—এতদিন আমি অন্যায় করে সে গুলো নিজের কাছে আটকে

রেখেছিলাম, দরিদ্রের জিনিস নিজে ভোগ করছিলাম। গরীবের জিনিষ গরীবে নিয়েছে—এ ত অন্যায় কিছু হয় নি।”

“কর্ত্তা, আমার বা মাঠাকরুণের জন্য বলছি নে। আপনি আজ থেকে কিসে খাবেন?”

মিরিয়েল যেন বিস্মিত হইলেন, বলিলেন “কেন ঘরে কি টিনের থালা নাই?”

“টিনের থালা? মা গো, গন্ধ কর্‌বে যে!—”

“তবে লোহার থালা?”

“তাতে খাবার যে কষে যাবে?”

“ভাল কাঠের রেকাবি ত আছে?”

প্রাতরাশের সময় ব্যাপ্টিস্টাইন এ বিষয়ে ভ্রাতাকে কোন প্রশ্ন করিলেন না। কাষ্ঠপাত্রে আহার করিতে করিতে হাসিতে হাসিতে মিরিয়েল বলিলেন—“এক টুকরা রুটি আর এক বাটি দুধ, এই তো? এর জন্য আবার কাঁটা চামচের কি দরকার?”

ম্যাগলোয়ার কিন্তু গজরাইতেছিল— “ওমা কি সর্ব্বনেশে মিন্সে গো! এখনো ভয়ে আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছে” ইত্যাদি।

প্রাতরাশ শেষ হয় হয়—এমন সময় বহির্দ্দেশে করাঘাত পড়িল।

“কে মশায়? আসুন।”

দরজা খুলিতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য তাঁহাদের চক্ষে পড়িল। তিন জন লোকে আর একটী লোকের গলা ধরিয়া টানিয়া আনিতেছে; সে তিন জন—পুলিশ কর্ম্মচারী; সে লোকটা—জীন ভ্যালজিন।

পুলিশ কর্ম্মচারী যথারীতি অভিবাদন করিয়া অগ্রসর হইয়া বলিল—“প্রভু?”

“প্রভু”!

জীন নিরাশাভাবে এতক্ষণ অবসন্ন হইয়া ছিল, স্তম্ভিত হইয়া সে বলিল—

“প্রভু?—তবে ইনি কুরে নন, আরও বড়?”—

“চুপ' হারামজাদ, ইনি এখনাকার প্রধান ধর্ম্মযাজক তুই জানিস্ নে?”

মিরিয়েল ততক্ষণে কেদারা ছাড়িয়া যথাসম্ভব দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিয়া পড়িয়াছিলেন, জীনের দিকে চাহিয়াই বলিলেন— “এই যে আপনি ফিরে এসেছেন! আমি তাই ভাবছিলাম যে রূপার বাতিদান দু'টো আপনি ফেলে গেলেন কেন? সে দুটোও ত আপনাকে দিয়েছিলাম, তাদেরও দাম প্রায় ২০০ দু'শ' ফ্রাঙ্ক হবে যে!”

বিস্ফারিত নেত্রে জীন মিরিয়েলের প্রতি চাহিয়া রহিল। তার মুখভাবের বর্ণনা করি আমার সে সাধ্য নাই, মানুষের ভাষা এখানে মূক।

“প্রভু! তা হলে লোকটা যা বলছিল তা সত্য? লোকটা চোরের মত পালাচ্ছিল দেখে সন্দেহ হওয়ায় তাকে ধরে দেখি তার থলির মধ্যে এই সব রূপার জিনিষ।”

মিরিয়েল স্মিতহাস্যে বলিলেন—“আর উনি বল্‌লেন যে এক বুড়ো ধর্ম্মযাজক যার কাছে রাত্রিটা উনি ছিলেন, সেই ওঁকে এ সব দিয়েছে? তাই ধরে এনেছ? না, না, ধরে আন্‌বার মত ত উনি কিছু করেন নি। আমি নিজে হ'তেই ওগুলো ওঁকে দিয়েছি।”

“তা হলে একে ছেড়ে দিতে পারি?”

“নিশ্চয়ই।”

প্রহরী জীনের শৃঙ্খল মোচন করিল।

ক্ষীণ অর্দ্ধস্ফুটস্বরে জীন বলিল—"সত্যই আমি ছাড়া পেলাম ?"

প্রহরী। হাঁ, ছাড়া পেয়েছ। এখন তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পার।

"দাঁড়াও ভাই। বাতিদান দু'টো এনে দিই" বলিয়া বৃদ্ধ আলমারী হইতে রূপার বাতিদান দুইটি আনিয়া জীনের হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্যাপ্তিস্তাইন ও ম্যাগলোয়ার মন্ত্রমুগ্ধবৎ নীরবে সে অভিনয় দেখিতে লাগিল।

জীনের আপাদমস্তক কম্পিত হইতেছিল। কলের পুতুলের ন্যায় সে বাতিদান দুইটি গ্রহণ করিল।

"তবে এস ভাই। একটা কথা বলে রাখি, এবার থেকে যখন আসবে বাগানের পথে এসো না; সদর দরজা দিয়ে ত যখন ইচ্ছে তুমি যাতায়াত করতে পার ? শুধু একটা ছিট্‌কিনি তাতে লাগানো থাকে, তালা তো আমি কখনো দিই না।" তার পর পুলিশ কর্ম্মচারীর প্রতি চাহিয়া মিরিয়েল বলিলেন—"তা হলে আপনারা এখন যেতে পারেন।"

পুলিশের দল কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

জীনের সর্ব্বশরীর তখন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল; তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। মিরিয়েল ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া ধীর শান্তস্বরে বলিলেন—"এই টাকার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করে তুমি যে সাধু হবে বলে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছ, দেখো ভাই সে কথা জীবনে কোন দিন ভুলো না।"

জীন কি সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল ? কই তাহার তো কিছু মনে পড়ে না! মিরিয়েল কিন্তু কথাগুলির উপর যেন একটু জোর দিয়াই বলিলেন; আরও বলিলেন—"ভাই, আজ থেকে তুমি আর পাপী নও। আজ যে আমি তোমার আত্মাকে কিনে নিয়েছি; যা কিছু তোমার পাপচিন্তা যা কিছু তোমার কলঙ্ক সে-সব থেকে তোমাকে মুক্ত করে আজ যে আমি ভগবানের চরণে তোমার আত্মাকে নিবেদন করলাম, ভাই।"

(১৩)

অলিগলি খিড়কী সড়ক যা সম্মুখে পড়িল, তাহারই মধ্য দিয়া জীন পলাইতে লাগিল। সহর হইতে বাহির হইয়া সারা সকালবেলা সে এইরূপে ঘুরিল। অনাহারে থাকলেও তাহার ক্ষুধা বোধ ছিল না। শত শত অননুভূত-পূর্ব্ব চিন্তায় তাহার চিত্ত ছিন্নভিন্ন হইতেছিল। অন্তরে তার কোন্ সুরের—কোমলতার না দৈন্যের—কিসের ঝঙ্কার উঠিতেছিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। ক্ষণিকে যেন কাহার উপর একটা ক্রোধ, ক্ষণিকে আবার চিত্তের দ্রবীভূত ভাব; একদিকে, সুদীর্ঘ বিংশবর্ষব্যাপী চিত্তের কঠোরতা,—অপর দিকে কোন্ মায়াস্পর্শে চিত্তের এ নব আর্দ্রতা, এত বর্ষের সাধনার ফলে চিত্তের যে ভীষণ স্তব্ধতা সে লাভ করিয়াছিল—আজ কোন্ প্রলয় ঝটিকায় তাহা বুঝি লুপ্ত হইয়া যায়! এ কি অস্থিরতা, এ কি অশান্তি! কারাবাস যে ইহা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়স্কর ছিল। কোন্ গ্রহে তাহার এ দুর্দ্দশা ঘটাইল ?—অস্থিরচিত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে জীন তাহাই

ভাবিতে লাগিল। বন্যকণ্টকগুল্মে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল; তাহাদের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া বহুযুগবিস্মৃত অতীত বাল্যের কথা তাহার মনে জাগিতে লাগিল। হায়, কোথায় সে দিন!

সমস্ত দিন এইরূপে কাটিল। অপরাহ্নে, তরু লতা এবং উপলখণ্ডের ছায়া ক্রমবর্দ্ধিত করিতে করিতে যখন সূর্য্য অস্তাচলগত হইতেছিলেন, তখন অবসন্ন জীন, নির্জ্জন প্রান্তরে, এক ঝোপের অন্তরালে বসিয়া ছিল। যতদূর দৃষ্টি চলে লোকালয়ের চিহ্নমাত্র ছিল না; ঝোপের অপর পার্শ্ব দিয়া একটা পথ সহরের দিকে চলিয়া গিয়াছে মাত্র। বহুদূরে গাঢ় নীল আল্পস্ পর্ব্বতের তরঙ্গায়িত অনন্ত বিস্তার।

সহসা, দূর হইতে একটা আনন্দকলধ্বনি তাহার কর্ণে আসিয়া পশিল। মুখ ফিরাইয়া জীন দেখিল, আনুমানিক দ্বাদশবর্ষীয় এক বালক, পৃষ্ঠে একটা খেলনার বাক্স বাঁধিয়া গান গাহিতে গাহিতে পার্শ্বের পথ দিয়া তাহারই দিকে আসিতেছে, আনন্দে তাহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কয়টি রৌপ্য মুদ্রা লইয়া লোফালুফি করিতে করিতে সে আসিতেছিল। ঝোপের পার্শ্বে আসিয়া দৈবক্রমে সেবার তাহার হাত হইতে সমস্ত মুদ্রাগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া গেল;—তাহার মধ্যে ৪০ স্যুসের একটি বড় মুদ্রা ছিল;—সেটা গড়াইতে গড়াইতে জীনের পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল; অমনি জীন সেটাকে জুতা দিয়া চাপিয়া ধরিল। বালক কিন্তু সেই মুদ্রাটির উপরই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিল, সুতরাং সেটা তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিল না।

সেই নির্জ্জন স্থানে, সন্ধ্যার সময় সেরূপ বেশ এবং আকৃতির লোকের সম্মুখীন হইতে অনেকেই প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিয়া থাকে; কিন্তু বালকের মনে কোন শঙ্কাই ছিল না। ক্ষিপ্রভাবে জীনের সম্মুখে আসিয়া সে বলিল —"মশাই, আমার টাকাটা?"—প্রবঞ্চনাবোধহীন অজ্ঞান শিশুর সরল প্রশ্ন!

জীন মুখ তুলিয়া চাহিল। অস্তগামী সূর্য্যের রক্তরাগ তাহার মুখের উপর পতিত হইয়া সে আকৃতিকে ভীষণতর করিয়া তুলিল। তবু বালক ভীত হইল না; ধীর স্বরে বলিল—

"মশাই, আমার টাকাটা?"

"কে তুই?"

"আমি ছোকরা জারভিস্, মশাই।"

"দূর হ—"

"আমার টাকাটা দিন।"

জীন উত্তর দিল না, মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল।

"আমার টাকাটা দিন্।"

জীন নিরুত্তর, ভূমিসংলগ্নদৃষ্টি।

"দিন্ না মশাই টাকাটা। বাঃ রে, বেশ মজার লোক ত!—"

তথাপি জীন নিরুত্তর।

জারভিস্ তখন অধৈর্য্য হইয়া জীনের জামার কলারটা ধরিয়া খুব একটা ঝাঁকুনি দিল। তবুও জীন নির্ব্বাক্।

তখন সে প্রাণপণ শক্তিতে দুই হাত দিয়া জীনের পা'টা সরাইতে চেষ্টা করিল। হায়, বৃথা চেষ্টা, গাঁথুনির মত পৃথিবীর সহিত যেন তাহা আঁটিয়া গিয়াছে!—বালক কাঁদিয়া ফেলিল।

অবশেষে জীন, মাথা তুলিয়া, শূন্য দৃষ্টিতে একবার সম্মুখের দিকে চাহিল; বালকের প্রতি দৃষ্টি পড়িতে, সে যেন বিস্মিত হইয়া উঠিল; তার পর যষ্টির দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিল—

"কে তুই? কি চাস্?"

"আমি জারভিস্, মশাই। আমার টাকাটা কেন পা দিয়ে চেপে রেখেছেন, মশাই? দিন্ না,—আমি চলে যাই।"

কিছুতেই যখন জীন সে মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিল না, তখন বালক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। উত্তেজিত স্বরে বলিল—"টাকাটা দেবেন কি না, শুনি?—সরান্ বল্‌ছি এখনো পা'—"

"এখনো রয়েছিস ছোড়া এখানে?"—বলিয়া জীন মুহূর্ত্তের মধ্যে দাঁড়াইয়া উঠিল,—রৌপ্যমুদ্রাটা তখনো তার বুটের নীচে। গর্জ্জন করিয়া বলিল—"বেরো হতভাগা, দূর হ,—নইলে মর্‌বি বল্‌ছি।"

ভয়ে বালকের মুখ শুকাইয়া গেল; তাহার আপাদমস্তক কাম্পত হইতে লাগিল; কয়েক মুহূর্ত্ত চলৎশক্তিরহিত হইয়া স্তব্ধভাবে সে দণ্ডায়মান রহিল; তার পর, পশ্চাতে আর না চাহিয়াই, ঊর্দ্ধশ্বাসে সে ছুটিল।

কিছুদূর গিয়া সে একবার থামিল, তার পর আবার ছুটিতে লাগিল।

চিন্তামগ্ন জীনের কর্ণে একবার যেন তাহার ক্রন্দনধ্বনি আসিয়া পশিল। তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে; চারিদিকে অন্ধকার ক্রমশ জমাট হইয়া উঠিতেছে।

কখন্ বালক চলিয়া গিয়াছে,—তবু এখনো জীন সেই একই ভাবে দাঁড়াইয়া! তাহার নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সমতা নাই; সমস্ত দিন সে উপবাসী; শরীর ক্লান্ত, অসুস্থ। অনতিদূরে ঘাসের উপর একটা কাঁচের খেলানা পড়িয়াছিল,—তাহারই প্রতি তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। সহসা তাহার প্রবল শীতানুভূতি হইতে লাগিল; টুপিটা মাথার উপর টানিয়া দিয়া, আনমনে জামার বোতামগুলা আঁটিয়া, ঈষৎ অগ্রসর হইয়া, অবনতভাবে লাঠিটা সে তুলিয়া লইল।

অকস্মাৎ সেই রৌপ্যমুদ্রার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল:—বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় তাহার সর্ব্ব দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল।—সভয়ে সে কয়েক পদ পিছাইয়া আসিল। কালনাগের চক্ষুর ন্যায়, অন্ধকারে সে রজতমুদ্রা যেন জ্বলিতেছিল। মন্ত্রাবিষ্ট মৃগের ন্যায় অপহৃত-শক্তি জীন সে দিক হইতে আর চক্ষু ফিরাইতে পারিল না।

সহসা ছুটিয়া গিয়া, সেটাকে তুলিয়া লইয়া, চারিদিকে সে চাহিতে লাগিল;—দিগন্তে দিক্‌চক্রবালে যদি কিছু তাহার দৃষ্টিতে পড়ে! আশ্রয়ভিক্ষু সন্ত্রস্ত মৃগের ন্যায় উদ্বেগাশঙ্কায় সে কাঁপিতে লাগিল।

নির্জ্জন প্রান্তর! দিগন্তের কোল হইতে ধীরে ধীরে কুজ্ঝটিকা উঠিয়া সন্ধ্যাকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে!

একটা অস্ফুট ধ্বনি করিয়া, বালক যে পথে গিয়াছে সেই পথ ধরিয়া জীন দ্রুত চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সে একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল। জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই! চীৎকার করিয়া সে ডাকিল—

"জারভিস্!—ছোকরা জারভিস্!—"

কয়েক মুহূর্ত্ত সে উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

কেহ সে আহ্বানের প্রত্যুত্তর দিল না। চারিদিকে অন্ধকার,—দৃষ্টি চলে না; দিগন্তে, স্তব্ধতার মাঝে তাহার সে কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গেল!

প্রবল হিম বায়ু উত্তর দিক হইতে বহিতেছিল। নাতিদীর্ঘ কণ্টকগুল্ম যেন প্রচণ্ড রোষে কাহার উপর আস্ফালন করিতেছিল।

জীন পুনরায় অগ্রসর হইল; ক্রমে ক্রমে গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়া অবশেষে ছুটিতে আরম্ভ করিল।—মাঝে মাঝে সে গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, তাহার সে ব্যাকুল বিহ্বল বিকৃত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিতে লাগিল—

"জারভিস্!—ছোকরা জারভিস্!—

জারভিস তখন অনের দূরে। নিকটে থাকিলেও, সে আর কখনও তাহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইত না।

কতক্ষণ পরে অশ্বারূঢ় এক ধর্ম্মযাজকের সহিত জীনের সাক্ষাৎ হইল।

"মশাই, একটা ছেলেকে এ পথ দিয়ে যেতে দেখেছেন?"

"কই, না।"

"তার নাম ছোকরা জারভিস্। তাকে দেখেছেন কি?

"কই, কাউকে ত এ পথ দিয়ে যেতে দেখিনি, বাপু।"

জীন, জেবের মধ্য হইতে পাচ ফ্রাঙ্কের দুইটি স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া ধর্ম্মযাজকের হাতে দিয়া বলিল—"গরীবদের দেবেন।" তারপর তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল,—

"তার নাম ছোকরা জারভিস্। বছর দশ বারো আন্দাজ তার বয়েস হবে। পিঠে তার খেলনার একটা বাক্স আছে, হয়ত সে তা ফেরি করে বেড়ায়। এইদিক দিয়েই সে গেছে।

"হবে; আমার চোখে কিন্তু পড়ে নি।"

"ছোকরা জারভিস্ তার নাম। এই কাছেই বুঝি কোন্ গাঁয়ে সে থাকে! জানেন আপনি কোথায় সে থাকে?"

"কি করে বলব? তবে সে যদি হা ঘরেদের ছেলে হয় তা হলে তার সন্ধান পাওয়া মুস্কিল। তারা আজ এ গাঁয়ে কাল সে গাঁয়ে এমনি করে ঘুরে ঘুরে বেরায়।"

জীন আরও দুইটি স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিল—"এও গরীবদের দেবেন।" তারপর সহসা উন্মত্ত ভাবে বলিয়া উঠিল—"ঠাকুর মশাই, আমায় ধরুন, আমায় বেঁধে নিয়ে চলুন।—আমি চোর, আমি ডাকাত—"

সন্ত্রস্ত ধর্ম্মযাজক, অশ্বপৃষ্ঠে সবেগে কশাঘাত করিয়া, নক্ষত্রগতি সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

জীন পুনরায় ছুটিতে লাগিল। পথিপার্শ্বে ঝোপগুলা মাঝে মাঝে মানুষের মত দেখাইতেছিল; সেগুলা আতিপাতি করিয়া দেখিয়া আবার উর্দ্ধশ্বাসে সে ছুটিয়া চলিল। শেষে, তিনটি পথের সংযোগস্থলে আসিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইল।—কোন্ পথে সে বালক গিয়াছে?

"জারভিস্!—ছোকরা জারভিস্!—" অন্ধকার সে শব্দকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিল, তাহার প্রতিধ্বনি পর্য্যন্ত উঠিল না।

পুনরায় সে ডাকিল—"জারভিস্!"—এবার কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ।—সেই তাহার শেষ আহ্বান! সে তখন টলিতেছিল।—কি

যেন এক অদৃশ্য শক্তি তাহার সমস্ত পাপের বোঝা লইয়া একই আঘাতে তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিল।—অবসন্নভাবে একটা বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর পতিত হইয়া জানুতে মুখ লুকাইয়া তীব্রকণ্ঠে সে আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল—"ওঃ, আমি এমনই পশু!"

অকস্মাৎ তাহার অন্তঃকরণ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; অভাগা ক্রন্দন করিয়া উঠিল! তাহার শুষ্ক নয়ন হইতে, উনিশ বৎসর পরে, আজ সর্ব্বপ্রথম অশ্রুধারা ছুটিল।

কিসে জীনের এ পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহাই আমরা এখন বুঝিতে চেষ্টা করিব

প্রাতঃকালের সে ঘটনার পর হইতে, চিত্তের চাঞ্চল্যে তাহার বিচারবুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল; কি যে ঘটিতেছে, কি যে ঘটিয়াছে—কিছুই যেন সে বুঝিতে পারিতেছিল না। মিরিয়েলের সেই গম্ভীর স্বর—"তুমি সাধু হবে ব'লে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রেছ। সব পাপ থেকে তোমায় মুক্ত ক'রে আজ আমি ভগবানের চরণে তোমার আত্মাকে নিবেদন কর্‌লাম"—সেই কথা, সেই কণ্ঠস্বর অনুক্ষণ তাহার কর্ণে ঝঙ্কৃত হইতেছিল।

গর্ব্ব, আত্মাভিমানই, পাপীর আশ্রয়—পাপের দুর্গস্বরূপ। সেই দুর্গের মধ্যে থাকিয়া, সাধুর করুণার আক্রমণ হইতে সে আপনাকে দূরে রাখিতেছিল। সে দুর্গে এমন প্রচণ্ড আঘাত এ পর্য্যন্ত কেহ করে নাই! সে বুঝিল,—যদি এ করুণার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে, তবেই তাহার চিত্তের কঠোরতা সম্পূর্ণ হইবে; যদি না পারে, তাহা হইলে এতদিন ধরিয়া যে হিংস্র আনন্দে সে তিলে তিলে আপনার চারিদিকে পাষাণ-প্রাচীর তুলিয়াছে, তাহা চূর্ণ হইয়া যাইবে, তাহাকে হয় জয়ী নয় বিজিত হইতে হইবে; তাহার পাপ এবং মিরিয়েলের পুণ্য—এ দু'য়ের সংগ্রামে এক পক্ষকে পরাজিত হইতেই হইবে; এ যুদ্ধে সন্ধির কোন কথা নাই।

মানুষের জীবনে এমন অনেক সময় আসে, যখন কি এক রহস্যময় অর্দ্ধস্ফুট ঝঙ্কার, তাহার কর্ণে আসিয়া পশিতে থাকে—তাহার অনুষ্ঠিতপ্রায় কার্য্যের বিষয়ে তাহাকে অনুনয় বা বাধা প্রদান করিতে চায়। সে ঝঙ্কার কি সে আজ শুনিয়াছিল? এমন কোন অশরীরী বাণী কি তাহার কর্ণে আসিয়া পশিতেছিল যে, জীবনের অনন্ত মুহূর্ত্ত আজ তাহার সম্মুখে উপস্থিত, এখন হইতে তাহাকে খুব সাধু হইতে হইবে, নয়ত পাপের চরম-সীমায় পৌঁছাইতে হইবে; যে, তাহার পক্ষে, আজ হইতে হয় মিরিয়েলের অপেক্ষাও উচ্চ আসন, নয় গ্যালির কয়েদীর অপেক্ষাও নিম্নগতি,—দু'য়ের মাঝামাঝি অন্য কোন স্থান নাই; যে, আজ হইতে, যদি সে ভাল হইতে চায় তবে দেবতা-স্বরূপ, যদি মন্দ হইতে চায়, তবে দানবের অপেক্ষাও ভীষণ হইবে?

দুর্দ্দিনে মানুষের বুদ্ধি উৎকর্ষ লাভ করে, লোকে বলিয়া থাকে বটে। তত্রাচ আমাদের বোধ হয়, সব কথা তেমন ভাল করিয়া বুঝিবার ক্ষমতা জীন ভ্যালজিনের ছিল না। সবই আব্‌ছায়ার মত তাহার চিত্রপটে ভাসিতেছিল; কি যেন একটা যন্ত্রণাকর চিত্ত-বিক্ষিপ্ততায় সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। গ্যালির সে পৈশাচিক অন্ধকার হইতে সদ্যঃ নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বাহিরে আসিতেই, প্রখর সূর্য্যকিরণে অন্ধকারাভ্যস্ত চক্ষুর ন্যায়,

মিরিয়েলের অপূর্ব্ব করুণায় তাহার অন্তঃস্থল আহত হইয়া উঠিল। পবিত্রোজ্জ্বল সম্ভাবিত ভবিষ্য-জীবনের যে ছবি তিনি তাহার চক্ষের সম্মুখে ধরিলেন,—তাহার কথা ভাবিয়া সে চকিত কম্পিত হইয়া উঠিল। সে যে কোথায় দাঁড়াইয়া আছে, তাহা সে ভালমত বুঝিতে পারিতেছিল না! অকস্মাদুদিত সূর্য্যকিরণে পেচকের ন্যায়, অভাগা আজ পুণ্যের কিরণ-সম্পাতে অন্ধপ্রায় হইয়াছিল। তবে একটা কথা সে বুঝিল; এই কয় ঘণ্টার মধ্যে তাহার প্রকৃতির একটা মহা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে,—মিরিয়েলকে একেবারে দূরে রাখা আর তাহার সাধ্যায়ত্ত নয়।

মনের যখন এই অবস্থা, তখন ছোকরা জারভিসের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে, এবং তাহার স্বর্ণমুদ্রাটি সে চুরি করে। কেন করে? তার উত্তর সে জানিত না। তবে আমরা বলিতে পারি, বোধ হয় সেটা তাহার সংস্কারের ফল, তাহার এত বর্ষব্যাপী অন্যায় চিন্তারূপ পাপের সর্ব্বশেষ চেষ্টা; নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপশিখার শেষ দীপ্তি। বুঝি তাহাও নহে। সে চুরি সে করে নাই; মন যখন তাহার শত শত অজ্ঞাত চিন্তার মধ্যে পড়িয়া সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল, তখন তাহার পশুভাবই, স্বভাব এবং সংস্কারের বশবর্ত্তিতায়, নির্ব্বোধের ন্যায় সে মুদ্রা পদদলিত করিয়া রাখিয়াছিল। যখন সে প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার সে পাশবিক কার্য্য বুঝিতে পারিল তখনই সে ব্যথিত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাহার মন প্রকৃতিস্থ থাকিলে সে কার্য্য তাহার দ্বারা কখনই সম্ভবপর হইত না। এইটুকু যদি আমরা বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে জীন ভ্যালজিনের এ পরিবর্ত্তন-চিত্র আমরা সবটাই বুঝিয়াছি।

যাহা হউক, এই শেষ ঘটনাই তাহার জীবন-সংগ্রামের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল; তাহার এতক্ষণের সমস্ত কুহেলিকা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, আলো এবং অন্ধকারকে দুইভাগে পৃথক করিয়া দিল। রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় যেমন কোন দ্রবীভূত নিশ্রণে অংশবিশেষ পাত্রতলে, এবং অংশবিশেষ স্বচ্ছতারল্যে উপরাংশে পৃথকীকৃত হইয়া পড়ে,—তাহারও চিন্তার সেইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল। যখন সে "ওঃ, আমি এমনই পশু" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, তখনই আপনার যথার্থ মূর্ত্তি তাহার চক্ষে প্রতিভাত হইল। নিজেকে তখন তাহার একটা ছায়ামূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে,—অপহৃত বাসনাদি স্কন্ধে লইয়া যষ্টিহস্তে দণ্ডায়মান, রক্তমাংসদেহধারী, ভীষণ-কঠোর-মুখচ্ছবি গ্যালির কয়েদী জীনের মূর্ত্তিখানা স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দুর্দ্দশায় পড়িয়া জীন কতকটা কাল্পনিক হইয়া পড়িয়াছিল। কল্পনার চক্ষে তাই সে আপনার প্রতিমূর্ত্তিখানা দেখিতে দেখিতে এক একবার ভাবিতে লাগিল,—'কে এ'? পরক্ষণেই শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

ধীরে, অতি ধীরে, সে অন্ধকারের মধ্যে যেন একটি ক্ষীণ আলোক ফুটিয়া উঠিল। ধীরে, অতি ধীরে, সে আলোক উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। জীন ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল,—সে ত আলোক নয়, সে যে কোন্ দিব্যমূর্ত্তি! সে মূর্ত্তি যে বিয়েভুঁ মিরিয়েলের!

বিবেকের তুলাদণ্ডে সে দু'জনকে তৌল করিতে বসিল। মিরিয়েল ব্যতীত আর কেহ বুঝি তাহাকে এত অবনত করিতে পারিত না! তখন তন্ময়চিত্ত জীন দেখিতে লাগিল যেন মিরিয়েলের মূর্ত্তি ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর, পবিত্র হইতে পবিত্রতর হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে; আর তাহার নিজের মূর্ত্তিখানা ক্রমশঃ ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া পড়িতেছে; তাহার রক্তমাংসময় দেহটা যেন ছায়ামূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সে ছায়ামূর্ত্তিও যেন মিলাইয়া গেল; তাহার চক্ষের সম্মুখে শুধু একটি মূর্ত্তি—মিরিয়েলের মূর্ত্তিখানি স্থির নিষ্কম্প ভাবে দীপ্তি পাইতে লাগিল। অভাগার জীবনখানিকে যেন তাহা নবীন মাধুর্য্যে পূর্ণ করিয়া দিল!

* * *

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ ধরিয়া অভাগা কাঁদিল; তাহার গণ্ডদেশ বহিয়া তপ্ত ধারাস্রোত ছুটিতে লাগিল। রমণী—চিত্ত দৌর্ব্বল্যে, শিশু, ভীতি ব্যাকুলতায়—যেভাবে ক্রন্দন করে তাহার অপেক্ষাও অধিক আবেগে সে কাঁদিতে লাগিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার চিত্তের অন্ধকার কাটিতে লাগিল; সে আলোকমূর্ত্তি প্রখর তেজে, তীব্র উন্মাদনায় তাহার অন্তঃস্তলকে ওতপ্রোত ভাবে অধিকার করিয়া বসিল। তাহার অতীত জীবন, প্রথম পাপানুষ্ঠান, সুদীর্ঘ কারাবাস, তাহার ভীষণ বহিরাকৃতি, কঠোর অন্তঃপ্রকৃতি, প্রতিহিংসা-সুখ-সম্ভাবনা-মধুর কারামুক্তির কথা, মিরিয়েলের আবাসে ঘটনাপরম্পরা, তাঁহার তেমন ক্ষমার পরও জারভিসের মুদ্রাপহরণ, এ সমস্তই একে একে তাহার মনে জাগিতে লাগিল; কি এক অচিন্ত্য অননুভূতপুর্ব্বক ভাবে নিজের জীবনটাকে পূতিগন্ধময়, আত্মাকে ভয়াবহ বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। তবুও যেন সে জীবনে সে আত্মায় একটা প্রশান্ত আলোকের প্রতিবিম্ব পড়িতেছিল! যেন স্বর্গের আলোকে শয়তানের মূর্ত্তিখানা সে দেখিতেছিল।

কতক্ষণ সে কাঁদিল? তার পর সে কি করিল? কোথায় সে গেল? কেহ তাহা জানে না। এইমাত্র শুধু আমরা জানি যে, শেষরাত্রে যখন ডি-সহরের মধ্য দিয়া রাত্রের ডাকগাড়ীখানা যায় তখন শকট-চালক একজন লোককে, বিয়েভুঁ মিরিয়েলের বাটীর বহির্দ্বারে সাষ্টাঙ্গপ্রণত হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। (ক্রমশ)

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

ব্রাহ্মমত ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত—অবতারবাদ

(আশ্বিনের বঙ্গদর্শনের ৫৪৪ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

ব্রাহ্মসমাজের অভাবাত্মক বা 'না'-বাচক মতের সঙ্গে বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের কোনও কোনও স্থলে অতিশয় গুরুতর বিরোধ আছে। ব্রাহ্মগণ বলেন—"ঈশ্বরের অবতার হয় নাই ও হইতে পারে না।" ব্রাহ্মসমাজ অবতার মানেন না। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ও বৈষ্ণবসাধনা অবতারবাদের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। ঈশ্বরের অবতার স্বীকার না করিলে, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের বিশেষত্ব ও বৈষ্ণব-সাধনার অনুপম বিচিত্রতা, এই সকলই নষ্ট হইয়া যায়। অতএব বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ও বৈষ্ণবসাধন অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মমত ও ব্রাহ্মসাধন বর্জ্জন করিতেই হয়।

আপাততঃ এইরূপই মনে হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বর্জ্জন করিতে হয় না, অতিক্রম করিতে হয় মাত্র। "ঈশ্বরের অবতার হয় নাই ও হয় না"—এটা একটা অভাবাত্মক বা 'না'-বাচক কথা। যাঁহারা কোনও অতি-প্রাকৃত শাস্ত্রপ্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাঁহাদের অভাবাত্মক বা 'না'-বাচক মতের একটা প্রবল ভিত্তি আছে। খৃষ্টীয়ান্ বলেন,—"যিশুখৃষ্টের আশ্রয়লাভ ব্যতীত জীবের মুক্তির আর অন্য পথ নাই।" এটী একটী 'না'-বাচক খৃষ্টীয়ানী মত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে খৃষ্টীয়ান্ সাধক এই পর্য্যন্ত বলিতে পারেন যে—"আমি খৃষ্টাশ্রয় পাইয়া মুক্ত হইয়াছি।" ইহার বেশি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা নাই ও থাকিতেই পারে না। অথচ তিনি যখন বলেন যে, এ পথ কেবল আমার পথ নয়, সকলেরই এই এক পথ, মুক্তির আর দ্বিতীয় পন্থা নাই; তখন তিনি একটা সর্ব্বজ্ঞতার দাবী করেন। এই দাবী তাঁর নিজের নাই, কিন্তু বাইবেলের আছে। কারণ বাইবেল ঈশ্বরের বাণী। আর ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া, তাঁর বাণীও সর্ব্বজ্ঞতার দাবী করিতে পারে। ঈশ্বর সকল জানেন বলিয়াই, মুক্তির যে আর পথ নাই, ইহাও জানেন। বাইবেল এই জ্ঞানই প্রচার করিতেছে। এইরূপে মুসলমান ধর্ম্মের 'না'-বাচক মত বা উপদেশেরও একটা অতিপ্রাকৃত শাস্ত্রপ্রামাণ্য আছে। সে শাস্ত্রপ্রামাণ্য সত্য কি মিথ্যা, এ বিচার এখানে উঠে না। এখানকার কথা কেবল এই যে যাঁরা অতিপ্রাকৃত শাস্ত্রপ্রামাণ্য মানেন, তাঁদের পক্ষে সর্ব্বজ্ঞতার দাবী না করিয়াও, সেই সর্ব্বজ্ঞ ও অভ্রান্ত শাস্ত্রের বলে, যাহা নিজেরা জানেন না, তার সম্বন্ধেও দৃঢ় ভাবে একটা অস্তি-নাস্তি মত ব্যক্ত করিতে পারেন। খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান্ প্রভৃতি ধর্ম্মের 'না'-বাচক মতের এইজন্য একটা জোর আছে। কিন্তু ব্রাহ্মগণ কোনও অতিপ্রাকৃত শাস্ত্র মানেন না। আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতিই ইঁহাদের নিকটে সত্যের একমাত্র মুখ্য

প্রমাণ। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমানের মতন, ইঁহারা তেমন জোর করিয়া কোনও 'না'-বাচক মতের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না।

মানুষ সাক্ষাৎভাবে না জানিয়াও অনেক বিষয়ে হাঁ, না বলিয়া থাকে। না জানিয়া যখন সে 'হাঁ' বলে, তখন অপরের সাক্ষ্যের উপরে সে নির্ভর করিয়া থাকে। আর না জানিয়াও যখন সে 'না' বলে, তখন তার এই উক্তি হয় মানবজ্ঞানের মূল প্রকৃতির উপরে, না হয় শুদ্ধ অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশ ও কালের জ্ঞান মানুষের স্বতঃসিদ্ধ। আর ইন্দ্রিয়-সাক্ষাৎকারে বস্তুর যে একটা আয়তন-বা-দৈর্ঘ্যপ্রস্থাদি-বোধ জন্মে, আমাদের এই স্বতঃসিদ্ধ দেশের জ্ঞান তারই উপরে প্রতিষ্ঠিত। সেইরূপ ইন্দ্রিয়-সাক্ষাৎকারে জাগতিক সর্ব্ববিধ ঘটনার যে একটা পারম্পর্য্যের বোধ জন্মে, তাহারই উপরে আমাদের সহজসিদ্ধ কালের জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। দেশের সঙ্গে আয়তনের বা extensionএর, আর কালের সঙ্গে ঘটনাপারম্পর্য্যের বা successionএর যে একটা নিত্যযোগ প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহা আমাদের জ্ঞানের মূল প্রকৃতির সাক্ষ্য। ইংরাজিতে এই সাক্ষ্যকে necessity of thought বলে। চিন্তা করিতে গেলেই, জ্ঞানলাভ করিতে হইলেই, যে সকল সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিতে হয়, তাহাকেই necessity of thought বলে। সর্ব্বজ্ঞতার দাবী না করিয়াও জ্ঞানের মূল প্রকৃতি যে সকল সিদ্ধান্তের আশ্রয়ে কর্ম্ম করে, সেই সকল স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের বিপরীত কোনও কিছু যে কোনও দিন হয় নাই, কোনও দিন হইবে না, ও কোনও দিন হইতেই পারে না,—ইহা সকলেই বলিতে পারেন। আয়তন বা extensionশূন্য দেশ, পারম্পর্য্য বা successionবিহীন কাল, কোথাও কখনও হয় নাই, হইবে না, হইতে পারে না,—এ কথা 'না'-বাচক হইলেও, যে ব্যক্তি জ্ঞানবস্তু যে কি, দেশজ্ঞান ও কালজ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়, ইহা জানেন, তিনিই নিঃসন্দিগ্ধরূপে এই কথা বলিতে পারেন। এই জাতীয় 'না'-বাচক কথা, অজ্ঞাত হইলেও জ্ঞাতেরই মতন সত্য। এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সর্ব্বজ্ঞত্বের দাবী করা আবশ্যক হয় না। এইরূপ 'না'-বাচক বা অভাবাত্মক সিদ্ধান্তকে ভ্রান্তিবশতঃ বর্জ্জন করা যাইতে পারে; কিন্তু কোনও নূতন অভিজ্ঞতালাভে বা অভিনব জ্ঞানের উন্মেষে ইহাকে অতিক্রম করা যায় না। কারণ এই জাতীয় 'না'-বাচক বা অভাবাত্মক প্রতিজ্ঞা মাত্রেই এক একটা সনাতন ও স্বতঃসিদ্ধ সত্যের প্রতিষ্ঠা করে।

"ঈশ্বরের অবতার হয় নাই, হইবে না, হইতে পারে না"—ব্রাহ্মসমাজ এই যে 'না'-বাচক বা অভাবাত্মক মতের প্রচার করিয়াছেন, ইহা কোনও অভ্রান্ত ও সর্ব্বজ্ঞ শাস্ত্রের কথা নহে। কারণ ব্রাহ্মসমাজে এরূপ কোনও অতিপ্রাকৃত শাস্ত্রপ্রামাণ্য স্বীকৃত হয় না। ব্রাহ্মসমাজে আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতিই সত্যের একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। অথচ—"ঈশ্বরের অবতার হয় নাই, হইবে না ও হইতে পারে না" ইহা আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতির কথাও নহে। কারণ আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতি-লব্ধ সত্য

মাত্রেই হাঁ-বাচক। যাহা নাই তার প্রত্যয়ও হয় না, অনুভূতিও অসম্ভব। ঈশ্বর আছেন আত্মপ্রত্যয় এই কথা বলিতে পারে। তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ,—এ সকলের সাক্ষ্য স্বানুভূতি দিতে পারে। কিন্তু তিনি অবতীর্ণ হইতে পারেন কি না পারেন, ইহা আত্মপ্রত্যয় বলিতে পারে না। স্বানুভূতি ইহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনও সাক্ষ্য দিতে পারে না। এ সকল কথা আত্মপ্রত্যয় ও স্বানুভূতির অধিকারের বহির্ভূত। অতএব যে মূল প্রামাণ্যের উপরে ব্রাহ্মমতের প্রতিষ্ঠা, তাহার দ্বারা অবতারবাদ সপ্রমাণও হয় না, অপ্রমাণও হয় না।

যাহা আছে বলিয়া জানি, তার বিপরীত কিছু নাই ও থাকিতেই পারে না—এইভাবেও না-বাচক প্রতিজ্ঞার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজে কতকগুলি ভাবাত্মক মত আছে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে এগুলির উল্লেখ করিয়াছি। এই সকল ভাবাত্মক মতের বিরোধী কোনও মত বা সিদ্ধান্ত ব্রাহ্মসমাজে কখনোই সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, ও হইলে, সে ভাবাত্মক মত পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। অর্থাৎ সে অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজ আর ব্রাহ্মসমাজ এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম আর ব্রাহ্মধর্ম্ম থাকিবে না—তাহার বিপরীত কোনও একটা সমাজ ও ধর্ম্ম হইয়া উঠিবে। ব্রাহ্মসমাজ কতকগুলি মতে 'হাঁ' দিয়াছেন বলিয়াই, তার বিপরীত মত সম্বন্ধে 'না' বলিতে বাধ্য। এইভাবেও 'না-বাচক মতের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের 'হাঁ'-বাচক মতগুলির সকলই অপরাপর ধর্ম্মেতেও সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। ব্রাহ্মসমাজের 'হাঁ'-বাচক মতের প্রথমটীতে ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ঈশ্বর আছেন; তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা; তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ-ইত্যাদি সত্যে খৃষ্টীয়ান্, মুসলমান্, বৈষ্ণব, শাক্ত সকলেই বিশ্বাস করেন। ঈশ্বর অন্তর্য্যামী ও সর্ব্বসাক্ষী, তাঁর হস্ত-পদাদি কোনও ইন্দ্রিয় নাই, এ সকল কথাও খৃষ্টীয়ান্, মুসলমান্, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকেই স্বীকার করেন। অথচ এই সকল মত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াও খৃষ্টীয়ান্, বৈষ্ণব ও শাক্ত ঈশ্বরের অবতারে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। মুসলমান্ পয়গম্বর ও নবীতে বিশ্বাস করেন। অবতারবাদের বা নবীবাদের দ্বারা ঈশ্বরের সত্যং জ্ঞানং অনন্তং স্বরূপের কিম্বা তাঁর অদ্বৈতত্ত্বের কোনও ব্যাঘাত হয়, খৃষ্টীয়ান্, মুসলমান্, বৈষ্ণব ও শাক্ত প্রভৃতি সাধকেরা এরূপ আশঙ্কা কোনও দিন করেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া এই সাধারণ ঈশ্বর-তত্ত্বের সঙ্গে অবতারবাদের বা নবীবাদের একটা নিগূঢ় বিরোধ থাকিতে পারে না, এমনও বলা যায় না, কারণ মানুষ অনেক সময় পরস্পরবিরোধী মতকেও অজ্ঞতা বা অসাবধানতানিবন্ধন সত্য বলিয়া গ্রহণও করিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও যে তাহাই হয় নাই—এ প্রশ্নটা উঠিতে পারে।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর-তত্ত্বের সঙ্গে সত্যই কি অবতারতত্ত্বের কোনও ঐকান্তিক বিরোধ আছে? ব্রাহ্মসাধারণে এরূপ বিরোধ আছে বলিয়া মনে করেন। তারই জন্য তাঁহারা অবতার অস্বীকার করেন। কিন্তু এই না-বাচক সিদ্ধান্ত কি চিন্তার মূলসূত্রের বা necess-

sity of thoughtএর উপরে প্রতিষ্ঠিত, না কেবলমাত্র লৌকিক ন্যায়ের বা formal logicএর একটা অসঙ্গত অনুমানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—ইহাও তাকাইয়া দেখা আবশ্যক।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানবজ্ঞানের মূলপ্রকৃতি হইতেই জানা যায়। যেমন দেশ ও কালকে, সেইরূপ কার্য্যকারণসম্বন্ধকেও আশ্রয় করিয়াই আমাদের যাবতীয় জ্ঞানক্রিয়া সম্পাদিত হয়। বিশেষ দেশেতে, বিশেষ কালেতে, কোনও কার্য্যবিশেষের কারণ বা কারণ-বিশেষের কার্য্যরূপেই আমরা যাবতীয় বিষয়ের বা বস্তুর জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। এই কার্য্যকারণশৃঙ্খলকে ধরিয়াই আমাদের বুদ্ধি পরিণামে অনাদি আদিকারণরূপ ঈশ্বরতত্ত্বে যাইয়া উপনীত হয়। লৌকিক ন্যায় বা formal logic এই কারণ-ব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা করে। এই কারণ-ব্রহ্মের যে অবতার হয় না বা হইতে পারে না, জ্ঞানের মূলসূত্র হইতে এমন কোনও সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হয় না। অপিচ কারণ মাত্রকেই যখন কার্য্যরূপে পরিণত হইতে দেখা যায়, কারণের আত্মপরিণামকেই যখন আমরা সর্ব্বত্র কার্য্য বলিয়া দেখি ও জানি, তখন কারণ-ব্রহ্মই যে জগৎ ও জীবের মধ্যে জগৎ ও জীবরূপে পরিণত হইতেছেন ইহা মানিতেই হয়। লৌকিক ন্যায় বা formal logic এই পরিণামবাদেরই প্রতিষ্ঠা করে। এই পরিণামবাদ সত্য হউক, মিথ্যা হউক, জ্ঞানের মূলপ্রকৃতির সঙ্গে ইহার কোনও ঐকান্তিক বিরোধ নাই। আর এই পরিণামবাদের সঙ্গে অবতার-বাদের কোনও অসঙ্গতি নাই।

যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সেইরূপ তাঁর স্বরূপও মানবজ্ঞানের মূলপ্রকৃতি হইতেই জানা যায়। যাহা বীজে নাই তাহা বৃক্ষেতে ফোটে না। যাহা কারণেতে নাই, কার্য্যেতে তার প্রকাশ হয় না ও হইতেই পারে না। জগতে যখন জ্ঞানের পরিচয় পাইতেছি তখন জগৎ-কারণে অবশ্যই জ্ঞানক্রিয়া বিদ্যমান আছে। জীবের চেতনাই ঈশ্বরের নিত্য-চৈতন্যের সাক্ষী দেয়। মানবের জ্ঞানই ঈশ্বরের জ্ঞানস্বরূপের পরিচয় প্রদান করে। ঈশ্বর যে জ্ঞানস্বরূপ, অনাদ্যনন্ত, সর্ব্বগত ও সর্ব্বব্যাপী, আনন্দময়, শিবস্বরূপ,—এ সকলই মানবজ্ঞানের ও মানবপ্রকৃতির সাক্ষ্য হইতে প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষ নিজের প্রকৃতিকে জানিতে গিয়াই এই সকল ঈশ্বরস্বরূপেরও জ্ঞানলাভ করে। ঈশ্বর যে অন্তর্য্যামী, সাক্ষী-চৈতন্য, ইহা আমাদের জ্ঞানেরই সাক্ষ্য। এই অন্তর্য্যামী পুরুষ আমাদের ভিতরেই বাস করিতেছেন, তিনিই পরমচৈতন্যরূপে দিবা-নিশি আমাদের সঙ্গে বিরাজ করিয়া, আমাদের ইন্দ্রিয়-চেষ্টা ও রসসম্ভোগ সকলই সম্ভব করিতেছেন। অথচ দেহপুরে থাকিয়াও দেহের বিকারের দ্বারা তিনি কদাপি বিকৃত হন না। আমাদের ভুলভ্রান্তির সঙ্গে ওত-প্রোত ভাবে মিশিয়া আছেন, অথচ এ সকল পাপ-তাপ-মোহ ও অজ্ঞান তাঁহাকে স্পর্শ করে না। আর আমাদের দেহপুরে পুর-স্বামী হইয়া আছেন বলিয়া যদি তাঁর স্বরূপের কোনও হানি না হয়, তাহা হইলে অবতার অঙ্গীকার করিলেই যে সেই স্বরূপের হানি হইবে, জ্ঞানের মূলপ্রকৃতি হইতে এরূপ কোনও সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হয় না।

ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ—ইহা সমাজের একটা হাঁ-বাচক সিদ্ধান্ত। আর মামুলী ব্রাহ্মমতে এই জন্যই অবতারবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। কিন্তু জীবাত্মাও ত নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ; অথচ এই জীবাত্মা যখন দেহ ধারণ করে, তখন তার নিরাকারত্ব ও চৈতন্যস্বরূপ দু'এর কোনটাই নষ্ট হইয়া যায় না। অবতীর্ণ ঈশ্বর দেহ ধারণ করেন বলিয়া, তাঁরই নিরাকারত্বের ও চৈতন্যস্বরূপের ব্যাঘাত জন্মিবে কেন? জীবাত্মা যখন দেহবদ্ধ হইয়াও আপনার স্বরূপভ্রষ্ট হন না, তবে পরমাত্মাই বা অবতার স্বীকার করিলে স্বরূপভ্রষ্ট হইবেন কেন?

যদি বল জীবাত্মা দেহধারণ করিয়া, এই দেহের ও এই সকল ইন্দ্রিয়ের অধীন এবং এই ইন্দ্রিয়ের অধীনতা নিবন্ধন জড়ের নিয়মের অধীন হইয়া পড়ে, অবতার স্বীকার করিলে পরমাত্মাকেও এই সকল অধীনতা গ্রহণ করিতে হয়, আর তাহা হইলে তাঁর সর্ব্বাতীতত্ব, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব ঈশিত্ব ও স্বতন্ত্রত্ব রক্ষা পায় না। তাহাই বা কল্পনা করিব কেন? কারণ এই জীবাত্মাই তো সাধনপ্রভাবে, জীবন্মুক্ত অবস্থায়, এই জড়জগতের সর্ব্বপ্রকারের অধীনতা হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে। জীবাত্মার পক্ষেই যখন এই দেহেতে থাকিয়াও দেহের অতীত হওয়া সম্ভব, পরমাত্মার পক্ষে তাহা অসম্ভব হইবে কেন?

আর এই সকল যোগসিদ্ধিতে যদি অবিশ্বাসই বা কর, তথাপি ব্রাহ্মমতেও তো জীবাত্মাকে স্বাধীন বলিয়া থাকে। এই স্বাধীনতার অর্থই এই যে জীব ইচ্ছা করিলে আপনার রক্তমাংসের প্রেরণা ও প্রবৃত্তি সকলকে পদানত করিয়া তাহাদের অতীত হইতে পারে। জীবাত্মাকে জড়ের নিয়মাধীন করিলে, তাহার আর কোনও সত্য-স্বাধীনতা থাকে না। এই স্বাধীনতা আছে বলিয়াই শরীরের সহজ ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তি সকল তাহাকে যে দিকে টানে, জীব তার বিপরীত দিকেও চলিতে পারে। আর দেহধারী হইয়াও যখন দেহের অধীন থাকা বা না থাকা জীবাত্মার স্বেচ্ছাধীন, তখন ইচ্ছাময় সর্ব্বশক্তিমান পরমাত্মা দেহ স্বীকার করিয়া সেই দেহের অতীত থাকিতে পারেন না, এমন বলা যায় কি?

অতএব অবতারবাদে ঈশ্বরতত্ত্বের নিরাকারত্ব বা চৈতন্যস্বরূপের কোনও ব্যাঘাত করে, এমন বলা যায় না।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গে অবতারতত্ত্বের যে কেবল কোনও সাংঘাতিক বিরোধ নাই, তাহাই নহে। প্রত্যুত এই ঈশ্বরতত্ত্ব গ্রহণ করিলে, এক আকারে না এক আকারে, অবতারতত্ত্বও মানিতেই হয়।

ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বরতত্ত্ব অদ্বৈত-তত্ত্ব। ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর—"শান্তং শিবং অদ্বৈতং"। প্রাকৃত জনে এই অদ্বৈতের একটা অসদর্থ করিতে পারে, কখনও কখনও করিয়াও থাকে, ইহা জানি। ঈশ্বর একজন,—দুইজন বা তিনজন বা তেত্রিশ কোটিজন নহেন, কেহ এরূপও মনে করেন বটে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণ কোনও দিন অদ্বৈত শব্দের এই কদর্থ করেন নাই। রাজা রামমোহন রায় বিশুদ্ধ বৈদান্তিক অর্থেই ব্রহ্মোপাসনায় অদ্বৈত শব্দের প্রয়োগ করিতেন। রাজার সিদ্ধান্তে ব্রহ্মই বিশ্বের একমাত্র সত্য ও

নিত্য তত্ত্ব। পরমার্থতঃ বিশ্বে তত্ত্ববস্তু এক, দুই নাই, তাহাই ব্রহ্মবস্তু। এই ব্রহ্মই বিশ্বের একমাত্র কারণ। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ, ব্রহ্মই ইহার উপাদান-কারণ। সুতরাং—সদেব ইদং অগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং। রাজা শঙ্কর-বেদান্তমতাবলম্বী ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। রাজার ব্রাহ্মধর্ম্মের চরম সাধ্য ছিল— কৈবল্য। মহর্ষি জীবব্রহ্মের নিত্যভেদ স্বীকার করিয়া, নিত্যকাল জীব ব্রহ্মসত্তায় নিমগ্ন হইয়া, জ্ঞান-প্রেম-কর্ম্ম-যোগে তাঁহার সঙ্গে যুক্ত থাকিবে, ইহাকেই ব্রাহ্মধর্ম্মের চরম সাধ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। ব্রহ্ম জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন। কিন্তু ইহা স্বগতভেদমাত্র, স্বতন্ত্রভেদ নহে। সুতরাং জীব ও জগৎ উভয়ই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া, ব্রহ্মেতেই স্থিতি করে, এবং ব্রহ্মের প্রতিই নিত্যকাল গমন করে। অতএব, অদ্বৈতবাদী না হইয়াও, ব্রহ্মই যে জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ, মহর্ষিও কোনও দিন এ কথা অস্বীকার করেন নাই। "ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ"—"সদেব, সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং"—মহর্ষিও এই সকল শ্রুতি উদ্ধার করিয়া তাঁর ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে, ব্রহ্মকেই একমাত্র পরমতত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর সময়ের ব্রহ্মসঙ্গীতেও ইহার প্রমাণ পরিচয় পাওয়া যায়।

না ছিল এ সব কিছু, আঁধার ছিল অতি,
ঘোর দিগন্তপ্রসারী।
ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল,
জয় জয় মহিমা তোমারি।

কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জড়ের নিত্যভেদ স্বীকার করিয়াও, কখনও ইহাদের স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করেন নাই, কেশবচন্দ্রের সিদ্ধান্তেও তত্ত্ববস্তু এক, দুই বা তিন নহে। সেই এক হইতেই এই বহুর সৃষ্টি হইয়াছে। জীব ও জগৎ সেই এক অদ্বৈত ব্রহ্মেরই প্রকাশ। জীব তাঁহারই চিৎকণা। জড় তাঁহারই চিন্তাঘন। ইহাই ব্রাহ্মসমাজের মূল সিদ্ধান্ত। আর এই অদ্বৈতসিদ্ধান্তের সঙ্গে অবতারবাদের কোনও ঐকান্তিক বিরোধ যে কেবল নাই, তাহা নহে; ফলতঃ এই অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে, কোনও না কোনও আকারে, অবতারবাদও মানিতেই হয়; না মানিলে, জীব ও জগতের সত্তার কোনও ভিত্তি ও অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ব্রহ্মই যদি জগতের একমাত্র পরমতত্ত্ব ও চরমবস্তু হন, বিশ্বের অনাদি আদিতে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও কিছু ছিল না, ইহাই যদি সত্য হয়; সেই ব্রহ্মবস্তু হইতেই সমুদায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়া, তাঁহারই মধ্যে স্থিতি করিতেছে এবং অন্তিমে তাঁহাতেই প্রবেশ করে, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে উদ্ধৃত এই শ্রুতিবাক্য যদি মিথ্যা না হয়; তাহা হইলে এই ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্মেরই প্রকাশ; তাঁহারই রূপান্তর বলিতে হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মই জীব ও জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন,—এই কথা অস্বীকার করা অসম্ভব হয়। আর ইহাও তো এক প্রকারের অবতার। জীব ও জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াও জীব ও জগতের ধর্ম্ম ব্রহ্মকে সসীম বা সাকার করিতে পারে না। সেইরূপ ঈশ্বর দেহ ধারণ করিয়া অবতার স্বীকার করিলেও, দেহের ধর্ম্ম তাঁহাকে স্পর্শ করে

না। তাঁর অনির্ব্বচনীয় অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই জগৎকারণ এই জগৎরূপে আপনাকে প্রকাশিত করেন। সেই মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই তিনি অবতারও গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহা বিশ্বাস করিলে, ব্রাহ্মমতের কোনও ব্যাঘাত হইবে কেন? গীতার অবতারবাদ এই মায়ার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। গীতা স্পষ্টই বলিয়াছেন— ভগবান্ আপনার মায়াপ্রভাবে যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন—"সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।" অন্তত: গীতার অবতারবাদের সঙ্গে ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তের কোনোই অসঙ্গতি নাই। ব্রাহ্ম-মতের সঙ্গেই বা তার বিরোধ থাকিবে কেন?

রাজা রামমোহন রায় গোস্বামীমতের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। শঙ্কর-বেদান্তা-বলম্বী তান্ত্রিক-সাধক রাজা যে বাংলার বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের কথা নহে। কিন্তু রাজা রামমোহনও গীতার অবতারবাদ একেবারে অস্বীকার করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি যে বিশ্বরূপের উপাসনা করিতেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। তিনিই মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ব্রহ্মস্তোত্রকে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপদ্ধতিতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি পরে এই স্তোত্রটীকে কতকটা কাটিয়া ছাটিয়া নিজের মনোমত করিয়া লইয়াছিলেন, রাজা তার একটী অক্ষরও পরিবর্ত্তন করেন নাই। রাজা ব্রহ্মতত্ত্বকে নির্গুণ ও বিশ্বরূপাত্মক দুই-ই মনে করিতেন। তাই তিনি—

"নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়"

বলিয়া ব্রহ্মের স্তুতি করিতেন। মহর্ষি বিশ্বরূপাত্মকায় কাটিয়া "সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়" করিয়াছেন। আর পরবর্ত্তী পদে নির্গুণায় কাটিয়া শাশ্বতায় করিয়াছেন। মহর্ষি অদ্বৈতবাদের ভয়ে সর্ব্বদা জড়সড় হইতেন। অদ্বৈতবাদের গন্ধ পর্য্যন্ত তাঁর সহ্য হইত না। রাজার এ ভয় ছিল না। অদ্বৈতবাদী ছিলেন বলিয়াই রাজা বিশ্বরূপের ভজনাও করিতেন, আর গীতায় যতটুকু অবতারবাদ ফুটিয়াছে, ততটুকু অবতারবাদ স্বীকার করিতে তাঁর কোনও আপত্তি ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র প্রকাশ্যভাবে অবতার-বাদ স্বীকার না করিলেও, মহাপুরুষবাদের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের ব্যক্তিবিশেষে সময়ে সময়ে এই মতের প্রতিবাদ করিলেও, কেশবচন্দ্রের মহাপুরুষবাদ যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী ইহা প্রতিপন্ন হয় নাই। এই মহাপুরুষবাদের সঙ্গে অবতারবাদের পার্থক্য অতি সামান্য। ফলতঃ কেশবচন্দ্রের এই মহাপুরুষবাদ কিয়ৎপরিমাণে মুসলমান্-ধর্ম্মের পয়গম্বরবাদ বা নবীবাদেরই মতন। মহাপুরুষেরা ঈশ্বরের প্রেরিত ধর্ম্মোপদেষ্টা। অধর্ম্মের ক্ষয় এবং ধর্ম্মের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা-সাধনের জন্য, তাঁহারা যুগে যুগে মানবসমাজে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন ও ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সাধন করিয়া চলিয়া যান। ইঁহারা যখন বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মবিধান প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া সংসারে আসেন, তখন দেহধারণের পূর্ব্বে তাঁহারা অবশ্য ঈশ্বরের নিকটে তাঁরই দরবারে বাস করেন। নতুবা প্রেরিতবাদের সার্থকতা থাকে না। কেবল তাঁরা নিজেরাই যে আসেন, তাহাও নহে; তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়াই তাঁরা যুগধর্ম্ম-

প্রতিষ্ঠার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। একদিক্ দিয়া এই মহাপুরুষবাদের সঙ্গে গীতার অবতারবাদের যথেষ্ট ঐক্য আছে।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তনই গীতার অবতারের মুখ্য প্রয়োজন। এই যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনই কেশবচন্দ্রের মহাপুরুষদের জন্মেরও মুখ্য হেতু। তবে গীতায় ভগবান সাঙ্গোপাঙ্গ সহকারে অবতীর্ণ হন, এ কথাও কোথাও বলেন নাই; বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। অতএব কেশবচন্দ্রের প্রেরিত মহাপুরুষবাদ গীতার অবতারবাদের অপেক্ষাও বৈষ্ণবীয় অবতারবাদের বেশী নিকটে গিয়াছে।

কিন্তু কেশবচন্দ্র কেবল প্রেরিত মহাপুরুষবাদের প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। খৃষ্টীয়ানদের লগস (Logos) বা শব্দব্রহ্মবাদ পর্য্যন্ত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মানুষের চিন্তা বা ভাবের সঙ্গে তার ভাষার যে সম্বন্ধ, পরমতত্ত্বের সঙ্গে লগসেরও সেই সম্বন্ধ। আমাদের ভাব ও চিন্তা ভাষার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়, আমাদের ভাষা আবার আমাদের মনের ভাব ও চিন্তা হইতে, সেই ভাব ও চিন্তার আশ্রয়ে প্রকাশিত হইয়া, সেই ভাব ও চিন্তাকে ধরিয়াই আপনার স্থিতি ও সার্থকতা সম্ভব করে। সেইরূপ পরমতত্ত্বও লগসের (Logos) ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করেন। আর লগসও (Logos) সেই তত্ত্ব হইতে প্রসূত হইয়া, তাহারই আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠা ও সার্থকতা লাভ করে। "বাগর্থমিব" নিত্যযুক্ত হইয়া লগস এবং পরমতত্ত্ব অনাদিকাল হইতে পরস্পরের সঙ্গে বাস করেন। আর এই লগসই সৃষ্টিমূল। লগসই বিশ্বের ছাঁচ। এই লগসই সাকার হইয়া জগৎ ও জীবরূপে প্রকাশিত হন। এই লগসই অবতীর্ণ ঈশ্বর বা যিশুখৃষ্ট। এই লগস-বাদের উপরেই খৃষ্টীয় অবতারবাদ প্রতিষ্ঠিত। এই লগসকেই ইংরেজি বাইবেলে the Word বলা হইয়াছে।

In the beginning Was the Word.
The Word was with God.
The Word was God.

ইংরেজি বাইবেল এখানে এই লগস-তত্ত্বই ব্যক্ত করিয়াছেন। এই খৃষ্টীয় লগস-তত্ত্বের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের সাদৃশ্য অতি ঘনিষ্ঠ। সে কথা যথাসময়ে ও যথাস্থানে বলিব। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই লগস-বাদ স্বীকার করিয়াছিলেন। যিশুখৃষ্টকে তিনি লগস বলিয়া মনে করিতেন। এমন কি তাঁহাকে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। দার্শনিক অর্থে কেশবচন্দ্র খৃষ্টীয় অবতারতত্ত্বকে সত্য বলিয়া মনে করিতেন, এ কথা বলিলেও বোধ হয়, কোনও অপরাধ হইবে না। এমন অনেক খৃষ্টীয়ান আছেন, যাঁরা খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্মের মামুলী ত্রিত্ববাদ বা Trinity অস্বীকার করিয়াও লগস-বাদ স্বীকার করেন এবং যিশু খৃষ্টকে ঈশ্বরের প্রেমের ও তাঁর অন্তর্জীবনের প্রতিচ্ছবি, প্রতিমূর্ত্তি ও সাকার বাহ্যপ্রকাশ বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। ইহাও একপ্রকারের অবতারবাদ বই আর কি? আর কেশবচন্দ্র, বিশেষতঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়, যিশু খৃষ্টকে অনেকটা

এই চক্ষেই দেখিতেন। অতটুকু অবতারবাদ স্বীকার করাতে তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের কোনও ব্যাঘাত হয় নাই।

অতএব ব্রাহ্মমতের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবীয় অবতারবাদেরও যে একটা ঐকান্তিক ও সাংঘাতিক বিরোধ আছে, এ কথা বলা যায় না। ঈশ্বরের অবতার হয় নাই, হইবে না, হইতে পারে না,—ব্রাহ্মগণ যে এ কথা বলেন, ইহা তাঁহাদের আত্মপ্রত্যয়ের বা স্বানুভূতির উপরেও প্রতিষ্ঠিত নহে ; মানবজ্ঞানের মৌলিক প্রকৃতি হইতেও এই মত প্রসূত হয় না। ইহা স্বতঃপ্রামাণ্য সত্য নহে। অনুমান-প্রতিষ্ঠ সত্যাভাস মাত্র। আর অনুমানের উপরে যে সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাকে বর্জ্জন করিতে হয় না, অতিক্রমই করিতে পারা যায়।

ফলতঃ নিরাকার ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গে অবতারবাদের কোনওই বিরোধ নাই। এই বিরোধ কল্পনা করিতে যাইয়া, আমরা আমাদের ঈশ্বরতত্ত্বকেই স্বল্পবিস্তর সাকার ও বিশিষ্ট করিয়া তুলি। ঈশ্বরতত্ত্ব যে দেশ-কালের অতীত,—এবং অতীত বলিয়াই যুগপৎ সমভাবে সর্ব্বকালে ও সকল দেশে বিগুমান রহিয়াছেন, এবং একই সঙ্গে প্রকট ও অপ্রকট, তটস্থ ও তুরীয় অবস্থায় বাস করেন, একই সময়ে ব্যক্ত হইতে এবং অব্যক্ত রহিতে পারেন,—এ সকল কথা ভুলিয়া গিয়াই, ঈশ্বরের অবতার হয় শুনিলে আমরা শিহরিয়া উঠি। ফলতঃ আমরা ঈশ্বরাবতারের কথা শুনিলে এমনই ভাবি যে ঈশ্বর যদি জুদিয়ায় বা নদীয়ায় অবতীর্ণ হইলেন, তবে সে সময়ে যতক্ষণ যিশুদেহে বা চৈতন্যদেহে তিনি আবদ্ধ থাকেন, ততক্ষণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কি অনাথ হইয়া থাকে ? আর এইজন্যই একেবারে অবতার-তত্ত্বটাকে উড়াইয়া দেই। কিন্তু ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্বের অর্থ বুঝিলে আর এ খট্‌কা বাধে না। ঈশ্বর তো বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। কিন্তু এ ব্যাপ্তি জড়বস্তুর কিম্বা এমন কি আকাশবস্তুর ব্যাপ্তির মতনও নহে। তড়াগগর্ভে যেমন জলরাশি পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপভাবে ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডময় ব্যাপিয়া আছেন, তাহা নয়। সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াও সর্ব্বত্রই তিনি যুগপৎ পরিপূর্ণরূপে, আত্ম-স্বরূপে বিগুমান রহিয়াছেন। ঈশ্বরতত্ত্বে ভাগবাটোয়ারা করা যায় না। এ তত্ত্ব অখণ্ড, অবিভাজ্য, অদ্বৈত। ঈশ্বর সর্ব্বত্রই সমভাবে পূর্ণরূপে বিগুমান। বিন্দুতে যেমন পূর্ণ সিন্ধুতেও সেইরূপ পূর্ণ। এমার্সনের কথায় বলিতে গেলে—He is as perfect in the atom as in the universe. এই ঈশ্বর-তত্ত্ব আমাদের আত্মতত্ত্বেরই মতন। এই যে অস্মদ্‌প্রত্যয়বাচক আত্মবস্তু তাহা এই দেহের সর্ব্বত্র বিগুমান রহিয়াছে। আমাদের এই আমি বস্তু, এই প্রাণবস্তু, এই চৈতন্যবস্তু, যে নামেই ইহাকে ব্যক্ত করি না কেন, এই দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সমভাবে অধিকার করিয়া, সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। কোন একটা অঙ্গ নষ্ট হইয়া গেলে এই বস্তুর হ্রাস হয় না। এ বস্তু যেমনটী ছিল তেমনটীই থাকে। পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। যেমন কেশমূলে, সেইরূপ হৃৎপিণ্ডে, দেহের সর্ব্বত্র এ বস্তু যুগপৎ পরিপূর্ণরূপে বিরাজ করে। এক অঙ্গ হইতে ইহাকে টানিয়া আনিয়া অপর অঙ্গে ইহাকে ফুটাইতে হয় না।

যেখানে অস্ফুট থাকে, সেখানেও ইহা পরিপূর্ণভাবে আত্মস্বরূপেই থাকে। যেখানে পরিস্ফুট হয়, সেখানেও পরিপূর্ণভাবে সেই আত্মস্বরূপেই বিদ্যমান থাকে। প্রকাশের ইতরবিশেষে তাঁর স্বরূপের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। ইহাই আত্মার লক্ষণ। ইহাই জীবাত্মার লক্ষণ। ইহাই পরমাত্মারও লক্ষণ। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন যে এই আত্মবস্তু—

"আসীনো দূরং ব্রজতি, শয়ানো যাতি সর্ব্বত্র।"

এই শক্তিকেই ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের যোগমায়া বলিয়াছেন। এই শক্তিপ্রভাবেই কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ আধারে, বিশেষভাবে আবির্ভূত হইলেও, অন্য ক্ষেত্রে, অন্য আধারে ঈশ্বরতত্ত্বের তিরোভাব হয় না। সুতরাং অবতার অঙ্গীকার করিলে ঈশ্বরের নিরাকারত্বের বা সর্ব্বব্যাপিত্বের কোনও ব্যাঘাত হয় বলিয়া যে আশঙ্কা হয়, ইহা নিতান্তই অজ্ঞান কল্পনা মাত্র।

ফলতঃ যতদিন নিরাকার ঈশ্বরতত্ত্ব কি ইহা বুঝি নাই, ততদিন অবতার অসম্ভব ও অসাধ্য বলিয়া ভাবিতাম। যে পরিমাণে প্রকৃত নিরাকারতত্ত্ব কাহাকে বলে ইহা বুঝিতে পারিতেছি, সেই পরিমাণে অবতারবাদের ভয়টাও কমিয়া যাইতেছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

রাও বাহাদুর সর্দ্দার সংসারচন্দ্র

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সংসারচন্দ্র বহুদিন হইতে সাংঘাতিক বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মবীর, কিন্তু সেজন্য রাজ্যের গুরু কর্ম্মভার বহন করিতে একদিনের জন্যও বিরত হ'ন নাই। এমন সময় গিয়াছে, যখন এই ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া তাঁহাকে দৈনিক ১৬৷১৭ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আফগানিস্থানের অধিপতি আমীরের ভারতাগমন-উপলক্ষে আগ্রায় যে দরবার হয়—তখন আগ্রায় অবস্থানকালে অত্যধিক পরিশ্রমে ও অনিয়মে সংসারচন্দ্র অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। আগ্রা হইতে ফিরিয়া আসার পর চিকিৎসকগণের বিশেষ আদেশে এবং মহারাজের আগ্রহে তিনি কিছুদিন জয়পুরের নিকটবর্ত্তী 'রোড়পুরা'য় গিয়া বাস করেন। সেখানকার স্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে এবং বিশ্রামলাভে শীঘ্রই তিনি অনেকটা আরোগ্যলাভ করিলেন। তাঁহার আরোগ্যলাভসংবাদে রাজকর্ম্মচারিগণ ও প্রজাবৃন্দ সকলেই আনন্দিত হইল। এই পুরাতন বিশ্বস্ত সচিবের আরোগ্যলাভে আনন্দপ্রকাশ করিবার জন্য মহারাজ স্বয়ং

প্রধানা মহিষী সমভিব্যাহারে রোড়পুরা গমন করিয়া দিবসব্যাপী উৎসব করিলেন। মহারাজ সংসারচন্দ্রকে যে প্রকার ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন—এ আনন্দোৎসব তাহারই ফল। এমনি করিয়া মহারাজ সাধারণের নিকট সংসারচন্দ্রের সুদীর্ঘ চল্লিশ-বর্ষব্যাপী একান্ত প্রভুভক্তি ও আত্মত্যাগের সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সংসারচন্দ্রের স্বর্গারোহণের কিছুদিন পূর্ব্বে মহারাজ মহিষী সহ তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসার জন্য সংসারচন্দ্রের গৃহে আগমন করেন। জয়পুরাধীশ্বরীর পক্ষে রাজমন্ত্রীকে এরূপ সম্মানপ্রদর্শন এ রাজ্যে বোধ হয় অনন্যপূর্ব্ব।

১৯০৯ সালের নববর্ষারম্ভে ভারত-গভর্ণমেণ্ট সংসারচন্দ্রকে C. I. E. উপাধি প্রদান করিলেন। লোকপ্রিয় সচিবের এই সম্মান প্রাপ্তি উপলক্ষে জনসাধারণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য এক বিরাট সভা আহ্বান করেন। এই সভায় তাঁহার পুরাতন ছাত্রবর্গ, সমগ্র রাজকর্ম্মচারী, কৌন্সলের ব্যবহারাজীবগণ মিলিত হইয়া সংসারচন্দ্রকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এই সকল অভিনন্দনপত্র * এবং তৎকালীন রেসিডেণ্ট কর্ণেল হার্বার্ট জয়পুরের ইংরাজ-সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হইয়া যে বক্তৃতা করেন তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সংসার-চন্দ্রের দেবতুল্য চরিত্র, তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহার, তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা—সর্ব্বোপরি রাজ্যের হিতের জন্য তাঁহার নিঃস্বার্থ চেষ্টা—তাঁহাকে জয়পুর-অধিবাসীদের নিকট কতদূর সম্মানভাজন ও লোকপ্রিয় করিয়াছিল। সংসারচন্দ্র ইংরাজী ও উর্দ্দু ভাষায় এই সকল অভিনন্দনপত্রের যে উত্তর দেন তাহা তাঁহার ন্যায় সহৃদয় ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিরই উপযুক্ত।

রেসিডেণ্ট কর্ণেল হার্বার্ট তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—"I have never heard other than good spoken of you by all sorts and conditions of men—indeed every one has spoken of you with affection and regard and I have ever found you courteous, upright, with a fine sense of justice and the highest integrity—* * *" বাস্তবিক তিনি দেশীয় রাজ্যসুলভ বিবিধ দলের সকলেরই প্রীতি ও ভক্তির পাত্র ছিলেন—রাজকার্য্যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে অনেক সময় অনেককেই তাঁহাকে শাসন করিতে বা নিরাশ করিতে হইয়াছিল—হয়ত অনেক সময় তাঁহার কার্য্যে অনেকের স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছিল—কিন্তু তাহাতে তাঁহার উপর লোকের শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে ব্যতীত কমে নাই। অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে একস্থানে সংসারচন্দ্র যে মহদ্বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—'Be just and fear not, let all the ends, thou aimest at, be thy country's, thy God's and Truth's—' ইহাই তাঁহার জীবনে সর্ব্বকার্য্যে মূলমন্ত্র ছিল।

কিন্তু হায়! কালের করাল হস্ত সংসার-

* অভিজ্ঞ পাঠকের জন্য নানা ভাষায় লিখিত এই সকল অভিনন্দনপত্র ও সংসারচন্দ্রের উত্তর, যদি কখন এই জীবনী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তবে পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইবে। মাসিকপত্রে সে সকল প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নহে।

চন্দ্রকে এই স্বতঃ-উৎসারিত ভক্তি, এই অযাচিত সম্মান, এই বিপুল গৌরব, বেশীদিন ভোগ করিতে দিল না। অভিনন্দন-সভা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি আবার যে রোগশয্যায় শায়িত হইলেন, তাহার পর আর তাঁহার পূর্ব্ববৎ নিয়মিত রাজকার্য্য পরিচালনের সামর্থ্য রহিল না।

১৯০৯ সালের ১১ই মে সর্ব্বজনপ্রিয় সচিব, সংসারচন্দ্র অম্বররাজ্যের রাজাপ্রজা সকলকে গভীরতম শোকে নিমজ্জিত করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন—রাজ্যে হাহাকার উত্থিত হইল। মহারাজের আজ্ঞায় রাজ্যের সমস্ত আফিস-আদালত, 'ছত্রিশ কারখানা' এবং সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্য দুইদিনের জন্য বন্ধ হইল। প্রথম শ্রেণীর সর্দ্দারদিগের মৃতদেহ যে প্রকার সম্মানের সহিত শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়, সেই প্রকার 'লওয়াজামা'র সহিত সংসারচন্দ্রের মৃতদেহ দাহ-স্থানে লইয়া যাওয়ার হুকুম প্রচারিত হইল। প্রথমে দুইটি হস্তীর উপর জয়পুররাজের 'পাঁচরঙ্গা' পতাকা, তাহার পর 'নগ্নী-নাকাড়া'-বাহী উষ্ট্র ও ঘোটকশ্রেণী, তৎপশ্চাতে এক রেজিমেণ্ট রাজসৈন্য, তাহার পর সুসজ্জিত 'বিমানে' মৃত সর্দ্দারের দেহ, সঙ্গে রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দ্দার ও সমগ্র রাজকর্ম্মচারী ও সর্ব্বশেষে সহস্রাধিক শোকসন্তপ্ত প্রজাবৃন্দ। এমনি করিয়া যে সংসারচন্দ্র সুদীর্ঘ ৪৩ বৎসর জয়পুররাজ্যের হিতের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, যিনি মহারাজ সবাই মাধোসিংহের একাধারে সৎপরামর্শদাতা সচিব, সর্ব্ব সময়ে একান্ত বিশ্বাসভাজন বন্ধু ও সর্ব্বসৎকার্য্যের সহায় ছিলেন—সেই মহাপ্রাণ বঙ্গসন্তানের নশ্বরদেহ শ্মশানভূমিতে লইয়া যাওয়া হইল। যেখানে এই ধার্ম্মিক, কর্ম্মী, সত্যপরায়ণ, প্রভুভক্ত বাঙ্গালীর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে, সেস্থান আজ সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছে। জানি না, আমরা সেই অমায়িক,আড়ম্বরহীন কর্ত্তব্যনিষ্ঠার, সেই নিঃস্বার্থ প্রভুভক্তি ও ন্যায়পরায়ণতার, সেই উদার হৃদয়ের প্রকৃত সম্মান করিব কি না। কীর্ত্তিমান স্বদেশীর সম্মান করিতে পরাঙ্মুখ বলিয়া বাঙ্গালীর যে কলঙ্ক আছে,—তাহা কি কখনও মোচন হইবে না? আর, অম্বররাজ্য আজ যে নিঃস্বার্থ প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হারাইল—কে জানে কবে তাহা পূরণ হইবে? যদি কখনও অম্বরবাসী তাহাদের দেশের প্রকৃত ইতিহাস লেখে, তবে, বাঙ্গালী-গৌরব বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য, হরিমোহন সেন, কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং সংসারচন্দ্রের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। এই সকল মহাপ্রাণ বঙ্গসন্তান জয়পুররাজ্যের যে উন্নতি করিয়া গিয়াছেন, যে সকল প্রবল বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান ভারতের প্রধান হিন্দুরাজ্যের সম্মান বৃদ্ধি করিয়া জগতের নিকট জয়পুরের নাম সুপরিচিত করিয়া গিয়াছেন—সে সকল কীর্ত্তি জয়পুর ইতিহাসের পৃষ্ঠা চিরদিন উজ্জ্বল করিয়া থাকিবে।

দানশৌণ্ড মহারাজ তাঁহার পরম হিতকারী সচিবের শ্রাদ্ধাদি যথাযোগ্য সমারোহে সম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে সংসারচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র অবিনাশচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন। বৃষোৎসর্গ, দানসাগর, কাশী-নবদ্বীপ-মিথিলা প্রভৃতি স্থানের মহা-

মহোপাধ্যায় অধ্যাপক-বিদায় এবং ব্রাহ্মণাদি-ভোজন ও কাঙ্গালীবিদায়ের বিপুল আয়োজন হইল। সংসারচন্দ্রের পিতৃভক্ত পুত্র অবিনাশচন্দ্র দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে এই বৃহৎ-ব্যাপারের যে প্রকার নিখুঁত বন্দোবস্ত করিলেন—তাহা তাঁহার পিতৃভক্তিরই পরিচায়ক। সমাগত সশিষ্য অধ্যাপকদিগের এবং অতিথি অভ্যাগত ও আত্মীয়স্বজনদিগের বাসস্থান ও আহারাদির বিশেষ ব্যবস্থা হইল। বিরাট মণ্ডপতলে আঠারটি রৌপ্য ও পিত্তলের ষোড়শ, ও শ্রাদ্ধোপকরণ এবং শ্রাদ্ধসভা সজ্জিত। সভা-মণ্ডপের একস্থানে রাজগুরু, মন্দিরের মহান্ত-বর্গ এবং নানাস্থানের সুপণ্ডিত অধ্যাপকগণের স্থান, অন্যত্র রাজ্যের সর্দ্দার ও প্রধান-অপ্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ সমবেত। একধারে বঙ্গ-দেশীয় কীর্ত্তনীয়া 'মাথুরে'র করুণ-সঙ্গীতে শ্রোতৃবৃন্দকে নির্ব্বাক করিয়া রাখিতেছে। সেদিন সকলের অবারিতদ্বার। পরদিবস প্রায় ষষ্টিসহস্রাধিক ব্রাহ্মণাদি নানা জাতিকে পরি-তোষে ভোজন করান হইল। একদিন জয়-পুরস্থিত কাঙ্গালিগণ, একদিন রাজ্যের সর্দ্দার-গণ ও রাজকর্ম্মচারিগণকে ভোজন করান হইল। আহারাদির এই বিরাট ব্যবস্থা, অধ্যাপক ও সমাগত ব্যক্তিদিগের জন্য সর্ব্ব-প্রকার সুবন্দোবস্ত এবং দানসাগর শ্রাদ্ধের ব্যাপার, সর্ব্বোপরি সংসারচন্দ্রের পুত্রগণের বিনীত আপ্যায়নে সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, বিভিন্ন দেশীয় অধ্যাপকগণ একবাক্যে বলিতে লাগিলেন যে এরূপ বিরাট অথচ সুনিয়মিত সমারোহব্যাপার তাঁহাদের জীবনে কেহ দেখেন নাই, ইহা কেবল দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহের বিখ্যাত মাতৃশ্রাদ্ধের সহিত উপমিত হইতে পারে। মহারাজ এমনি করিয়া সংসারচন্দ্রের জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ প্রভুভক্তির যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

এ দিকে জয়পুররাজমন্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদে পায়োনিয়র, * সিভিল-মিলিটারী গেজেট প্রভৃতি ইংরাজী সংবাদপত্র এবং উত্তরভারতের অধিকাংশ হিন্দী ও উর্দ্দু পত্র সংসারচন্দ্রের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া তাঁহার নানা সদ্‌গুণের ব্যাখ্যান করিতে লাগিলেন। মহা-মান্য ভারত-গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও রাজপুতানার প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গ সংসার-চন্দ্রের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিয়া মৃত মহাত্মার প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করিলেন। ইংলণ্ড ও ভারতের নানাস্থানের প্রধান, অপ্রধান, ধনী, গৃহস্থ, দরিদ্র, বিদ্বান ও কর্ম্মিগণের এই সকল সমবেদনা-সূচক পত্রাদি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহারা এই বঙ্গসন্তানকে কতদূর সম্মান করিতেন এবং আশ্চর্য্য হইতে হয় যে কেমন করিয়া বন্ধুবৎসল সংসারচন্দ্র এতপ্রকার বিভিন্ন প্রকৃতি ব্যক্তির বন্ধুত্বলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। দরিদ্র স্কুল-মাষ্টার সংসারচন্দ্র নিজ চরিত্রবলে, নিজের কঠোর সাধনায় যে প্রবল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিষ্কলঙ্ক যশের উচ্চশিখরে আরোহণ

---

* স্বর্গগত সংসারচন্দ্র সম্বন্ধে সুবিখ্যাত 'পায়োনিয়রে' যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহা গ্রন্থপরিশিষ্টে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। দেশের কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির পত্রও সেই সঙ্গে প্রকাশিত হইবে।

করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, সংসারচক্রের জীবন নিম্নলিখিত সত্যের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ-স্থল—

"The heights of great men reached and kept
Were not attained by sudden flight;
But they, while their companions slept
Were toiling upward in the night.

(ক্রমশ)

অমৃতসর

(কাপিতেন ক্লড-লাফণ্টেনের ফরাসী গ্রন্থ * হইতে)

১

এইখানে একটি অতি সুন্দর, অতি মনোরম, ও পবিত্র নগর অধিষ্ঠিত; অমৃতসর শিখদিগের 'রোম,' খাল্‌সাদিগের,—ঈশ্বর-নির্ব্বাচিতদিগের—মেক্কা। এইখানেই আমি শিখদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ দেখিতে পাইলাম, তাহাতে শিখদিগের অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্মমতগুলি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

উজ্জল প্রভাত। চারিদিকেই জীবন-চাঞ্চল্যের একশেষ। স্বর্ণমন্দির দর্শনোদ্দেশে জনতার মধ্য দিয়া অতিকষ্টে সহর অতিক্রম করিলাম। সুন্দর সুন্দর উদ্যানের মধ্যস্থিত দীর্ঘ বীথিগুলি অনুসরণ করিয়া, মক্ষিকা-গুঞ্জিত অসংখ্য বিপণির মধ্য দিয়া, পুরাতন অমৃতসর অতিক্রমপূর্ব্বক, অবশেষে পুণ্য-সরোবরের তীরে উপনীত হইলাম। এইরূপে বিবিধ গণ্ডি অতিক্রম করিয়া, এই পথটি কেন্দ্রস্থলে আসিয়া—২০ লক্ষ শিখ যে গ্রন্থ মানিয়া চলে, সেই গ্রন্থের অধিষ্ঠানভূমিতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। প্রথমেই উদ্যানের একটি বহির্বেষ্টন; পরে, ইংরাজি কেতা-অনুযায়ী ফুলের কেয়ারী-সমূহ, তাহার পর পুরাতন দেশী সহর, তাহার পর পুণ্য-নগরী,—এই নগরী অমৃত-সরোবরকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। সরোবরের মধ্যস্থলে, স্বর্ণমন্দির; মন্দিরের ভিতর "গ্রন্থ সাহেব"।

সাদা কালো মার্বেল-প্রস্তরে নির্ম্মিত সমচতুষ্কোণ সুশীতল ঘাট সরোবরটিকে রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। জনতার নগ্নপদঘর্ষণে মসৃণ ঘাটের সানগুলা সূর্য্যালোকে ঝিক্ মিক্ করিতেছে। চারিদিকে বড় বড় বাড়ী ও দেবালয়ের প্রাচীর হইতে সূর্য্যকিরণ দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত হইতেছে, এবং মন্দির-

* "A Travers L' Inde"—খৃঃ ১৯১৩ অব্দে প্রকাশিত।

গাত্র হইতে বিশুদ্ধ কাঞ্চনদীপ্তি বিচ্ছুরিত হইয়া পরীদৃশ্যের ন্যায় আলোক-উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে।

মন্দিরটি চমৎকার; মনে মনে কল্পনা কর,—একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ ইমারৎ, তল হইতে চূড়া পর্য্যন্ত স্বর্ণমণ্ডিত, বেশ অক্ষুণ্ণ অক্ষত, মধ্যস্থানে একটি ছোট গম্বুজ চূড়াদেশে স্থাপিত, চারি পার্শ্বে চারিটি ক্ষুদ্র ফাঁক্-বিশিষ্ট সুন্দর অট্টচূড়া,তাহাতে আঁবদ্ধ ধাতব ঘণ্টিকা-গুলি জলন্ত আকাশতলে তীব্ররূপে ধ্বনিত হইতেছে। একটা প্রশস্ত বাঁধের উপর দিয়া তথায় উপনীত হইলাম—ইহা একপ্রকার সেতু, তীর হইতে মন্দির পর্য্যন্ত প্রসারিত—'মোজেয়িক্'-কাজ করা এই সেতু-পথের দুই ধারে খোদিত বারাণ্ডা; ইহা বিচিত্র বর্ণের লণ্ঠনে বিভূষিত; সেতুর যে প্রান্তটি ঘাটে আসিয়া মিলিয়াছে, সেইখানে হস্তিদন্তখচিত একটি জমকালো রৌপ্যময় দ্বার।

যে সোনার কথা বলিয়াছি, উহা মোটা সোনার পাত, এবং যে রূপার কথা বলিয়াছি ঐ রূপা তাঁবার মত ঢালাই করা। শিল্প-অলঙ্কারগুলি, দশপুরুষ-পরম্পরাগত শিল্প-কলার ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিতেছে। সমস্ত ভারত ভ্রমণ করিয়া আমি এইরূপ কথা কচিৎ কখন বলিতে সমর্থ হইয়াছি।

সর্ব্বজনপ্রশংসিত প্রাসাদ, প্রসিদ্ধ সমাধি-মন্দির, মস্‌জিদাদি, রাশি রাশি দেবমন্দির অনেক সময়ে আমাকে প্রতারিত করিয়াছে! কোন পরমাশ্চর্য্য ইমারৎ, যাহা কল্পনায় অতুলনীয় বলিয়া প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, আসল জিনিসটা যখন দেখিলাম, তখন স্থূল বলিয়া মনে হইল:—(প্রাচীরগুলা পুরাতন ইঁটের), কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তবৎ (চূণের পোঁচ দেওয়া, অল্পবিস্তর রং করা, সর্ব্বত্রই চটা-উঠানো) বিশেষতঃ নির্দ্দয় কালপ্রভাবে বিষম ভগ্ন-দশাগ্রস্ত।

কিন্তু এখানকার এই পরমাশ্চর্য্য মন্দিরটি একটি রত্ন বিশেষ; সুন্দররূপে খোদিত, সুন্দর রূপে সন্নিবেশিত এবং যারপরনাই সমুজ্জল।

অভ্যন্তরে,—জরির কাজ-করা লাল মখ-মলের একটি চন্দ্রাতপ-তলে, কতকগুলি পুরোহিত একখানি গ্রন্থের চতুষ্পার্শ্বে বসিয়া আছে। আমাদের 'ফোলিও' (Folio) আকারের গ্রন্থের অপেক্ষা চতুর্গুণ বড় এবং সেই অনুপাতে স্থূল। গ্রন্থখানি মেজের গালিচার উপর খোলা রহিয়াছে; একটা জরির কাপড়ে উহার কিয়দংশ ঢাকা। মধ্যে মধ্যে, একজন পুরোহিত খাড়া হইয়া, কতক-গুলি শব্দ পাঠ করিবার জন্য ঐ কাপড়ের একটি কোণ উঠাইয়া ধরিতেছে, তাহার পর আবার ভক্তিভাবে স্বস্থানে পুনঃ স্থাপন করিতেছে। তিনজন বাদক,—দুইজন পাখোয়াজিয়া ও একজন সারেঙ্গী; উহারা বেশ একটি মনোরম ছন্দে অবিরাম বাজাইয়া যাইতেছে। ভক্তেরা দলে দলে আসিয়া ঐ বৃহৎ গ্রন্থের সম্মুখে যোড়হস্তে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিতেছে এবং সম্মুখে বিস্তৃত গালিচার উপর এক একটি মুদ্রাখণ্ড নিঃক্ষেপ করিতেছে। পাওনার অঙ্কটা মন্দ নহে। পয়সা, আনা, টাকা অজস্র বর্ষিত হইতেছে। ইহার জন্যই কি, পুরোহিতেরা, বাদকেরা, ভক্তেরা, এরূপ সহাস্যবদন ও হর্ষোৎফুল্ল? আমি ঘরের যে কোণটিতে বসিয়াছিলাম, সেখান হইতে ঘরের দৃশ্যটি অতি রমণীয়—ঘরটি স্বর্ণভূষণে ও

চিত্রাদিতে বিভূষিত। একটি সূর্য্যরশ্মি তির্য্যক্‌ভাবে পতিত হইয়া, ধূপ-ধূনার তরঙ্গায়িত লঘু ধূমরাশিকে উদ্‌ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। যেন নিজ গৃহের মধ্যেই অধিষ্ঠিত, এইরূপভাবে কপোতেরা পক্ষসঞ্চালন পূর্ব্বক গৃহ-আকাশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে উড়িয়া বেড়াইতেছে। ভক্তেরা যেরূপভাবে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিতেছে, সেই ভঙ্গিটিতে বেশ একটু শ্রী আছে।

যাহারা গ্রন্থকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে একটি পুরোহিত গাত্রোত্থান করিয়া গম্ভীর ভাবে সাদা ফুলের একটি মালা আমাকে দিবার জন্য আসিল। তাহার সযত্ন-বিন্যস্ত দীর্ঘ কেশকলাপ স্কন্ধের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, এবং দীর্ঘ শ্মশ্রুরাজি তাহার বক্ষকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। ঐ মালা আমার গলায় পরাইয়া দিল—আমি নিবারণ করিতে পারিলাম না। আর আমি নিবারণ করিবই বা কেন? তাহার ভঙ্গিটি অতি সুন্দর এবং আমি যে একটি টাকা গালিচার উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, আমার বিশ্বাস, উহাই এই শিষ্টাচারের একমাত্র কারণ নহে। আবার, প্রধান পুরোহিতের তরফ হইতে সে আমাকে একখণ্ড মিছরিও দিল, তাহাও আমি আদরের সহিত গ্রহণ করিলাম।

তাহার পর আমাদের মধ্যে বাক্যালাপ চলিতে লাগিল। তাহাদের মন্দিরটি আমার বড় ভাল লাগিয়াছে,—ইহা একজন দোভাষীর মুখ দিয়া তাহাকে জানাইলাম। এই কথায় প্রীত হইয়া, সে ঔৎসুক্য ও ভদ্রতার সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—আমি য়ুরোপীয় কোন্ জাতিভুক্ত, আমার কি ব্যবসায়। সে আমার ধর্ম্মের কথা পাড়িল এবং স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে খুব উৎসাহ প্রকাশ করিল। "সাহেব, তুমি আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ—আমাদের "আদিগ্রন্থ"—দেখিতে আসিয়াছ? তুমি এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিবে কি না সন্দেহ; কেননা এই সকল গ্রন্থের ভাষাপ্রয়োগ-পদ্ধতি বুঝিতে পারে এরূপ লোক আমাদের মধ্যেও অতি অল্প আছে। কিন্তু ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়; কেননা, ঐ গ্রন্থে সুন্দর সুন্দর অনেক কথা লেখা আছে—সমস্তই ধ্রুব সত্য;—ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়; তাঁহাকেই আরাধনা করিতে হইবে, কোন প্রতিমাকে নহে। আত্মা অমর, ঈশ্বর পর্য্যন্ত উত্থিত হইবার জন্য, এই আত্মা বহু জন্মের মধ্য দিয়া, যুঝাযুঝি করিতেছে। কেবল চিত্তশুদ্ধির দ্বারাই তাঁহার নিকট উপনীত হওয়া যায়। হৃদয় বিশোধিত হইলে, ঈর্ষ্যাকে জয় করা যায়। রসনা বিশোধিত হইলে, মিথ্যাবাদকে জয় করা যায়। চক্ষু বিশোধিত হইলে, কামকে জয় করা যায়। কর্ণ বিশোধিত হইলে, নিন্দাবাদকে জয় করা যায়।

এক্ষণে সূর্য্য যথেষ্ট উচ্চে উঠিয়াছে। বাহিরে, এই সূর্য্যের প্রখর কিরণে, সরোবরটি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। এইবার একটু ত্বরা করিতে হইবে; অটলের ধ্বজমন্দিরটি দেখিতে যাইতে হইবে। এখান হইতে খুব নিকটে। ঐ ধ্বজমন্দির হইতে এক দৃষ্টিতে সমস্ত সহরের দৃশ্যটি দেখা যায়। এই ধ্বজমন্দিরটি দুই উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হয়। ইহা নানকের সমাধি-মন্দির এবং অটলের স্মৃতিমন্দির। এই অটল, এক শিশুর বিনিময়ে আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল।

উহার উপর হইতে—প্রায় ১২৫ হস্ত পরিমাণ উচ্চ—দৃশ্যটি পরীদৃশ্যের ন্যায়। প্রথমেই দর্শকের দৃষ্টি স্বর্ণচূড়ার উপর আসিয়া নিপতিত হয়। শুভ্রবর্ণ সরসীজলের মধ্যস্থলে উহা ম্লান-পীতবর্ণ বলিয়া অনুভূত হয়; এবং ঐখান হইতে বীথিগুলি, সরোবর-অভিমুখী পথগুলি পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পথগুলি,—চিত্রের পশ্চাদ্‌ভূমির ন্যায় ঘন-ঘোর উদ্ভিজ্জরাশি হইতে বাহির হইয়া এই পুণ্যনগরীর প্রাচীরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

কোথাও কোথাও, ধনবান্ শিখদিগের বাগানবাড়ী দেখা যাইতেছে; উহারা উৎসবাদির সময় ঐখানে কয়েক দিবস অতিবাহিত করে। কোথাও বা গৃহের সমতল ছাড়াইয়া মন্দিরের চূড়া উঠিয়াছে; কোথাও বা একটি মস্‌জিদ্; আর একটি সরোবর; আরও দূরে একটি অসমান-আকৃতি চত্বর; কিন্তু এই ক্ষুদ্র স্বর্ণমন্দিরটির উপরেই দর্শকের ঔৎসুক্য সতত কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে;—রত্নাধারের মধ্যে যেন একটি সুকুমার বহুমূল্য রত্ন নিহিত।

২

অমৃতসর হইতে ছাড়িবার পূর্ব্বে, এখানকার কোন সুন্দর স্মৃতিচিহ্ন, বা কৌতুক-সামগ্রী বা কোন টুকি-টাকি দ্রব্য সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমার পরিচারক (boy) গালিচা ও পুরাতন জিনিসের দোকান্‌দার চম্বা-মলের নাম করিল।

আমরা তখনই সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম; আমার 'বয়' একটা দরজা ঠেলিয়া খুলিল; আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

চূণ-কাম করা দুটি ছোট ঘর,—প্রায় খালি। আমাদের দোকানের টুকি-টাকি দ্রব্য স্মরণ করাইয়া দেয়,—এখানে এমন কিছুই নাই; দেয়ালের ধারে লম্বালম্বি, গোটানো গালিচাগুলা সাজান রহিয়াছে। একটা খোলা আলমারীতে কতকগুলি "কৌতুক-সামগ্রী" (curiosities); একটা কোণে, টেবিলের উপর, একটা বড় বুদ্ধমূর্ত্তি গূঢ়অর্থ সূচক পদ্মের উপর উপবিষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করত ঈষৎ হাস্য করিতেছে।

আমাকে দেখিয়া, তিনটি বালক অগ্রসর হইল; ইহারা চম্বামলের মুহুরী;—নতনেত্রে, যোড়হস্তে, শোভনভঙ্গিতে একটু নতকায় হইয়া, আমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করিতে লাগিল; এবং সাদর সঙ্কেতে আমাকে দ্বিতীয় ঘরটিতে আসিবার জন্য আহ্বান করিল। চম্বামল ঐ ঘরে থাকেন।

লোকটি স্থূলকায়; একটা আরাম-কেদারায় ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছে এবং গড়্‌গড়ার দীর্ঘ নল মুখে দিয়া তামাকু সেবন করিতেছে। এক ক্ষুদ্রকায় মুসলমান তাহাকে পাখার বাতাস করিতেছে; এবং আর দুইজন তাহাকে আমোদ দিবার জন্য বাদ্য বাজাইতেছে।

অবশ্য এই নাট্যদৃশ্যটি পূর্ব্ব হইতে আয়োজন করিয়া রাখা হয় নাই। কাজ-কর্ম্ম করিবার কি মধুর রীতি! আমাদের য়ুরোপের বণিকেরা তাহাদের অমৃতসরের সংযোগীকে দেখিয়া কত না ঈর্ষ্যা করিবে!

স্থূলকায় লোকটি আমাকে দেখিতে পাইয়া, একটু হাসিমুখে আমার দিকে মুখ

ফিরাইল। এ কি! লোকটা, ওর বুদ্ধমূর্ত্তিরই মত যে কুৎসিৎ।—সে ইংরাজিতে বলিল :—

—Step in, Sir ··you will see my shop? I feel quite honoured. This way...please to follow me ..

অপ্রত্যাশিত লঘুগতি-সহকারে চম্বামল, তাহার গালিচা-কারখানার মধ্য দিয়া, আমার আগে আগে চলিতে লাগিল। আহা! কি সুন্দর দৃশ্য!··একটি সরু গলি-পথ, ১০০ হাতের কিঞ্চিৎ অধিক দীর্ঘ; বামদিকে একটি দেয়াল, দক্ষিণে অসংখ্য খোপের মত ঘর, সেইখানে গালিচার তাঁতগুলা খাড়া রহিয়াছে; প্রত্যেক তাঁতের সম্মুখে ৪।৫ জন অল্পবয়স্ক লোক—বালক ও বালিকা—বসিয়া আছে। একপ্রকার নিস্তব্ধ কর্ম্মতৎপরতা ঐ সকল মানব-যন্ত্রদিগকে যেন সজীব করিয়া তুলিয়াছে। কার্য্যপ্রকরণটি বড়ই কৌতুকাবহ; প্রত্যেক খোপে, প্রধান কারিগর অনুচ্চস্বরে একটা আদেশবাক্য উচ্চারণ করিতেছে; তাহার অর্থ,—"একটা লাল পংক্তি", "একটা নীল পংক্তি", এবং তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ কারিগরদিগের কর্ত্তৃক পালিত হইয়া মূল-নক্সাটা অল্পে অল্পে গড়িয়া উঠিতেছে। আমাদের দেশের প্রণালী স্বতন্ত্র; আমাদের কারিগরেরা একটা স্থূল ধরণের নমুনা চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া তাহারই অনুসরণ করে।

উহাদের কার্য্যপ্রকরণ দেখিবার সময়, দর্শক আর কোন দিকে মন দিতে পারে না; উহাই দর্শকের মনকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলে। এই তাম্রবর্ণ সরু-সরু আঙ্গুলগুলির ক্ষিপ্রকারিতা দর্শককে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে। উহাদের মধ্যে খুব ছোট-ছোট ছেলেও আছে, তাহারা ভারী গম্ভীর ও কার্য্য-গৌরবে গর্ব্বিত।

—— ... কিন্তু চম্বামল্, এই গালিচাগুলা দেখিতে কদাকার···

—তা'সত্ত্বেও আমি ত সাহেব খুব উচ্চমূল্যে—বিশেষত বিলাতে—এইগুলা বিক্রয় করি; এই দেখ, আজই রাত্রে এই তিন বাক্‌স প্যারিসের জন্য চালান হইবে। প্রতি সপ্তাহে অতগুলা করিয়া বাক্‌স প্যারিসের বড় বড় দোকানে পাঠাইয়া থাকি...

...একই কথা! তার চেয়ে, পারস্যের পুরাতন গালিচার নকল কর না কেন তোমরা? পারসীক গালিচার রং-এর কেমন সামঞ্জস্য, কেমন মাধুর্য্য; দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, ও তাহার উপর বসিয়া ঈশ্বর-আরাধনা করিতেও বেশ। এই রকম মূঢ় ধরণের গালিচায় বসিয়া তুমি কি ধ্যানধারণা করিতে পার?

——না সাহেব, তা পারি না!···কিন্তু ও জিনিস নকল করিতে ক খরচ পড়ে। আচ্ছা যদি পছন্দ না হয়, আমার ও-গুলি রেখে, এইগুলি লও। এই গালিচাগুলি সার্থবাহেরা কাবুল ও পেশোয়ার পর্য্যন্ত আনিয়াছিল;—খুব পুরাতন; অনেক লোকের হাঁটু উহাতে পড়িয়াছে...এই দেখ। এই ছোট হল্‌দে গালিচা, আর এই লাল গালিচা,—মূল্য ত্রিশ টাকা মাত্র··· ...

... ...

অনেক কথার পর, অবশেষে আমি ত্রিশ টাকা মূল্যেই ঐ দুইটি গালিচা লইলাম। ত্রিশ টাকার বিনিময়ে এমন চমৎকার বেমালুম-মিশ্রিত রং-এর পুরাতন জিনিস—সে হিসাবে মূল্য বাস্তবিকই খুব কম! তাহার বুদ্ধেরই মত দেখিতে সেই চম্বামল্, আর আমি—আমরা দু'জনেই প্রীত হইলাম···

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, মেট্কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

ত্রয়োদশ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩২০ [৮ম সংখ্যা

(নব পর্য্যায়)

মাসিক পত্র

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত

কলিকাতা, ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

মজুমদার লাইব্রেরি হইতে এস্ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বর্ত্তমান সংখ্যার মূল্য ।৵০ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০

১৩শ বর্ষ] বঙ্গদর্শন [অগ্রহায়ণ, ১৩২০

সূচী

মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত এবং
৬ ও ৭ ফর্ম্মা—মেট্‌কাফ্ প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র
অধিকারী দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন

নিমাই-চরিত্র

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

গৌড়ীয় ভক্তগণের স্বদেশ-প্রত্যাগমন, গৌরের বৃন্দাবনযাত্রা, শান্তিপুর-গমন, রূপ-সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ, রঘুনাথ দাসের সহিত সাক্ষাৎ

একদিন অদ্বৈতাচার্য্য গৌরের আবাসে উপস্থিত হইলে, গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথা হইতে আসিলেন?"

অদ্বৈত—জগন্নাথ দেখিয়া আসিতেছি।

গৌর—আপনি জগন্নাথ দর্শন করেন কিরূপে বলুন দেখি।

আচার্য্য—কেন, দর্শন করিয়া প্রদক্ষিণ করি।

গৌর—আমি ওরূপভাবে ঠাকুর দেখি না। প্রদক্ষিণ করিলে কিছুক্ষণ ঠাকুরের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি ক্ষণেকের অদর্শনও সহ্য করিতে পারি না। তাই প্রদক্ষিণ না করিয়া অপলক নয়নে ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকি।

এইরূপ নানা আলাপে গৌর গৌড়ীয় ভক্তগণের সহবাসে চারিমাস কাটাইলেন। এ চারিমাস ভক্তগণের বড় সুখেই অতিবাহিত হইল। তাঁহারা একে একে নিমন্ত্রণ করিয়া সকলেই গৌরকে খাওয়াইলেন। গৌর তাঁহাদিগের সহিত নিতান্ত অন্তরঙ্গের মত ব্যবহার করিতেন। চারি মাস তিনি তাঁহাদিগের সহিত নানারূপ আমোদ-প্রমোদ করিলেন; জন্মাষ্টমীর দিন তাঁহাদিগের সহিত গোপীবেশ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিলেন; বিজয়া দশমীর দিন তাঁহাদিগকে বানর সাজাইয়া ও নিজে হনুমান্ সাজিয়া রামলীলা অভিনয় করিলেন। ভক্তগণ তাঁহার সহবাসে গৃহের কথা ভুলিয়া রহিলেন।

অবশেষে বিদায়ের দিন সমাগত হইল। ভক্তগণ শোকাকুল হইয়া পড়িলেন। গৌর সুমিষ্ট বচনে সকলকেই পরিতুষ্ট করিয়া কহিলেন, "তোমরা সকলে প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় আসিয়া চারিমাস আমার সহিত নীলাচলে অবস্থান করিবে; এখন দেশে ফিরিয়া যাও।" অদ্বৈতাচার্য্যকে কহিলেন, "আচার্য্য, দেশে তোমার জন্য প্রচুর কর্ম্ম পড়িয়া আছে; তুমি দেশে ফিরিয়া গিয়া আচণ্ডালে কৃষ্ণভক্তি বিতরণ কর।" নিত্যা-

নন্দকে কহিলেন, "নিতাই, তোমাকে গৌড়-দেশে যাইতে হইবে। রামদাস, গঙ্গাধর প্রভৃতি ভক্তকে সঙ্গে লইয়া তুমি তথায় প্রেমভক্তি--প্রচারের ভার গ্রহণ কর।" অতঃপর শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "শ্রীবাস, তোমার প্রাঙ্গণ আমার নিত্য-বিহারভূমি। আমি প্রত্যহ তথায় নৃত্য করিব ; কিন্তু তুমি ভিন্ন কেহ আমায় দেখিতে পাইবে না।" একখানা বস্ত্র, শ্রীবাসের হস্তে দিয়া কহিলেন, "আমার মাতাকে এই বস্ত্র দিয়া বলিবে, তাঁহার সেবা ত্যাগ করিয়া যে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, ইহাতে আমার ধর্ম্মনাশ হইয়াছে। তাঁহার আজ্ঞাতেই আমি নীলাচলে আছি। মাঝে মাঝে তাঁহার চরণ-দর্শনাভিলাষে আমি তাঁহার নিকট যাই। কিন্তু তিনি দেখিতে পান না। একদিন নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত করত ইষ্টদেবতাকে নিবেদন কালে আমাকে স্মরণ করিয়া তিনি কাঁদিয়াছিলেন। আমি তাহা জানিতে পারিয়া, সেই আহার্য্য ভক্ষণ করিয়া আসিয়া-ছিলাম। তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, বালগোপাল তাঁহার অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিল; তাঁহাকে বলিও আমিই গিয়া খাইয়া আসিয়াছিলাম।" শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ, নরহরি ও মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দন ভক্তগণের মধ্যে ছিলেন। মুকুন্দ ও নরহরি দুই সহোদর। গৌর হাসিতে হাসিতে মুকুন্দকে কহিলেন, "মুকুন্দ, তুমি রঘুনন্দনের পুত্র না রঘুনন্দন তোমার পুত্র?" মুকুন্দ কহিলেন, "রঘুনন্দন হইতেই আমরা কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়াছি। সুতরাং রঘুনন্দন পিতা, আমরা তাহার পুত্র।" তখন গৌর কহিলেন, "মুকুন্দ ছিলেন ম্লেচ্ছরাজার বৈদ্য। একদিন এক ভৃত্য ম্লেচ্ছরাজার মাথার উপর এক ময়ূর-পুচ্ছের আড়ানী ধরিয়াছিল। মুকুন্দ সেই শিখিপুচ্ছ দেখিয়াই মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। মুকুন্দের মত ভক্ত বিরল।" কিন্তু মুকুন্দ ও রঘুনন্দনকে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে গৌর আদেশ করিলেন। নরহরি তাঁহার নিকট থাকিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন।

মুরারি গুপ্তকে আলিঙ্গন করিয়া গৌর ভক্তগণকে কহিলেন, "মুরারির ভক্তি অনন্য-সুলভ। ইনি রঘুনাথমন্ত্রের উপাসক। একদিন আমি তাঁহাকে বারবার বলিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের ভজনা করিতে মত লওয়াইলাম। কিন্তু গৃহে গিয়া কিরূপে তিনি রঘুনাথের সেবা ত্যাগ করিবেন, ইহা ভাবিতে ভাবিতে পাগলের মত হইলেন। সমস্ত রাত্রি কাঁদিতে কাঁদিতে গেল,—পরদিন প্রত্যূষে আমার নিকট আসিয়া কহিলেন, "আমি রঘুনাথের চরণে মাথা বেচিয়াছি। তাহা আর ফিরিয়া লইতে পারিতেছি না। কিন্তু তোমার ও আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব কিরূপে? তুমি দয়া করিয়া এইরূপ কর—যেন আমি এখন তোমার সম্মুখে মরিয়া এই দ্বন্দের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই।" এই ঐকান্তিকী ভক্তি দেখিয়া আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলাম, "গুপ্ত, তোমার ভজনই সার্থক। প্রভুচরণে তোমারই মত দৃঢ়প্রীতি প্রভুর গ্রাহ্য। প্রভু যদি পদ ছাড়াইয়া নিতে যান, তবু সে পদ ছাড়িয়া দিতে সেবক পারে না। আমি পরীক্ষা করিবার জন্যই তোমাকে রঘুনাথমন্ত্র ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলাম। তুমি সাক্ষাৎ হনুমান্—তুমি

কেন শ্রীরামের চরণ ত্যাগ করিবে।” তখন বাসুদেবকে আলিঙ্গন দিয়া গৌর তাহারও গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বাসুদেব তাঁহার চরণ ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—

“জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার,
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার।
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে,
সব জীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে।
জীবের পাপ লইয়া মুঞি করোঁ নরকভোগ,
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥”

গৌর কহিলেন, “ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ কখনও ভক্তবাঞ্ছা অপূর্ণ রাখেন না। তুমি যখন ব্রহ্মাণ্ডের জীবের উদ্ধার প্রার্থনা করিতেছ, তখন সকলেই উদ্ধার লাভ করিবে।”

কাঁদিতে কাঁদিতে গৌরচরণে প্রণাম করিয়া ভক্তগণ বিদায় গ্রহণ করিলেন। কেবল গদাধর পণ্ডিত, পরমানন্দ পুরী, জগদানন্দ, স্বরূপ দামোদর, দামোদর পণ্ডিত, গোবিন্দ ও কাশীশ্বর গৌরের সহিত নীলাচলে রহিলেন।

ভক্তগণ প্রস্থান করিলে সার্ব্বভৌম একদিন গৌরকে মিনতি করিয়া কহিলেন, “আমার গৃহে মাসাবধি ভিক্ষা করিতে হইবে।” গৌর কিছুতেই রাজী হইলেন না। অনেক পীড়াপীড়িতে একদিনের জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। সার্ব্বভৌম-গৃহিণী পরম যত্নে নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া গৌরকে পরিবেশন করিলেন। অত্যধিক প্রীতিবশতঃ অত্যধিক দ্রব্য গৌরের পাত্রে পরিবেশিত হইল। গৌর তাঁহাদের ভক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া ভোজনে বসিলেন। এমন সময় সার্ব্বভৌমের জামাতা, তাঁহার কন্যা ষাঠীর স্বামী অমোঘ ভট্টাচার্য্য ভোজনগৃহের বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল, “বাপরে খাওয়া দেখ, ১০।১২ জনের ভাত সন্ন্যাসীটা একা খাচ্ছে।” সার্ব্বভৌম এই কথা শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইলেন এবং একলাঠি হস্তে লইয়া তাহাকে প্রহার করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। অমোঘ পলাইয়া গেল। সার্ব্বভৌম-গৃহিণীও জামাতার আচরণ লক্ষ্য করিয়া বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন “অমন পাষণ্ডের স্ত্রী হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা, ষাঠী বিধবা হউক।” গৌর হাসিতে হাসিতে তাহাদের ক্রোধ শান্তির জন্য নানা কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বজনকর্ত্তৃক প্রভুর অপমান হইল ইহা ভাবিয়া সার্ব্বভৌম মহা দুঃখিত হইলেন। ভোজনান্তে সার্ব্বভৌম গৌরকে গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, এমন জামাতার আর মুখদর্শন করিব না। এদিকে অমোঘ পলায়ন করিয়া দূরে দূরে থাকিতে লাগিল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই রাত্রিতেই তাহার বিসূচিকা রোগ হইল। গৌর সেই সংবাদ শুনিয়া ত্বরিতে তাহার নিকটে গমন করিলেন এবং তাহাকে নানাবিধ উপদেশ দিয়া অবশেষে কৃষ্ণনাম প্রদান করিলেন। অমোঘ নিরাময় হইয়া পরম কৃষ্ণভক্ত হইয়া উঠিল।

কিছুদিন পরে গৌর রামানন্দ ও সার্ব্বভৌমের নিকট বৃন্দাবন গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা বিচ্ছেদাশঙ্কায় কহিলেন—“সম্মুখে রথযাত্রা, রথযাত্রার পরে গমন করিও।” রথযাত্রা অতিক্রান্ত হইলে গৌর স্বীয় অভিপ্রায় পুনরায় ব্যক্ত করিলেন।

তখন তাঁহারা কহিলেন—"কার্ত্তিক মাসে যাইও।" কার্ত্তিক মাসে দুরন্ত শীত বলিয়া আপত্তি হইল। এইরূপে চারি বৎসর গেল। পঞ্চমবৎসরে গৌর দৃঢ়ভাবে স্বীয় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করিলেন। এবার আর ওরূপ আপত্তির কোনও ফল হইল না। বিজয়া দশমীর পর দিন গৌর বৃন্দাবন উদ্দেশ্যে পূরী ত্যাগ করিলেন। কটকে রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার সহিত দেখা করিয়া তাঁহার গমনের সমস্ত আয়োজন করিয়া দিলেন। রামানন্দ, স্বরূপ-গদাধর ও অন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত কটক পর্য্যন্ত গৌরের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। কটক ত্যাগ কালে গৌর গদাধরকে পুরুষোত্তমে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিয়া কহিলেন—"তুমি ক্ষেত্রসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ। তাহা ত্যাগ করিয়া আমার সহিত আসা তোমার অকর্ত্তব্য।"

পণ্ডিত কহে যাঁহা তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥
প্রভু কহে, ইহা কর গোপীনাথ সেবন।
পণ্ডিত কহে, কোটিসেবা ত্বৎপাদদর্শন॥
প্রভু কহে, সেবা ছাড়িবে আমার লাগে দোষ।
ইহা রহি সেবা কর আমার সন্তোষ॥
পণ্ডিত কহে, সব দোষ আমার উপর॥
তোমা সঙ্গে না যাইব, যাব একেশ্বর।

গদাধর গৌরের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একাকী চলিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাকে ডাকিয়া তাহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক গৌর কহিলেন—

আমার সঙ্গে রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজ সুখ,
তোমার দুই ধর্ম্ম যায় আমার হয় দুঃখ॥
মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল।
আমার শপথ যদি আর কিছু বল॥

বলিয়া গৌর নৌকায় আরোহণ করিলেন। গদাধর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহাকে নানারূপ প্রবোধ দিয়া পুরী লইয়া গেলেন। রামানন্দ যমুনা পর্য্যন্ত গৌরের সঙ্গে গিয়া তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। গৌর উড়িষ্যা দেশের সীমা অতিক্রান্ত হইবার পরে, বঙ্গদেশীয় এক যবন-রাজা তাঁহার অলৌকিক ভক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার নিকট হরিনাম প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলেন। যবনরাজ পিছলদা পর্য্যন্ত গৌরের সহিত গমন করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া আসিলেন। গৌর অবশেষে পাণিহাটী গ্রামে উপস্থিত হইয়া রাঘব পণ্ডিতের গৃহে একদিন অবস্থান করিলেন। তথা হইতে কুমারহট্টে শ্রীনিবাসের গৃহ হইয়া শিবানন্দ সেনের গৃহে ও তৎপরে বাসুদেবের গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর সার্ব্বভৌম-ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে উপস্থিত হইয়া পথশ্রান্তি অপনোদন করিলেন। তাঁহার আগমনসংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। দলে দলে লোক তাঁহার দর্শনাভিলাষে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। গৌর গৃহমধ্যে ছিলেন। সকলে তাঁহাকে দেখাইবার জন্য বিদ্যাবাচস্পতির চরণ ধরিয়া কাকুতি করিতে লাগিল। গৌর বাহিরে আসিলেন—তখন তাঁহার দুই নয়নে অবিরল জলধারা, মুখে হরিধ্বনি, দুই হস্ত উত্তোলিত। ভক্তগণ সে মূর্ত্তি দেখিয়া পাগল হইল। সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, এবং লক্ষ কণ্ঠ হইতে "পাপিষ্ঠ আমাকে উদ্ধার কর" যুগপৎ এই প্রার্থনা সমুখিত হইল;

"শ্রীকৃষ্ণে মতি হউক" বলিয়া গৌর সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোক আসিতে লাগিল এবং গৌরকে দেখিবার জন্য উন্মত্তের মত ব্যবহার করিতে লাগিল। অবশেষে এই জনতার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে গৌর এক রাত্রিতে পলায়ন করিয়া কুলিয়া গ্রামে গমন করিলেন। পরদিন অগণিত লোক আসিয়া যখন শুনিল গৌর পলায়ন করিয়াছেন—তখন প্রথমে তাহারা সে কথা বিশ্বাস করিল না; অবশেষে সকলে বিদ্যাবাচস্পতিকে তিরস্কার করিতে লাগিল। বাচস্পতি লোকমুখে শুনিয়াছিলেন যে গৌর কুলিয়া গমন করিয়াছিল। তিনি সেই কথা বলিয়া সকলের সমভিব্যাহারে কুলিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌর কুলিয়ায় মাধবদাসের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, সকলে তথায় তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। কুলিয়ায় কয়েক দিন অবস্থানপূর্ব্বক গৌর বহুলোককে হরিনাম দান করিলেন। এইখানে দেবানন্দ পণ্ডিত আসিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন এবং পূর্ব্ব অপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিলেন। গৌর তাঁহাকে ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ দিয়া ভাগবত অধ্যাপনা করিবার আদেশ করত বিদায় দিলেন।

কুলিয়া হইতে গৌর শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গমন করিলেন। পুত্রবিধুরা শচীদেবী আসিয়া তথায় পুত্রমুখ দর্শন করিলেন। শান্তিপুর হইতে বৃন্দাবন উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া কতিপয় দিবসান্তে গৌর গৌড়নগরের সন্নিহিত রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়া অসংখ্য নরনারী তাঁহার দর্শনাশায় তথায় উপনীত হইল।

হোসেন সাহ তখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। গৌরের রামকেলি আগমন বাদশাহের কর্ণগত হইল। বাদশাহ তাঁহার হিন্দু অমাত্যদিগকে গৌরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হিন্দুসভাসদ্‌গণ প্রশ্ন শুনিয়া শঙ্কিত হইলেন। হিন্দু-বিদ্বেষী যবনরাজ পাছে সন্ন্যাসীর কোনও অনিষ্ট সংকল্প করেন এই ভয়ে তাঁহারা কহিলেন, "কোথাকার এক ভিখারী সন্ন্যাসী তীর্থে চলিয়াছে, তাহার সহিত দুই চারি জন লোক আসিয়াছে। বাদশাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে এমন গুণ তাহার নাই।" কিন্তু গৌরের কথা শ্রবণ করিয়া বাদশাহের মনে তৎপ্রতি ভক্তির উদয় হইয়াছিল। তিনি কাজী ও কোটালগণের উপর আদেশ প্রচার করিলেন—যেন তাঁহার প্রতি কোনও রূপ অত্যাচার অনুষ্ঠিত না হয়। এই হোসেন শাহই উড়িষ্যায় বাসুদেবমূর্ত্তি ভগ্ন ও মন্দির বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন।

বাদশাহের ব্যবহারে হিন্দুসভাসদ্‌গণ প্রীত হইলেন, কিন্তু অস্থিরমতি রাজা কখন স্বীয় আদেশের প্রত্যাহার করে, এই ভয়ে তাঁহারা গৌরের নিকট লোক প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে ত্বরায় রামকেলি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। গৌর তাঁহাদের উপদেশ অবহেলা করিয়া তথায় কয়েক দিন অবস্থান করিলেন।

বাদশাহের হিন্দুপারিষদ্‌গণের মধ্যে রূপ ও সাকর মল্লিক নামক দুই সহোদর ছিলেন। সাকর মল্লিক দবীর-খাস পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা বহু পূর্ব্বেই গৌরের নবদ্বীপলীলা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সাকর কয়েক বার কয়েকখানা চিঠিও গৌরকে

লিখিয়াছিলেন। গৌরের রামকেলি অবস্থান-কালে একদিন দুই ভ্রাতায় আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন, এবং নানা প্রকার দৈন্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিলেন। সাকর নানাবিধ স্তব করিয়া কহিলেন—

ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসেবী করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম
গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম।
মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বাঁধিয়া,
কুবিষয় বিষ্ঠাগর্ভে দিয়াছে ফেলিয়া।
আমা উদ্ধারিতে যদি দেখাও নিজ বল,
পতিতপাবন নাম তবে সে সকল।

তখন—

শুনি মহাপ্রভু কহেন, শুন দবীরখাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥
আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপ সনাতন।
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥
দৈন্যপত্রী লিখি মোরে পাঠাইলে বারবার।
সেই পত্র দ্বারা জানি তোমার ব্যবহার॥
তোমার হৃদয় আমি জানি পত্রীদ্বারে।
তোমা শিখাইতে শ্লোক কহি বারে বারে॥
পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥

পরপুরুষে আসক্ত নারী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও মনে মনে জারসঙ্গ-জনিত সুখেরই আস্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকে।

অনন্তর গৌর কহিলেন "আমি তোমাদিগকে দেখিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি—নহিলে গৌড়ে আমার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তোমরা বহু জন্ম যাবৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছ, শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই তোমাদিগের উদ্ধার সাধন করিবেন; এখন গৃহে গমন কর।" গৌর উভয়ের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর উভয়কে আলিঙ্গন দান করত ভক্তগণকে কহিলেন "তোমরা ইহাদিগকে অনুগ্রহ কর।" রূপ ও সনাতন তখন সকল ভক্তের চরণধূলি গ্রহণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়কালে সনাতন বিনীত ভাবে কহিলেন "প্রভু! গৌড়াধিপতি যবন, যদিও বর্ত্তমানে সে তোমার প্রতি ভক্তিমান্ আছে, তথাপি তাহার মনের ভাব যে পরিবর্ত্তিত হইবে না তাহার নিশ্চয় নাই। আর তীর্থযাত্রায় এত লোকসংঘট্টও ভাল নহে। যদিও তোমার নিজের ভয়ের কোনই কারণ নাই, তথাপি লৌকিক লীলা লৌকিক ভাবেই হয়। তাই নিবেদন করিতেছি—এরূপভাবে বৃন্দাবনে না গিয়া, এখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কর।"

পরদিন রামকেলি ত্যাগ করিয়া গৌর কানাইর নাটশালা গ্রামে গমন করিলেন। তথায় সনাতনের উপদেশ মনে মনে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন "এত লোকজন সহ বৃন্দাবন যাওয়া বাস্তবিকই বিধেয় নহে।" এই ভাবিয়া গৌর বৃন্দাবনগমনের ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন এবং সত্বরই শান্তিপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

শান্তিপুরে গৌর দশদিন অবস্থান করিলেন। এখানে সপ্তগ্রামের গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস আসিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন। গোবর্দ্ধন মহা ধনী। তিনিও তাঁহার ভ্রাতা হিরণ্য সৎকুলসম্ভূত, সদাচারপরায়ণ ও পরমধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। নদীয়ায় এমন কোনও ব্রাহ্মণ ছিলেন না যিনি হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের বৃত্তি ভোগ করিতেন না। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও জগন্নাথ মিশ্রকে উভয়

ভ্রাতা বিশেষ ভক্তি করিতেন। রঘুনাথ গোবর্দ্ধনের পুত্র। শৈশব হইতেই রঘুনাথ সংসারে উদাসীন ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণান্তে গৌর প্রথম যখন শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, রঘুনাথ তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তখন গৌর তাঁহাকে নানারূপ বুঝাইয়া গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গৃহে আসিয়া রঘুনাথ পাগলের মত হইলেন। গৃহ তাঁহার নিকট কারাগারের মত বোধ হইতে লাগিল। তিনি এই কারাগার হইতে উদ্ধার লাভের জন্য কয়েকবার পলায়ন করিলেন—কিন্তু কয়েকবারই পিতৃ-প্রেরিত লোক কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। অবশেষে গৌর শান্তিপুরে আগমন করিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া রঘুনাথ পিতার নিকট তদ্দর্শনে গমন করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং অনেক অনুনয়ের পর অনুমতি লাভ করিলেন। শান্তিপুরে আগমন করিয়া রঘুনাথ গৌরের নিকট নীলাচলে বাসের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং পিতার শৃঙ্খল ছেদন করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু গৌর তাঁহার সংসারত্যাগের সংকল্পের অনুমোদন করিলেন না; তিনি কহিলেন—

স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোকে ভবসিন্ধু কূল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর, লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহে লোক ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥

রঘুনাথের সংসারে প্রত্যাগমন করিবার নিতান্ত অনিচ্ছা লক্ষ্য করিয়া গৌর অবশেষে কহিলেন "এখন গৃহে যাও, আমি যখন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া যাইব, তখন তথায় গিয়া আমার সহিত মিলিত হইও।" রঘুনাথ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন এবং প্রভুর আদেশে পূর্ব্ব চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

গৌর বন্ধুবান্ধবগণের নিকট বিদায় লইয়া নীলাচলে প্রত্যাগত হইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

উৎপলা

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্মোৎসবে

গঙ্গা ও হিরণ্যবতীর সঙ্গমস্থলে বিশাল পাটলীপুত্র নগর। উপকণ্ঠভাগ পরিত্যাগ করিলেও দীর্ঘে বিংশতি এবং প্রস্থে পঞ্চ যোজন বিস্তৃত এই মহানগরের চারিদিকে চারিশত হস্ত পরিসর, বিংশতি হস্ত গভীর, জলপরিপূর্ণ পরিখা। পরিখার প্রান্তে প্রান্তে সমস্ত নগরবেষ্টিত ইষ্টক, প্রস্তর এবং বিশাল কাষ্ঠদণ্ডনির্ম্মিত দৃঢ়গঠিত প্রাচীর। প্রাচীর ভেদ করিয়া নগরপ্রবেশের চতুঃষষ্টি দ্বার। প্রাচীর-

শিরে পরস্পর সমদূর ব্যবধানে নির্ম্মিত সু-উচ্চ শত শত প্রহরিকক্ষ। প্রতিকক্ষে পর্য্যায়-ক্রমে নিত্যজাগ্রত বর্ম্মধারী ধনুর্ধর প্রহরী। প্রহরীর তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া লোকের নগরপ্রবেশ অথবা নগর হইতে বহির্গমন অসম্ভব।

আজ রাজাধিরাজ অশোকদেবের জন্মদিন। নগরে মহা উৎসবঘটা। প্রতি প্রহরিকক্ষশিরে পতাকা। নগরপ্রবেশের প্রতিদ্বারের উভয় পার্শ্বে পূর্ণকুম্ভ, তাহাতে আম্র, অশোক অথবা অশ্বত্থপল্লব। ফুলমালা পত্রপল্লবে দ্বারের অপূর্ব্ব শোভা। প্রতি প্রহরিকক্ষে, প্রতি দ্বারপার্শ্বে বাদিত্র। মৃদঙ্গ, ভেরি, পটহ, খরতাল, ঝর্ঝর, মর্দ্দলের উচ্চরবে সমস্ত নগর কোলাহলময়।

সমস্ত নগর সজ্জিত। প্রতিগৃহচূড়ে চীনাংশুক-পতাকা, গৃহদ্বারে ফুলপাতার মালা, মঙ্গলঘট। সমস্ত পথে লোকের সমাবেশ। ধৌত উদ্গমনীয়, ক্ষৌম, কৌশেয় নানাবর্ণের বস্ত্রপরিহিত উদ্‌গ্রীব উল্লসিত লোকসঙ্ঘ রাজপুরী অভিমুখে চলিয়াছে।

রাজপুরীর সম্মুখে অতি প্রশস্ত বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তাহাতে অসংখ্য দর্শকের সমাবেশ। প্রাঙ্গণের প্রান্তে নানা ভাগে বিভক্ত রঙ্গভূমি। ভীমকায় মল্ল, যষ্টিক, খড়্গাধারী, কুঠারী, মুদ্গারী, প্রাসিক যোদ্ধারা অমানুষিক বল, অপূর্ব্ব ক্ষিপ্রকৌশল দেখাইয়া সহস্র সহস্র লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। ষণ্ডে ষণ্ডে, গণ্ডারে গণ্ডারে, মহিষে মহিষে, গজে গজে, মেষে মেষে ভয়ানক যুদ্ধ। মল্লগণের আস্ফালন, হুহুঙ্কার, বাহুর আস্ফোটন, দর্শক-বৃন্দের উৎসাহধ্বনি অথবা টিটকারী, বিজয়ী দ্বন্দীর বন্ধুবান্ধবের উল্লাস-কোলাহল, বিজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর শুভাকাঙ্ক্ষিগণের আপত্তি ও প্রতিবাদ; যুযুৎসু পশুগণের উচ্চ গর্জ্জন, ভয়াবহ সংঘর্ষ; পলায়মান পশুর বিকট আর্ত্তনাদ, বিজয়ীর হুহুকার শব্দে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত; ধরাতল কম্পিত।

অঙ্গনের স্থানে স্থানে সুবৃহৎ সুশোভন পট্টাবাস। তাহাতে নট-নটী, গায়ক-গায়িকা, বৈণিক, বৈণবিক, মৌরজিকগণ নৃত্যগীতবাদ্য-কৌশলে শত শত শ্রোতা দর্শকের চিত্ত উৎফুল্ল করিতেছে। স্থানে স্থানে বিচিত্রবেশ ভণ্ডের কৌতুক অথবা বাক্‌চাতুর্য্যে শ্রোতার অট্টহাস্য, করতালি; কোন স্থানে মায়াবী ঐন্দ্রজালিকের অদ্ভুত কর্ম্মে মুগ্ধ দর্শকের স্তম্ভিতদৃষ্টি। শত সহস্র নাগরিক, গ্রামিক —আবালবৃদ্ধ—আজিকার মহোৎসবঘটায় উন্মত্ত, উল্লসিত।

যাগ, যজ্ঞ, পূজা, বলি, হোম, বেদপাঠ, অভিষেক-ক্রিয়া শেষ হইয়াছে। রাজাধিরাজ স্বর্ণরৌপ্য, মণিরত্নে তুলিত হইয়াছেন। তুলিত স্বর্ণ-রৌপ্য-মণিরত্ন—সহস্র সহস্র মুদ্রা, রাশি রাশি বস্ত্র বিতরিত হইয়াছে। রাজাধিরাজের মঙ্গলকামনায় অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা, হোতা, ঋত্বিক্, স্নাতক, শ্রোত্রিয়, সাগ্নিক, ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক, সদস্য, পুরোহিত, দৈবজ্ঞ, ভট্ট, ভিক্ষু, অন্ধ, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বৃদ্ধ, দুঃস্থ, দরিদ্রের জয়োচ্চারণ-শব্দে সমস্ত ভূভাগ কোলাহলময় হইয়া উঠিয়াছে।

অঙ্গনের মধ্যভাগে রাজসভা। ইষ্টক প্রস্তর কাষ্ঠ নির্ম্মিত অতি বৃহৎ সভাগৃহের স্বর্ণমণ্ডিত উচ্চ চূড়া হইতে বিশাল রাজপতাকা বায়ুস্রোতে তরঙ্গায়িত হইতেছে। চারিদিকে

সভাগৃহ প্রবেশের চারি-দ্বার, ফুল-মালা লতা-পল্লব মঙ্গলকুম্ভে সুসজ্জিত। দ্বারমুখে বীণা-বংশী, মুরজ-মন্দিরা সংযোগে অনতি উচ্চ মধুর গম্ভীর বাদ্যধ্বনি। গৃহমধ্যে স্বর্ণবিমণ্ডিত সারি সারি উচ্চ স্তম্ভশিরে কৌশেয় চন্দ্রাতপ। তাহাতে স্বর্ণসূত্রগ্রথিত মণিরত্নখচিত লতা পত্র পুষ্প-পল্লবের ছবি। প্রতিস্তম্ভগাত্রে নিপুণ শিল্পী-নির্ম্মিত স্বর্ণলতা, তাহাতে স্তবকে স্তবকে মণিমুক্তা-রত্নের ফল, আর সেই ফল ভক্ষণ-প্রয়াসী রজতপক্ষ, স্বর্ণচঞ্চু, রত্নচক্ষু বিহঙ্গ। স্থানে স্থানে ত্রিপদীর উপর রক্ষিত কৃত্রিম যুঁই জাতি কুন্দ মালতীর গাছ, কোনটীতে রৌপ্য পল্লব, সোণার ফুল; কোনটীতে স্বর্ণপল্লব, রূপার ফুল। স্তম্ভ হইতে স্তম্ভ পর্য্যন্ত, কীলক হইতে কীলক পর্য্যন্ত শ্লথবিলম্বিত ফুলের মালা। চন্দ্রাতপ হইতে স্বর্ণশৃঙ্খলে বিলম্বিত কত স্বর্ণ-প্রদীপ পাত্র, সন্ধ্যাসমাগমে তাহাতে গন্ধতৈল-বর্ত্তি জ্বালিত হইয়া সেই বিশাল গৃহ আলোকিত করিবে।

সভাগৃহের মধ্যভাগে স্বর্ণবিমণ্ডিত উচ্চ সিংহাসন। সিংহাসনে আসীন মণিরত্নখচিত মুকুট এবং মহার্ঘপরিচ্ছদ-পরিহিত রাজাধিরাজ মৌর্য্যকুলচূড়া অশোক দেব। কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তাহার, ললাটে হরিচন্দন-লেপ। মহারাজ অশোক কমনীয় কান্তিমান সুন্দর পুরুষ ছিলেন না; কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-সূচক তাঁহার তেজোময় আরক্ত আয়ত চক্ষু, দৃঢ়গঠিত বলশালী বিশাল বাহু, আর সেই উচ্চ সিংহাসনে তাঁহার স্থিরস্বচ্ছন্দ উপবেশনচ্ছন্দ রাজপ্রতিভা সূচিত করিতেছিল, জনমণ্ডলীর ভয় বিস্ময় ও অতর্কিত পূজা আকর্ষণ করিতেছিল।

মস্তকে সেবকধৃত মণিমুক্তাখচিত দীপ্তিমান রাজছত্র। রাজাধিরাজের পশ্চাতে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে দণ্ডায়মান চামরদণ্ডব্যজনধারিগণ, তাম্বূল করঙ্ক গন্ধমাল্যধারিগণ, মর্দ্দনদণ্ডহস্ত সংবাহক, আর অসি-ভল্লকুঠারধারী পার্শ্বরক্ষী-বর্গ।

সিংহাসন হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সম্মুখে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে যথোপযুক্ত বিচিত্র মূল্যবান্ আসনে আসীন মিত্র ও করদ রাজগণ, রাজন্যক, রাজ-প্রতিনিধি, ধর্ম্মপাত্র, মহাপাত্র, সামন্ত, মহা-সামন্ত, দণ্ডনায়ক, সচিব, সেনানী প্রভৃতি সভা-সদ্‌গণ; সুদূর সাগরান্তর হইতে মিশর, সিরিয়া, ইপিরাস, মাসিডোনিয়ার শ্মশ্রুমান্ বিশাল-দেহ রাজপ্রতিনিধিগণ; চেল, পাণ্ড্য, কেরল হইতে স্বাধীন ভারতীয় নৃপতিগণের প্রতিনিধি; তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, সুবর্ণগিরি প্রভৃতি প্রদেশের শাসনকর্ত্তাগণ; কাশী, কোশল, চেদী, অঙ্গ, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, গান্ধার, কাম্বোজ, বাহ্লিক প্রভৃতি দেশের রাজা রাজ-প্রতিনিধিগণ; বৃজি, মল্ল, লিচ্ছবিগণের প্রতি-নিধি। ভট্ট, বন্দী আপ্ত, চর, দৈবজ্ঞ, দূত, লেখক, প্রতিবেদক, শ্রেষ্ঠী, সাংযাত্রিক প্রভৃতিরা পদভেদে আসীন অথবা দণ্ডায়মান। একপার্শ্বে গুরু-পুরোহিত, স্নাতক-অধ্যাপক, যতী-ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ; অপর পার্শ্বে উচ্চমঞ্চে যবনিকার অন্তরালে শুদ্ধান্তঃবাসিনী মহিলাগণের সমাবেশ; মঞ্চের নিম্নভাগে অসি-ভল্লধারিণী প্রহরিণীগণ।

রাজাধিরাজের জন্মদিন-মহোৎসবে কোন রাজা, রাজ-প্রতিনিধি অথবা সভাসদ্ শূন্য-হস্তে রাজদর্শনে আগমন করেন নাই। সিংহা-সনের সম্মুখে ধান্য দূর্ব্বা যব তিল ফল ফুল

প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য, তৎপর বহুবিধ বহুমূল্য রাজভেট, উপায়ন-সামগ্রী। মণিমুক্তা হীরক বৈদূর্য্য প্রবাল কাঞ্চন; ক্ষৌম কৌশেয় রাঙ্কব নানাবিধ বস্ত্র, অগুরু কুঙ্কুম কস্তুরী হরিচন্দন প্রভৃতি গন্ধ; হার বলয় কেয়ূর কুণ্ডল প্রভৃতি অলঙ্কার; মণিমুক্তারত্ন-খচিত কোষমুষ্টিযুক্ত দীপ্তিমান অসি, ছুরিকা; হস্তিদন্ত নির্ম্মিত, মর্ম্মর প্রস্তর-চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত দেশবিদেশ হইতে আগত বহুবিধ সুদৃশ্য মূল্যবান দ্রব্য। আর, হয় হস্তী, শকট শিবির প্রভৃতি সভাভঙ্গে রাজদর্শন জন্য সভাগৃহের বাহির চত্বরে রক্ষিত হইয়াছে।

মহাপাত্র উপস্থিত রাজা, রাজপ্রতিনিধি, রাজদূত, সম্ভ্রান্ত সভাসদ্‌গণকে ক্রমে রাজাধিরাজের নিকট পরিচিত করিয়াছেন, তাঁহাদের আনীত উপায়ন-সামগ্রী সকল রাজগোচর করিয়াছেন। অশোকদেব তাঁহাদের যথাযোগ্য অভিবাদন, আপ্যায়ন করিয়াছেন। সভাভঙ্গের আর অধিক বিলম্ব নাই।

এমন সময় প্রহরীপরিরক্ষিত একটী যুবক সেখানে আনীত হইল। তাহার দৃঢ়গঠিত বলিষ্ঠ শরীর, বিশাল বক্ষ, আয়ত উজ্জ্বল চক্ষু, বিস্তৃত উন্নত ললাট; কিন্তু পরিধানে অতি সামান্য গ্রাম্যবেশ। যুবক সিংহাসনের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া মস্তকে ভূমি স্পর্শ করিয়া রাজাধিরাজের সম্বর্দ্ধনা করিল।

রাজাধিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি নাম তোমার ?"

"দাসের নাম মাণিক্যদেব।"

"কোন্ দেশে বাড়ী ?"

"মহারাজ্য কলিঙ্গে।"

"কি প্রয়োজনে আমার রাজধানীতে আসিয়াছিলে ?"

যুবক ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল;—

"মহানগর পাটলীপুত্র দেখিবার সাধ কাহার না হয় ? রাজাধিরাজের রাজধানী দর্শন করিতে আসা যে অপরাধের কার্য্য, তাহা জানিতাম না।"

যুবকের পরুষ বাক্যে সভাসদ্‌গণ বিস্মিত হইলেন। রাজাধিরাজ মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন;—

"ছদ্মবেশে চোরের ন্যায় প্রবেশ, পররাজ্যের সৈন্যসংখ্যা-নিরূপণ-চেষ্টা, চিত্রে দুর্গসংস্থান অঙ্কন—সাধু অভিপ্রায়ের পরিচায়ক নহে।"

পাত্র অগ্রসর হইয়া রাজাধিরাজের হস্তে একখণ্ড চতুষ্কোণ স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিলেন। তাহাতে বিকীর্ণ রশ্মিজাল চিহ্নযুক্ত গোলাকার সূর্য্যমূর্ত্তি, নিম্নভাগে সপ্তত্রিশূল-চিহ্ন। রাজাধিরাজ সেই মুদ্রাঙ্কিত স্বর্ণখণ্ড দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"এখানি কি ?"

যুবক সসম্ভ্রমে মস্তক নমিত করিয়া সেই মুদ্রাঙ্কিত সূর্য্যধ্বজ স্বর্ণখণ্ডে নমস্কার জানাইয়া বলিল;—

"রাজাধিরাজের নিকট আমার পরিচয় বিদিত হইয়াছে; যে দণ্ডবিধান অভিপ্রায় হয়, আদেশ প্রচার হউক।"

"এখানি কি ?"

"রাজাধিরাজ ত্রিকলিঙ্গেশ্বরের গুপ্তচরের পরিচয় চিহ্ন।"

"সূর্য্য-মুদ্রাই তোমার প্রভুর রাজধ্বজ, সপ্তত্রিশূল-চিহ্ন কেন ?"

"আমার প্রভু যাহাকে আপ্তপদ প্রদান করেন, তাহার পরিচয়ের জন্য সূর্য্যমুদ্রার নিম্নে ত্রিশূল-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেন। এই ক্ষুদ্র অধম প্রভুর প্রধান চর, সেই জন্য এই সপ্তত্রিশূল-চিহ্ন।"

"তুমি ভিন্নদেশের গুপ্তচর, আমার রাজ্যের গুপ্তসংবাদ সংগ্রহে আসিয়া ধরা পড়িয়াছ; তোমার প্রাণদণ্ড কেন হইবে না?"

যুবক নির্ভীক চিত্তে উত্তর করিল;—

'গুপ্তচর রাজসেবক। রাজাধিরাজ সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর, পাটলীপুত্রের চর কোন রাজ্যে না যায়?"

রাজাধিরাজ বলিলেন;—

'যায় বটে, তাহাদেরও চিরদিন এরূপ বিপদ সম্ভব।"

"তাঁহারা সাহসী এবং প্রভুভক্ত, ভয় করেন না। এই ক্ষুদ্র অধমও আজ দৈবদুর্ব্বিপাকে বিপদে পড়িয়াছে। যে মুদ্রাঙ্কিত ধ্বজ দেখাইলে গঙ্গাসাগর সঙ্গম হইতে গোদাবরী-তীর পর্য্যন্ত ত্রিকলিঙ্গে এমন মানুষ নাই যে মস্তক নত না করে; যাহার সাহায্যে মুহূর্ত্ত মধ্যে এ দাস শত রক্ষী সাহায্যকারী সংগ্রহ করিতে পারিত; আজ তাহার কোন শক্তি নাই।—কিন্তু এ অধমও অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয় মনে করে। রাজাধিরাজের অখণ্ড রুদ্র প্রতাপ;—দণ্ডাদেশ প্রচার হউক!"

সেই মহাসভা-সমাসীন সকলের চিত্ত শিহরিয়া উঠিল। এই দৃঢ়চিত্ত নবীন যুবকের প্রতি নিশ্চয়ই শূলদণ্ডের আদেশ হইবে! কিন্তু রাজাধিরাজ বলিলেন;—'মহারাজ কলিঙ্গপতির শৌর্য্য-প্রতাপের কথা আমার অবিদিত নাই। তাঁহার বিশ্বাসী চরেরও যে অতুল সাহস, তাহাও প্রত্যক্ষ করিলাম। তোমার মৃত্যুভয় নাই। সংসারে মৃত্যুভীতের মৃত্যুসংঘটনে বিলম্ব হয় না। শুন, অশোকদেব প্রকৃত সাহসীর অশেষ অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন। তুমি সাহসী এবং বিশ্বাসী প্রভুভক্ত, তোমার অপরাধ ক্ষমা করা গেল।"

রাজাধিরাজের মহামহিমময় আদেশে সভাসমাসীন সমস্ত লোক চমৎকৃত হইল। যুবক পুনরায় ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া রাজাধিরাজের সম্বর্দ্ধনা করিল এবং উচ্চ গম্ভীর স্বরে বলিল;—

"রাজাধিরাজের জয় হউক!"

"তোমার প্রভু আমার সীমান্ত-প্রদেশে অহেতুক গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। আমার প্রজাগণ অত্যাচারিত হইতেছে, বণিক-ব্যবসায়ীর বহু ক্ষতি হইতেছে। আমার প্রেরিত দূত সমুচিত সম্বর্দ্ধিত হয় নাই। তিনি গুপ্তচর পাঠাইয়া আমার সৈন্য এবং দুর্গ-সন্নিবেশের তত্ত্ব করিতেছেন।—যুদ্ধ করাই কি তাঁহার অভিপ্রায়?"

যুবক যুক্তকরে নিবেদন করিল;—

"দাস ক্ষুদ্র সেবক, ত্রিকলিঙ্গেশ্বরের গুপ্ত অভিপ্রায় আমার জ্ঞাত থাকার কি সম্ভাবনা?"

"ভাল, অচিরেই তাহা জানা যাইবে। তুমি এখন পরিচিত, ছদ্মবেশে আর তোমার প্রয়োজন নাই। পাত্র তোমার বেশ, যান, বাহন, আহার, বাসস্থানের উপযুক্ত বিধান করিয়া দিবে। সপ্তাহ কাল আমার রাজধানীতে থাকিয়া যাহা যাহা দেখিবার ইচ্ছা হয়, দেখ। পরে আমার লোকেরা তোমাকে

তোমার প্রভুর রাজ্যসীমায় রাখিয়া আসিবে।”

যুবক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল; দুই বাহু ঊর্দ্ধ করিয়া, উচ্চ গম্ভীর স্বরে বলিল;—

“রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী অশোকদেবের জয় হউক!”

রাজাধিরাজ সভাভঙ্গের ইঙ্গিত করিলেন।

মাগধগণ স্তুতিগীত আরম্ভ করিল। বহির্দ্বার চত্বর রাজপ্রাসাদ—সমস্ত নগর মৃদঙ্গ ভেরি পটহ ঝর্ঝর মর্দ্দল বেণু বংশী রবে মুখরিত হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুখরার মূকত্ব

এক দিন অপারহ্নে মঞ্জুলা কুমুদ-নিবাসে উপস্থিত হইল। সঙ্গে পরিচারিকা চঞ্চলা ও চিত্রা, ভৃত্য বাহক এবং উপায়ন-গন্ধ-পুষ্প-মাল্যবাহী ভারিক। প্রমীতসেন এবং উৎপলা প্রস্তুত ছিলেন। শিবিকা অন্তঃপুর-দ্বারে পৌঁছিতেই মাধবী তাহার দ্বার খুলিয়া দিল। মঞ্জুলা শিবিকা হইতে বাহির হইয়া প্রমীতকে নমস্কার অভিবাদন করিল এবং সহজ অনুমানে গৃহকর্ত্রী উৎপলাকে চিনিতে পারিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। উৎপলা অতি আদরে হাতে ধরিয়া তুলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রমীত বলিলেন;—

“আজ আমাদের কত আনন্দ!”

মঞ্জুলা মুখ নত করিয়া হাসিমুখে পুনরায় প্রমীতকে অভিবাদন করিল।

“তোমরা উপরে যাইয়া বিশ্রাম কর।”

প্রমীত বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। উৎপলা মঞ্জুলাকে লইয়া দ্বিতলে নিজ কক্ষে গেলেন। সেখানে নিজের শয়ন-পর্য্যঙ্কের নিকট দ্বিতীয় পালঙ্কে কোমল শয্যায় নিজের পার্শ্বে মঞ্জুলাকে বসাইলেন।

উৎপলা বলিলেন;—

“আমার কত সৌভাগ্য, তুমি আমাদের গৃহে আসিয়াছ!”

মঞ্জুলা বলিল;—“আপনার গৃহে আসিয়া আপনাকে প্রণাম করিয়া আজ আমি কৃতার্থ হইলাম।”

রাজকোপ হইতে স্বামী যে মঞ্জুলার অনুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া উৎপলা কত কথা বলিলেন। মঞ্জুলা তৎসম্বন্ধে নিজের কৃতিত্ব অস্বীকার করিয়া সেই দুর্য্যোগময় রাত্রিকালে দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা এবং নিরাপদে নিজগৃহে পৌঁছার জন্য প্রমীতসেনের মহত্ত্ব এবং অনুগ্রহের কথা তুলিয়া কত কৃতজ্ঞতা জানাইল।

অনেক কথা হইল। শেষে উৎপলা বলিলেন;—“সে দিন কোথা হইতে আসিতে এই বৃষ্টিদুর্য্যোগের মধ্যে পড়িয়াছিলে?”

“পাটলীগ্রামে আমার এক আত্মীয়া আছেন. তাঁহার আমন্ত্রণে ভিক্ষুদেব উপগুপ্ত ঠাকুর সে দিন তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলেন। ভিক্ষুদেবের চরণ দর্শন জন্য আমি পাটলীগ্রামে গিয়াছিলাম। ফিরিতে সন্ধ্যা হয়, ঝড়-বৃষ্টির সময় দস্যু-হস্তে পড়িয়াছিলাম। বহু পুণ্যফলে সে সময় আমার উদ্ধার-কর্ত্তার সমাগম হইয়াছিল।”

“দেবতার অনুগ্রহে আমরাও সেদিন তোমার মত সুহৃদের নিকট পরিচিত হইয়া ভয়ঙ্কর রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি।”

মঞ্জুলা হাসিল, বলিল ;—

"তিনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন ."

"তুমি আমাদের প্রাণ-মান মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চিরদিনের জন্য আমাদিগকে কিনিয়া ফেলিয়াছ।"

"শ্রীচরণের দাসীকে ও কথা বলিবেন না।"

"তুমি আমার পরম সুহৃদ, প্রাণপ্রিয় ভগিনী!"

মঞ্জুলা পালঙ্ক হইতে নামিয়া উৎপলার পদে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম করিল। উৎপলাও নামিলেন এবং দুই হাতে মঞ্জুলাকে ধরিয়া তুলিয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

উৎপলা তখন হাতে ধরিয়া মঞ্জুলাকে লইয়া অন্তঃপুরস্থ গৃহকক্ষ পুকুর উদ্যান ইত্যাদি দেখাইতে লাগিলেন।

উৎপলার কক্ষগুলি সুন্দর ও সুসজ্জিত। মঞ্জুলা দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, কমলপুরে তাহার নিজের কক্ষগুলি কারুকার্য্যে অথবা মূল্যবান দ্রব্যসম্ভারে উৎপলার কক্ষগুলি অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু নির্ব্বাচন ও সন্নিবেশ-পারিপাট্যে, প্রিয়জনের প্রীতি এবং প্রয়োজন সম্পাদনে এই গৃহিণী গৃহের নিকট কমলপুরের সেই প্রয়োজনহীন মহার্ঘ সাজ-সজ্জাপূর্ণ অতি-অলঙ্কৃত কক্ষগুলি সজ্জিত বিপণী বা দ্রব্যভাণ্ডার মাত্র।

উৎপলার শয়নকক্ষে বিস্তৃত পালঙ্কে দুগ্ধশুভ্র আস্তরণযুক্ত প্রশস্ত শয্যা, তাহাতে যুগ্ম উপাধান। শয্যাপার্শ্বে অযত্নরক্ষিত সপ্ত-আবলী স্বর্ণমেখলা, তাহারই পার্শ্বে মনোহর স্বর্ণ-শৃঙ্খল। এক কোণে শুভ্র পাদুকা, মণিখচিত সিংহমুখ যষ্টি ; অন্য কোণে ত্রিপদীর উপর মুকুর, কঙ্কতি, গন্ধচূর্ণ, কবরীবন্ধন সূত্র, বিবিধ অঙ্গরাগ-সামগ্রী। কক্ষের এক পার্শ্বে মসৃণ কাষ্ঠদণ্ডের উপর রক্ষিত পুরুষ-পরিধেয় ধৌত কৌশেয় ধুতি, উত্তরীয় ; নিকটেই রমণী-পরিধান-যোগ্য সাটী, প্রাবৃত ওড়নি, কঞ্চুলিকা।

মঞ্জুলা বিস্মিতনেত্রে সাগ্রহচিত্তে দেখিতে লাগিল, কক্ষের সর্ব্বত্র এক নবীন ভাব, অদৃষ্টপূর্ব্ব এক কমনীয় চিত্র। শৌর্য্য-মাধুর্য্যের এরূপ মিলন, সুন্দর আর সুন্দরীর এরূপ সামঞ্জস্য, যুগ্মের এরূপ অবিচ্ছিন্ন একত্ব আর কোথায়ও তাহার চক্ষুগোচর হয় নাই। তাহার নিজগৃহে ত সে ভাবের লেশ মাত্র নাই। মহারাজ্ঞী কারুবকীর কক্ষ ত রাজকক্ষ, সেখানেও মঞ্জুলা এ ভাব লক্ষ্য করে নাই। অন্য গৃহস্থ লোকের ঘর সংসার মঞ্জুলা কমই দেখিয়াছে।

দেখিয়া দেখিয়া মঞ্জুলা মুগ্ধ হইল। তাহার জীবনে সে কখনো এ সৌন্দর্য্যের লীলা দেখে নাই, সুতরাং তাহার মহিমা কি অভাব কোন দিন অনুভব করে নাই। স্বাধীনার জীবন যে চির অভাবময়, আর পরাধীনা যে ঐশ্বর্য্য-শালিনী—এক যে কিছুই নয়, দু'য়ের একত্বই যে পূর্ণ জীবন, মঞ্জুলার মনে ত কোন দিন সে কথা উদয় হয় নাই। অন্যের ঐশ্বর্য্য দেখিয়াই লোকে নিজের অভাব বুঝিতে পারে, অনাসক্ত সংযমীর চিত্ত তাহাতে বিচলিত হয় না। কিন্তু সংসারে তেমন মহাত্যাগী সংযতবৃত্তি কয় জন? মঞ্জুলা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলদেশে

কি যেন এক অজ্ঞাতপ্রকৃতি ক্ষীণ অথচ মৃদু-উন্মাদক নবীন ভাব জাগিয়া উঠিল। মঞ্জুলার উৎফুল্ল মুখ ঈষৎ উন্মনা হইল।

চঞ্চলা বলিয়াছিল, উৎপলা পরমসুন্দরী। মঞ্জুলা দেখিল উৎপলার তুলভরূপ। উৎপলার দেহে বেশভূষা বা অলঙ্কারের কোন পারিপাট্য নাই, প্রায় সম্পূর্ণনিরাভরণা উৎপলার রূপ-বৈভব অতুল। সীমন্তশোভী একমাত্র সিন্দুর-বিন্দু যেন সেই অতুল রূপরাশি উদ্ভাসিত, অপূর্ব্ব লাবণ্যময় করিয়া তুলিয়াছে। তখন তাহার নিজদেহে মণিরত্ন-অলঙ্কারের ছটা তাহার নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর এবং দৈন্য-শর্য্যের পরিচায়ক মাত্র বোধ হইল। মঞ্জুলার চক্ষু লজ্জায় নত হইল।

অবশেষে উৎপলা মঞ্জুলাকে লইয়া আর এক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষমধ্যে প্রশস্ত বৃহৎ শয্যা, শয্যার উপর এবং প্রাচীরের গায়ে বিবিধ বাদ্যযন্ত্র—বেণু, বীণা, বংশী, মন্দিরা, মৃদঙ্গ। দেখিয়া মঞ্জুলার চক্ষু স্মিত বিভাসিত হইয়া উঠিল। মঞ্জুলা বলিল—

"আপনার গৃহে এত যন্ত্র, গীতবাদ্যে আপনার অভ্যাস নাই ?"

উৎপলা হাসিলেন, বলিলেন —

"আমার অভ্যাস! তোমার 'পরম সুহৃদ' কোন কোন দিন গান করিয়া থাকেন, এবং আমোদ করিয়া আমাকে শিখাইতে চাহেন।"

"তবে আপনিও গাহিতে পারেন ?"

"কিছু না।"

"অভ্যাস করিতেছেন ?"

"তুমিই আমার সে বিপদের মূল!"

"আমি !"

"এবার বসন্তোৎসব হইতে ফিরিয়া অবধি গীতের চর্চ্চা অধিক হইতেছে। আমাকে না শিখাইয়া ছাড়িবেন না! এই কাককণ্ঠ হইতে পঞ্চম বাহির হইবে!- সে কথা থাকুক, শুনিয়াছিলাম তুমি অপূর্ব্ব রূপবতী—"

মঞ্জুলা লজ্জায় মুখ নত করিল। উৎপলা অতি আদরে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"আজ স্বচক্ষে দেখিলাম, তোমার রূপের তুলনা নাই, চক্ষু সার্থক হইল। শুনিয়াছি, গীতবাদ্যেও তোমার অসীম ক্ষমতা—"

"আপনি কাহার নিকট এত অলীক কথা শুনিয়াছেন ?"

"অতি বিশ্বস্ত লোকের মুখেই শুনিয়াছি!' —সহাস্যে—"সেই দুর্য্যোগ দিনে সাক্ষাৎ হইতে তোমার অপূর্ব্ব রূপের, আর বসন্তো-সবের দিন হইতে তোমার গীতের কথা প্রতি দিন শুনি! অমন মিষ্ট স্বর, অমন সুন্দর গীত না কি তিনি আর কখনো শুনেন নাই।"

"আপনি আমার অতি-প্রশংসা শুনিয়া-ছেন আমি তাহার উপযুক্ত নই।"

"অতি প্রশংসা যে নয়, তোমার রূপ দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। তোমার গীত যে অতি মধুর হইবে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।—একটা গান শুনাইতেই হইবে।"

মঞ্জুলা মহা বিপদে পড়িল, তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। উৎপলার সঙ্গে আজই প্রথম দেখা। প্রথম দিনেই গীতবাদ্য, আমোদ প্রমোদ প্রকৃতি-প্রগল্‌ভা মঞ্জুলার নিকটও চঞ্চলতা বলিয়া বোধ হইল। দেশ-কাল পাত্র-ভেদে মুখরাও মূক হইয়া পড়ে। উৎপলা

বীণাটী তুলিয়া লইয়া মঞ্জুলার হাতে দিলেন। শেষে মঞ্জুলা বলিল ;—

"আজ ক্ষমা করিবেন, আমার মুখে আজ গীত আসিবে না। আরও ত কতদিন আসিব, আর একদিন শুনাইব।"

"তোমার মুখের গীত শুনিবার বড় সাধ ছিল। ভাল, শুধু একটুকু বাজাও!"

বাধ্য হইয়া মঞ্জুলা বীণা লইয়া তাহার তার চড়াইয়া নামাইয়া সুর বাঁধিতে লাগিল এবং দ্বারের দিকে বারবার চাহিতে লাগিল। বুঝিতে পারিয়া উৎপলা হাসিয়া বলিলেন ;—"কোন ভয় নাই এখানে কেহ আসিবে না।"

কম্পিত হস্তে মঞ্জুলা বীণাতে ঝঙ্কার দিয়া স্বর তুলিতে লাগিল। এমন সময় মাধবী আসিয়া জানাইল, প্রমীতসেন আসিতেছেন। প্রমীত কক্ষদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মঞ্জুলা তাড়াতাড়ি বীণা রাখিয়া দিয়া জড়সড় হইয়া একটুকু সরিয়া বসিল।

প্রমীত বলিলেন ;—"আমি বাধা দিলাম! আমি যাই।"

মঞ্জুলা বলিল,—"না, আপনি যাইবেন না। বেলা গিয়াছে, আপনি অনুমতি করুন, আমি এখন বিদায় হইব।"

"এখনি যাইবে ?"

"হাঁ, আপনি অনুমতি করুন, সন্ধ্যা হইয়া আসিল।"

উৎপলা বলিলেন ;—"তবে আজ আর হইল না। আর এক দিন আসিয়া গীত শুনাইবে ?"

মঞ্জুলা মৃদু মৃদু বলিল ;—"শুনাইব।"

প্রমীত বলিলেন ;—"আমার প্রার্থনা, সেদিন আমিও উপস্থিত থাকিব।"

মঞ্জুলার লজ্জা-বিজড়িত সুন্দর মুখ স্মিত-বিভাসিত হইয়া উঠিল। মঞ্জুলা প্রমীতসেনকে নমস্কার করিয়া উৎপলাকে প্রণাম করিল।

গন্ধপুষ্প-মাল্যভারে বরিতা মঞ্জুলা বিদায় হইয়া নিজ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

মঞ্জুলাকে বিদায় করিয়া দিয়া প্রমীত পুনরায় উৎপলার কক্ষে ফিরিলেন ; জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কেমন দেখিলে ?—মঞ্জুলা রূপসী নয় ?"

"অপূর্ব্ব রূপসী, অমন রূপবতী আমি আর দেখি নাই।"

"আমিও—" বলিতে বলিতে প্রমীত থামিয়া গেলেন।

"কি বলিতেছিলে ?"

"না,—আবার কবে তাহাকে আনাইবে ?"

"লজ্জায় মঞ্জুলা আজ গীত শুনাইতে পারে নাই—"

"শীঘ্রই আর একবার তাহাকে আনাইও ; দেখিবে, সে কেমন সুকণ্ঠ!"

"শীঘ্রই আনাইব।—একটা কথা, মঞ্জুলা বসন্তোৎসবে প্রকাশ্যে এত লোকের সম্মুখে গীত গাহিল, আর আজ এই নিরিবিলী অন্তঃপুরে আমার কাছে গাহিতে অত লজ্জা বোধ করিল ?"

"তোমার সঙ্গে এই প্রথম দেখা, ক্রমে লজ্জা যাইবে। মঞ্জুলা প্রায় তোমার সমবয়সী, অল্প দিনেই তোমাদের মনের মিল হইবে।"

"মঞ্জুলা আজও অবিবাহিতা কেন? অমন শিক্ষিতা, সুন্দরী, ধনশালিনীর বর জুটে না?"

"বর জুটে না!—অভাব কি! কতলোক ত তাহার বিবাহপ্রার্থী। বোধ হয়, মঞ্জুলার

মনোমত কেহ এতক জুটে নাই! দেবী কারুবকী স্বয়ং মঞ্জুলার আভভাবিকা; যে সৌভাগ্যবান মঞ্জুলাকে লাভ করিবে, সে ত রূপ গুণ ধন সম্পদ—আকাঙ্ক্ষার সমস্ত বস্তু একাধারে লাভ করিবে!"

স্মিতমুখে উৎপলা বলিলেন :—

"লোভ হয় কি?—দেখিও উপকৃতাই বা শেষে বাঞ্ছিতা হয়!"

প্রমীত হাসিয়া উঠিলেন; উৎপলার মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন;—"রূপ গুণ ধন সম্পদ কি কবচ ভেদ করিতে পারে!"

প্রমীত হাসিলেন; কিন্তু সে হাস যেন ফুল্ল হৃদয়ের স্বচ্ছন্দজাত ললিত হৃষ্ট হাসি নহে, কিছু যেন উদ্বেগজড়িত, সঙ্কুচিত হাসি! মুগ্ধা উৎপলা কিন্তু উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে স্বামীদত্ত ঋণ সত্ত পরিশোধ করিলেন। ক্রমশঃ

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

বেহার-চিত্র

রেলপথে

অপরাহ্ন হইয়া আসিয়াছে; জামালপুর হইতে গয়ার গাড়ী ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই। "পুরি—মিঠাই," "পান—বিড়ি—দেয়াসলাই," "ক্ষীরা—কাঁকড়ি—তরমুজা" —ফেরিওয়ালাদের বিচিত্র সুর ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে; গার্ডসাহেব হরিৎ নিশান হস্তে ধীরে ধীরে পাদচারণা করিতেছেন। এমন সময় একজন বিশালদেহ মাড়োয়ারি গলদ্‌ঘর্ম্মকলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে মধ্যশ্রেণীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একজন কুলি এক বিশাল মোট এবং বাক্স লইয়া উপস্থিত হইল।

শেঠজি মোট নামাইয়া লইয়া কুলিকে দিয়া 'বেঞ্চের' উপর আপনার শয্যা রচনা করাইয়া লইলেন, তাহার পর অত্যন্ত উদার ভাবে জটিল বস্ত্রগ্রন্থি উন্মোচন করিয়া তাহার হস্তে দুইটি পয়সা দিয়া বলিলেন, "লেও বক্‌সিস্।"

কুলী চীৎকার করিয়া উঠিল "ওপার হইতে এপারে মোট আনিবার সাধারণ মজুরিই এক আনা; তাহার উপর সে দুই জনের মোট —একাকী বহন করিয়া আনিয়াছে। তাহার এই মজুরি!"

উভয়ে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক লাগিয়া গেল। বহুতর্কের পরে শেঠজি হতাশ হইয়া বলিলেন যে এ সকল বড়ই "জুলুমের" কথা। একটা মোট বহিবার মজুরি এক আনা! এরূপ অবস্থায় ভদ্রলোকের পক্ষে অন্য কাজ না করিয়া মজুরি করাই ত ভাল! জটিলতর গ্রন্থি বহুকষ্টে উন্মোচন করিয়া শেঠজি কাতর ভাবে আর একটি পয়সা বাহির করিয়া বলিলেন "লেও ভাই মিন্‌সে তুম্ খুসী হোও।"

কুলি আর তর্ক করা বৃথা বুঝিয়া অনুচ্চস্বরে শেঠজির সম্বন্ধে নানা অযথা বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করিল।

কুলিকে বিদায় দিয়া শেঠজি চরণ হইতে পাদুকাযুগল উন্মোচন করিয়া উত্তরীয় সাহায্যে সযত্নে তাহাদের সংস্কারসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। পাদুকাযুগল একে বিলাতি, তাহাতে নূতন।

যথোচিত সংস্কারান্তে দ্বারের সম্মুখে সে দু'টিকে রক্ষা করিয়া শেঠজি সগর্ব্বে একবার সহযাত্রিগণের প্রতি অপাঙ্গে চাহিয়া লইলেন। একজন যাত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন "ইংরেজ লোগ্ বড়া বঢ়িয়া জুতি বানাতা হায়। লেকিন দামভি বহুত লেতা হায়। ইস্ জুতিকে দাম সাঢ়ে সাত রোপেয়া লিয়া।" মুগ্ধ সহযাত্রী বলিল "ওঃ সাঢ়ে সা—ত রোপেয়া!"

শেঠজি একটু গর্ব্বের হাসি হাসিয়া আপনার পরিপুষ্ট গুম্ফরাজিকে যত্নপূর্ব্বক সুবিন্যস্ত করিয়া লইলেন।

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল। ষ্টেশনের খালাসীরা গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এমন সময়ে কোট-প্যাণ্টপরিহিত এক বেহারবাসী দ্রুতবেগে দ্বার খুলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন।

শেঠজি "হাঁ হাঁ" করিয়া উঠিয়া বলিলেন "ইয়ে গাড্ডী মে জাগা নেহি হায়। দোস্রি গ্যাড্ডীমে যাও।" উত্তেজিত বেহারবাসী বলিল "চোপ্রও শালা, তুম্হারা বাপ্‌কি গাড়ী হায়?"

শেঠজি তাঁহার বিশাল উদর কম্পিত করিয়া বলিলেন "খবরদার মুহ্ সামাল্‌কে বাত বোলো।" এঞ্জিনের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। বেহারবাসী সবেগে দ্বার খুলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল; শেঠজি ধাক্কা মারিয়া তাহাকে বাহির করিতে চেষ্টা করিলেন। ফলে বেহারীর পায়ে লাগিয়া শেঠজির সযত্নরক্ষিত একপাটি জুতা লাইনের মধ্যে পড়িয়া গেল। শেঠজি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "গার্ড সাহেব! গার্ড সাহেব! হুজুর, ষ্টেশনমাষ্টার, পুলিস্ পুলিস্—হামারা জুতি গিরা দিয়া—!"

গার্ডসাহেব নিকটেই দাঁড়াইয়া ড্রাইভারকে হরিৎ পতাকা দেখাইতেছিলেন। শেঠজির মর্ম্মভেদী চীৎকার শুনিয়া সম্মুখে আসিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন "কেয়া হুয়া? কাহে হাল্লা করতা?" চীৎকার করিয়া শেঠজি বেহারবাসীর হাত ধরিয়া বলিলেন "হুজুর, ইয়ে বদ্‌মাস্‌নে হামারা সাঢ়ে সাত রোপেয়াকা জুতি গিরা দিয়া!" বিহারী বলিল "Sir, the fellow push me. I about to be thrown on the line! the rascal!"

গার্ড শেঠজিকে বলিলেন "কাহে ধাক্কা মারা শূয়ারকে বাচ্চা?" শেঠজি করজোড়ে বলিতে চেষ্টা করিলেন "হুজুর!"—সাহেব বলিল "চোপরও।" বলিয়াই বাঁশী বাজাইয়া দিল। শেঠজি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন।

শেঠজির মোটবাহী কুলিটী সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। শেঠজি করুণ অনুনয়ের স্বরে বলিলেন "এ ভাই, হামারা জুতিকো তো উঠাও। নগদ চার পয়সা বথসিস্ দেঙ্গে।" কুলি বিরক্তির স্বরে বলিল "ওঃ বড়া দেনে-বালা! গাড়ী খুল রহা হায়, চার পয়সেকা ওয়াস্তে আদ্‌মি জান দেগা!'

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। শেঠজি মুখ বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন "গাড়ী যানেকো বাদ জুতি উঠাকে রাখিও! হাম্ ঘুরকে আ'কে চার আনা বথসিস্ দেঙ্গে।" পার্শ্বের গাড়ীতে এক বাঙ্গালী যুবক বসিয়া ছিল। সে হাসিয়া বলিল

"শেঠজি, একপাটি জুতো নিয়ে আর কি করবে? ও পাটিটাও ফেলে দাও। যে পাবে সে পায়ে দিয়ে তোমায় আশীর্ব্বাদ করবে!" শেঠজি অবোধ্য ভাষায় তাহাকে গালি দিয়া "বাঙ্কের" উপর হতাশভাবে শয্যাগ্রহণ করিলেন।

শেঠজি শুইয়া পড়িলে বেহারী ভদ্রলোকটী মাথার টুপি খুলিয়া বেঞ্চের উপর রাখিলেন। "নেক্‌টাই"-শোভিত সাহেবী পোষাকের উপর তাঁহার দোদুল্যমান স্থূল শিখা ইউরোপীয় সভ্যতার উপর ভারতীয় ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। টুপি রাখিয়া আরামে বেঞ্চের উপর উপবেশন করিয়া বাবুসাহেব কহিলেন, "সাত রোপেয়াকে জুতি দেখ্‌লাতা। লছ্‌মি চৌধুরী সাতলাখ রোপেয়া পুছ্‌তা নেহি তো সাত রোপেয়া! এই কিউল ব্রিজমে হামারা দেড় লাখ রোপেয়া একরাত্‌মে ডুব গিয়া। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কহা 'আপ্‌কো বহুৎ রোপেয়া লোক্‌সান হো গেয়া। হাম্‌ Agentকো লিখ্‌কে আপ্‌কো কুছ্‌ রোপেয়া Advance দেলা দেঙ্গে।' হাম কহা, 'হামারা ওয়াস্তে কোই পরোয়া মত্‌ কিজিয়ে সাহেব। দো চার লাখ রোপেয়া কোন্‌ পুছ্‌তা হায়?' উস্‌রোজ সে সাহেব হামারা নাম রাখা 'King contractor!' সম্‌ঝিয়ে, হাবড়া সে দিল্লী তক যেতনা লাইন হায় সব হামারা এলাকা হায়। বিশ পঁচিশ লাখ রোপেয়া হামারা হামেশা লাইন পর পড়া রহতা হায়। Agentসে লে করকে ষ্টেশনমাষ্টার তক্‌ ভর লাইনমে এইসা কোই নেহি হায় যো লছমি চৌধুরীকে একৃঠো বাত উঠাবে। Company দশ বিশ হাজার লোক্‌সান করেগা সো কবুল। তব্‌ভি লছ্‌মি চৌধুরীকো বাত নেহি উঠাবেগা।" মুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল "ওঃ কেয়া খাতির!" সুযোগ পাইয়া একজন সহযাত্রী বাবু ঘমণ্ডিলাল বলিলেন "হামারা নোকরনে তো একঠো বড়া ভারি গল্‌তি (ভুল) কিয়া। উস্‌কো লানে দিয়া "ইন্‌টর"কে "টিকস্‌" উয়ো বেওকুফ্‌নে "থার্ড কিলাসকে টিকস্‌" লান দিয়া। ইস্‌মে কুছ্‌ হরজ (ক্ষতি) তো নেহি?"

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী চৌধুরী হাসিয়া বলিলেন "কোই পরোয়া নেহি। হামারা নাম লেকে আপ্‌ ফার্ষ্ট ক্লাস্‌ মে যাইয়ে তব্‌ ভি কোই কুছ্‌ নেহি কহে গা; ইণ্টর কোন পুছ্‌তা হায়।" ভক্তিগদ্‌গদ ঘমণ্ডিলাল চৌধুরীজিকে দীর্ঘ সেলাম করিলেন।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী ধারারায় আসিয়া পৌঁছিল, তিনজন মুসলমান আরোহী—"বদ্‌না" "গড়গড়া" "পানদান" "ওগল্‌দান" "খানা" প্রভৃতি লইয়া মহাসমারোহে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। হাজি সাহেব জিনিষপত্র গুছাইতে গুছাইতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন "তোবা, হামরা খানা কাঁহা!"

হায় হায়, কমবক্‌ত্‌ খানসামা হাজি সাহেবকে কি বিপদেই ফেলিয়াছে! উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত ভিন্ন হাজিসাহেবের অন্য কোন স্নেহ-পদার্থ আদৌ সহ্য হয় না! তাহার উপর অপরের রন্ধন হাজি সাহেবের মোটেই রুচিকর হয় না। সেইজন্য হাজিসাহেবের বিবি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় একটী মোরগ মারিয়া তাহাকে চালে ঝুলাইয়া রাখেন। পরদিন সেইটীকে ছাড়াইয়া কেবল একসের ঘৃতসহযোগে রন্ধন করেন। তাহাতে বিন্দুমাত্র জল পড়িবার যো নাই; কেবল কিছু মেওয়া,

জাফ্‌রান্, এলাচি, আর পেঁয়াজ। এই মোরগটী, একডজন "খাস্তা" পরেটা, কিছু উৎকৃষ্ট ফল, আধসের রাবড়ি আর আধসের উৎকৃষ্ট সির্‌নি (মিষ্টান্ন)—ইহাই হাজি সাহেবের রাত্রের নাশ্‌তা (জলযোগ)। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই সর্ব্বনাশ। "কমবখ্‌ত" এই আসল জিনিষটাই দিতে ভুল করিয়াছে! এখন সারা-রাত্রি উপবাস ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। লছ্‌মি চৌধুরী বলিলেন যে, কিউলে উৎকৃষ্ট ফলমূল যথেষ্ট পাওয়া যায়। সেখানকার "রাবড়ি" এবং "মালাই"ও উত্তম। সেইখানে, কিছু ফলমূল আর রাবড়ি খরিদ করিয়া লইলে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। "খয়ের" বলিয়া হাজিসাহেব মনকে প্রবোধ দিয়া তামাকু সাজিতে মনোনিবেশ করিলেন।

হাজি সাহেবের সহযাত্রী খাঁ সাহেব এতক্ষণ তাম্রকূট-ধূমাকর্ষণে ব্যাপৃত ছিলেন। এতক্ষণ পরে তিনি উদাসীন ভাবে হাজি সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,"চাকর বাকরদের উপর বিশ্বাস করিলেই বিপদ্। এই দেখুন না কেন, খারাপ তামাক আমার সহ্য হয় না বলিয়া ৫০ টাকা খরচ করিয়া লক্ষ্ণৌ হইতে একেবারে একমণ তামাক আনাইয়া রাখিয়াছি। তথাপি আসিবার সময় সে তামাক না দিয়া তাহাদের নিজেদের খাইবার "কড়ুয়া" তামাক একসের ইহার মধ্যে দিয়া দিয়াছে। এখন সমস্ত রাত্রিই "নেহাইৎ তক্‌লিফ্‌"। পথে ভাল তামাক পাইবার কোনই উপায় নাই।" দুঃখিতচিত্ত খাঁসাহেব মুদিতচক্ষে তাম্রকূটধূমাকর্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্ণৌএর মূল্যবান্ তামাকের অভাবে তাঁহার যে বিশেষ কষ্ট হইতেছে মুখ দেখিয়া এমন কোন লক্ষণ বুঝা গেল না।

পার্শ্বের গাড়ী হইতে সান্ধ্য বাতাস কম্পিত করিয়া মাঝে মাঝে সুর আসিতে লাগিল—

"পিছে চলত ভাই লছমন
আগে চলত রঘুবীর।"

গাড়ী কাজরা পৌঁছিবা মাত্র ১০।১২ জন স্ত্রী-পুরুষ, লাঠি, বস্তা, ঝুড়ি, কোদাল প্রভৃতি লইয়া কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইল। চৌধুরী সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিলেন; "ইয়ে গাড়ী নেহি। ইয়ে ডেঢ়া মাশুলকে গাড়ী হায়। আগে যাও।" কিন্তু তাহাদের অগ্রণী ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল "ও ডেঢ়া আর আঢ়াইয়া, আরে চলরে শুক্‌রা।" বলিতে বলিতে হুড়মুড় করিয়া সমস্ত দলবল কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

খাঁ সাহেবেরা "ওঃ! ওঃ!! আরে ই কেয়া, ই কেয়া" বলিয়া বিব্রত হইয়া উঠিলেন। চৌধুরী সাহেব গার্ড সাহেবের উদ্দেশে ধাবমান হইলেন। গার্ড আসিয়া বহুকষ্টে নিশানের দণ্ড প্রয়োগে তাহাদের গাড়ী হইতে নামাইয়া দিল।

হাজি সাহেবের যুবা সঙ্গীটী এখনো কোন কথা কহেন নাই। এক্ষণে তিনি চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। চৌধুরী সাহেব তাঁহার পরিচয় লইয়া জানিলেন যে মৌলভি মহম্মদ মির্জ্জা সাহেব একজন "আমীর" লোক। সেখপুরা অঞ্চলে যত সম্ভ্রান্ত মুসলমান-পরিবার আছেন, মৌলভি সাহেবের পরিবার তাঁহাদের মধ্যে বংশ-মর্য্যাদায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ইংরাজের সঙ্গে নবাব মিরকাশিমের যুদ্ধ বাধিলে, বলিতে গেলে একরকম তাঁহার "পরদাদার" (প্রপিতামহের) সাহায্যেই

ইংরাজের জয়লাভ হয়। মিরকাশিম তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার "পরদাদা" গবর্ণর সাহেবকে একবার "জবান" (কথা) দিয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া কিছুতেই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইতে স্বীকৃত হন নাই। কৃতজ্ঞ গবর্ণমেণ্ট কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ মৌলভি সাহেবের প্রপিতামহকে একখানি তিন হাজার টাকা মূল্যের তরবারি আর একলক্ষ টাকা আয়ের একটী "জাগীর" দান করেন।

তাঁহার পিতামহ এক ফকিরকে সেই জাগীর "ইনাম" দিয়া ফেলেন। তদবধি মৌলভি-পরিবারের কিছু অর্থকষ্ট ঘটিয়াছে।

চৌধুরী সাহেব বিস্মিত হইয়া বলিলেন "একলক্ষ টাকা আয়ের জাগীর একেবারে ফকিরকে দান করিয়া ফেলিলেন!"

ঈষৎ হাসিয়া মৌলভি কহিলেন যে "বাল্য কালে তাঁহার পিতার একবার কঠিন পীড়া হয়। কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, হায়দরাবাদ প্রভৃতি স্থানে যত প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন, সকলকে দেখাইয়াও কিছুতেই রোগের শান্তি হইল না। অবশেষে এক ফকির দৈবক্রমে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। ফকিরের চিকিৎসায় পিতা সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হন। রোগ-মুক্তির পর ফকির তাঁহার পিতামহের নিকটে "ইনাম" চাহিতে গেলে, তিনি তাঁহার লক্ষ টাকা আয়ের সমস্ত জমিদারী ফকিরকে লিখিয়া দেন! তাঁহার দুই চারিজন বন্ধু সে সময়ে তাঁহাকে বলিয়াছিল "একেবারে লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি! ইনামটা বড় বেশী হইয়া গেল!" কিন্তু পিতামহ হাসিয়া বলিয়াছিলেন "কুছ্ ভি নেহি। প্রাণের দাম লাখ টাকার অনেক বেশী! আমি ফকিরকে কিছুই দিতে পারিলাম না!"

শুনিয়া পুলকিত চিত্তে খাঁ সাহেব ও হাজি সাহেব চীৎকার করিয়া বলিলেন "ওঃ হোঃ হোঃ! উন্ হোনে বহুত ঠিক তজ্‌বিজ্ (বিচার) কিয়া, জান্ কি কিম্মত (মূল্য) হাজার লাখ!!"

পিতামহের গৌরব-কাহিনী স্মরণে উদ্বেলিত-হৃদয় মৌলভি সাহেব সহাস্যমুখে দুই খিলি পান নিজ বদন-বিবরে নিক্ষেপ করিয়া, "মোচে" একটু "ইত্তর" (আতর) লাগাইয়া গড়গড়ায় ঝুলাইবার জন্য পূর্ব্বসঞ্চিত পুষ্প-কলিকার সাহায্যে মাল্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

গাড়ী কিউলে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্লাটফর্ম্ম প্রতিধ্বনিত করিয়া "রাবড়ি-মালাই," "পুরী-মিঠাই," "পান-বিড়ি-দিয়াশালাই," "রোটি-কাবাব," "হিন্দু-চা," "কেলা-আম-কাঁকড়ি-নাশপাতি"—ইত্যাকার শব্দ নানা বিচিত্র সুরে সমুত্থিত হইতে লাগিল।

"নাশ্‌তা" (জলযোগ) বঞ্চিত হাজি সাহেব "কেলাবালা" "কেলাবালা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

কলাওয়ালা নিকটে আসিলে হাজি সাহেব বলিলেন "কুছ মেওয়া হায়?" কলাওয়ালা আপেল, নাশপাতি, আম্র, কদলী প্রভৃতি দেখাইল। কিন্তু তাহাদের মূল্যের কথা শুনিয়া হাজিজি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে একান্ত হতাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা কাঁকড়ি কেয়া ভাউ?" ফলওয়ালা বলিল "পয়সা পয়সা।" "তব্ তুম্-হারা সওদা বেচ্‌নেকে মতলব নাহি হায়!"—

বলিয়া হাজি সাহেব অন্যদিকে মুখ ফিরাইতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে একটী অতিক্ষুদ্র কাঁকড়ি তাঁহার নেত্রগোচর হইল। সেইটী উঠাইয়া হাজি সাহেব বলিলেন "আচ্ছা ইস্‌কো কেত্তা লেওগে ?" ফলওয়ালা বিরক্ত হইয়া বলিল "এক আধেলা। আব্‌ লেনা হোয় তো লিজিয়ে ; এত্তা দের মে হাম্‌ এক রোপেয়াকে সওদা বেচতেঁ।" "খয়ের"—বলিয়া হাজি সাহেব আধেলা দিয়া কাঁকড়ি গ্রহণ করিলেন এবং ধীরে ধীরে ছুরিকা সাহায্যে তাহাকে ছাড়াইতে ছাড়াইতে সহযাত্রিগণের প্রতি চাহিয়া বলিলেন "আরে ভাই আরা নাশ্‌তাই না করনা ? নাশ্‌তাকে লিয়ে এহি কাফি (যথেষ্ট) হায়।" একজন হিন্দু ভদ্রলোক বলিলেন "হিঁয়াকা মালাই ভি বহুত আচ্ছা হায়।" চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হাজিসাহেব কহিলেন "কুছ্‌ কামকা নেহি, বিল্‌কুল আটা মিলায়া হুয়া। সাদিমে কাম পড়নেসে হিঁয়াকে রাব্‌ড়ি মালাই হামেশে দু দশ মণ হামারা মকাম্‌মে যাতাই হায়!" অগত্যা নিরুপায় হাজিসাহেব কাঁকড়ি খাইয়াই এক বদ্‌না জলপান করিলেন। "মেওয়া" এবং "মোরগ মোসল্লম"-ভোজী হাজি সাহেবের ভীষণ ত্যাগস্বীকার দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল !

ইতিমধ্যে প্লাটফর্ম্মে এক মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল লক্ষপতি চৌধুরী সাহেবের সহিত টিকিট-কলেক্টারের মহা দ্বন্দ্ব বাধিয়া গিয়াছে ! টিকিট কলেক্টর বলিতেছিল "তুমি without ticket travel করিতেছ ; যদি তুমি এখনি টিকিটের মূল্য ও penalty না দাও তাহা হইলে আমি তোমাকে পুলিশে hand over করিয়া দিব।" চৌধুরী বলিতেছিলেন "I am a pass-holder. I forgot to bring my pass. Your Traffic Manager and Agent know me. I report against you." টিকিট-কলেক্টর বলিল "Do what you like. I won't let you go." চৌধুরী সাহেব হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ফল হইল না। রেলওয়ে পুলিশের জমাদার আসিয়া তাঁহার ভার গ্রহণ করিল।

বাবু ঘমণ্ডিলাল তাঁহার মুরব্বির এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কাণে পৈতা জড়াইয়া দ্রুতপদে লোটা হস্তে গাড়ীর পাইখানার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গোলমালে শেঠজির নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। চৌধুরীর দুরবস্থা দেখিয়া পাদুকা-শোক-বিহ্বল শেঠজির মুখে ক্ষীণ হাস্যরেখা দেখা দিল। শেঠজি হাসিয়া বলিলেন "শালা চোট্টা। টিকট্‌ খরিদ্‌ নে কো আওকাত (ক্ষমতা) নেহি, শালা বিশ লাখ্‌কে গপ্‌ উড়াতা থা ! হামারা সাড়ে সাত রোপেয়াকা জুতি নাশ্‌ কর দিয়া, শালা, বদমাস্‌ !"

কাঁকড়ি-ভোজন-পরিতৃপ্ত হাজিসাহেব ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন "দো চার রোপেয়াকে ওয়াস্তে ইজ্জত বরবাদ করনা বহুত খারাব হায়।"

এক পয়সার বরফ বদনার জলে ফেলিয়া দিয়া খাঁ সাহেব বলিলেন "সেরেফ্‌ এই ইজ্জত কে খেয়াল্‌সে মেরা ওয়ালিদ (পিতা) হামেশা গাড়ী reserve করকে travel করতেঁ থে।"

গাড়ী ছাড়ে-ছাড়ে এমন সময়ে দুইজন "বাভন" গল্প করিতে করিতে দ্রুতবেগে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। উভয়েরই পরিধানে জীর্ণ মলিন বস্ত্র ও মিরজাই, কেবল মস্তকে একটী শুভ্র টুপি।

উভয়ে কিছুক্ষণ উপবেশনের পর কোমর হইতে "খইনি" (দোক্তা) এবং চূণের ডিবা বাহির করিয়া "খইনি" প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। খইনি প্রস্তুত হইলে নিজ নিজ বদনে খইনি নিক্ষেপ করিয়া একজন অপরকে কহিল "রামসিং তোমার সে মোকদ্দমার কি হইল?" রামসিং কহিল "মোকদ্দমায় আমারি জিত হইয়াছে। কোন সাক্ষী সাবুদ ছিল না। শেষে একটা জাল তমসুক বাহির করিয়া মোকদ্দমাটা "দুরস্ত" করি। হাকিম তমসুক দেখিয়া আর কোন কথা শুনিল না।"

হরি সিং বলিল "তমসুক রেজিষ্টারি হইল কি করিয়া?"

রাম। আরে সেজন্য ভাবনা কি? আমার চাকরটা গিয়া বলিল "আমি ভিখন সিং, আমিই তমসুক লিখিয়া দিয়াছি।"

হরি। সনাক্ত করিল কে?

রাম। তুমিও যেমন, সনাক্তের আবার ভাবনা? এক টাকা খরচ করিলে কত মোক্তার খুসী হইয়া সনাক্ত করিয়া দেয়! আজকাল আমাদের কুটুম্বেরা উকীল হইয়াছে, এখন উকীলেরও ভাবনা নাই!

কিন্তু তোমার খুনী মোকদ্দমাটা খুব বাঁচাইয়াছ যাহোক, হরি সিং!

হরি। কি করি ভাই; কিছু খরচ হইয়া গেল। রাস্তায় "লাস্" বদ্‌লাইয়া দিলাম। কনষ্টেবলকে ঘুস দিয়া ওদের "মুর্দ্দার" (মরার) বদলে আমার চাচার লাস চালাইয়া দিলাম। সমস্ত মোকদ্দমা ফাঁসিয়া গেল।

রাম। অঁ্যা! তোমার চাচা কি মারা গিয়াছেন?

হরি সিং কণ্ঠস্বর খুব নীচু করিয়া বলিল "আর ও কথা কেন বল? চাচা বুড়ো হইয়া ত একরকম "বেকার"ই হইয়াছিলেন, একটা কাজে লাগিয়া গেলেন।"

রাম। হাঁ সে কথা যথার্থ, আগে "জায়-দাদ" (সম্পত্তি), পরে "জান"। "জান" দিতে পারি, কিন্তু এক "ধূল" জমি ছাড়িতে পারি না।

গাড়ী সেখপুরা আসিয়া পৌছিল। রামসিং ও হরি সিং গল্প করিতে করিতে নামিয়া গেল। তাহাদের পরিবর্ত্তে "মেহ্‌দি"-রঞ্জিত শ্মশ্রু এবং স্থূল যষ্টি লইয়া আর একজন মুসলমান তাড়াতাড়ি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া খাঁ সাহেব তাঁহার তাম্বুল-রঞ্জিত দন্তরাজি আমূল প্রকাশিত করিয়া কহিলেন "আঃ হা! হাকিম সাহেব! আইয়ে, আইয়ে।" হাকিম সাহেব আপনার জিনিস-পত্র গুছাইয়া খাঁ সাহেবের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। পরস্পর কুশলপ্রশ্নাদির পর খাঁ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "নবাব সাহেব—কি হাল্‌ত্ (অবস্থা) কেইসা?"

হাকিম সাহেব দুঃখের সহিত বলিলেন "কুচিকিৎসায় তিনি শেষটা মারা গেলেন! আমি রোগীকে প্রায় আরাম করিয়াই আনিয়া-ছিলাম. কেবল একটু শ্বাসের জোর আর "ছাতির ধড়্‌ধড়ি" ছিল। গয়া হইতে বাঙ্গালী ডাক্তার আসিয়াই সর্ব্বনাশ করিল! হাত ফুঁড়িয়া পিচকারি করিয়া কি দিল, আর দুই

ঘণ্টার মধ্যেই নবাবসাহেব "কব্জা" করিলেন! আসল কথা, ইংরাজিতে "প্লেগের" কোন ঔষধই নাই। ইহার প্রকৃত ঔষধ হইতেছে মিছ্‌রির সরবৎ আর আফিং। পর্য্যায়ক্রমে মিছরির সরবৎ আর আফিমের সরবৎ ২৪ ঘণ্টা দিতে পারিলে যেমনই রোগ হউক আরাম হইবেই। আমি এমনি করিয়া "হাজারো" রোগী আরাম করিয়াছি। খাঁ সাহেব সোচ্ছ্বাসে বলিলেন "আলবৎ। দাবাই তো ইউনানী। উহার কাছে অন্য চিকিৎসা কিছুই নয়।"

এই বিষয়ের আলোচনা শেষ হইতে না হইতে গাড়ী ওয়ার্‌সেলিগঞ্জে আসিয়া পৌঁছিল। খাঁ সাহেব সপরিবারে বাটী যাইতেছিলেন। এইখানে তাঁহার নামিবার কথা। খাঁ সাহেব "পাল্কী" "পাল্কী" বলিয়া ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাল্কীর কোন লক্ষণই দেখা গেল না। খাঁ সাহেব একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

"আবরু" রক্ষা করিয়া কিরূপে বিবিসাহেবাকে গাড়ী হইতে নামান যায়, ইহা বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিল।

তাড়াতাড়ি দুইজন কুলিকে ডাকিয়া খাঁ সাহেব যবনিকা রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার নিকট একখানির অধিক চাদর ছিল না। বিপন্ন খাঁ সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিলেন "চাদর" "চাদর"! সকলেই আগ্রহাতিশয়ে বলিয়া উঠিলেন "হাঁ হাঁ, জরুর, জরুর!" কিন্তু কাহারও নিকট "তোয়ালিয়া" ভিন্ন আর কিছুর সন্ধান পাওয়া গেল না!

এই সময়ে ক্ষুণ্ণচিত্ত শেঠজি একখানি স্থূল চাদরে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া ঘৃতের দর মণকরা কত করিয়া চড়াইয়া দিলে সাড়েসাত টাকা জুতার মূল্য উঠিয়া যাইতে পারে, মুদিত চক্ষে সম্ভবতঃ এই কঠিন সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত ছিলেন। এমন সময়ে গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িয়া গেল। নিরুপায় খাঁ সাহেব তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া সবেগে শেঠজির গাত্রবস্ত্রখানি টানিয়া লইয়া পত্নীর "আবরু" রক্ষার জন্য ধাবমান হইলেন। চৈতন্যপ্রাপ্ত শেঠজি সঙ্গে সঙ্গে লম্ফ দিয়া প্লাটফর্ম্মে পড়িলেন। খাঁ সাহেব ছুটিয়া গিয়া কুলির হস্তে চাদর দিয়া বলিলেন "জল্‌দি করো। চাদর পাক্‌ড়ো।" কিন্তু কুলি চাদর ধরিবার পূর্ব্বেই শেঠজি ব্যাঘ্রবিক্রমে খাঁ সাহেবের উপর পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন "শালা চোট্টা! চাদর লেকে ভাগ্‌তা?" শেঠজির বিশাল উদরের গুরুভারে খাঁ সাহেব মুহূর্ত্তে ধরাশায়ী হইলেন। বিপন্ন খাঁ সাহেব করুণস্বরে বলিলেন "আরে ছোড়ে ছোড়ে, গাড়ী খুলেগী।" শেঠজি গর্জ্জিয়া উঠিলেন? "কেয়া? ছোড়েগা শালা চোট্টা? তুমকো পুলিশমে দেউঙ্গা।" খাঁ সাহেব শেঠজির বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই শেঠজির "জগদ্দল" দেহ-ভার হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিলেন না।

হাজি সাহেব এবং হাকিম সাহেব উভয়েই গাড়ীর জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন "ওঃ ওঃ কেয়া বদ্‌বখ্‌ত!" কিন্তু কেহই সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন না। দেখিতে দেখিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। এতক্ষণে শেঠজির চৈতন্য হইল। তিনি খাঁ সাহেবকে ছাড়িয়া চাদর লইয়া দ্রুতবেগে চলিষ্ণু গাড়ীর

পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। কিন্তু গাড়ীতে উঠিবার চেষ্টা করিবামাত্র ষ্টেশন-মাষ্টার চীৎকার করিয়া উঠিলেন "হাঁ, হাঁ, খবরদার চল্‌তি গাড়ী মে মত্‌ চঢ়ো!" ষ্টেশনমাষ্টারের ইঙ্গিতে একজন কুলি শেঠজির কোমর ধরিয়া সজোরে ঝুলিয়া পড়িল। শেঠজি সশব্দে প্লাট-ফর্ম্মের উপর পড়িয়া গেলেন। খাঁ সাহেব বিশুদ্ধ পারস্য ভাষায় আপনার দুরদৃষ্ট, "কাহার" গণের নির্ব্বুদ্ধিতা, এবং শেঠজির "সয়তানি" সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে টেলিগ্রাম করিবার জন্য ক্ষুণ্ণমনে "তার ঘরে" প্রবেশ করিলেন।

হাকিম সাহেব ও হাজি সাহেব নিজ নিজ আসনে পুনরাসীন হইয়া উভয়েই দুঃখের সহিত বলিলেন যে গাড়ীতে ভদ্রমহিলার "আবরু" রক্ষা হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। মৌলভি মহম্মদ মির্জ্জা সাহেব কহিলেন "ইহার একমাত্র উপায় আছে। আমার "ওয়ালিদ্‌" (পিতা) বরাবর সেই প্রথা অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন এবং আমিও এ বিষয়ে সেই পন্থারই অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। আমাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকদের কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হইলে আমরা একখানি করিয়া খোলা কয়লার গাড়ী (coal truck) আনাইয়া লই। তাহারই উপর বেহারারা "ঘেরা টোপ" দেওয়া পাল্কী সমেত স্ত্রীলোকদের উঠাইয়া দেয়। যেখানে নামাইবার প্রয়োজন হয়, সেখানে পাল্কীসমেত নামাইয়া লয়। ইহাতে ২০০।১০০ খরচ হয় বটে, কিন্তু এরূপ না করিলে কিছুতেই ইজ্জত থাকে না।"

মির্জ্জা সাহেবের অদ্ভুত আবিষ্কার-কাহিনী শ্রবণে মুগ্ধ হাকিম ও হাজি সাহেব কহিলেন "বাহবা! ইয়ে আপ্‌নে বহুত্‌ হি উম্‌দা তরিকা (কৌশল) নিকালা। সাবাস!"

মির্জ্জা সাহেব বলিলেন আমাদের "খান্‌-দানে" (পরিবারে) ইজ্জতের খেয়ালটা বরা-বরই খুব বেশী। একবার আমার "চাচী" প্রসবকালে কিছুতেই প্রসব হইতে পারেন না। প্রতিবেশীরা সকলেই আসিয়া ধরিল একবার ডাক্তার সাহেবকে আনান হউক, নহিলে জীবন-সঙ্কট। কিন্তু আমার চাচা কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন "জান্‌সে ভি ইজ্জত বড়া; জান যায় সো কবুল, কিন্তু আমি "বে-ইজ্জতি" হইতে দিব না! চাচী মারা গেলেন, তথাপি চাচা নিজের ইজ্জত নষ্ট হইতে দিলেন না।

দীর্ঘশ্মশ্রু অঙ্গুলিসাহায্যে আলোড়িত করিয়া হাজি সাহেব বলিলেন "আলবৎ। ইজ্জতকে খেয়াল এইসাই হোনা চাহিয়ে।"

গাড়ী নওয়াদা পৌঁছিল। টেলিগ্রাম পাইয়া টিকিট কলেক্টর আসিয়া শেঠজির মোট এবং খাঁ সাহেবের রোদনরতা বিবি সাহেবাকে নামাইয়া লইল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

দুর্ভাগ্যের কাহিনী

—o—

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় স্তর

(১)

মণ্টফারমিল, ফ্রান্সের একটি গণ্ডগ্রাম। সহর হইতে অনেকটা দূর, তবে ডাকগাড়ীর পথে বলিয়া কতকটা সহর-ঘেঁসা; একটিমাত্র সরাই; যাত্রীরা সেইখানেই আসিয়া উঠিত। থেনেডিয়ার-পরিবার তাহার একমাত্র স্বত্বাধিকারী এবং একাধারে পাচক, ভৃত্য এবং পরিবেশক। অনর্থক ব্যয়বাহুল্য বলিয়া তাহারা পরিচারক বা পরিচারিকা রাখিত না; সরাইয়ের আয় হইতে কষ্টে-সৃষ্টে একরূপে তাহাদের কাটিত।

সে দিন প্রাতঃকালে, থেনেডিয়ারের স্ত্রী, সদর দরজার চৌকাঠের উপর বসিয়া, রাস্তার অপরপার্শ্বে ক্রীড়ারতা তাহার কন্যাদ্বয়ের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া, আপন মনে গুণ্ গুণ্ করিয়া গান ধরিয়াছিল। কন্যা দুইটিই শিশু,-একটির বয়স আড়াই, অপরটির বয়স দেড় বৎসর মাত্র; দু'জনে একটা ভাঙ্গা গাড়ীর শিকলের দোলনা করিয়া খুব দোল খাইতেছিল, আর মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছিল। সে নিষ্কলঙ্ক সরল মুখ দুইটি আনন্দে উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল; বাতাসে তাহাদের কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ উড়িয়া উড়িয়া মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছিল; পার্শ্বস্থ উদ্যান হইতে বেলিমল্লিকার গন্ধটুক্ যেন তাহাদের গাত্রসৌরভ লইয়াই ভাসিয়া আসিতেছিল। সতর্ক এবং স্নেহমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাদের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া জননী গাহিতেছিল—

এমন সময় পশ্চাদ্দিক্ হইতে মধুর কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল—"বেশ সুন্দর মেয়ে দুটি ত' আপনার!"

প্রশ্নকর্ত্রী এক যুবতী; তাহার কোলে শিশু কন্যা, দক্ষিণ হস্তে একটা ভারি ব্যাগ।

অপূর্ব্ব শ্রী সে শিশুকন্যার! বিধাতা যেন আপন ছাঁচে তাহার মুখখানি গড়িয়া, তুলিকা দিয়া তাহার আঁখিপক্ষ্ম এবং যুগ্ম ভ্রূ চিত্রিত করিয়াছিলেন। রাজকন্যার ন্যায় তাহার আভরণ ও বেশভূষা। জননীর স্নেহশীতল বক্ষে বালিকা ঘুমাইতেছিল। জননীর কিন্তু বেশভূষার কোন পারিপাট্য ছিল না; দীন-দরিদ্রার ন্যায় তাহার আকৃতি, অঙ্গুলিগুলি সূচিবিদ্ধ,—তাহাকে যে খাটিয়া খাইতে হয় তাহাতে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছিল। তথাপি লুকাইবার চেষ্টা সত্ত্বেও, তাহার মুক্তাধবল দন্তপাতি অশ্রুসজল চক্ষু, অযত্নরক্ষিত আজানুলম্বিত ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম, এবং মুখের সে বিষণ্ণ মাধুরীতে, তাহার অনুপম সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছিল। জননী ক্রোড়স্থ শিশুর

প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন,— সে দৃষ্টি কেমন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; স্তন্যদাননিরতা জননী ধাত্রীকে যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই তাহা বুঝিবেন।

কে সে জননী?—সে ফ্যান্‌টাইন।

এইখানে আমরা একটা পূর্ব্বকথা বলিব। কে এ ফ্যানটাইন?

ফ্যান্‌টাইন দরিদ্রা শ্রমজীবিকন্যা। যৌবনের প্রারম্ভে প্রতারকের কুহকে ভুলিয়া সে আজন্মের পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া আসে।—থলোমিয়ে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াই সরলাকে ভুলাইয়া আনে। কিন্তু, একদিন, দু' দিন, সপ্তাহ, মাস, করিয়া ক্রমে ক্রমে দুই বৎসর কাটিল, তবু থলোমিয়ে তাহার সে প্রতিজ্ঞা পালন করিল না। নানা ছলে, নানা কৌশলে সে সে কথা চাপা দিতে লাগিল। অবশেষে একদিন সহসা সে যখন অন্তর্দ্ধান করিল, তখন বালিকা সত্যই অকূল পাথারে পড়িল। হায়, সে যে থলোমিয়েকে তাহার সর্ব্বস্বই দিয়াছিল,—পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম বলিয়া সে ত কিছুরই বিচার করে নাই,—বিবাহিতা স্ত্রীর মতই সে যে আপনাকে উৎসর্গিতা করিয়াছিল। বালিকা চারিদিক্ শূন্য দেখিল,—সে তখন অন্তর্বত্নী!

তাহার নিজের অলঙ্কারাদি যাহা ছিল, একে একে বিক্রয় করিয়া সে কয়েক মাস চালাইল। তারপর, অনেক অনুসন্ধানে থলোমিয়ের ঠিকানা জানিয়া, একদিন এক সাধারণ মুহুরীকে দিয়া তাহাকে একখানি পত্র লিখিল—নিজে সে লেখাপড়া জানিত না। থলোমিয়ে তখন 'মথুরার রাজা'; 'ব্রজের কথা' আর তখন তার মনে থাকিবে কেন? তাই সে ফ্যানটাইনের পত্রের কোন উত্তর দিল না। ফ্যানটাইন তার পর উপর্য্যুপরি আরও দুইখানি পত্র লেখাইল,—তাহাতেও কোন ফল হইল না। তার নিজের প্রতি না থাকুক, তাঁর আপন সন্তান—নিষ্কলঙ্ক স্বর্গের ছবি তার প্রতিও তাঁর দয়া নাই?—অভাগিনীর শূন্য দেউলের ক্ষীণ দীপশিখা ক্রমশঃ নির্ব্বাণোন্মুখী হইতে লাগিল।—স্বেচ্ছায় সে ইহজীবনের সব সুখ নষ্ট করিয়াছে, ক্ষণিক সুখের মন্থনে যে হলাহল উঠিয়াছে আজীবন সে বিষ তাহাকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে বালিকা তাহা বুঝিল। তাহার পকৃতি অন্যরূপ হইলে তাহাতে কিছু আসিয়া যাইত না; যাহার সে অনুপম রূপসম্পত্তি, তাহার স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব কি? কিন্তু আমরা জানি তাহার প্রকৃতি অন্য ধাতুতে গঠিত ছিল; সংসারানভিজ্ঞা বালিকা একবার মাত্র পদস্খলিতা হইলেও, রমণীসুলভ সঙ্কোচ এবং পবিত্রতা হইতে ভ্রষ্টা হইবার সে প্রবৃত্তি তখনও তাহার হয় নাই।

ভালবাসা জীবনের ভ্রান্তি; হয় হউক, কিন্তু ফ্যানটাইনের সারল্যের ছবিখানি সে ভ্রান্তির সলিলের উপর ভাসিতেছিল—এ কথা আমরা শতবার বলিব। যে দেবতার চরণে সে তাহার যৌবনের প্রথম আবেগ, জীবনের প্রথম প্রণয়, অন্তরের প্রথম অর্ঘ্য উৎসর্গিত করিয়াছিল,—প্রতারিতা হইয়াও, কার্য্যে বা চিন্তায় তাঁহার প্রতি অবিশ্বাসিনী হইতে সে চাহে নাই; তাঁহার প্রসাদী ফুল অন্য কোন দেবতার চরণে অর্পণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই। প্রথম যৌবনে সর্ব্বপ্রথম যে মূর্ত্তিকে স্ত্রীলোকে একবার বরণ করিয়া লয়, যাহার

মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে সে একবার আত্মবিসর্জ্জন করে, সে দেবতার আসন তাহার হৃদয়ে চির প্রতিষ্ঠিতই থাকে; উপেক্ষায়, বিচ্ছেদে, ঘটনা-চক্রের ঘাতপ্রতিঘাতে, সে প্রথম যৌবনের স্বপ্ন, প্রথম প্রেমের স্মৃতি, দুঃখে মধুর আশায় উজ্জ্বল হইয়া, চিরদিন তাহার জীবনে এক অনুপম মাধুরী সৃজন করিয়া রাখে। 'দুঃখের বেশে আসিলে'ও চিরদিবসের সে রাজার জন্য চিরদিন তাহার হৃদয় উন্মুখী হইয়া থাকে।—ফ্যানটাইন তখনও পর্য্যন্ত সেই একনিষ্ঠা সাধিকা ছিল। তাই সংসারের নির্ম্মায়িকতায় এবং ঘটনাচক্রের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়াও তখনো সে তলাইয়া যায় নাই। কিন্তু অর্থহীনা নিঃসহায়া তাহার অবস্থা প্রতিদিনই শোচনীয়তর হইয়া উঠিতে-ছিল; তাহা বুঝিয়াই, 'শপথ রাখিতে শক্তি হয় কি না হয়' ভাবিয়াই, প্রাণপণে আপনাকে প্রলোভনের হাত হইতে সে দূরে দূরে রাখিতে লাগিল। অবশেষে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করাই সে স্থির করিল। বহুদিন হইতে তাহারা প্রবাসী হইলেও, সেখানে কেহ না কেহ তাহাকে চিনিয়া দয়া করিতে পারে, কাজকর্ম্মেরও তাহার সুবিধা ঘটিতে পারে। কিন্তু তাহার কোলের শিশু? তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া যে অসম্ভব; তার অস্তিত্বের কথা তাহাকে গোপন করিতে হইবে। ভাবী বিচ্ছেদের চিন্তায় চিত্ত অধীর হইয়া উঠিলেও, সে অধৈর্য্য তাহাকে দমন করিতেই হইবে। কিন্তু কোথায় সে তাকে রাখিয়া যায়? সেই কথাই ভাবিতে ভাবিতে সে অগ্রসর হইতে-ছিল, এমন সময় অকস্মাৎ থেনেডিয়ারের কন্যা দুইটির প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল; তাহাদের সে শিশুসুলভ আনন্দোচ্ছ্বাস, অকলঙ্ক সরল মুখচ্ছবি তাহাকে আকৃষ্ট করিল। তারা যেন দেবদূতের ন্যায় তাহাকে বলিতেছিল—"এই ই স্বর্গ, এইখানে আয়।" অভাগিনী মুগ্ধা হইল, তাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া থেনেডিয়ার-পত্নীর কাছে যাইয়া তাই সে মৃদুস্বরে বলিল—"সুন্দর মেয়ে দু'টি ত আপনার!"

অতি হিংস্র পশুও অপরকে তাহার সন্তানদের আদর করিতে দেখিলে, শান্ত হইয়া আসে; থেনেডিয়ার-পত্নী ত দূরের কথা। তাই মুখ তুলিয়া, ধন্যবাদ দিয়া, আগন্তুকাকে সে বসিতে বলিল। পরিচয়ে বলিল—"আমি থেনেডিয়ারের স্ত্রী; এটা আমাদেরই সরাই।" তারপর গুণ্ গুণ্ করিয়া পুনরায় গাহিতে লাগিল;—

থেনেডিয়ার—অন্ততঃ সে নিজে এইরূপ প্রচার করিত—বহুপূর্ব্বে সৈন্যদলভুক্ত ছিল; এবং বিখ্যাত ওয়াটর্লু যুদ্ধের সময় সে না কি কোন এক আহত সেনাপতিকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে উদ্ধার করে। সেই ঘটনার উপলক্ষ্য করিয়াই সে "ওয়াটার্লুর সার্জ্জেণ্ট" বলিয়া তাহার সরাইখানার নামকরণ করিয়া-ছিল। তার পত্নীও সৈনিকের যোগ্যা স্ত্রী; তাহার পাটল কেশ, তাম্রাভ গাত্রবর্ণ, এবং অসম কর্কশ দেহযষ্টি দেখিয়া সকলেই বলিত—"যোগ্যং যোগ্যেন যুক্তং।" তবে স্ত্রীর জীবনে একটু বৈচিত্র্য ছিল,—বটতলার এবং বাজে নাটক নভেল পড়িয়া কতকটা নায়িকাসুলভ নভেলী ভাব তাহার মধ্যে কঠোরে কোমলে মিশিয়া ছিল। তত্রাচ, সে বসিয়া ছিল তাই, নতুবা তাহার পূর্ণ অবয়ব এবং সম্পূর্ণ মুখখানা

দেখিলে ফ্যানটাইন হয় ত সন্ত্রস্তা এবং সন্দিগ্ধা হইত ; কি করিত বলা যায় না, হয় ত কন্যাকে সেখানে রাখিবার সঙ্কল্প সে ত্যাগ করিত। —কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ অন্যরূপ। এমনি সামান্য সূত্রের উপর কত সময় মানবের অদৃষ্ট দুলিতে থাকে।

আগন্তুকা আপন জীবন-বৃত্তান্ত, সময়োপযোগী কতক পরিবর্ত্তিত করিয়া, বর্ণনা করিল। বলিল -"তাহার স্বামী প্যারীতে দিনমজুরের কাজ করিতেন, হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হওয়ায় অনাথা শিশুকন্যাকে লইয়া সে কাজের সন্ধানে অন্যত্র যাইতেছে, দরিদ্রা সে, তাই সে প্রায় সব পথটা হাঁটিয়াই আসিয়াছে, মেয়েকেও কতক হাঁটাইয়াছে,—তাই তার চাঁদের কণা ক্লান্ত হইয়া তার বুকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—ইত্যাদি" বলিয়া কন্যাকে দৃঢ়তরালিঙ্গনবদ্ধা করিয়া সাগ্রহে তাহার মুখচুম্বন করিল।

সে স্পর্শে শিশু জাগিয়া উঠিয়া, আয়ত সুনীল নেত্রে জননীর প্রতি চাহিল।—কি দেখিল?—কিছুই নয়; অথচ সবই যেন সে দেখিল। তারা যে দেব-দূত তা বুঝি শিশুরা বোঝে, আমরা যে দুর্ব্বল মানব তাও বুঝি তারা জানে; তাই আমাদের সন্দিগ্ধ পুণ্যের পার্শ্বে তাদের উজ্জ্বল পবিত্রতার ছবি এমন সারল্যে কোমল, গাম্ভীর্য্যে মধুর!

কন্যাকে ফ্যানটাইন ধরিয়া রাখিতে পারিল না; ক্রোড় হইতে স্খলিতা হইয়া ক্রীড়ারতা বালিকা দুইটির প্রতি সে ছুটিল। থেনেডিয়ার-পত্নী তাহার প্রতি চাহিয়া সহাস্যে বলিল,—"বেশ হয়েছে। তিনটিতে খেলা কর।"

সে বয়সে ভাব হইতে বিলম্ব হয় না। মুহূর্ত্তের মধ্যে তিন জনে পূর্ণ উৎসাহে 'গর্ত্ত কাটাকাটি খেলা' খেলিতে আরম্ভ করিল। নবাগতার উৎসাহই খুব বেশী; শিশুর আনন্দোচ্ছ্বাসে জননীর অন্তর-ছবিখানি প্রতিফলিত হয়, এ কথা খুবই সত্য।

কিয়ৎক্ষণ পরে থেনেডিয়ার-পত্নী প্রশ্ন করিল—"তোমার মেয়ের নাম কি বাছা?"

"কসেট্।"

"ক' বছরের হল?"

"এই তিন চল্‌ছে।"

'তা হ'লে ত আমার বড়টির বয়েসী।"

শিশু তিনটি তখন বিস্ময়চকিত ভাবে সম্মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। তার বিশেষ কারণও ছিল। একটা বৃহৎ কীট মাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। তা দেখিয়া তাহাদের কত ভয়, অথচ কি আনন্দ! তাহাদের ক্ষুদ্র ললাট তিনটি পরস্পর সংলগ্ন, তিনটি ক্ষুদ্র মস্তকের উপর একটি দিব্যালোকসম্পাত!

"ছেলেরা কেমন এক দণ্ডে ভাব করে নেয় দেখেছ? তিনটিই যেন এক মায়ের পেটের!"

ফ্যানটাইন বুঝি এতক্ষণে ইহারই অপেক্ষা করিতেছিল। থেনেডিয়ার-স্ত্রীর হাত দু'টি ধরিয়া সে বলিয়া উঠিল—"আমার মেয়েটিকে, আপনার কাছে রাখ্‌বেন?"

প্রবীণা বিস্ময়ে নবীনার প্রতি চাহিল। সে চাহনিতে 'হাঁ' কি 'না' কিছুই বুঝা গেল না। ফ্যানটাইন পুনরায় বলিল—'মেয়েকে নিয়ে ত আর আমি সেখানে যেতে পারি নে। সঙ্গে নেজুড় থাক্‌লে কোথাও কাজ পাব না। তাই ভগবানই বুঝি দয়া করে আমাকে এ দিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনার মেয়ে

দু'টিকে যখন দেখ্‌লাম, তখন মনে হল,— এদের মা নিশ্চয়ই খুব ভাল, আর কসেটও এদের সঙ্গে হেসে খেলে আপনার বোনের মত বেশ সুখে থাকবে।—ক' দিনই ত! তার পর আবার আমি এসে নিয়ে যাবো। কসেটকে আপনি রাখ্‌বেন ?"

"তাই ত, আচ্ছা ভেবে দেখি।"

"আমি মাসে মাসে তার খরচ বলে ছ' ফ্রাঙ্ক করে দেবো।"

এমন সময় বাটীর অভ্যন্তর হইতে পুরুষ-কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল—

"সাত ফ্রাঙ্কের কমে হবে না—আর, ছ' মাসের টাকা আগাম চাই।"

প্রবীণা বলিল—"ছ' মাসের হিসাবে তা হলে ত ৪২ ফ্রাঙ্ক হয়।"

নবীনা।—"বেশ, তা দিচ্ছি।"

পুনরায় নেপথ্য হইতে থেনেডিয়ার বলিল —"আর, প্রথম প্রথম বার্‌তি খরচের জন্য তা ছাড়া ১৫ ফ্রাঙ্ক বেশী চাই—."

প্রবীণা।—৪২ আর ১৫,—সবশুদ্ধ তা হলে ৫৭ হয়।

নবীনা।—"তাও দেবো—আমার কাছে এখন ৮০ ফ্রাঙ্ক আছে; তা থেকে ৫৭ গেলেও যা থাক্‌বে তাতে এখন কিছুদিন আমার চলে যাবে। না হয় হাঁটাপথেই যাবো, তাতে খরচেরও কিছু সাশ্রয় হবে। তার পর, কাজ কর্ম্ম জুটলে, হাতে কিছু টাকা করে, ফিরে এসে আমার সোণাকে নিয়ে যাবো।"

নেপথ্য হইতে—"মেয়ের জামা কাপড় আছে ত ?" এইবার প্রবীণা মৃদুস্বরে নবীনাকে জানাইল—"উনি আমার স্বামী।"

নবীনা।—আমি তা বুঝেছিলাম। জামা কাপড় আছে বই কি, যথেষ্টই আছে; ভাল ভাল রেশমী পোষাক,—সব একডজন করে আছে। আমার হাতের এ কার্পেটের ব্যাগটা ওরই জিনিষপত্রে ভরা।

পুনরায় নেপথ্য হইতে—"সে গুলা সব রেখে যাবে ত ?"

"নইলে কোথায় নিয়ে যাবো—এত পোষাক থাকতে কি মেয়ে আমার ন্যাংটো হয়ে থাক্‌বে ?"

এতক্ষণে থেনাডিয়ার বাহিরে আসিল। বলিল "তা হলে আর আমাদের আপত্তি নেই।"

সেইভাবেই বন্দোবস্ত হইল। ফ্যানটাইন, রাত্রিটা সেই সরাইখানাতে থাকিয়া, প্রাতঃ-কালে, থেনেডিয়ারদের প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া, কন্যাকে সেখানে রাখিয়া রওনা হইল। খুব শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়া কন্যাকে আপনার কাছে লইয়া যাইবে, তাহার মনে তখন সেই আশা। তত্রাচ সহজভাবে কন্যার কাছে বিদায় লইলেও এক একবার সে দারুণ নিরাশাভারে লুটাইয়া পড়িতেছিল।

ফ্যানটাইন চলিয়া গেলে, থেনেডিয়ার তাহার স্ত্রীকে বলিল—"আঃ, বাঁচা গেল। সেই ১১০ ফ্রাঙ্কের দেনাটা কাল শোধ দেবার দিন, গোটা ৫০ ফ্রাঙ্ক কম পড়্‌ছিল—কি করব্‌ তাই আকাশ পাতাল ভাব্‌ছিলাম; হয় ত কাল সকালে দোকানে 'সিলই' বা পড়ত! ভাগ্যি তুমি তোমার বাচ্ছাগুলোকে নিয়ে এমন ইঁদুর-কল পেতে ছিলে!"

"হাঁ,—তবে অজান্তিতে, এই যা!" বলিয়া প্রবীণা মৃদু হাস্য করিল।

কলে ইন্দুর ধরা পড়িয়াছিল।—সে ইন্দুর-শিশু কসেট। শিকার ক্ষুদ্র হউক, তাহা

দেখিয়াই মার্জ্জারী সানন্দে লাঙ্গুলাস্ফালন করিতেছিল।

কাহারা এই থেনেডিয়ার-পরিবার? বংশ হিসাবে ধরিতে গেলে, তাহাদিগকে মিশ্র বংশজ বলিতে হয়। নিম্নতম বংশ হইতে ক্রমোন্নত সম্প্রদায়, এবং অবস্থাবিপর্য্যয়ে অধঃপতিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী—উভয়ের মিশ্রণে যে শ্রেণী উৎপন্ন হয়, থেনেডিয়ারেরা তাহারই অন্তর্ভুক্ত। এসব ক্ষেত্রে যেমন হইয়া থাকে, থেনেডিয়ারদের রীতিনীতি সেইরূপ। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহজাত ভদ্রতা বা শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের চিত্তের উদারতা কিছুই তাহারা পায় নাই। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অতি সঙ্কীর্ণ মনা ছিল;—সামান্য কারণেই তাহারা পিশাচসদৃশ হইয়া উঠিত,—তাহাদের অননুষ্ঠেয় কোন পাপ-কার্য্যই ছিল না। এমন মানব অনেক আছে যাহারা প্রতিদিনই 'আপনা রচিত জালে আপনি জড়িত' হইয়া, জীবনে ক্রমশঃ গাঢ়তর অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়া থাকে;—পশ্চাদ্দিকেই তাহাদের জীবনের গতি, পুরোভাগে নহে; তাহাদের জীবন চিররহস্যাচ্ছন্ন, সর্ব্বদাই যেন কি এক আশঙ্কায় তাহারা সন্ত্রস্ত; তাহাদের পাপপূর্ণ-চরিত্রের ছায়া সর্ব্বদাই তাহাদের মুখে ঘনীভূত হইয়া থাকে, সামান্য দু'একটি কথায়, মুখ ভাবে, তাহাদের অতীতের গুপ্ত পাপকাহিনী এবং ভবিষ্যতের অন্ধকারময় ঘটনার ইঙ্গিত যেন আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই। থেনেডিয়ার ও তাহার স্ত্রীর সম্বন্ধে এ কথা খুবই খাটে।

পাপ যতই আপাতঃ বলবান্ হউক্ না কেন, সকল সময় তাহা হইতে সম্পদ্ আসে না; থেনেডিয়ারদের ব্যবসায়ই তাহার প্রমাণ—কোনও রূপে তাহাদের চলিতেছিল মাত্র। দেনার দায়ে সরাইখানা প্রায়ই বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছিল। ফ্যানটাইনের প্রদত্ত ৫৭ ফ্রাঙ্ক এ যাত্রা তাহাদিগকে উত্তমর্ণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিল বটে, কিন্তু পরমাসে পুনরায় সেইরূপ অর্থকষ্ট উপস্থিত হইল; তখন থেনেডিয়ারের স্ত্রী কসেটের মূল্যবান্ পরিচ্ছদাদি প্যারীতে লইয়া যাইয়া ৬০ ফ্রাঙ্কে বন্ধক দিয়া আসিল। সে অর্থও যখন নিঃশেষিত হইয়া গেল, তখন হইতে তাহারা কসেটের সহিত অনুগ্রহজীবীর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল। মূল্যবান্ পোষাকের যাহার অভাব ছিল না, থেনেডিয়ার-কন্যাদের পরিত্যক্ত—অর্থাৎ শত-ছিন্ন, অব্যবহার্য্য—বস্ত্রাদিতে তাহার দেহতাপ রক্ষা হইতে লাগিল; তাহাদের উচ্ছিষ্ট অন্নব্যঞ্জনে কোনোরূপে তাহার উদরপূর্ত্তি ঘটিতে লাগিল। অথচ এদিকে ফ্যানটাইন প্রতিমাসেই পত্রোত্তরে জানিতে লাগিল—"কসেট্ ভাল আছে, বেশ মনের স্ফূর্ত্তিতেই আছে।"—নির্দ্দিষ্ট ছয়মাস অতীত হইয়া গেলে, ফ্যানটাইন চুক্তিমত, তাহার মাসিক দেয় ৭ ফ্রাঙ্ক পাঠাইয়া দিল। উত্তরে থেনেডিয়ার লিখিল—"৭ ফ্রাঙ্কে কি হবে? এখন থেকে ১২ ফ্রাঙ্ক করে চাই।" পরমাসে ফ্যানটাইন ১২ ফ্রাঙ্কই পাঠাইল;—মেয়ে ভাল আছে,—কাজেই সে কোন আপত্তি করিল না।

লোকচরিত্র চিরদিনই দুর্জ্জেয়। অনেক চরিত্রে ভালবাসা এবং হিংসা পাশাপাশি গ্রথিত থাকে। থেনেডিয়ারের স্ত্রী আপন কন্যা দু'টিকে যে পরিমাণ ভালবাসিত, কসেটের প্রতি তার

সেই পরিমাণ ঘৃণা ছিল। অবশ্য সেটা সঙ্কীর্ণ-মনের লক্ষণ; জননীর ভালবাসা এতটা সঙ্কীর্ণ হওয়া পরিতাপের বিষয়। কিন্তু আমরা কি করিব? আমরা যেমনটি দেখিয়াছি তেমনই লিখিতেছি;—তবে সংসারে এমন জননীও অনেক থাকে। কসেট শিশু কসেট তাহার গৃহে তাহার কন্যা দুইটির সহিত আলো-বাতাসের ভাগ বসাইতে আসিতেছে—তাই সে ভাবিত, আর জ্বলিয়া মরিত। আদর, যত্ন, হাতটান—তিনটাই তার পূর্ণমাত্রায় ছিল,—কসেটের অভাবে, এতটা স্নেহ থাকিলেও, হয় ত তিনটাই সম-ভাবে কন্যাদের উপর বর্ষিত হইত; কিন্তু কসেট আসিয়া অবধি কিল চাপড়ের ভারটা সবই আপনার উপর লইল, আদর যত্ন যা কিছু সবই তাহাদের জন্য রাখিয়া দিল। তত্রাচ তাহার নিস্তার ছিল না।—অসহায়া, কোমলা, সংসারানভিজ্ঞা, বালিকা দণ্ডে দণ্ডে নির্য্যাতিত হইত, আর তাহারই পার্শ্বে অপর দুইটি বালিকা স্নেহের শীতল ছায়ায় বসিয়া থাকিত।—এমনই সংসার!

শুধু জননী বলিয়া নয়, কন্যাদ্বয়ের—ইপোনাইন ও এজেলমারেরও—ব্যবহার বড় নির্ম্মম ছিল। তাহাদের কি দোষ? সে বয়সে বালিকারা ত জননীরই প্রতিচ্ছায়ামাত্র; সে ছায়া আয়তনে ক্ষুদ্র—এই যা!

এই ভাবে বৎসর দুই কাটিল। প্রতি-বেশিনীরা সব কথা জানিত না; তাহারা ভাবিত, জননী বুঝি আর কসেটের কোন উদ্দেশ লয় না। তাই তাহারা পরস্পর বলাবলি করিত—"যা হোক্, থেনেডিয়ারদের খুব ভাল বল্‌তে হবে কিন্তু বাছা। পরের মেয়েকে ঘরের কড়ি দিয়ে কে পোষে বল ত?"

ক্রমে ক্রমে কসেটের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে থেনেডিয়ারের মনে সন্দেহ জন্মিল; তাই সে জো পাইয়া তখন হইতে মাসিক ১৫ ফ্রাঙ্কের দাবী করিয়া বসিল, লিখিল—"মেয়ে এখন বড় হচ্ছে, বেশী খাচ্ছে, এর কমে হবে না।" পরমাস হইতে ১৫ ফ্রাঙ্ক করিয়াই তাহার নিকট আসিতে লাগিল।

বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল, কসেটের দুর্দ্দশাও ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল। যতদিন সে নিতান্ত শিশু ছিল, ততদিন ইপোনাইনদের কৃত অপরাধের সমস্ত শাস্তি তাহাকে বহন করিতে হইত; পাঁচ বৎসরে পড়িতেই বাটীর পরিচারিকারূপে সে গণ্যা হইল। পাঠক, কথাটা আশ্চর্য্য ভাবিবেন না; এমনই ঘটিয়া থাকে! বিখ্যাত দস্যু তুমলার্দ্দের বিচারে কর্ত্তৃপক্ষের নথিপত্র হইতে জানা যায় যে, পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক, উদরান্ন-সংস্থানের উপায়ান্তর না দেখিতে পাইয়া, পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম হইতেই চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কালে দস্যুদলপতি হয়। অতএব কসেট যে সে অল্প বয়সে অবস্থাবিপর্য্যয়ে দাসীগিরি করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

চিঠিপত্রাদি লইয়া যাওয়া, ঘরদ্বার উঠান প্রভৃতি ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, ছোট খাট মোট-ঘাট বহা;—এ সকলই এখন হইতে তাহাকে করিতে হইত। বিশেষতঃ কয়েক মাস হইতে ফ্যানটাইন টাকা পাঠাইতে পারে নাই, কাজেই থেনেডিয়ারেরা বরং জোর করিয়াই তাহাকে বেশী বেশী খাটাইতে লাগিল। আজ হঠাৎ ফ্যানটাইন ফিরিয়া

আসিলে, কসেটকে দেখিয়া কখনই আপনার কন্যা বলিয়া চিনিতে পারিত না,—তিন বৎসর পূর্ব্বের সেই নধরদেহা বালিকা এতই শীর্ণা হইয়া গিয়াছে; অত্যাচার এবং দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়িয়া সে ক্ষুদ্র বালিকা এই বয়সেই এতই গম্ভীরপ্রকৃতি এবং এমনই লুপ্ত-শ্রী হইয়া পড়িয়াছে! থাকিবার মধ্যে চক্ষু দুইটি তার আজিও তেমনি আয়ত ছিল,—তাহাতে বুঝি তাহার দীনভাবটুকু আরও পরিস্ফুট হইয়া থাকিত। থেনেডিয়ারেরা তা দেখিয়া বলিত—"পাজি ছুঁড়ি! হাড়ে হাড়ে সয়তানি!"

দারুণ শীতের সময়েও, প্রত্যূষে উঠিয়া, শতছিন্ন গাত্রবস্ত্রে, কাঁপিতে কাঁপিতে, ছোট ছোট হাত দু'খানিতে প্রকাণ্ড সম্মার্জ্জনী লইয়া তাহাকে ঘরদ্বার ঝাঁট দিতে হইত। গ্রামের লোকেরা তাই তাহার নাম দিয়াছিল—"চাতক পাখী।" চাতক পাখীটীর মতই দেখিতে সে ক্ষুদ্র ছিল, তাহারই মত প্রত্যূষে সকলের আগে উঠিতও বটে; তবে উভয়ের মধ্যে একটু মাত্র প্রভেদ ছিল ;—এ চাতকে গান গাহিত না, বুঝি গান সে জানিত না!

ফ্যানটাইনের কি হইল, এখন তাহার সন্ধান লওয়া আবশ্যক।

যথাসময়ে সে তাহার পিতৃগ্রাম ম—তে আসিয়া পৌঁছিল। বহুদিন পূর্ব্বে সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া গেলেও, আবছায়া মত কতকটা তাহার মনে ছিল; কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়া সেটাকে স্বগ্রাম বলিয়া প্রথমতঃ সে চিনিতেই পারিল না,—এখন তাহার এতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যেখানে সামান্য কয়েক ঘর গৃহস্থ পরিবার লইয়াই গ্রামের সমগ্র জন-সংখ্যা ছিল এখন সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কল-কারখানা, অজস্র দোকান-পাট, কত নূতন নূতন অট্টালিকা,—তাহার ইয়ত্তা নাই। কিসে সে গ্রামের এখন এমন অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল তাই বলিতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ম—গ্রামটি অতি ক্ষুদ্র ছিল, কয়েক ঘর শ্রমজীবী মাত্রই সেখানে বসতি করিত—পুরুষানুক্রমে তাহারা কালো বনাত ও কালো কাঁচের চুড়ির ব্যবসায় করিত।—কিন্তু কাঁচা মাল (Raw materials) দুর্ম্মূল্য হওয়ায়, বাধ্য হইয়া তৈয়ারী জিনিসের দাম তাহাদের চড়াইতে হইত—কাজেই দামী বলিয়া বাজারে তত কাটতি ছিল না। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কিন্তু একজন বিদেশী লোক আসিয়া দ্রব্যাদির নির্ম্মাণ-প্রণালীতে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সংসাধিত করে। পরিবর্ত্তন যৎসামান্য, কিন্তু তাহাতেই সে ব্যবসায়ে যুগান্তর উপস্থিত হইল। দ্রব্যাদির নির্ম্মাণ ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় এবং তজ্জন্য মূল্য সুলভ হওয়ায়, এখন হইতে সে সব জিনিসের বিক্রয় অসম্ভব রূপ বৃদ্ধি পাইল। ফলে, ক্রেতা বিক্রেতা, এবং শ্রমজীবিসম্প্রদায় প্রত্যেকেই লাভবান্ হইতে লাগিল অপেক্ষাকৃত অল্প দামে বিক্রয় করিলেও পূর্ব্বাপেক্ষা তিনগুণ লাভ থাকিতে লাগিল; এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদির উন্নতি এবং শ্রমজীবীদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধিও সম্ভবপর হইল। দেখিতে দেখিতে নবাগত লোকটি আপনি সমৃদ্ধ হইয়া সে পল্লীকেও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিল—কিন্তু সাধারণে এ পর্য্যন্ত তাহার বংশপরিচয় বা পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানিত না।—লোকে বলিত কয়েক শত ফ্রাঙ্ক মাত্র লইয়া সামান্য শ্রমজীবীর ন্যায় সে সে গ্রামে প্রবেশ করে; তারপর পরিশ্রম এবং কার্য্য-

কুশলতার গুণে এবং সে নূতন আবিষ্কারের ফলে তাহার এ সমৃদ্ধি; প্রথম যখন সে আসে তখন সাধারণ একজন শ্রমজীবীর ন্যায়ই তাহার আচার-ব্যবহার পরিচ্ছদ ছিল। লোকে আরও বলে যে, সে দিন তাহার আগমনের অব্যবহিত পরেই সন্ধ্যার সময় সে গ্রামে আগুন লাগে, এবং নবাগত লোকটি তাহা দেখিয়া আপন জীবন তুচ্ছ করিয়া জ্বলন্ত গৃহ হইতে দুইটি শিশুকে উদ্ধার করিয়া আনে,—সে শিশু দুইটি পুলিশের দারোগার। সেই আকস্মিক বিপদে কৃতজ্ঞ কর্ত্তৃপক্ষ আর তাহার ছাড়পত্র দেখিতে চায় নাই। লোকটি সেই দিন হইতে 'ফাদার ম্যাডেলিন' নামে পরিচিত হইয়া সে গ্রামে বাস করিতে লাগিল। তখন তাহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ।

লোকটি উদারপ্রকৃতির, সর্ব্বদাই সে চিন্তামগ্ন থাকিত। সৌভাগ্যলক্ষ্মী যেন স্বহস্তে তাহার ললাটে রাজটীকা পরাইয়া দিয়াছিলেন। তাই দুই বৎসর যাইতে না যাইতে তাহার কার্য্যে অভাবনীয় উন্নতি ঘটিল,—প্রত্যহ সহস্র সহস্র স্ত্রী-পুরুষ তাহার কারবারে খাটিতে লাগিল; কার্য্যের সুবিধার জন্য তখন ম্যাডেলিন স্ত্রী এবং পুরুষ শ্রমজীবীদের জন্য স্বতন্ত্র দুইটি কারখানা করিল,—প্রত্যেকটির জন্য পৃথক্ তত্ত্বাবধায়ক এবং স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইল। তবে অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোক বা বালিকার সেখানে স্থান ছিল না, ম্যাডেলিন এই একটি মাত্র বিষয়ে কঠোর ছিল। তাহার আগমনে সে মুমূর্ষু প্রদেশ কর্ম্মের দীক্ষা লাভ করিয়া যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল; চারিদিকে উৎসাহ-উন্মাদনা পরিস্ফুট হইতে লাগিল; শ্রমবিমুখতা এবং দারিদ্র্য অন্তর্হিত হইল; অতি দুঃখীরও অন্নের সংস্থান হইল; দীনদরিদ্রের আবাসও আনন্দরেখায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কার্য্যের জন্য কেহ আসিলে ম্যাডেলিন কখনও তাহাকে ফিরাইত না, শুধু বলিত,—"স্ত্রী হও, আর পুরুষ হও,—সৎপথে থাক।"

ল্যাফিটের ব্যাঙ্কে ইতিমধ্যেই তাহার প্রায় ৬৷৷৹ লক্ষ ফ্রাঙ্ক জমিয়াছিল; অথচ সে কখনও অর্থগৃধ্নু ছিল না। হাঁসপাতাল, বালক এবং বালিকাদিগের জন্য পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যালয়, আতুরাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি শত শত অনুষ্ঠানে তাহার উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার হইতে লাগিল।

সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই পরানুচিকীর্ষু থাকে; ম—তেও ছিল। প্রথম প্রথম তাহারা বলাবলি করিত—"লোকটা টাকা চায়।" তার পর তাহার দানব্যয় দেখিয়া বলিল—"লোকটার মনে একটা উচ্চাশা আছে।" কথাটা অনেকের মনে সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইল; কারণ, ম্যাডেলিনের ধর্ম্মের দিকেও বেশ একটু টান ছিল,—সাধারণের সহানুভূতিও তজ্জন্য তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। অবশেষে যখন একদিন তাৎকালিক "মনিটর" পত্রে প্রকাশিত হইল যে, তাঁহার সাধারণ সৎকার্য্যের জন্য এবং পুলিশের অধ্যক্ষের অনুরোধে স্বয়ং সম্রাট্ ম্যাডেলিনকে ম—র নগরাধ্যক্ষের পদ প্রদান করিয়াছেন, তখন তাহারা যুগপৎ বলিয়া উঠিল—"দেখেছ ত, ঠিকই বলেছিলাম। লোকটার মনে মনে বরাবরই এমনই একটা মতলব ছিল। যা কিছু ওর দান-ধ্যান, সবই এর জন্য।"

ম্যাডেলিন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে পদ প্রত্যাখ্যান

করিল। সেই বৎসরের শেষে তাহার নূতন আবিষ্কারের ফলে, সম্রাট্ তাহাকে সি, এল্, এচ্ (Cross of the Legion of Honour) উপাধিতে ভূষিত করিতে চাহিলেন। তখন তাহারা পরস্পর বলাবলি করিল—"ওঃ বুঝেছি, ও এই রকম একটা বড় উপাধি চায়।"

ম্যাডেলিন সে সম্মানও প্রত্যাখ্যান করিল। তখন তাহারা বিস্মিত হইয়া, ম্যাডেলিনের এরূপ ব্যবহারের কোন কারণ না বুঝিতে পারিয়া, শেষে বলিল—"লোকটা একটা Adventurer (হুজুকে)।" অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সম্ভ্রান্ত পরিবার-সমূহ হইতে ম্যাডেলিনের নামে অজস্র নিমন্ত্রণ-পত্র আসিতে লাগিল। সাধারণ শ্রমজীবিভাবে যেখানে তাহার কোন স্থান ছিল না, আজ অবস্থার উন্নতিতে সে সব দ্বার তাহার জন্য সাদরে উন্মুক্ত হইল। তত্রাচ ম্যাডেলিন আপনাকে দূরে দূরেই রাখিতে লাগিল। তাহাতে অনেকে বিরক্ত হইল;—কেহ বলিল—"ও একটা কোথাকার গেঁয়ো ভূত, মূর্খ,— ভদ্রপরিবারে ও মিশবে কি করে।" কেহ বলিত "পশু ও, ভদ্রতার কি জানে?" ইত্যাদি ইত্যাদি। ম্যাডেলিন কিন্তু তাহাতে টলিল না—অবশেষে, একদিন কর্ত্তৃপক্ষ নাছোড়বান্দা হইয়া তাহাকে ধরিলেন, গ্রামস্থ সকলে পথে ঘাটে তাহাকে অনুনয় করিতে লাগিল; শেষে এক বৃদ্ধা ক্রুদ্ধা হইয়া তাহাকে বলিল—"ভাল, নগরাধ্যক্ষ হলে দেশের ও দশের উন্নতি হয়। ভাল কাজ করতে হবে বলেই কি তোমার যত ভয়?" অগত্যা ম্যাডেলিনকে স্বীকৃত হইতে হইল, এবং তাহার অনতিকাল পরেই ম—র অধ্যক্ষরূপে তাহার নিয়োগপত্র আসিল।

নগরাধ্যক্ষ হইয়াও তাঁহার সেই সহজ অনাড়ম্বরতা বিনষ্ট হইল না। শ্রমজীবীর ন্যায় তাম্রাভ-বর্ণ, এবং দার্শনিকের ন্যায় সর্ব্বদা চিন্তামগ্ন তাঁহার মুখভাবে সর্ব্বদাই একটা শান্ত শ্রী ফুটিয়া থাকিত। একটা চওড়া টুপি এবং গলা পর্য্যন্ত আঁটা কোর্ত্তাই সাধারণতঃ তিনি পরিধান করিতেন। কথা তিনি কহিতেন কম; এবং লোকের তোষামোদ হইতে দূরে দূরে থাকিতেন। পথে কাহারও সহিত দেখা হইলে, মৃদু হাসিয়া দ্রুত চলিয়া যাইতেন—কাহাকেও কথা কহিবার বড়একটা অবকাশ দিতেন না; সুযোগ পাইলেই নির্জ্জন প্রান্তরে যাইয়া একাকী পদচারণ করিতেন। প্রায়ই তিনি পাঠগৃহে থাকিতেন; পুস্তক তাঁহার বেশী ছিল না; যাহা ছিল সবগুলিই উচ্চ ভাবপূর্ণ, সুনির্ব্বাচিত। যথার্থ বলিতে গেলে কিন্তু পুস্তকের মত নীরব অথচ যথার্থ বন্ধু আর নাই। সেই নীরব বন্ধুর নিত্যসহবাসে ম্যাডেলিনের কথাবার্ত্তা, ভাষা, ভাব ক্রমশঃই সংশোধিত হইতেছিল। একটা কথা, নির্জ্জনে বেড়াইবার সময় সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে কোন না কোন একটা বন্দুক থাকিত; প্রায়ই তাহার ব্যবহার হইত না, কিন্তু আবশ্যক কালে তাঁহার লক্ষ্য অব্যর্থ-সন্ধান ছিল। নিরীহ জীবকে কখনও তিনি শিকার করিতেন না। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পদার্পণ করিলেও, শরীরে তখনও তাঁহার অমানুষিক শক্তি ছিল। পথে চলিতে চলিতে কতবার তিনি কতলোকের বহুপরিশ্রম-সাধ্য কার্য্য একাই করিয়া দিতেন। লোকেরা নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিত।

কৃষকদিগকে কতদিন তিনি কৃষিসম্বন্ধে কত উপদেশ দিতেন,—কিরূপে ধানের গোলায়, মরাইয়ের নীচে, কেবল মাত্র লবণের জল দিলে ঘুণ ধরে না, কিরূপে ধানের খেতে, গোলাবাড়ীতে, orviotএর ফুল রাখিয়া দিলে চেলোপোকা নষ্ট হয়; কিরূপে ধানের জমি ভাল থাকে, ইত্যাদি অনেক কথা তিনি তাহাদের বলিতেন। একবার কোন মজুরকে কতকগুলি nettle (কাঁটাগাছ) তুলিয়া ফেলিয়া দিতে দেখিয়া তিনি বলেন "দেখ, ভগবানের জগতে সব জিনিসেরই মূল্য আছে। এর জমিও পাট কর্‌তে হয় না, চাষেরও পরিশ্রম নেই, অথচ সামান্য যত্নেই এ থেকে কত উপকার পাওয়া যায়, কতকাজে একে লাগান যেতে পারে; আমরা সে যত্নটুকুও করি না বলেই, সময়ে এর ফলগুলা কুড়িয়ে নিই না বলেই, শেষে এ গুলা জমির ক্ষতি করে,কাজেই তখন তাকে উপড়ে ফেলে দূর করে দিই। মানুষও এই কাঁটাগাছের মতনই।" তারপর থামিয়া,—"ভাই সব, এটা ঠিক জেনো, সংসারে নিতান্ত মন্দ লোক বলে, বা একবারে অপদার্থ উদ্ভিদ্ বলে কিছু নেই, আবাদের দোষেই সব মন্দ হয়, যা কিছু ক্রটী—সবই চাষার।" ম্যাডেলিন সব কাজই জানিতেন,— সামান্য খড়-কুটা দিয়া ছেলেদের এমন সুন্দর সুন্দর খেলনা তৈয়ার করিয়া দিতেন যে, তাহারা তাঁহাকে পাইলে আর সহজে ছাড়িতে চাহিত না।

যখনি কোন মৃতদেহ গির্জ্জায় লইয়া যাওয়া হইত, ম্যাডেলিন, কাছে থাকিলে, অমনি তাহার অনুসরণ করিতেন। অপরের দুঃখ কষ্ট মৃত্যু তাঁহাকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিত; শোকার্ত্ত পরিবারে তাহাদেরই একটি হইয়া তিনি মিশিয়া যাইতেন। মৃতের উদ্দেশে পঠিত মন্ত্রের ধ্বনি অপর এক জগতের দ্বার যেন তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিত। মৃত্যুর গাঢ় অন্ধকারে সে করুণ স্বর যেন ডুবিয়া যাইত, আর ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া, অনন্তের গূঢ়-রহস্যাচ্ছন্ন কোন দৈবি-ঝঙ্কার যেন তিনি শুনিতে থাকিতেন। তাঁহার অধিকাংশ সৎকার্য্য দানাদি অতি গোপনেই নিষ্পন্ন হইত। কত দরিদ্র, কত সময় সন্ধ্যার পর বাটী ফিরিয়া তার সদর দরজার পুরাতন তালা ভাঙা দেখিয়া "চোর" "চোর" করিয়া তাড়াতাড়ি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিত তাহার শয্যার উপর কতকগুলা টাকা কে রাখিয়া গিয়াছে। সে চোর কে, পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না। —লোকে তাঁহার টাকাকড়ি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিত; তবে এটা সত্য যে লাফেট ব্যাঙ্কে তাঁহার প্রভূত পরিমাণ অর্থ জমা ছিল; এবং ব্যাঙ্কওয়ালার সহিত এই সর্ত্ত ছিল যে, আবশ্যক হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে সে সব টাকা তিনি এককালীন উঠাইয়া লইতে পারিবেন।

ম্যাডেলিন ম—নগরের অধ্যক্ষ হওয়ার পর ছয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। সহসা একদিন ডি—র প্রধান ধর্ম্মযাজকের ৮২ বৎসর বয়সে মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইল; পরদিন ম্যাডেলিন শোক-চিহ্ন ধারণ করিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা আরও বর্দ্ধিত হইল. কারণ ডি—র ধর্ম্ম-যাজক তখনকার কালে একরূপ মহর্ষি-পদ-বাচ্য ছিলেন। লোকে ভাবিল, হয়ত

ম্যাডেলিন তাঁহার কোন আত্মীয়ই বা হইবেন; তত্রাচ তাহারা উভয়ের মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য কৌতূহলী হইল। অবশেষে একদিন এক সম্ভ্রান্তা বৃদ্ধা ম্যাডেলিনকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন—

"আপনি কি তাঁহার কোন আত্মীয় ?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে তাঁর জন্য আপনি শোকচিহ্ন নিয়েছেন কেন ?"

ম্যাডেলিন ধীরভাবে উত্তর করিলেন--"ছেলে বয়সে তাঁর বাড়ীতে আমি চাকর ছিলাম, তাই।"

আরও একটা কথা। যখনি কোন 'হা-ঘরে' বালক সে গ্রামে আসিত, ম্যাডেলিন তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার নামধাম জিজ্ঞাসা করিয়া অর্থ ভিক্ষা দিয়া তাহাকে বিদায় দিতেন। তাহারা যাইয়া সঙ্গীদের কাছে সে গল্প করিত; ফলে হা-ঘরে বালকদের প্রায়ই সে পথ দিয়া যাতায়াত করিতে দেখা যাইত।

ক্রমে ক্রমে ম্যাডেলিনের নাম চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। দশ পনের ক্রোশের মধ্যে যত গ্রামবাসী ছিল সকলেরই তিনি উপদেষ্টা স্বরূপ হইলেন; মামলা-মোকদ্দমার সালিশনিষ্পত্তি, পরস্পর বন্ধুত্ব সংস্থাপন প্রভৃতি কার্য্যে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিলেন। লোকের মুখে মুখে তাঁহার গুণগাথা কীর্ত্তিত হইতে লাগিল।

একজনমাত্র লোক তাঁহার উপর বরাবর সন্দিগ্ধ ছিল। সাধারণের সুখ্যাতি, ম্যাডেলিনের অসংখ্য সৎকার্য্যাদি কিছুতেই তাহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই। এক একজন লোকের মনে এমন এক একটা পাশবিক সংস্কার থাকে—যাহা আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ, যাহা আপনা আপনিই স্নেহের আকর্ষণের বা ঘৃণার বিকর্ষণের সৃষ্টি করে, যাহা কখনও ইতস্ততঃ করে না, কখনও চঞ্চল হয় না; কখনও আপনাকে ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না; জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার, বিতর্ক যাহাকে কখনও টলাইতে পারে না; স্থির গম্ভীর অদম্য অনম্যভাবে আপনার সম্পূর্ণতার মাঝে যাহা স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকে। এ লোকটারও প্রকৃতি সেইরূপ। প্রায়ই, যখন ম্যাডেলিনের ধীর স্নেহ-মধুর সাধারণের মঙ্গলাশীষপূত মূর্ত্তিখানি পথে দেখা যাইত, তখন সে অকস্মাৎ তাঁহার পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, স্থির দৃষ্টিতে, যতক্ষণ দৃষ্টি চলে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিত; আর নিম্নাধরোষ্ঠ দিয়া উর্দ্ধাধরোষ্ঠকে নাসিকার সহিত সংযুক্ত করিয়া, ধীরে ধীরে মস্তক সঞ্চালন করিত; ভাবটা—"কে এ? কোথায় না দেখিছি যেন? যাই হোক্ তোমার ভেকে আমি ভুলছিনে, ঠাকুর!"

সে জাভার্ট। পুলিশের দারোগা। ম—তে যখন সে আসে, তখন ম্যাডেলিনের ব্যবসায় জমিয়া গিয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

— —

বাঙ্গালীর স্বাধীন বৃত্তির পরিচয় দানের সুযোগ বড়ই অল্প ঘটে। এরূপ স্থলে, দেশের শিক্ষিত সমাজে স্বাধীন ভাবের উপযোগী স্পষ্ট-বাদিতার সাহস দেখিলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকে না, তাই আজ দেশের চারিটি প্রথিতনামা মহাশয় ব্যক্তির অনুষ্ঠিত চারিটি ঘটনার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, মহোদয় বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বোচ্চ রাজকার্য্যে যখন নিযুক্ত হন, তখন স্যার আস্‌লি ইডেন্ বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষ। রাজকার্য্যোপলক্ষে ভূদেব বাবু বেলভিডিয়ারে ছোটলাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, প্রসঙ্গক্রমে ইডেন সাহেব সম্মান ও সমাদরের ভাবব্যঞ্জক স্বরে ভূদেব বাবুকে বলিয়াছিলেন, "দেখুন আমাদের রাজ্য-পালন-পদ্ধতি কত উদার! আমরা আপনাকে যোগ্য ব্যক্তি বলিয়াই জাতি ও বর্ণ বিচার না করিয়া, একেবারে একটা ডিপার্টমেণ্টের সর্ব্বোচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছি।" ভূদেব বাবু চিরদিনই স্পষ্টবক্তা, এ স্থানেও উচিত বলিতে ইতস্ততঃ করিলেন না। বলিলেন,—"এই রাজ্যপালনপদ্ধতি অত্যন্ত অনুদার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত; যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে আমাকে যেরূপ ভাবে শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদে স্থান দেওয়া হইয়াছে, কথনই ঐরূপ হইত না। আপনি মুখে যাহাই বলুন না কেন, ভিতরে ভিতরে প্রভেদ বজায় রাখার জন্য আপনারা দৃঢ়ব্রত, তবে এদেশে অবশ্য আপনাদের এই নীতি শোভা পাইতেছে, আর এতেই দেশের লোক সন্তুষ্ট।" ছোটলাট বলিলেন, "আপনার এরূপ বলিবার কারণ কি?" ভূদেব বাবু বলিলেন, "দেখুন, ডাইরেক্টর অব্ পাবলিক ইন্‌স্‌ট্রক্‌সনের পদে আমাকে কয়েক মাসের জন্য নিযুক্ত করিলেন বটে, কিন্তু ঐ নিয়োগটা একজন ইংরাজের হইলে, গেজেটে যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, আমার বেলা সে ভাষা ব্যবহার করিতে আপনাদের আপত্তি জন্মিল। Officiating Director এই দুটি শব্দ ব্যবহার ত্যাগ করিয়া 'Placed in charge of the Directorate' ব্যবহার করা আবশ্যক হইল; একজন ইংরাজের নিয়োগে কি ঐরূপ কিম্ভূতকিমাকার হইত?" ইডেন সাহেব সত্যই উদারপ্রকৃতির রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তাই ভূদেব বাবুর কথায় প্রতিবাদ না করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। ভূদেব বাবু পুনরপি বলিলেন "দেখুন, মোগল-রাজত্বে আমার ন্যায় ব্যক্তি মোগল-কোর্টের প্রধান মন্ত্রীর পদলাভ করিতে বোধ হয় অক্ষম হইত না।" এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। ইডেন সাহেবের আনন্দানুভূতি সে দিন বিষাদে পরিণত করিয়া ভূদেব বাবু গৃহে ফিরিয়াছিলেন।*

ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় যখন বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ, সে সময়ে পুণ্যশ্লোকা মহারাণী স্বর্ণময়ীর নির্দ্দেশ

* অধুনা লোকান্তরিত অম্বিকাচরণ বসু মহাশয় ভূদেব-প্রসঙ্গে আমাকে ঐ ঘটনাটি বলিয়াছিলেন। ইনি ডাইরেক্টারের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন।

মত উক্ত কলেজের কার্য্যপরিচালন জন্য এক কমিটী গঠিত হয়। সেই কমিটীর সম্পাদক ছিলেন—রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর, আর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সেই কমিটির সভাপতি। সুতরাং যখন যিনি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিতেন, তিনিই কলেজ-কমিটীর সভাপতির কার্য্য করিতেন।

একদা প্রেসিডেন্সীবিভাগের শিক্ষাবিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টর রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় কয়েক মাসের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলে, তাঁহার তদানীন্তন সহকারী চন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয় অস্থায়িভাবে ঐ কার্য্যে ব্রতী থাকা কালে একবার মুর্শিদাবাদ জেলার বিদ্যালয় সকল পরিদর্শনে বাহির হইয়া বহরমপুরে উপস্থিত হন। তথায় জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। জেলার বিদ্যালয়সমূহের অবস্থা বিষয়ে নানা কথা-বার্ত্তার মাঝখানে জেলার কর্ত্তা সহসা কলেজ পরিদর্শনের প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। "কলেজ পরিদর্শন ত করা হয় না।" সাহেব বলিলেন "এবার হবে। আগামী কল্য আপনি কলেজে যাইবেন, আমি কলেজের কমিটীকে সমস্ত ব্যবস্থা করিবার আদেশ দিয়া এখনই পত্র লিখিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সভাপতি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কমিটির সম্পাদক রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুরকে এক পত্র লিখিয়া পরদিনের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন এবং এ কথাও লিখিয়া দিলেন যে, তিনি স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর মহাশয়কে পরদিন কলেজ-পরিদর্শনে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

যে দিন এই ব্যাপার ঘটে, সেই দিন সন্ধ্যার সময় কাশিমবাজার রাজবাটীতে বিশেষ কোন অনুষ্ঠাননিবন্ধন বহু পদস্থ লোকের নিমন্ত্রণ ছিল। রায় বাহাদুর সম্পাদক, কলেজের অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্র বাবুকে পত্রের দ্বারা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অভিপ্রায় জানাইয়া পর দিনের পরিদর্শন ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। ব্রজেন্দ্র বাবু রায় বাহাদুরের পত্র পাইবার পূর্ব্বেই চন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয়ের নিকট উক্ত সংবাদ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। তাই রাজবাটীতে নিমন্ত্রণে যাইবার সময়ে একখানি পদত্যাগপত্র সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। রায় বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবা মাত্র ব্রজেন্দ্র বাবু নিজের পদত্যাগপত্রখানি হাতে দিয়া বলিলেন "আগে কল্যকার ব্যবস্থা করুন। আমি কলেজের অধ্যক্ষ থাকিয়া শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর ভিন্ন অন্য কোন নিম্নপদবির কর্ম্মচারী দ্বারা কলেজ পরিদর্শনে সাহায্য করিতে পারিব না। সে কাজ আমার দ্বারা হইবে না।" শ্রীনাথ বাবু পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন "এখন উপায়? এ ব্যাপার এতদূর গড়াইবে, আমি তাহা আদৌ বুঝিতে পারি নাই। তাহা হইলে আপনাকে সংবাদ দিবার পূর্ব্বে উপায় অবলম্বন করিতাম, এখন উপায় কি?"

ব্রজেন্দ্র বাবু বলিলেন, "এ ক্ষেত্রে আমার দ্বারা কোন সাহায্য হইবে না।" এই সময়ে বৈকুণ্ঠ বাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইবা মাত্র শ্রীনাথ বাবু বৈকুণ্ঠ বাবুকে গিয়া অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া ত্বরায় উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন।

রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর ইতিপূর্ব্বে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে একজন বিষয়-জ্ঞানবিহীন নিরীহ দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়াই

মনে করিতেন, কিন্তু সেই দিন ঐ পদত্যাগ পত্রখানি পাঠ করিয়া ব্রজেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা উচ্চগ্রামে উঠিয়া গেল। বৈকুণ্ঠ বাবু বুঝিলেন যে, অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্রনাথ কেবল পণ্ডিত নহেন, তাঁহার পদ-মর্য্যাদাজ্ঞান. পূর্ণরূপে পরিস্ফুট ও স্বপদের সম্মান রক্ষায় বেশ পটু ; উক্ত পদত্যাগ-পত্রে উচ্চাঙ্গের কর্ম্মপটুতার পরিচয় পাইয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন, এবং ত্বরায় ইহার প্রতীকার সাধনে অগ্রসর হইলেন। শ্রীনাথ বাবু ও বৈকুণ্ঠ বাবু উভয়ে পরামর্শ করিয়া তখনই সভাপতি ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসায় উপস্থিত হইয়া সাহেবকে সকল কথা খুলিয়া বলিবামাত্র, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর—সান্ধ্যসমীরণ-সেবিত স্নিগ্ধ ইংরাজ-মূর্ত্তি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব—সহসা বৈশাখের প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ডে পরিণত হইয়া বলিলেন, "How can it be ? I can't cancel my order. The Inspector must inspect the college to-morrow. I have asked him to do so as President of the College Comittee. It is impossible for me now to ask hin. not to go there". বৈকুণ্ঠ বাবু ও শ্রীনাথ বাবু সাহেবকে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে "এটা নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে, আর এই হুকুম তামিল করিতে হইলে, আমাদিগকে বর্ত্তমান অধ্যক্ষকে হারাইতে হয়। এ কার্য্যে আমরাই বা কেমন করিয়া সম্মত হইব ?" সাহেব বলিলেন, "I don't know that. It is my order, and the order must stand". এই বলিয়া সাহেব ক্রোধ ও অভিমানভরে নীরবে বসিয়া রহিলেন।

তখন বৈকুণ্ঠ বাবু সাহেবকে বলিলেন, কলেজের একটা কমিটি আছে, এরূপ গুরুতর বিষয়ে কলেজ-কমিটির অভিপ্রায় জানিয়া কার্য্য করা উচিত. তাই আমার অনুরোধ এই যে আজ রাত্রিতেই সম্পাদক সকল সভ্যকে সংবাদ দিবেন। আগামী কল্য প্রাতঃকালে ছয়টার সময় আপনার এখানেই আমরা মিলিত হইয়া এ বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করিব, আপনি সে বিষয়ে অনুমতি দিলেই আমরা নিশ্চিন্ত হই।" সাহেব বলিলেন "All right Babu."

পরদিন প্রাতঃকালে ছয়টার সময় সভ্যেরা সাহেবের বাঙ্গালায় মিলিত হইলেন। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, বিষয়টা এরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে যে এবিষয়ে কমিটি কিছু না করিয়া শিক্ষাবিভাগীয় প্রধান রাজপুরুষের উপর ভার দেওয়া হউক, কমিটি ডাইরেক্টর বাহাদুরের নির্দ্দেশ মত কার্য্য করিতে প্রস্তুত রহিলেন। অধিকাংশের মতে এই প্রস্তাব পরিগৃহীত হইবামাত্র ম্যাজিষ্ট্রেট পদত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠ বাবু তাঁহাকে বুঝাইয়া তাঁহার বক্তব্যসহ বিষয়টা শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তার নিকট প্রেরণের অনুরোধ করিয়া বলিলেন "আমরা আপনাদের প্রদর্শিত বিধি-সঙ্গত পন্থারই অনুসরণ করিলাম। এতে ক্ষুণ্ণ হইলে চলিবে কেন ? শেষ মীমাংসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন, তাহা না করিলে, আপনাদের প্রতিষ্ঠিত বিধিব্যবস্থার অবমাননা করা হয়, আপনার ত সেরূপ করা উদ্দেশ্য নহে।" ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পুনরায় বলিলেন "All right Babu."

অধ্যক্ষের পদত্যাগপত্রসহ কমিটির মন্তব্য, সভাপতির মন্তব্য স্বাক্ষরে তদানীন্তন ডাইরেক্টর স্যার আল্‌ফ্রেড্ ক্রফ্ট বাহাদুরের দরবারে প্রেরিত হইল। জেলার কর্ত্তা চন্দ্রমোহন বাবুকে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন, "আপনি কলেজ পরিদর্শন জন্য এই জেলায় কয়েক দিনের জন্য অপেক্ষা করুন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিদ্যালয়ের পরিদর্শনকার্য্য চলিতে থাকুক।" সপ্তাহ অতীত হয় দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর তাহার তাগিদ্ দিলেন। নবম কি দশম দিবসে শিক্ষাবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ আসিল। সে আদেশ বড়ই চমৎকার।

ডাইরেক্টর বাহাদুর লিখিলেন "শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরই কেবল প্রথম শ্রেণীর কলেজ-পরিদর্শনের অধিকারী, তন্নিম্নস্থ কোন কর্ম্মচারী নিয়মানুসারে ঐরূপ পরিদর্শনের অধিকারী নহেন। এক্ষেত্রে কমিটির সভাপতি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ভ্রমবশতঃ ইন্‌স্‌পেক্টরকে কলেজ পরিদর্শনে অনুরোধ করায় কলেজের অধ্যক্ষ যদি শীলতা ও শিষ্টাচারের খাতিরে সভাপতির অনুরোধ রক্ষা করিতেন, বা এখনও করেন, ভালই; কিন্তু তাঁহার আপত্তি থাকিলে, নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ইনস্‌পেক্টর দ্বারা কলেজ পরিদর্শনে তাঁহাকে বাধ্য করিবার কাহারও অধিকার নাই। আর এক কথা এই যে, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল যত দিন কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষতা করিবেন, সে সময়ে কলেজ-কমিটি কলেজের শিক্ষাবিষয়ক আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিলেই ভাল হয়।"

এই আদেশ আসিবামাত্র ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সভাপতির পদ ত্যাগ করিলেন, তাঁহার স্থলে জেলার জজ বাহাদুরকে সভাপতি-পদে বরণ করা হইল। বোধ হয় সেই ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। অস্থায়ী ইন্‌স্‌পেক্টর চন্দ্রমোহন বাবুর আর কলেজ পরিদর্শন করা হইল না।

মহামান্য হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দুই জন ইংরাজ জজের সঙ্গে মিলিত বিচার-আসনে উপবিষ্ট হইয়া ঢাকার ষড়যন্ত্রবিষয়ক মোকদ্দমার আপিল শুনিতে ও বিচার করিতে আরম্ভ করেন। আপিলের সময়ে রাজপক্ষ-সমর্থনের ভার ছিল কাউন্সেল গার্থ সাহেবের উপর। গার্থ সাহেব আপিলের উদ্বোধন-অনুষ্ঠান কালে প্রাথমিক বক্তৃতায় কয়েকটা অবান্তর কথার উত্থাপন করিবামাত্র স্যার আশুতোষ বলিয়াছিলেন "মিষ্টার গার্থ, আপনি যাঁহার নামে গুরুতর অভিযোগ আরোপ করিতেছেন, তিনি কি এই আসামী দলভুক্ত?" উত্তরে গার্থ সাহেব বলিলেন "No, my lord." স্যার আশুতোষ তৎক্ষণাৎ বলিলেন "তবে তাঁহার নাম করিবার আপনার কি অধিকার আছে?" পুনরায় গার্থ সাহেব বলিলেন "আর, সি, দত্তের ভারতীয় ইতিহাস পাঠে এদেশের ছাত্রবৃন্দের মস্তিষ্ক বিগ্‌ড়াইয়া যাইতেছে।" স্যার আশুতোষ প্রশ্নের আকারে জিজ্ঞাসা করিলেন মিষ্টার গার্থ কোন্ ইতিহাস? যেখানি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত, সেই বইখানিকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বলিতে সাবধান হওয়া উচিত।" গার্থ সাহেব পুনরায় বলিলেন "শিবাজি দস্যুদলের নায়ক ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না।" স্যার আশুতোষ

উত্তরে বলিয়াছিলেন—"Was the Marhatta leader a greater robber than your Alexander the Great?" এইরূপ শিষ্ট বিশেষণে ভারতীয় জাতি সকলের মর্য্যাদাশালী লোকদিগকে ভারত-প্রবাসী বিদেশীগণ কালাকালবিচারশূন্য হইয়া আক্রমণ করিয়া থাকেন। নিরীহ ভারতসন্তান এ সব তিরস্কার নীরবে সহ্য করে।

ভাগ্যগুণে বিচারাসনে স্যার আশুতোষের ন্যায় আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানসম্পন্ন, উদারহৃদয়, তেজস্বী বিচারপতি উপবিষ্ট ছিলেন, তাই সমগ্র জাতির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য গার্থ সাহেবের বাক্যগঞ্জনার উপযুক্ত প্রতিবাদ হইয়াছিল এবং সাহেবও নীরব হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

স্যার আস্‌লি ইডেন যখন বঙ্গের ছোটলাট নিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মদেশ হইতে আলিপুরের রাজ-ভবনে পদার্পণ করেন, সে সময়ে তাঁহার বন্ধু-বর্গের সকলেই এক এক করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে বেলভিডিয়ারে পদার্পণ করিয়াছিলেন, যান নাই কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়। প্রসঙ্গক্রমে ছোটলাট স্যার এস্‌লি ইডেন রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের নিকট দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমার পুরাতন বন্ধুদের সকলেই আমার সংবাদ লইলেন, পণ্ডিত কেবল আমার কোন খোঁজ লইলেন না।" স্বর্গীয় পাল মহাশয় এই বহু সম্মানজনক আক্ষেপোক্তিতে আনন্দিত হইয়া আলিপুর হইতে প্রত্যাগমন কালে কাঁসাড়িপাড়ার মোড় হইতে গৃহে না গিয়া সেই দরবারের পোষাকেই বাদুরবাগানে বিদ্যাসাগরসদনে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পাল মহাশয়কে বলিলেন, "এ রাজবেশে আমার এখানে কেন?" রায় বাহাদুর বলিলেন "আমি বেলভিডিয়ারে গিয়াছিলাম। ইডেন সাহেব আপনার কথা বলায় আপনাকে কথাটা বলিতে আসিয়াছি। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন 'আমি বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া আসায় আমার পুরাতন বন্ধুদের সকলেই সংবাদ লইলেন, কেবল পণ্ডিত কোন সংবাদ লইলেন না।' আপনি কি একবার সাক্ষাৎ করিবেন না?" বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথা শুনিয়া "না রাম না গঙ্গা" একটি কথাও বলিলেন না। ক্রমশঃ অন্যান্য কথা পাড়িয়া রায় বাহাদুরের আদর আপ্যায়ন করিয়া বিদায় দিতেছেন, এমন সময়ে উৎকণ্ঠান্বিত রায় বাহাদুর পুনরায় বলিলেন "আপনি কথাটা গায় মাখলেন না, ব্যাপার কি?" "ব্যাপার কি শুনিতে চাও তবে একটু বসো" বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি শান্ত ও গম্ভীরস্বরে বলিলেন "তোমাদের দরকার আছে, তোমরা যাইতেছ, আমার কোন দরকার নাই, আমি কেন যাইব? ছোটলাটের কোন প্রয়োজন হইলে তিনি আমাকে সংবাদ দিতে পারেন। আমি অকারণ কেন দৌড়াদৌড়ি করিব?" রায় বাহাদুর বলিলেন "তিনি পুরাতন আত্মীয়তার অভিমান করিয়াই ঐ কয়টি কথা বলিয়াছেন।" উত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন "তিনি কি ঐ কথাগুলি আমাকে বলিবার জন্য তোমাকে অনুরোধ করিয়াছেন?" রায় বাহাদুর বলিলেন "আজ্ঞে না, তা তিনি বলেন নাই।" এইবার বিদ্যাসাগর একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তুমি কি মনে কর ইডেন্‌ সাহেবের পাঁচিলে আমার একচালা? যেমন তোমার মুখে শুনা, অমনি আলিপুরে দৌড়িব?

তোমায় তিনি অনুরোধ করেন নাই, আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি আমার নাম করিয়া ইডেন সাহেবকে বল পণ্ডিত এই কথা বলিয়াছেন।" রায় বাহাদুর বলিলেন "আজ্ঞে আমার দ্বারা ও কাজ হইবে না, আমি আপনাকে এ কথা বলিতে আসিয়া অন্যায় করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি তাঁকে এ বিষয়ে কোন কথাই বলিব না।"

এই ঘটনার কিছুকাল পরে কার্য্যবিশেষে উত্তর-পশ্চিমের ছোটলাট ও বঙ্গের ছোটলাট একদা বক্সারে দেখা সাক্ষাৎ করেন। তৎপরে বঙ্গের ছোটলাট ইডেন্ সাহেব মোগলসরাই ষ্টেশনের দীর্ঘ প্লাটফর্ম্মে পাইচারি করিতেছেন, এমন সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় কাশী হইতে আসিয়া মোগলসরাই ষ্টেশনে কলিকাতার গাড়ীতে চড়িয়া বসিতেছেন, ইডেন সাহেব তাহা দেখিয়াছেন। দেখিয়া ধীরে ধীরে পণ্ডিতের গাড়ীর দ্বারে আসিয়া গাড়ীর হাতল ধরিয়া দাঁড়াইলেন। চারি চক্ষের মিলন হইবামাত্র ইডেন সাহেব সুন্দর বাঙ্গালায় বলিলেন "আপনি আমাকে চিনিতে পারেন?" বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষণকাল মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন "না, চিনিতে পারিতেছি না ত।" সাহেব বলিলেন "আমি ইডেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন "কেমন করিয়া চিনিব? দেখাসাক্ষাৎ কতকালের কথা হইল, তখন তুমি লিক্‌লিকে ছোকরা ছিলে, এখন তুমি যেমন বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর, তেমনি তোমার চেহারাখানাও জাঁদরেল গোছের হয়েছে, সে চেহারাই নাই, আমি কেমন করে চিন্‌বো?" ইহার পরই বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন "তুমি কৃষ্ণদাস পালকে আমার বিষয়ে কিছু বলেছিলে?" সাহেব বলিলেন "হাঁ বলিয়াছিলাম।" "আমি যে উত্তর বলিয়াছিলাম তিনি বোধ হয় তোমাকে সে কথা বলেন নাই। আমি সর্ব্বাগ্রে সেটা তোমাকে বলি," বলিয়া তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথাগুলি ইডেন সাহেবকে বলিলেন। সাহেব "পাঁচিলে এক চালার" কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "বেশ উত্তর হয়েছে, এখন বেলভিডিয়ারে পায়ের ধূলা পড়িবে কবে?" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন "তোমার যে দিন ইচ্ছা সংবাদ দিলেই যাইব।" এরূপ ভাবের মর্য্যাদাবোধই এদেশের লোকসমাজে ফুটিয়া উঠিতে বিলম্ব আছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাও বাহাদুর সর্দ্দার সংসারচন্দ্র

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যাঁহারা কর্ম্মী, জীবনী-লেখক তাঁহাদিগের জীবনের ঘটনা-পরম্পরা অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তি বর্ণনা করিতে পারেন মাত্র, কিন্তু যে সাধনার বলে তাঁহারা এই সকল কর্ম্মে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন,—তাহা দেখান এক প্রকার সাধ্যাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিপুণ ব্যবচ্ছেদকের ছুরিকা দ্বারা মনুষ্যদেহের শিরা, পেশী প্রভৃতির যথাযথ

সংস্থান প্রকাশ করা যাইতে পারে মাত্র, কিন্তু তাহাতে মনুষ্যদেহে জীবনী-শক্তির স্থান কোথায় তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। সমালোচক কবিতার সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ করিতে পারেন মাত্র, কিন্তু সহস্র বিশ্লেষণেও কবিতার প্রাণ কোথায় তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না—তেমনি মনুষ্য-চরিত্রের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া আমরা কেবল তাহার প্রধান প্রধান উপাদান নির্দ্দেশ করিতে পারি—কিন্তু যে জীবনব্যাপী নিগূঢ় সাধনায় এই চরিত্র আপনাকে সম্পূর্ণ সফল করিয়াছিল,—তাহা কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। সংসারচন্দ্র সামান্য শিক্ষকতা হইতে ক্রমে ক্রমে জয়পুরের মত একটা বিশাল রাজ্যের মন্ত্রিত্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন,- আমরা ঘটনাবলি গ্রথিত করিয়া তাহা দেখাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু কেমন করিয়া যে তাঁহার প্রতিভা চারিদিক হইতে রস গ্রহণ করিয়া, ক্ষুদ্র বীজ যেমন বৃহৎ বনস্পতিতে পরিণত হয়, তেমনি আপনাকে পরিপুষ্ট করিয়া বিকশিত হইয়াছিল—জানি না কি প্রকার বিশ্লেষণে তাহা প্রকাশ করিব। সংসারচন্দ্রের জীবনী লিখিতে যে সহস্র ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে—সে সকল ত্রুটির ইহাই একমাত্র ওজুহাত।

এত দূর যাঁহারা ধৈর্য্যের সহিত পাঠ করিয়াছেন—সংসারচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের একটা ধারণা জন্মিয়াছে, আশা করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। তথাপি আমরা তাঁহার চরিত্রের প্রধান উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার জন্য এই পরিচ্ছদের অবতারণা করিয়াছি।

রাজনীতি ব্যাপারটি এমন যে, ধর্ম্ম-নীতির সহিত ইহার অহি-নকুল-সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যাঁহারা ধর্ম্মভীরু তাঁহারা যদি সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহার সামঞ্জস্য করা যে কতদূর কঠিন তাহা তাঁহারাই বুঝেন। সংসারচন্দ্র সম্বন্ধে কি রাজা, কি প্রজা, কি ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারী সকলেরই মুখে এই একটা কথা সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যাইত –"Oh! he is a God fearing man!"—এই ধর্ম্ম-ভীরুতাই তাঁহার চরিত্রের প্রধান উপাদান। তিনি অল্প বয়স হইতেই নানা দুঃখ-কষ্টের ঝঞ্ঝাবাতের মধ্য দিয়া "সাবধানে জ্বালায়ে অন্তর-প্রদীপখানি" সংসারের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু যে সর্ব্বকার্য্যনিয়ন্তা বিধাতা তাঁহাকে এই বিচিত্র কর্ম্মের মধ্যে বিবিধ পরীক্ষার মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনকে সফলতার দিকে লইয়া যাইতেছিলেন, তিনি সর্ব্বদা তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই দুর্গম পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। নানা প্রলোভন, নানা চক্রান্ত, "প্রতিদিনের কুশাঙ্কুর" প্রতি পদে তাঁহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে, কিন্তু তিনি তাঁহার অন্তরস্থিত দেবতার আদেশ-বাণী কখন অগ্রাহ্য করেন নাই—তিনি সেই "ভয়ানাং ভয়ম্ ভীষণং ভীষণানাম্"এর আদেশ প্রতিকার্য্যে অনুভব করিতেন। তিনি বলিতেন—জগদীশ্বর শুধু প্রেমময় নহেন—তিনি ভীষণং ভীষণানাম্। ইহাই তাঁহার চরিত্রের প্রধান উপাদান ; ধর্ম্মভীরুতা এবং জগদীশ্বরের উপর একান্ত নির্ভরতাই

তাঁহার চরিত্রকে অসামান্যতা প্রদান করিয়া তাঁহাকে সর্ব্ব দুঃখ, সর্ব্ব দৈন্য, সকল প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়া অসাধারণ চরিত্রবলে বলীয়ান্ করিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রের যাহা কিছু মহত্ব, এই ধর্ম্মভীরুতাই তাহার মূল প্রস্রবণ।

সংসারচন্দ্রের ধর্ম্ম-জীবনের মূল—তাঁহার স্বর্গীয় পিতার আদর্শ এবং উপদেশ। বাল্যকালে তিনি প্রতিদিন প্রাতে পিতার সহিত মন্দিরে গিয়া প্রণামাদি করিয়া আসিতেন এবং গৃহে নিজে পিতার অনুকরণে পূজাদি করিতেন। বালকের নিষ্ঠা ও ভক্তি দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইত। যৌবনে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশেষ অনুরাগী হয়েন। তখন বঙ্গদেশে এই নবধর্ম্মের যুগ—রাজা রামমোহন রায় যাহার ব্যাখ্যাতা ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যাহার সাধক এবং কেশবচন্দ্র সেন যাহার প্রচারক—সেই নবধর্ম্মের স্রোত বঙ্গদেশ হইতে সুদূর আগ্রা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, তাহার ফলে তখনকার অনেক শিক্ষিত যুবকই আগ্রার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিতেন, সংসারচন্দ্রও তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ লইয়া নিয়মিতরূপে এখানে আসিয়া উপাসনাদি করিতেন। তারপর যখন স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া গেলেন, তখন সংসারচন্দ্র প্রভৃতি যুবকগণ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সমাজে উৎসাহে যোগ দিলেন। এ সকল কথা আমরা পূর্ব্বে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছি। জয়পুর ব্রাহ্ম-সমাজ লোপ পাওয়ার পর সংসারচন্দ্র নিজে ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুসারে নিয়মিত উপাসনাদি করিতেন। ইহার কিছুদিন পরে সংসারচন্দ্রের জীবনে এক মহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিল। তাঁহার ভ্রাতা স্বর্গীয় ডাক্তার হেমচন্দ্রের শিক্ষাদাতা এক জন বৈদান্তিক পাঞ্জাবী সাধুর সহিত সংসার-চন্দ্রের ধর্ম্মালোচনা হইল—বহুক্ষণব্যাপী আলোচনার ফলে তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান হয়েন। এই সময় হইতে তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হিন্দুগৃহীর আদর্শ গ্রহণ করিয়া আপন জীবনে সেই সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং জীবনের প্রতিকার্য্যে তিনি হিন্দুর সেই আদর্শ অনুসারে চলিতেন।

এই ধর্ম্মানুরাগ তাঁহাকে ঈশ্বরের উপর যে একান্ত নির্ভরতা, যে সাহস, বিপদে যে অটল ধৈর্য্য, এবং প্রলোভনে আত্মরক্ষার যে অসীম ক্ষমতা দান করিয়াছিল—তাহা গৃহীর পক্ষে বিশেষতঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিতান্ত সুলভ নহে।

তাঁহার সাহস সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গীদিগের মুখে আজও নানা প্রকার গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। মহারাজ মাধোসিংহ অত্যন্ত শিকার প্রিয়। তিনি পূর্ব্বে প্রায়ই রাত্রে ব্যাঘ্র শিকার-করিতে যাইতেন। গভীর বনের ভিতর বৃক্ষের উপর শিকারীদিগের জন্য কয়েকটি 'মাচান' বাঁধা হইত। সংসারচন্দ্র শিকার করিতেন না; কিন্তু তাঁহাকে সঙ্গে না লইলে মহারাজের চলিত না। মাঝে মাঝে শিকার সম্বন্ধে অন্য শিকারীদের মহারাজের আদেশ দিবার প্রয়োজন হইত। সংসারচন্দ্রের উপরই সে সকল আদেশ বহন করিবার ভার পড়িত। তাঁহার সঙ্গীরা বলেন সেই ঘোর অন্ধকারে, গভীর বনের ভিতর যখন প্রতি মুহূর্ত্তে ব্যাঘ্র আসিয়া পড়ার সম্ভাবনা, সে সময় সংসারচন্দ্র সামান্য এক গাছি ছড়ি মাত্র হস্তে করিয়া

এক মাচান হইতে নামিয়া অন্য মাচানে যাইতেন, নির্ভীক সংসারচন্দ্রকে তাহারা কখন একটুও বিচলিত বা ত্রস্ত হইতে দেখে নাই। মহারাজ তাঁহাকে বন্দুক হাতে করিয়া যাইবার জন্য বলিলে তিনি একটু হাসিয়া বলিতেন "কি দরকার ?"

বাল্যকাল হইতে সংসারচন্দ্র নানা দুঃখ-কষ্ট, নানা শোকের মধ্যে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু শোকে দুঃখে কেহ কখন তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি দেখে নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার জীবনের একটা ঘটনা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া ইন্দুমতী তাঁহার একান্ত স্নেহের পাত্রী ছিলেন। ইন্দুমতীর স্বামী মেদিনীপুর জেলায় কাঁথিতে ওকালতী করেন। কয় দিন হইতে ইন্দুমতীর সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছিল। হঠাৎ একদিন প্রাতে ইন্দুমতীর পরলোক-গমনের সংবাদ আসিল, সংসারচন্দ্র তখন মহারাজের নিকট। এই নিদারুণ সংবাদ যে সংসারচন্দ্রকে মর্ম্মান্তিক আঘাত করিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য ; কিন্তু বাহিরে তাহার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। তিনি ধীর ভাবে আফিসের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি সম্পন্ন করিলেন। বাড়ী যাওয়া মাত্র তাঁহার সহধর্ম্মিণী ব্যাকুল হইয়া ইন্দুমতীর সংবাদ লইতে আসিলেন, সংসারচন্দ্র কোন কথা না কহিয়া নিজে স্নান আহার করিয়া বাড়ীর সকলকে স্নানাহার করাইলেন, তারপর সকলকে নিজের ঘরে ডাকিয়া ধীর ভাবে এই মর্ম্মান্তিক সংবাদ দিলেন এবং নানা প্রকার উপদেশ দিয়া সকলকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তাঁহার ধৈর্য্য দেখিয়া আর আর সকলে শান্ত হইল—তিনি আপন বলে শোকসন্তপ্ত পরিবারকে বলীয়ান্ করিলেন।

তাঁহার ধর্ম্মভীরুতা তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রের কত প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়াছিল—নানা কারণে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা সম্ভব নহে। একটা উদাহরণ দেই—মহারাজ মাধোসিংহের গদি প্রাপ্তির পর ১৮৮১ সালে তাঁহার সহিত গুজরাট প্রদেশের ধ্রাংধাড়া রাজকুমারীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব হয়। এই প্রস্তাব যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় সে জন্য ব্যারিষ্টার মিঃ কৃষ্ণরাও পাণ্ডুরাং ধ্রাংধাড়া রাজ-দরবার হইতে জয়পুর আগমন করেন। মিঃ কৃষ্ণরাও জয়পুরে আসিয়া তদানীন্তন রেসিডেণ্টের সহিত সাক্ষাতাদি করিয়া রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী, প্রধান প্রধান সর্দ্দার এবং রাজবাটীর কর্ম্মচারীদিগকে নানা কৌশলে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে কৃতকার্য্য হয়েন। সংসারচন্দ্র মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং মহারাজের উপর তাঁহার প্রতিপত্তিও যথেষ্ট—এই সকল কারণে মিঃ কৃষ্ণরাও তাঁহাকেও স্বপক্ষে আনিবার বিধিমত চেষ্টা করেন এবং যাহাতে এই শুভ-বিবাহ ঘটে তাহা করিতে পারিলে তাঁহাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করিবেন এমন প্রস্তাবও করেন। পুরস্কারের পরিমাণ দরিদ্র সংসারচন্দ্রকে প্রলোভিত করিতে পারিল না—তিনি সহাস্য বদনে এই বিপুল অর্থ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন—"যে পরিশ্রমে এবং মহারাজের অনুগ্রহে তিনি যাহা উপার্জ্জন করেন—তাঁহার সামান্য অভাবের পক্ষে তাহাই তিনি যথেষ্ট মনে করেন। এরূপ পুরস্কারে তাঁহার প্রয়োজন নাই। তবে তিনি এই

শুভ-বিবাহ যাহাতে ঘটে সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবেন। বিবাহ হইয়া গেল। এই ঘটনার বহুদিন পরে বোম্বায়ে কোন বন্ধুগৃহে সংসারচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র অবিনাশ-চন্দ্রকে দেখিয়া মিঃ কৃষ্ণরাও এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"তুমি জান না, তুমি কত বড় লোকের পুত্র; তোমার পিতা মানুষ নহেন, তিনি দেবতা।" (ক্রমশঃ)

প্রার্থনা

গাব তোমার সুরে
দাও সে বীণাযন্ত্র।
শুন্‌ব তোমার বাণী
দাও সে অমর মন্ত্র।
করব তোমার সেবা
দাও সে পরম শক্তি,
চাইব তোমার মুখে
দাও সে অচল ভক্তি।
সইব তোমার আঘাত
দাও সে বিপুল ধৈর্য্য,
বইব তোমার ধ্বজা
দাও সে অটল স্থৈর্য্য।

নেব সকল বিশ্ব
দাও সে প্রবল প্রাণ,
করব আমায় নিঃস্ব
দাও সে প্রেমের দান।
যাব তোমার সাথে
দাও সে দখিণ হস্ত,
লড়ব তোমার রণে
দাও সে তোমার অস্ত্র।
জাগ্‌ব তোমার সত্যে
দাও সেই আহ্বান,
ছাড়্‌ব সুখের দাস্য
দাও দাও কল্যাণ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পূর্ব্বরাগ *

শৃঙ্গার আর মাধুর্য্য মূলে একই বস্তু বলিয়াই, শরীরের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক এমন ঘনিষ্ঠ। আর মাধুর্য্যের কোনও অবস্থাতেই এই শারীর সম্বন্ধের একান্ত বিলোপ হয় না। নায়ক-নায়িকার পরস্পরের সম্বন্ধের উপরেই মাধুর্য্যরস ফুটিয়া উঠে। এই সম্বন্ধের প্রথম সূচনাকেই পূর্ব্বরাগ বলে। এই পূর্ব্বরাগ যে ভাবে নায়ক-নায়িকার স্নায়ুমণ্ডলকে অধিকার করিয়া, তাঁহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতর দিয়া আপনাকে ফুটাইয়া তোলে, তাহাকেই পূর্ব্বরাগের রূপ বলা যাইতে পারে।

রসশাস্ত্রে সচরাচর কেবল নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধেই পূর্ব্বরাগ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর পরস্পরের প্রতি প্রথম অনুরাগের সঞ্চার অবধি, প্রথম মিলন বা সম্ভোগ পর্য্যন্ত মাধুর্য্যের যে সকল অবস্থা ঘটে, এ ক্ষেত্রে তাহাকেই পূর্ব্বরাগ বলে। কিন্তু রসশাস্ত্রে এই পূর্ব্বরাগ-শব্দ বিশেষভাবে মাধুর্য্যের সম্পর্কেই ব্যবহৃত হইলেও, বাৎসল্যে বা সখ্যেতেও যে ইহার অনুরূপ একটা অবস্থা নাই, তাহা নহে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই, আপনার গর্ভস্থ ভ্রূণের প্রতি সন্তানসম্ভাবিতার অন্তরে একটা অপূর্ব্ব আসক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। ইহাই বাৎসল্যের পূর্ব্বরাগ। আর বাল্য-বন্ধুত্বের আস্বাদলাভ যার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, সে-ই সখ্যের পূর্ব্বরাগ-বস্তুটা যে কি, ইহাও জানে। মাধুর্য্যের মতন, বাল্য-বন্ধুত্বের ভিতরেও একটা রূপলালসা ও আসঙ্গ-লিপ্সা লুকাইয়া থাকে। পাঠশালায় শতাধিক বালক এক সঙ্গে পড়ে। ইহাদের মধ্যে হঠাৎ একদিন একটী বালকের মুখ দেখিয়া আর একটী বালকের প্রাণে একটা অভিনব অনুরাগের সঞ্চার হইল। ঐ মুখখানি ধ্যান করিতে তার আনন্দ হয়। এই বালকের সঙ্গ-লাভের জন্য তার অন্তরে একটা পিপাসা জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তখনও উভয়ের মধ্যে তেমন পরিচয় হয় নাই। পূর্ব্ব পরিচয় থাকিলেও তেমন ঘনিষ্ঠতা জন্মে নাই। তখনও ইহারা পরস্পরের সঙ্গে গলাগলি জড়াজড়ি করিতে আরম্ভ করে নাই; অথচ তাহা করিবার জন্য প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। এই যে অবস্থা ইহাই সখ্যের পূর্ব্বরাগ। এ অবস্থায় লালসা ও ভয়, সাহস ও লজ্জা, আস্থা ও সন্দেহ, এই সকল পরস্পর-বিরোধী ভাব প্রাণটাকে তোল্পাড় করিতে থাকে। এই লোভ ও ভীতি, আশ্বাস ও সন্দেহ মিলিয়া তার শরীর-মনে একটা চাঞ্চল্য ও উদ্বেগের সৃষ্টি করে। এই উদ্বেগ তার মুখে, এই চাঞ্চল্য তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়া, সখ্যরতির পূর্ব্বরাগের বিশিষ্ট রূপটীকে গড়িয়া তোলে। আর এই সখ্যরতি যখন খুব বলবতী হইয়া উঠে, তখন তাহাতেও মাধুর্য্যের পূর্ব্বরাগের মতন, স্বেদকম্পপুলকাদি সাত্ত্বিকীভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। প্রণয়ী

---

* রসের রূপ শীর্ষক প্রবন্ধাবলী বঙ্গদর্শনে ১৩১৯ সালের পৌষ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে—(১) বাৎসল্য—পৌষ; (২) দাস্য ও (৩) সখ্য—মাঘ; (৪) (৫) (৬) মাধুর্য্য—১৩২০—শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন।

জনের রূপ দেখিয়া, আর কখনও বা না দেখিয়াও, তাঁর রূপগুণের কথামাত্র শুনিয়াই, সখ্যের এবং মাধুর্য্যের পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হয়। কিন্তু বাৎসল্যের পূর্ব্বরাগের এরূপ কোনও প্রত্যক্ষ উদ্দীপনা থাকে না, থাকা অসম্ভব। তবে সন্তান ধারণ করিয়াই, সন্তান-সম্ভাবিতার শরীরের, বিশেষতঃ তাঁর স্নায়ু-মণ্ডলের, এমন সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ করে, যাহাতে অজাত সন্তানের প্রতিও গর্ভ-ধারিণীর অন্তরে একটা স্বাভাবিকী আসক্তি জন্মিতে থাকে। গর্ভস্থ ভ্রূণের বৃদ্ধির ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই আসক্তিও বাড়িয়া চলে, এবং সন্তানসম্ভাবিতা জননীর প্রাণে গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি একটা প্রবল মমতা জাগিয়া উঠে। এই মমতা হইতেই এই সন্তানের মুখ দেখিবার জন্য লালসার উদয় হয়। এই লালসায় তখন আসন্ন-প্রসবা জননীর সমুদায় শরীরকে যেন এক অভূতপূর্ব্ব রসে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। আর, যেখানে আশা সেইখানেই আশঙ্কা, যেখানে লোভ সেইখানেই ভয়, যেখানে ঔৎসুক্য সেইখানেই উদ্বেগ ও ভাবনা জাগিয়া উঠে। অজাত সন্তান সম্বন্ধে শত আশা, শত আশঙ্কা, শত সুখ-কল্পনা, শত দুঃখভীতি, এ সকলে মাতার মনকে অধিকার করিয়া, তাঁহাকে অধীর করিয়া তোলে। সন্তান বালক হইবে, না বালিকা হইবে; সুন্দর, সুস্থ, সুঠাম ও পূর্ণাঙ্গ হইবে, না কুৎসিত, রুগ্ন, অপূর্ণ ও বিকলাঙ্গ হইবে; সে দীর্ঘায়ু হইবে, না স্বল্পায়ু হইবে, এই সকল চিন্তায় মাতার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠে। এইরূপে কখনও কখনও সন্তানসম্ভাবিতাকে গর্ভস্থ শিশুর ধ্যানে তন্ময় করিয়া ফেলে। এই তন্ময়ত্বহেতু গর্ভবতী রমণীগণ কখনও বা অমনস্ক, কখনও বা সমনস্ক; কখনও বা চঞ্চল, কখনও বা ধীর; কখনও বা উৎফুল্ল, কখনও বা অবসন্ন ও বিষণ্ণ হইয়া পড়েন। আর এই ধ্যান খুব গভীর হইলে, অজাত সন্তানের ভাবনায় জননীর অঙ্গে হর্ষদৈন্যপুলকবিবর্ণাদি সাত্ত্বিকী ভাবেরও প্রকাশ হইতে পারে। সন্তানের জন্মের পূর্ব্বে, জননীর অন্তরে বাৎসল্যের এই সকল প্রকাশই, এই রসের পূর্ব্বরাগ। অতএব কেবল মাধুর্য্য বা শৃঙ্গার-রসেরই একটা পূর্ব্বরাগের অবস্থা আছে, সখ্যের বা বাৎসল্যের কোনও পূর্ব্বরাগ নাই, এমন বলা যায় না। তবে মাধুর্য্য সকল রসের সেরা ও সর্ব্বাপেক্ষা জটিল বলিয়া, প্রত্যেক অবস্থাতেই এই রসের মধ্যে যে অদ্ভুত শক্তি, আনন্দ এবং বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে, সখ্যে বা বাৎসল্যে যে তাহা হয় না, ইহাও অস্বীকার করা অসম্ভব।

রসতত্ত্ববিদেরা শ্রেষ্ঠনিকৃষ্টভেদে রসের পর্য্যায় নিরূপণ করিতে যাইয়া, প্রথমে সখ্য, তারপর বাৎসল্য, এবং সর্ব্বশেষেই মাধুর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহা সত্য। ব্যক্তিগত জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এ সকল রসকে পৃথক্ করিয়া, সকল রসের একটা সমীকরণ ও নিজস্ব-পর্য্যায়-নিরূপণ করিতে হইলে, যেটী অপেক্ষাকৃত সরল, তাহাকেই সকলের নিম্নে, আর যেটী সর্ব্বাপেক্ষা জটিল, তাহাকেই সকলের মাথায় বসাইতে হয়; ইহাও অস্বীকার করা যায় না। এবং—

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে বৈসে"—এই সূত্র ধরিয়াই আমাদের রসতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত-ভক্তেরাও বাৎসল্যকে মাধুর্য্যের পূর্ব্বে

এবং সখ্যের পরে বসাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের নিজ নিজ জীবনের বিবর্ত্তনধারাতে এই সকল রস, এই ক্রমের অনুসরণ করিয়া ফুটিয়া উঠে না। আমরা সকলের প্রথমে, যত সামান্য পরিমাণে হউক না কেন, দাস্যরসেরই আস্বাদন করিয়া থাকি। কারণ, আমাদের প্রথম আসক্তি পিতামাতার উপরে, কিম্বা পিতৃমাতৃস্থানীয় পরিচারক ও পরিচারিকার উপরেই জন্মিয়া থাকে এবং এই আসক্তির মধ্যে দাস্যরতির প্রাণ যে দুইটী বস্তু—ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ও আনুগত্য—সেই দুইটীই স্বল্পাধিক বিদ্যমান থাকে। আশ্রয়-আশ্রিত ভাবটা, অতি অলক্ষিতে হইলেও, শৈশবের পিতৃমাতৃভক্তির মধ্যে সর্ব্বদাই লুকাইয়া থাকে। তার পরে, বয়োবৃদ্ধি সহকারে, নবযৌবনের প্রথম মলয়নিঃস্বনে যখন শরীর-মনের কুঞ্জে কুঞ্জে নূতন প্রাণতা ও নূতন উল্লাস স্পন্দিত হইতে থাকে, এবং যখন আমরা, বাসন্তী বনস্থলীর ন্যায়, নিজেদেরে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠি; তখন ইচ্ছা হয়—

ঘর করি বাহির, বাহির করি ঘর,
পর করি আপন, আপন করি পর।

আর এই যে পরকে আপন করিবার আকাঙ্ক্ষা, ইহা হইতেই সখ্যরতির জন্ম হয়। বাসন্তী বনস্থলী যেমন আপনি আপনার অভিনব উল্লাস ও কর্ম্মচেষ্টার ভাব নিজে বুঝে না, কেন যে তার শুষ্ক তরু মুঞ্জরিয়া উঠে, নীরব আকাশ বিহগের কলকণ্ঠে ও ভ্রমরগুঞ্জনে সঙ্গীত-মুখরিত হইয়া উঠে, কেন যে কুঞ্জে কুঞ্জে ফুল ফুটে, চারিদিকে সৌরভ ছুটে, এ সকল কিছুই জানে না; আমরাও অনেক সময় প্রকৃতি দেবীর এই অপূর্ব্ব বসন্তোৎসবের বরণকিরণগন্ধে ও সঙ্গীত-ছন্দেই কেবল মুগ্ধ হইয়া থাকি, কিন্তু তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম যে কি, ইহার অনুসন্ধান করি না। সেইরূপ প্রথম-যৌবন-সঞ্চারে আমাদের শরীর-মনে যে অভিনব ভাবের উদয় হয়, তাহার আনন্দ এবং উল্লাসটুকুই কেবল আমরা অনুভব ও প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু তাহার ভিতরে যে নিগূঢ় কলাকৌশলটী লুকাইয়া আছে, তাহা ধরিতে চাহিও না, পারিও না। ফলতঃ প্রকৃত মর্ম্ম কিন্তু দু'এরই এক। ঐ বাহিরের নৈসর্গিকী বাসন্তী লীলার যে অর্থ, জীবের শরীর-মনের এই যৌবনলীলারও সেই অর্থ। দুই-ই এককে বহু করিবার, সঙ্কীর্ণকে বিস্তীর্ণ করিবার জন্য প্রকৃতির অদ্ভুত কলাকৌশল মাত্র। ভৃঙ্গের পায়ে জড়াইয়া, প্রজাপতির পালকে চড়াইয়া, উদ্ভিদেরা আপনার প্রাণ-কেশরগুলিকে বনময় ছড়াইবার জন্যই, রূপের হাট খুলিয়া, মধুগন্ধ বিলাইয়া, বাসন্তীলীলাতে নিযুক্ত হয়। আর আমরাও সখ্য ও মাধুর্য্য-রতিকে জাগাইয়া, তার সাহায্যে আপনাদিগকে বিশ্বময় ব্যাপ্ত করিবার আকাঙ্ক্ষাতেই, সজ্ঞানে এবং অজ্ঞানে, নবযৌবনের রূপরসের পসরা খুলিয়া বসি।

যৌবনের সূচনাতেই সখ্যরতির সঞ্চার হয়। তার পরে, যৌবনের প্রস্ফুট পূর্ণতায়, যাহা মাধুর্য্য-রসের ভিতর দিয়া পরিণতি লাভ করিবে,—সেই শ্রেষ্ঠবিদ্যারও এই সখ্যরতিতেই "হাতে খড়ি" আরম্ভ হয়। এই জন্য মাধুর্য্যের অনেকগুলি ভাববিভব এবং কলাকৌশল সখ্যেতেও ফুটিয়া উঠে। রূপ-লালসা এবং

আসঙ্গলিপ্সা মাধুর্য্যের প্রাণ। এই রূপ-লালসা এবং আসঙ্গলিপ্সা সখ্যেরও প্রধান প্রেরণা এবং উপজীব্য। দেহাশ্রয় ও রূপজ-মোহ ব্যতীত সখ্যরতির সঞ্চার হয়, এ কল্পনা অসত্য। যৌবনান্তে বা যৌবনের প্রথম উচ্ছ্বাসের নিবৃত্তি হইলেও বহুলোকের সঙ্গে আমরা অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হই বটে, এবং প্রচলিত ভাষায় অনেক সময় এই সকল আত্মীয়তার সম্বন্ধকে সখ্য নামও দিয়া থাকি; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ইহা সখ্যরতি নহে। সেবা, কল্যাণ-কামনা, চিন্তা ও ভাবের বিনিময়, সংসারের কর্ম্মে ও অবসরের আমোদ-প্রমোদে পরস্পরের সাহায্য —এ সকলই এই আত্মীয়তার সম্বন্ধের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তথাপি ইহা প্রকৃত সখ্য নহে। আর, এই সম্বন্ধের মধ্যে রূপের ভোগ ও একান্ত আসঙ্গলিপ্সা থাকে না বলিয়াই ইহাকে সখ্য বলা সঙ্গত নহে। প্রকৃত সখ্য কৈশোর-ধর্ম্ম। দেহের তারুণ্য ও লাবণ্য ইহার প্রধান উদ্দীপনা। বিগত-কৈশোরের প্রণয়ের সম্বন্ধেতে প্রণয়ী জনের দেহের প্রতি কোনও প্রকারের লোভ থাকে না। তাঁর হাতখানি ধরিয়া, সে স্পর্শসুখে নীরবে ডুবিয়া যাইবার কোনও সাধ, তাঁর অনাবৃত দেহের সুদৃঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার কোনও লালসা—হয় না। তাঁর অবিরল সান্নিধ্য লাভ না করিলে, কাছে থাকা ব্যর্থ হইয়া গেল, এমনটা মনে হয় না। অথচ এইগুলি সখ্যরতির নিত্যধর্ম্ম। এই ঘনিষ্ঠ দেহ-সম্বন্ধ-নিবন্ধনই সখ্যরতির মধ্যে আমরা মাধুর্য্যরসের পূর্ব্বাস্বাদ লাভ করিয়া থাকি। এই জন্যই সখ্যরতিরও ঠিক মাধুর্য্যের পূর্ব্বরাগের মতন একটা পূর্ব্বরাগের অবস্থা আছে।

আমাদের দেশের বৈষ্ণব সাহিত্যে সখ্য-বাৎসল্যাদি রসের যেমন অদ্ভুত ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হইয়াছে, জগতের আর কোনও সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত সেরূপ হইয়াছে বলিয়া জানি না ও শুনি নাই। আর আমাদের বৈষ্ণব-পদকর্ত্তাগণ এ সকল রসের রূপ যেমন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, অন্য কোনও কবি-সমাজ সেরূপ ফুটাইতে পারেন নাই। পূর্ব্বরাগ, মিলন, সম্ভোগ, মান, বিরহ, প্রভৃতির বর্ণনা যেমন বৈষ্ণব কবিতায় আছে, তেমন আর কোনও কবিতায় নাই। কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণও সখ্যের পূর্ব্বরাগের কোনও চিত্র অঙ্কিত করেন নাই। গোষ্ঠলীলায় সখ্যের সম্ভোগের এবং শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইলে শ্রীদামাদির বিরহের বর্ণনা বৈষ্ণব পদাবলীতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ রসের মধ্যেও যে পূর্ব্বরাগ এবং মানাদির প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহার কোনও চিত্র অন্ততঃ এপর্য্যন্ত আমার চক্ষে পড়ে নাই। অথচ এই রসের যে একটা পূর্ব্বরাগের অবস্থা আছে, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। আর এই পূর্ব্বরাগের সঙ্গে মাধুর্য্যের পূর্ব্বরাগের সাদৃশ্য অতিশয় ঘনিষ্ঠ।

দর্শন বা শ্রবণ এই দুই সূত্র অবলম্বনে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হয়। রূপ-দর্শন বা গুণ-শ্রবণ, এই দুই কারণেই,—যাঁর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম, কিম্বা গুণের কথা শুনিয়া যাঁর প্রতি প্রাণে একটা আসক্তির সঞ্চার হইল— তাঁর সঙ্গলাভের জন্য লোভ জন্মে। এই লোভেরই নাম পূর্ব্বরাগ। শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ

শ্রবণে চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হইয়াছে—

সই ! কেবা শুনাইল শ্যাম নাম ।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো !
আকুল করিল মোর প্রাণ ।
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো !
বদন ছাড়িতে নাহি পারে ।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো !
কেমনে পাইব সই, তারে ?

অন্যদিকে বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ মুখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎদর্শন হইতেই সঞ্জাত হয়—

নাহি উঠল তীরে, রাই কমলমুখী
সমুখে হেরল বর কান ।
গুরুজন সঙ্গে, লাজে ধনী নতমুখী
কৈছনে হেরয় বয়ান ।
সখিহে, অপরূপ চাতুরী গোরী !
সব জন তেজিয়া, আগুসরি ফুকরই
আড় বদন তঁহি ফেরি ।
তঁহি পুন মোতি হার টুটি ফেকল,
কহত হার টুটি গেল ।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনী কেল ।
নয়ন চকোর, কানুমুখ শশিবর
করল অমিয়া রসপান ।
দুহু দোহাঁ দরশনে, রসহুঁ পসারল
বিদ্যাপতি ভাল জান ॥

প্রথমে তাঁর নামগুণ শুনিয়া চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়াছেন, তারপর চিত্রপটে কৃষ্ণ-প্রতিকৃতি দেখিয়া, সে অনুরাগ বাড়িয়া যায় ; এবং সর্ব্বশেষে সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিয়া, সে রূপসায়রে কুলশীলমান ধরম-করম সকল বিসর্জ্জন দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। ফলতঃ দর্শন ও শ্রবণ দু'ই পূর্ব্বরাগের সমান বাহন। তবে উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদও আছে। বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকা ঐ প্রথম দর্শন-লাভের পরেই সখীকে কহিতেছেন :—

কি কহব রে সখি কানুক রূপ
কো পতিয়ায়ব স্বপন-স্বরূপ ।

কিন্তু চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকাকে কৃষ্ণরূপে যেমন পাগল করিয়া তুলিয়াছে, বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকাকে তেমন করিতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে, সাক্ষাৎদর্শনের পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকার মতন, বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকা সে রূপকে এমন করিয়া আপনার ধ্যানের বিষয় করেন নাই। চণ্ডীদাসের শ্রীমতী প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের নামগুণ শুনিয়া মুগ্ধ হন। এই নাম-গুণই তাঁর অনুরাগের প্রথম আশ্রয় ও উপজীব্য হয়। কিন্তু নাম শুনিয়া তিনি কেবল নাম লইয়াই পড়িয়া রহেন নাই—কেহই পড়িয়া রহে না। তিনি সেই নামকে আপনার জপমালা করিলেও, আপনার অন্তরে যে সহজ শ্রেষ্ঠতম রূপের আদর্শ ঘুমাইয়া ছিল, তাহাকে জাগাইয়া, সেই নামের উপরে আপনার নবীন অনুরাগের তুলিকা লইয়া সে নবীন রূপকে আঁকিয়া নামের সঙ্গে তারও ধ্যান আরম্ভ করিলেন। মানুষের প্রাণ, জগতের সকল রূপের সার ছানিয়া, আপনার মনের মাঝে তার নিজের সৌন্দর্য্যের আদর্শকে ফুটাইয়া তোলে ও জাগাইয়া রাখে। তার চক্ষে এ রূপের তুলনা জগতে মিলে না। আর আপনার অন্তরের এই অতুলনীয় রূপ

দিয়াই চণ্ডীদাসের শ্রীমতী শ্যামনামের উপরে শ্যামরূপের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তারপর চিত্রপট-দর্শন। পটের ধর্ম্মই এই যে, তাহা কোনও বস্তুর সমগ্রকে কিছুতেই প্রকাশ করে না ও করিতে পারে না। যে রূপ পটে ফুটিয়া উঠে, তার পশ্চাতে তার শতগুণ, সহস্রগুণ রূপ অস্ফুট থাকিয়া, কেবল যেন চারিদিকে উকি-ঝুঁকি মারিতে থাকে। প্রথমে যেমন নাম শুনিয়া সেই নামের উপরে শ্রীমতী আপনার অন্তরের সৌন্দর্য্যের ছবিটী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেইরূপ চিত্রপট দেখিয়াও সেই পটের অস্ফুট রূপের উপরে আপনার অন্তরের রূপের চিরন্তন আদর্শের রসান মাখাইয়া দিলেন। ইহার পরে যখন তাঁর সাক্ষাৎদর্শনলাভ হইল, তখন সে প্রত্যক্ষ রূপের সঙ্গে তাঁর বহুদিনের ধ্যানের রূপটী মিলিয়া মিশিয়া, ভিতরবাহির, চাক্ষুষ ও অচাক্ষুষ উভয়কে এক করিয়া দিল। বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া

কি কহব রে সখি কানুক রূপ !
কো পতিয়ায়ব স্বপনস্বরূপ !

ইহার চাইতে কোনও বড় কথা আর কহিতে পারিলেন না। তার পরে যাহা কিছু রূপবর্ণনা করিলেন, সকলই যেন ভাসা-ভাসা, কেবল কবিত্বের চাতুরী, উপমার ছলাকলা মাত্র। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা পূর্ব্ব হইতেই গভীর ধ্যানযোগে ও মানস-সম্ভোগের দ্বারা সে স্বপ্নকেই প্রত্যক্ষ ও সত্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। সুতরাং সাক্ষাৎদর্শনে তাঁর স্বপ্নাবেশ হইল না ; বরং তন্দ্রা টুটিয়া গিয়া সজাগ দৃষ্টিতে সে সত্যরূপ দেখিয়া, তিনি সজ্ঞানে তাহার পদে আপনার তনু-মন-প্রাণ সকলি সমর্পণ করিলেন। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকার দৃষ্টি পরিষ্কার, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আর ছায়ার মতন দেখেন নাই !

শ্যামের বদনের ছটার কিবা ছবি।
কোটি মদন জনু জিনিয়া শ্যামের তনু
উদইছে যেন শশী রবি।
সই কিবা সে শ্যামের রূপ
নয়ান জুড়ায় চেঞা।
হেন মনে লয়, যদি লোক ভয় নয়,
কোলে করি যেয়ে ধেঞা।

অন্যত্র—

জলদ বরণ কানু দলিত অঞ্জন জনু
উদয় হয়েছে সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর, পিতে করে উতরোল
নিমিখে নিমিখ নাহি সয়।
* * * * * *
দুইটী মোহন নয়নের বাণ
দেখিতে পরাণ হানে।
পশিয়া মরমে, ঘুচায়া ধরমে
পরাণ সহিত টানে।

দর্শন ও শ্রবণ—রূপদর্শন এবং নামগুণ-শ্রবণ—ইহা হইতেই পূর্ব্বরাগের জন্ম হয়। সখ্যের পূর্ব্বরাগ প্রায় সর্ব্বদাই রূপদর্শনে জাগ্রত হয়। মাধুর্য্যের পূর্ব্বরাগ দর্শন ও শ্রবণে—আর আমাদের দেশে বিশেষতঃ প্রিয়জনের নামগুণ শুনিয়াই জাগিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই পূর্ব্বরাগেরও একটা পূর্ব্বাবস্থা আছে। যৌবন ফুটিতেছে অথচ বাল্যও একেবারে চলিয়া যায় নাই, এই বয়ঃসন্ধি-কালেই সখ্যের পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হয়। এই সময়ে বাল্য-বন্ধু ও বাল্যসহচরীগণই আমাদের

প্রেমের প্রধান আলম্বন ও উপজীব্য হইয়া কেন। তখনও মাধুর্য্যের ভূমি প্রস্তুত হয় নাই। প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ—প্রজনন-হেতুই কাম বা কন্দর্প ভগবানের বিভূতিমধ্যে পরিগণিত হয়। আর এই প্রজনন-চেষ্টা হইতেই শৃঙ্গার বা মাধুর্য্য-রসের উৎপত্তি হয়। সুতরাং যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের শরীর-মনের অবস্থা প্রজনন-ক্রিয়ার উপযোগী হয় নাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে মাধুর্য্যের ভূমিও প্রস্তুত হয় না। অতএব স্ফুটনোন্মুখ যৌবন যেমন সখ্যরতির আশ্রয়, সেইরূপ প্রস্ফুট যৌবনই কেবল মাধুর্য্যের আশ্রয় হইয়া থাকে। যৌবন ফুটিবার পূর্ব্বে সখ্য-রতিই জন্মিতে পারে, কিন্তু মাধুর্য্য জন্মিতে পারে না। সেইরূপ আবার যৌবন একেবারে নিঃশেষ পরিণতি প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে আর প্রকৃত মাধুর্য্য ফুটিবার অবসর পায় না। যে সকল সমাজে অতীত-যৌবন-বিবাহ প্রচলিত, সেখানে আমাদের রস-শাস্ত্রে যাহাকে পূর্ব্বরাগ বলিয়াছেন, তার সত্য স্বরূপটী ভাল করিয়া ফুটিতে পারে না। একদিকে একটা বলবতী লালসা, অন্যদিকে একটা অজ্ঞাত, অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা,—এই দুই ভাব মিলিয়া যে গভীর উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে, তাহাই পূর্ব্বরাগের প্রাণ। জীবনের অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ভবিষ্যতের আশা ও আশঙ্কা সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে একটা স্বল্পবিস্তর স্থিরবুদ্ধি জন্মিতে আরম্ভ করে। আর পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল অবস্থার যেরূপ পরিণতি ঘটিয়াছে, এবারেও তাহার অনুরূপ অবস্থার সেইরূপ পরিণতিই ঘটিবে, এই যে ধারণা, ইহা হইতেই অনাগত বিষয়ে আমাদের উদ্বেগ কমিয়া আইসে। বয়োবৃদ্ধি সহকারে আমাদের সংসারের ভাবনা ও কর্ম্মচেষ্টা যতই প্রবল হউক না কেন, প্রথম বয়সের অসহ্য উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা যে ক্রমে কমিয়া আইসে, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। এবং এই জন্যই পরিণত যৌবনে বা যৌবনান্তে আমাদের জীবনে মাধুর্য্যের পূর্ব্বরাগ ফুটিয়া উঠিবার উপযোগী ভূমি ও অবসর প্রাপ্ত হয় না।

প্রথম যৌবনের সূচনায় আমরা একটা অনন্ত অজ্ঞাত রাজ্যের সীমাপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াই। আমাদের শরীরের মধ্যে তখন একটা অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ করে—এই অভিনব উল্লাস ও বিবর্ত্তন-স্রোতে আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইবে, ইহা আমরা তখনও জানি না। জানি কেবল একটা নূতন শক্তির জাগরণ, একটা নূতন আনন্দের সঞ্চার, একটা নূতন রূপের বিকাশ, একটা নূতন ভোগের পিয়াসা। এই যৌবন যখন আপনার নিঃশেষ পরিণতি প্রাপ্ত হয়, এই বিকাশ যখন বন্ধ হইয়া যায়,—ইন্দ্রিয়ের লালসা মাত্র তখন থাকে, কিন্তু পূর্ব্বকার সে রস বা রোম্যান্স-টুকু আর থাকে না। ফলতঃ অজ্ঞাতের আশ্রয় ব্যতীত কোথাও সত্য রস বা রোম্যান্স (Romance) ফুটিতে পায় না। অজ্ঞাতই রসের বা রোম্যান্সের নিত্যভূমি। যে দম্পতি পরস্পরকে একান্তভাবে জানিয়া ফেলিয়াছেন, যাহাদের পরস্পরের চক্ষে পরস্পরের রূপের, গুণের, চিন্তার, ভাবের, আচার-আচরণের মধ্যে অজানা কোনও কিছু থাকে না,—যাঁরা পরস্পরের সম্বন্ধে সত্যভাবে সর্ব্বদা ইহা অনুভব করেন না যে—"জানি

জানি মনে জানি, কিন্তু আমি জানিনে"
চিনি চিনি মনে চিনি, কিন্তু আমি চিনিনে"—
তাঁদের দাম্পত্য সম্বন্ধের রস বা রোম্যান্স (Romance) আর থাকে না। যতদিন ঐ অজানা জগৎটা পরস্পরের রূপের, গুণের, আচার-আচরণের মধ্যে একে অন্যের চক্ষে নিয়ত জাগিয়া থাকে, ততদিনই প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের দাম্পত্য-প্রেমে মাধুর্য্য-রস বিদ্যমান থাকে। সব জানা হইয়া গেলে, কামের সন্ধুক্ষণ-নিবৃত্তি না হইলেও, প্রেমের সন্ধান আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তখন নিতান্ত সাধুলোকের মধ্যেও, প্রেমের ডোর ছিঁড়িয়া গিয়া, কেবল সংসারের কঠোর কর্ত্তব্য বন্ধন মাত্র অবশিষ্ট রহে। কেবলমাত্র কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য, কিম্বা শুদ্ধ প্রজননক্রিয়া-সম্পাদনার্থে যৌবন একান্ত আবশ্যক নহে। কিন্তু মাধুর্য্যের জন্য তাহা নিতান্তই প্রয়োজন। এই জন্যই চণ্ডীদাস কিশোরা-কিশোরীর যুগল-মূর্ত্তিকে মাধুর্য্যের আধার ও আশ্রয় বলিয়াছেন।

কিশোরা কিশোরী দুইটি জন।
শৃঙ্গার রসের মূরতি হন।

কিন্তু এখানে কিশোরা-কিশোরী বলিতে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বালিকা বুঝিলে চলিবে না। প্রচলিত বাঙ্গালা অভিধানে একাদশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্তই কৈশোরকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণবপদ-কর্ত্তাগণের, বিশেষতঃ বিদ্যাপতি ঠাকুরের, পরিভাষায় ইহাকে কৈশোর না বলিয়া বয়ঃ-সন্ধি বলাই সমধিক সঙ্গত। আর বয়ঃসন্ধি-কালে সখ্যরতিরই সঞ্চার ও বিকাশ সম্ভব, মাধুর্য্যরসের স্ফূর্ত্তি অসম্ভব। ফলতঃ চণ্ডী-দাসের পদাবলীতেও শ্রীমতীর যে রূপবর্ণনা আছে, তাহা হইতে তাঁহাকে কোনও মতেই অপ্রাপ্তবয়স্কা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহা দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকার ছবি নহে, কিন্তু প্রস্ফুট-যৌবনা রমণীরই ছবি।

তাড়িত বরণী, হরিণ নয়নী
দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে।
কিবা বা দিঞা, অমিয়া ছানিয়া,
গড়িল কোন বা রাজে॥
সই, কিবা সে সুন্দর রূপ।
চাহিতে চাহিতে, পশি গেল চিতে,
বড়ই রসের কূপ॥
সোণার কটোরি, কুচযুগ গিরি
কনক মন্দির লাগে।
তাহার উপরে চূড়াটি বসাল
সে আর অধিক ভাগে॥

অন্যত্র—

সজনি ও ধনি কে কহ বটে।
গোরোচনা গোরী, নবীন কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
শুনহ পরাণ, সুবল সাঙ্গাতি
কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে, বসি তার নীরে,
পায়ের উপরে পা॥
অঙ্গের বসন, কৈরাছে আসন
আলাঞা দিয়াছে বেণী।
উচ কুচ মূলে, হেমহার দোলে,
সুমেরু শিখর জানি॥

আবার অন্যত্র আছে—

থির বিজুরী বদন গোরী
পেখনু ঘাটের কূলে।

কানড়া ছাঁদে, কবরী বান্ধে
নবমল্লিকার মালে॥
সই মরম কহিনু তোরে।
আড় নয়নে ঈষৎ হাসিয়া
আকুল করিল মোরে॥
ফুলের গেড়ুয়া, লুফিয়া ধরয়ে,
সঘনে দেখায়ে পাশ।
উচ কুচ যুগ, বসন ঘুচায়ে
মুচকি মুচকি হাস॥

অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর রূপ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন :—

শ্রীফল যুগল, জিনি কুচ যুগ
পাতলা কাঁচলি তাহে।
তাহার উপরে, মণিময় হার
উপমা কহিব কাহে॥

শ্রীকৃষ্ণমুখে শ্রীমতীর রূপ-বর্ণনার সকলের শেষ পদটী এই—

কনক বরণ কিবে দরপণ
নিছনি দিয়ে যে তার।
কপালে ললিত, চাঁদ শোভিত
সিন্দুর অরুণ আর।
সই, কিবা সে মধুর হাসি।
হিয়ার ভিতর, পাঁজর কাটিয়া
মরমে রহল পশি॥
গলার উপর, মণিময় হার
গগন মণ্ডল হেরু।
কুচযুগ গিরি, কনক গাগরী,
উলটি পড়ল মেরু॥
গুরু উরুতে, লম্বিত কেশ—
ইত্যাদি।

নায়কের পূর্ব্বরাগের বর্ণনায়, চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের মুখে শ্রীরাধিকার যে রূপের বর্ণনা এখানে করিয়াছেন, প্রচলিত অর্থে তাহা কৈশোর রূপ হইতেই পারে না। একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্তও অঙ্গ-গঠনের এতটা বিকাশ প্রায় হয় না। গুরুনিতম্ব, পীনপয়োধর প্রভৃতি প্রস্ফুটযৌবনেরই লক্ষণ, বিকাশোন্মুখ যৌবনে ইহা পাওয়া যায় না। অতএব চণ্ডীদাসের কৈশোর কাল কিছুতেই একাদশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করা যায় না। কদাচিৎ কোনও স্থলে চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকার মধ্যে এতটা অসাধারণ অঙ্গবিকাশ দেখা গেলেও, সচরাচর আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ এবং শীতপ্রধান য়ুরোপে অষ্টাদশ হইতে বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্তই চণ্ডীদাস কৈশোর-নামে যে প্রস্ফুট যৌবনের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত কাল বলিয়া নির্ণয় করিতে হয়। চণ্ডীদাসের কিশোরী অনুদ্ভিন্নযৌবনা বা সদ্যোভিন্নযৌবনা নহেন, কিন্তু প্রস্ফুট বা বিকশিতযৌবনা। তাঁহার কিশোরও সেইরূপ বালক নহেন, কিন্তু যুবক। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের যে রূপের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেই ইহার সম্পূর্ণ প্রমাণ-পরিচয় পাওয়া যায়। সাক্ষাদ্দর্শনের পরে শ্রীমতী সখী সম্বোধনে বলিতেছেন—

সই এমন সুন্দর বর কান।
হেরিয়া সেই মুরতি, সতী ছাড়ে নিজ পতি
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান॥
এ বড় কারিকরে কুঁদিলে তাহারে
প্রতি অঙ্গে মদনের শরে।
যুবতী ধরম, ধৈর্য্য ভুজঙ্গম
দমন করিবার তরে॥

অতি সুশোভিত, বক্ষ বিস্তারিত
দেখিনু দর্পণাকার।
তাহার উপরে মালা বিরাজিত
কি দিব উপমা তার॥
নাভির উপরে, লোমলতাবলী
সাপিনী আকার শোভা।
ভুরুর বলনী, কামধনু জিনি
ইন্দ্রধনুকের আভা॥

আর একবার শ্রীমতী কৃষ্ণরূপ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—

অতি সে শোভিত, বক্ষঃ বিস্তারিত
দেখিয়ে দর্পণাকার।
তাহার উপরে মাল, শোভি আছে ভাল
উপজে মদন বিকার॥
নাভির উপরে জনু, তমাল জিনিয়া তনু
দলিত অঞ্জন জিনি আভা।
বড় কারিকর, কুন্দিয়াছে ভাল
বাম কদলী শোভা॥

অন্যত্র—

বিম্বফল জিনি কে বা, ওষ্ঠ গড়ল রে,
ভুজ জিনিয়া করি-শুণ্ড।
কম্বু জিনিয়া কে বা, কণ্ঠ বনাইল রে,
বিস্তারি পাষাণে কে বা, রতন বসাইল রে,
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
দাম কুসুমে কে বা, সুষমা করেছে রে,
এমতি তনুর দেখি আভা॥
আচলি উপরে কে বা, কদলি রোপল রে,
ঐছন দেখি উরুযুগ।
অঙ্গুলি উপরে কে বা, দর্পণ বসাইল রে,
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগ॥

যেমন শ্রীমতীর গুরুনিতম্ব পীনপয়োধর প্রভৃতি, প্রচলিত অভিধানে যাহাকে কৈশোর বলে, তাহার লক্ষণ নহে; সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিস্তারিত বক্ষ, নাভি, লোমলতাবলী, কদলি-সম উরুযুগ, এই সকলও কৈশোরের ছবি নহে। চণ্ডীদাসের শ্রীমতীর রূপবর্ণনা ও শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা উভয়ই তাঁর নায়ক-নায়িকার কোমল কৈশোরের নহে, কিন্তু প্রস্ফুট যৌবনেরই প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করিয়াছে। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে যেমন, বিদ্যাপতির পদাবলীতেও সেইরূপই, প্রথম দর্শনের পরে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা পরস্পরের যে রূপের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের কৈশোরাবস্থার নহে, কিন্তু প্রস্ফুটযৌবনেরই পরিষ্কার প্রমাণ-পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম দর্শনের পরে বিদ্যাপতির শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার রূপ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—

উরহি অঞ্চল, কাঁপই চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভবে, শারদ ঘন জনু
বেকত কয়ল সুমেরু॥

অন্যত্র বলিতেছেন—

গিরিবর গুরুয়া, পয়োধর পরশিত
গীম গজমতি-হারা।
কামকম্বু ভরি, কনয়া শম্ভুপরি
ঢারত সুরধুনী-ধারা॥

আবার—

অপরূপ-রূপ রমণী মণি।
যাইতে পেখনু গজরাজ-গমনি ধনী॥
সিংহ জিনিয়া মাঝারি খিনি,
তনু অতি কোমলিনী
কুচ-ছিরি-ফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি॥

পীনপয়োধর, গুরুনিতম্ব, সরুভাঙ্গ,—এ

সকলের কোনটাই কৈশোর-লক্ষণ নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাপতি পূর্ব্বরাগ বর্ণনার পূর্ব্বেই বয়ঃসন্ধির বর্ণনা করিয়া, পূর্ণ ও প্রস্ফুট যৌবনের পূর্ব্বে যে মাধুর্য্যের সঞ্চার অসম্ভব ইহা স্পষ্টতঃই বলিয়া গিয়াছেন। অতএব বৈষ্ণবপদকর্ত্তাগণের কিশোর-কিশোরীকে আধুনিক বাঙ্গালা অভিধানের অর্থে অপ্রাপ্ত-বয়স্কা বা অস্ফুটযৌবনা মনে করা কোনও মতেই সঙ্গত নহে। তাঁহাদের রাধাকৃষ্ণের লীলা-বর্ণনার সঙ্গে এই অর্থের কোনও প্রকারের সঙ্গতি হয় না।

ফলতঃ প্রচলিত বাঙ্গালা অভিধানে যাহাকে কৈশোর বলে, বিদ্যাপতি তাহাকেই বয়ঃসন্ধি বলিয়াছেন। এই কৈশোরে বা বয়ঃসন্ধিকালে সখ্যরতিরই জন্ম হয়, মাধুর্য্য জন্মে না। এই কৈশোরে মানুষ জানা ও অজানার, জ্ঞাত ও অজ্ঞাতের গোধূলী লগ্নে আসিয়া দাঁড়ায়। অজ্ঞাতের ছটা আসিয়া তখন যাবতীয় জ্ঞাতকে উদ্ভাসিত করিতে আরম্ভ করে। উন্মেষোন্মুখ যৌবনের প্রথম মলয়-নিশ্বাসে তখন একটা অভিনব রূপ-লালসা ও আসঙ্গলিপ্সা শরীর-মনকে চঞ্চল করিতে আরম্ভ করে। তখনও কিন্তু জননে-ন্দ্রিয়ের স্ফূর্ত্তি হয় নাই। প্রজনন-প্রয়োজনে প্রস্ফুট যৌবনে জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে পূর্ণতাপ্রাপ্তি অত্যাবশ্যক, সে পূর্ণতা তখনও ফুটিয়া উঠে নাই; তার অঙ্কুর মাত্র সবে জাত হইতেছে। ভিতরে ভিতরে তখন সবে এই নবযৌবনের সাড়া পড়িয়াছে, কিন্তু এই সাড়ার মর্ম্ম সম্যক উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। এই বয়ঃকালকেই আমাদের দেশের রসতত্ত্ব-বিদেরা বয়ঃসন্ধি বলিয়াছেন। তখন মানুষ না পুরুষ না স্ত্রী; না রমণ, না রমণী। এই বয়ঃসন্ধিকালই সখ্যরতির উপযোগী যুগ। এই বয়ঃসন্ধিকালেই ইংরেজিতে যাহাকে school-boy কিম্বা school-girl love বা friendship বলিয়া থাকে, তার জন্ম হয়। তখনও মাধুর্য্যের আশ্রয় যে শৃঙ্গাররতি তার প্রেরণা জাগে নাই, অথচ উষার প্রথমতম আভাসের মতন, এই অপূর্ব্ব, অজ্ঞাত রসের একটা ঈষৎ-আভা শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন আমরা নিজেরাই নিজেদেরে চিনি নাই ও বুঝি না; কেবল প্রতিদিন নূতন নূতন রূপরসের বিকাশ অনুভব করিয়া কেমন একটা অজানাভাবে বিভোর হইতে আরম্ভ করিয়া নিজেদের দেহেতে এই উন্মেষোন্মুখ যৌবনের নিত্য নবরূপের স্ফূর্ত্তি দেখিয়া নিজেরাই বিস্মিত হইয়া, চকিত হইয়া, মুগ্ধ হইয়া, বারম্বার তাহারই ধ্যান করিতে থাকি। এই ধ্যান হইতে এই শরীরের প্রতি একটা অভিনব মমতা, এই দেহের স্ফূর্ত্তি ও কান্তি-সাধনের জন্য একটা অভিনব প্রসাধন-প্রয়াস প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সময়ে দর্পণ-সম্মুখে দাঁড়াইয়া, আমরা নিজেরা নিজেদের রূপেরই সম্ভোগ করিতে থাকি। এই রূপে তখনও অপর কাহারও অধিকার হয় নাই। ইহাই বয়ঃসন্ধির অবস্থা। এই অবস্থাতেই আমাদের শরীর-মনেতে ক্রমে ক্রমে মাধুর্য্যের ভূমি প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করে।

বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীকৃষ্ণের এই বয়ঃসন্ধির কোনও বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। অথচ রসের সকল রূপকে ভাল করিয়া ফুটাইতে হইলে, যেমন নায়িকার সেইরূপ

নায়কেরও বয়ঃসন্ধির প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করা আবশ্যক হয়। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই এই বয়ঃসন্ধির সঙ্গে পরবর্তী প্রস্ফুটযৌবনে মাধুর্য্যের পূর্ব্বরাগের যে সকল রূপ ফুটিয়া উঠে, তার অতি ঘনিষ্ঠ, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃসন্ধির কোনও ছবি বৈষ্ণব-পদাবলীতে না থাকিলেও, বিদ্যাপতি ঠাকুর শ্রীরাধিকার বয়ঃসন্ধির অতি অপূর্ব্ব প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। জগতের আর কোনও সাহিত্যে ইহার অনুরূপ কোনও কিছু পাওয়া যায় বলিয়া এখনও জানি নাই। আর পূর্ব্বরাগের সত্য রূপটী যে কি, ইহা ভাল করিয়া ধরিতে হইলে, প্রথমে এই বয়ঃসন্ধিকালে নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে সকল ভাব ফুটিয়া উঠে, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। কারণ এই সকল ভাবই প্রস্ফুট-যৌবনের তাড়িতসঞ্চারের দ্বারা রূপান্তরিত ও অর্থান্তরিত হইয়া, পূর্ব্বরাগের স্বরূপকে ফুটাইয়া তোলে। শৈশব ও যৌবনের মিলন-কালকেই এই বয়ঃসন্ধি বলা হয়।

শৈশব যৌবন দুহুঁ মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহুঁ লোচন নেল॥
বচনক চাতুরি, লহু লহু হাস।
ধরণীয়ে চাঁদ করত পরকাশ॥
নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।
হাসত, হাসত, পয়োধর হেরি॥
পহিল বদরীসম পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে অনঙ্গ উঝারয়ে অঙ্গ॥

অন্যত্র—

ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণ অনুসরই।
ক্ষণে ক্ষণে বসনধূলি তনু ভরই॥
ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে করু বাস॥
চমকি চলয়ে ক্ষণে, ক্ষণে চলু মন্দ।
মন্মথ পাঠ পাহল অনুবন্ধ॥
হৃদয়জ মুকুলি হেরি থোর থোর।
ক্ষণে আঁচর দেই, ক্ষণে হোয় ভোর॥

আবার—

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ দল বলে ধনি দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥
কবহুঁ বান্ধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি।
কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি॥
থির নয়ন অথির কছু ভেল।
উরজ-উদয় থল লালিম দেল॥
চরণ চঞ্চল, চিত চঞ্চল ভাণ।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥

তার পরে যখন যৌবন আর একটু ফুটিয়া উঠিল, তখন এ সকল ভাবেরও একটু পরিবর্ত্তন ঘটিল।

আওল যৌবন শৈশব গেল।
চরণ চপলতা লোচন নেল॥
করু দুহুঁ লোচন দূতক কাজ।
হাস গোপত ভেল, উপজল লাজ॥
অব অনুখন দেই আঁচরে হাত।
সগর বচন কহু নত করু মাথ॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
চলইতে সহচরী কর অবলম্ব॥

তার পরে, যৌবন যখন আরো প্রস্ফুট হইল তখন—

দিনে দিনে পয়োধর ভৈগ গেল পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল ক্ষীণ॥
অবহি মদন বাঢ়ায়ল দীঠ।
শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ॥

কেমন করিয়া ধীরে ধীরে শৈশব সরিয়া যায় ও যৌবন আসিয়া তার স্থান অধিকার করে, বিদ্যাপতি ঠাকুরের শ্রীরাধিকার এই বয়ঃসন্ধির চিত্রেতে তাহা অতিশয় বিশদভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর

"জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান"

এই পদেতে বিদ্যাপতি ঠাকুর এই বয়ঃসন্ধির সঙ্গে মাধুর্য্য বা শৃঙ্গারের সম্বন্ধ কি ও কতটুকু ইহা অদ্ভুত কলাকুশলতা সহকারে ব্যক্ত করিয়াছেন। শৈশবে আমাদের দেহমনে মদনের কোনও সাড়া পড়ে না। শৃঙ্গার বা মাধুর্য্য কাকে বলে তখন আমরা তার কোনও কিছুই জানি না। কিন্তু এই বয়ঃসন্ধিকালে, আসন্ন যৌবনের পূর্ব্বভাগে শরীর-মনের যখন একটা নূতন বিকাশ আরম্ভ হয়, তখনই প্রথমে মনসিজ জাগিতে আরম্ভ করে—কিন্তু চক্ষু খোলে না। ভিতরে ভিতরে তার জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু বহিশ্চৈতন্যের প্রকাশ হয় নাই। ফলতঃ কোনও বিশিষ্ট মানুষী রূপের প্রেরণা ব্যতীত মনসিজ কখনও এই বহিশ্চৈতন্য লাভ করে না। এইরূপ চাক্ষুষই হউক বা কেবল কল্পিতই হউক,—ইহার প্রেরণা মনসিজের নয়নোন্মীলনের জন্য অত্যাবশ্যক। আর কল্পিতরূপও প্রত্যক্ষের আশ্রয় ব্যতীত ফুটে না। কারণ স্থানবিশেষে, কালবিশেষে, আধারবিশেষে যে রূপ প্রত্যক্ষ হয়, অন্যস্থানে, অন্যকালে, অপর আধারে, যেখানে তাহা প্রত্যক্ষ নাই, সেখানে তার আরোপ বা অধ্যাস করিয়াই আমরা সর্ব্ববিধ কল্পিত রূপের সৃষ্টি করিয়া থাকি। এইরূপে বিশেষ রূপের প্রত্যক্ষ বা কল্পনা ব্যতীত মনসিজের মুদিত-নয়ান খোলে না। বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকার জাগ্রত কিন্তু নিমীলিতনেত্র মনসিজ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্দর্শনে চক্ষু মেলিয়াছে। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকার মনসিজের এই নিমীলিত নেত্র প্রথমে শ্রীমতীর অন্তরের ধ্যানমূর্ত্তি ভাবিয়া, ও পরে চিত্রপটে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার সাক্ষাদ্দর্শনলাভে উত্তরোত্তর পরিষ্কার হইয়া খুলিয়া যায়। কিন্তু উভয়-ক্ষেত্রেই বয়ঃসন্ধিকালে ইহা জাগ্রত অথচ নিমীলিতনেত্র হইয়া ছিল।

বিদ্যাপতি ঠাকুর পূর্ব্বরাগের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে শ্রীমতীর বয়ঃসন্ধির এই অনুপম চিত্র অঙ্কিত করিয়া, মাধুর্য্যের উৎপত্তি কেমন করিয়া হয়, শরীরের ও স্নায়ুমণ্ডলের কোন্ অবস্থাকে কিরূপে কোন্ দিক দিয়া অবলম্বন করিয়া এই উন্নত উজ্জ্বল রসশ্রী তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে, ইহার বিবর্ত্তন-ইতিহাস এবং মনস্তত্বটীও অতি পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। এইখানেই আমরা পূর্ব্বরাগের মনস্তত্ত্বের বা psychology'র সন্ধান প্রাপ্ত হই। আর এইখানেই আমরা অতি পরিষ্কাররূপে এটী দেখি যে, প্রস্ফুট যৌবনে ভিন্ন মাধুর্য্যের সত্য আশ্রয়ের প্রতিষ্ঠা হয় না। শ্রীরাধিকার যখন—

দিনে দিনে পয়োধর ভৈ গেল পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল ক্ষীণ॥
অবহি মদন বাঢ়ায়ল দীঠ।
শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ॥

আর এইরূপে শৈশব-যৌবনের দ্বন্দ্বেতে যখন যৌবন সম্পূর্ণ জয়লাভ করিল এবং শৈশব সদলবলে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল,—অর্থাৎ যৌবনের পূর্ণ ও অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব যখন তাঁর দেহ-মনের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইল,—তার পরেই যমুনা-স্নানে যাইয়া কানু-দরশনে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হইল।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

স্বর্গীয় জগদীশনাথ রায়

বুড়া বয়সে কলম ধরিতে যাওয়াই এক প্রকার বিড়ম্বনা। লিখিতে বসিলে সব কথা সকল সময়ে ঠিক মনে আসে না.—আর যদিই বা আসে, ভাল করিয়া গুছাইয়া লেখা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু তা' বলিয়া জগদীশ বাবুর জীবনবৃত্তান্ত বাদ দেওয়া চলে না। সুতরাং যেখানে যেখানে ত্রুটি ঘটিয়াছে, পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন।

জগদীশ বাবু যখন নোয়াখালিতে, তখন সেই বিভাগে ডরাণ্ট বলিয়া একজন সিভিল-সার্জ্জন ছিলেন, পানাধিক্যের জন্য সাহেবেরা কেহই তাঁহাকে সুচক্ষে দেখিতেন না, ইনি জগদীশ বাবুর শরণাপন্ন হন, জগদীশ বাবুও ইঁহাকে সহায়তা করিতেন। একদিন সন্ধ্যার পর জগদীশ বাবুর নিকটে আসিয়া কি চাহেন, জগদীশ বাবু তাহা দিতে স্বীকৃত হন নাই, তাহাতে রাগান্ধ হইয়া হস্তস্থিত একটা 'ছপ্‌টি'র দ্বারা জগদীশ বাবুকে আঘাত করিতে যান, ছপ্‌টির অগ্রভাগ জগদীশ বাবুর মুখে লাগে, তিনি ইঁহার মত্ততার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, অন্য কোনও প্রতিবিধান না করিয়া, আর্দ্দালিদের কেবল উঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হুকুম দেন, আর্দ্দালিরা বাহিরে লইয়া গিয়া কিছু শাস্তি দেয়, সাহেব প্রাণভয়ে পলায়ন করে।

লেফ্‌টেনাণ্ট গবরণর গ্রে সাহেব এ কথা জানিতে পারিয়া, একেবারে ডরাণ্টকে ডিস্‌মিস করেন, নোয়াখালি হইতে আসে, তাহার এমন সংস্থান ছিল না, সুতরাং জগদীশ বাবুর নিকট সহায়তা প্রার্থনা করে, জগদীশ বাবু তাহার পূর্ব্ব ব্যবহার ভুলিয়া গিয়া অর্থ সাহায্য করিয়া তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন, এ রকম উদারতা আজকাল বিরল।

একবার জগদীশ বাবু ময়নাগড়ের রাজা ও তাঁহার দল-বল লইয়া কাঁচড়াপাড়ায় যাইতে-ছিলেন, শিয়ালদহ ষ্টেশনে পুলিশ-বিভাগের ইনস্পেক্টার জেনেরাল কর্ণেল জিউ, ডেপুটী ইনস্পেক্টার জেনেরাল কর্ণেল গর্ডন, পারসনাল আসিষ্টাণ্ট মেজার হাইলাকিন্‌সন এবং অপরাপর সাহেব পুলিস-কর্ম্মচারীদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, তাঁহারা জগদীশ বাবুকে প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি অম্লান বদনে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটগুলি দেখাইয়া উত্তর করিলেন "আমার বন্ধুদের লইয়া কাঁচড়াপাড়ায় যাইতেছি এবং তৃতীয় শ্রেণীর এই টিকিটগুলি ক্রয় করিয়াছি।" কয়জন এ অবস্থায় পড়িলে সত্যকথা বলিতে সাহসী হইতেন?

যখন জগদীশ বাবু নোয়াখালিতে, তখন হুইনফিল্‌ড্ বলিয়া একজন ইংরাজ সিভিলিয়ান কলেক্টর ছিলেন, নিমকসংক্রান্ত কোন বিষয় তাঁহার জানিবার আবশ্যক ছিল, সুতরাং রেভেনিউ বোর্ডে সেই তথ্য জানিবার জন্য লেখেন, আলানজোর্মনি তখন বোর্ডে নিমক বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন, তিনি উত্তর পাঠাইলেন 'নিমকের সম্বন্ধে কোন কথা জানিবার আবশ্যক হইলে বোর্ডকে লিখিতে হইবে না, ওখানে তোমার যে

পুলিশের কর্ত্তা আছেন, তিনি নিমকসম্বন্ধীয় বিষয়ে এত দক্ষ ও বিজ্ঞ যে, তিনি যাহা বলিবেন সেই মতে যেন কার্য্য করা হয়, বোর্ডকে লিখিবার আবশ্যক নাই, বোর্ড ও গবর্ণমেণ্ট নিমক সম্বন্ধে জগদীশ বাবুর পরামর্শ লইয়া কার্য্য করেন।”

হুইন্‌ফিল্‌ড সাহেবের জগদীশ বাবুর উপর এত শ্রদ্ধাভক্তি বার্দ্ধিত হইল যে, তাঁহার স্ত্রীকে জগদীশ বাবুর সঙ্গে এক বোটে কলিকাতায় চিকিৎসার জন্ত পাঠাইয়া দিলেন. আজকাল এমত সৌহার্দ্দ্য বাঙ্গালী-ইংরাজের ভিতর দুর্লভ।

বালেশ্বরে থাকিবার সময় ইনি উড়িয়াদিগের উচ্চ শিক্ষা দিবার এবং সরকারী কার্য্যে স্তুক্তি কারবার সুব্যবস্থা করেন; বাঙ্গালারা তখন উড়িয়াদের সুচক্ষে দেখিতেন না, এমন কি উড়িয়া ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা ছিল না, জগদীশ বাবু উড়িয়াদের নিমন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করিলেন.তাহাতে বাঙ্গালীরা মনে মনে বিরক্ত হইলেন, যদিও প্রকাশ্যে কোন কথা বলিতে কেহ সাহসী হন নাই। এই সম্বন্ধে বাবু ফকিরমোহন সেনাপতি, বাবু গোবিন্দ দাস এবং মহারাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর অনেক কথা বলিতে পারেন। জগদীশ বাবুর উত্তেজনায় ডিভিসনাল্‌ কমিশনার রেভেনসা সাহেব স্থানীয় সাহেবদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, উড়িয়াদিগকে উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন এবং তাঁহার পরেই রেভেনসা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। জগদীশ বাবুর পরামর্শ মত চাঁদবালী বন্দর খোলা হয়, উড়িষ্যার পথে তখন চোর-ডাকাতের বড় ভয় ছিল, যাত্রীদের কাপড়-চোপড় কাড়িয়া কুড়িয়া লইয়া শুধু বদমায়েসেরা যে ক্ষান্ত হইত তাহা নহে, সময়ে সময়ে খুন জখম অবধি করিয়া ফেলিত। অধিকন্তু পথে পীড়া হইলে একেবারে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই ছিল না, জগদীশ বাবু গ্রাণ্ডট্রঙ্ক রোডে এমন সুব্যবস্থা করিলেন যে, প্রত্যেক এক ক্রোশ অন্তর একজন কনষ্টেবল ও চারিজন পাইক এবং প্রত্যেক তিন ক্রোশ অন্তর একজন হেড্‌ কনষ্টেবল, চারিজন কনষ্টেবল এবং আটজন পাইক, তাহাদের এলাকার ভিতর চৌকি পাহারা করিত,ইহাদের উপর একজন ইন্‌স্পেক্টর ও দুইজন সব্‌ইন্‌স্পেক্টার খালি জেদগস্ত করিত, স্বয়ং জগদীশ বাবু নিজে ঝুপ ঝাপ করিয়া আজ এখানে কাল ওখানে দেখিয়া বেড়াইতেন, সুতরাং চুরি ডাকাতী তাঁহার এলাকার ভিতর একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই সব পুলিশ-কর্ম্মচারিগণের নিকট জ্বর, কলেরা, রক্ত আমাশয়ের ঔষধ থাকিত এবং পানীয় জলের ইন্দারা অথবা পুষ্করিণী তাহারা একেবারে ময়লা করিতে দিত না। এই প্রকার সুচারু বন্দোবস্তে যাত্রীদিগের বড়ই উপকার হইয়াছিল। ক্রমে কটক এবং পুরীর পুলিশ সাহেবেরা ঠিক ঐ রকম আপন আপন এলাকায় করিয়াছিলেন। এই সময় দিনাজপুরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, স্যার রিচার্ড টেম্পল জগদীশ বাবুকে মনোনীত করিয়া দুর্ভিক্ষকার্য্যে ব্রতী করিলেন। তিনি প্রথমতঃ দুইলক্ষ মণ চাউল সংগ্রহ করিবার ভার পান, মালদহ এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে চাউল সংগ্রহ করিয়া, উহা দিনাজপুরে গোলাজাত করা হয়, দিনাজ-

পুরে চারিমাস ধরিয়া তিনি পুলিস ও দুর্ভিক্ষ উভয় বিভাগেরই কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহার পর রামগঞ্জে গিয়া একেবারে দুর্ভিক্ষের কর্ম্মে ব্রতী হয়েন। এই রামগঞ্জ মাঠের উপর একটা ক্ষুদ্র স্থান, কিন্তু দুর্ভিক্ষের জন্য ইহা আধা সহরে পরিণত হইল। 'ফেমিন'কর্ম্মচারীর সুবৃহৎ বাঙ্গালা সম্মুখে সুবৃহৎ তাম্বু খাটান, এই তাম্বুটি অফিসারদিগের জন্য এবেসিনিয়ান একস্‌পিডিসনে গিয়াছিল, বড় বড় প্রকাণ্ড চালের গোলা, কর্ম্মচারীদিগের থাকিবার বাসা, খাদ্য-সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য দোকান-ঘর প্রভৃতি নানাবিধ আটখানা চালা বাঙ্গালা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর প্রভৃতিতে রামগঞ্জ একটা জনাকীর্ণ স্থান হইয়া পড়িল। গ্রামটির নীচে টাঙ্গন বলিয়া একটি নদী হিমালয় হইতে পড়িতেছে, তাহার বক্ষে পারাপারের সুবিধার জন্য একটি বাঁশের পুল নির্ম্মিত হইল।

(ক্রমশঃ)

জিজ্ঞাসা।

—:*:—

হে ধ্রুব, হে অন্তর্য্যামী, হৃদি-অন্তঃপুর
তব রূপ-রস-স্পর্শে সদা ভরপুর-
এ কথা কে কবে নাথ, করে অস্বীকার ?
তবে কেন প্রাণারাম, হেন ব্যভিচার,—
তব সহ পরিচয় করিবার তরে,—
অক্ষয় করুণা-স্নেহ লভিতে অন্তরে,—
পুরোহিত—প্রতিনিধি—পথ-প্রদর্শক,
অনিল-সলিল-সম হবে আবশ্যক ?
যে সম্বন্ধে বাঁধিয়াছ হৃদয় আমার—
তা'র মাঝে কোথা স্থান অন্যে দাঁড়াবার ?
আমার প্রাণের কথা—সে গুপ্ত কাহিনী—
মিলন-মঙ্গল তব, দিবসযামিনী,
অপরে বলিবে মোরে,—তা' কি হয় কভু ?
চির-প্রিয়তম মম, হে নিখিল প্রভু !

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা।

প্রথম পাঁচ ফর্ম্মা মেট্‌কাফ্‌ প্রিন্টিংওয়ার্কসে ও শেষ দুই ফর্ম্মা মেট্‌কাফ্‌ প্রেসে মুদ্রিত।

---

৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, মেট্কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন।

[নবপর্য্যায়]

মাসিক পত্র।

চতুর্থ বর্ষ।

১৩১১।

লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যোগেশ-চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ, শ্রীযুক্ত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঠাকুর, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী, গোপালকৃষ্ণ, ৺সতীশচন্দ্র রায় প্রভৃতি।

সহঃ সম্পাদক

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক

২০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, মজুমদার লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত।